পূজাবার্ষিকী ১৪২৯
আনন্দমেলা
KUNAL '22

আনন্দমেলা

পূজাবার্ষিকী ১৪২৯

সূচিপত্র

সম্পূর্ণ উপন্যাস

শ্যাডোর বাবার ব্রেন টিউমার। হঠাৎ কয়েক জন এসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা অপারেশনের পাঁচ লাখ টাকা দিতে রাজি। শর্ত, এক জন অচেনা মানুষকে খুন করতে হবে। বাবার কথা ভেবে শ্যাডো সায় দেয় প্রস্তাবে। ও দিকে এক ফেরিওয়ালা এসে গজপতিবাবুকে রোজ-রোজ আশ্চর্য জিনিস গছাচ্ছে। সে এমন হুইস্‌ল দিয়েছে যা বাজালে শব্দ হয় না। গন্ধ বেরোয়। যে গন্ধে মশা-মাছি থাকে না। কে সেই ফেরিওয়ালা? কেনই বা শ্যাডোকে মারতে হবে এক জন রহস্যময় ব্যক্তিকে?

আড়ালে রয়েছে সে

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ৫০

এই কাহিনির পটভূমি ষোড়শ শতকের শেষ দিক। তখন বাংলায় বারো ভুঁইয়ার রাজত্ব। যশোরের রাজসিংহাসনে আসীন রাজা প্রতাপাদিত্য। দাস ব্যবসা করছে পর্তুগিজ় জলদস্যুরা। তাদের খপ্পর থেকে দুটো ছেলে-মেয়েকে উদ্ধার করতে বেরিয়ে পড়েছে উষ্ণীষ। ছেলে-মেয়েরা তো উদ্ধার হয়, কিন্তু উষ্ণীষ জড়িয়ে পড়ে এক জটিল জালে। পর্তুগিজ় জলদস্যু দাভি ডি'ক্রুজ় কুটিল ষড়যন্ত্র করে, মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা করার। কী সেই ষড়যন্ত্র? ও দিকে মান সিংহ বাহিনী নিয়ে আসছে বাংলা দখল করতে। শেষ পর্যন্ত উষ্ণীষ কি পারল জাল কেটে বেরিয়ে আসতে?

হাতে সময় বড্ড কম

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ৯৩

টেলিভিশনে শুরু হয়েছে জমজমাট রিয়্যালিটি শো, 'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ'। পোড়ো বাড়ির ভিতরে কিংবা অন্য ভূতুড়ে জায়গায় প্রতিযোগীদের নানা কাজ করতে হবে। সেই শোয়ের চূড়ান্ত পর্বে উঠেছে গুড়িয়া এবং বাপ্পাদিত্য। কিন্তু যে-বাড়িতে সেই পর্বের শুটিং হওয়ার কথা ছিল, তার বুকিং বাতিল হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে মাইকেল নামের এক জনকে নতুন বাড়ি খোঁজার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মাইকেল কিন্তু অন্য ফন্দি আঁটে। কী হল শেষ পর্যন্ত?

মৃতের সঙ্কেত

রাজেশ বসু ১৭৮

বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞান সম্মেলনে জড়ো হয়েছেন কয়েক জন বিজ্ঞানী। কথায়-কথায় ওঠে বিজ্ঞানী বরিস ডেফনারের কথা। তিনি অপ্টোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ মারা যান। সঙ্গে মারা যায় তাঁর কুকুরও। সেই মৃত্যু কি স্বাভাবিক? কে মারল বিজ্ঞানীকে? কেন? কোন রহস্য লুকিয়ে ওই মৃত্যুর আড়ালে?

অকালবোধন

অঙ্কন মিত্র ২৫৫

ঝিল, পয়ার, জারুল, আবহ... সবাই অধিরাজ স্যারের কোচিং ক্লাসে এক সঙ্গে পড়ে। এক দিন উষ্ণীষদা পয়ারকে বলে, পুজোয় ঠাকুর দেখার সময় সে চায়, পয়ারের সাহায্যে ঝিলকে অপহরণ করতে। বদলে পয়ার পাবে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ। পয়ার রাজি না হয়ে পারে না। এ দিকে বোস ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি মারফত জারুলের হাতে আসে এক অদ্ভুত তদন্তের ভার। বহু দিন আগে এক কারখানায় লক আউটের সময় বোমা বিস্ফোরণে মারা যান এক ভদ্রলোক। এই ঘটনার সঙ্গে আজকের অপহরণ কি এক সূত্রে বাঁধা? কী ভাবে?

ঝিকিমিকি আলো

অদিতি ভট্টাচার্য ৩৩৫

টুকাই আর তাতাই দুই ভাই। বাবার মৃত্যুর পর দুই ভাইকে নিয়ে মা চলে এলেন গ্রামে। নিজের দাদার বাড়িতে। শুরু হল দুই ভাইয়ের নতুন জীবন। যে জীবনে কল্পনা এবং বাস্তব মিলেমিশে একাকার। তবে মামা খুব কড়া। আর তাতাই ভুগছে এক অদ্ভুত মানসিক সমস্যায়। আবার, সেই গ্রামেই থাকতে এসেছেন মৃণাল মজুমদার। প্রতি রাতে তাঁর বাড়িতে দেখা যায় এক ছায়ামূর্তি। কেন ঘুরছে ছায়ামূর্তি?

মাসাইমারার বিশল্যকরণী

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৯

বাবা-মায়ের সঙ্গে মাসাইমারার জঙ্গলে বেড়াতে এসেছে সবুজ। নাইরোবি বিমানবন্দরে পরিচয় অলীকবাবুর সঙ্গে। সেই ট্রিপে বন্য জন্তুদের দেখার পাশাপাশি সবুজ জড়িয়ে পড়ল এক অন্য অ্যাডভেঞ্চারে। অলীকবাবুকে কিছু খারাপ লোক ধরতে চাইছে। পেতে চাইছে এক বিশেষ পেন ড্রাইভ। সেটা তিনি চুপিসারে তুলে দিয়েছেন সবুজের হাতে। কী আছে সেই পেন ড্রাইভে? অলীকবাবুই বা কে?

সম্পূর্ণ শঙ্কু কমিক্স

প্রফেসর রন্ডির টাইম মেশিন ১২১

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

চিত্রনাট্য ও ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছেন প্রফেসর রন্ডি। শঙ্কুকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন নিজের বাড়িতে। ইটালির মিলান শহরে। উদ্দেশ্য, ওই টাইম মেশিন দেখানো। রাজি হলেন শঙ্কু। তখনই নকুড় এসে হাজির শঙ্কুর গিরিডির বাড়িতে। শঙ্কুকে সতর্ক করার জন্য। একটা বড়সড় বিপদে পড়তে চলেছেন শঙ্কু। এবং সেটা ওই মিলানেই। কী হল তার পর? শঙ্কু কি টাইম মেশিনে চড়ে অতীতে যেতে পারলেন? প্রফেসর রন্ডির ওখানে কী বিপদ এল?
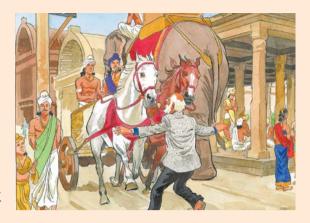
সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

সোনালি পাড়ের রহস্য ২০৭

কাহিনি: সমরেশ বসু

চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

মানসিক উদ্বেগ কমাতে গোগোলকে নিয়ে পুরী গেলেন বাবা-মা। কিন্তু সেখানে এক ফাঁকা বাড়িতে গোগোল রহস্যের গন্ধ পেল। মাঝে-মাঝে বাবা-মায়ের চোখ এড়িয়ে গোগোল হানা দিল সেই বাড়িতে। এবং জড়িয়ে পড়ল নতুন রহস্যের জালে।

সম্পূর্ণ হাসির কমিক্স

সোনালি জিশুর মূর্তি ২৮৮

কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

টনির গাড়িতে চড়ে ‘মর্নিংওয়াকে’ গিয়ে বিপদে পড়ল রাপ্পা আর তার বাবা। গাড়ি খারাপ। তখনই রাস্তার ধারে এক জনকে রাপ্পা দেখল, সাপ ধরে দেওয়ার জন্য আর-এক জনকে ফরমায়েশ করতে। রাপ্পার যাওয়ার কথা ছিল শিল্পসংগ্রাহক ত্রিবেণী পাত্রের সাক্ষাৎকার নিতে। কিন্তু তার আগেই ত্রিবেণীবাবু হঠাৎ দুর্ঘটনায় পড়লেন। হঠাৎ কেন এই দুর্ঘটনা? এতে কার কী লাভ?

গ ল্প
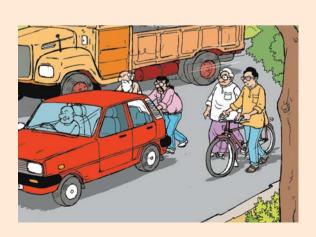
নেমন্তন্ন পাকড়াশি

প্রচেত গুপ্ত ৪৪

জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশির জীবনের একটাই শখ। নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ানো। কেউ এক বার নেমন্তন্ন করলেই হল। ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করেও তিনি হাজির হন সেখানে। নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্য মাইলের পর-মাইল হেঁটেছেন তিনি। এমনই তাঁর নেশা। সেই মানুষকে হঠাৎ দেখা গেল নেমন্তন্নে যাওয়ার জন্য টাকা ধার করতে। কেন?

জ্যাঠামশাইয়ের তালা

উল্লাস মল্লিক ৮১

বিয়েবাড়ি থেকে সপরিবারে ফিরছেন জ্যাঠামশাই। এমন সময় খেয়াল হল, বাড়ির গেটের চাবি নেই। পকেট ফাঁকা। বিষ্ণুচকের মেলা থেকে আগের দিনই এই হাতি-মার্কা তালা কিনে এনেছিলেন জ্যাঠামশাই। কারণ পাড়ায় কয়েক দিন ধরেই বেশ চুরি হচ্ছে। এর মধ্যেই চাবি হারিয়ে ফেললেন জ্যাঠামশাই? শুরু হয়ে গেল খোঁজ। রাস্তা থেকে ম্যারেজ হল, কিছুই বাদ গেল না। শেষমেশ মিলল কি?

হলুদ পুতুলের রহস্য

বিপুল দাস ৮৬

মাঠ ভর্তি লোকের মধ্যে হঠাৎই ভাইয়ের গলা কানে আসে তনুর। অথচ তনুর তো কোনও ভাই নেই। এক ভাই অবশ্য ছিল। কিন্তু সে তো জন্মের কিছু দিন পরেই মারা যায়। তা হলে কে ডাকে ওকে? যখনই কোনও বিপদে পড়ে তখনই কার গলা শুনতে পায় ও? সবই কি ওর মনের ভুল? নাকি সত্যিই ও নিজের মৃত ভাইয়ের গলা শুনতে পায়? এর সঙ্গে হলুদ পুতুলেরই বা কি রহস্য?

শিউলিতলায় ভোরবেলা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় **৮৯**

প্রতি বছর শিউলিতলায় নাকি জাদু হয়। যা হারিয়ে যায়, তা-ও নাকি ফিরে আসে! এ কথাটা বলে বদ্যি বুড়ি। আগের বার ষষ্ঠীর দিন শিউলিতলা থেকেই পাওয়া গিয়েছিল একটা কুকুর ছানা। পুজো মিটতেই সে-ও যেন হারিয়ে গেল। এক পুজোয় দেখা মিলল জগু বলে ম্যাজিকের শো-এর এক বাজনাদারের। পরের বার এল জলু। কিন্তু সবাই কেমন হারিয়ে যায় পুজোর শেষে। হারিয়ে যাওয়ার এই খেলা কি শেষ হওয়ার নয়?

দড়ি

স্বর্ণেন্দু সাহা **১৭৩**

আকাশ থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে দড়ি নেমে এসেছে। অদ্ভুত সেই দড়ি দিয়ে আটকে রাস্তার বড়-বড় যানবাহনদের কেউ যেন এক নিমেষে আকাশে তুলে নিতে চাইছে। চলন্ত ইঞ্জিনও ফেল, তা থেকে কেবলই গোঁ-গো করে শব্দ বেরোচ্ছে। শুধু রিকশা ও সাইকেলের কিছু হচ্ছে না। দড়িগুলো কাটার চেষ্টা করেও বিশেষ লাভ হল না। সবাই বেশ আতঙ্কিত। কোথা থেকে এল এমন ভয়ানক সব দড়ি? এর পিছনে কাজ করছে কোন রহস্য?

গোপন পাহারাদার

জয়দীপ চক্রবর্তী **২৮২**

চা-বাগানের সুন্দর পরিবেশে বেড়াতে এসেছে দুই খুড়তুতো ভাই। সঙ্গে বাবা-মা আর পরিবারের অন্যান্য। যে বাংলোয় তারা থাকছে, তার পাশেই রয়েছে ঘন জঙ্গল। এক দিন দুপুরে সবার অলক্ষ্যে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল তারা। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় জঙ্গলে গিয়ে কিসের মুখোমুখি হবে তারা? জঙ্গলে কি লুকোনো রয়েছে কোনও সম্পদ? নাকি তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে কোনও অন্য রকম বিপদ?

পু রা ণ

মহিষাসুরমর্দ্দিনী

তিতাস চট্টোপাধ্যায় ১২

মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন বলেই তো দেবী দুর্গাকে আমরা মহিষাসুরমর্দ্দিনী বলে থাকি। কিন্তু ক'বার বধ করেছিলেন তিনি মহিষাসুরকে?

প্রা ণি জ গ ৎ

মশাদের ঠান্ডা করা যাবে কি?

যুধাজিৎ দাশগুপ্ত ৪৮

কে বলে ঠান্ডায় বাঁচে না মশা? আলাস্কার হাড় হিম করা ঠান্ডাতেও বিজ্ঞানীদের ছেঁকে ধরেছিল শয়ে-শয়ে মশা। রক্তচোষা এই মশাদের ভীষণ ভয় পায় হরিণরাও!

ভ্যাম্পায়ার ব্যাট

জয় সেনগুপ্ত ১৭৬

ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। এ কি গল্প? না কি সত্যি? বিজ্ঞান বলছে সত্যি। মেক্সিকো, ব্রাজ়িল, আর্জেন্টিনায় ঘুপচি অন্ধকারে, গুহায় গেলেই দেখা মিলবে ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের।

বি চি ত্রা

বিশ্বের ধনী রাজাদের গল্প

ঋষিতা মুখোপাধ্যায় ২৮১

কারও আছে আটত্রিশটা এরোপ্লেন, কারও আবার গাড়িটাই সোনায় মোড়া। ইতিহাসের পাতায় নন, এঁরা দিব্যি আছেন আধুনিক বিশ্বেই। ধনী রাজাদের বিপুল ধনসম্পদের ঝলক।

বি জ্ঞা ন

জীবাশ্মে টাইম ট্র্যাভেল

অচ্যুত দাস ৮৪

আশ্চর্য কিছু জীবাশ্মে আজও ধরা আছে কোটি-কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর বাসিন্দাদের স্বভাবের ছবি। সেই ছবি বুঝতে পারা মানে যেন অতীতে টাইম ট্র্যাভেল করে আসা।

ই তি হা স

অ্যানে ফ্র্যাঙ্কের সেই ডায়েরি

উপাসনা সরকার পাত্র ২৮৬

তেরো বছর বয়সে ডায়েরি লিখতে শুরু করেছিল কিশোরী অ্যানে ফ্রাঙ্ক। গোপন আস্তানায় লুকিয়ে সে লিখতে পেরেছিল মোটে বছর দুয়েক। এ বছর ৭৫ বছর পূর্ণ হল সেই ডায়েরির।

খেলার ইতিহাস, ইতিহাসের খেলা

অংশুমিত্রা দত্ত ৩৩৪

জিমন্যাস্টিক্স, তিরন্দাজি, ফুটবল— খেলাগুলো মানুষের জীবনে আছে ও ক্রমাগত নিজেদের হাবভাব, আদবকায়দা পাল্টে চলেছে হাজার-হাজার বছর ধরে।

সা হি ত্য

দেড়শো বছর আগের চোখে

সাগ্নিক রক্ষিত ৩৫৭

জুল ভের্ন তো মানসচক্ষে একশো বছর পরের প্যারিস দেখে তার আশ্চর্য বিবরণ লিখে গেলেন। কিন্তু নিয়তি এমনই, একশো ছাব্বিশ বছর ধরে সে-লেখা বন্ধই পড়ে রইল সিন্দুকে। সিন্দুক খুলে উপন্যাস পড়তে বসে সবার চোখ কপালে!

খে লা ধু লো

ক্রিকেটের আগুনে ব্যাটার অ্যালিসা

চন্দন রুদ্র ৩৭৯

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলের হয়ে খেলছেন অ্যালিসা হিলি। ব্যাট হাতে উইকেটের সামনে কিংবা গ্লাভস হাতে উইকেটের পিছনে, তাঁর আগুনঝরা পারফরম্যান্স চমকে দিচ্ছে সারা বিশ্বকে।

অন্যান্য আকর্ষণ
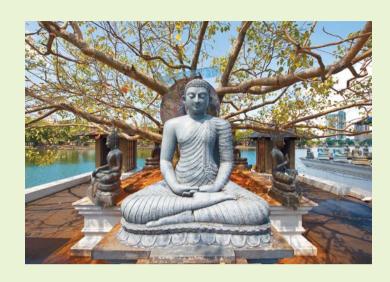
প্রচ্ছদ: কুনাল বর্মণ

সম্পাদক: সিজার বাগচী

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড সি পি-৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মহিষাসুরমর্দ্দিনী

মহিষাসুর বধ করেই দেবী দুর্গা হয়ে উঠেছিলেন মহিষাসুরমর্দ্দিনী। এক বারের বেশি তিনি বধ করেছিলেন মহিষাসুরকে।

তিতাস চট্টোপাধ্যায়

দেবী দুর্গা যে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, এ গল্প তো আমাদের সবার জানা। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় দেবী কত বার মহিষাসুরকে বধ করেছেন? ব্যস, তা হলেই কিন্তু অনেকে ধন্দে পড়ে যাবে। এ আবার কী প্রশ্ন? মহিষাসুরকে তো এক বারই বধ করেছিলেন দেবী! উঁহু, হল না। আসলে আমাদের পুরাণের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এমন অনেক কাহিনি, যেগুলো আমরা অনেকেই সে ভাবে জানি না। কেমন সেই গল্প?

জানতে গেলে আরম্ভ করতে হবে মহিষাসুর বধের গল্প দিয়ে। সেই গল্প আবার শুরু মহিষাসুরের বাবার আমল থেকে।

সে কালে রম্ভ নামে এক অসুর ছিল। দিন-রাত এক করে সে শুরু করল কঠিন তপস্যা। তার এই কঠিন তপস্যা দেখে এক সময় খুশি হলেন মহাদেব। রম্ভকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কী বর চায়। রম্ভাসুর ঠিক এই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল। সে বলল, তার এমন এক জন পুত্র চাই, যে ত্রিলোক বিজয়ী হবে। অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের কেউই তাকে বধ করতে পারবে না। মহাদেবও বললেন, "বেশ, তাই হবে।" তার মানে জন্মানোর আগে থেকেই মহিষাসুর পেয়ে গেল এই রকম একখানা জবরদস্ত বর।

কিন্তু কথা হচ্ছে রম্ভ কিন্তু একাই তপস্যা করেনি।

মহিষাসুরও তপস্যা করেছিল। সে তখন এক জন সাধারণ বালক। তার সেই তপস্যা দেখে ভয় পেয়েছিলেন দেবতারাও। কিন্তু কী করা যাবে, সেই ঘোর তপস্যা দেখে ব্রহ্মার মন না গলে আর যায় কোথায়! ব্রহ্মাও এসে মহিষাসুরকে বললেন, তার কী বর চাই। মহিষাসুরও কম যায় না। এই সুযোগ সে ছাড়ে! সে ব্রহ্মার কাছে বর চেয়ে বসল, যাতে কোনও পুরুষই তাকে বধ করতে না পারে। কী সাংঘাতিক দাবি ভাবো! এমন বর পেয়ে সে ক্রমেই হয়ে উঠল দারুণ অত্যাচারী। আর কাকে ভয় তার! সে তো স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। দেবতাদের সঙ্গেও শুরু করল ভীষণ যুদ্ধ। শেষে করল কী, স্বর্গ থেকে দেবতাদের একেবারে তাড়িয়ে ছাড়ল। দেবতারা তখন পড়লেন মহা বিপদে। কী করবেন এখন তাঁরা? কী করেই বা এই দুষ্টু দৈত্যকে দমন করবেন? এই সব ভাবতে-ভাবতেই তাঁরা সকলে মিলে গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললেন, কোনও পুরুষ তো মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না, তা হলে এক মাত্র উপায় রইল নারীশক্তির আবাহন। এই শুনে সব দেবতা একত্র হলেন। তাঁদের সম্মিলিত তেজ থেকে আবির্ভূত হলেন অষ্টাদশ হাতের এক অপরূপ নারী।

অষ্টাদশ হাতের নারী? কিন্তু দেবী দুর্গাকে তো আমরা দেখি দশভুজা রূপে! তা হলে? আসলে দেবীর নানা রূপ। কখনও তিনি দশভুজা, কখনও তিনি অষ্টাদশভুজা, কখনও তিনি ষোড়শভুজা। মানে কখনও তাঁর হাতের সংখ্যা দশ, কখনও বা আঠারো, কখনও আবার ষোলো। যাই হোক, দেবতাদের তেজ থেকে সেই দেবী তো আবির্ভূত হলেন। এ বার দেবী যুদ্ধ করবেন কী করে? তাঁকে তো যুদ্ধসাজে সাজাতে হবে। তাই দেবীকে অস্ত্র দিয়ে সাজালেন দেবতারা। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে দিলেন ত্রিশূল, বরুণদেব দিলেন শঙ্খ, ইন্দ্র দিলেন বজ্র, যম দিলেন দণ্ড, ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু... এমন আরও কত অস্ত্র! সেজে উঠলেন দেবী। একেবারে তৈরি যুদ্ধযাত্রার জন্য।

এ-দিকে মহিষাসুরের কানে গেল এ রকম এক জন দেবীর কথা। দেবীর বর্ণনা শুনেই তাড়াতাড়ি সে দেবীর কাছে তার এক দূত পাঠাল। কারণ তার ইচ্ছে, সে দেবীকে বিয়ে করবে! দূত তো গেল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। কারণ সেই দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন দেবী দুর্গা। খবর শুনে রেগেমেগে মহিষাসুর করল কী, এ বার তার সৈন্যদের পাঠাল। দুর্ধর্ষ সব সৈন্য। তাদের নাম শুনে ভয়ে কাঁপত ত্রিলোক। কিন্তু তাতে কী? দেবীর তেজের কাছে সবাই তো নস্যি! তিনি কী করলেন, তাদের সব্বাইকে এক-এক করে বধ করলেন। খবরটা গেল মহিষাসুরের কানে। ব্যাপারটা যে এই রকম দিকে যাবে, মহিষাসুর ভাবতেই পারেনি। নিজের প্রিয় সৈন্যদের এ রকম অবস্থা দেখে এ বার তো মহিষাসুর ভীষণ রেগে গেল। সে ভাবল, এ বার তাকেই একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। এ রকম চলতে দেওয়া যায় নাকি! এই ভেবে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ল দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ব্যস, অমনি শুরু হল তুমুল যুদ্ধ! নানা ছলনা দিয়ে দেবীকে ভোলাতে লাগল মহিষাসুর। নানা রূপ পাল্টে-পাল্টে দেবীর সামনে আসতে লাগল। দেবীও কম যান না। এ ভাবে অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলল। তার পর অবশেষে এক দিন দেবী দুর্গা চক্র দিয়ে ছিন্ন করে দিলেন মহিষাসুরের মাথা। বধ হল দুর্ধর্ষ অসুর মহিষাসুর। আর এ ভাবেই দেবী দুর্গা হয়ে উঠলেন মহিষাসুরমর্দ্দিনী।

এ বার যে কথাটা প্রথমে বলছিলাম, এই মহিষাসুর কিন্তু এক বার নয়, জন্মেছিল তিন বার। অবশ্য সেটা তিনটে আলাদা কল্পে। কল্প শব্দটা অচেনা লাগছে না? ঠিকই। আমাদের সে ভাবে জানার কথা নয়। কল্প হল বহু পুরনো একটা কাল গণনার হিসেব। আর হিসেবটা একটু শক্ত। তাও সহজ করে একটু বলার চেষ্টা করা যাক। আমাদের হিসেবে যা ৪৩২ কোটি বছর, তাতে ব্রহ্মার একটা দিন। তাকেই বলা হয় এক কল্প। এখন দিন ও রাত মিলে দুই কল্প। দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়, আর রাতে তার বিনাশ হয়। যাই হোক, এই রকম তিনটে আলাদা কল্পে তিন বার মহিষাসুর জন্ম নিয়েছিল। আর দেবী কী করেছিলেন? তিনটে আলাদা-আলাদা রূপ নিয়ে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। প্রথম কল্পে দেবী উগ্রচণ্ডা রূপ নিয়ে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। এই দেবী অষ্টাদশভুজা। দ্বিতীয় কল্পে ভদ্রকালী রূপে মহিষাসুরকে বধ করেন। এই দেবীর হাতের সংখ্যা ষোলো। আর শেষ কল্পে দেবী দশভুজা দুর্গা রূপে আবির্ভূত হয়ে অসুর নিধন করেন। দেবী যে মহিষাসুর বধের জন্য এত বার এত রূপ নিয়েছেন, এ কথা কতজন জানি?

শেষমেশ মহিষাসুর তো দেবীর হাতে বধ হল। কিন্তু মনে হতেই তো পারে, সে তো ভারী দুষ্টু একটা লোক। তা হলে দেবী দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরকেও পুজো করি কেন? এই গল্পও রয়েছে কোনও এক পুরাণে। কী সেই গল্প? মহিষাসুর এক সময় বুঝতে পেরেছিল যে, দেবীর হাতেই তার মৃত্যু নিশ্চিত। তখন সে দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করা শুরু করে। সে বলে, তাকে যেন দেবীর সঙ্গেই সব সময় পুজো করা হয়। সে আর কিছু চায় না, সে দেবীর পদসেবক হয়েই থাকতে চায়। দেবীও দয়াময়ী। মহিষাসুরের প্রার্থনা শুনে তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন, ''তা-ই হবে।''

সেই থেকে দেবী দুর্গার সঙ্গে-সঙ্গে মহিষাসুরও পুজো পেতে থাকল। কত পুরনো সভ্যতায় মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে জানো নিশ্চয়ই! সেখানে কিন্তু দেবী দুর্গা আমাদের এখনকার মতো সপরিবারে নেই। কিন্তু কেন সপরিবারে নেই, তার পিছনে রয়েছে প্রতিমার রূপ বদলের গল্প। তবে সে গল্প এখন না, পরে হবে!

তথ্যসূত্র: *পৌরাণিক অভিধান, (সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত)*

ছবি: *রৌদ্র মিত্র*

সম্পূর্ণ উপন্যাস

এক আশ্চর্য ফেরিওয়ালা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছবি: দেবাশিস দেব

সন্ধে ঠিক সাতটা পনেরো মিনিটে জিম থেকে বেরোল শ্যাডো। শ্যাডো সেনগুপ্ত। পরনে ফেডেড জিন্‌স, গায়ে একটা হ্যান্ডলুমের ধূসররঙা হাতকাটা কুর্তা, পায়ে সাদা এবং ময়লা স্নিকার্স, কাঁধ থেকে একটা কিটব্যাগ ঝুলছে। সে বেশ অনেকটাই লম্বা, ছমছমে শরীর, মেদহীন। ডান দিকে ঘুরে সে একটু উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটছিল। আসলে এখন তার বিশেষ কোথাও যাওয়ার নেই, তেমন কিছু করারও নেই।

এরকম অবস্থায় তার সবচেয়ে প্রিয় পাসটাইম হল চেনা-অচেনা রাস্তায় হেঁটে-হেঁটে বেড়ানো। তার এখন একটু খিদে পেয়েছে, পকেটে যা পয়সা আছে তাতে ফুটপাতের জাঙ্ক ফুড হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সে জাঙ্ক ফুড কদাচ খায় না। সুতরাং খিদেটাকে উপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আর এটা সে ভালই পারে।

সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় রোড থেকে সে নিউ মার্কেটের দিকে ঘুরল। নিউ মার্কেটে ঘুরে বেড়াতে তার খারাপ লাগে না। কিছু কেনাকাটা করার নেই তার, কোনও জিনিসের প্রতিই তার তেমন কোনও আগ্রহও নেই। কিন্তু দেখে বেড়াতে তার মন্দ লাগে না। সময়টাও কেটে যায়। লোকে কেনাকাটা করে এবং তা থেকে আনন্দও পায়, এটা দেখতে তার ভালই লাগে।

জিম করার পর প্রচুর ঘাম হয়। তোয়ালে দিয়ে মুছলেও ঘামের চটচটে ভাবটা যায় না। একটু স্নান করতে পারলে হত, কিন্তু এই জিমটায় স্নানের ব্যবস্থা নেই। তবে এখন শীতের মরসুম বলে ততটা অসুবিধে হচ্ছে না।

ফুটপাতে হাঁটার উপায় নেই, দোকানিরা পসরা সাজিয়ে বসে গেছে। তাদের মধ্যে একটা লোক প্লাস্টিক শিটের উপর কিছু টুলস সাজিয়ে বসেছে। স্ক্রু ড্রাইভার, প্লাস, রেঞ্চ, টেস্টার, প্লায়ার, হাতুড়ি ইত্যাদি। তার বাবা ক'দিন যাবৎ একটা হাতুড়ির কথা বলছে। সস্তায় একটা হাতুড়ি কেনা যায় কিনা দেখার জন্য দোকানটার সামনে একটু দাঁড়িয়ে মন দিয়ে জিনিসগুলো দেখছিল শ্যাডো, এমন সময় হঠাৎ একটা মোটরবাইক সবেগে এসে তার গাঁ ঘেঁষে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। হেলমেটে ঢাকা মুখ লোকটা খুব জরুরি গলায় বলল, ''হপ আপ ম্যান।''

শ্যাডো সহজে চমকায় না, বিস্মিতও হয় না। তার নার্ভ খুব শক্ত। সে ফিরে তাকিয়ে ঠান্ডা গলাতেই বলল, ''হোয়াই?''

''দেয়ার ইজ় আ জব ফর ইউ ম্যান। হপ আপ! উই হ্যাভ টু টক।''

বিকেলটা ম্যাড়ম্যাড়ে কাটছিল, তার চেয়ে বরং একটা অ্যাডভেঞ্চার ভাল। অ্যাডভেঞ্চার তো কপালে খুব একটা জোটে না! শ্যাডো আর কথা না বাড়িয়ে মোটরবাইকের পিছনে উঠে পড়ল। তার বিস্ময় নেই, এমন নয়। কিন্তু সেটার কোনও প্রতিক্রিয়া তার মুখে বা আচরণে দেখা যায় না।

ভিড়ের রাস্তায় লোকটা দিব্যি ওস্তাদের মতো বাইকটা চালাতে লাগল। খুব পাকা হাত। শ্যাডোর কখনও ভয় বা দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ হয় না। জন্মসূত্রেই সে এক ধরনের নির্বিকারত্ব নিয়ে জন্মেছে। তার জীবনদর্শন হল, যা হওয়ার হবে। আমার তো কিছু করার নেই। দেশ-কাল-পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষ চালিত হয়, তার নিজের ইচ্ছেয় কিছুই হয় না। তা হলে আমি ভেবে মরি কেন? লোকটা মন দিয়ে বাইক চালাচ্ছে, আর শ্যাডো চুপচাপ বসে লক্ষ করছে, লোকটা কোন পথ দিয়ে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

ময়দান পেরিয়ে খিদিরপুর। ফ্যান্সি মার্কেট ছাড়িয়ে আরও একটু গিয়ে একটা রেস্তরাঁর সামনে বাইক দাঁড় করাল লোকটা। ইশারায় নেমে পড়তে বলল তাকে। শ্যাডো নেমে দাঁড়ালে লোকটাও নামল এবং হেলমেট খুলে ফেলল। শ্যাডো দেখল, লোকটা মাঝবয়সি, চোয়াড়ে মুখ, গালে অল্প দাড়ি আছে, আর মোটা পাকানো গোঁফ। গম্ভীর মুখেই বলল, ‘‘লেট আস গো ইন।’’

বিরাট রেস্তরাঁর ভিতরটায় গিজগিজে ভিড়, আর প্রচুর কথাবার্তা এবং শোরগোল। হয়তো এদের খাবারদাবার ভাল এবং সস্তা। তাই এত ভিড়। ভিতরটা হলঘরের মতো বড় এবং দেখে মনে হয়, বেশ পুরনো রেস্তরাঁ। লোকটা তাকে টেবিল-চেয়ারের ফাঁক দিয়ে একটু ভিতরের দিকে একটা টেবিলে নিয়ে এল। টেবিলে চার জন কাস্টমার বসে ছিল, তারা কাছে যেতেই চার জন চটপট উঠে হাওয়া হয়ে গেল। শ্যাডোর বুঝতে অসুবিধে হল না যে, ওই চার জন তাদের জন্যই টেবিলটা দখল করে বসে ছিল।

লোকটা তাকে ইশারায় বসতে বলে নিজেও উল্টো দিকে বসে ভাঙা বাংলায় বলে, ‘‘বস এখনই চলে আসবে। তুমি কী খাবে বলো তো! এনিথিং ইউ লাইক।’’

শ্যাডোর খিদে পেয়েছে, সে অকপটে বলল, ‘‘খাবার খাওয়ার মতো পয়সা কিন্তু আমার কাছে নেই।’’

লোকটা একটা তাচ্ছিল্যের হাতনাড়া দিয়ে বলল, ‘‘ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি যা খুশি খেতে পারো।’’

টেবিলের উপর একটা ময়লা প্লাস্টিকের কভারে মেনুটা পড়ে ছিল। শ্যাডো সেটা তুলে নিয়ে মন দিয়ে দেখে বলল, ‘‘আমি কি একটা মুরগির স্টু নিতে পারি?’’

‘‘এনিথিং ইয়ংম্যান।’’

লোকটা এখানে বেশ পরিচিত, কারণ তার একটা ইশারাতেই এক জন ওয়েটার হাজির হয়ে গেল। গম্ভীর ভাবে অর্ডার নিল। শ্যাডোর স্টু আর গ্রিন স্যালাড, লোকটার জন্য ব্ল্যাক কফি।

শ্যাডোর অনুমান নির্ভুল। এদের খাবার খুবই ভাল। আর পরিমাণেও বেশ বেশি। খাবার খেতে ব্যস্ত থাকায় টের পায়নি, তার অলক্ষ্যে আর এক জন লোক এসে তার বাঁ দিকের চেয়ারটায় নিঃশব্দে বসেছে। খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে সে খুব ফরসা, টাক মাথা, ছিপছিপে মাঝবয়সি লোকটাকে দেখতে পেল। তার দিকেই চেয়ে আছে এবং খুব মন দিয়ে দেখছে তাকে। লোকটা যে অভিজাত পরিবারের এবং পয়সাওয়ালা তা যেন এর সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে। সে তাকাতেই লোকটা খুব সামান্য একটু হাসল এবং একটু অবাঙালি টানে বাংলায় বলল, ‘‘আর কিছু খাবে শ্যাডো?’’

লোকটা তার নাম জানে দেখে সে অবাক হল না, কারণ এরা তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েই তাকে পাকড়াও করে এনেছে। সুতরাং নাম ছাড়াও এরা আরও অনেক কিছুই জানতে পারে। সে বলল, ‘‘না, আর কিছু লাগবে না।’’

লোকটা অত্যন্ত ভদ্র গলায় বলে, ‘‘জিম করার পর খুব খিদে পায়, আমি জানি। এখানকার ডাম্পলিং খুব ভাল। খেয়ে দেখো।’’

শ্যাডো আপত্তি করল না।

ডাম্পলিং শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লোকটা। তার পর বলল, ‘‘এবার আমরা কি একটু কথা বলতে পারি?’’

শ্যাডো ঠান্ডা গলায় বলে, ‘‘হ্যাঁ। আপনারা আমাকে একটা কাজ দিতে চান বলে শুনেছি!’’

‘‘হ্যাঁ। তার আগে বলি, আমরা তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, কিন্তু সব কিছু নয়। যেমন আমরা জানি, তোমার নাম শ্যাডো সেনগুপ্ত, বয়স তেইশ, বিএ পাশ, এক জন স্পোর্টসম্যান। তুমি ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছ, ক্যারাটে শিখেছ, এবং এক জন বক্সার। অ্যাম আই কারেক্ট?’’

‘‘হুঁ, কিন্তু আমি কোনওটাতেই এক্সেল করিনি। আই অ্যাম আ বর্ন মিডিয়োকার।’’

লোকটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে বলল, ‘‘আমরা কোনও স্টার স্পোর্টসম্যান খুঁজছি না। আমরা জানি, তুমি এক জন অত্যন্ত সাহসী মানুষ, এবং এও জানি, তোমার বাবার বিনাইন ব্রেন টিউমার হয়েছে এবং সেটা অপারেশন করা দরকার। কিন্তু তুমি বেকার এবং ইউ নিড মানি। অ্যাম আই রাইট?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

‘‘আমরা এও অনুমান করেছি যে, তুমি খুব একটা মরালিস্ট নও, কিংবা তোমার কর্মফল, পরকাল, পাপপুণ্য নিয়ে কোনও অবসেশনও নেই। আমি ঠিক বলছি কি?’’

‘‘আমি নাস্তিক, এটা ঠিক কথা।’’

‘‘ভেরি গুড। আমরা তোমাকে একটা কাজ দিতে চাই।’’

‘‘কী রকম কাজ? সেটা কি ইমমরাল?’’

‘‘হলে কি তোমার আপত্তি আছে? আগেই জানিয়ে রাখি যে, এই কাজটার জন্য তোমাকে আমরা পাঁচ লাখ টাকা দিতে রাজি। আর হ্যাঁ, কাজটা অনেকের চোখে ইমমরাল মনে হতেও পারে। যদি তোমার তাতে আপত্তি থাকে তা হলে আমরা আমাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেব।’’

‘‘আগে শোনা যাক, কাজটা কী!’’

‘‘ইউ হ্যাভ টু কিল আ ম্যান!’’

॥ ২ ॥

গজপতি ঘোষ এক জন লাজুক, মুখচোরা, আনস্মার্ট এবং ভিতু মানুষ। মফস্সল শহরের এক প্রান্তে নিরিবিলি জায়গায় তার একটা একটেরে বাড়ি আর তৎসংলগ্ন ছোট মতো একখানা বাগান আছে। গজপতি এক সময়ে বিজ্ঞান গবেষণা করতেন। এখন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শুধু বাগান নিয়ে পড়ে আছেন। বাগানই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তাঁর মাথায় যে একটু গোলমাল আছে, এটা তিনিও জানেন এবং লোকেও টের পায়। এক রকম বীজের সঙ্গে আর এক রকমের বীজ মিশিয়ে তিনি নতুন-নতুন গাছ তৈরির চেষ্টা করেন। বেশির ভাগ চেষ্টাই বিফলে যায়। দু’-একটা গাছ হলেও তাতে ফুল বা ফল প্রত্যাশামতো ফলে না।

এখন সকাল সাড়ে ছ’টা। প্রচণ্ড শীত। চার দিকটা ঘন কুয়াশায় এখনও অন্ধকার হয়ে আছে। এই শহরে শীতকালে রোদ অনেক বেলায় দেখা দেয়। গজপতির গায়ে মোটা পুলওভার, গলায় কমফর্টার, মাথায় বাঁদুরে টুপি, পায়ে মোজা। আজ সকালে তিনি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে তাঁর হাইব্রিড জবা গাছটা দেখছিলেন। কিন্তু না, আজও জবা গাছটায় কোনও কুঁড়ি আসেনি। আর আসবে বলে মনেও হয় না। অথচ তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই গাছটায় কালো রঙের জবা ফুল ফুটবে!

এই সাতসকালে সেই খ্যাপা ফেরিওয়ালাটা ঠেলাগাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, তার আজব সব জিনিস ফিরি করতে। তার ঠেলাগাড়িতে পুরনো লোহালক্কড়, ভাঙাচোরা জিনিস, অকেজো বেহালা, ফেঁসে যাওয়া তবলাডুগি, ফাটা বাঁশি, জংধরা হাতুড়ি, বাতিল যন্ত্রপাতি, এই সবই থাকে। কেউ কিছু কেনে বলে তো মনে হয় না, তবু সক্কালবেলায়

সে ''আ পান, আ পান'' বলে হাঁক মেরে তার সওদা ফিরি করতে বেরোয়।

এই 'আ পান, আ পান' কথাটার মানে কী, তা গজপতি জানেন না। বেশির ভাগ ফেরিওয়ালার ডাকই বোধগম্য নয়। কিন্তু এই লোকটার সঙ্গে গজপতির বেশ পট খায়। কেন পট খায় সেটাও গজপতি বেশ বুঝতে পারেন। তিনিও যেমন একটু পাগল, ফেরিওয়ালাটাও তেমনি একটু খ্যাপা।

এই পথে এলে ফেরিওয়ালাটা গজপতির ফটকের সামনে একটু দাঁড়িয়ে যায়। আজও দাঁড়িয়েছে। এমনিতে গজপতি মুখচোরা হলেও পাগল গোছের লোক পেলে কথা কয়ে সুখ পান। গজপতি ফটকের কাছে গিয়ে দেখলেন, লোকটার গায়ে আজও সেই গেরুয়া রঙের একটা ময়লা ফতুয়া, পরনে সেই খাকি রঙের নোংরা পাতলুন, পায়ে সেই হাওয়াই চটি।

গজপতি আজ একটু মায়াভরে জিজ্ঞেস করলেন, ''ওহে বাপু, তোমার কি গরম জামাটামা নেই?''

লোকটা বেশ লম্বা, রোগাটে চেহারা, রং তামাটে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গালে রুখু দাড়ি এবং গোঁফ। বয়স তিরিশ-পঁয়তিরিশ হবে। এক গাল হেসে বলে, ''গরম জামা! গরম জামা দিয়ে কী হবে বাবু! আমার কি শীতগিরিস্থি বলে কিছু আছে?''

গজপতি অবাক হয়ে বলেন, ''বলো কী হে! এই পাথুরে শীতেও তোমার ঠান্ডা লাগছে না! আমার তো ঠান্ডায় হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে!''

লোকটা বড়-বড় দাঁত দেখিয়ে চওড়া হাসি হেসে বলে, ''মাইনাস কুড়ি বা তিরিশ হলে তখন হয়তো একটু শীত-শীত করবে। এই শীতকে তো শীত বলেই মনে হচ্ছে না!''

পাগল আর কাকে বলে! এই শীতেও লোকটা নাকি শীত টের পাচ্ছে না! গজপতিবাবুর মনটা বড্ড নরম, তিনি বললেন, ''তোমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে তোমাকে আমি আমার একটা পুরনো পুলওভার দিতে পারি।''

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, ''না বাবু, ওই সব জিনিস গায়ে চাপালে আমার ফোস্কা পড়ে যাবে!''

''তুমি খুব অদ্ভুত লোক বাপু! এই সাতসকালে কী সব ছাইভস্ম জিনিস ফিরি করতে বেরিয়ে পড়েছ! তার ওপর গায়ে একটা গরম জামা অবধি নেই!''

লোকটার কাঁধে একটা লাল রঙের ময়লা গামছা ঝুলছিল, সেটা টেনে নামিয়ে মুখটা মুছে বলে, ''আজ কিছু নেবেন না বাবু? একটা টর্চবাতি আছে, দিয়ে যাই?''

''না বাপু, তুমি সেই যে একটা হুইস্‌ল আমাকে গছিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে, সেটা আমি আমার নাতিকে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটাতে তো কোনও শব্দই হয় না!''

লোকটা মাথা চুলকে একটু লজ্জার হাসি হেসে বলে, ''আমারই ভুল, আপনাকে বলা হয়নি, ওটা আসলে শব্দের হুইস্‌ল নয়। ওটা গন্ধের হুইস্‌ল। ওটা বাজালে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোয় আর বাড়িতে মশা-মাছি থাকে না।''

গজপতি বিজ্ঞানী হলেও লোকের যে কোনও কথা চট করে বিশ্বাস করে ফেলার বদ অভ্যাস তাঁর আছে। অবাক হয়ে বলেন, ''বলো কী হে! এ রকম হুইস্‌লও পাওয়া যায় নাকি!''

''আজ্ঞে দুনিয়ায় কত আজব জিনিস আছে বাবু, তার কি কোনও লেখাজোখা আছে!''

গজপতি একটু ভাবিত হলেন। তাঁর মনে পড়ল, কয়েক দিন আগে তাঁর গিন্নি বলছিলেন বটে, বাড়িতে একটা ধূপকাঠির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কোথাও কোনও ধূপকাঠির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা হলে কি সেটা ওই হুইস্‌লেরই গন্ধ? কে জানে বাবা, হতেও পারে। তবে মশা-মাছির ব্যাপারটা তাঁর জানা নেই। হলেও হতে পারে। আসলে গজপতি আজগুবিতে বিশ্বাস করতে ভালবাসেন। আমতা-আমতা করে বললেন, ''ভেবেছিলাম হুইস্‌লটা তোমাকে ফেরত দেব। তা হলে আরও কয়েকটা দিন দেখি। তুমি অবশ্য দাম এখনও নাওনি।''

লোকটা ভারী আহ্লাদের হাসি হেসে বলে, ''দাম কি আর পালিয়ে যাচ্ছে বাবু? দেবেন যখন খুশি। আজ বরং টর্চবাতিটা রেখে দিন।''

''না হে বাপু, আমার তো টর্চ আছে।''

''এটা সেই টর্চ নয় বাবু, এ অন্য জিনিস!''

''কী রকম হে?''

লোকটা ভারী লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলল, ''এটা আলো জ্বালবার টর্চ নয় বাবু।''

''তা হলে কি টর্চ থেকে অন্ধকার বেরোয়?''

খুব যেন মজার কথা বলা হয়েছে এমন ভাবে হি হি করে হাসল লোকটা, তার পর মাথা নাড়া দিয়ে বলল, ''আজ্ঞে, তা বলতে পারি না। তবে শুনেছি এই টর্চ থেকে একটা রশ্মি বেরোয়। তাতে অনেক কাজ হওয়ার কথা।''

'''রে গান' নাকি হে বাপু? কিন্তু সে জিনিস তো তোমার কাছে থাকার কথা নয়!''

''আমি কি আর সায়েন্স জানি? নানা জায়গা থেকে নানা জিনিস কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনি, কোনটা কী কাজে লেগে যায় তা কে বলতে পারে! তবে মনে হয় টর্চটা নিলে আপনি ঠকবেন না।''

গজপতি মাথা নেড়ে বলেন, ''না হে বাপু, রে জিনিসটা বিপজ্জনক, শেষে কী থেকে কী হয়ে যায় কে বলতে পারে!''

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলে, ''তা অবিশ্যি ঠিক। রশ্মি বা বিকিরণ থেকে হুঁশিয়ার থাকাই ভাল। তবে কিনা আপনার জবা গাছটায় এক বার পরীক্ষা করে দেখলেও পারতেন। খানিকটা বিকিরণ ঢুকিয়ে দিলে ফুল ফুটতেও পারে তো! কী বলেন?''

গজপতি বেজায় অবাক হয়ে বলেন, ''তুমি আমার জবা গাছটার কথা জানলে কী করে হে!''

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, ''গত বিষ্যুৎবারে আপনিই যেন দুঃখ করে বলছিলেন, 'ওহে কালীচরণ, এত মেহনত বুঝি বৃথাই গেল হে, আমার জবা গাছটায় আর বুঝি কুঁড়িই এল না!'''

গজপতি তাজ্জব। তিনি কিছু ক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, ''এ সব কথা আমি তোমাকে কবে বললুম বলো তো! আর আমি তো জানতামই না যে, তোমার নাম কালীচরণ!''

লোকটা ঘ্যাঁসঘ্যাঁস করে মাথা চুলকে কুণ্ঠিত গলায় বলে, ''তা হলে বোধ হয় আমার ভুলই হয়েছে বাবু। মনে হচ্ছে সেই লোক বোধ হয় আপনি নন। কী জানি, বোধ হয় কুমোরপাড়ার নন্দবাবুই হবেন। বরং তাকেই দেব'খন জিনিসটা।''

কুমোরপাড়ার নন্দবাবুকে খুব চেনেন গজপতি। লোকটা কিপটের হদ্দ, দুর্মুখ এবং রগচটা। নন্দবাবুর নাম শুনেই গজপতির পিত্তি জ্বলে গেল। তিনি বেশ জোরালো গলায় বললেন, ''না-না, ওই টর্চ আমিই নেব হে! তা দামটা কত যেন!''

''আজ্ঞে, দাম তো অনেক, পঞ্চাশ টাকা! তবে আপনাকে অত দিতে হবে না, পঁচিশটা টাকা ফেলে দিলেই হবে। তাড়াহুড়ো নেই, মাসপয়লা আপনি যখন পেনশন পাবেন, তখন দিলেই চলবে।''

লোকটা ঠেলাগাড়ি থেকে একটা কালো রঙের টর্চ বের করে গজপতির হাতে দিল। টর্চটা হাতে নিয়ে গজপতি দেখলেন টর্চটা বেশ ভারী। সুইচ টিপে দেখলেন, কোনও আলো জ্বলল না বটে, তবে একটু যেন গরম হল। হয়তো কোনও কাজই করবে না! না করুক, খুব বেশি ঠকাও তো হচ্ছে না! সত্যিকারের কোনও রে গান হলে তার দাম অনেক বেশি হওয়ার কথা! আর কাজ না হলে ফেরত তো দেওয়াই যাবে। কালীচরণের এই একটা গুণ আছে, জিনিস ফেরত দিলে নির্বিকার মুখে নিয়ে নেয়। গছানোর জন্য ঝোলাঝুলি করে না।''

কালীচরণ ''আ পান, আ পান'' বলে হাঁক মারতে-মারতে অনেক

দূর চলে যাওয়ার পরও গজপতির থম-ধরা ভাবটা যাচ্ছিল না। লোকটা জবা গাছটার কথা জানল কী করে? শুধু তাই নয়, জবা গাছটায় ফুল আসছে না বলে গজপতির টেনশনের কথাটাও জানে! অন্তর্যামী বলে একটা কথা আছে, সেটা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু লোকটা তো দেখা যাচ্ছে ওরকমই কিছু! নাহ, লোকটা তো বেশ ভাবিয়ে তুলল তাকে! হাতের টর্চটার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কিছু ক্ষণ চেয়ে রইলেন গজপতি। তার পর জবা গাছটার কাছে গিয়ে গাছটা তাক করে টর্চটার সুইচ টিপে ধরে রইলেন কিছু ক্ষণ। কিছুই হল না অবিশ্যি। লোকটার আজগুবি এবং অবিজ্ঞানসম্মত কথায় নির্ভর করছেন বলে তাঁর নিজের জন্য একটু লজ্জাও হল।

একটু বেলায় যখন ডাইনিং টেবিলে সকালের জলখাবার খেতে বসেছেন, তখন মনের ভুলে টর্চটা টেবিলের উপর উপুড় করে খাড়া ভাবে রেখেছিলেন। গিন্নি দেখলে যে রাগ করবেন, সেটা খেয়াল ছিল না। তাঁর গিন্নি সুচরিতা দেবী অত্যন্ত মিতব্যয়ী মানুষ, বাজে খরচ একদম বরদাস্ত করেন না। টর্চটা চোখে পড়তেই এমন চেঁচালেন যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে, "বলি ওই কেলেকুষ্টি টর্চটা কোথা থেকে এল শুনি! নিশ্চয়ই ওই হাড়হাভাতে ফেরিওয়ালাটা আগড়মবাগড়ম বুঝিয়ে তোমাকে গছিয়ে দিয়ে গেছে! সক্কালবেলায় ওই হতভাগাটার হাঁকডাক শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম, তোমাকে আহাম্মক পেয়ে নিশ্চয়ই কোনও অচল মাল গছিয়ে দিয়ে যাবে! এখন দেখছি ঠিক তাই! বলি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আর কবে হবে বলো তো! বাড়িতে দু'-দুটো টর্চ থাকতে আবার একটা টর্চ কোন আক্কেলে কিনতে গেলে!"

গিন্নির সামনে তিনি বরাবরই ভারী অসহায় হয়ে পড়েন। কথাগুলোর উপযুক্ত জবাবও আছে বটে, কিন্তু সময়মতো সেগুলো তাঁর মনেই পড়ে না। মাখনমাখানো পাউরুটির টোস্ট তাঁর মুখে নারকেলের ছোবড়ার মতো বিস্বাদ লাগছে, পাকা মর্তমান কলাকে মনে হচ্ছে পেঁপেসেদ্ধ। তবে ঝড়ের মুখে কুটো গাছের মতো উড়ে যেতে-যেতেও তিনি শুধু বলতে পারলেন, "আহা, ওটা আসলে টর্চ নয়।"

"তবে ওটা কী? অ্যাটম বোমা না ডুবোজাহাজ? তোমাকে কি বুঝিয়ে গছিয়ে দিয়ে গেছে শুনি! তোমার মতো বোকা লোক কোন বুদ্ধিতে যে ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করত তা বুঝি না বাবা! ওটা আমি আজই যদি আঁস্তাকুড়ে না ফেলেছি তবে আমার নামই সুচরিতা নয়। বলি কত টাকা গচ্চা দিয়েছ?"

"টাকা দিইনি এখনও। ফেরত দিয়ে দেওয়া যাবে।"

সুচরিতা অত্যন্ত কঠিন গলায় বললেন, "তাই যেন দেওয়া হয়। ফেরত নিতে গাঁইগুঁই করলে আমাকে ডেকো, আমি হতভাগাটার বিষ ঝেড়ে দেব।"

গজপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টর্চটা হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন।

হুইস্‌লটায় শব্দ হয় না বলে তাঁর নাতি সেটা তাঁকে ফেরত দিয়ে গেছে। নিজের ঘরে এসে গজপতি হুইস্‌লটাকে তাঁর টেবিলে অনাদরে পড়ে থাকতে দেখলেন। চার দিকে তাকিয়ে দেখলেন কেউ দেখছে কিনা। তার পর হুইস্‌লটা মুখে নিয়ে একটা হালকা করে ফুঁ দিয়েই তাড়াতাড়ি রেখে দিলেন। তার পর বাতাস শুঁকে দেখলেন, একটা হালকা সুগন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে! তবে বলা যায় না, সেটা মনের ভুলও হতে পারে। নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি বা অনুভূতি কিংবা বিচার-বিশ্লেষণের উপর তাঁর খুব একটা বিশ্বাস নেই। এবার তিনি ঘরের মধ্যে মশা-মাছি খুঁজে দেখতে লাগলেন। কোনও মশা-মাছি তাঁর চোখে পড়ল না। কিন্তু সেটাও তাঁর দেখার দোষ হতে পারে। মশা-মাছি যে সব সময়ে চোখের সামনে নাচানাচি করবে এমন তো কথা নয়! মশামাছিদেরও তো নানা বিষয়কর্ম থাকতেই পারে।

টর্চটা টেবিলের ড্রয়ারে সাবধানে রেখে দিলেন গজপতি। এ কথা সত্যি যে বিজ্ঞানের মানুষ হয়েও এখনও তাঁর নানা কুসংস্কার আছে, নইলে তিনি কালীচরণের মতো একটা বিটকেল লোককে ফস করে এতটা বিশ্বাস করে ফেললেন কী করে?

কিন্তু পর দিন সকালে যা ঘটল তাতে তাজ্জব না হয়ে উপায় নেই। রোজকার মতোই সকাল সাড়ে ছ'টায় বাঁদুরে টুপি, কমফর্টার, পুলওভার আর মোজায় নিজেকে ঢেকেঢুকে তিনি বাগানের পরিচর্যায় নেমেছিলেন। জবা গাছটার কাছে আচমকা এসে হাঁ হয়ে গেলেন তিনি এবং বেশ কিছু ক্ষণ হাঁ করেই রইলেন। হাঁ হওয়ারই কথা কিনা! কাল পর্যন্ত জবা গাছটায় একটাও কুঁড়ি ছিল না, কিন্তু আজ সেই গাছে তিন-তিনটে কালো— না, ঠিক কালো নয়, ঘন কালচে নীল রঙের জবা ফুল ফুটে আছে! এটা কী করে সম্ভব! বিস্ময়ে তাঁর মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার দশা! কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলেন। তা হলে কি টর্চেরই কেরামতি! তবে কি কালীচরণ জালি জিনিস গছিয়ে যায়নি? গিন্নিকে ডেকে দেখাবেন কি? না, সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না। আহাম্মকি হবে। কিন্তু তিনি কি ঠিক দেখছেন? চোখের ভুল নয় তো!

উত্তেজনায় বুক ঢিপঢিপ করছে বলে তিনি বারান্দার সিঁড়িতে বসে একটু দম নিলেন ভাল করে। এই বয়সে যে কোনও রকম উত্তেজনাই বিপজ্জনক। বসে-বসেই অনুলোম, বিলোম, আর কপালভাতি করে নিজেকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর এক বার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, এই কাণ্ড ওই টর্চের জন্যই হয়েছে। আবার দুর্বল মন ফিসফিস করে বলছে, এটা কাকতালীয়ও তো হতে পারে হে! তুমি না এক জন যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী! এই রকম কোনও টর্চবাতি আবিষ্কার হয়ে থাকলে তা কি আর তোমার অজানা থাকত!

এই দোটানাই তাঁর নিয়তি। তাঁর এক হাত ধরে 'হেঁইয়ো মারি' বলে টান লাগাচ্ছে বিশ্বাস, আর অন্য হাত ধরে 'জোর লাগাকে হ্যাঁইসা' বলে টান মারছে যুক্তি ও বিজ্ঞান। তাই এই সকালবেলায় তাঁর দমসম অবস্থা। এমন সময়ে কে যেন খুব কাছ থেকে বলে উঠল, "মেসোমশাইয়ের কি শরীরটা খারাপ?"

গজপতি আঁতকে উঠে বললেন, "কে? কে আপনি?"

"আমি গোপাল। বড্ড লাতন হয়ে পড়েছেন যে!"

গোপাল তাঁদের বাড়ির কাজের লোক, হালে কাজে লেগেছে। ছোকরা খুবই চালাক। গজপতি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেননি, গোপাল কার পক্ষে, তাঁর না তাঁর গিন্নির!

একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ছেড়ে গজপতি বললেন, "অ, গোপাল! তা বাপু রে, আমি ভুল দেখেছি কি না তা বুঝতে পারছি না, তুই একটু দ্যাখ তো, ওই জবা গাছটায় কি কোনও ফুল ফুটেছে? নাকি আমারই চোখের ভুল!"

জবা গাছটার কথা বাড়ির সবাই জানে। গোপাল গিয়ে জবা গাছটা খুব মন দিয়ে নিরীক্ষণ করে বলে, "না মেসোমশাই, ভুল দেখবেন কেন? এ তো ফুল বলেই মনে হচ্ছে! তিন-তিনটে কেলেকুষ্টি অলক্ষুনে জবাফুল! এরকম কুচ্ছিত জবাফুল জন্মে দেখিনি মশাই! এই ফুল দিয়ে মা কালীর পুজো করলে ঘোর অকল্যাণ হবে যে!"

গজপতি ফের আঁতকে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী সুচরিতা দেবী বেজায় কালীভক্ত, রোজই মা কালীর পটে জবা ফুল দিয়ে পুজোটুজো করেন। গজপতি বাঘা গলায় বললেন, "খবরদার! ওই ফুল পুজোর জন্য নয়! ফুল ছিঁড়লে কিন্তু কেটে ফেলব!"

গোপাল খুব অমায়িক গলায় বলে, "না মেসোমশাই, নিশ্চিন্তে থাকুন, এই ফুল কেউ পুজোর জন্য তুলবে না। শুধু কুচ্ছিতই নয়, কালো ফুলগুলো থেকে কেমন যেন পচা গোবরের গন্ধও আসছে। এই ফুল দিয়ে কি মা কালীর পুজো হয়? হলে দেশে মহামারি লাগবে, আকাল আসবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এমনকি, ভূমিকম্পও হতে পারে। মা কালী যা রাগী মানুষ, অনাসৃষ্টি একদম সইতে পারেন না।"

গজপতি একটা সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন, "ওই ফুলের মর্ম বুঝবার মতো বিদ্যে তোর পেটে নেই। এখন নিজের কাজে যা তো বাপু!"

"তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু মেসোমশাই, একটা কথা তো মানবেন।"

"কী কথা?"

"জবা গাছে লাল জবা ফুল ফোটাই ভগবানের নিয়ম, আপনি

খোঁচাখুঁচি করে ওই কেলেকুষ্টি ফুলগুলো আমদানি করে কি ভাল করলেন? খোদার ওপর খোদকারি করা কি উচিত? না, ব্যাপারটা মাসিমাকে বলতেই হচ্ছে। তিনি শুনলে বোধ হয় গাছটাই শেকড় সুদ্ধু উপড়ে ফেলবেন।''

কথাটা কানে যেতেই গজপতি বেঁউরে উঠে বললেন, ''ওরে, ও কাজও করিসনি, আমার এত সাধনা, এত চেষ্টা, এত তিতিক্ষা, এত গবেষণা সব যে বিফলে যাবে!''

গোপাল একটু গা-ঝাড়া দিয়ে নির্বিকার গলায় বলে, ''তা কী করব বলুন, মাসিমাকে না বললে যে নেমকহারামি হবে! মাসি বলে ডাকলেও তিনি আমার মায়ের মতো। মাসিমা আমাকে চার দিকে নজর রাখতে বলেছেন। বিশেষ করে বলেছেন, আপনি কী করেন না করেন তা যেন খেয়াল রাখি।''

গজপতি ভারী অমায়িক হয়ে গদগদ গলায় বললেন, ''ওরে, তোর মাসিমা তো আর সায়েন্স জানেন না, এই ফুলের মর্ম তো তাঁর বুঝবার কথা নয়!''

''তা হলে সেই কথাটাই তাঁকে গিয়ে বলি! মাসিমা, আপনি তো আর সায়েন্স জানেন না, লেখাপড়া তো আর করেননি, কী করেই বা বুঝবেন! তাই মেসোমশাই বলছিলেন...''

''ওরে বাপু, তুই তো বেজায় ঘড়েল লোক দেখছি! তা তোকে বরং কুড়িটা টাকা দিচ্ছি, খবরদার, জবাফুলের কথা তোর মাসিমার সামনে উচ্চারণও করবি না।''

গোপাল মাথা চুলকে বলে, ''কুড়ি টাকায় আজকাল কী হয় বলুন! হরিপদর দোকানে একটা ফাউল কাটলেটের দামই পঁচিশ টাকা।''

''ঠিক আছে, না হয় তিরিশ টাকাই পাবি।''

''সে না হয় আজকের দিনটার জন্য হল, কিন্তু কালকের জন্য কি ব্যবস্থা করছেন?''

গজপতি মহা মুশকিলে পড়ে বললেন, ''তোকে যা ভেবেছিলাম, তুই তো দেখছি তার চেয়েও বেশি ঘড়েল!''

''মেসোমশাই, টাকা-পয়সার কথা তো আপনিই তুললেন, আমি তো টাকার ট-ও উচ্চারণও করিনি! আর সত্যি কথা বলতে কী, ঘুষ দেওয়াটা কিন্তু ঘুষ নেওয়ার মতোই অন্যায়।''

গজপতি টালমালু হয়ে গোপালের দিকে চেয়ে বললেন, ''একে কী বলে জানিস? একে বলে ব্ল্যাকমেল। আর ব্ল্যাকমেল করলে পুলিশে ধরে।''

গোপাল কাঁচুমাচু হয়ে বলে, ''তা হলে ঝুটঝামেলার দরকার নেই মেসোমশাই, আমি বরং মাসিমার কাছে কথাটা নিবেদন করে আসি। আপনি যে টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন সে কথাটাও বলব কি?''

গজপতি আঁতকে উঠে বললেন, ''দাঁড়া বাপু, দাঁড়া! আমি কি বলেছি যে তোকে সত্যি-সত্যিই পুলিশে দেব?''

''তাই তো বললেন মেসোমশাই!''

''ওরে না রে, না! ঠাট্টা করে বলছিলাম আর কী। সব কথা অত সিরিয়াসলি নিলে কি হয়? তা হলে ওই কথাই রইল।''

''যে আজ্ঞে। দিনপ্রতি তিরিশ টাকা।''

গোপাল বিদেয় হলে গজপতি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন, চার দিকে এত বিপদ, এত বাধা, এত বিরুদ্ধতা যে, জীবনটার উপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। তাঁর উপর নজর রাখার জন্য যে গোপালকে লাগানো হয়েছে এটাই তো তাঁর জানা ছিল না! কী সব্বোনেশে ব্যাপার! নিজের বাড়িতে যে আপন মনে ইচ্ছে মতো বসবাস করবেন, তারও উপায় রইল না! মুশকিল হল, তাঁর নানা রকম মুদ্রাদোষ আছে, যেমন তিনি ভাববার সময় হাঁ করে ভাবেন, বিড়বিড় করে আপন মনে কথা কন, নানা অঙ্গভঙ্গি করে হরিধনের সঙ্গে ঝগড়াও করেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই হরিধন লোকটা কে! কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব গজপতির জানা নেই। কারণ হরিধন বলে গজপতির জীবনে বাস্তবে কেউ নেই বটে, কিন্তু নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক এবং ঝগড়া করার জন্য তিনি হরিধন নামে এক জন মানুষকে মাঝে-মাঝে মনে-মনে খাড়া করে নেন। হরিধন এক জন রোখাচোখা, সবজান্তা, জাঁদরেল লোক। সে প্রায়ই গজপতির নানা ভুল ধরতে আসে এবং দু'জনে ধুন্ধুমার ঝগড়া লেগে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত হরিধনকে রোজই গজপতির কাছে হার স্বীকার করতে হয়। আর এই ঝগড়াটা গজপতির কাছে খুবই উপভোগ্য ব্যাপার। কারণ বাস্তব জীবনে তিনি প্রায় কারও সঙ্গেই ঝগড়া বা বিতর্কে এঁটে উঠতে পারেন না, লেজেগোবরে হয়ে হেরে যান। তাই নিরাকার হরিধনকে হারিয়ে তার শোধ তোলেন। এখন এসব তো গোপালের মারফত প্রকাশ হয়ে পড়বে! সুচরিতা দেবী এমনিতেই সন্দেহ করেন যে, গজপতির মাথার দোষ আছে, এখন তো সেই ধারণায় সিলমোহর পড়ে যাবে!

তা হলে কি গোপালের টাকাটা আরও একটু বাড়িয়ে দেবেন, যাতে তাঁর উপর তেমন কড়া নজর না রাখে! তাতে খরচাটা অনেক বেড়ে যাবে! আর গোপাল যা ঘড়েল, সুযোগ বুঝে দর বাড়িয়ে না ফেলে! নাহ, বেঁচে থাকাটায় আর কোনও সুখ নেই। গজপতি ঘনঘন কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

গজপতির ধারণা, পৃথিবীতে যে কয়েকটা নরক আছে তার মধ্যে একটা হল বাজার। বাজারের মতো খারাপ জায়গা কমই আছে। বাজারে যাওয়ার নামেই গজপতির গায়ে জ্বর আসে। ভালমানুষ পেয়ে দোকানিরা তাঁকে চিলুবিলু করে ছেঁকে ধরে। হাত ধরে টানাটানি, হাঁকাহাঁকি, সাধাসাধি, তার পর খুব আদর করে, স্নেহের সঙ্গে পোকা বেগুন, পাকা ঢেঁড়স, বুড়ো লাউ, পচা মাছ গছিয়েই ছাড়ে। এবং প্রায়ই শোনা যায় যে, পাশের বাড়ির মন্মথবাবু অনেক সরেস জিনিস তাঁর চেয়ে প্রায় অর্ধেক দামে কিনে এনেছেন। ফলে বাজার করে আসার পর অন্তত ঘণ্টাখানেক তাঁকে সুচরিতা দেবীর কটুকাটব্য শুনতে হয়। শুনে শুনে তাঁর আত্মধিক্কার আসে, কান্না পায় এবং কোনও-কোনও দিন আত্মহত্যা করার ইচ্ছেও জাগে।

তবে ইদানীং সুচরিতা দেবীর হুকুমে তাঁর সঙ্গে বাজার করতে গোপালকেও লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুচরিতা দেবীর ধারণা, গোপাল গজপতির চেয়ে অনেক চালাকচতুর, চারচোখো, হিসেবি, দরাদরি করতে পারে এবং ভাল-মন্দ চেনে। গোপালের এসব গুণ যে নির্যস আছে তাতে গজপতির সন্দেহ নেই। এই তো সেদিন ফুলকপি কেনার সময় দুটো ফুলকপির দাম পঞ্চাশ টাকা থেকে লহমায় তিরিশ টাকায় নামিয়ে আনল গোপাল। আশ্চর্য তার বাকপটুত্ব, বিস্ময়কর তার মানুষকে পটিয়ে ফেলার ক্ষমতা, গভীর তার মনুষ্যচরিত্র স্টাডি করার অভিজ্ঞতা। গজপতি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন, আর তাঁর এই সব গুণ নেই বলে মনে-মনে আফসোস করছিলেন। দুনিয়ায় কত চালাকচতুর মানুষ আছে ভেবে আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল গজপতির। তাই রুমালে চোখ মুছতে-মুছতে দাম দেওয়ার জন্য একশো টাকার একখানা নোট বের করে দিলেন। গোপাল দাম মিটিয়ে বিনীত ভাবে তাঁকে কুড়িটা টাকা ফেরত দিল। তিনি অবাক হয়ে বললেন, ''তোকে একশো টাকার নোট দিলুম যে! হিসেব মতো তোর তো সত্তর টাকা ফেরত দেওয়ার কথা!''

গোপাল আকাশ থেকে পড়ে বলল, ''সে কী মেসোমশাই, আপনার কি ভীমরতি হল? আপনি তো জলজ্যান্ত একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়েছেন! বিশ্বাস না হয় দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।''

গজপতির মুশকিল হল, তাঁর আত্মবিশ্বাস নেই। তাঁর মাথা বলছে, তিনি একশো টাকার নোটই গোপালকে দিয়েছেন, আবার বিবেক বলছে, কী জানি বাবা, আমারই হয়তো মনের ভুল! বিবেক এবং বুদ্ধির এই টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যে পড়ে তাঁর মাথা গুলিয়ে গেল। সুতরাং হার স্বীকার না করে উপায় কী! কিন্তু এভাবেই মাছের বাজারে পাঁচশো টাকার নোট, রুমাল থেকে বেড়াল হয়ে যাওয়ার মতো, একশো টাকার নোটে পরিণত হল। কড়াইশুঁটি কেনার সময় পঞ্চাশ টাকার নোট জাদুমন্ত্রবলে চোখের পলক না ফেলতেই ফস করে হয়ে গেল দশ টাকা। লঙ্কা কেনার সময়

দশ টাকার কয়েন হয়ে গেল পাঁচ টাকার মুদ্রা। বাড়িতে এলে অবশ্য শোরগোল পড়ে গেল সরেস বাজার হয়েছে বলে। সুচরিতা দেবী তো ধন্যি-ধন্যি করতে লাগলেন, তার পর তাঁকে লক্ষ করে আঁশটে মুখে বললেন, ''গোপালকে দেখে তোমার শেখা উচিত! দেখো কী টাটকা সব সব্জি, আর কী ভাল তরতাজা মাছ, আর দামেও কত সস্তা! তুমি তো বাজারে যাও টাকার হরির লুট করতে!''

কিন্তু গজপতির পকেট থেকে যে ডবল টাকা খসে গেছে সেটা সুচরিতা দেবীকে যে বলবেন, তা তাঁর মুরোদে কুলোল না।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত একই ব্যবস্থা চলছে, গজপতিকে গোপালের সঙ্গেই বাজারে যেতে হয়, গোপালের হাতসাফাই সয়ে নিতে হয় এবং লোকসান না মেনে নিয়ে উপায়ও থাকে না। না, জীবনে সুখ বলে আর কিছুই নেই গজপতির। কারও সঙ্গেই তিনি এঁটে উঠতে পারছেন না। এখন বন্ধু বলতে তাঁর বাগানের গাছপালা।

ভোর ছ'টায় উঠে গজপতি দেখলেন আজ ঘন কুয়াশায় বড্ড অন্ধকার হয়ে আছে চার দিক। আজ তাঁর কলমের গোলাপ গাছের উপর এক্সপেরিমেন্ট করার কথা। কালীচরণের দেওয়া টর্চটা বাগিয়ে তিনি সন্তর্পণে বেরোলেন। গায়ে যথারীতি মোটা পুলওভার, মাথায় বাঁদুরে টুপি, গলায় কমফর্টার, পায়ে উলের মোজা এবং জুতো। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ঘন কুয়াশায় কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। জন্মে এমন ঘন আর নিরেট কুয়াশা দেখেননি তিনি। অভ্যাসবশে এক বার হাতের টর্চটার সুইচ টিপলেন। কোনও আলো হল না, কিন্তু খচ করে হঠাৎ কুয়াশার গায়ে যেন একটা ছ্যাঁদা হয়ে গেল। লম্বা আর সরু একটা সুড়ঙ্গ যেন। গজপতি প্রথমটায় চমকে উঠলেন, তার পর ভারী অবাক হয়ে সুড়ঙ্গটা দেখতে লাগলেন! তা হলে কি টর্চটা কুয়াশা কাটিয়ে দিতে পারে? তিনি টর্চটা ফের জ্বেলে এ-দিক ও-দিক ফেলতেই কুয়াশায় নানা রকম নকশা তৈরি হতে লাগল। যেন টর্চের রশ্মি যেখানে-যেখানে পড়ছে সেই সব জায়গার কুয়াশা কেউ ইরেজ়ার দিয়ে মুছে দিচ্ছে। গজপতির বুক ফের ধড়ফড় করতে লাগল, মাথা ঝিমঝিম, হাত-পায়ে যেন বশ নেই! কিছু ক্ষণ বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর তাঁর ভিতরকার বিজ্ঞানী যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, 'যা দেখছ তা বিশ্বাস কোরো না হে! এগুলো কিছুই কিন্তু ঘটছে না। তুমি স্বপ্ন দেখছ।'

ভিতরের গজপতির কথায় বাইরের গজপতি একটু সাহস পেয়ে অন্য দিকে টর্চের মুখ ঘুরিয়ে কুয়াশার গায়ে একটা ইকুয়েশন কষলেন। ইকুয়েশনটা দিব্যি ভেসে রইল। তার পর বাংলায় নিজের নাম লিখলেন, 'গজপতি', সেটাও দিব্যি কুয়াশার গায়ে সেঁটে রইল। এবারে একটু কাটাকুটিও খেলে নিলেন, কোনও অসুবিধে হল না। কাণ্ড দেখে গজপতি যেমন হতবাক, তেমনি হতবুদ্ধি! তিনি যত দূর জানেন, কুয়াশা কাটিয়ে দিতে পারে এমন যন্ত্র এখনও আবিষ্কার হয়নি। তা হলে এই যন্ত্রটা এল কোথা থেকে? তবে কি কালীচরণ এক জন ছদ্মবেশী বিজ্ঞানী! তা-ই বা হয় কী করে? গজপতি এবার পুব দিকে তাক করে টর্চটা টিপে একটু ধরে রইলেন। তার পর যা কাণ্ড হল কহতব্য নয়। পুব দিগন্ত থেকে একটা টানেলের মতো সুড়ঙ্গপথ বেয়ে সোনালি রোদ এসে পড়ল তাঁর বাগানে। অথচ বাকি জায়গাটায় জমাট কুয়াশা আর অন্ধকার। রোদটাকে মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারে একটা সার্চলাইটের আলো এসে পড়েছে।

সবিস্ময়ে টর্চটার দিকে চেয়ে রইলেন গজপতি। এ তো সাংঘাতিক জিনিস! তিনি স্বপ্ন দেখছেন কি না তা হলফ করে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু তিনি বোধ হয় আলাদিনের পিদিমের মতোই কিছু একটা পেয়ে গেছেন। লোক জানাজানি হলে ঘোর বিপদ। তিনি টক করে টর্চটা পুলওভারের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তার পর তাড়াতাড়ি উঠে কুয়াশার গায়ে যেসব আঁকিবুকি কেটেছিলেন সেগুলো হাত দিয়ে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। কেউ দেখে ফেললে সন্দিহান হয়ে উঠতে কত ক্ষণ? তা হলে তো সর্বনাশ!

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। হঠাৎ কে যেন খুব কাছ থেকে, প্রায় তাঁর কানে-কানে বলে উঠল, ''মেসোমশাইয়ের কি মৃগী রোগ আছে নাকি! নাকি সিরাজদ্দৌলার ভূমিকা প্লে করছেন! অমন পাগলের মতো হাত পা ছুড়ছেন কেন?''

গজপতি ফাঁপরে পড়ে বললেন, ''ওরে না না, এই মশা তাড়াচ্ছি আর কী!''

গোপাল নরম গলাতেই বলে, ''গায়ে যা গন্ধমাদন চাপিয়েছেন তাতে মশা কী করে হুল দেবে বলুন তো! আর এ বাড়িতে তেমন মশা-মাছি আজকাল কোথায়! কয়েক দিন হল কেউ তো মশারিই টাঙিয়ে শুচ্ছে না। মাসিমাও সেদিন দুঃখ করে বলছিলেন, 'গেরস্থবাড়িতে মশা-মাছি থাকাটাই রেওয়াজ, কিন্তু কী অলক্ষুনে কাণ্ড বাপু, আজকাল একটাও মশা বা মাছি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!'''

গজপতি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠে মনের ভুলে বলে ফেললেন, ''হুইস্‌ল! হুইস্‌ল! এ হল হুইস্‌লের কাণ্ড!''

গোপাল হাঁ করে কিছু ক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে বলে, ''মেসোমশাইয়ের কি মাথার দোষ হল, নাকি বায়ু চড়েছে! হঠাৎ হুইস্‌লের কথা আসছে কোত্থেকে!''

গজপতি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ''না রে, ওই একটা পুরনো কথা মনে পড়ল কিনা!''

''কী পুরনো কথা, শুনি।''

গজপতি মহা ফাঁপরে পড়লেন। বানিয়েছানিয়ে যে একটা গপ্পো ফাঁদবেন তেমন এলেমও তাঁর নেই। আমতা-আমতা করে বললেন, ''আমার ঘোতনমামার একটা হুইস্‌ল ছিল, সেটা বাজিয়ে তিনি মশা-মাছি তাড়াতেন, সেই কথাটা মনে পড়ে গেল কিনা!''

''আপনার ঘোতনমামার কি মাথার দোষ ছিল?''

''ও কথা কেন বলছিস?''

''মনে হয় আপনি আপনার মাথার গন্ডগোলটা নির্যস ওই ঘোতনমামার কাছ থেকেই পেয়েছেন। নরানাং মাতুলক্রম।''

গজপতি অপমানটা গায়ে মাখলেন না। হুইস্‌লের কথাটা যে ফাঁস হয়নি এটাই যথেষ্ট। তার বদলে একটু অপমান তো আর বেশি কিছু নয়! তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। তা ছাড়া তাঁর নিজেরও ধারণা যে, তাঁর মাথায় একটু গন্ডগোল আছে।

সন্ধেবেলা প্রায় রোজই গজপতি সুরেশ নন্দীর বাড়িতে একটু দাবা খেলতে যান। দাবা যে তিনি ভাল খেলেন তা মোটেই নয়। গভীর অন্যমনস্কতার দরুন প্রায়ই ভুল চাল দিয়ে ফেলেন এবং গোহারা হারেন। আজও সুরেশবাবুর একটা বোড়ে ঘোড়া দিয়ে খেয়ে ফেলায় তাঁর মন্ত্রী সুরেশের গজের মুখে পড়ে গেছে। মন্ত্রী বাঁচাতে গেলে তাঁর একটা ঘোড়া বেমালুম মারা পড়ে। গজপতি বেরোনোর রাস্তা পাচ্ছেন না।

সুরেশবাবু তাচ্ছিল্যের গলায় বলেন, ''অত ভাবছ কী? ওই ঘোড়াটা তোমার গেছে বলেই ধরে নাও।''

কাঁচুমাচু হয়ে গজপতি বলেন, ''তোমার বোড়েটা পাকা ফলের মতো এমন টুসটুসে দেখাচ্ছিল যে আমি লোভ সামলাতে পারিনি!''

''লোভ দেখানোর জন্যেই তো চালটা দিয়েছিলাম হে! তুমি ফাঁদে পা দিলে কেন?''

গজপতি বুঝলেন, আর আশা নেই, চার-পাঁচ চালের মধ্যেই তিনি মাত হবেন। হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, ''দাবা আবার একটা খেলা! অকারণে মাথার ট্যাক্সেশন। তার চেয়ে বরং লুডো খেলা ভাল।''

সুরেশবাবু প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, লম্বা-চওড়া চেহারা, দারুণ ফুর্তিবাজ, প্রচণ্ড খাইয়ে মানুষ, আর খুব বুদ্ধিমান। তাঁর দিকে একটু তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থেকে বললেন, ''লুডো হল চান্স অ্যান্ড প্রবাবিলিটির খেলা, দান পড়লে ভাল নইলে ফক্কা। আর দাবা খেলতে বুদ্ধি লাগে, দূরদৃষ্টির দরকার হয়, ক্যালকুলেশন আর ইম্যাজিনেশন দুটোরই প্রয়োজন, যেগুলো তোমার নেই। আর একটা কথা...''

গজপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ''কী কথা?''

''আমার বিশ্বাস লুডোতেও তোমার মতো দিনকানা-রাতকানা

লোক একটা বাচ্চা মেয়ের কাছেও হেরে যাবে।''

গজপতি কথাটা শুনে খুবই অবাক হলেন। কারণ মাত্র দু'দিন আগে সত্যিই তিনি তাঁর নাতনি মিতুলের কাছে লুডোয় পর পর দু'দান হেরেছেন। আমতা-আমতা করে বললেন, ''তুমি কী করে জানলে!''

''সিম্পল ডিডাকশন হে গজপতি।''

গজপতি একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, ''আমি একটু অন্যমনস্ক লোক বলে একটুআধটু ভুলচুক হয়ে যায় ঠিকই, তা বলে আমি তো আর বোকা নই!''

''শুধু বোকাই নও, তোমার গিন্নির তো ধারণা, তুমি একটু পাগলও। নইলে একটা ফেরেববাজ ফেরিওয়ালা তোমাকে আবোলতাবোল জিনিস গছিয়ে দিয়ে যায়! শুনলুম তার কাছ থেকে তুমি নাকি একটা হুইস্‌ল কিনেছ যাতে কোনও শব্দ হয় না, আবার একটা টর্চও নাকি গছিয়ে গেছে যেটায় আলো জ্বলে না! তোমার গিন্নি আমার গিন্নির কাছে দুঃখ করে সব বলে গেছেন।''

গজপতি এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, ''দেখো সুরেশ, মানছি তুমি দাবাটা ভালই খেলো, হয়তো লুডোটাও তুমি খারাপ খেলবে না, কিন্তু তা বলে তুমি তো আর সবজান্তা নও!''

''এতে জানাজানির আছেটা কী? তোমাকে আহাম্মক পেয়ে লোকটা দুটো জালি জিনিস গছিয়ে গেছে, এই তো ব্যাপার! আমি লোকাল থানার ওসিকে বলে দিয়েছি, লোকটাকে দেখতে পেলেই যেন পাকড়াও করে লকআপে ভরে দেয়।''

''সর্বনাশ! করেছ কী! লোকটা আমাকে মোটেই ঠকায়নি! ওগুলো খুবই কাজের জিনিস।''

সুরেশ ব্যঙ্গের গলায় বলেন, ''আমরা যারা সাধারণ বুদ্ধির মানুষ তারা জানি যে হুইস্‌ল বাজালে শব্দ হয় আর টর্চ জ্বালালে আলো হয়। আর তাই যদি না হয় তা হলে ওগুলো কাজের জিনিস হল কী করে?''

''ও তুমি ঠিক বুঝবে না। অনেক ব্যাপার আছে।''

''কী ব্যাপার আছে বলো তো! তোমাকে কি আরও বড়সড় কোনও ধাপ্পা দিয়ে জিনিসগুলো গছিয়ে গেছে?''

গজপতি খুব আহ্লাদী একটা হাসি হেসে মাথা নেড়ে বলেন, ''আরে না না, একটু মিস্টিরিয়াস হলেও সে লোক খারাপ নয়।''

সুরেশ টান হয়ে বসে কঠিন স্বরে বলেন, ''মিস্টিরিয়াস! তা হলে তো ডেঞ্জারাস ব্যাপার। তুমি কোনও স্মাগলার বা টেররিস্টের পাল্লায় পড়োনি তো!''

গজপতি মাথা নেড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন, ''আরে না! তোমাদের পুলিশের লোকরা বড্ড সন্দেহবাতিক! কালীচরণ সেরকম মিস্টিরিয়াস নয়। তাকে মিস্টিরিয়াস কেন বলছি জানো?''

''কেন বলছ?''

''বলছি, কারণ এই বাঘা শীতেও সে একটা ফতুয়া পরে ঘুরে বেড়ায়, গায়ে গরম জামা দেয় না।''

''এদেশে অনেকের গরম জামা জোটে না বলে দেয় না, এতে মিস্টিরিয়াস কী আছে?''

''মিস্টিরিয়াস এই কারণে যে, আমি তাকে একটা পুলওভার দিতে চেয়েছিলাম, সে নেয়নি।''

সুরেশবাবু ভুরু কুঁচকে গজপতির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি কিছু চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছ কিংবা কথা ঘোরাচ্ছ! কিন্তু পেরে উঠছ না। তোমাকে বেশ নার্ভাসও দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা কী, তা খুলে বলবে! মনে রেখো আমি কিন্তু পুলিশের লোক, রিটায়ার করলেও পুলিশের ট্রেনিং তো আর যায়নি।''

গজপতির হঠাৎ বেশ হাঁসফাঁস লাগছিল। এই প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও তাঁর যেন একটু ঘাম হচ্ছে! কোনও পরিস্থিতিই তিনি ঠিক সামলে উঠতে পারেন না। সেই লেজেগোবরেই হতে হয়। একটু কপালভাতি বা অনুলোম বিলোম করতে পারলেও হত, কিন্তু পরিস্থিতি তার অনুকূল নয়। কী করবেন বুঝতে না পেরে তিনি গলাটা নামিয়ে খুব চাপা গলায় বললেন, ''একটা কথা বলবে? তুমি তো আমার পাশের বাড়িতেই থাকো। গত দু'দিন তুমি তোমার বাড়িতে কোনও মশা বা মাছি দেখতে পেয়েছ?''

সুরেশবাবু কিছু ক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, ''মশা-মাছি! হঠাৎ মশা-মাছির কথা কেন?''

''না, এই বলছিলাম আর কী। আশ্চর্যের বিষয় কী জানো, আমাদের বাড়িতে গত দু'-তিন দিন কোনও মশা-মাছি দেখা যাচ্ছে না।''

সুরেশবাবু গম্ভীর এবং চিন্তিত হয়ে গজপতির দিকে অনেক ক্ষণ চেয়ে রইলেন, তার পর অত্যন্ত সমবেদনার গলায় বললেন, ''শুনেছি তোমার বাড়িতে আজ ফুলকপি আর কড়াইশুঁটি দিয়ে সোনামুগ ডালের খিচুড়ি হয়েছে, সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা। তুমি বরং এখন বাড়ি যাও, গিয়ে মাথায় আর চোখে-মুখে ভাল করে ঠান্ডা জল থাবড়াও, তার পর পেট ভরে গরম-গরম খিচুড়ি খেয়ে টেনে ঘুম লাগাও। তোমার বায়ু চড়েছে।''

গজপতি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, ''ওই দ্যাখো, আমার বাড়িতে খিচুড়ি হয়েছে আর সে খবর আমিই জানি না! কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!''

রাস্তায় বেরিয়ে গজপতি দেখলেন, নিরেট দেওয়ালের মতো ঘন কুয়াশা, সামনে বা আশপাশে কিছু দেখার উপায় নেই। তবে চেনা রাস্তা বলে খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। কয়েক পা হাঁটতেই তাঁর সঙ্গ নিল হরিধন।

ফ্যাঁচ করে একটু হেসে বলল, ''আর একটু হলেই তো সুরেশের কাছে নাস্তানাবুদ হতে বাপু! কপাল ভাল যে সুরেশ দয়া করে তোমাকে রেহাই দিয়েছে। নইলে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ত! বহু আহাম্মক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো আর এক পিসও বোধ হয় নেই!''

''বেশি বোকো না, পৃথিবীতে অন্যমনস্ক মানুষের অভাব নেই।''

''তা নেই, তবে তোমার মতো আহাম্মক, বুদ্ধিভ্রষ্ট, অপ্রতিভ এবং ডরপোক আর আছে কিনা সন্দেহ। মশা-মাছির কথাটা বলতে গেলে কেন?''

''মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল।''

হরিধন আজ তর্কের মুডে নেই। হঠাৎ খুব সহানুভূতির সঙ্গে বলল, ''শোনো গজপতি, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। সুরেশ কিছু আন্দাজ করতে পারেনি। তবু তোমাকে বলি, এখন থেকে একটু সাবালক হও। জিনিয়াসদের মাথা আর পাঁচটা মানুষের মতো নয়, অ্যাভারেজ মানুষ যে রকম ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তারা সেই ভাবে করে না, তাই তারা একটু অন্য রকম। সেই জন্যই অনেক সময় মানুষ তাদের পাগল বা ছিটিয়াল বলে মনে করে।''

''তার মানে, তুমি কি বলতে চাও যে আমি এক জন জিনিয়াস?''

''হয়তো বড় মাপের জিনিয়াস নও, কিন্তু তোমার একটা ডেডিকেশন ছিল। যারা বেশি চিন্তা-ভাবনা করে এবং নতুন কিছু ভাবে, তাদের বাস্তব আচরণ অনেক সময় স্বাভাবিক মানুষের মতো না-ও হতে পারে। তার মানেই তো আর সে পাগল নয়! আমি যত দূর জানি তুমি পাগলটাগল নও। তা হলে আর্কিমিডিস, নিউটন, গ্যালিলিও, শেক্সপিয়র, কার্ল মার্ক্স, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ সবাই পাগল।''

গজপতি হতাশ হয়ে বলেন, ''ওরে বাবা! আমি তো ওঁদের ধারেকাছেও নই!''

''তা নও, তবে তুমি তোমার মতো করে দুনিয়ার একটা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলে। পলিউশন ম্যানেজমেন্ট। কাজ অনেকটা এগিয়েওছিল। কিন্তু কিছু লোক আগেভাগে পেটেন্ট কিনে নেওয়ার জন্য তোমার ওপর চড়াও হয়েছিল বলে তুমি ভয় পেয়ে কাজটা থেকে সরে এসেছিলে। ঠিক বলছি তো!''

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গজপতি বলেন, ''কী করব বলো! আমি যে বেজায় ভিতু মানুষ! তিন-তিনটে পার্টি পেটেন্ট কিনতে চেয়েছিল। প্রত্যেকেই হুমকি দিত, অন্য দু'জনের কাউকে দিলে জানে মেরে দেবে।

অনেক টাকার অফার ছিল। কিন্তু প্রাণেই যদি না বাঁচি তা হলে টাকা দিয়ে কী করব বলো।''

''ঠিক কথা। তবে সুরেশ নন্দী তখন তোমাকে পুলিশ প্রোটেকশন দিতে চেয়েছিল, তুমি নাওনি। ওই তিনটে পার্টিকে অ্যারেস্ট করতেও চেয়েছিল, তুমিই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলে।''

গজপতি একটু লজ্জিত মুখে বলেন, ওরা যে ষণ্ডাগুন্ডা মানুষ! সুপারি কিলার লাগিয়ে মেরে দিলে পুলিশ কী করবে বলো! পুলিশ তো আর সর্বশক্তিমান নয়!''

হরিধন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ''কিন্তু তার ফলে তোমার কাজটা তো শেষ হল না! শেষ হলে হয়তো পৃথিবীর একটা মস্ত উপকার হত!''

গজপতি করুণ মুখ করে বলেন, ''তা জানি না। আমি পারিনি বটে, কিন্তু পলিউশন নিয়ে গবেষণা তো গোটা পৃথিবী জুড়েই চলছে। এক দিন না এক দিন কেউ না কেউ কোনও না-কোনও একটা সমাধান নিশ্চয়ই বের করে ফেলবে।''

হরিধন গম্ভীর গলায় বলে, ''এখন ওটাই যা তোমার সান্ত্বনা।''

গজপতি গোমড়া মুখে হাঁটতে লাগলেন। নিজেকে নিয়ে তাঁর যে কত মুশকিল!

॥ ৩ ॥

করিডোরে একটা মৃদু শিসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একটা ইংরেজি গান, 'স্যাড টু সে, আই অ্যাম অন মাই ওয়ে, ওন্ট বি ব্যাক ফর মেনি আ ডে...' বয়স্কা নার্সটি একটু বিরক্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলেন। ভিজ়িটিং আওয়ার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কিছু ভিজ়িটর এখনও আছে। ছোকরাটিকে শনাক্ত করতে সময় লাগল না তাঁর। ভিজ়িটরদের জন্য পাতা বেঞ্চে বসে ছিল। পরনে ফেডেড জিন্‌স, গায়ে কালচে টি শার্ট, পায়ে স্নিকার।

নার্সটি ভদ্র গলাতেই বললেন, ''এটা হাসপাতাল, শিস দেওয়ার জায়গা নয় কিন্তু।''

ছেলেটা লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়াল, বিনয়ের সঙ্গেই বলল, ''সরি ম্যাডাম, ভুল হয়ে গেছে।''

নার্সটি দেখলেন, ছেলেটা বেশ লম্বা, স্পোর্টসম্যানের মতো চেহারা। মুখখানা করুণ।

নার্স জিজ্ঞেস করলেন, ''কেউ ভর্তি আছে বুঝি?''

''বাবা। ব্রেন টিউমার।''

''ও,'' বলেই নার্স একটু হেসে আবার বললেন, ''আপনি শিস খুব ভাল দেন, কিন্তু এটা যে হাসপাতাল সেটা মনে রাখতে হবে তো!''

''আর হবে না ম্যাডাম।''

''ঠিক আছে, বসুন। আপনার বাবার নাম কী?''

''বিনয় সেনগুপ্ত, সার্জিক্যাল ওয়ার্ড।''

''ডক্টর পল্লব দাশগুপ্তর পেশেন্ট তো! জানি। আপনি বসুন, ডক্টর একটু পরেই এসে যাবেন।''

''ধন্যবাদ ম্যাডাম।''

বয়স্কা নার্সটির একটু ফিল গুড হচ্ছে। তাঁর ছেলে নেই, এরকম একটা ছেলে থাকলে বেশ হত। ধীরে-ধীরে হেঁটে তিনি নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

শ্যাডোকে তার বাবা এক বার জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে টাকাটা কোথায় পেল। তাদের পরিবারে একটা সততার অনুশীলন আছে। অনর্জিত আয়কে তারা ভাল চোখে দেখে না। ভয় পায়। সেটা হয়তো পাপের ভয়, নরকবাসের ভয়, কিংবা আত্মসম্মান। এ টাকা অবশ্য শ্যাডোর অনর্জিত আয় নয়। একটা কাজ করে দিতে হবে মাত্র। একটা খুন। সেটা ক্রাইম বটে, কিন্তু ডিজ়অনেস্টি নয়। এটা তো আর বাড়িতে বলা যায় না। মিথ্যে কথাটা তেমন পরিপাটি বলতেও পারে না সে। ঘুরিয়েফিরিয়ে বলেছিল, এক বন্ধু ধার দিয়েছে, ধীরে-ধীরে শোধ দিতে হবে। তার বাবা বিনয় সেনগুপ্ত আর কিছু জিজ্ঞেস করেননি। জিজ্ঞেস করার মতো অবস্থাতেও ছিলেন না। ব্রেন টিউমারটা বাড়ছে, চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে এবং আরও নানা রকম কমপ্লিকেশন। ধারের কথা শুনে এ বিষয়ে তার মা বা দিদিও আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। পৃথিবীতে মাত্র তিনটে লোক আছে শ্যাডোর, বাবা, মা আর দু'বছরের বড় দিদি। ব্যস, তার পৃথিবী শেষ। এর বাইরে আর কারও প্রতি তেমন কোনও দায়বদ্ধতা নেই তার। বাদবাকি লোক বাঁচল কী মরল তাতে কিছু যায় আসে না শ্যাডোর। বাবাকে সে প্রাণাধিক ভালবাসে। কর্পোরেশনের এই সামান্য কর্মচারীটি তাঁর ছেলেকে তেমন ভাল স্কুলে পড়াতে পারেননি, দামি জামাকাপড় বা মহার্ঘ খেলনা কিনে দেননি, তেমন ভাল খাওয়াদাওয়াও জোটাতে পারেননি। তবে আকণ্ঠ ভালবাসা দিয়েছেন। কাঁধে করে রথের মেলায় নিয়ে গেছেন, অসুখ হলে রাত জেগে শিয়রে বসে থেকেছেন, মুখে-মুখে গল্পের ছলে পৃথিবীর ইতিহাস, রূপকথা, কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্টো, হাঞ্চব্যাক অফ নোতরদাম, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, ব্ল্যাক অ্যারো, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, কত কী শুনিয়েছেন! এই মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শ্যাডো সব কিছু করতে পারে।

কাল অপারেশন হবে। সেই জন্য একটু টেনশন আছে তার। ডাক্তার দাশগুপ্ত অবশ্য বলেছেন, ''কোনও ভয় নেই। টিউমারটা বিনাইন এবং অপারেশন তেমন জটিল নয়।''

দুঃখের বিষয়, অপারেশনের সময়ে সে থাকতে পারবে না। দিন চারেক আগে সেই চোয়াড়ে চেহারার লোকটা, যার নাম সে পরে জেনেছে, আবু, তার সঙ্গে সেই রেস্তরাঁয় দেখা করে বলেছিল, ''আর সময় নেই। তুমি ফুল পেমেন্ট পেয়ে গেছ, নাউ ইট্‌স টাইম টু ডেলিভার।''

লোকটা তাকে একটা ট্রেনের এসি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট ধরিয়ে দিল, যেটা আজ রাতের ট্রেন। তার পর একটা খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেট তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ''ইউ উইল নিড দিস।''

''ওটা কী?''

''আ গান, ম্যান!''

শ্যাডো জীবনে কখনও বন্দুক-পিস্তল হাতে নিয়ে দেখেনি। মাথা নেড়ে বলল, ''ওটার দরকার হবে না। একটা মানুষকে মারতে বেশি কিছু লাগে না।''

আবু দ্বিধাগ্রস্ত মুখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ''চালাতে জানো না বুঝি!''

''না। তা ছাড়া পিস্তল সঙ্গে রাখলে ঝুঁকি বাড়বে।''

''দেন হাউ উইল ইউ ডু ইট? বাই স্ট্র্যাংলিং?''

''সেটা পরে ঠিক করব।''

''লুক ইয়ংম্যান, এটা ছেলেখেলা নয়, ভাল করে ভেবে দেখো। পিস্তলে কাজ সবচেয়ে ভাল হয়। ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার। জাস্ট হিট অ্যান্ড রান।''

''মিস্টার আবু, জায়গা মতো একটা কারাটে কিক বা মাথায় একটা ঘুষিই অনেক সময়ে যথেষ্ট। কিংবা এক টুকরো দড়িই কাজটা করে দিতে পারে। তুমি ভেবো না, আই শ্যাল ডু ইট ইন মাই ওন ওয়ে।''

''আবার ভেবে দেখো। দরকার হলে বাড়ি গিয়ে ভাবো। মত বদলালে আমাকে ফোন কোরো। পিস্তল তোমার কাছে পৌঁছে যাবে।''

শেষ পর্যন্ত পিস্তলটা নেয়নি শ্যাডো। তার একটা ভয় হল, বন্দুক-পিস্তল সঙ্গে থাকলেই ভিতরে একটা হননেচ্ছা জাগতে পারে, তখন হয়তো সামান্য কারণেই গুলি চালিয়ে দিতে ইচ্ছে হবে। অস্ত্র সব সময়েই অন্যকে হত্যা করার প্ররোচনা দেয়। সে তো আর পেশাদার খুনি নয়, বাবার প্রাণরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে একটা কাজ করতে যাচ্ছে।

করিডোরের এক প্রান্তে ডাক্তার পল্লব দাশগুপ্তকে দেখা গেল। একটু মোটাসোটা মানুষ, আহ্লাদী এবং হাসি-খুশি, আমুদে চেহারা। সব সময় রোগীদের ভরসা দেন বলে রোগীরা তাঁকে পছন্দ করে। তার বাবাও বলেছেন, ডাক্তারবাবুটিকে তাঁর বেশ ভাল বলে মনে হয়েছে।

ডাক্তারবাবু কাছে আসতেই উঠে দাঁড়াল শ্যাডো, ''স্যর, আমার

বাবা বিনয় সেনগুপ্তর অপারেশন আগামী কাল হবে বলে ঠিক হয়েছে। কিন্তু আমাকে আজকেই একটা জরুরি কাজে বাইরে যেতে হবে। অপারেশনের সময়ে আমি থাকতে পারব না।''

ডাক্তার পল্লব দাশগুপ্ত হাসিমুখেই বললেন, ''জরুরি কাজ থাকলে যাবেন। আর আপনি এখানে থাকলেও তো কিছু করতে পারবেন না। আপনার বাবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেডিক্যাল কেয়ারে থাকবেন। বরং কাজ সেরে ফিরে আসুন, বাই দি গ্রেস অফ গড উনি ততদিনে সুস্থ হয়ে উঠবেন, ফিরে এসে সুস্থ বাবাকে দেখতেই বরং ভাল লাগবে। কী বলেন? বাই দা বাই, আপনার বাড়ির অন্য লোকজন আছেন তো! কাউকে না-কাউকে তো অ্যাটেন্ড করতে হবে!''

''আমার মা আর দিদি আছেন স্যর, তাঁরা থাকবেন।''

''তা হলেই হবে।''

''আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।''

''ইউ আর ওয়েলকাম।''

ডাক্তার ওয়ার্ডের দিক চলে যাওয়ার পর শ্যাডো পাশে রাখা তার হ্যাভারস্যাকটা পিঠে তুলে নিল। বয়স্কা নার্সটি তাকে হয়তো লক্ষ করছিলেন, উঠে এসে স্নেহসিক্ত গলায় বললেন, ''এ কী! চলে যাচ্ছেন যে! বাবার সঙ্গে এক বার দেখা করে যাবেন না?''

শ্যাডো খুব অপ্রস্তুত বোধ করল, কারণ সে এখন মোটেই বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে না। এখন বাবার প্রিয় মুখখানা দেখলে তার মন দ্রব হয়ে যাবে। যে কাজ সে করতে যাচ্ছে তা ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে। তার ভিতরকার যে খুনিটা আস্তে-আস্তে জেগে উঠছে সে আবার ঘুমিয়ে পড়বে হয়তো। তাই সে মাথা নেড়ে বলল, ''না ম্যাডাম, এখন তো ভিজ়িটিং আওয়ার নয়, এখন দেখা করব না।''

নার্সটি স্নেহমিশ্রিত হাসি হেসে বলেন, ''আরে তাতে কী হয়েছে! ভিজ়িটিং আওয়ার তো এই মাত্র শেষ হল! চলুন আমি আপনাকে আপনার বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি বোধ হয় বাইরে কোথাও যাচ্ছেন, এক বার বাবার সঙ্গে দেখা করে যান!''

শ্যাডো এই গায়েপড়া প্রস্তাবটা পছন্দ করছিল না। বিরক্ত হলেও সে বিনয়ের ভাব বজায় রেখেই বলে, ''ম্যাডাম, আমার বাবা এক জন হার্ডকোর মরালিস্ট। কোনও রকম আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নেওয়া একদম পছন্দ করেন না। এই অসময়ে আমি ওঁর কাছে গেলে উনি খুব অসন্তুষ্ট হবেন।''

''ওমা! তাই বুঝি! তা হলে থাক,'' নার্সটি দুঃখী মুখে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

শ্যাডো নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে এল। এখন সন্ধে সাড়ে সাতটাও বাজেনি। তার ট্রেন পৌনে দশটায়। কাছাকাছি একটা ধাবায় বসে তন্দুরি রুটি আর মুরগির রোস্ট খেয়ে নিল সে। খেতে-খেতে তার হঠাৎ মনে হচ্ছিল, তার উপর কেউ নজর রাখছে না তো! কেমন একটু সন্দেহ হওয়ায় সে চার দিকটা চেয়ে দেখল। কিন্তু মুশকিল হল ধাবায় এই সন্ধেবেলায় প্রচণ্ড ভিড়। এই ভিড়ের ভিতর কে কার উপর নজর রাখছে তা বোঝে কার সাধ্য! নজর রাখলেও তার কিছু করার নেই। 'যা হওয়ার হবে' এই নীতিতে সে গভীর ভাবে বিশ্বাসী।

আবুর বসের নাম হরিশ। আবু বলে হরিশজি। আবু বা তার বস কী করে বা কোথায় থাকে তা জানার চেষ্টাও করেনি শ্যাডো। হয় বলবে না, নয়তো ভুল ইনফরমেশন দেবে। তাই ওদের আসল পরিচয় জানার চেষ্টাই করেনি সে। এমনকি, আবু বা হরিশও হয়তো ওদের আসল নাম নয়।

রিস্কের কথাটাও ভাবে শ্যাডো। এতগুলো টাকা তো ঝুঁকি ছাড়া রোজগার করা সম্ভব নয়। হয়তো বাকি জীবন তাকে জেলে পচতে হবে। কিংবা ডেথ সেনটেন্সও হতে পারে। তাতে তার তেমন কোনও সমস্যা নেই। যা হওয়ার হবে। তার চাকরি নেই, চাকরি পাওয়ার আশাও নেই, এই পরিস্থিতিতে দৈবের উপর ভরসা করে তো বসে থাকা যায় না। দৈব সে মানেও না। জনসংখ্যাবহুল এই পৃথিবী থেকে একটা লোককে

সরিয়ে দেওয়া এমন কী ব্যাপার! বিশেষ করে যদি তাতে তার নিজের বাবা বেঁচে যায়! আর লোকটা তো মরবেই, শ্যাডো যদি না-ও মারে তবু আবু বা হরিশ অন্য সুপারি কিলার লাগিয়ে ঠিকই মেরে দেবে। তা হলে সে মারলে ক্ষতি কী? যুদ্ধেও তো এক জন সৈন্য বিপক্ষের সৈন্যকে মারে। পাপ-পুণ্যে সে বিশ্বাসী নয়, তার পরকালের ভয় নেই, ভগবান বলেও কাউকে মানে না। এক প্রাকৃতিক নিয়মে তার জন্ম, কালের নিয়মে সে এক দিন মারাও যাবে, এই তো ব্যাপার! তা হলে অকারণে কর্মফল নিয়ে ভাবতে যাবে কেন সে?

আগে তার একটা সস্তা ফিচার ফোন ছিল, হরিশ তাকে একটা ভাল জাতের স্মার্ট ফোন দিয়েছে। তাতে একটা রহস্যজনক নম্বর সেভ করা আছে। প্রয়োজনে সে যোগাযোগ করতে পারে। তবে সে যদি ধরা পড়ে এবং কেস গুবলেট হয়ে যায় তা হলে এই নম্বরটা যে পুলিশ ট্রেস করতে পারবে না, তা-ও শ্যাডো অনুমান করতে পারে। এরা পাকা লোক, কোথাও কোনও সূত্র রেখে যাবে না। সব দায় শ্যাডোকেই বহন করতে হবে। কিছু যায় আসে না তাতে। সে সব পরিস্থিতির জন্যই প্রস্তুত।

নতুন ফোনটা থেকে সে মা আর দিদির সঙ্গে একটু কথা বলল। কথা বলার মতো বেশি লোক নেই তার। তার এখন একটাই টেনশন, কাল সকালে তার বাবার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার। এবং তখন সে কলকাতায় থাকবে না। এক অচেনা জায়গায়, এক অচেনা পরিবেশে একটা অচেনা কাজ জীবনে প্রথম বার করতে হবে তাকে। সে কি শেষ পর্যন্ত সুপারি কিলার হয়ে দাঁড়াবে! প্রফেশনাল হিটম্যান? বাবা জানতে পারলে বোধ হয় আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু বিকল্পই বা কী আছে শ্যাডোর হাতে?

জীবনে কখনও এসি ফার্স্ট ক্লাসে চড়েনি সে। আজ চড়ে দেখল, ঘ্যামা ব্যাপারস্যাপার। চার জনের কিউবিক্‌ল। তার বার্থ ডান দিকের আপার। ওঠার জন্য চমৎকার একটা মই আছে। সেকেন্ড ক্লাসের মতো হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে উঠতে হবে না। বাকি তিন জনের এক জন বয়স্ক মানুষ, ফরসা, অভিজাত চেহারা, সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র। বাকি দু'জনের এক জন বছর তিরিশের, রোগা, নিরীহ চেহারার মানুষ, তার সঙ্গেও গোটা দুই সুটকেস। চতুর্থ জন বছর পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশের এক জন হাট্টাগাট্টা, বেঁটে চেহারার লোক। এই লোকটার বেশি লাগেজ নেই, কেবল একটা ব্যাগ। চেহারা দেখে কে কী রকম তা অনুমান করা মুশকিল। তবে শ্যাডোর কেন যেন মনে হচ্ছে, এই যাত্রায় সে একা নয়, কেউ সম্ভবত তার ছায়া হয়ে যাচ্ছে। যেতেই পারে। হরিশ হয়তো এক জন অবজ়ার্ভারকেও লেলিয়ে দিয়েছে। এবং সেই লোকটা সম্ভবত বেঁটে জন। কারণ তারই লাগেজ সবচেয়ে কম। শ্যাডোর শ্যাডো। তাতে অবশ্য শ্যাডোর কিছুই যায় আসে না। তার মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। একটু যা টেনশন আছে তা বাবার জন্য। বাবার কাল সকালে অপারেশন। ব্রেন অপারেশন সব সময়েই ক্রিটিকাল। তার ডাকার মতো কোনও ভগবান নেই, নির্ভর করার মতো কোনও দৈব নেই, সাহস দেওয়ার মতো কোনও মিরাক্‌ল নেই।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর সে, তার সহযাত্রীদের কারও সঙ্গে একটিও কথা না-বলে, তার বার্থে উঠে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৪ ॥

না, বগার দিনকাল মোটেই ভাল যাচ্ছে না। নইলে কুমোরপাড়ার নন্দবাবুর বাড়ির বাগানে মাটি কোপানোর কাজ করতে হয়! বিশ্বসংসারের কে না জানে যে, সকালে নন্দবাবুর মুখ দেখলে হাঁড়ি ফাটে, যাত্রাভঙ্গ হয়, লোকে শুকনো ডাঙায় আছাড় খায়! ত্রিভুবনে এমন হাড়কঞ্জুস, তিরিক্ষে, বদমেজাজি মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পুরনো বাজারের সস্তা জ্যোতিষী রামভজন মিশিরকে পাঁচ টাকায় হাত দেখিয়েছিল বগা, গত মাসেই। রামভজন একখানা আতসকাচ বাগিয়ে ধরে ভাল করে উল্টেপাল্টে তার কররেখা বিচার করে দুঃখের গলায় বলেছিল, ''না রে, তোর সময়টা খারাপই যাচ্ছে! আর এক বছর তিন মাস একটু চেপেচুপে থাক, তার পর তোকে আর পায় কে!''

রামভজনের চেতাবনি বেশির ভাগই মেলে না, দু'-একটা কখনও সখনও মিলেও যায়। কেউই রামভজনের উপর ভরসা করে না, তবে হাত দেখাতেও ছাড়ে না। বগার অভিজ্ঞতা হল, রামভজনের খারাপ কথাগুলো বেশ ফলে যায়, ভালগুলোই ফলে না।

তবে বগার ভাল সময়ও এসেছিল বইকি। তখন বৈজুলালের ফাইফরমাশ খাটত বগা। বৈজুলাল একা-বোকা মানুষ। ছেলে জিতেনের সঙ্গে তার উদুম ঝগড়া। জিতেন আলাদা থাকে, বাপমুখো হয় না। তাতে বৈজুলালের বয়েই গেল। বৈজুলালের ছেলে বলো, বৌ বলো, বন্ধু বলো, মা-বাপ বলো, সবই হল টাকা। বৈজুলাল বলতও তাই, ''ওরে টাকার ওপর বাপ নেই!''

তা তার ফাইফরমাশ খাটত বগা, আর আড়ে-আড়ে দেখে নিত, বৈজু টাকা রাখে একখানা মজবুত লোহার আলমারিতে, আর চাবি তার ট্যাঁকে। এ সব দেখে রাখা ভাল, কবে কোন জানাটা কোন কাজে লেগে যায় তার কি কোনও ঠিক আছে? খবর রাখা বড় জবর জিনিস। খবরের জন্য চোখ, কান, নাক, মাথা সবই সজাগ রাখতে হয়। আর সুযোগের সুলুকসন্ধানে থাকতে হয়। তা বগার সে সব গুণ আছেও। বৈজুলাল বুড়ো মানুষ, আর বুড়ো মানুষদের কবে কী হয়ে বসে, তার কি কিছু ঠিক আছে! এই ভাল তো এই খারাপ। তবে বৈজুলাল মজবুত মানুষ, দুপুরে আধ সের ছাতু খায় আর রাতে দশখানা রুটি। তাই খুব একটা আশা-ভরসা ছিল না বগার। কিন্তু কপাল এমনই জিনিস, কার কখন খোলে তার কিছু ঠিক নেই। তা বগারও খুলল। বৈজুলাল, কোথাও কিছু না, দুপুরবেলা ছাতু খেতে-খেতেই হঠাৎ 'আঁ আঁ' করে ঢলে পড়ল। বগা বুদ্ধি রাখে, লোকজন ডাকার আগেই সে বৈজুলালের ট্যাঁকের ঘুনশি থেকে অতি তৎপরতায় চাবির গোছাটা খুলে নিয়ে চটপট আলমারি থেকে টাকার একটা বান্ডিল হাতছিপ্পু করে নিল। চাবিটা আবার ঘুনশিতে বেঁধে তার পর লোকজন ডাকাডাকি। খবর পেয়ে ছেলে জিতেনও এল। বৈজুলালকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

বৈজু হাসপাতাল থেকে ফিরল দিন দশেক বাদে। বগার বরাতজোর বটে। যে বৈজুলাল হাসপাতালে গিয়েছিল সেই বৈজুলাল কিন্তু ফিরল না। কেমন যেন জবুথবু, বোকাটে, থপথপে, স্মৃতিভ্রষ্ট বৈজুলাল। যে টাকা ছিল তার শ্বাসপ্রশ্বাস, সেই টাকাও যেন ঠিকঠাক চিনে উঠতে পারছে না। নইলে বগার কপালে দুঃখ ছিল। সে ঠিক করেই রেখেছিল, বৈজু টাকার হিসেব নিয়ে হাল্লা মাচালে সে পিঠটান দেবে। তবে বৈজুলাল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেনি। হাতছিপ্পুর দশ হাজার টাকা পেয়ে বগা আহ্লাদে একখানা নতুন সাইকেল পর্যন্ত কিনে ফেলল। সাইকেলে চেপে পাড়ায়-পাড়ায় টহল মারার মতো কেতার জিনিস আর কী আছে? তা ছাড়া মদন ঘোষের দোকানে সকালে শিঙাড়া জিলিপি আর বিকেলে হিংয়ের কচুরি আর আলুর দম।

তবে ওই আর কী, তার কপালে সুখ সয় না। তার নতুন সাইকেল দেখে জিতেন কিসের যেন গন্ধ পেল, খানিক হম্বিতম্বি করল, চোরছ্যাঁচড় বলে গালাগাল দিল, তার পর তাড়াল। বৈজুলালের গদিতে এখন জিতেন বসছে, কাজেই বগার কিছু করার ছিল না। এই মাগ্‌গি গন্ডার বাজারে দশ হাজার টাকার আয়ু আর কদ্দিন! মাসখানেক ভাল সময়টা ছিল। তার পর থেকেই খারাপ সময়টা ধরে ফেলল তাকে। সাইকেলটা পর্যন্ত পটল মল্লিকের কাছে হাফ দামে বিক্রি করে দিতে হল।

তা এই হল বগার বৃত্তান্ত। বগার শরীরটা হল পাকানো দড়ির মতো, রোগা হলেও শক্তপোক্ত। সকালে সে হাপুসহুপুস করে নন্দবাবুর বাগান কোপাচ্ছিল। নন্দবাবু হুঁশিয়ার লোক, চতুর্দিকে নজর। তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে এমন বাপের ব্যাটা জন্মায়নি। তাই মন দিয়েই কোদাল চালাচ্ছিল বগা। ঢিলে দিলেই পয়সা কাটবেন নন্দবাবু। তা মেহনত বড় কম হচ্ছে না। এই বাঘা শীতেও বগার রীতিমতো ঘাম হচ্ছে। বগা মোটেই সুখে নেই।

নন্দবাবু বারান্দায় মোড়া পেতে বসে আছেন। তাঁর গায়ে মোটা

আলোয়ান, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা, দুটো চোখ টর্চলাইটের মতো বগার উপর নজর রাখছে। শুধু কাজের ফাঁকি ধরার জন্য নয়, বগার যে হাতটানের স্বভাব আছে তা-ও সবাই জানে কিনা। চোখের পলকে কী সরিয়ে ফেলবে তার কি কোনও ঠিক আছে!

সাতটার সময় জলখাবার এল। আর জলখাবারের কী ছিরি! কলাইকরা পিরিচে তিনটে বাসি, ঠান্ডা রুটি আর খানিকটা ঘ্যাঁট মতো কিছু।

বগা বারান্দার সিঁড়িতে খেতে বসে বলল, ''নন্দকর্তা, এক ডেলা গুড় পাওয়া যাবে?''

নন্দবাবু খ্যাঁক করে উঠলেন, ''গুড়ের দাম জানিস? চিনিকে বলে ওদিক থাক।''

''তা হলে বরং এক থাবা চিনিই হয়ে যাক।''

একটু গাঁইগুঁই করার পর অবশ্য একটু চিনি জুটল। খুব যত্ন করে খাচ্ছিল বগা। চিনির মতো জিনিস নেই। মুখে কেউ যেন মধু ঢেলে দিয়েছে। চিবোতে-চিবোতে আরামে ঘুম এসে যাচ্ছিল বগার। ঘুমিয়েই পড়ত যদি না এমন সময়ে হাড়হাভাতে ফেরিওয়ালাটা 'আ পান, আ পান' করে হাঁক মারতে-মারতে এসে হাজির হত।

নন্দবাবু বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, ''ওই এসেছে আবার জোচ্চোরটা!''

এক ঘটি জল গলায় ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে বগা বলে, ''কার কথা বলছেন আজ্ঞে?''

''ওই তো, ওই বদমাশ ফেরিওয়ালাটা! দিন তিনেক আগে জোর করে একটা ঢাউস লাট্টু গছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। দশ টাকা চেয়েছিল, আমি অবশ্য দাম এখনও দিইনি। তা নাতি বলল, সেই লাট্টু নাকি ঘোরেই না! লাট্টুটা এনে দিচ্ছি, যা তো জোচ্চোরটাকে ফেরত দিয়ে আয়।''

ফেরিওয়ালাটাকে চেনে বগা। রাজ্যের অকাজের জিনিস ফিরি করে বেড়ায়। নিরখ পরখ করে দেখেছে বগা, ও সব পুরনো অচল জিনিস চোরবাজারেও বিক্রি হওয়ার নয়। সে এক গাল হেসে বলল, ''আর বলবেন না, দেশটা চোর বাটপাড়ে একেবারে ভরে গেছে।''

নন্দবাবু উঠে ভিতরবাড়িতে গেলেন। একটু বাদে একটা বেশ বড়সড় লাট্টু এনে বগার হাতে দিয়ে বললেন, ''যা, লোকটাকে দিয়ে আয়গে!''

কারও উপর হম্বিতম্বি করার সুযোগ পেলে বগা ভারী খুশি হয়। এমন সুযোগ তো বড় একটা আসে না! সে মুরুব্বির চালে গিয়ে লোকটার উপর চড়াও হয়ে বলল, ''এটা কি চিটিংবাজির জায়গা পেয়েছ নাকি হে বাপু! তুমি তো মোটেই সুবিধের লোক নও! এই অ্যাত্তো বড় লাট্টুটা কোন আক্কেলে গছিয়ে গেছ শুনি! অ্যাতো বড় লাট্টু কখনও ঘোরে! আচ্ছা বেআক্কেল লোক বটে হে তুমি!''

লোকটা ভারী কাঁচুমাচু হয়ে বলে, ''ঘোরেনি বুঝি!''

''আর ভালমানুষ সেজো না তো বাপু, তুমি ভালই জানো যে, এ লাট্টু ঘোরার জিনিসই নয়। লোক ঠকানোর আর জায়গা পেলে না! জুটলে এসে নন্দ চাকলাদারের বাড়িতে!''

লোকটা লাট্টুটা হাতে নিয়ে, খুব যেন মজার কথা হচ্ছে, এ রকম ভাবে হাসল। তার পর হাসিমুখ করেই বলল, ''ঘোরাতে জানলে এই লাট্টুটাও ঘোরে কিন্তু। তবে এক বার ঘুরলে আর থামে না কিনা! ঘুরতেই থাকে, ঘুরতেই থাকে।''

বগা অবাক হয়ে বলে, ''তুমি পাগল না পান্তাভাত বলো তো! লাট্টু কখনও অনন্ত কাল ধরে ঘোরে শুনেছ? দম ফুরোলে লটকে পড়বে না!''

লোকটা একটুও রাগল না দেখে বগারই রাগ হচ্ছিল। ওরে বাপু, এত অপমানের কথা বললুম, তুইও দু'-একটা চোটপাটের কথা বলবি তো! নইলে কাজিয়াটা জমবে কী করে! কিন্তু ম্যান্তামারাটা সেই দিক দিয়েই গেল না! কেবল বোকার মতো হেসেই যাচ্ছে দেখ!

লোকটা গ্যালগ্যালে হাসি হাসতে-হাসতেই বলে, ''এটা ঠিক লাট্টু নয় কিনা!''

''তবে ওটা কী? স্কন্ধকাটার মুন্ডু?''

''ঠিক জানি না, তবে শুনেছি, এটা যত ঘোরে তত বাতাসে অক্সিজেন বেড়ে যায়।''

এই কথাটা বগা ঠিক বুঝতে পারল না। ভ্রু কুঁচকে বলে, ''কী বেড়ে যায়?''

লোকটা জবাব না-দিয়ে, লাট্টুটার তলার পেরেকের সরু দিকটা দু'আঙুলে ধরে ফুরুক করে ঘুরিয়ে দিয়ে ডান হাতের তেলোর উপর লুফে নিল, আর লাট্টুটা হাতের তেলোর উপর দিব্যি ঘুরতে লাগল বনবন করে। ঘুরছে তো ঘুরছেই, থামার নাম নেই। অনেক ক্ষণ কাণ্ডটা হাঁ করে দেখল বগা। তাজ্জব ব্যাপার তো! লোকটার স্থির হাতের উপর ঘুরন্ত লাট্টু!

চটকা ভাঙল নন্দবাবুর হাঁকে, ''বলি দিনমানটা কি ওই ফেরিওয়ালার সঙ্গে আড্ডা মেরেই কাটাবি ভেবেছিস! পয়সা চাওয়ার সময় মজা দেখাব, মনে রাখিস!''

হাঁকটাকে পাত্তা দিল না বগা। ফেরিওয়ালাটাকে বলল, ''লাট্টুটা আমায় দেবে? আমি তোমাকে দুটো টাকা দেব'খন।''

ফেরিওয়ালা এক গাল হেসে বলে, ''নেবে? তা নাও। টাকা পরে দিলেও হবে।''

বগা তো তা-ই চায়। হাড়হাভাতেটাকে পয়সা দিতে বয়েই গেছে তার। ওর ওই সব পুরনো জিনিসপত্তর কেউ কেনে নাকি! সবই বাতিল জিনিস। তবে লাট্টুটা কিন্তু জব্বর!

লাট্টুটা পেয়ে বগার মাথাটাই যেন কেমনধারা হয়ে গেল। মাটি কোপাবে কী, কামিনী ঝোপটার আড়ালে বসে একমনে লাট্টুটা ঘোরানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। কিন্তু জুত করতে পারছিল না। ফেরিওয়ালাটা যেমন ফুরুক করে ঘুরিয়ে দিল তেমনটা বগার হাতে হচ্ছে না কিছুতেই। আর যতই হচ্ছে না ততই রোখ চেপে যাচ্ছে বগার। কোদাল চালানো তার মাথায় উঠেছে।

ও দিকে বারান্দায় বসা নন্দবাবু চেঁচামেচি জুড়েছেন, ''যত সব চোর-জোচ্চোর-চিটিংবাজ-কামচোর এসে জোটে এখানে! কোথায় গেল বদমাশটা! নিশ্চয়ই ঘাপটি মেরে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে হাতসাফাই করবে বলে। আজ তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন! পুলিশে দিয়ে ছাড়ব, এই বলে রাখলাম!''

অবশেষে অনেক বারের চেষ্টায় লাট্টুটা ঘোরাতে পারল বগা। তলার সরু দিকটা দু'আঙুলে চেপে ধরে হালকা একটা টুসকি মারতেই লাট্টু হঠাৎ বোঁ শব্দ করে তার হাতের তেলোর উপর বাঁইবাঁই করে ঘুরতে শুরু করায় বগার চোখ রসগোল্লার মতো বড়-বড় হয়ে গেল। নন্দবাবুর চেঁচামেচিকে গ্রাহ্যই করল না সে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। তার পর ধীরে সুস্থে হাতের তেলোর উপর ঘুরন্ত লাট্টুটা নিয়েই সে উঠে নন্দবাবুর সামনে গিয়ে বুক চিতিয়ে বলল, ''খুব তো বলেছিলেন যে, লাট্টুটা নাকি ঘোরে না! এই বার স্বচক্ষেই দেখুন লাট্টু ঘুরছে কি না!''

নন্দ চাকলাদার বিস্ময়ে খানিক ক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, ''তার মানে তুই এত ক্ষণ ধরে কাজ ফেলে রেখে লাট্টু ঘোরাচ্ছিলি! এটা কি লাট্টু ঘোরানোর সময়? নাকি তোর সেই বয়স আছে! তুই লাট্টু ঘোরালে কি বাগানের মাটি ভূতে কোপাবে!''

বগা বিরক্ত হয়ে বলে, ''আজ্ঞে চটছেন কেন! মাটি কোপানো তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! তার আগে লাট্টুর কেরামতিটাও একটু দেখুন। ভূভারতে এ রকম লাট্টু কখনও দেখেছেন! সেই কখন থেকে ঘুরেই চলেছে, থামার নামই নেই মশাই!''

নন্দবাবু রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ''লাট্টুর কেরামতি দেখানোর জন্য কি তোকে এককাঁড়ি টাকা দিয়ে রেখেছি? এটা কি ইয়ার্কি পেয়েছিস নাকি?''

বগা তেতো গলায় বলে, ''আপনার দোষ কি জানেন নন্দকর্তা, বিষয়চিন্তা ছাড়া আপনি আর কিছু ভাবতে পারেন না। বিষয়ের বাইরেও দুনিয়ায় অনেক কিছু আছে কিন্তু।''

নন্দ চাকলাদার মোড়া থেকে উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, ''আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছিস! তোর সাহস তো কম নয়! বেরো, বেরো বলছি আমার বাড়ি থেকে! দূর হয়ে যা বেয়াদব কোথাকার!''

বগার মোটেই রাগ হল না। সে নির্বিকার গলায় বলল, ''ঠিক আছে মশাই, যাচ্ছি। যে ঘণ্টা খানেক কাজ করেছি তার পয়সাটা হিসেব করে দিয়ে দিন।''

নন্দবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, ''কিসের পয়সা? মামাবাড়ির আবদার পেয়েছিস নাকি! তোর সঙ্গে কড়ার হয়েছিল গোটা বাগান কুপিয়ে দিলে তিনশো টাকা পাবি। আধখেঁচড়া কাজের জন্য কোনও পয়সা নেই।''

হাতের তেলোর উপর লাট্টুটা এখনও বাঁইবাঁই করে ঘুরছে। দৃশ্যটা মুগ্ধ চোখে দেখতে-দেখতে বগা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, ''ঠিক আছে মশাই, ও পয়সা আপনাকে আর দিতে হবে না।''

নন্দবাবু তেড়ে উঠে বললেন, ''দয়া করছিস নাকি রে ব্যাটা! এই যে গাণ্ডেপিণ্ডে রুটি-তরকারিগুলো গিললি, সঙ্গে আবার দেড়শো গ্রাম চিনি, তার কি হিসেব নেই নাকি?''

অন্য সময় হলে এ সব কথার জবাবে বগাও উল্টে দু'-চার কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু লাট্টুটা পেয়ে বগার মনটা এতই ভাল হয়ে গেছে যে, তার মোটে রাগই হচ্ছে না। সে বেশ খোশ মেজাজেই বলল, ''ঠিক আছে নন্দবাবু, ওই রুটি-তরকারিতে আজকের পয়সা উসুল হয়ে গেল।''

এই বলে বেরিয়ে পড়ল বগা। এই জিনিস দশ জনকে দেখিয়ে বাহাদুরি না-পেলে আর লাভ কী হল! আর দশ জনকে দেখাতে হলে বাজারের মতো আর কোনও জায়গা আছে! কেনারামের দোকান থেকে একটা পিরিচ কিনে বাজারে ঢোকার মুখটাতেই একটা প্লাস্টিক পেতে বসে গেল সে। তার পর একটু কসরত করে লাট্টুটা ফের ঘুরিয়ে পিরিচটার উপর ছেড়ে দিল বগা। আর বশংবদ লাট্টুটাও লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুরে যেতে লাগল। লোক জড়ো করতে বগা নাটুকে ভঙ্গিতে গলা তুলে চেঁচাতে লাগল, ''মার কাটারি! মার কাটারি! জাদুই লাট্টু! জাদুই লাট্টু! মঙ্গলগ্রহ থেকে ইমপোর্টেড! ওয়ান পিস, ওনলি ওয়ান পিস! দেখে যাও সবাই...''

দ্যাখ না দ্যাখ কাণ্ড দেখতে লোক জমে গেল মেলাই। লাট্টু নিতান্তই একটা এলেবেলে জিনিস। কিন্তু এত দমওয়ালা লাট্টু কেউ কখনও দেখেনি। নেতাই বাগ জিজ্ঞেস করল, ''হ্যাঁ রে বগা, এর ভিতরে কি মেশিন আছে? নইলে ঘুরছে কিসে?''

মনোতোষ গায়েন বলে, ''আরে না-না, ব্যাটারি ভরা আছে নিশ্চয়ই! ব্যাটারি ফুরোলেই নেতিয়ে পড়বে।''

গণেশ পাল সায়েন্স নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিল। অনেক ক্ষণ দেখেটেখে বলল, ''না হে, এটা সোলার এনার্জিতে চলছে বলে মনে হচ্ছে।''

বিষ্ণুপদ কাউ সন্দিহান ভঙ্গিতে বলে, ''এ চিনে জিনিস না-হয়ে যায় না! কিছু ক্ষণ চলেই একেবারে ঠান্ডা মেরে যাবে, এই বলে দিলুম!''

অভয়পদবাবু খুব ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''বগাভাই, লাট্টুটা কি বিক্রি করবে? আমার ছেলেটা একটা লাট্টুর জন্য ক'দিন হল বায়না করছিল। তা না হয় দশটা টাকাই দিচ্ছি।''

বগা উচ্চাঙ্গের একটা হাসি হেসে বলে, ''আর হাসাবেন না মাস্টারমশাই, যান না, পকেটে লাখ টাকা নিয়ে সব বাজার ঘুরে আসুন, দেখুন এমন জিনিস পান কি না! তবে ভাই বলে ডেকেছেন, তাতে আমি ভারী খুশি হয়েছি, দশটি হাজার টাকা পেলে আমি লাট্টু দিয়ে দেব।''

দশ হাজার শুনে অভয়পদবাবু বুকে হাত চেপে হার্টটা সামাল দিলেন। তার পর মলিন মুখে ভিড়ের মধ্যে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গজপতির আজকাল বাজার করতে বড্ড হাঁসফাঁস হয়। কারণ বাজারে জিনিস পছন্দ করা থেকে দরদস্তুর সব গোপালই করে, তাঁর কাজ হল গোপালকে টাকা সাপ্লাই করা। আর উদ্বেগের ব্যাপার হল, গোপালের খাঁই দিন-দিন বাড়ছে। আর তার কায়দারও উন্নতি হচ্ছে। নতুন কায়দাটা হল, গজপতি জিনিস কেনার জন্য যে টাকাটা দেন সেটা চোখের পলকে ভ্যানিশ হয়ে যায়, গোপাল ফের হাত পেতে বলে, ''কী হল, টাকাটা দিলেন না যে!''

গজপতি সঙ্কোচের সঙ্গেই বলেন, ''এই মাত্র তো দিলুম!''

তখন গোপাল অত্যন্ত অভিমানের সঙ্গে বলে, ''দিলে তো আমার হাতেই থাকত মেসোমশাই! আমার হাতে কিছু আছে কি?''

এর জবাবে কী বলতে হয় সেটা গজপতি জানেন না। কারণ সেটা স্কুল-কলেজে শেখায়নি। অগত্যা তিনি মনমরা হয়ে ফের টাকা দেন। আর এই জন্যই তাঁকে আজকাল মোটা টাকা নিয়ে বাজারে আসতে হয়। তিনি এক বার সঙ্কোচের সঙ্গেই সুচরিতা দেবীকে বলেছিলেন, ''তা গোপাল যখন ভালই বাজার করছে তখন আর আমার বাজারে যাওয়ার দরকার কী?''

তাতে সুচরিতা দেবী চমকে উঠে চোখ বড়-বড় করে বললেন, ''বলো কী! কাজের লোকের হাতে বাজারের দায়িত্ব দিতে আছে? চুরি করে ফাঁক করে দেবে যে! বাড়ির কর্তা সঙ্গে থাকলে সেই সাহস পাবে না।''

এ কথা শুনে গজপতি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

আজও যখন কাতলা মাছের একটা টুকরো কিনতে গোপাল মাছওয়ালার সঙ্গে দরদাম নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিল, সেই সময়ে পাশের দোকানেই সুধন্য বকসি চিংড়ি মাছ কিনছিল, তাঁকে দেখে বলল, ''আরে গজপতি যে! আজকের অবাক কাণ্ডটা দেখলে নাকি!''

''কী কাণ্ড বলো তো!''

''আরে ওই যে হাড়হাভাতে বগাটা কোত্থেকে একটা ঢাউস লাট্টু নিয়ে এসেছে, সেটা ঘুরছে তো ঘুরছেই। থামছেই না। বাজারের মুখটায় লোকে ভিড় করে দেখছে। আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু।''

''অ্যাঁ!'' বলে গজপতি হাঁ হয়ে গেলেন। কারণ, কালীচরণ কয়েক দিন আগে লাট্টুটা তাঁকে বিক্রি করতে চেয়েছিল বটে! বলেছিল, লাট্টুটা এক বার ঘুরলে নাকি আর থামে না। আর ওটা নাকি অক্সিজেন জেনারেট করে। গজপতির খুব লোভ হয়েছিল বটে, মাত্র দশ টাকা দাম, কিন্তু সুচরিতার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে নেননি। ইস, মস্ত ভুল হয়ে গেছে তো! নিশ্চয়ই বগা লাট্টুটা চুরি বা ছিনতাই করেছে, নয়তো বাগিয়ে নিয়েছে!

তিনি আর দাঁড়ালেন না। হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে ভিড় ঠেলে এক বার সামনে হাজির হয়ে বাজখাঁই গলায় বললেন, ''তোকে পুলিশে দেব। এটা তো কালীচরণের লাট্টু, তুই চুরি করেছিস!''

বগা আকাশ থেকে পড়ে বলে, ''কী যে বলেন গজুবাবু, আমার সঙ্গে কি চুরি কথাটা যায়, না মানায়! এই আপনিই প্রথম বললেন, নইলে আজ অবধি কেউ বলতে পারেনি কখনও পরদ্রব্য গস্ত করেছি।''

''তা হলে তুই ওটা পেলি কোথায়?''

বগা জানে গজপতিবাবু আসলে একটি ন্যাদোস, যা বোঝানো যাবে তাই বুঝে যাবেন। তবে লোকটার এক জন খিটকেলে বন্ধু আছে, সুরেশবাবু, পুলিশের লোক। তাঁর কানে কথা উঠলে বগার কপালে কষ্ট আছে। তাই সে এক গাল হেসে বলল, ''সে আর কবেন না। কালীচরণের সঙ্গে তো আমার গলায়-গলায় ভাব কিনা। বহু কালের পুরনো দোস্তি। তাই কালীচরণ বলল, জিনিসটা বিক্রি করে কিছু টাকা তুলে দিতে, তার নাকি ঠেকা পড়েছে।''

''কালীচরণ তো আমাকে দশ টাকায় এটা বিক্রি করতে চেয়েছিল!''

বগা সঙ্গে-সঙ্গে কানে হাত দিয়ে বলল, ''আজ্ঞে অমন কথা কবেন না, শুনলেও পাপ হবে। দাম একেবারে বাঁধা, দশ হাজার। তবে আপনি নিলে কিছু কমসম করতে পারি, শত হলেও আপনি এক জন মান্যগণ্য লোক!''

চোখ কপালে তুলে গজপতি বলেন, ''বলিস কী! এ তো দিনে

ডাকাতি!''

বগা গলা নামিয়ে বলে, ''গজুবাবু, এই বেলা যদি নিতে হয় তো নিয়ে নিন, নইলে নগেন হালদার সাত হাজার টাকা কবুল করে গেছেন, বাজার সেরে ফেরার পথে নেবেন, আর তিনি এলেন বলে। সময় হয়ে গেছে।''

গজপতি মহা ফাঁপরে পড়ে খানিক ক্ষণ হাঁসফাঁস করলেন। এই অত্যাশ্চর্য জিনিসটা হাতছাড়া হলেও আফসোসের জায়গা থাকবে না। তাঁর হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল, কেন যে জিনিসটা তখনই নেননি! তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে দেখে হিসেব করে বললেন, ''আমার কাছে সাড়ে চার হাজার টাকা আছে। তার বেশি দিতে পারব না।''

বগা খুবই দুঃখী মুখ করে বলল, ''তাতে তো মজুরি পোষাচ্ছে না মশাই! কালীচরণকেই বা কী জবাবদিহি করব বলুন!''

''দিয়ে দে বাবা!'' আর হয়রান করিস না।

বগা এক মিনিট ভাবল, এই গঞ্জ জায়গায় ফস করে এত টাকা বের করে দেওয়ার মতো লোক নেই। আর পাগল ছাড়া এত দাম দিয়ে লাট্টুই বা কে কিনবে, তা সে যতই জাদুই লাট্টু হোক না কেন! তাই সে একটা নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ''আপনার মতো একজন মান্যগণ্য লোককে তো আর মুখের ওপর না করতে পারি না! দিন, ওই সাড়ে চার হাজারই দিন। মেলা লোকসান হয়ে গেল, তা কী আর করা যাবে!''

গজপতি লাট্টুটা নিয়ে মহানন্দে ভিড় কেটে বেরিয়ে আসতেই মুখোমুখি গোপাল। একটু তেরছা হাসি হেসে বলল, ''মেসোমশাই যে বাজারে একেবারে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন! লোকে তো আপনাকে দেখার জন্য ছুটে-ছুটে আসছে!''

গজপতি অবাক হয়ে বলেন, ''কেন বল তো!''

''আরে আপনি যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একটা লাট্টু কিনেছেন সেটা রটে গেছে কিনা!''

গজপতি যেটা একেবারেই পারেন না সেটা হল অভিনয়, কিন্তু বিপাকে পড়ে সেটাই করার প্রাণপণ চেষ্টা করে খুব বিস্ময়ের গলায় বললেন, ''লাট্টু! লাট্টু কিনতে যাব কোন দুঃখে! তাও আবার পাঁচ হাজার টাকায়! আমার কি মাথার গন্ডগোল হয়েছে নাকি? আর লাট্টুর কথা উঠছেই বা কেন বল তো! আমার কি এখন লাট্টু ঘোরানোর বয়স!''

''আজ্ঞে, কথাটা আমি তুলিনি, মানুষজন বলাবলি করছে আর কী!''

''লোকের কথা বাদ দে তো। লোকে গুজব ছড়াতে বেজায় ভালবাসে কিনা। কিসের লাট্টু, কোথাকার লাট্টু, কেমন লাট্টু কে জানে বাপু!''

''তা হলে মাসিমাকে কী বলা যাবে বলুন তো! পাঁচ জনে যখন বলছে তখন কথাটা তো আর চাপা থাকবে না, মাসিমার কানেও তো উঠবে নিশ্চয়ই!''

বেজার মুখে গজপতি একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট গোপালের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, ''একটু সামলে নিস বাবা!''

''সে আর বলতে! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।''

''আর একটা কথা।''

''কী মেসোমশাই?''

''ওটা পাঁচ নয় কিন্তু, সাড়ে চার। আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়, বুঝলি!''

''যে আজ্ঞে, তা হলে মাসিমাকে কি ওই সাড়ে চারই বলব? পাঁচের জায়গায় সাড়ে চার তো বেশ সস্তাই হয়েছে মনে হয়, বলতে গেলে জলের দর, মাসিমা শুনলে বোধ হয় খুশিই হবেন।''

''ওরে না না, ও কাজও করিসনি!''

''ঠিক আছে মেসোমশাই, আপনি ও সব নিয়ে ভাববেন না। তবে আমার মাথার চুলগুলো দেখছেন তো! তিন মাস কাটা হয়নি। মাথায় যেন পাখির বাসা! গোটা তিরিশেক টাকা হলে নেপালের সেলুন থেকে একটা ছাঁট দিয়ে আসতুম।''

গেল আরও তিরিশ টাকা। আজকাল গজপতির দীর্ঘশ্বাসের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতে হবে যে, লাট্টুটা বরাতজোরে হস্তগত করতে পেরেছেন। কিছু টাকা গেল অবশ্য, সেটা খুব কম টাকাও নয়, কিন্তু লাট্টুটা তো উদ্ধার হয়েছে! সাড়ে চার হাজার টাকায় লাট্টু কেনাটা পাগলের কাণ্ড বলে মনে হবে ঠিকই, কিন্তু লোকে কি আর এই জিনিসের মর্ম বুঝবে!

সুচরিতা দেবী তৈরিই ছিলেন। পাঁচ হাজার টাকায় লাট্টু কেনার গল্পটা লতায়-পাতায় পল্লবিত হয়ে দশ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। আর শহরে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে সুচরিতা দেবীর কানে পৌঁছে দেওয়ার লোকের অভাব হয়নি। বনবিহারী দত্তর বাড়ির কাজের মেয়ে বাতাসী এসে বলে গেল, ''কী কাণ্ড রে বাবা, কী কাণ্ড! চার দিকে যে হুলস্থুল পড়ে গেছে! ও মাসিমা, এই বাড়ির কর্তাকে শিগগির মাথার ডাক্তার দেখাও! উনি যে আজ দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা লাট্টু কিনেছেন!''

'দশ হাজার টাকার লাট্টু' শুনে সুচরিতা দেবীর মূর্ছামতো হয়েছিল। চোখে অন্ধকার দেখছিলেন। তবে গজপতিকে হাড়ে-হাড়ে চেনেন বলে কোনও রকমে সামলেও উঠেছেন।

সুচরিতা দেবী বুঝে গেছেন, গজপতির সঙ্গে ঘর করতে হলে তাঁর নিজেরও মাথার ডাক্তার দেখানো উচিত। পাগল হতে তাঁরও বেশি বাকি নেই। তিনি কোমরে হাত দিয়ে রণং দেহি মূর্তিতে বাগানেই পায়চারি করছিলেন। এক বার আসুক লোকটা, ঝেড়ে কাপড় পরাবেন!

দূর থেকে সুচরিতা দেবীকে দেখতে পেয়েই গজপতি সুট করে গোপালের পিছনে গা-ঢাকা দিয়ে ফেললেন। ফিসফিস করে বললেন, ''তুই এগিয়ে যা, কী কী বলবি সব ঠিক করে রেখেছিস তো!''

গোপাল নির্বিকার গলায় বলে, ''ও সব তো আমার নামতার মতো মুখস্থ।''

দূর থেকে গোপালকে দেখেই সুচরিতা দেবী চেঁচিয়ে উঠলেন, ''তোর গুণধর মেসোমশাইটি কোথায় শুনি!''

গোপাল এক গাল হেসে বলে, ''না মাসিমা, আপনি যা ভাবছেন তা কিন্তু নয়।''

''কী ভাবছি তা তোর কাছ থেকে জানতে হবে নাকি! তুই কি অন্তর্যামী?''

''আপনি ভাবছেন তো যে, মেসোমশাই লাট্টুটা দশ হাজার টাকায় কিনেছেন! কিন্তু শুনলে আপনি খুশিই হবেন যে, মেসোমশাই মোটেই দশ হাজার টাকায় লাট্টুটা কেনেননি। লোকটা ঝুলোঝুলি করছিল বটে কিন্তু মেসোমশাই জলের দরে মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকায় কিনেছেন।''

''মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা! সেটা তোর কাছে জলের দর বলে মনে হচ্ছে? একটা লাট্টুর দাম সাড়ে চার হাজার টাকা তোর কাছে মাত্র বলে মনে হচ্ছে? টাকা কি খোলামকুচি?''

''আহা মাসিমা, দশ হাজার টাকার সঙ্গে তুলনা করে দেখুন সস্তা হচ্ছে কি না।''

''আমি কিছু শুনতে চাই না, লোকটা কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে বল!''

গোপাল দু'হাতে বাজারের ব্যাগসমেত বেশ একটা আড়াল করে রেখেছিল গজপতিকে, এ বার সে চট করে সরে দাঁড়ানোয় গজপতি প্রকট হয়ে পড়লেন। সরে দাঁড়িয়ে গোপাল অবাক ভাব করে বলে, ''গা ঢাকা দেবেন কেন মাসিমা? এই তো মেসোমশাই! উনিই তো আমাকে পিছন থেকে পাহারা দিতে-দিতে নিয়ে এলেন বাড়ি পর্যন্ত! যা-ই বলুন, খুব হুঁশিয়ার মানুষ কিন্তু।''

সুচরিতা দেবী চোখ কপালে তুলে বললেন, ''হুঁশিয়ার মানুষ! দেখাচ্ছি মজা হুঁশিয়ার মানুষকে তোর!''

এর পরের আধ ঘণ্টা গজপতির কেমন কেটেছিল, তা সবাই সহজেই অনুমান করতে পারবেন ভেবে আমরা আর ইতিবৃত্তান্তে গেলাম না। তবে আধ ঘণ্টা বাদে আমরা এক জন বিধ্বস্ত, অপমানিত, পরাজিত, পর্যুদস্ত, অবিন্যস্ত, অপ্রতিভ, ম্লান ও মলিন গজপতিকে তাঁর ঘরে চেয়ার বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। হাতে সেই বিখ্যাত লাট্টু, যা সাড়ে চার হাজার টাকায় বগার কাছ থেকে কিনেছেন তিনি। সুচরিতা

দেবী লাট্টুটা উনুনে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাড়িতে এখন আর কয়লার উনুন নেই বলে দিতে পারেননি। লাট্টুটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে গজপতি বিড়বিড় করে শেক্সপিয়র আওড়াচ্ছিলেন, ‘‘ইট ইজ় দ্য কজ়, ইট ইজ় দ্য কজ়, মাই সোল...’’-

তবে হ্যাঁ, এই সব ছোটখাটো অপমান, বিদ্রুপ, তিরস্কার, লাভ-লোকসান তাঁকে খুব একটা বিচলিত করছিল না। এ সব গায়ে না-মাখলেও চলে। এরা তো জানে না যে, তিনি একটা অদ্ভুত রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করছেন! আর এই সামান্য জিনিসগুলো মোটেই সামান্য বা তুচ্ছ নয়। প্রত্যেকটাই বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার! জানাজানি হলে এ সব জিনিসের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। চাই কী লোভী লোকেরা পিছনে লোকও লাগাতে পারে। আর সেই জন্যই তিনি উত্তেজনা এবং আশঙ্কা বোধ করছেন। এগুলো কার আবিষ্কার তিনি জানেন না, কী করে এক জন গরিব আর মুখ্যুসুখ্যু ফেরিওয়ালার কাছে এল সেটাও রহস্য। ব্যাপারটা সামান্য ঘটনা নয়, রীতিমতো রোমহর্ষক! কারও সঙ্গে কথাটা শেয়ার করা দরকার, কিন্তু তেমন বিশ্বাসযোগ্য লোক কোথায়! বিশ্বাসযোগ্য হয়তো আছেও, কিন্তু সে বিজ্ঞানী না হলে হবে না। জিনিসগুলো খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখতে হবে, লোক জানাজানি হতে দেওয়া যাবে না।

উত্তেজনা বোধ করায় তিনি উঠে কিছু ক্ষণ ঘরে পায়চারি করে দেখলেন। না, এই শীতেও তাঁর বেশ ঘাম হচ্ছে, অর্থাৎ উত্তেজনাটা প্রশমিত হচ্ছে না। গোপন করার এই টেনশন তাঁর সহ্য হচ্ছে না।

সন্ধেবেলা দাবা খেলতে বসে সুরেশবাবু বললেন, ‘‘তোমার বৌ তো তোমাকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে চাইছেন হে!’’

শুনে গজপতি নির্বিকার মুখে বললেন, ‘‘সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে আমার আপত্তি নেই। যদি তিনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন।’’

‘‘তার মানে?’’

‘‘নিউটনের থার্ড ল কি তুমি ডিফাই করতে পারো!’’

‘‘না, পারি না। কিন্তু তার সঙ্গে সাইকিয়াট্রিস্টের সম্পর্ক কী?’’

‘‘সাইকিয়াট্রিস্ট কি পারবেন?’’

‘‘তা কী করে পারবেন!’’

‘‘তা হলে তাঁর কাছে গিয়ে লাভ নেই।’’

‘‘কী মাথামুন্ডু বলতে চাইছ তা একটু খোলসা করে বলো তো!’’

‘‘বললেও তুমি বুঝবে না। চিরকাল পুলিশের চাকরি করে এসেছ, বিজ্ঞানের বিষয় তুমি কি বুঝবে?’’

‘‘বিজ্ঞানের বিষয়! তুমি কি বলতে চাও, সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে একটা লাট্টু কেনা কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয়?’’

‘‘ঠিক তাই বলতে চাইছি। সাড়ে চার হাজার তো কিছুই না। আসলে ওর কোনও দামই যথেষ্ট নয়।’’

‘‘দেখো গজপতি, বেকুবের মতো একটা কাজ করে ফেলেছ, সে না হয় হল। যা গেছে তা গেছে। কিন্তু সেটাকে জাস্টিফাই করার জন্য এখন আবোলতাবোল বললে তো হবে না! আমি বগাকে অ্যারেস্ট করার কথা ওসিকে বলেছি। টাকাটা উদ্ধার হওয়া দরকার।’’

‘‘বগাকে অ্যারেস্ট করা হলে আমার আপত্তি নেই। কারণ সে চোর। জিনিসটা তার নয়। তবে জিনিসটার মহিমা বুঝলে সে আরও অনেক বেশি টাকা রোজগার করতে পারত। ভাগ্যিস সে মহিমাটা বুঝতে পারেনি, পারলে আমি লাট্টুটা এত সহজে হাত করতে পারতাম না।’’

সুরেশ চোখ কপালে তুলে বলেন, ‘‘এটাকে সহজে হাত করা বলে নাকি! সাড়ে চার হাজার টাকা গুনাগার দিয়ে একটা সামান্য লাট্টু কেনা কি সহজে হাত করা হল?’’

গজপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ‘‘একটা কথা বলবে সুরেশ?’’

‘‘কী কথা!’’

‘‘তোমাকে বিশ্বাস করা চলে কি?’’

‘‘তার মানে! তুমি আমাকে না হোক তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে চেনো, কখনও অবিশ্বাস করার মতো কিছু দেখেছ কি!’’

‘‘তা দেখিনি। কিন্তু আমাকে পাগলা-গারদে পাঠানোর ব্যাপারে তোমার এত উৎসাহ দেখে ভয় হচ্ছে, আমার ওপর তোমার হয়তো কোনও আস্থাই নেই। একটু আগেই তুমি বললে, আমি নাকি আবোলতাবোল বকছি!’’

সুরেশবাবু একটু গুম হয়ে রইলেন, তার পর হঠাৎ সহজ হয়ে বললেন, ‘‘কোনও আষাঢ়ে গল্প যদি না হয় তা হলে আমাকে বলতে পারো।’’

‘‘এটা কোনও গল্পটল্প নয়, তবে আষাঢ়ে কি না তা ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে। তোমাকে বলে লাভ নেই, কারণ তুমি বিজ্ঞান জানো না। প্রত্যেক মানুষেরই বেসিক বিজ্ঞান খানিকটা জানা উচিত।’’

‘‘সেটা কি আমি জানি না বলে তোমার মনে হয়?’’

‘‘জানলে আমার বৌয়ের কথায় নেচে উঠতে না, আর আমাকে পাগল বলেও সন্দেহ করতে না!’’

‘‘আহা, চটে যাচ্ছ কেন? সবটা খুলে না-বললে সন্দেহ তো হতেই পারে।’’

‘‘মুখে বলে কোনও লাভ নেই। তোমাকে একটা ডেমো দেখাতে চাই। কিন্তু তার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে যে, যা দেখেছ তা কারও কাছে প্রকাশ করতে পারবে না! আর সেটা তোমার এবং আমার ভালর জন্যই। তবে লাট্টুটার কথা মানুষ খানিকটা জেনে গেছে এবং তাতে অনেকটাই ড্যামেজ হয়েছে। এ সব কথা ছড়িয়ে পড়লে শকুনেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে কিনা!’’

‘‘ঠিক আছে। কথা দিলাম।’’

‘‘তা হলে টেবিল থেকে দাবার বোর্ড সরাও, আর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসো।’’

সুরেশবাবু তা-ই করলেন। গজপতি গম্ভীর মুখে পকেট থেকে বড়সড় লাট্টুটা বের করে অত্যন্ত তৎপরতায় সেটা টেবিলের উপর দু’আঙুলে টুসকি মেরে ঘুরিয়ে দিলেন। লাট্টুটা এক বার একটু কাত হয়েই সোজা দাঁড়িয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে ঘুরতে লাগল। দুরন্ত গতি, হেলদোল নেই, প্রতিসরণ নেই। যেন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরছে তো ঘুরছেই।

একটু পরে গজপতি বলেন, ‘‘লক্ষ করে দেখো, লাট্টুটা নিউটনের থার্ড ল ভায়োলেট করছে। বস্তুর যে-কোনও মোশনই নিয়ন্ত্রণ করে সারফেস এবং অ্যাটমস্ফিয়ারের বায়ু। তারা মোশনকে ইকুয়াল অ্যান্টিফোর্সে আটকায়। তাই স্বাভাবিক নিয়মে লাট্টুটার দম এত ক্ষণে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না।’’

‘‘ভিতরে কোনও মেকানিজ়ম নেই তো! ধরো ব্যাটারি বা ডায়নামো কিংবা মাইক্রোচিপ। এমনকি রিমোট কন্ট্রোলও তো হতে পারে!’’

‘‘পারে এবং সেই রকম কিছু আছেও। তবে তুমি যে নামগুলো বললে সে রকম কিছু নয়। অন্য কিছু, আমার জানার মধ্যে নয়।’’

‘‘আহা, এক্স রে করে দেখলেই তো হয়।’’

‘‘ঠিক বলেছ। আজ দুপুরবেলা আমি মোহনদাস এক্স রে ক্লিনিকে গিয়েও ছিলাম। লাট্টুর এক্স রে করাতে চাই শুনে লোকটা ঠিক তোমার মতোই, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে সন্দিহান হয়ে অনেক ক্ষণ আমাকে নিরীক্ষণ করেছিল। তার পর অবশ্য ন্যায্য পয়সা পেয়ে এক্স রে করেও দেয়। কিন্তু ওখানেই রহস্য। এক্স রে লাট্টুটার বডি পেনিট্রেট করতে পারেনি।’’

‘‘তার মানে!’’

‘‘যা বলছি ঠিক তাই। এক্স রে-র সারফেস থেকে বাউন্স করেছে, ভিতরে ঢুকতে পারেনি। মোহনদাসের রেডিয়োলজিস্ট নিজেও ভারী অবাক হয়ে বলল, এ রকম হওয়ার কথাই নয়। সে নিজের কৌতূহল মেটাতে আরও বার চারেক চেষ্টা করে দেখেছে। হয়নি। এই দেখো, এক্স রে প্লেট আমি সঙ্গে করেই এনেছি,’’ বলে চাদরের তলা থেকে একটা

বড়সড় চৌকো খাম, যে রকম খামে সাধারণত এক্স রে প্লেট থাকে, বের করে দিলেন গজপতি।

সুরেশ মন দিয়ে প্লেটগুলো দেখলেন। রিপোর্টেও এই কথাটাই লেখা আছে যে, এক্স রে ফেল করেছে।

সুরেশ ভ্রু কুঁচকে বললেন, ''এর মানে কী গজপতি?''

''এর মানে জানলে আর পাগলের বদনাম নিয়ে বেঁচে থাকতে হত নাকি আমাকে! তবে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এগুলো কোনও এক জন বিজ্ঞানবিদের আবিষ্কার। তবে এলেবেলে বিজ্ঞানী নয়। সাংঘাতিক কেউ। এবং সেই বিজ্ঞানী হয়তো আমাদের কিছু জানাতে চায়।''

''কী করে বুঝলে?''

''তার আগে লাট্টুটাকে ভাল করে দেখো। তোমার টেবিলে টেবিলক্লথ পাতা আছে, ফলে লাট্টুটাকে অনেক বেশি ফ্রিকশন সহ্য করতে হচ্ছে, তবু স্পিড এতটুকু কমছে না। তার ওপর বাতাসের ফ্রিকশন তো আছেই। ফেরিওয়ালাটা আমাকে বলেছিল, লাট্টুটা অক্সিজেন জেনারেট করে।''

''ফেরিওয়ালাটা তো ফেরেববাজ!''

''ওই অ্যাটিচুডের জন্যই তুমি ডিফিকাল্ট! যখন-তখন তোমার ভিতরকার পুলিশটা মাথাচাড়া দেয়। ফেরিওয়ালাটা মোটেই ফেরেববাজ নয়। হলেও সে আমার সঙ্গে অন্তত কোনও ফেরেব্বাজি করেনি। বরং তার কিছু আচরণ দেখে আমার মনে হয়েছে, সে খুব সাধারণ বা এলেবেলে লোক নয়। আবার বলছি, সে ভাল লোক না-ও হতে পারে, কিন্তু এলেবেলে লোক নয়। প্রমাণ চেয়ো না, ওটা এখনই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।''

''কিন্তু সে তোমার কাছে এই যে জিনিসটা দিয়ে গেছে, এটা সে পেল কোথায়? সে এটা আবিষ্কার করেনি নিশ্চয়ই! তা হলে এটা অবশ্যই চুরির মাল!''

''সুরেশ, একটু মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখো, এই লাট্টুটা ছাড়াও সে আমাকে আরও দুটো জিনিস দিয়ে গেছে। একটা হুইস্‌ল...''

''যেটা বাজে না?''

''আর একটা টর্চ...''

''যেটা জ্বলে না?''

''ঠিক তাই। কারণ ওগুলো আসলে হুইস্‌লও নয়, টর্চও নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজের জিনিস।''

''কী কাজ বলো তো!''

''হুইস্‌লটা কীট-পতঙ্গ, মশা-মাছিকে রিপাল্স করতে পারে বলে আমার ধারণা হয়েছে। আর টর্চটা পৃথিবীর দূষণ কমিয়ে দিতে পারে।''

''বলো কী? এত বড় আবিষ্কার হয়ে গেল, আর আমরা টেরও পেলাম না!''

গজপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ''তোমাকে বলে ফেলে ভাল করলাম কি না জানি না, তুমি হয়তো ঘটনাটা সিরিয়াসলি নিলেও না। তোমার মুখে-চোখে একটা ঠাট্টা-তামাশার ভাবই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তোমাকে তো ভূতের গল্প বলছি না, সায়েন্সের কথাই বলছি। এই জিনিসগুলো আমার কাছে থাকায় আমি খুব টেনশনে আছি বলেই তোমাকে বলে ফেললাম, কারও সঙ্গে শেয়ার করলে একটু হালকা লাগবে বলে। কিন্তু তুমি তো দেখছি এখনও তোমার লঘুচিত্ততা থেকেই বেরোতে পারোনি!''

সুরেশ একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বললেন, ''শোনো গজপতি, তোমার লাট্টুটা দেখে আমি যথেষ্ট ইমপ্রেস্‌ড হয়েছি। তবে কথা আছে। ইন ফ্যাক্ট, আমার এখনও ধারণা, ওটা রিমোট কন্ট্রোলে চালানো হচ্ছে, আর ওটার পিছনে কোনও দুষ্টচক্র কাজ করছে। আজকাল অ্যান্টিসোশ্যালদের কাছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সবার আগে পৌঁছে যায়। আর আমার এমনও মনে হচ্ছে যে, এই লাট্টুটা হয়তো আমাদের কথা চুরি করে অন্য কারও কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এর মধ্যে যে মাইক্রোফোন নেই তা কি তুমি হলফ করে বলতে পারো?''

‘‘না, তা পারি না। তবে আমি এক জন রিটায়ার্ড সায়েন্টিস্ট, আর তুমি এক জন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার, আমাদের কাছে চুরি করার মতো কী তথ্য থাকতে পারে বলো তো! আমরা তো এখন নিতান্তই নিরীহ এবং গোবেচারা দুই নাগরিক! আমাদের মতো অকাজের লোকের পিছনে কেন কেউ এত মেহনত করতে যাবে? ওই যা বললাম, তোমার মুশকিল হল, তুমি যে একদা পুলিশ ছিলে সেটা ভুলতে পারছ না।’’

‘‘পুলিশের ওপর তোমার এত রাগ কেন?’’

‘‘বিন্দুমাত্র রাগ নেই। বরং এখন আমার এক জন বিচক্ষণ, গোয়েন্দার মতো মস্তিষ্কওয়ালা মানুষেরই সাহায্য বিশেষ ভাবে দরকার, যে ঠান্ডা মাথায় লজিক্যাল ডিডাকশন করতে পারবে। কিন্তু তুমি চিন্তাভাবনার চেয়ে এক লাফে কনক্লুশনে পৌঁছনোয় বেশি আগ্রহী। তুমি অ্যাকশন চাও, ধরপাকড় চাও, এক্ষুনি কিছু একটা সমাধান করে ফেলতে চাও। উত্তেজিত মস্তিষ্ক এবং বৃথা আড়ম্বরযুক্ত চিন্তা— দু’টিই অসিদ্ধির লক্ষণ। তোমার আর একটা দোষ হল, তুমি আমার বৌ বা পাড়াপড়শির কথাকে যতটা গুরুত্ব দিচ্ছ তার কণামাত্র গুরুত্ব আমার কথাকে দিচ্ছ না। তাই ভাবছি, তোমাকে এ সব কথা বলা ঠিক হল কি না।’’

সুরেশবাবু একটু অবাক হয়ে বলেন, ‘‘গজপতি, তুমি যে আমাকে রীতিমতো হুমকি দিচ্ছ হে! আমার বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর কি তোমার একেবারেই আস্থা নেই? আমার তো মনে হয়, ফেরিওয়ালাটাকে অ্যারেস্ট করলেই সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ সব চিনে জিনিস ও-ই স্মাগল করে এনেছে।’’

‘‘তাই তো বলছি, তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলে কোনও লাভ নেই, তুমি বুঝবে না। কারণ বিজ্ঞান বিষয়ে তোমার জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ। তার চেয়েও সীমাবদ্ধ তোমার বোধ-বিবেচনা।’’

সুরেশবাবু রাগলেন না, তবে একটু গুম হয়ে থেকে বললেন, ‘‘তুমি কি বলতে চাও যে, এই লাট্টুটা বিজ্ঞানের কোনও বিস্ময়কর আবিষ্কার?’’

‘‘শুধু বিস্ময়কর বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। আসলে এ রকম কিছু তৈরি করা আমাদের বিজ্ঞানে সম্ভবই নয়।’’

‘‘তা হলে এটা তৈরি হয়েছে কী করে?’’

‘‘সেইটেই রহস্য। এবং গভীর চিন্তার বিষয়। এটা চিনে তৈরি কোনও খেলনা নয়, কোনও ম্যাজিক আইটেম নয়। এ রকম জিনিস যে আবিষ্কার করেছে তার উচিত ছিল জিনিসগুলোর পেটেন্ট নেওয়া, এবং আবিষ্কারটা ঘোষণা করা। তাতে সে কোটি-কোটি টাকা রোজগার করতে পারে এমনকি, নোবেল প্রাইজ় পেতে পারে। কিন্তু তা সে করছে না।’’

সুরেশ অবাক হয়ে বলেন, ‘‘বলো কী হে! হুইস্‌ল, টর্চ আর লাট্টু আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ়!’’

‘‘আমার মনে হয় তার চেয়েও বড় সম্মান তার প্রাপ্য।’’

‘‘কী বলতে চাইছ বলো তো!’’

‘‘আমার কথা তোমার বোধগম্য হবে না। আমি খুব উদ্বিগ্ন। শুধু দোহাই তোমার, দয়া করে ফেরিওয়ালাটাকে অ্যারেস্ট করাতে যেয়ো না।’’

‘‘অ্যারেস্ট করালে ক্ষতি কী?’’

‘‘ফেরিওয়ালাটা কোনও অপরাধ করেনি। বরং মনে হয়, লোকটা কারও বার্তাবহ।’’

‘‘অপরাধ করেনি মানে? আমার তো মনে হচ্ছে জিনিসগুলো ও চুরি করে এনেছে।’’

‘‘যদি চুরিই করে থাকে তা হলেও কোনও প্রমাণ নেই, কেউ তো ওর নামে নালিশ করেনি! আর যারটা চুরি করেছে তার কাছে ফরমুলা এবং নো হাউ দুটোই আছে, সে দরকার মতো আবার এ রকম সব জিনিস তৈরি করতে পারবে।’’

‘‘তুমি যে আমাকে ভাবিয়ে তুললে হে!’’

‘‘যদি সেটা পেরে থাকি তবে সেটা আমার সৌভাগ্য। ধুমধাড়াক্কা অ্যাকশনের চেয়ে চুপ করে বসে নিবিষ্ট হয়ে পূর্বাপর ভাবা এবং চিন্তার সূত্র ধরে এগোনোটাই এখন দরকার। ভাবো সুরেশ, ভাবো। ভাবতে শেখো। অ্যাকশন শুধু হাত-পায়ের কাজ নয়, মগজেরও কিন্তু অ্যাকশন আছে, আর সেটা অনেক বেশি ফলপ্রসূ।’’

সুরেশ নিবিষ্ট হয়ে লাট্টুটাকে দেখছিলেন। মৃদু একটা বোঁ বোঁ শব্দ করে লাট্টুটা ঠিক একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একই দমে ঘুরে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। দম ফুরোনোর কোনও লক্ষণই নেই। বিস্ময়কর বটে, তবে আজকাল তো নানা ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বেরিয়েছে, সুরেশ তাই খুব বেশি বিস্মিত হতেও পারছেন না। একটু বেজার মুখ করে বললেন, ‘‘এসব কি সায়েন্স ফিকশনের জিনিস?’’

‘‘যা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ তাকে ফিকশন বলি কেমন করে! তবে হ্যাঁ, মিস্টিরিয়াস অবশ্যই। আমি রিটায়ার করেছি বটে, কিন্তু নিয়মিত সায়েন্স জার্নালগুলো পড়ি। ইন্টারনেট থেকে পয়সা খরচ করে ডাউনলোড করি, হালফিল বিজ্ঞানের খবর রাখার জন্য। আমি জানি এ রকম কোনও জিনিস আবিষ্কার হয়নি। তাই আমি তোমার সাহায্য চাই সুরেশ।’’

‘‘কী রকম সাহায্য?’’

‘‘আমার মনে হয়, কালীচরণ কোনও কারণে আমার হেফাজতেই জিনিসগুলো রাখতে চেয়েছিল। হুইস্‌ল আর টর্চটা আমি রেখেওছিলাম। কিন্তু লাট্টুটা নিইনি। গিন্নির ভয়ে। কিন্তু তা বলে সে বগার মতো একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোককে লাট্টুটা কেন দিয়ে গেল সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার মন বলছে, ফেরিওয়ালাটা কোনও দায়ে পড়ে বা বিপদের গন্ধ পেয়ে তাড়াহুড়ো করে জিনিসটা সরিয়ে ফেলতে এ কাজ করেছে, তবে তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। লাট্টুটার কথা অনেক লোক জেনে গেছে।’’

‘‘শোনো, বগাকে আমি ইতিমধ্যেই অ্যারেস্ট করিয়েছিলাম। জেরা করে জেনেছি যে, ফেরিওয়ালাটা কুমোরপাড়ার নন্দবাবুকে ওটা গছিয়ে গিয়েছিল। নন্দবাবু ওটা ফেরত দেন। তার পর ফেরিওয়ালা ওটা বগাকে দিয়ে যায়।’’

‘‘কিন্তু কেন? এ রকম অমূল্য একটা জিনিস সে নন্দবাবুকেই বা কেন গছাতে গেল কিংবা বগাকেই বা কেন দিয়ে গেল!’’

‘‘এর জবাব খুব সোজা। চোরাই জিনিস সহ ধরা পড়লে বিপদ হবে জেনে সে ওগুলো যাকে হাতের কাছে পেয়েছে তার কাছেই পাচার করেছে।’’

‘‘হয়তো অনেকটা ও রকমই। কালীচরণ ভয় পেয়েছে বলেই এই কাণ্ড করেছে।’’

॥ ৫ ॥

হিমশীতল, নিস্তব্ধ, অন্ধকার এক শেষ রাত্তিরে এক আশ্চর্য স্টেশনে নামল শ্যাডো। খোলা প্ল্যাটফর্ম ঘন কুয়াশায় ডুবে আছে। আবছা আলোয় চার দিকটা কেমন ভূতুড়ে! যেন পরাবাস্তব, যেন স্বপ্নদৃশ্য, যেন রূপকথার দেশ। আর অনেক দিন পর বাতাসে উদ্ভিদের গন্ধ পেল সে, যে গন্ধ কলকাতায় পাওয়াই যায় না। ছায়া-ছায়া, কোলকুঁজো দু’-এক জন মানুষকে আবছা দেখতে পাওয়া গেল। একটু দূরে গরম চা ফিরি করছে চাওয়ালা। তাকে দেখা যাচ্ছে না। আর প্রবল শীত টের পেল সে। কাঁপুনি ওঠার মতো শীত। শ্যাডোর গায়ে মাত্র একটা পুরনো পুলওভার। লাগেজ ভারী হবে বলে বেশি গরম জামা আনেওনি সে। তবে একটা জ্যাকেট থাকলে ভাল হত।

কোন দিকে যেতে হবে তা বুঝতে পারছিল না শ্যাডো। থমকে দাঁড়িয়ে নিরেট কুয়াশা ভেদ করে চার দিকটা অনুমান করার চেষ্টা করছিল। এমন সময়ে হঠাৎ আবছা মতো এক জন তার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মৃদু স্বরে বলে গেল, ‘‘বাঁ দিকে ওভারব্রিজ।’’

শ্যাডো চমকায় না। তার বিস্ময় খুব কম।

তাড়া নেই। ধীরে-সুস্থে গন্তব্যের সন্ধান করা যাবে। তার চা বা কফির নেশা নেই। কিন্তু এই প্রচণ্ড শীতে গরম কিছু হলে ভাল

লাগবে হয়তো। বাঁ দিকেই এগিয়ে গেল সে এবং একটু এগিয়েই প্ল্যাটফর্মের মাঝমধ্যিখানে একটা চায়ের দোকান পেয়ে গেল। চায়ের মাঝবয়সি দোকানির শীতবস্ত্রের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। একটা ঝ্যালঝ্যালে ফুলহাতা সোয়েটার, কানঢাকা একটা টুপি, গলায় জড়ানো একটা গামছা।

''চা পাওয়া যাবে?''

''জরুর!''

''ভাঁড়ে হবে তো?''

''হোবে। লিকার, না দুধ চিনি?''

''দুধ চিনি।''

লোকটা বেশ যত্ন করে চা বানিয়ে দিল। দু'হাতে গরম ভাঁড়টা ধরেই একটু আরাম পেল শ্যাডো। ফাঁকা একটা বেঞ্চে বসতেই টের পেল ঠান্ডা এবং হিমে বেঞ্চটা সপসপে ভেজা। প্যান্টটা ভিজে গেল। কী আর করা যাবে। তবে চা-টা খেতে বেশ ভালই লাগছিল তার। এই শীতে গরম যা-কিছুই উপাদেয়। যে লোকটা তাকে ওভারব্রিজ কোন দিকে জানিয়ে দিয়ে চলে গেল সে কে হতে পারে তা আন্দাজ করতে অসুবিধে নেই। কামরার সেই বেঁটেমতো লোকটাই হবে। এবং সে অবশ্যই আবু এবং হরিশের লোক। অবজার্ভার। পিছনে এই স্পাই লাগানোয় সে এখন বেশ অসন্তুষ্ট বোধ করছে। এটা বাড়াবাড়ি।

আজকের দিনটা তার কাছে ভয়াবহ। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যেই তার বাবার অপারেশনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে। তার বাবা বিনয় সেনগুপ্তর বেশ মোটা, সযত্নে চর্চিত গোঁফ আছে। আজ সেই গোঁফ, সামান্য কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথার কোঁকড়া চুল, কানের লোম সব চেঁছে ফেলা হবে। হয়তো ভুরু দুটোও। অন্তত সেই রকমই তাকে বলেছিলেন নার্স। তার পর ওটি। অ্যান্টিসেপ্টিকের প্রলেপ। তার পর অ্যানাস্থেসিয়া। তার পর? ভাবতে এখনই নার্ভাস লাগছে। বাবা বেঁচে যাবে তো!

ট্রেনটা নিঃশব্দে কখন চলে গেছে, টের পায়নি শ্যাডো। হাতের শূন্য ভাঁড়টা ফাঁকা রেললাইনে ছুড়ে ফেলল সে।

ওভারব্রিজ পেরিয়ে ধীর পায়ে স্টেশনের বাইরে এল শ্যাডো। ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে এক অলৌকিক ভোরের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিছু দোকানপাট, কিছু মানুষজন, রিকশা, উনুনের ধোঁয়া, পোড়া কয়লার গন্ধ। একটা শান্ত, নিরুদ্বেগ, নিরীহ শহর। এ সব জায়গায় ঘটনা ঘটে খুব কম। সানসেট নামে একটা হোটেলের কথা তাকে বলে দেওয়া আছে। এ সব একটা সেটিংয়েরই অংশ, জিগ শ পাজ়লের একটা খণ্ড। সে নিজেও তাই। কিন্তু তাতে তার কোনও উদ্বেগ বা ভয় নেই। যা হওয়ার হবে।

যা হওয়ার হবে, এই কথাটা সে যদি নিজের বাবার সম্পর্কেও ভাবতে পারত তা হলে হয়তো ভাল হত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। বাবাকে বাঁচাতেই হবে। শুধু বাবাকে বাঁচানোর জন্যই তো সে এত দূর এসেছে! আরও বহু দূর যেতে প্রস্তুত।

একটা রিকশায় উঠতে গিয়েও থমকাল শ্যাডো। রাস্তার ধারে একটা মলিন, ছোটখাটো মন্দির, উপরে একটা বিবর্ণ ধ্বজা উত্তুরে হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছে। মন্দিরে দরজা হাট করে খোলা, ভিতরে একটা পাথরের আসনে মলিন একটা বিগ্রহ, তাতে বিস্তর সিঁদুরটিদুর মাখানো। কিন্তু কোন দেবতার বিগ্রহ তা বোঝার উপায় নেই। সে ঘোর নাস্তিক বটে, কিন্তু হঠাৎ বাবার জন্য ভগবানকে ডাকার একটা ক্ষণস্থায়ী ইচ্ছে হল। পর মুহূর্তেই অবশ্য নিজেকে সংবরণ করে নিল সে। রিকশায় উঠতে যেতেই রোগা চেহারার ছোকরা রিকশাওয়ালা বলল, ''খুব জাগ্রত দেবতা স্যর, মহাবীর বজরঙ্গবলী।''

''তাই নাকি?'' বলে একটু আনমনা হয়ে গেল সে। বাবার অপারেশনের সময় এগিয়ে আসছে। কী হবে কে জানে।

সানসেট হোটেলটা বেশ সাদামাটা, একেবারে রাস্তার উপর তিন তলা হলুদ রঙের বাড়ি। জাঁকজমক নেই। রিসেপশনে তাকে আইডেন্টিটি হিসেবে আধার কার্ড দেখাতে হল। অর্থাৎ সে একটা ক্লু রেখে যাচ্ছে। খুনটা হলে পুলিশ তাকে খুঁজে পেতে অসুবিধেয় পড়বে না। কিন্তু তাতে শ্যাডোর মাথাব্যথা নেই। যাবজ্জীবন বা ফাঁসি, যাই হোক, তার কিছু আসে যায় না।

দোতলায় একটা কোণের ঘর পেয়ে গেল সে। আর ঠিক সাতটায় আবুর ফোন এল।

''আর ইউ ওকে?''

''আই অ্যাম ফাইন।''

''আজ তোমার বাবার অপারেশন, আমরা জানি। টেক রেস্ট টুডে। আর যার ছবি আর রেজ়ুমে তোমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয়েছে তাকে ভাল করে স্টাডি করো। প্লিজ়, নো মিস্টেক।''

''তোমরা কি আমার পিছনে কাউকে লাগিয়েছ আবু!''

''হ্যাঁ। ইট ইজ় দ্য গোল্ডেন রুল। বাট হি উইল নট বদার ইউ, খুব ইমার্জেন্সি কিছু হলে হি উইল কাম টু ইয়োর হেল্প। নইলে ও আড়ালে থাকবে। জাস্ট ফরগেট হিম।''

শ্যাডো নির্বিকার গলায় বলে, ''ঠিক আছে। তবে গায়ে পড়া লোক আমি পছন্দ করি না, এটা তাকে বলে দিয়ো।''

''ও আর তোমার কাছে ঘেঁষবে না। নিশ্চিন্ত থাকো।''

বেলা আটটায় মাকে ফোন করল শ্যাডো, ''কী খবর মা?''

''এই তো, আমরা এখন হাসপাতালে। তোর বাবাকে নিয়ে গেছে, অপারেশনের আগে কী সব প্রিপারেশন আছে বলল।''

''বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?''

''হয়েছে। ঠিকঠাক আছে। তুই এখানে নেই বলে একটু মন খারাপ মনে হল।''

''জানি। কাজটাও যে জরুরি।''

''সাবধানে থাকিস।''

যাকে মারতে হবে তার মোট দুটো ফটো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে আবু। কোনওটাই খুব স্পষ্ট নয়। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, রোগা, নাকটা বেশ তীক্ষ্ণ। গালে একটু দাড়ি আছ। কিন্তু ছবিতে ঝাপসা ভাব আছে। মনে হয় চলন্ত অবস্থায়, আনাড়ি হাতে, বাজে ক্যামেরায় তোলা। কোনও ঠিকানা নেই। বলা হয়েছে, পারহ্যাপস আ স্লাম ডুয়েলার, অর্থাৎ সম্ভবত কোনও বস্তিতে থাকে। আরও লেখা আছে, আ হকার অফ সানড্রি থিংস। অর্থাৎ নানাবিধ জিনিসের ফেরিওয়ালা! রেজ়ুমেটা দেখে হতাশ হল শ্যাডো। এক জন ফেরিওয়ালাকে কেন মারতে চাইছে ওরা? এত খরচ করে শেষ পর্যন্ত এক জন ফেরিওয়ালা? তবে এমন হতে পারে যে ফেরিওয়ালাটা লোকটার ছদ্মবেশ! আসলে লোকটা হয়তো কোনও ডন বা গুপ্তচর বা রাইভ্যাল! কিন্তু এত অস্পষ্ট ফটো এবং গরঠিকানায় লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কী করে, সেটাই বুঝতে পারছিল না শ্যাডো। শহরটা ছোট হলেই বা কী, কয়েক হাজার লোকের তো বাস! ফেরিওয়ালাটা যে বস্তিতেই থাকে তা-ও তো নিশ্চিত নয়! এই শহরে কতগুলো বস্তি আছে তা-ও তো জানা নেই।

দশটার সময় ফোন করে জানতে পারল, বিনয় সেনগুপ্তকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টেনশনটা কাটানোর জন্য পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল শ্যাডো। সে ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। মুশকিল হল, লম্বা লোক দেখলেই লোকে তাকায়। এটাই একটু অস্বস্তিকর, অন্তত গা ঢাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে।

কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ্দুর উঠেছে। চমৎকার আবহাওয়া। গাছপালা আছে, সবুজ মাঠ আছে, পার্ক আছে, আবার গরিব-গরিব ভাবও আছে। বাজার ছাড়িয়ে রাস্তাটা যেখানে দু'ভাগ হয়েছে সেখানে একটা ছোট্ট তিনকোনা পার্ক। দুটো বেঞ্চি, একটা বাচ্চাদের স্লিপ আর একটা দোলনাও আছে। শ্যাডো রেলিংটা টপকে ভিতরে ঢুকে একটা বেঞ্চে বসল। চোখ বুজে কিছু ক্ষণ বাবাকে চিন্তা করল সে। বাবাকে কি অজ্ঞান করা হয়ে গেছে! স্কাল কি ওপেন করা হয়েছে? বাবা কি বাঁচবে?

ভাবতে গিয়ে একটু ঝুম হয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ কাঁধে একটা

হাতের মৃদু স্পর্শ। কে যেন খুব নিচু গলায় বলল, ''স্যর, এটা বাচ্চাদের পার্ক, বড়দের জন্য নয়।''

আস্তে চোখ চেয়ে মুখ ফিরিয়ে সে যাকে দেখল, সে এক জন আধবুড়ো মানুষ। পাকা এবং পুরুষ্টু এক জোড়া ভুঁড়ো গোঁফ, গালে খসখসে দাড়ি, মুখখানা গোমড়া। গায়ে খাকি রঙের একটা জামা, তার উপর হাফ সোয়েটার, মাথায় একটা কানঢাকা কাপড়ের ফেট্টি। মালিই হবে বোধ হয়।

শ্যাডো উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ''ভুল হয়ে গেছে দাদা, কিছু মনে করবেন না। আমি চলে যাচ্ছি।''

যেতে গিয়েও হঠাৎ কী মনে হওয়ায় সে মোবাইলটা বের করে লোকটাকে ফেরিওয়ালার ফটোটা দেখিয়ে বলল, ''একে চেনেন?''

লোকটা সময় নিয়ে ভাল করে ছবিটা দেখল, তার পর মাথা নেড়ে বলে, ''না, দেখেছি বলে মনে হয় না। আপনি একে কেন খুঁজছেন?''

''দরকার আছে।''

''কী দরকার?''

''এ লোকটা আমার কাছে টাকা পায়। সেটা শোধ দিতে হবে।''

''ও,'' বলে লোকটা কৌতূহল হারিয়ে ফেলে বলল, ''আমি চিনি না, তবে কেউ হয়তো চিনতেও পারে। দেখুন খুঁজে,'' একটু চুপ করে থেকে বলে, ''কী নাম বলুন তো!''

শ্যাডো লোকটার নাম জানে না। বলল, ''নাম জেনে আপনি কী করবেন! আপনি তো লোকটাকে চেনেনই না!''

''আমি আজকাল অনেক কিছুই ভুলে যাই, আবার অনেক কিছু মনেও পড়ে যায়। তাই মনে হল, নামটা শুনলে যদি লোকটাকে মনে পড়ে।''

''তার দরকার নেই, আমি খুঁজে নেব।''

''আপনি একটা কাজ করবেন? গিরিধারীকে জিজ্ঞেস করুন, সে সবাইকে চেনে।''

''গিরিধারীকে কোথায় পাওয়া যাবে?''

''গিরিধারীকে?'' বলেই লোকটা যেন অকূলপাথারে পড়ে গেল। চার দিকে টালুমালু করে চেয়ে কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, ''তাই তো! গিরিধারীকে এখন কোথায় যে পাওয়া যাবে!''

শ্যাডো বুঝে গেল, লোকটাকে ডিমেনশিয়ায় ধরেছে। কিচ্ছু মনে করতে পারছে না। সে একটু হেসে বলে, ''ঠিক আছে, আমি লোকটাকে ঠিক খুঁজে বের করব। গিরিধারীকে লাগবে না।''

লোকটা তার দিকে জুলজুলে চোখে চেয়ে ফের বলে উঠল, ''বাজারের মধ্যে যে তেলের ঘানি আছে, গিরিধারীকে ওইখানে পাবেন,'' বলেই লোকটা যেতে গিয়ে ফের ঘুরে তাকিয়ে বলল, ''না, গিরিধারীকে এখন পাবেন পপুলার স্টোর্সে। সামনে যে চৌপথী আছে, ওখান থেকে ডান দিকে।''

শ্যাডোর একটু মায়া হল লোকটার প্রতি। একটু পরেই তার বাবার ব্রেন অপারেশন। তার বাবার স্মৃতি চলে যাবে না তো! বাবাও এরকম ভুলভাল বলবে না তো! সে গলায় অনুকম্পা মিশিয়ে বলল, ''আপনি বাড়ি যান দাদা, আমি খুঁজে নেব।''

লোকটা আবার কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে বলে উঠল, ''গুড্ডুকে খুঁজে পাওয়া কি অতই সোজা? গিরিধারী জানে। আগে গিরিধারীকে খুঁজে বের করুন।''

শ্যাডো অবাক হয়ে বলে, ''গুড্ডু! গুড্ডু কে?''

''ওই তো, যার ছবি দেখালেন! ও তো গুড্ডু।''

হঠাৎ পিছন থেকে একটা বাচ্চার গলা বলে উঠল, ''আপনি দাদুর সঙ্গে কী কথা বলছেন?''

শ্যাডো ফিরে তাকিয়ে দেখল, স্কুলড্রেস পরা একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে। পিঠে ব্যাগ। ছোট করে ছাঁটা চুল আর স্মার্ট চেহারা।

শ্যাডো একটু হেসে বলে, ''হাই! এই তো, তোমার দাদুর সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম।''

''লাভ নেই, দাদুর কিছুই মনে থাকে না, উল্টোপাল্টা বলে। আমাকেও মাঝে-মাঝে ভুলে যায়।''

''তাই বুঝি!''

''হ্যাঁ। দাদু তো বুড়ো হয়ে গেছে, তাই ও রকম! আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?''

শ্যাডো ছেলেটাকে মোবাইলের ফটোটা দেখিয়ে বলল, ''একে কোথায় পাব বলতে পারো?''

''ওহ, ও তো কালুদাদা!''

''কালুদাদা কোথায় থাকে?''

''তা তো জানি না। তবে মাঝে-মাঝে অনেক মজার জিনিস ফিরি করতে আসে। কালুদাদা খুব ভাল লোক। কালুদাদাকে খুঁজছেন কেন? কিছু কিনবেন বুঝি!''

''হ্যাঁ, কিনব। কালুদাদাকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে বলতে পারো?''

''না তো! কালুদাদা কোথায় থাকে তা জানি না। খুব ভোরবেলা আসে। তাও রোজ নয়, মাঝে-মাঝে। কালুদাদা আমাকে একটা পেনসিল দিয়েছে, যেটা জীবনেও ক্ষয় হবে না। পেনসিল কাটারে কাটতেও হবে না। আমি গত দুই মাস ধরে পেনসিলটায় লিখেই যাচ্ছি, শিষ একই রকম আছে, একটুও ক্ষয় হয়নি।''

শ্যাডো অবাক হয়ে বলে, ''এ রকমও হয় নাকি?''

''হ্যাঁ তো!'' কালুদাদার কাছে অনেক মজার জিনিস পাওয়া যায়।

শ্যাডো গম্ভীর মুখে বলে, ''কিন্তু কালুদাদাকে পাওয়া যাবে কোথায়!''

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে, ''কেউ জানে না। কালুদাদা তো ম্যাজিশিয়ান কিনা, তাই ভ্যানিশ হয়ে যায়! আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাই...''

''বাই,'' বলে শ্যাডোও হাত নাড়ল।

দাদুর হাত ধরে ছেলেটা বোধ হয় তার স্কুলের দিকেই চলে গেল। 'কালুদাদা ম্যাজিশিয়ান কিনা, তাই ভ্যানিশ হয়ে যায়' কথাটা শ্যাডোর মাথায় চক্কর কাটতে লাগল। বাচ্চা ছেলেরা অনেক কিছু কল্পনা করে নেয়, এটাও কি তাই? নাকি লোকটা গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পছন্দ করে! ফেরারি আসামি নয়তো! লোকটা কি ম্যাজিকও দেখায় নাকি? অনেক প্রশ্ন, কিন্তু উত্তর নেই!

সামনের চৌপথীটা পেরিয়ে কোন দিকে যাবে তা ঠিক করতে পারছিল না শ্যাডো। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একটু ভাবছিল। লোকজন যাতায়াত করছে, সবারই বেশ তাড়া। রাস্তায় রিকশার ঢল নেমেছে, বিস্তর মোটরগাড়ি, বাস আর অটো চলছে। রোদের তেজ বেড়েছে এবং শ্যাডোর এখন গরম লাগছে। অনেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে, সে নতুন লোক বলেই বোধ হয়, কিংবা লম্বা বলেও হতে পারে। আর এটা মোটেই পছন্দ করছে না সে।

লোকটা পপুলার স্টোর্সের কথা বলেছিল, চৌপথী থেকে ডান দিকের রাস্তায়। ওইখানে গিরিধারী নামে কাউকে পাওয়া যেতে পারে। রাস্তাটা ধীর পায়ে পেরোল শ্যাডো। ডান দিকের রাস্তা ধরে খানিক হাঁটল। মিনিট খানেক হাঁটার পর পপুলার স্টোর্সের সাইনবোর্ড দেখতে পেল সে। কাউন্টারে এক জন বুড়ো মানুষ বসে আছেন, মুখে রাজ্যের বিরক্তি।

দুটো সিঁড়ি ভেঙে উঠে বুড়োমানুষটির মুখোমুখি হয়ে শ্যাডো জিজ্ঞেস করল, ''স্যর, গিরিধারীবাবু কি আছেন?''

লোকটা তেতো গলায় বললেন, ''গিরিধারী! ক্যা গিরিধারী! কোথাকার গিরিধারী! কেমন গিরিধারী!''

শ্যাডো একটু হেসে বলল, ''মাপ করবেন, আমার ভুল হয়ে গেছে! শুনেছিলাম, এখানেই গিরিধারীবাবুকে পাওয়া যাবে।''

''না মশাই, এখানে গিরিধারী বলে কাউকে পাওয়া যাবে না। অন্য জায়গায় দেখুন।''

ডিমেনশিয়াওয়ালা বুড়োটা ভুল খবর দিয়েছে। তবু দেখা যাক, বাজারের তেলের ঘানিতে পাওয়া যায় কি না। এক-আধটা সূত্র না-পেলে আজব লোকটাকে খুঁজেই বা পাওয়া যাবে কী করে!

বাজারটা ছোটই। বেশি ভিড় নেই। তেলের ঘানিটা খুঁজে পেতে দেরি হল না তার। নাদুসনুদুস আর ফরসা চেহারার মধ্যবয়সি এক জন লোক বসেছিলেন, মুখে পান।

''এখানে গিরিধারী বলে কেউ আছেন?''

লোকটা তাকে মন দিয়ে দেখল, তার পর পানের পিক ফেলে বলল, ''কালেভদ্রে আসে। তবে সে এখন বাইরে কোথায় যেন গেছে। কী দরকার বলুন তো, আপনি কি তার পাওনাদার নাকি?''

''না, আমি পাওনাদার নই। এমনি একটু দরকার ছিল।''

লোকটা একটু যেন দুঃখের গলায় বলে, ''গিরিধারীর অনেক পাওনাদার। পালিয়ে-পালিয়েই জীবন কাটিয়ে দিল।''

এ ভাবে যে হবে না সেটা বুঝে গেল সে। হঠাৎ তার মনে হল, ফেরিওয়ালার খবর ভাল জানার কথা অন্য কোনও ফেরিওয়ালার। বাজারের বাইরে একটা ঠেলাগাড়িতে আপেল, কমলালেবু, মুসুম্বি, আঙুর এ সব সাজিয়ে বসেছিল একটি অল্পবয়সি ছেলে। চোখা চালাক চেহারা। শ্যাডো তার কাছে গিয়ে বলল, ''ভাই, আমি এক জনকে খুঁজছি, বলতে পারবে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে!''

ছবিটা এক ঝলক দেখেই ছেলেটা বলল, ''এ তো কালুদাদা!''

''কালুদাদা কোথায় থাকে বলতে পারো?''

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে, ''না। কালুদাদা তো এই শহরে নতুন এসেছে কি না। ঠিক জানি না, তবে নদীর ধারের নয়া বস্তিতে থাকতে পারে।''

''কালুদাদা এই শহরে কবে এসেছে?''

''মাস দুই হবে।''

প্যান্টের পকেটে ফোনটা বাজতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল শ্যাডোর, বাবার কোনও খবর নয় তো! ফোনটা বের করে দেখল, না, প্রাইভেট নম্বর। ফোনটা কানে তুলতেই একটি গম্ভীর গলা বলল, ''আপনি কি বুদ্ধু? এ ভাবে জনে-জনে জিজ্ঞেস করে বেড়ালে যে বেলা বারোটার মধ্যেই গোটা শহর জেনে যাবে আপনি কে! মফস্‌সল শহরে ইনফর্মেশন তাড়াতাড়ি ছড়ায়।''

শ্যাডো ঝাঁঝালো গলায় বলে, ''আপনি কে মশাই?''

''সেটা জানার কোনও দরকার নেই আপনার। বি কেয়ারফুল। নিজেই লোকটাকে খুঁজে বের করুন, সারা শহরকে জানান দিয়ে নয়। ইট ইজ় আ কভার্ট অপারেশন, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি সিক্রেটিভ, ম্যান।''

বলেই ফোনটা কেটে দিল লোকটা। প্রাইভেট নম্বর, তার মানে কলব্যাক করারও উপায় নেই।

॥ ৬ ॥

কালো কুকুরটা আসলে ইবলিশের চর, অন্তত রাজুর তাই ধারণা। সকালে কোতলপুরের জঙ্গল থেকে আমলকী পেড়ে আনতে যখনই বেতবনের পাশ দিয়ে সে নদীর দিকটায় যায় তখনই কুকুরটা কোথা থেকে তেড়ে আসে। আর ডাকটাও গমগমে রাশভারী, শুনলে আঁত শুকিয়ে যায়। এ রকম ভয়ঙ্কর বাঘা কুকুর জীবনে দেখেনি সে, হাঁ করে যখন চেঁচায় তখন মুখের টকটকে লাল অভ্যন্তরে ওর আলজিভ পর্যন্ত দেখা যায়। আর কী বড়-বড় দাঁত, বাবা গো! ভাগ্যিস লম্বা আর সরু একটা শিকলে বাঁধা থাকে, নইলে কুকুরটা তার গলার নলি ছিঁড়ে ফেলত ওই দাঁত দিয়ে।

নদীর চরে নানা রঙের প্লাস্টিক শিট দিয়ে তৈরি ভারী গরিব চেহারার একখানা ঘর, বাঁশের মাচানের কাঠামোয় নড়বড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনওক্রমে। না-আছে ছিরি, না-আছে ছাঁদ। কোনওরকমে মাথা গোঁজা যায় আর কী। ঘরের পাশেই একখানা হাড় জিরজিরে ভ্যানগাড়ি। তা ওইখানাই হচ্ছে কালুদাদার ঠেক। লক্ষ্মীছাড়া মানুষ। চালচুলোর যা অবস্থা তাতে দিন কাটে বলে মনে হয় না। তবু কালুদাদা দিব্যি হাসিমুখেই আছে। ওই বাঘা, মারাক্কু কুকুরটা তারই। যার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সে কোন আক্কেলে যে অমন কুকুর পোষে কে জানে! ঘরে যাদের মেলা সোনাদানা আছে তারা পুষলে মানায়। কালুদাদার আছেটা কী! পুরনো, বাতিল সব জিনিসপত্র ফিরি করে বেড়ায়, তাও আবার ধার-বাকিতে। তবে মানুষটা বড় ভাল, সব সময় মুখে একখানা সাদাসিধে হাসি, যেন এক জন ভারী বোকাসোকা লোক। দুনিয়ার বেশির ভাগ ভালমানুষই একটু বোকাসোকা লোক। এটা কেমন নিয়ম কে জানে বাবা!

রাজু দূর থেকেই হাঁক মারল, ''কালুদাদা! ও কালুদাদা! ঘরে আছ নাকি?''

কালুদাদার ঘরে ঢোকার জন্য একখানা ফুটোমতো দরজা আছে, কুঁজো হয়ে ঢুকতে বা বেরোতে হয়, তাতে আবার প্লাস্টিকেরই একখানা ঢাকনা আছে। বাহার দেখলে হাসি পায়।

হাঁক শুনে কোলকুঁজো হয়ে লোকটা বেরিয়ে এল, সেই ঝাঁকড় মাকড় একরাশ চুল, গায়ে একটা ময়লা নীল রঙের জামা, পরনে লটরপটর একখানা পাতলুন। তবে মুখে সেই সাদাসিধে হাসিটি। কালুদাদার আর কিছু না-হোক, দাঁতগুলো বড্ড ঝকঝকে। তাকে দেখে কুকুরটা চুপ মেরে গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ল। কালীচরণ ভারী খুশি হয়ে বলল, ''রাজুবাবু যে! আমলকী পাড়তে চললে বুঝি?''

''তা তো চললুম। কিন্তু তোমার কুকুরটা আমাকে দেখলে রোজ অমন চেঁচায় কেন বলো তো! রোজ দেখছে, তবু চেঁচায়। এত দিনেও চেনা হল না?''

কালীচরণ কাঁচুমাচু হয়ে মাথা চুলকে বলে, ''চেঁচায় বটে, তবে গোলো কিন্তু লোক খারাপ নয়।''

''আহা, লোক তো আমিও খারাপ নই। চোরছ্যাঁচড় দেখলে চেঁচায় সে ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে দেখে চেঁচায় কেন বলো তো!''

''আসলে ওই রকমই প্রোগ্রাম করা আছে তো, তাই চেঁচায়।''

রাজু হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে, ''কী করা আছে বললে!''

কালীচরণ একগাল হেসে বলে, ''কাল থেকে আর তোমাকে দেখে চেঁচাবে না। দেখে নিয়ো।''

''মন্তর পড়ে দেবে নাকি!''

''ওই রকমই আছে কিছু।''

''ও রকম রাগী একটা কুকুর পুষেছ কেন বলো তো! ঘরে গুপ্তধন আছে নাকি?''

কথা শুনে হেসে একেবারে ঢলাঢল হয়ে গেল কালীচরণ, তার পর বলল, ''তা গুপ্তধনও বলা যায়। ছিল কিছু জিনিসপত্তর, কিন্তু লোকে তার মর্মই বুঝল না কিনা!''

''ও সব পুরনো অচল জিনিসপত্তর কী চলে! কে কিনবে বলো তো।''

কালীচরণ কথাটা শুনে খুব গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়ল, তার পর বলল, ''ঠিকই বলেছ রাজুবাবু, আমার ব্যবসাটা চলল না। এবার দেখছি পাততাড়ি গুটোতে হবে।''

''পাততাড়ি গুটোবে! পাততাড়ি গুটোবে কেন? তার চেয়ে খেলনা বা ফলপাকড়, কিংবা বাসনপত্র ফিরি করলেও তো হয়।''

কালীচরণ মাথা চুলকে বলে, ''ও সব ব্যবসা কি আমি জানি! ফেলাছড়া জিনিস নিয়েই আমার কারবার।''

''তুমি এক জন কিম্ভূত লোক আছ বাপু! লোকে পয়সা কামানোর জন্য কত অন্ধিসন্ধি খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু তোমার তো সেই সব ধান্ধাই নেই দেখছি!''

কালীচরণ খুব হাসল, যেন মজার কথা, তার পর বলল, ''দেখি অন্য কোথাও গিয়ে ব্যবসা ফাঁদতে পারি কি না! এই জায়গায় আমার আর পোষাচ্ছে না রাজুবাবু।''

''বটে! তা যাবে কোথায়?''

''আমার মতো ভবঘুরের কি যাওয়ার জায়গার অভাব আছে?

বেরিয়ে পড়লেই হয়।''

''তুমি চলে গেলে বড্ড ফাঁকা লাগবে, বুঝলে কালুদাদা!''

কালীচরণ খুব হাসল কথাটা শুনে। অথচ হাসির কথা কিছু বলেনি রাজু। তাই তার ফের মনে হল, দুনিয়ার বেশির ভাগ ভালমানুষই একটু বোকাসোকা হয়।

হাঁটুজলের নদী পেরিয়ে কোতলপুরের জঙ্গলে ঢুকে আমলকী পেড়ে দু'ঘণ্টা বাদে যখন ফিরল রাজু, তখন কালুদাদার বাঘা কুকুরটা ঝিমিয়ে পড়েছে, তাকে আড়চোখে দেখেও চেঁচাল না। কয়েকটা আমলকী দিয়ে যাবে বলে মায়াভরে ''কালুদাদা, কালুদাদা'' বলে কিছু ক্ষণ হাঁক মারল রাজু, কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমলকীর বেশ কয়েক জন 'গাহেক' আছে তার। নন্দবাবু, পরেশবাবু, সুরেশবাবু, গজপতিবাবু, আরও কয়েক জনা। রওনা হতে গিয়ে দেখতে পেল, কাতু পাগলা নদীতে নেমে গামছা দিয়ে মাছ ধরছে।

সে হেঁকে বলল, ''কী রে কাতু, মাছ পেলি?''

কাতু বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল। পায়নি। তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ''কালুদাদাকে খুঁজছ? তাকে তো একটু আগে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল।''

''বলিস কী! পুলিশ ধরে নিয়ে গেল! কেন ধরে নিয়ে গেল জানিস?''

''কে জানে বাপু, চুরি-ডাকাতি কিছু করেছে নিশ্চয়ই। তা চুরি-ডাকাতি কি আর কিছু খারাপ কাজ! সবাই তো করে। পুলিশের দোষ কী জানো, বড্ড পেছনে লাগে মানুষের! ভাবছি গভর্নরকে একটা চিঠি লিখব পুলিশের নামে নালিশ করে।''

''লিখবি কী করে? তুই তো লিখতে-পড়তে জানিস না।''

''ও সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। গণপতি হাই স্কুলের জীবন মাস্টারের সঙ্গে কড়ার হয়েছে, গাছ থেকে সুপুরি পেড়ে দিলে বর্ণপরিচয় শিখিয়ে দেবে।''

''যাক, তা হলে তাড়াতাড়ি লেখাপড়াটা শিখে গভর্নরকে চিঠিটা লিখে ফেলো। পুলিশের উচিত শিক্ষে হোক। তা পুলিশ কালুদাদাকে মারধর করেনি তো!''

কাতু বড় বড় দাঁত দেখিয়ে একগাল হেসে বলে, ''ওহ, তা হলে তো খুব জমে যেত! তাদের হাতে মোটা-মোটা লাঠি ছিল, বন্দুকও ছিল। পেটাই দেখতে আমার ভারী ভাল লাগে। তাই মাছধরা ছেড়ে কালুদাদার পেটাই দেখতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম।''

''তা পেটাতে পারল না বুঝি?''

''কী করে পেটাবে বলো! কালুদাদা তো দিব্যি ভালমানুষের মতো সুড়সুড় করে হাসি-হাসি মুখে ওদের সঙ্গে চলে গেল! এমন ম্যান্দামারা লোক যে, একটু ফাইটও দিতে পারল না। ফাইট দিলে কিন্তু পুলিশ খুব পেটাত! শুধু কুকুরটা পুলিশ দেখে ঘেউঘেউ করছিল। পুলিশগুলো রেগে গিয়ে কুকুরটাকে খুব লাঠিপেটা করেছে। কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি। ও তো আর চুরি-ডাকাতি করেনি, শুধু ঘেউঘেউ করেছে।''

কালুদাদাকে আগেও বার কয়েক পুলিশে ধরেছে, চোরাই জিনিস বিক্রি করে বলে সন্দেহে। তার পর ছেড়েও দিয়েছে। তাই বিশেষ উদ্বিগ্ন হল না রাজু। একটু বেলায় সুরেশবাবুর বাড়িতে বসে চা আর বিস্কুট খাচ্ছিল সে। তার খদ্দেরদের মধ্যে সুরেশবাবুর বেশ মায়াদয়া আছে। রোজই চা-বিস্কুট বা কিছু না-কিছু খাওয়াবেনই। কথায়-কথায় রাজু বলল, ''বাবু, আজ কালুদাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা জানি কালুদাদা ভাল লোক, কোনও দু'নম্বরি করে না। আপনি যদি পুলিশকে একটু বলে দেন তা হলে কালুদাদাকে ওরা ছেড়ে দেবে।''

সুরেশবাবু বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, হাতে খবরের কাগজ। ভ্রু কুঁচকে বললেন, ''দেখ রাজু, আমি চল্লিশ বছরের ওপর পুলিশে চাকরি করেছি, বহু আসামি ঘেঁটেছি। ভালমানুষ রূপী শয়তান বড় কম দেখিনি। আমার সন্দেহ কালীচরণ এক জন স্মাগলার। আর ওর জিনিসগুলোও সন্দেহজনক। হাইলি সাসপিশাস! ওকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ ঠিক কাজই করেছে।''

''কিন্তু কালুদাদাকে যদি আটকে রাখে তা হলে তো ওর কুকুরটা না-খেয়ে মরে যাবে বাবু!''

''কুকুর! কালীচরণের আবার কুকুরও আছে নাকি?''

''যে আজ্ঞে। এই অ্যাত্তো বড় কালো একটা তেজি কুকুর! খুব রোখাচোখা!''

সুরেশবাবু কুকুরপ্রেমী মানুষ, তাই কুকুরের কথায় বিচলিত বোধ করলেন। বললেন, ''আমি পুলিশকে বলে দিচ্ছি যাতে কুকুরটাকে খাবার দিয়ে আসে।''

রাজু মাথা নেড়ে বলে, ''তাতে লাভ নেই। কালুদাদার কুকুর মনিবকে না পেলে অনশন করেই মরে যাবে। গোলো খুব প্রভুভক্ত কুকুর।''

সুরেশবাবু চিন্তিত হয়ে বলেন, ''বলছিস! তা হলে দেখছি কী করা যায়। কালীচরণের যে কুকুর আছে সেটাই তো জানা ছিল না। কী নাম বললি কুকুরটার?''

''আজ্ঞে, গোলো।''

''ও বাবা, নামের তো বেশ বাহার আছে দেখছি! ঠিক আছে, আমি পুলিশকে বলে দিচ্ছি, তেমন কোনও কগনিজেবল অফেন্স না-থাকলে ছেড়ে দেয় যেন।''

রাত্রিবেলা দাবা খেলতে এসে গজপতি গম্ভীর মুখে বললেন, ''কাজটা তুমি ঠিক করোনি।''

সুরেশ অবাক হয়ে বলেন, ''কোন কাজটার কথা বলছ?''

''পুলিশকে বলে যে কালীচরণকে বড় ছাড়িয়ে আনলে! কাজটা কি ঠিক হয়েছে তোমার?''

''বলো কী হে! 'এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে!' এ তো উলটপুরাণ! তুমিই তো এত দিন কালীচরণের অ্যারেস্ট চাওনি!''

গজপতি গোমড়া মুখ করে বললেন, ''এত কাল চাইনি, কিন্তু এখন চাই।''

''কেন বলো তো!''

''আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কালীচরণ বিপদের মধ্যে আছে। বাইরে থাকার চেয়ে এখন কাস্টডিতে থাকলে নিরাপদে থাকবে।''

''বিপদ! কী রকম বিপদ বলে মনে হচ্ছে তোমার?''

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গজপতি বলেন, ''আমি জানি আমার কথার কোনও গুরুত্ব তোমার কাছে নেই। আমি ইমপ্র্যাক্টিক্যাল। তবু বলছি, আমার মন বলছে, কালীচরণের একটা বিপদ ঘটতে পারে।''

সুরেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, ''দেখো গজপতি, কালীচরণ এক জন যৎসামান্য ফেরিওয়ালা, দিন আনে দিন খায়। দু'-একটা ম্যাজিক্যাল আইটেম তোমাকে গছিয়ে গেছে বলেই সে তো আর সায়েন্টিস্ট বনে যায়নি! তুমি তিলকে তাল করছ।''

গজপতি তাঁর দ্বিতীয় দীর্ঘশ্বাসটি ফেলে বললেন, ''তুমি যা-ই বলো, আমার কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে হে সুরেশ, আর সেই জন্যই আমি একটা ফল্‌স চার্জে ওকে অ্যারেস্ট করিয়েছিলাম।''

সুরেশবাবু চোখ কপালে তুলে বলেন, ''তুমি! শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হবে যে এ কাজ তোমার?''

গজপতি খুবই লজ্জিত বোধ করছিলেন। কাজটা যে আহাম্মকের মতো হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, তার উপর একটা মিথ্যাচারও তো বটে। মুখখানা নামিয়ে বললেন, ''ভেবেছিলাম এ সব জিনিসের সন্ধান যদি বদমাশ লোকেরা পায় তা হলে তারা কালীচরণের ওপর চড়াও হবে। বিশেষ করে লাট্টুর ঘটনার পর ব্যাপারটা খানিকটা লোক জানাজানি হয়েছে তো! তাই।''

''তোমার মাথায় বিজ্ঞান নয়, সায়েন্স ফিকশন আর থ্রিলার ঘুরছে। একটা টর্চ, একটা হুইস্‌ল আর একটা লাট্টুর কেরামতি দেখে তোমার কল্পনাশক্তি একেবারে ডানা মেলে দিয়েছে। আরে, আজকাল বাচ্চাদের এমন সব ইলেকট্রনিক খেলনা বেরিয়েছে যা দেখলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। এগুলো সেই রকমই কয়েকটা খেলনা ছাড়া আর কিছু নয়। চিনে-জাপানে এ সব আকছার তৈরি হচ্ছে।''

গজপতি বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি হেরে গেছেন। দুঃখের কিছু নেই, কারণ তিনি সব সময়ে এবং সবার কাছেই হারেন। হেরে যাওয়াই তাঁর অভ্যাস। একমাত্র হরিধন ছাড়া তিনি আজ পর্যন্ত আর কাউকে হারাতে পেরেছেন বলে স্মরণ করতে পারলেন না। তাই গজপতি নিশ্চিন্তে তাঁর তৃতীয় দীর্ঘশ্বাসটি ফেললেন। দীর্ঘশ্বাস অতি উপকারী জিনিস, তাতে অক্সিজেন ইনটেক বাড়ে। ওই অনুলোম, বিলোম, কপালভাতি এ সবও তো নানা রকম দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়!

দাবা খেলায় সুরেশবাবুর কাছে হেরে যাওয়ার পর তাঁর চতুর্থ দীর্ঘশ্বাসটি পড়ল। গজ দিয়ে সুরেশের রাজা আর মন্ত্রীকে এক লাইনে পেয়ে গিয়ে ভারী আহ্লাদ হয়েছিল তাঁর। সুরেশের মন্ত্রী নির্ঘাত মারা পড়ে। কিন্তু গজটা যে সুরেশের ঘোড়ার পাল্লায় ছিল সেটা একেবারে চোখে পড়েনি। গজটা কাটা পড়তেই খেলাটা নেতিয়ে একপেশে হয়ে গেল, রোজই যেমন হয়। আর এই ভাবেই রোজ গজপতির আত্মবিশ্বাস এক ধাপ করে নীচে নামতে থাকে।

হেরে যাওয়ার পর রোজই তিনি তাঁর কোথায়-কোথায় ভুল হল তা ভাবতে-ভাবতে এবং বিড়বিড় করে পর্যালোচনা করতে-করতে বাড়ি ফেরেন। আজও ফেরার সময় তিনি বিড়বিড় করে বলছিলেন, ‘‘না, আগের চালটায় বোড়েটা টিপে দিলেই ওর ঘোড়াটা চাপা পড়ে সরে যেত, তা হলে মন্ত্রীটা বাঁচাতে পারত না। বরং গজের চালটা আর একটু সামাল দিয়ে নিয়ে তবে দেওয়া উচিত ছিল। নাহ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো...’’

ঠিক এই সময়ে ঘন কুয়াশার মধ্যেই একটা কোট, মাফলার, টুপিতে ঢাকা লোক তাঁর পথ আটকে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল, ‘‘আচ্ছা, এখানে গজপতিবাবুর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?’’

গজপতিবাবু একটু বিরক্ত হলেন, চিন্তায় ব্যাঘাত হওয়ার ফলে। তার পর ঘোর অন্যমনস্কতার ভিতরেই আওড়ালেন, ‘‘গজপতিবাবু! গজপতিবাবু! নামটা চেনা-চেনা লাগছে বটে, কিন্তু মনে পড়ছে না তো! আপনি বরং মোড়ের গদাধর স্টোর্সে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন তো। ওরা বোধ হয় বলতে পারবে।’’

এর পর কৃতিত্বের সঙ্গেই তিনি বাড়ি ফিরে এলেন, তবে দাবার চালগুলো তখনও তাঁর মাথায় ঘুরছে। বাথরুমে গিয়ে ঠান্ডা জলের ঝাপটা চোখে-মুখে দিতেই ঝড়াক করে তাঁর মনে পড়ে গেল যে, ‘আরে! তিনিই তো গজপতি! গজপতি যে তিনিই!’

গজপতিবাবু বাথরুম থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গোপালকে ডেকে বললেন, ‘‘ওরে, যা তো, দেখে আয় রাস্তায় কে যেন আমাকে খুঁজছে!’’

গোপাল অবাক হয়ে বলল, ‘‘রাস্তায় কে আপনাকে খুঁজছে তা আপনি ঘর থেকে টের পেলেন কী করে?’’

‘‘ওরে না না, রাস্তায় লোকটা যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, গজপতিবাবুর বাড়িটা কোথায়!’’

গোপাল আরও অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বলে, ‘‘তা হলে তাকে নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে এলেন না কেন?’’

এই প্রশ্নের সদুত্তর গজপতির জানা নেই। তিনি টালুমালু করে চার দিকে চেয়ে বললেন, ‘‘আচ্ছা, তোর কি মায়াদয়া নেই! লোকটা এই ঠান্ডায়, অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তুই মুখে-মুখে তর্ক করছিস! একটু সাহায্য করতে পারছিস না লোকটাকে?’’

গোপাল অবাক হয়ে বলে, ‘‘ঠান্ডায় অন্ধকারে পথে তো মেলা লোকই যাতায়াত করছে, তার মধ্যে আপনার লোকটাকে আমি খুঁজে পাবো কেমন করে?’’

গজপতির মাথায় একটা চমৎকার আইডিয়া এল। তিনি একগাল হেসে বললেন, ‘‘তা হলে এক কাজ কর, গেটের কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বেশ হেঁকে কয়েক বার বল, এটাই গজপতিবাবুর বাড়ি! এটাই গজপতিবাবুর বাড়ি!’’

‘‘তা হলে কথাটা মাসিমাকে গিয়ে বলি, কারণ এখন আমার রাতের রুটির জন্য আটা মাখতে বসার কথা। এখন বাইরে গিয়ে হাঁকাহাঁকি করলে মাসিমা আমাকে আস্ত রাখবেন না।’’

গজপতি সতর্ক হয়ে গেলেন, কাজটা বোধ হয় খুব একটা বিবেচকের মতো হবে না। বললেন, ‘‘তবে থাক।’’

একটা গলাখাঁকারি দিয়ে গোপাল বলল, ‘‘তা হলে মাসিমাকে গিয়ে কথাটা বলি?’’

গজপতি সভয়ে বলেন, ‘‘কী বলবি?’’

‘‘এই যে আপনি আমাকে ফটকের কাছে গিয়ে ‘এটাই গজপতিবাবুর বাড়ি! এটাই গজপতিবাবুর বাড়ি!’ বলে চেঁচাতে বললেন!’’

গজপতি হাঁ করে কিছু ক্ষণ চেয়ে রইলেন গোপালের দিকে। ছোকরার বদমাইশি বুদ্ধির সঙ্গে এঁটে ওঠা তাঁর কম্মো নয়। তিনি অত্যন্ত কাতর গলায় বললেন, ‘‘কত?’’

‘‘শতখানেক হলে হয়। ঘরে পরার হাওয়াই চটি জোড়া ছিঁড়েছে তো, নতুন এক জোড়া দরকার।’’

গেল একশো টাকা। কী আর করবেন, এই ভাবেই চিরকাল তাঁকে নানা লোকের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে আসতে হয়েছে। তাই এবার তাঁর পঞ্চম দীর্ঘশ্বাসটি আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

ভদ্রলোক কিন্তু এলেন। রাত সোয়া আটটা নাগাদ। শীতে কাতর, জড়সড়, কম্পমান এক জন বুড়ো মানুষ। গায়ে সেই ঝুব্বুস একটা কোট, গলায় মাফলার, মাথায় গলফ্ ক্যাপ। বাইরে জুতো ছেড়ে বৈঠকখানায় ঢুকে ভারী বিনয়ের সঙ্গে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলেন গজপতিকে। ঘড়ঘড়ে গলাতেই বললেন, ‘‘আমার নাম আদ্যনাথ সর্বাধিকারী। শুনেছি আপনি একজন বিজ্ঞানী, তার উপর আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরুজন, তাই আপনাকে আমার সম্মান জানাতে এলাম। আপনি যদি আমার আগমনে বিরক্ত না-হয়ে থাকেন তা হলে আমার একটু নিবেদন আছে।’’

গজপতি নতুন মানুষের সামনে বরাবরই একটু অপ্রস্তুত। তার উপর এই মানুষটা তাঁকে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুরুজন বলায় তিনি একটু অবাকও হয়েছেন, কারণ এই বুড়ো মানুষটি তাঁর চেয়ে অন্তত বছর দশেকের বড়। তাই আমতা-আমতা করে বললেন, ‘‘আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, বসুন।’’

ভদ্রলোক জড়সড় হয়েই একটা সোফায় বসলেন। তার পর দস্তানা পরা হাত দিয়ে সোফাটা একটু চেপেচুপে দেখে নিলেন এবং চার দিকে খুব কৌতূহল নিয়ে চোখ বোলালেন। তার পর বললেন, ‘‘আপনাদের এই বসার আসনগুলো খুবই আরামদায়ক। এমনকি আপনাদের বাসস্থানটিও বেশ চমৎকার।’’

গজপতি একটু অবাক হলেন, তাঁর বাড়ির সোফাসেট আর পাঁচটা বাড়ির মতোই সাধারণ, বাড়িরও কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, তা হলে লোকটা সোফা বা বাড়ির প্রশংসা করছে কেন? তিনি শুধু বললেন, ‘‘আপনার ভাল লাগলেই ভাল। একটু চা খাবেন?’’

লোকটা হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে আতঙ্কিত গলায় বলল, ‘‘না মহাশয়, না! আমি খাদ্য-পানীয় কিছুই গ্রহণ করতে অপারগ।’’

লোকটা যেন একটু কেমনধারা সাধুঘেঁষা ভাষায় কথা কইছে দেখে অবাক হলেন গজপতি। ‘মহাশয়’, ‘অপারগ’ এ সব কথা তো কেউ মুখের কথায় ব্যবহার করে না! তবে এমন হতেই পারে যে, লোকটা বাঙালি নয়, হালে বাংলা শেখার চেষ্টা করছে!

গজপতি তবু আন্তরিক গলাতেই বললেন, ‘‘আপনি তো শীতে বেশ কাতর হয়ে পড়েছেন দেখছি! একটু চা খেলে শরীরটা তো গরম হত।’’

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, ‘‘না মহাশয়, আমাদের অনেক বিধিনিষেধ আছে। বিশেষত এখানকার জীবাণু বহন করে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।’’

গজপতির মাথায় কিছুই ঢুকল না। তিনি ফের আমতা-আমতা করে বললেন, ‘‘জীবাণু! ফুটন্ত জলে তো জীবাণু থাকার কথা নয়!’’

লোকটা বলল, ‘‘আপ্যায়নের কোনও দরকার নেই। আমি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।’’

‘‘কী প্রয়োজন বলুন!’’

‘‘আমি এসেছি একটি ভুল সংশোধন করতে।’’

গজপতির মাথার ভিতরে এখনও দাবার ঘোড়া লাফাচ্ছে, বোড়ে এগোচ্ছে, মন্ত্রী পজ়িশন নিচ্ছে, গজ শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি ভ্রু কুঁচকে বললেন, ‘‘ভুল! কী ভুল বলুন তো! বাই এনি চান্স আপনি আমার দাবা খেলার ভুল ধরতে আসেননি তো! এটা ঠিক কথাই যে আমার বাঁ-দিকের তিন নম্বর ঘরের বোড়েটা এগিয়ে রাখা উচিত ছিল। তাতে ঘোড়াটা না-সরিয়ে সুরেশের উপায় থাকত না। সামান্য একটা ক্যালকুলেশনের গন্ডগোল। তবে কিনা...’’

ভদ্রলোক মাথাটা ঘন ঘন নাড়া দিয়ে বললেন, ‘‘না মহাশয়, আমি দাবা ক্রীড়া জানি না। ওইটি কালহরণকারী ক্রীড়া। দাবায় আমার কৌতূহল নাই। আমি অন্য একটি প্রমাদের কথা বলতে এসেছি।’’

গজপতি বলেন, ‘‘প্রমাদ! প্রমাদ মানে তো ভুল! আবার কী ভুল করলাম রে বাবা যে, বাড়ি বয়ে লোকে ভুল ধরতে আসে!’’

‘‘হ্যাঁ মহাশয়, একটি ভুল ধরতেই আমার এত দূর থেকে আসা।’’

‘‘আপনি কত দূর থেকে আমার ভুল ধরতে এসেছেন শুনি! আমেরিকা না হাওয়াই?’’

‘‘এটা সেই দূরত্ব নয়। আপনাদের সঙ্গে আমাদের নানাবিধ দূরত্ব আছে। সব উন্মোচন করে বলা যাবে না।’’

‘‘দেখুন মশাই, আমি একটু অন্যমনস্ক লোক সেটা স্বীকার করছি। আর তাই নানা রকম ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। কিন্তু তার জন্য আপনি এই বুড়ো বয়সে এত দূর থেকে হন্তদন্ত হয়ে চলে এলেন কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। কী এমন ভুল করেছি বলুন তো!’’

‘‘আপনার কাছে তিনটি দ্রব্য আছে। তিনটি খেলনা জাতীয় জিনিস। আপনি এক জন বিজ্ঞানী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ওগুলি খেলনা নয়!’’

গজপতি লোকটার দিকে চেয়ে লোকটা কতখানি ধূর্ত এবং মতলব কী তা বোঝার বৃথা চেষ্টা করে বলেই ফেললেন, ‘‘জানি।’’

‘‘কিন্তু আপনি এটা জানেন না যে, ওগুলি আপনাদের স্থান ও কালানুযায়ী কতখানি বিপজ্জনক।’’

গজপতি অবাক হয়ে বলেন, ‘‘বিপজ্জনক! বলেন কী মশাই, বিপজ্জনক হতে যাবে কেন? ওগুলো তো খুব উপকারী জিনিস।’’

লোকটি মাথা নেড়ে বললেন, ‘‘না মহাশয়, আপাতদৃষ্টিতে উপকারী বলে মনে হলেও আপনাদের আপেক্ষিক স্থান ও কালের পক্ষে ওই প্রযুক্তি উপযুক্ত নয়। ওগুলি ভ্রমক্রমে এই স্থান ও এই কালে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু এটা প্রকৃষ্ট সময় বা প্রকৃষ্ট স্থান নয়। আপনি দয়া করে ওগুলি ব্যবহার করবেন না। তাতে আপনাদের ক্ষতি হতে পারে।’’

গজপতি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘‘কী ক্ষতি হতে পারে বলুন তো!’’

‘‘আপনি যদি প্রস্তর যুগে গিয়ে বন্দুক দিয়ে পাখি বা জীবজন্তু শিকার করেন তা হলে আবহের নকশায় একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা। বিবর্তনের বিরুদ্ধাচরণ বা প্রকৃতির নিয়মকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা কি ভাল?’’

গজপতি আরও একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘আপনি কি টাইম ট্র্যাভেলের গপ্পো ফাঁদছেন নাকি মশাই?’’

‘‘ওই রকমই কিছু ধরে নিন।

‘‘তার মানে আপনি এক জন টাইম ট্র্যাভেলার!’’

‘‘আপনাদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব স্থানিক, কালিক, তারঙ্গিক এবং ভৌতিক। কিছু বুঝলেন?’’

‘‘না মশাই, আমার বাংলা জ্ঞান ভাল নয়। তবে মনে হচ্ছে আপনি এক জন গোলমেলে লোক। আপনার মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।’’

ভদ্রলোকের গোমড়া মুখে এবার একটা তির্যক হাসি ফুটল। ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, ‘‘বোঝার কথাও নয়। শুধু দয়া করে ওই খেলনাগুলোয় আর হাত দেবেন না। ওগুলো আমরা নিয়ে নেব।’’

“আপনি কি ওগুলো চাইতেই এসেছেন নাকি? যদি তা-ই এসে থাকেন তা হলে আগেই বলে দিচ্ছি, আমি কিন্তু ওগুলো হাতছাড়া করতে পারব না। লাখ টাকা দিলেও না।”

লোকটা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, “না মহাশয়, আমি দ্রব্যগুলি স্পর্শও করব না। তাতে বিপদ হতে পারে। তাই নিষেধ আছে। আপনি দ্রব্যগুলিকে রক্ষা করুন, কোনও আপত্তি নেই। যখন সময় হবে তখন ওগুলি আমরা নিয়ে নেব।”

“মগের মুলুক নাকি! নিয়ে নেবেন মানে! ওগুলো আমি কালীচরণের কাছ থেকে কিনেছি।”

“কালীচরণ কে মহাশয়?”

“সে এক জন ফেরিওয়ালা এবং এক জন ভাল লোক।”

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, “আমি কোনও কালীচরণকে চিনি না। তবে জাবালিকে চিনি। সে এক জন সময়চারণ। নানা কালখণ্ডে সে বিচরণ করে এবং স্থান ও কালের উপযোগী প্রযুক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করে, যাতে পৃথিবী ও মনুষ্যকুল নিরাপদে থাকতে পারে। আপনার কাছে অনুরোধ, দয়া করে ভ্রমক্রমেও আর দ্রব্যগুলো স্পর্শ করবেন না বা কাউকে স্পর্শ করতে দেবেন না। যথা সময়ে আমাদের দূত ওগুলো আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করবে।”

“তার মানে কি চুরি করবেন?”

“পরস্বাপহরণকে চুরি বলে, কিন্তু দ্রব্যগুলো তো আপনার নয়।”

গজপতি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন, “আলবাত আমার।”

ভদ্রলোক কথা বাড়ালেন না, তর্ক করলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে নত হয়ে নমস্কার করলেন। ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, “আজ আমি আসি। আর কখনও আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।”

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর গজপতি নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর একটা মজবুত আলমারির মধ্যে হুইস্‌ল, টর্চ আর লাট্টুটা লুকিয়ে রাখলেন। চাবি রইল তাঁর কোমরের ঘুনশিতে। লোকটা যে এক জন মতলববাজ এবং ইম্পস্টার তাতে সন্দেহ নেই। আবোলতাবোল বুঝিয়ে জিনিসগুলো হাতানোর তালে ছিল। দরকার হলে তিনি বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসাবেন, গুন্ডা পুষবেন, বাউন্সার রাখবেন, তবু জিনিসগুলো হাতছাড়া করা যাবে না।

পর দিন দাবা খেলতে বসে গজপতি বললেন, “খুব যে জিনিসগুলোকে খেলনা বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিলে, এই তো গত কালই ওগুলো হাতানোর জন্য এক জন বুড়ো লোক এসে হাজির। বলে কিনা সে এক জন টাইম ট্র্যাভেলার। আমি অবশ্য তার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি, লোকটা গুলবাজ। পাত্তাই দিইনি।”

সুরেশ সিরিয়াস মুখ করে বললেন, “তোমার উচিত ছিল লোকটাকে পুলিশে দেওয়া। ছেড়ে দেওয়াটা উচিত হয়নি।”

“আরে লোকটা বেশ বুড়ো, আমার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়, পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর তো হবেই। পুলিশের রুলের গুঁতো খেলে যে অক্কা পাবে হে!”

“পুলিশ বুঝি যাকে পায় তাকেই পেটায়? ওটা তোমার ভুল ধারণা। তবে মাঝে-মাঝে থার্ড ডিগ্রির দরকার হয় কথা আদায়ের জন্য। তোমার উচিত ছিল পুলিশকে ফোন করে ধরিয়ে দেওয়া।”

“আরে বাবা, লোকটা গুলগপ্পো ঝেড়েছে মাত্র, তার বেশি তো কিছু করেনি! গুল মারা ভাল নয় ঠিকই, কিন্তু ক্রাইমের মধ্যেও পড়ে না। ঠিক কিনা!”

সুরেশ গম্ভীর গলায় বললেন, “হুঁ, তা বটে। তবে পুলিশে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখা ভাল।”

“তোমার যেমন পুলিশের ওপর অগাধ বিশ্বাস আমার কিন্তু তেমন নেই। পুলিশ অনেক ভুলভাল করে।”

“তার চেয়ে অনেক বেশি ভুল তুমি করো। কী করে যে তুমি সায়েন্টিস্ট হলে সেটাই রহস্য। অবশ্য শুনেছি, আইনস্টাইনও নাকি বাজারে গিয়ে পয়সার হিসেব মেলাতে পারতেন না।”

“তা হলেই বুঝে দেখো, কারও কারও মাথা ছোটখাটো ব্যাপারের জন্য নয়।”

“তা বলে নিজেকে আইনস্টাইন ভেবে ফেলো না যেন! তাঁর দোষগুলো পেলেই তো হবে না, গুণগুলোও তো পেতে হবে!”

“তা বটে।”

“কখনওসখনও গজপতি যে দাবায় সুরেশবাবুকে হারিয়ে দেন না তা কিন্তু নয়। কালেভদ্রে তেমন ঘটনাও ঘটে। আজ যেমন। একটা নৌকো এবং দুটো গজের আচমকা কম্বিনেশনে আজ সুরেশবাবুকে এমন চেপে ধরলেন গজপতি যে, সুরেশবাবু সারেন্ডার করে বললেন, “না হে গজপতি, আজ দেখছি তুমি দুর্ধর্ষ খেলেছ! আমার আর দেওয়ার মতো চালই নেই।”

গজপতি আজ ভারী ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। আজও যথারীতি ঘন এবং জমাট কুয়াশা। চার দিকে হিম শীতলতা। রাস্তা অন্ধকার। কিন্তু গজপতির ভিতরটায় আজ আলো জ্বলছে। আজ তিনি সুরেশকে হারিয়ে দিয়েছেন। সুরেশ কিছু গ্যারি কাসপারভ বা বিশ্বনাথন আনন্দ নন, তবু গজপতির আজ নিজের পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। নিজেকেই মালা পরানোর ইচ্ছে হচ্ছিল। নিজের হাতে বিশ্বকাপ তুলে দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। তিনি মনশ্চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছেন, হাজার হাজার লোক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর জয়ে হাততালি দিচ্ছে, চিৎকার করে অভিনন্দন জানাচ্ছে। গা বেশ গরম লাগতে লাগল গজপতির। তেমন শীতও যেন করছে না। ওহ, আজ জব্বর চাল দিয়েছেন তিনি। অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে, আগুপিছু ইগলের মতো পর্যবেক্ষণ এবং চমৎকার ক্যালকুলেশন করে। বাহবা! বাহবা!

কিন্তু এই জয়টা তো সেলিব্রেট করা দরকার! কিন্তু কী করে সেলিব্রেট করা যায়? রাতে লুচি আর পাঁঠার মাংস হলে কেমন হয়? কিংবা মুরগি আর পরোটা? সঙ্গে একটু রাবড়ি!

মুশকিল হল মনে-মনে ভাবলেও কথাগুলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে বেরিয়ে আসে এবং আশপাশের লোক শুনতেও পায়। কে এক জন পাশ কাটিয়ে যেতে-যেতে বলে গেল, “তা হলে তো তোফা হয় মশাই! বলেন তো আমারাও জনা কয়েক চলে আসতে পারি আপনার বাড়ি। কত কাল মুরগি আর পরোটা খাওয়া হয়নি!”

গজপতি অপ্রস্তুত হলেন। নাহ, তিনি মনে-মনে ভাবলেও লোকে যদি তা টের পেয়ে যায় তা হলে তো বেজায় সঙ্কট! তার চেয়ে এ সব বরং না-ভাবাই ভাল। তার উপর লুচি-মাংস বা মুরগি-পরোটা, এ সব প্রস্তাবে সুচরিতা দেবীকে রাজি করাবে কে? কার এমন বুকের পাটা? এক ঘটি জল ঢেলে দেবেন। মনটা বড্ড দমে গেল তাঁর। না, আজকের স্মরণীয় জয়টাকে উপভোগ করার কোনও কৌশলই তাঁর মাথায় আসছে না।

বেজার মুখে এবং বিষণ্ণ মনে তিনি ঘরে এসে চুপচাপ কিছু ক্ষণ বসে রইলেন। তিনি যে আজ একটা বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন সেটা যে কাকে জানানো যায় সেটাই ভেবে পেলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি উঠে নিয়মমাফিক তাঁর আলমারিটা খুলে তিনটি জিনিস ঠিকঠাক আছে কি না তা খতিয়ে দেখলেন। আছে। টর্চ, হুইস্‌ল আর লাট্টু সব ঠিকঠাকই আছে।

আলমারিটা বন্ধ করতে গিয়েও হঠাৎ তাঁর একটা খটকা লাগল। তিনটে জিনিস আছে বটে, তবে তার সঙ্গে একটা বাড়তি জিনিসও আছে বলে মনে হচ্ছে যেন! হ্যাঁ তো! লাট্টুটার পাশেই সযত্নে ভাঁজ করা একটা লেত্তি! আশ্চর্য! লেত্তিটা এল কোত্থেকে? এই লাট্টুর সঙ্গে তো লেত্তি ছিল না! থাকার কথাও নয়! এই লাট্টু ঘোরাতে লেত্তির তো কোনও প্রয়োজনই হয় না! তা হলে?

মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছিলেন না গজপতি। তিনি সন্দিহান হয়ে লাট্টুটা নিয়ে দু'আঙুলের ফুরকি দিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু লাট্টুটা মোটেই ঘুরল না, নেতিয়ে পড়ে গেল। গজপতি অবাক! এসব কী হচ্ছে! লাট্টুটার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি। তার পর লেত্তিটা নিয়ে যত্ন করে লাট্টুটায় পেঁচিয়ে হাত ঘুরিয়ে ছুড়ে মারতেই

লাট্টুটা মেঝেয় পড়ে বনবন করে ঘুরতে লাগল এবং কিছু ক্ষণ পরেই দম ফুরিয়ে ঘাড় লটকে নেতিয়ে ছিটকে গিয়ে চেয়ারের পায়ায় লেগে থামল। গজপতি অবাক, লাট্টুটা কি স্বধর্মচ্যুত হয়েছে, নাকি কেউ পাল্টে দিয়ে গেছে!

দরজার কাছে ছোট্ট একটা গলাখাঁকারি শোনা গেল, গোপাল ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, ''মেসোমশাই কি এত রাতে লাট্টু ঘোরাচ্ছেন নাকি?''

গজপতি আঁতকে উঠে বলেন, ''কে বলেছে যে, আমি লাট্টু ঘোরাচ্ছি!''

গোপাল আহ্লাদের গলায় বলে, ''বলতে নেই, লাট্টু কিন্তু আপনি ভালই ঘোরান! আড়াল থেকে দেখছিলাম তো! দিব্যি লেত্তি প্যাঁচালেন, তার পর ওস্তাদের মতো হাত উল্টে লাট্টুটা ছুড়লেন, ঘুরলও চমৎকার। মাসিমা যে বলেন আপনি কোনও কাজের নন, সে কথাটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। আমি এখুনি মাসিমাকে ব্যাপারটা গিয়ে জানাচ্ছি।''

গজপতি আতান্তরে পড়ে বললেন, ''ওরে দাঁড়া, ও সব বললে হিতে বিপরীত হবে যে! এই নে বাবা কুড়িটা টাকা রাখ। কিছু বলতে হবে না মাসিমাকে।''

গোপাল বিদায় হলে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে খানিক ক্ষণ ভাবলেন! তার পর সন্দেহের বশে তিনি তাড়াতাড়ি টর্চটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, একই টর্চ বলেই তো মনে হচ্ছে। কম্পিত বক্ষে তিনি সাবধানে সুইচটা টিপতেই দিব্যি ফটফটে আলো জ্বলে উঠল যে! কী সর্বনাশ, এ রকম তো হওয়ার কথা নয়! এই টর্চে আলো জ্বলছে কেন? অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তিনি টর্চটার দিকে চেয়ে রইলেন। দুঃখে, শোকে তাঁর বুক ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। এগুলো কি সেই জিনিসগুলো নয়!

এ বার তিনি কাঁপা হাতে হুইস্‌লটা নিয়ে ভাল করে দেখলেন, হুবহু সেই একই হুইস্‌ল। তাঁর বুক কাঁপছে, হাত-পা বশে নেই, একটু ভেবে নিয়ে তিনি হুইস্‌লটা ঠোঁটে চেপে ধরে খুব জোরে একটা ফুঁ দিলেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, নিঝুম নিস্তব্ধতা ভেঙে হুইস্‌লটা পঞ্চম স্বরে কুহু কুহু রবে বেজে উঠে সারা বাড়ি এবং পাড়া কাঁপিয়ে তুলল। আর তার ফলে সারা বাড়িতে একটা শোরগোল এবং হুলস্থুল পড়ে গেল। বাড়ির সবাই ছুটে এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি!

গজপতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হুইস্‌লটার দিকে চেয়ে রইলেন, বিশ্বাসঘাতক হুইস্‌লটার তো বাজার কথাই নয়! এর পর আর সন্দেহের অবকাশই নেই যে, আদ্যনাথ সর্বাধিকারীর লোকজন এসে আসল জিনিসগুলো চুরি করে নকল জিনিস রেখে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি।

দরজায় ধাক্কাধাক্কি আর চেঁচামেচি শুনতে তাঁর অনেক সময় লাগল। দরজা খুলে দিয়ে তিনি দেখলেন হুইস্‌লের আওয়াজে বাড়ি এবং পাড়ার লোকও জড়ো হয়ে গেছে। লজ্জার শেষ নেই। অথচ আজ তাঁর জীবনের একটা গৌরবেরই দিন ছিল। আজ তিনি সুরেশকে দাবায় হারিয়ে দিয়েছেন!

॥ ৭ ॥

বিনয় সেনগুপ্তর অপারেশন ঠিকঠাক হয়ে গেছে। তিনি বিপন্মুক্ত। খবরটা দু'জনের কাছ থেকে পেল শ্যাডো। মা এবং ডাক্তার। পল্লব দাশগুপ্ত বললেন, ''হি উইল লিভ অ্যানাদার ফিফটি ইয়ার্স। কাল আমরা ওকে হাঁটাব। হি ইজ় অ্যাজ় ফাইন অ্যাজ় আ হুইস্‌ল।''

বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল শ্যাডোর। বাবা বেঁচে থাকবে, এর চেয়ে ভাল ব্যাপার আর কী-ই বা হতে পারে! কিন্তু বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে আর এক জনের প্রাণ যে তাকে নিতেই হবে! এখন ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখছে সে যে, এই বিনিময়টা বিনয় সেনগুপ্তর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না। জানা কথাই যে, বিনয় সেনগুপ্ত খবরটা শুনলে মূর্ছা যাবেন। এবং বেঁচে থাকার উপর তাঁর আর কোনও আকর্ষণই থাকবে না। উপরন্তু ছেলের এ হেন কাজে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাবে। বেঁচে থাকাটাই হবে বিড়ম্বনা। শ্যাডোর দিক থেকে ঘটনাটা এক রকম, কিন্তু বিনয় সেনগুপ্তর দিক থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম। ধরা পড়লে শ্যাডোর ফাঁসি বা যাবজ্জীবন হবে। তার তাতে কোনও পরোয়া নেই বটে, কিন্তু তার পরিবারটির সম্মান থাকবে না। সে তো আর শহিদ নয়, এক জন খুনি।

কিন্তু এ সব ভাবাবেগের চিন্তা করে এখন লাভ নেই। দ্য ডাই ইজ় কাস্ট। এখন আর ফেরার উপায় নেই। লোকটাকে মরতেই হবে।

দুপুরে হোটেলের রেস্তরাঁয় লাঞ্চ করছিল সে। এদের খাবার খুব একটা ভাল কিছু নয়। তবে মোটামুটি খাওয়া যায়। ফ্রায়েড রাইস আর কষা মাংস, সঙ্গে স্যালাড। হাবিজাবি সে পছন্দ করে না। খাওয়ার একদম শেষ দিকটায় ফোনটা এল। সেই প্রাইভেট নম্বর।

''হাই মিস্টার শ্যাডো, এনজয়িং দ্য লাঞ্চ?''

শ্যাডো ভ্রু কোঁচকাল। লোকটা কি তাকে লক্ষ করছে? সে চট করে তার চার দিকটা দেখে নিল। আরও জনা আট-দশ পুরুষ ও মহিলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে লাঞ্চ করছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে এই লোকটা আছে কি না বোঝা গেল না। কারও কানেই তো মোবাইল নেই!

সে ঠান্ডা গলাতেই বলল, ''মোর অর লেস। কিছু বলবেন?''

''আপনি কি লোকটাকে স্পট করতে পেরেছেন?''

''না, এখনও নয়।''

''এনি হিন্ট?''

''মনে হচ্ছে না।''

''এনিওয়ে, ইউ উইল গেট হিম। সময় আছে। অ্যান্ড আই ক্যান লেন্ড ইউ আ গান, ইফ নিডেড। গুড লাক,'' বলেই কেটে দিল। শ্যাডো ধীরে-সুস্থে খাওয়া শেষ করে উঠল। ফলওয়ালা ছেলেটাকে একশো টাকা দিয়েছে সে। কথা আছে আজ বিকেলের মধ্যে কালুদাদার খবর এনে দেবে। সুতরাং হাতে একটু সময় আছে। সমস্যা হল, শ্যাডো এই সব কাজে দড় নয়। সে নিজের এসকেপ রুট ভেবে রাখেনি। পেশাদার খুনিরা পালানোর পথ আগে থেকেই ঠিক করে রাখে। কিন্তু সেই কাজে শ্যাডো আনাড়ি। তাই সে সম্ভবত ধরা পড়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে কোর্ট-কাছারির ঝামেলা, পাবলিসিটি এবং পরিবারের অসম্মান এড়ানোর জন্য সে ইচ্ছে করলে আত্মহত্যা করতে পারে। আর সেটা করতে হলে তার একটা পিস্তল বা রিভলভার দরকার। সে ভেবে রাখল, ওই রহস্যময় লোকটা এর পরের বার ফোন করলে সে পিস্তলটা চেয়ে নেবে।

দুপুরে নিজের ঘরে একটু আধশোয়া হয়ে এক মনে ভাবছিল সে। কী ভাবে এক জন লোককে খুন করা যায়! কাজটা যত সহজ বলে ভেবেছিল সে, এখন আর তত সহজ বলে মনে হচ্ছে না। ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সে। কেউ যেন বলছে, 'সে তোমার কোনও ক্ষতি করেনি, তাকে তুমি চেনোও না, তার উপর তোমার কোনও রাগ নেই, প্রতিশোধ নেওয়ার নেই। তা হলে তাকে মারার লজিক কী?'

ফালতু ভাবনা। মারার লজিক নেই কেন? আছে তো! পাঁচ লাখ টাকা! এর চেয়ে বড় মোটিভ আর কী হতে পারে!

ভরা পেটে একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল তার। হঠাৎ দরজায় নক। ধড়মড় করে উঠে পড়ল সে। দরজা খুলে দেখল হোটেলেরই এক জন বেয়ারা। হাতে একটা ট্রে, তার উপর একটা কাগজে জড়ানো প্যাকেট।

''কী এটা?''

''ঠিক জানি না স্যর। রিসেপশন থেকে পাঠিয়ে দিল।''

প্যাকেটটা নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। প্যাকেটটা চৌকো এবং ভারী। ভিতরে কী আছে তা অনুমান করতে বিশেষ মাথা ঘামাতে হল না তাকে। লোকটা তার অনুমতির অপেক্ষা না-করেই বোধ হয় পিস্তলটা পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ ভাবে কেউ পিস্তল পাঠায়? লোকটা কি পাগল?

প্যাকেটটা খোলার আগে সে দরজা লক করে নিল। তার পর কাগজের মোড়ক খুলে চৌকো পিচবোর্ডের বাক্সটা খুলে দেখল, পিস্তলই বটে। এই বস্তু সে বিশেষ দেখেনি, সিনেমাটিনেমায় ছাড়া। সঙ্গে একটা

কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ।

শ্যাডো পিস্তলটা হাতে নিল। বাথরুমে গিয়ে আয়নায় দেখল, তাকে পিস্তল হাতে কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। প্রিন্ট আউটে বলা হয়েছে, মোট এগারোটা কার্তুজের একটা ক্লিপ ভরা আছে পিস্তলটায়, এবং ব্যবহার খুব সোজা। ঘরে এসে সে পিস্তলটা বালিশের তলায় লুকিয়ে ফেলল, ওটাই সবচেয়ে সহজ জায়গা বলে। কিন্তু তার অস্বস্তি হচ্ছে। পিস্তলে শব্দ হয়, এবং পিস্তল নিজেই একটা এভিডেন্স। প্রিন্ট আউটটা বার কয়েক পড়ে সে সেটাকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। প্রিন্ট আউট না-থাকলেই বা কী, ইন্টারনেটে সার্চ করলেই পিস্তল চালানোর কৌশল শিখিয়ে দেবে। বাক্সটা অবশ্য সাদামাটা একটা বাক্স, পিস্তলের বাক্স নয়, বোধ হয় মোজা বা রুমালের বাক্স। তাই সেটা আপাতত ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলল।

ফলওয়ালা ছেলেটার নাম রতন। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ছেলেটা এল। ভালমানুষের মতো মুখ, সরল-সোজা। বলল, ''স্যর, কালুদাদা থাকে নদীর ধারের একটা ঝুপড়িতে। আমি গিয়ে অবশ্য কালুদাদাকে পাইনি। শুনলাম তাকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে। শুধু কুকুরটা আছে।''

শ্যাডো অবাক হয়ে বলে, ''পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে কেন?''

''পুলিশ তো ওই রকমই স্যর, ফালতু ঝামেলা পাকায়। কালুদাদা ভাল লোক স্যর, ঝুট-ঝামেলায় নেই। পুরনো মাল বিক্রি করে, কিন্তু স্মাগলার নয়।''

''কুকুরের কথা কী বলছিলে?''

রতন এক গাল হাসল, ''বলল, কালুদাদার একটা কুকুর আছে স্যর, খুব ডেঞ্জারাস কুকুর। তবে শিস দিলে চুপ করে যায়।''

''শিস দিলে চুপ করে যায় কেন?''

''ঠিক জানি না। ও রকম ট্রেনিং দেওয়া আছে বলে মনে হয়। কালুদাদাই এক বার বলেছিল যে, ওর একটা কুকুর আছে, খুব রাগী। তবে শিস শুনলে কিছু করে না, শান্ত হয়ে যায়। আপনি হোটেল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেলে বিনোদিনী হাই স্কুল দেখতে পাবেন, স্কুল বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা এগোলে শাল-জঙ্গল। ভিতরে পায়ে হাঁটা রাস্তা আছে। ওটা ধরে এগোলেই নদী। নদীর চরে কালুদাদার ঠেক। প্লাস্টিকের ঘর, দেখলেই চিনতে পারবেন। আমি যাই স্যর, আমাকে দোকান খুলতে হবে।''

''ঠিক আছে রতন। থ্যাঙ্ক ইউ।''

রতন চলে গেল। শ্যাডো একটু ভ্রূ কুঁচকে রইল। বাঁচা গেল, সে অন্তত শিস দিতে পারে। কিন্তু সমস্যা আরও আছে। সেটা হল রতন। এই এক জন সাক্ষী অন্তত থাকছে যে শপথ করে বলতে পারবে, শ্যাডো কালুদাদার আস্তানার খোঁজ করেছিল। কী আর করা যাবে, কিছু রিস্ক না-নিলেও তো হবে না!

একা ঘরে সে কিছু ক্ষণ শিস দিয়ে 'কে স্যারা স্যারা' বাজাল। যা হওয়ার তা হবে। 'দি ফিউচার ইজ় নট আওয়ার্স টু সি'। শিস দিলে তার মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে যায়। বন্ধুরা বলে সে নাকি চমৎকার শিস দেয়। শ্যাডো নিজে অবশ্য বোঝে না তার শিস কতটা ভাল। তবে বাবার হাসপাতালের এক জন মাঝ-বয়সি নার্স, সে যখন শিস দিচ্ছিল তখন তাকে বারণ করতে এসে বলেছিলেন, ''আপনি অবশ্য শিস ভালই দেন।''

হয়তো সত্যিই তার এই একটা প্রতিভা আছে। কিন্তু শিস দিয়ে কে কবে রাজা হয়েছে?

শীতকাল। তাই বেলা বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। পাঁচটা বাজতে না-বাজতেই বাইরে অন্ধকার নেমে এল। কুয়াশা ঘনিয়ে উঠছে। পিস্তলটা ঘরে রেখে যেতে সাহস হল না তার। হোটেলের ঘরের কোনও নিরাপত্তা নেই, কে জানে রুম সার্ভিস এসে হাজির হবে কি না। সুতরাং সে ভারী পিস্তলটা প্যান্টের ডান দিকের পকেটে ঢোকাল। তাতে প্যান্টটা বেশ আঁটসাঁট হল এবং পকেটটা বেজায় ফুলে রইল। সেটা ম্যানেজ করতে পুলওভারটা টেনে নামাতে হল খানিকটা। এক রকম ঢাকাচাপা দেওয়া হল বটে, কিন্তু তাতে মনের খচখচানিটা গেল না। সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে কখনও চলাফেরা তো করেনি সে!

রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। কারণ আজ শীতটা খুব জেঁকে পড়েছে। একটু কোলকুঁজো হয়ে সে দ্রুত বেগে হাঁটছিল। জোরে না-হাঁটলে গা গরম হবে না। বিনোদিনী স্কুল পেরিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরল সে। এই রাস্তাটা বেশ অবহেলিত, স্ট্রিটলাইট নেই। খানিক দূর অন্ধকারেই হাঁটল সে, তার পর দু'-এক বার হোঁচট খেয়ে মোবাইলের টর্চটা অন করে নিল। রাস্তা বড় কম নয়। লোকালয় পার হয়ে তার পর শাল-জঙ্গল। এবং শাল-জঙ্গলটাও বেশ অনেকটা গভীর। মাঝে-মাঝে আলো জ্বেলে প্রায় এক কিলোমিটার জংলা রাস্তা পেরিয়ে তার পর নদী। সেখানেও অন্ধকার, তবে তত ঘন নয়। কুয়াশায় কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। চুপচাপ কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তার পর হঠাৎ একটা কুকুরের ডাক শুনতে পেল শ্যাডো। ডাকটা বেশ ব্যারিটোন গোছের। অর্থাৎ খানদানি কুকুর। দিশি কুকুরের মতো খেঁকি ঘ্যান্যানে ডাক নয়। শ্যাডোর কান চমৎকার। সে কুকুরের ডাকটাকে লক্ষ করে হাঁটতে লাগল। শিস দিল না, কারণ শিস শুনলে কুকুরটা হয়তো ডাক বন্ধ করে দেবে। সে বোকা নয়। অন্তত একশো কদম হাঁটার পর তার চোখের সামনে একটা আবছা ইগলু গোছের স্ট্রাকচার দেখা গেল। কুকুরের ডাক এখন খুব কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে। সে জায়গা মতো এসে পড়েছে। সে মৃদু লয়ে শিস দিয়ে, 'কান্ট্রিরোডস, টেক মি হোম' বাজাতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, গানটা বেজে উঠতেই কুকুরটা একদম চুপ করে গেল।

কাছে গিয়ে শ্যাডো দেখল, কালুদাদা নামক লোকটি একটি অতিশয় দীন-দরিদ্র প্লাস্টিকের ছাউনি দেওয়া ঘরে থাকে। তা হলে লোকটা এমন পেডিগ্রির একটা কুকুর পোষে কেমন করে? এটা তো লোকটার স্টেটাসের সঙ্গে মানাচ্ছে না! সে কিছু ক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর ভাবল, আমি তো কোনও রহস্য উন্মোচন করতে আসিনি! আমার কাজ একটা লোককে খুন করা। তার পর আমার ছুটি। মুক্তি। তারও পর কী হবে না-হবে তা জানা নেই। মোবাইলের আলোয় সে ঘরে ঢোকার যে ফোকরটা খুঁজে পেল তা দিয়ে তার মতো এক জন বড়সড় লোকের পক্ষে ভিতরে প্রবেশ আয়াসসাধ্য। কিন্তু কী আর করা যাবে, কষ্ট করেই ভিতরে ঢুকল সে। কালুদাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, সুতরাং লোকটার আরও একটু আয়ু আছে। ঘরে থাকলে আজই কাজটা সেরে ফেলা যেত!

কালুদাদার ইগলুতে ঢুকে চার দিকে মোবাইলের আলো ফেলে ঝুম হয়ে গেল শ্যাডো। এত বিকট দারিদ্রের চিহ্ন চার দিকে যে, বিশ্বাস হয় না এত গরিবও কেউ হয়। এক ধারে ইট সাজিয়ে একটুখানি কাঠের উনুন, একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, একটা কানাউঁচু অ্যালুমিনিয়ামেরই থালা, গোটা চারেক কাগজের ঠোঙায় চাল, ডাল, নুনের মতো কিছু আছে বোধ হয়। আর অন্য ধারটায় মাটির উপর পাতা একটা প্লাস্টিকের শিট, তার উপর একটা ময়লা চাদর আর বালিশের বদলে একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলি গোছের। কোনও কম্বল বা কাঁথা নেই। তৈজসপত্র বলতে এই যা। এই হাড়ভাঙা শীতে লোকটা এখানে থাকে কী করে?

মোবাইলের চার্জ কমে আসছে। সে আলোটা ঘুরিয়ে ফেলে দেখল, আর একটা প্লাস্টিক শিটের উপর কিছু পুরনো জিনিসপত্র পড়ে আছে। ভাঙা ডলপুতুল, সাঁড়াশি, প্লাস, আড়বাঁশি, মাউথ অর্গান, ফিচার ফোন, এক্সটেনশন কর্ড, বাতিল হওয়া ভিডিয়ো প্লেয়ার ইত্যাদি। এ সবের কোনও সেকেন্ড হ্যান্ড বাজারও নেই। সে মোটেই ভাবাবেগওয়ালা মানুষ নয়। তবু লোকটার দারিদ্রের বহর দেখে তার চোখ ছলছল করতে লাগল। এ কাকে মারতে এসেছে সে? এত খরচ করে, পাঁচ লাখ টাকা সুপারি ফি নিয়ে, শেষ পর্যন্ত একটা ভিখিরি-প্রায় মানুষকে মারতে হবে? আর এই লোকটাকে ওরাই বা মারতে চায় কেন?

শুধু একটা জিনিসই মিলছে না। কালুদাদার কুকুরটা। এই জাতের

কুকুর পুষতে পারে বড়লোকেরা। কারণ পেডিগ্রি কুকুর পোষার অনেক খরচ। কালুদাদা তো আর কুকুরটাকে শাকপাতা খাইয়ে রাখে না! কিন্তু আসল কথা হল, এ সব রহস্য ভেদ করা তার কাজ নয়। কালুদাদা তার কুকুরকে হাওয়া খাইয়ে রাখুক, তাতে তার কী আসে যায়! অপ্রাসঙ্গিক জিনিস নিয়ে ভাবতে গেলে ফোকাস নষ্ট হয়ে যাবে।

বাইরে একটা খুব মৃদু পায়ের শব্দ গোছের শোনা গেল কি? শ্যাডো কান পেতে রইল। আর কিছু শোনা না-গেলেও শ্যাডো টের পেল, সে একা নয়। আরও কেউ কাছাকাছি আছে। তা হলে কুকুরটা ডাকল না কেন? তবে কি কালুদাদাই ফিরে এসেছে পুলিশের হাত ছাড়িয়ে?

শ্যাডো নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। চার দিকে চেয়ে কাউকে দেখতে পেল না। হঠাৎ কুকুরটা তাকে দেখে 'ঘ্রাউ' করে বিকট একটা ডাক ছাড়তেই সে শিস দিয়ে উঠল, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।' কুকুরটা চুপ হয়ে ফের বসে পড়ল। তাতে একটু সাহস হল শ্যাডোর। সে কুকুরপ্রেমী নয়, তবে প্রাণীটিকে তার খারাপ লাগে না। সে ধীর পায়ে কুকুরটার কাছে এগিয়ে গেল। বিশাল কুকুর, যে কোনও মানুষকে অনায়াসে পেড়ে ফেলতে পারবে। শিস দিতে-দিতেই কুকুরটার পাশে উবু হয়ে বসল সে। তার পর আরও একটু সাহস সঞ্চয় করে সে কুকুরটার মাথায় আস্তে করে হাত রাখল। 'কুঁই' করে একটা শব্দ করল কুকুরটা। আহ্লাদের শব্দ। বেশ কিছু ক্ষণ কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একটু মায়া হল তার। জীবনে কখনও কোনও কুকুরকে আদর করেনি সে। এই প্রথম।

কিন্তু রাত হয়ে আসছে। তার ফেরা উচিত বলে সে উঠে পড়ল। তার পর চরের বালিয়াড়ি ভেঙে ডাঙা-জমিতে পা রাখল। শাল-জঙ্গল ভেদ করে হাঁটতে লাগল গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে। ক্ষুরধার কোনও চিন্তা নয়, এলোমেলো চিন্তা। সবচেয়ে অস্বস্তিকর চিন্তা হল, এক জনকে তার খুন করতেই হবে।

হোটেলে ফিরেই ফোনটাকে চার্জে বসাল সে। ব্যাটারি একদম শেষ। কিছু ক্ষণ চার্জ হওয়ার পর মাকে ফোন করল।

মা বলল, ''জ্ঞান ফিরেছে, তবে এখনও কারও সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না। কাল বিকেলে নাকি দেবে। তোর কাজ হলে তাড়াতাড়ি ফিরে আয়।''

''যাব মা। আর একটু কাজ বাকি আছে।''

মায়ের সঙ্গে কিছু ক্ষণ কথা বলার পর ফোনটাকে ফের চার্জে বসিয়ে খানিক ক্ষণ ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ় করে নিল শ্যাডো। হাঁটাহাঁটি এবং এক্সারসাইজ়ের ফলে তার খিদে পাচ্ছে। কিন্তু রাত মোটে আটটা বাজে। এত তাড়াতাড়ি ডিনার করার মানেই হয় না। সে ফোনে অমলেটের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পিস্তলটা বালিশের তলায় রেখেছে। বেয়ারাটা আবার কিছু সন্দেহ করবে না তো! না, বালিশটা তেমন ফুলে নেই!

সেই প্রাইভেট নম্বর থেকে ফোনটা এল রাত সাড়ে দশটায়, যখন সে রুটি আর মুরগির মাংস দিয়ে ডিনার সেরে সবে ঘরে ঢুকেছে।

''হাই শ্যাডো, আপনি তো দারুণ শিস দিতে পারেন! আ মাস্টার হুইস্‌লার!''

শ্যাডো ভ্রু কোঁচকাল। লোকটা তার শিস শুনল কোথায়? তা হলে কি তাকে ফলো করে কালুদাদার ঠেক পর্যন্ত গিয়েছিল লোকটা! শ্যাডো কি ওরই পায়ের শব্দ শুনেছিল?

শ্যাডো নিরাসক্ত গলায় বলল, ''থ্যাঙ্ক ইউ। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?''

''অফ কোর্স। এনিথিং।''

''ও ভাবে পিস্তলটা পাঠালেন কেন? ইট ওয়াজ় রিস্কি।''

''ডোন্ট ওরি। একটু-আধটু ছোটখাটো রিস্ক নিতেই হয়। ইট ইজ় অল ইন দ্য গেম।''

''আমি তো পিস্তল চাইনি!''

''জানি। আপনি নভিস, তাই চাননি।''

''আর একটা কথা।''

''গো অ্যাহেড মিস্টার শ্যাডো।''

''এ রকম গরিব এক জন হ্যাভ-নটকে মারতে চান কেন আপনারা? লোকটার তো কিছুই নেই! অলমোস্ট আ বেগার।''

''ওটা ক্যামোফ্লাজ, মাই ডিয়ার শ্যাডো। লোকটা আসলে ধুরন্ধর। কতটা ধুরন্ধর তা আন্দাজ করা মুশকিল। আমরা ওর সঙ্গে একটা ডিল করতে চেয়েছিলাম। ও তাতে রাজি নয়। কয়েক কোটি টাকার অফার ও রিফিউজ় করেছে।''

''কিসের ডিল জানতে পারি?''

''আমি সেটা ঠিক জানি না। আমি একজন সামান্য অপারেটর, সব কিছু আমার জানতে নেই। তবে আন্দাজ করছি, ওর কাছে খুব ভ্যালুয়েবল কিছু আছে, যা সাদা চোখে দেখা যায় না।''

''আমি ওর ঘরটা সার্চ করেছি, সেখানে এ রকম কিছুই নেই যাকে ভ্যালুয়েবল বলা যায়।''

''আমি অত কিছু জানি না। আমাকে যা করতে বলা হয়েছে আমার শুধু সেটুকুই করার কথা, বেশি কৌতূহল উনি পছন্দ করেন না।''

''কে? কার কথা বলছেন?''

''দ্য বস।''

''হরিশ?''

''মে বি। কে যে কী, তা বলা ডিফিকাল্ট মিস্টার শ্যাডো। দাবা খেলা জানেন তো! আমরা হচ্ছি বোড়ে। আমাদের খুব বেশি কিছু জানার নেই, বোঝার নেই, করারও নেই। আন্ডারস্টুড?''

''হ্যাঁ। আর একটা কথা। আপনি কি আমাকে নদীর চর অবধি ফলো করেছিলেন?''

''না মিস্টার শ্যাডো, আমার অন্য কাজ ছিল।''

''তা হলে আমার শিস দেওয়ার ব্যাপারটা আপনি জানলেন কী করে?''

''আপনার বায়োডেটায় লেখা আছে।''

''আপনি কে?''

''নোবডি মিস্টার শ্যাডো। গুড নাইট।''

ফোনটা কেটে গেল। শ্যাডো নিশ্চিত যে, লোকটা তাকে ফলো করেছিল, কিংবা আগেভাগে গিয়ে অকুস্থলে হাজির হয়েছিল। প্যাটার্নটা বুঝতে পারছে না সে। অনেক ধন্দ রয়েছে। নিজেদের অপারেটর বা ভাড়াটে খুনিরা থাকতে এক জন মানুষকে মারার জন্য তার মতো আনাড়িকে ভাড়া করার মানে কী? এবং এত টাকা দিয়ে! কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে যাচ্ছে!

তার ঘুম গাঢ় এবং প্রায় স্বপ্নহীন। প্রচণ্ড শীতে কম্বল চাপা দিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল সে। ঘুমটা আচমকা ভাঙল ফোনের রিং শুনে।

''মিস্টার শ্যাডো, সরি টু ডিস্টার্ব। একটা ইম্পর্ট্যান্ট খবর আছে। রাত দশটায় কালীচরণকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। ইট ইজ় দ্য টাইম ফর ইউ টু ডেলিভার। প্লিজ় গেট রেডি।''

ঘুমে ভোম্বল হয়ে আছে মাথা। তাই কথাগুলো মাথায় ঢুকতে এবং বুঝে উঠতে অনেকটা সময় লাগল শ্যাডোর। সে অবাক হয়ে বলল, ''এখনই?''

''মনে রাখবেন মিস্টার শ্যাডো, আগামী কাল রাতের ট্রেনেই আপনার ফেরার টিকিট কনফার্ম আছে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইটারনিটি ইন ইয়োর হ্যান্ড। ডু ইট নাউ। গেট আপ ম্যান, অ্যান্ড গেট রেডি।''

শ্যাডো কম্বল ছেড়ে উঠে বসল। এবং কিছু ক্ষণ বসে রইল। একটু পরেই এক জন লোককে খুন করতে হবে। যে লোকটার সঙ্গে তার কোনও খাড়াখাড়ি নেই, যাকে সে চেনেও না, যাকে মারার কোনও কারণই নেই, এক মুঠো টাকা ছাড়া!

সে উঠল। নিঃশব্দে পোশাক পরল। পিস্তলটা পকেটে পুরল। হোটেল থেকে গোপনে বেরোনোর কোনও উপায় নেই। রিসেপশন দেখবে, নাইটগার্ড বা গেটকিপার দেখবে। অনেক সাক্ষী থাকছে। কিন্তু

কী আর করা! যা হওয়ার তা হবে।

মধ্য রাত্রিতে রিসেপশনে কেউ ছিল না। তবে মেন গেটের কাছে এক জন টুল পেতে বসা ঘুমন্ত লোক ছিল। তাকে ডাকতে হল গেট খোলার জন্য। লোকটা একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তার দিকে চেয়ে থেকে অবশেষে গেট খুলে দিল।

বাইরে বেরোতেই শীত যেন বাঘের মতো আঁচড়ে-কামড়ে দিতে লাগল। দুটো হাতের পাঞ্জা আর মুখ যেন ঠান্ডায় অবশ, অসাড়। দ্রুত হাঁটলে গা একটু গরম হয়, সেটাই যা বাঁচোয়া। সে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। রাস্তা জনহীন। তবে নেড়ি কুকুররা ঘেউঘেউ করে তেড়ে আসছিল। এত রাতে অচেনা লোক তারা পছন্দ করে না। এই নিয়ম সর্বত্র। বিনোদিনী স্কুল পেরিয়ে বাঁ-দিকের কাঁচা রাস্তা ধরে ফেলল শ্যাডো। অন্ধকার। সে আলো জ্বালার চেষ্টাই করল না। মনটা ভাল নেই। মন ভাল লাগছে না। আলোর চেয়ে অন্ধকারই ভাল। জীবনে বোধ হয় প্রথম নিজের হার্টের ডুগডুগি শুনতে পাচ্ছিল সে। তার হৃৎপিণ্ড জানান দিচ্ছে যে, সে বেঁচে আছে।

শাল-জঙ্গলে ঢুকতেই পায়ের নীচে মর্মরধ্বনি, শুকনো শালপাতা ভাঙছে। আবার উপর থেকে টুপটাপ শিশির পড়ছে। অন্ধকারেই দীর্ঘ রাস্তাটা পেরিয়ে এল সে। টাইম টু ডেলিভার। ঋণ শোধ করতে হবে। তার বাবা এখন প্রাণ ফিরে পেয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। সেই প্রাণের দাম শ্যাডোকে এই মধ্য রাতে মেটাতে হচ্ছে।

শাল-জঙ্গলের শেষে এসে নদীর গন্ধ পেল শ্যাডো। আর কালুদাদার কুকুরটা বোধ হয় পেল তার গন্ধ। আচমকা তার গম্ভীর ব্যারিটোন গলায় চার দিক প্রকম্পিত করে ডাকল, 'ঘ্রাউ ঘ্রাউ...'

শ্যাডো মৃদু শিসে গাইতে লাগল 'মায়াবনবিহারিনী হরিণী'। কুকুরটা চুপ। চার দিক নিস্তব্ধ। শুধু শ্যাডোর শিসের মৃদু ও মধুর শব্দ চার দিকে নেচে বেড়াতে লাগল, 'থাক থাক নিজমনে দূরেতে, আমি শুধু বাঁশরির সুরেতে...'

খুব ধীরে ধীরে হেঁটে বালিয়াড়ি পেরিয়ে কালুদাদার দীন-দরিদ্র ইগলুটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। লোকটা কি জেগে আছে? জেগে থাকার কথা নয়। কুকুরটাকে বাইরে দেখতে পেল না সে। সম্ভবত ভিতরেই আছে। তাই সে শিস দেওয়া বন্ধ করল না। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিল, লকটা খুলল। তার পর প্লাস্টিকের ঢাকনাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

অন্ধকারেই আচমকা হঠাৎ বিশাল একটা ছায়া ঢেউয়ের মতো এসে পড়ল তার উপর। কুকুরটা! হ্যা হ্যা করে হাঁপ-ধরা একটা শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে শ্যাডোকে জিভ দিয়ে চেটে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছিল সে। শ্যাডো বিশাল কুকুরটার ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে আছে কোনও ক্রমে। অপ্রস্তুত অবস্থা। হাতে ধরা তার অসহায় পিস্তল।

ফস করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। তাতে অনেকটা আলো হল যেন। আধশোয়া অবস্থা থেকেই প্লাস্টিক শিটের বিছানায় রোগা চেহারার লোকটাকে দেখতে পেল শ্যাডো। উঠে বসে অবাক চোখে দেখছে তাকে। ঝাকড়মাকড় চুল, একটু কোমল দাড়ি আর গোঁফ, চোখ দুটো ভারী মায়াবী। বিস্ময়ের সঙ্গে নরম গলায় বলল, ''আপনি কে বাবু?''

কুকুরটা তাকে ছেড়ে মালিকের কাছে গিয়ে চুপ করে বসে পড়ল। আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসল শ্যাডো। তার পর বলল, ''আমার নাম শ্যাডো সেনগুপ্ত।''

''আপনি খুব সুন্দর শিস দেন। কোথায় শিখলেন বাবু?''

শ্যাডো মাথা নেড়ে বলে, ''কোথাও শিখিনি। আপনা থেকেই শেখা।''

লোকটা একটা মোমবাতি জ্বেলে একটা পুরনো চেহারার মোমদানিতে রেখে বলে, ''অমন উঁচু পর্দায় এত নিখুঁত শিস বড় একটা শোনা যায় না। ও রকম শিস না-দিলে আজ গোলো আপনাকে ছিঁড়ে ফেলত। কী ভাগ্যি যে আপনি ও রকম শিস দিতে পারেন! আমাকে কি কিছু বলবেন বাবু? আপনার হাতে একটা পিস্তল দেখছি যেন!''

শ্যাডো কিছু ক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল। তার পর মুখ তুলে বলল, ''আমি আপনাকে মারতে এসেছি।''

কালুদাদা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলে, ''তাই তো বাবু, বড় মুশকিলে ফেললেন!''

শ্যাডো বিষণ্ণ গলায় বলে, ''আমার উপায় নেই। আমি এই কাজটা করার জন্য কিছু টাকা পেয়েছি। আমার খুব দরকার। টাকাটা তো অন্য ভাবে শোধ দিতে পারব না! আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।''

কালুদাদা বিষণ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে ছিল। হতাশ ভাবে মাথাটা নেড়ে স্বগতোক্তির মতো করে বলল, ''আমাকে মারতে এই তো সে দিন আরও এক জন এসেছিল, তারও আগে আরও এক জন এসেছিল, আমি কী করব বলুন, গোলো তাদের গলার নলি কেটে ছিঁড়ে ফেলেছে। ও রকমই প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে গোলোকে! আমার কিছু করার ছিল না বাবু! তাদের লাশ ওই বালিয়াড়িতে পোঁতা আছে। শুধু আপনিই এত দূর আসতে পেরেছেন, অমন অদ্ভুত শিস দিতে পারেন বলে।''

শ্যাডো বিস্ফারিত চোখে কিছু ক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে রইল, তার পর বলল, ''তা হলে আমি না-জেনে একটা অন্যায় সুযোগ নিয়েছি কালুদাদা! আমি আপনাকে মারতে চাই না, আমি কাউকেই মারতে চাই না। কিন্তু আমার বাবার অসুখের জন্য আমাকে এই সুপারিটা নিতে হয়েছে।''

কী চমৎকার সাদা আর ঝকঝকে দাঁত কালুদাদার! যখন হাসল তখন ঘরখানা যেন আরও আলো হয়ে গেল, মৃদু স্বরে বলল, ''তাই তো! বাবার অসুখের তো চিকিৎসা দরকার, তার জন্য টাকাও তো লাগবে বাবু! তা হলে এক কাজ করেন, দেরি করে লাভ কী? পিস্তলটা তুলে গুলি চালিয়ে দেন আমার বুকে। এই তো আপনার সামনেই বসে আছি, চালিয়ে দিন!''

শ্যাডো পিস্তলটা তুলল। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।

পর পর দু'বার ট্রিগার টিপল শ্যাডো।

॥ ৮ ॥

না, গজপতির মন ভাল নেই। আজকাল ঘুম ভাল হতে চায় না, এ-পাশ ও-পাশ করতে করতেই রাত ফুরিয়ে আসে। খুব ভোর-ভোর উঠে পড়েন তিনি। বাগানে এসে বসে থাকেন বারান্দার সিঁড়িতে। অপেক্ষা করেন, যদি ফেরিওয়ালাটা তার আশ্চর্য জিনিসপত্তর নিয়ে আবার কোনও দিন আসে! কিন্তু আসে কই!

ফেরিওয়ালাটার তিন-তিনটে জব্বর জিনিস হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন। দুনিয়ার ভোলই পাল্টে দিতে পারতেন গজপতি। কিন্তু আদ্যনাথ সর্বাধিকারীর মতো একটা ছিঁচকে লোকের জন্যই হল না। গজপতি থানায় আদ্যনাথের নামে একটা চুরির কেস দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু থানা থেকে বলা হয়েছে, এ রকম কোনও লোকই নাকি এলাকায় নেই! এক জন আদিনাথ সরকারকে পাওয়া যাচ্ছে, এক জন অনাদিনাথ সর্বাধিকারীকেও পাওয়া গেছে, আদ্যনাথ অধিকারী বলেও এক জন নাকি অল্পবয়সি মানুষ আছেন, কিন্তু কালপ্রিট আদ্যনাথ স্রেফ হাওয়া। লোকটার কথা মনে হলেই গজপতি দাঁত কিড়মিড় করেন, হাতের মুঠো আপনা থেকেই ঘুষি পাকিয়ে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে। হাতের কাছে পেলে আদ্যনাথকে তিনি উস্তমকুস্তম করে ছাড়তেন। এই সব ভাবেন বলে আজকাল তাঁর প্রেশার বেড়েছে, অরুচি বেড়েছে, অন্যমনস্কতা বেড়ে এমন হয়েছে যে, গোপাল আজকাল পুকুরচুরি ছেড়ে সমুদ্দুর চুরি করতে লেগে পড়েছে।

তবে উপায় আছে। রাজু মাঝে-মাঝে তাঁকে আমলকী দিতে আসে। সে কালীচরণের ঘর চেনে। ভারী ভাবসাব নাকি তার সঙ্গে। কিন্তু অসময়ে বাড়ি থেকে বেরোলে সুচরিতা দেবী কৈফিয়ত চাইবেন। গজপতি আবার লাগসই মিথ্যে কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না। নার্ভাস হয়ে পড়েন, তোতলামি আসে, চোখ-মুখে আর্ত ভাব ফুটে ওঠে এবং

ধরা পড়ে যান। সুতরাং বুদ্ধি খাটাতে হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওই জিনিসটা তাঁর বিশেষ নেই। বুদ্ধি থাকলে পদে-পদে এত নাকাল হতে হত না তাঁকে।

একটু বেলা হলে তিনি সুরেশের বাড়িতে হানা দিলেন।

সুরেশ এই সময় বারান্দায় বসে চা খান আর প্রকৃতি দেখেন। গজপতিকে দেখে সবিস্ময়ে বললেন, ''কী ব্যাপার হে গজপতি! এত সকাল-সকাল যে!''

গজপতি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, ''আচ্ছা ধরো, আজ দুপুরে তোমার বাড়িতে আমার মধ্যাহ্নভোজনের নেমন্তন্ন!''

সুরেশ অবাক হয়ে বলেন, ''তাই নাকি! কিন্তু কবে তোমাকে আজকের মধ্যাহ্নভোজনের নেমন্তন্ন করলাম বলো তো! আর উপলক্ষই বা কী! আজ কারও জন্মদিন নয়, বিবাহবার্ষিকী নয়, অন্নপ্রাশন নয়, তা হলে কিসের নেমন্তন্ন হে!''

''না সুরেশ, আসলে ঠিক নেমন্তন্ন নয়, তবে অনেকটা ও রকমই আর কী! বুঝতে পারলে না?''

''বিন্দু মাত্র না। অনেকটা ও রকমই বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? তোমাকে কি আমি ছাড়া আর কেউ আমার হয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছে? কিন্তু নেমন্তন্ন করলেই তো হবে না। তার একটা আয়োজন আছে, বাজার করা আছে, পাঁচটা পদ রান্না করার আছে!''

''আরে না! একটা সহজ জিনিস কেন বুঝতে পারছ না বলো তো!''

''বুঝিয়ে বললে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। বাই দি বাই, তোমার কি বৌঠানের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? নাকি তোমার রাঁধুনি আজকাল খুব খারাপ রান্না করছে! নাকি আমার বাড়ির সর্ষে-ইলিশের গন্ধ তোমার নাকে যাওয়ায় তুমি উচাটন হয়ে পড়েছ!''

তিতিবিরক্ত হয়ে গজপতি বললেন, ''আরে না হে বাপু, ও সব কিছুই নয়। গিন্নির সঙ্গে আমার বোঝাপড়া চমৎকার, আমাদের রাঁধুনি ফার্স্ট ক্লাস রান্না করছে, অ্যান্ড ফর ইয়োর ইনফরমেশন, আমাদের বাড়িতেও আজ সর্ষে-ইলিশ হচ্ছে।''

''তা হলে আমার বাড়িতে পাত পাড়তে চাইছ কেন?''

''মোটেই চাইছি না। শুধু নেমন্তন্নটা চাইছি।''

''তার মানে কী, একটু বুঝিয়ে বলবে? পাত পাড়বে না অথচ নেমন্তন্ন খাবে, এটা কী করে হয়!''

''সোজা কথা হল, আজ যে তোমার বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন সেটা আমার গিন্নিকে তোমার জানাতে হবে। ভয় নেই, তোমাকে সত্যি সত্যিই খাওয়াতে হবে না।''

''সেটা কী করে হয়?''

''হয় হে, হয়। বন্ধু হয়ে এই সামান্য উপকারটা করতে পারবে না?''

''তোমার মতলবটা কী খুলে বলো তো!''

গজপতি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, ''আসলে আজ দুপুরে আমি এক জায়গায় যাব। কিন্তু আমার গৃহিণীকে তো তুমি জানো, হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসবেন।''

''তা যাবেটা কোথায়?''

''সে আছে এক জায়গায়।''

''বিবাগী হয়ে যাওয়ার মতলব নেই তো!''

''কেউ কি বলেকয়ে বিবাগী হয়, শুনেছ কখনও!''

''তা-ও তো বটে! তা আজকের অ্যাডভেঞ্চারটা কোথায় বলো তো!''

''ডুংলি নদীর দিকটায়। কালীচরণের ঠেকটা একটু দেখে আসব ভাই। লোকটা অনেক দিন আসছে না।''

''তোমার কি মাথা খারাপ হল! ওই অত দূর ঠেঙিয়ে তুমি এক জন ফেরিওয়ালার খোঁজে যাবে!''

''কেন যাচ্ছি তা তুমি বুঝবে না। আমি একটা রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছি।''

''তুমি কি গোয়েন্দা না পুলিশ যে, রহস্য ভেদ করবে!''

''আপত্তি কোরো না ভাই, এক বার তার সঙ্গে দেখা না-করলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।''

বিস্তর গাঁইগুঁই করে অগত্যা রাজি হলেন সুরেশ। তবে বললেন, ''তা হলে ফিরে এসে আমার বাড়িতেই যা হোক দু'টি ডাল-ভাত খেয়ো।''

গজপতি রাজি হলেন। একটু বেলার দিকেই রাজু আমলকী নিয়ে এল। তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন গজপতি। প্রথম খানিকটা রিকশায়, তার পর শাল-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অনেকটা হাঁটা পথ। হাঁসফাঁস করতে-করতে যখন পৌঁছলেন তখন খাড়া দুপুর।

রাজু দুঃখ করে বলল, ''কালুদাদা এক জন ভাল লোক ছিল বাবু, কিন্তু টিকতে পারল না। কোথায় যে চলে গেল কে জানে।''

গজপতিরও মনটা ভারী খারাপ। প্লাস্টিকের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরও মনটা হু হু করছিল। বললেন, ''চল তো একটু ভিতরে ঢুকে দেখি কোনও ক্লু পাই কি না।''

''চলুন।''

দু'জনে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। আবছা অন্ধকারে দেখা গেল, ঘরে ইটের উনুন আর কয়েকটা ঠোঙা, একটা প্লাস্টিকের শিট, অ্যালুমিনিয়ামের একটা থালা আর হাঁড়ি ছাড়া কিছুই নেই। ভারী হতাশ হলেন গজপতি।

ঘরের এক কোণে একটা হলুদ রঙের বল পেয়ে সেটা কুড়িয়ে এনে গজপতির হাতে দিল রাজু, ''এইটে পড়ে ছিল বাবু।''

গজপতি বলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। রবারের বল বলেই মনে হচ্ছে। বলের উপর একটা হাসিমুখের ছবি আঁকা। তিনি বলটা পকেটস্থ করলেন।

দুটো ছোট জিনিস মাটি থেকে তুলে দেখাল রাজু, ''বাবু, দেখুন তো এ দুটো কী।''

গজপতি হাতে নিয়ে দেখলেন দুটো কার্তুজের খোল। এ দুটো এখানে এল কী করে তা ভেবে পেলেন না গজপতি। তবে পকেটে রেখে দিলেন যত্ন করে, সুরেশকে দেখাবেন।

সুরেশ বিকেলে কার্তুজের খোল দেখে চোখ কপালে তুলে বললেন, ''এ তো নাইন মিলিমিটার পিস্তলের কার্তুজ! সর্বনাশ! তোমার কালীচরণ কি ফায়ার আর্মসের কারবারও করে নাকি? এ তো বিপদের কথা! তাকে তো এক্ষুনি পাকড়াও করা দরকার!''

গজপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ''আর পাকড়াও! থানার লকআপে ছিল, বেশ ছিল। তুমিই তো তাকে বলে-কয়ে ছাড়িয়ে আনলে! কাজটা কি ভাল করলে তুমি!''

''আহা, আমি কি তখন জানতাম যে সে অস্ত্রের কারবারি!''

দুটো কার্তুজের খোল দেখে অত বড় সন্দেহ করাটা কি ঠিক হচ্ছে হে! সে পুরনো জাঙ্ক জিনিসের কারবারি, হয়তো কোথাও খোলদুটো কুড়িয়ে পেয়েছিল। সে হয়তো জানেও না এগুলো আসলে কী!''

''তোমার মতো আহাম্মকের হাতে যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকত তা হলে দেশ উচ্ছন্নে যেত।''

গজপতি দ্বিতীয় দীর্ঘশ্বাসটা ফেলে চুপ করে বসে রইলেন। মনটা বড্ড খারাপ।

আজকাল গজপতি মাঝে-মাঝে তাঁর ঘরের দরজা ভাল করে বন্ধ করে আলমারি খুলে তাঁর চারটে জিনিস বের করে দেখেন। কখনও লাট্টু ঘোরান, টর্চ জ্বেলে দেখেন, বল নিয়ে একটু মেঝেয় ধাপান। হুইস্‌ল বাজাতে হলে তাঁকে অবশ্য পালপাড়ার মাঠে যেতে হয়। তাও যান মাঝে-মাঝে। সময়টা তাঁর খারাপ কাটছে না। তবে তাঁর মনে-মনে আশা, ফেরিওয়ালাটা আবার কোনওদিন ঠিক ফিরে আসবে!

॥ ৯ ॥

অনভ্যস্ত হাত, তবু নিশানা ভুল করেনি শ্যাডো, দুটো বুলেট উল্কার মতো আলোর রেখা টেনে গিয়ে কালুদাদাকে ভেদ করে দিয়েছিল।

লোকটা কোনও আওয়াজ না-করে লুটিয়ে পড়ে গেল তার দীন-দরিদ্র শয্যার উপর। কোনও শব্দও করল না। শুধু লাফিয়ে উঠেছিল কুকুরটা। শ্যাডো জানে যে, প্রভুভক্ত কুকুর তার প্রভুর হত্যাকারীকে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তাই সে শিসে গেয়ে উঠল 'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে...' কুকুরটা চুপ করে বসে পড়ল। আস্তে-আস্তে পিছু হটে দরজার দিকে সরে যাচ্ছিল সে। একটু-একটু করে। ঠিক এই সময়ে বাইরে থেকে কে যেন চাপা গলায় বলে উঠল, ''প্লিজ় শ্যাডো, কিপ অন হুইস্‌লিং , কিপ অন হুইস্‌লিং, ডোন্ট স্টপ, প্লিজ়...''

কিন্তু এক উত্তেজক হত্যাকাণ্ডের পর শ্যাডোর দম আটকে আসছিল, বুকে তবলার দ্রুত বোল। চোখ ফেটে জলও আসছিল তার। লোকটা কত ভদ্র ভাবে মরে গেল, একটুও প্রতিরোধ করল না! এত নরম ভাবে কেউ মরে নাকি! এত বিনয়ের সঙ্গে কেউ কি তার খুনিকে ক্ষমা করে যায়! জীবনে কখনও কেঁদেছে বলে তার মনে পড়ে না। আজ বুক ভেঙে কান্না আসছে। কী করে শিস দেবে সে?

পারল না শ্যাডো, শিস থেমে হেঁচকি উঠে এল তার গলায়। আর সঙ্গে-সঙ্গে গোলো বাঘের মতো একটা লাফ দিয়ে ঘরের দরজাটা ভেদ করে বাইরে ছুটে গেল। বাইরে একটা আর্তনাদ শুনতে পেল শ্যাডো। তার পর আরও দুটো আর্তনাদ, পর পর। তার পর নিস্তব্ধতা। শ্যাডোর কিছু করার নেই। ঘরের একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সে কেঁদেই যাচ্ছিল অঝোরে।

অনেক ক্ষণ বাদে কে যেন খুব নরম গলায় বলে উঠল, ''আপনি কাঁদবেন না বাবু, আপনার সত্যরক্ষা তো হয়েছে!''

ভূত বা ভগবানে বিন্দু মাত্র বিশ্বাস নেই শ্যাডোর, কিন্তু জলভরা চোখের অস্পষ্টতায় সে দেখতে পেল কালুদাদা তার দীন বিছানায় উঠে বসেছে, তার দিকেই চেয়ে আছে করুণ চোখে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না শ্যাডো। হাঁ করে চেয়ে থেকে সে অনেক ক্ষণ পরে বলতে পারল, ''আপনি মরেননি?''

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কালুদাদা বলে, ''আমার কি মরণ আছে বাবু? আমি হলুম সময়চারণ। একশো হাজার বছর আগেও ছিলাম, একশো হাজার বছর পরেও থাকব।''

শ্যাডোর মুখে কথা সরল না। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

নিঃশব্দে কালো গরিলার মতো গোলো এসে ঘরে ঢুকল, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে কালুদাদার পাশটিতে বসে হ্যা হ্যা করে হাঁপাতে লাগল। তার মুখ রক্তে মাখামাখি।

একটা বড় করে শ্বাস ফেলে কালুদাদা বলে, ''আপনারা যেমন ডাঙায় বিচরণ করেন, আমি তেমনি বিচরণ করি সময়ের উজান ভাঁটেনে। আজ এখানে তো কাল একশো, দুশো বা তিনশো বছরের তফাতে। মরলে কি আমার চলে বাবু!''

''আপনি কে কালুদাদা? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।''

''আমি এক ফেরিওয়ালা বাবু। নানা দ্রব্য নানা সময়ের মানুষের কাছে রেখে আসাই আমার কাজ, যদি তাতে মানুষের উপকার হয়। এই যে দেখছেন একটা লাট্টু, একটা টর্চবাতি আর একটা বাঁশি, তুচ্ছ জিনিস ভাববেন না বাবু, এর জন্য কোটি-কোটি টাকা দর দিয়েছিল ওরা। আর এর জন্যই আমাকে খুন করতে এসেছিলেন আপনি, আর এর জন্যই বাইরে তিন-তিনটে মানুষ লাশ হয়ে পড়ে আছে এখন।

শ্যাডো শুধু হাঁ করে চেয়ে রইল একটা গোলমেলে মাথা নিয়ে। কী হচ্ছে এ সব?

লোকটা উঠল, বলল, ''আসুন বাবু, বাইরে আসুন। শেষ রাতে জ্যোছনা ফুটেছে খুব। দেখবেন আসুন।''

বাইরে বেরিয়েই কালুদাদা তার হাতের টর্চবাতিটা নাড়তেই চার দিকের কুয়াশা কেটে যেতে লাগল। ফটফটে জ্যোৎস্নায় বালিয়াড়ির উপর খানিকটা তফাতে তিন-তিনটে মানুষের দেহ পড়ে আছে নানা ভঙ্গিমায়।

কালুদাদা নিজের কপালে হাত বুলিয়ে বিষণ্ণ গলায় বলে, ''আমার কী করার ছিল বলুন তো! কেউ মরতে এলে আমি কী করতে পারি!''

''এরা কারা?''

''আসুন দেখে নিই।''

দু'জনকে দেখা মাত্র চিনতে পারল শ্যাডো। হরিশ আর আবু। তৃতীয় জন আধচেনা, গাড়ির সেই বেঁটে সহযাত্রীটি। প্রত্যেকের গলার নলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে গোলো।

''আপনার সত্যরক্ষা হয়েছে বাবু, আপনি তো আমাকে গুলি করেছেন। আমি যদি না-মরি সে তো আর আপনার দোষ নয়! আপনার আর কারও কাছে কোনও দেনা নেই। সব শোধবোধ। নিশ্চিন্তে বাড়ি যান বাবু।''

''তিন-তিনটে মৃতদেহ, গোলোর রক্তাক্ত মুখ আর এই ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নায় শ্যাডোর বমি পাচ্ছিল। সে টলতে-টলতে হাঁটার চেষ্টা করছিল। কালুদাদা এসে তাকে সস্নেহে ধরে ডাঙা-জমি পর্যন্ত পৌঁছে দিল। বলল, ''আপনি শিস দিতে জানেন বলেই ওরা আপনাকে ভাড়া করেছিল বাবু। আপনি বড় সুন্দর শিস দেন আর যেন শিস বিক্রি করতে যাবেন না বাবু। সুর বড় শুদ্ধ জিনিস।''

''এই পিস্তলটা নিয়ে আমি এখন কী করব কালুদাদা?''

কালীচরণ হাত বাড়িয়ে বলল, ''আমাকে দেন। আজ থেকে বহু বছর পরে যখন মানুষ আর অস্ত্রের ব্যবহার করবে না তখনকার সময়ে এটা পুরনো জিনিস হয়ে যাবে। আমি তখনকার মানুষকে এটা বিক্রি করব। তারা এটা ঘরের শো-কেসে সাজিয়ে রাখবে আর দেখে ভাববে, এক সময়ে মানুষ কত হিংস্র ছিল!''

অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোল শ্যাডো। উঠতে প্রায় দুপুর। ঘুম থেকে জেগে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, কাল যা ঘটেছিল তা সত্যি। হিম ঠান্ডা জলে স্নান করল সে অনেক ক্ষণ। তার পর একটু ধাতস্থ হল। অনেক ক্ষণ ভেবেও সে ব্যাপারটার মাথা-মুন্ডু কিছু বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু মনে হচ্ছে এই দুটো দিনে তার বয়স অনেক বেড়ে গেছে।

ফোন করে জানল, বাবাকে করিডরে অনেকটা হাঁটানো হয়েছে আজ। বাবা ভাল আছে। সন্ধেয় নিজের পিঠ-ব্যাগখানা গুছোতে গুছোতে সে শিস দিচ্ছিল, 'কান্ট্রিরোডস, টেক মি হোম।'

আর রাতে উপরের বার্থে কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছিল, ছোট্ট শ্যাডো, অর্থাৎ সে, তার বাবার হাত ধরে গুটগুট করে হেঁটে যাচ্ছে।

কে যেন জিজ্ঞেস করল, ''কোথায় যাচ্ছ শ্যাডো?''

শ্যাডো খুব অহঙ্কারের সঙ্গে বলল, ''রথের মেলায়। আমার বাবার সঙ্গে।''

নেমন্তন্ন পাকড়াশি

প্রচেত গুপ্ত

মানুষের কত রকমই না শখ থাকে। কেউ ভোর হতে-না-হতেই বাগানে দৌড়য়, গাছপালার যত্ন করে। কেউ ছিপ নিয়ে পুকুরের ধারে বসে থাকে গোটা দুপুর, কখন চকচকে তেলাপিয়া এসে টোপ গিলবে। কেউ আবার মাদুর পেতে ছাদে চিত হয়ে শুয়ে থাকে গোটা রাত। আকাশের চাঁদ-তারা দেখে। ভোরের আলো ফুটলে তবে নীচে নেমে ঘুমোয়।

তবে এ সব হল চেনাজানা শখ। অচেনা, অদ্ভুত শখেরও শেষ নেই। বলতে গেলে তালিকা শেষ হবে না। তাও দু'-একটা বলা যাক।

গোপালবাবুর শখ ছিল, সকালে বাজার ঘুরে আলু, পটল, উচ্ছে, ঝিঙে নেড়েচেড়ে দেখা। টাটকা, তাজা আনাজপাতি দেখতে -দেখতে তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। একটা বাজারে দেখা শেষ হলে আর-একটা বাজারে ছুটতেন। এ দিকে বেলা যেত গড়িয়ে। নিজের বাজার করার কথাটাই ভুলে মেরে দিতেন। দোকানিরাও দোকান গোটাত, তখন হাতের কাছে শুকনো, পচা, ফেলে দেওয়া যা আনাজপাতি জুটত, তা-ই খানিকটা কিনে বাড়ি ছুটতেন। গিন্নিকে ম্যানেজ করার জন্য হাসি মুখে বলতেন, "আহা!

আজ যা বাজার করেছি ভাবতেও পারবে না। যেমন সস্তা, তেমন তাজা। সব্জি দেখলে মনে হবে, বাজার থেকে নয়, একেবারে খেত থেকে তুলে আনলাম। গরম ভাতের পাতে বেগুন ভাজা করো, খুব জমবে।"

গোপালবাবুর গিন্নি বেগুন ভাজার কথা শুনে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। সেটাই স্বাভাবিক। বেলা বারোটার সময় ক'টা শুকনো পোকা-ধরা বেগুন এনে ভাজতে বললে, তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠারই কথা। ঝাঁঝিয়ে উঠে বলতেন, "বেগুন ভাজতে বয়ে গেছে আমার। বাজারে-বাজারে ঘোরার শখ যদি না-ছেড়েছ, কাল থেকে বাড়িতে রান্নাবান্না সব বন্ধ।"

গোপালবাবু গিন্নির ধমক খেয়ে মিনমিন করে বলতেন, "এ যে কী শখ, তুমি না-দেখলে বুঝবে না। ঢেঁড়স, কুমড়ো, ধনেপাতার গায়ে জল লেগে থাকে, যেন চোখ চিকচিক করছে। টম্যাটো, চিচিঙ্গে যেন তোমাকে দেখে হাসছে।"

গোপালবাবুর গিন্নি বলেন, "চিচিঙ্গের হাসি দেখেছ, এ বার আমার রাগ দেখবে।"

আমাদের ক্লাসের বিল্টুর এক দাদুর শখ ছিল ভয়ঙ্কর। সে কথা বললে বিশ্বাস হবে না, আমরাও যে খুব বিশ্বাস করেছি এমনটা নয়। নিজে তো আর দেখিনি, বিল্টুর কাছে গল্প শুনেছি। বিল্টুও দেখেনি, সে-ও গল্প শুনেছে। শুনেছে তার মামাদের কাছ থেকে। সেই দাদু বাঘের ডাক শুনতে ভারী পছন্দ করতেন। অত বছর আগে তো গুগল, ইউটিউবের ব্যাপার ছিল না, ফলে কোনও রেকর্ড করা ডাক নয়, দাদু শুনতে চাইতেন অরিজিনাল ডাক। চিড়িয়াখানার খাঁচাবন্দি বাঘের ডাক তাঁর নাকি মোটে পছন্দ ছিল না।

সবাই বলত, "বাঘের ডাক তো বাঘের ডাকই থাকবে। চিড়িয়াখানায় এসে তো বদলে যাবে না।"

দাদু বলতেন, "অবশ্যই বদলে যাবে। জঙ্গলের বাঘের গর্জন যদি বিস্কুটের মতো মিইয়ে যায়, তখনই সেটা হয় চিড়িয়াখানার বাঘের ডাক। এ সব ডাকে আমার চলবে না।"

চলতও না। দাদু যেতেন সুন্দরবন। যেতেন বান্ধবগড়, কান্‌হা টাইগার রিজ়ার্ভ ফরেস্টে। গোটা রাত কান পেতে থাকতেন। ওই বুঝি হুংকার শোনা যায়। কেউ-কেউ এই বিষয়ে দাদুকে প্রশ্ন করত।

"বাঘের ডাক শুনে কী মজা পাও? ভয়ে তো হাড় হিম হয়ে যাওয়ার কথা।"

দাদু গম্ভীর মুখে বলতেন, "বাঘ যে জঙ্গলে নিশ্চিন্তে রয়েছে, এটা জানতে পারাটাই একটা মজা। তবে কী জানিস, শখে মজা, দুঃখ বলে কিছু হয় না। শখ হল শখ।"

মানুর ছোড়দি গ্রামের স্কুলের 'বড়দি'। বড়দিরা যেমন হয়, তেমনই রাগী। ছাত্রীরা বেজায় ভয় পায়। বড়দিকে বকতে হয় না, হট্টগোলের সময় এক বার গিয়ে দাঁড়ালেই হল। ব্যস, সবাই শান্ত। এই বড়দির শখ হল, সন্ধেবেলা স্কুটি চালিয়ে ছাত্রীদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। কে কেমন লেখাপড়া করছে, কোন পড়া বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে, তার খোঁজখবর নেওয়া। আর সেই সময় মানুষটা হয়ে যান একেবারে মেয়েদের বন্ধু। বকাঝকার কোনও ব্যাপারই নেই, উল্টে পড়া আটকে গেলে মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে অঙ্ক, বিজ্ঞান বুঝিয়ে দেন। বড়দি আসতে পারেন এই আশায় মেয়েরা পড়তেও বসে যায়। মুশকিল হল, এই কাণ্ড করতে গিয়ে বড়দি মাঝে-মধ্যে দূরের গ্রামেও চলে যান। ফিরতে রাত হয়ে যায়। ঝড়-জলের মধ্যেও পড়েন। বাড়িতে সবাই আপত্তি করে।

"স্কুলেই তো পড়াও, আবার মেয়েদের বাড়িতে ছোটার দরকার কী?"

বড়দি বলেন, "বাড়িতে গেলে মেয়েদের মনে আর-একটু জোর বাড়ে। সবাই তো স্কুলে সব পড়া বুঝতে পারে না, আবার লজ্জায়, ভয়ে বলতেও পারে না। তাই সন্ধের দিকটা যতটা পারি, এক চক্কর ঘুরে আসি। শখ করেই যাই, কেউ তো আর জোর করেনি।"

"এক দিন বড় বিপদ হয়ে যাবে।"

বড়দি হেসে বলেন, "শখ মেটাতে গিয়ে বিপদের কথা কে কবে ভেবেছে?"

আমাদের এই কাহিনি অবশ্য বিপদে পড়ার কোনও শখ নিয়ে নয়, এক মজার শখের গল্প। কাহিনির নায়ক জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশি। বয়স বিয়াল্লিশ বছর তিন মাস। থাকেন কলকাতা শহর থেকে কিছুটা দূরে। অতি শান্ত, গাছপালায় ঘেরা ফুরফুরে বাতাস বয়ে যাওয়া এক গ্রামে। গ্রামের নাম 'দিঘির নিবাস'। গ্রামে বেশ কয়েকটা টলটলে জলের দিঘি রয়েছে বলেই এমন নাম। জীবনকৃষ্ণবাবু এক জন হাসিখুশি মুখের ভদ্রলোক। গ্রামের সকলেই তাঁকে পছন্দ করে। শুধু নিজের গ্রামে নয়, আশপাশে আর পাঁচটা গ্রামেও তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে রয়েছে। এমনকি কলকাতাতেও চেনাজানা বিস্তর। এত চেনাজানার কারণ হল উনি যেমন চমৎকার মানুষ, তেমন চমৎকার গল্প করতে পারেন। একেবারে আসর জমিয়ে দেওয়া গল্প। সেই ছোটবেলার দুষ্টুমি থেকে বড়বেলার হইচই পর্যন্ত। মানুষটার রসবোধও জোরালো। একটা উদাহরণ দিলেই খানিকটা বোঝা যাবে।

দিঘির নিবাস গ্রামের বিকাশবাবু সকাল থেকে বসে থাকেন রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে। কাজকর্ম কিছু করতে চান না। তার অতি বিতিকিচ্ছিরি শখ হল, একে-তাকে চেপে ধরে বকর বকর করা। ওই পথ দিয়ে কেউ গেলেই হল, দেখতে পেলেই তাকে ডেকে জেরা শুরু করেন।

"কোথায় চললেন? কেন চললেন? না-গেলেই তো হয় না?"

সকলেই বিকাশবাবুর এই শখে বিরক্ত। এ আবার কেমন বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড! কে, কোন কাজে যাবে বিকাশবাবুকে তার জবাবদিহি করতে হবে নাকি? তা ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে কে কোথায় চলল, সে প্রশ্ন করাও তো মোটে উচিত নয়। বিকাশবাবুকে আকারে-ইঙ্গিতে এ কথা বলেও লাভ হয় না, তিনি অন্যকে বিরক্ত করার এই উদ্ভট শখ ছাড়তে পারেন না। এক দিন জীবনকৃষ্ণবাবুর হাতে জব্দ হলেন।

সকালে জীবনকৃষ্ণবাবু যাচ্ছিলেন চুল কাটতে। চায়ের দোকানের সামনে এলে যথারীতি বিকাশবাবু ধরলেন তাঁকে।

"ও জীবনভায়া, চললে কই?"

জীবনকৃষ্ণবাবু একটুও বিরক্তি না-দেখিয়ে জবাব দিলেন, "চুল কাটতে।"

বিকাশবাবু মাথার দিকে তাকিয়ে বললেন, "চুল তো তেমন বড় হয়নি, এখন না-কাটলেও চলবে। তার চেয়ে এসো, দুটো গল্পগুজব করি।"

জীবনকৃষ্ণবাবু এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, "চুল তেমন বড় হয়নি বলেই তো কাটাতে যাচ্ছি দাদা। সেলুনে গিয়ে দরাদরি করব।

বলব, চুল হাফ বেড়েছে, পয়সাও হাফ নিতে হবে।”

বিকাশবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, “সেলুনে আবার দরাদরি চলে নাকি!”

জীবনকৃষ্ণবাবু মুচকি হেসে বললেন, “চালালেই চলবে। আর যদি না-চলে, আরও এক জনকে না-হয় ডেকে নেব। এক খরচেই দু’জনকে কেটে দেবে না হয়,’’ এর পর একটু থমকে, বিকাশবাবুর মাথার দিকে চট করে এক বার তাকিয়ে বললেন, “আরে! আপনারও তো দেখছি চুল তেমন বাড়েনি, যাবেন নাকি কাটাতে? আপনার হাফ, আমারও হাফ। হাফে-হাফে ওয়ান হয়ে যাবে। এই শর্তেও যদি সেলুন রাজি না-হয়, হাফ চুলই কাটবে আপনার। মাথার এক দিকেরটুকু এখন কেটে দেবে না-হয়, বাকিটা না-হয় কাটবে পরের মাসে। মন্দ কী? দরাদরি করে যতটা পাওয়া যায় আর কী! চলুন, চলুন দেরি করে লাভ নেই।’’

কথা শেষ করে জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশি বিকাশবাবুর হাত ধরে এক রকম টানাটানি শুরু করে দিলেন। আধ খানা চুল কাটানোর ভয়ে বিকাশবাবু তো পালানোর পথ পান না। কোনও রকমে হাত ছাড়িয়ে, বগলে ছাতা নিয়ে দৌড় দিয়ে বাঁচলেন। এই গল্প গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। সবাই তো হেসে কুটোপাটি। দেখা হলেই বিকাশবাবুকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, “সেলুনে যাচ্ছেন নাকি?”

বিকাশবাবু বিরক্ত করার ‘শখ’ ত্যাগ করেছেন। আর ঘুণাক্ষরেও কাউকে জিজ্ঞেস করেন না, “কোথায় চললেন?”

আমাদের জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশির শখটি শুধু মজাদার নয়, লোভনীয়ও বটে। তার শখ নেমন্তন্ন খাওয়ার। একটু-আধটু শখ নয়, মারাত্মক শখ। তিনি হলেন এক জন ‘নেমন্তন্ন রসিক’। নেমন্তন্ন খাওয়ার মতো আনন্দ তিনি আর কিছুতে পান না। কেউ নেমন্তন্ন করলে তিনি কেমন যেন আত্মহারা হয়ে যান। দুনিয়ার সব ভুলে যান। কোনও বাধাকেই তাঁর বাধা বলে মনে হয় না। নেমন্তন্ন খাওয়ার জন্য তিনি যেন জীবন দিয়ে দিতে পারেন। নেমন্তন্ন বাড়ির লুচি-আলুর দম, চপ-কাটলেট, মাছের ঝাল-মাংসের ঝোল, চাটনি-পাঁপড়, দই-রসগোল্লা থেকে বিরিয়ানি, ফিশ ফ্রাই, মটন রেজ়ালা, চিকেন চাঁপ, আইসক্রিম, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাকে তুচ্ছ করে দেয়। এক বার ট্রেনে চেপে মুখেভাতের নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছিলেন জীবনকৃষ্ণবাবু। নেমন্তন্নের টানে দেরি না-করে সকাল-সকাল রওনা দিয়েছিলেন। স্টেশন ছেড়ে ট্রেন খানিকটা গড়িয়েই গেল থমকে। খবর এল, সামনে সিগন্যালে গোলমাল, ট্রেন এখন চলবে না। কখন চলবে তা-ও বলা যাচ্ছে না। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়ে যেতে পারে, সন্ধে যে হবে না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়ে পিছন দিকে হাঁটা শুরু করল। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ হাঁটলেই স্টেশনে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে হয় বাড়ি ফিরে যাবে, নয় বাস-টাস ধরে সড়ক পথে যাওয়ার চেষ্টা করবে। জীবনকৃষ্ণবাবুও ট্রেন থেকে নামলেন। তবে তিনি সকলের মতো পিছনের দিকে হাঁটলেন না, মাথার উপর ছাতা খুলে হাঁটা শুরু করলেন সামনের দিকে। মানে নেমন্তন্নের দিকে। তাঁর কাছে খবর আছে, সেখানে ধোঁয়া-ওঠা ধবধবে সাদা ভাত, ঝুরো-ঝুরো আলু ভাজা, এক চামচ খাঁটি ঘি দিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়া শুরু হবে। থামবে বাটি ভর্তি পায়েসে। সেই পায়েসে ডুবো-ডুবো কিশমিশ থাকবে। এর জন্য খান চার-পাঁচ স্টেশন পায়ে হেঁটে চলে যাওয়া কী আর এমন ব্যাপার? হাতে তো সময় রয়েছেই। নেমন্তন্ন বাড়িতে পৌঁছতে সবাই হাঁ।

“এতটা পথ হাঁটতে কষ্ট হল না?”

জীবনকৃষ্ণ লাজুক মুখে বলেছিলেন, “কষ্টের কী আছে? ট্রেন লাইনে তো বেশ ফুরফুরে হাওয়া থাকে। খিদেও বেড়ে যায়। খাওয়ার আগে হাঁটা তো শরীরের জন্য ভালই।’’

জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশি বর্ষায় গলা পর্যন্ত জমে যাওয়া জলেও নেমন্তন্ন রক্ষায় বেরিয়েছেন। সে দৃষ্টান্তও রয়েছে। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে নিয়েছেন ধুতি, পাঞ্জাবি, চটি। এক হাতে উঁচু করে ধরে রেখেছেন সেই ব্যাগ, অন্য হাতে খোলা ছাতা এমন ভাবে রেখেছেন যাতে ব্যাগ না-ভেজে। নিজে অবশ্য কাকভেজা ভিজেছেন। সে হোক, নেমন্তন্নর পোশাক তো ঠিক থাকা চাই।

দুনিয়ায় যত জরুরি কাজই থাকুক, নেমন্তন্ন পেলে জীবনকৃষ্ণবাবু যাবেনই যাবেন। ছোটবেলায় স্কুল কামাই করেছেন, কলেজে পড়ার সময় আধখানা পরীক্ষা দিয়ে ছুটেছেন, চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলেছেন, “স্যর, বেশি সময় নেবেন না। জরুরি কাজ পড়ে গেছে।”

যারা ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তাঁরা চোখ বড় করে বললেন, “চাকরির থেকে জরুরি! কী কাজ?”

যুবক জীবনকৃষ্ণ মাথা চুলকে বলেছিলেন, “বিল্টুর দিদির বিয়ে স্যর। সকাল থেকে রাত মোট তিন বেলা খাওয়া। স্যর, বিল্টুর দিদি একটাই। এই নেমন্তন্ন মিস হয়ে গেলে আর কখনও চান্স হবে না। চাকরির ইন্টারভিউ পরের বছরও দেওয়া যাবে। তাই বলছিলাম স্যর...”

চাকরি পাওয়ার পরেও নেমন্তন্ন খাবেন বলে, জীবনকৃষ্ণ কত বার যে হাফ ছুটি, সেমি ছুটি, ফুল ছুটি নিয়ে ফেলেন তার ঠিক নেই। অফিসের বড়বাবু ডেকে বকাঝকা করেন।

“আবার কাল তুমি ছুটি নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে চলে গেলে!”

জীবনকৃষ্ণবাবু বললেন, “কী বলব, অত করে বলল, না-গেলে দুঃখ পাবে যে!”

বড়বাবু বললেন, “তা বলে অফিস ছুটি নিয়ে যাবে?”

জীবনকৃষ্ণবাবু বললেন, “সামনেই তো আপনার এক মাত্র কন্যার বিবাহ। যাঁদের নেমন্তন্ন করবেন, তাঁদের কেউ এক জন না-এলে আপনার দুঃখ হবে না? নেমন্তন্ন শুধু খেতে যাওয়ার জন্য নয়, যিনি করেন তাঁকে সম্মান দেওয়ারও একটা কর্তব্য থাকে। থাকে কি না?”

বড়বাবু এর পর আর কথা বাড়াননি।

জীবনকৃষ্ণবাবু নেমন্তন্ন নিয়ে ভেদাভেদ করেন না। পাকা দেখা, বিয়ে, বৌভাত, মুখেভাত, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, ভাইফোঁটা, শীতে নলেন গুড়ের পায়েস, বর্ষায় সর্ষে-ইলিশ খেতে যেতে হবে, গরমে কাঁচা আমের শরবতের নেমন্তন্ন তো থাকেই, এর উপর হাজারটা পুজোপার্বণ রয়েছে। এর সঙ্গে এসে পড়ে ছোটখাটো নানা ধরনের নেমন্তন্ন। সে সব নেমন্তন্নের কারণ বিচিত্র। মানুষটা পছন্দের বলে জীবনকৃষ্ণবাবু সে সবেও ডাক পান। যেমন কারও বাড়িতে নতুন হাঁড়ি এসেছে বলে পোলাও খাওয়ার নেমন্তন্ন। নতুন

হাঁড়ির প্রথম পোলাও। কখনও বাড়িতে মুরগি চারটে বেশি ডিম দিয়েছে বলে ডাক আসে।

"আজ বিকেলে এক বার ঢুঁ মেরে যেয়ো। ডিমের কালিয়ার সঙ্গে পরোটার ব্যবস্থা হয়েছে।"

কারও বাড়ির বাগানে দুটো লাউ বড় হয়ে গেলে লাউ-চিংড়ি খেতে যেতে হয়। কারও পুকুরে জাল ফেলা হলে তো ডাক পাবেনই পাবেন। এর সঙ্গে পরীক্ষা পাশের নেমন্তন্ন রয়েছে, ফেলের নেমন্তন্নও রয়েছে। ফেলের দুঃখ ভুলতে খাওয়াদাওয়া। কলকাতা থেকেও নেমন্তন্ন আসে জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশির। গৃহপ্রবেশের মতো ফ্ল্যাট-প্রবেশের অনুষ্ঠান থাকে। নতুন গাড়ি, ল্যাপটপ, ওয়াশিং মেশিন কেনার পরও ডাকা হয়।

"নতুন গাড়ি চড়ে আজ রেস্তরাঁয় ডিনারে যাব, আপনাকে পাশে চাই।"

তালিকায় 'শান্তি-অশান্তির নেমন্তন্ন'ও রয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া মেটাতে শান্তির ভোজ, আবার ঝগড়ায় যাওয়ার আগে দল পাকাতে অশান্তির ভোজ। জীবনকৃষ্ণবাবু দু'তরফেই ডাক পান।

দিঘির নিবাস গ্রামের সকলেই জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশির নেমন্তন্ন শখের খবর রাখে। সবাই জানে, মানুষটা খেতে ভালবাসে। পোলাও-কোর্মা থেকে আলুর চপ, কাঠি আইসক্রিম কোনও কিছুতেই আপত্তি নেই। এক বার নেমন্তন্ন করলেই হল। তাঁকে আড়ালে ডাকা হয়, 'নেমন্তন্ন পাকড়াশি'।

হঠাৎ এক দিন কাণ্ড ঘটল।

সে দিন ভোরে জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশি কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। চিন্তিত মুখে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন বড় রাস্তার দিকে। পথে দেখা তরণী পালের সঙ্গে। তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এক গাল হেসে বললেন, "বাপরে, এত সকালেই নেমন্তন্ন?"

জীবনকৃষ্ণবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "হ্যাঁ, নেমন্তন্ন। শ'খানেক টাকা হবে দাদা? অফিসে বেতন পেলেই মিটিয়ে দেব।"

তরণীবাবু অবাক হলেন। এই মানুষ তো কখনও ধার-টার চায় না। হলটা কী? কথা না-বাড়িয়ে পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে দিলেন তরণীবাবু। জীবনকৃষ্ণ হেসে বিদায় নিলেন। আবার খানিকটা যাওয়ার পর অবিনাশ মাস্টারের সঙ্গে দেখা। সকালে ট্রেন ধরতে হয়। হাত নেড়ে বললেন, "সাতসকালেই নেমন্তন্ন খেতে চললেন জীবনদা? একটা শখ বানিয়েছেন বটে!"

জীবনকৃষ্ণবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "ঠিকই বলেছ, নেমন্তন্নেই যাচ্ছি। অবিনাশ, কিছু টাকা ধার হবে নাকি?"

অবিনাশ মাস্টার ঘাবড়ে গেলেন। এই লোক তো টাকাপয়সা নেওয়ার লোক নয়। নেমন্তন্ন বাড়ির জন্য উপহার কিনবে নাকি? ভুরু কুঁচকে পকেট থেকে শ'দুয়েক টাকা বের করে দিলেন অবিনাশ মাস্টার। তবে তাঁর সন্দেহ গেল না। জীবনকৃষ্ণবাবুর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এর পর দেখা মাধব সামন্তর সঙ্গে। গঞ্জে বড় ব্যবসা করেন। ধনী মানুষ। জীবনকৃষ্ণবাবুকে বিশেষ পছন্দ করেন এবং সুযোগ পেলেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করেন। সাতসকালে তাঁকে দেখতে পেয়ে খুশিই হলেন।

"ইস। আপনার মতো শখ যদি থাকত, সকাল থেকেই নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াতাম।"

জীবনকৃষ্ণবাবু বললেন, "ঠিকই ধরেছেন, শখ মেটাতেই চলেছি, তবে আমার যে একটা উপকার করতে হবে। হাজার খানেক টাকা দিতে হবে। চিন্তা নেই, শখ মিটিয়ে ক'দিন পরেই ফেরত দেব। হঠাৎ করে একটু টানাটানি পড়ে গেছে। তা বলে, শখ তো ছাড়া যাবে না!"

মাধব সামন্ত মানুষ চেনেন। এই লোক যে টাকা নিয়ে পালাবে না, তা তিনি জানেন। কথা না-বাড়িয়ে ব্যাগ থেকে হাজার টাকা বের করে এগিয়ে দিলেন। নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন বাড়িতে যাওয়ার আগে উপহার কিনবে। শখ মেটাতে খরচাপাতি তো একটু করতেই হয়।

এ ভাবে আরও ক'জনের কাছ থেকে টাকা নিলেন জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশি। সবাইকেই হেসে বললেন, "নেমন্তন্নর জন্য নিচ্ছি। কী করি? বড্ড অদ্ভুত শখ যে!"

পছন্দের মানুষকে ধার দিতে কেউই আপত্তি করেনি। খুশি মনে বড় রাস্তায় পৌঁছে বাস ধরলেন জীবনকৃষ্ণ। তিনি জানতেও পারলেন না, স্কুলে না-গিয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছেন অবিনাশ মাস্টার। এই ভাল মানুষটি সকলের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিচ্ছে কেন? নেমন্তন্ন খেতে গেলে কত টাকার উপহার কিনতে হয়? কই, আগে তো শখ মেটাতে গিয়ে 'জীবনদা' এ কাজ কখনও করেননি! এত প্রশ্নের উত্তর পেতেই অবিনাশ মাস্টারের পিছু নেওয়া। ঘটনা কী?

ঘটনা কী, জানতে পেরেছেন অবিনাশ মাস্টার। গ্রামে ফিরে এসে সবাইকে ঢাক পিটিয়ে জানিয়েও দিয়েছেন। সকলের মাথা ঘুরে গেছে। এমনও হয়?

হয় কি না, বলা যাবে না। তবে দিঘির নিবাস গ্রামের নেমন্তন্ন পাকড়াশি-র বেলায় এমনটাই হয়েছে। নেমন্তন্নই তাঁর শখ, তবে তা শুধু নিজে খাওয়ার জন্য নয়, অন্যকে খাওয়ানোর জন্যও বটে। এই শখ মেটান তিনি গোপনে। মাসে এক বার করে বিভিন্ন পাড়াগাঁয়ে, শহরের বস্তিতে ঘুরে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ান। আগে এক দিন গিয়ে যত্ন করে নেমন্তন্ন করে আসেন। মেনু অতি সামান্য থাকে। খিচুড়ি, বেগুনি, ডিমের ঝোল, চাটনি আর একটা করে রসগোল্লা। পয়সা কম পড়লে রসগোল্লা বাদ। এমনকি, ডিমও বাদ যেতে পারে। তাতে কারও আপত্তি নেই। জীবনকৃষ্ণবাবু চাকরি করেন ছোটখাটো, নিজের বেতন থেকে এর বেশি তো সম্ভব নয়। তবে নিজে হাতে পরিবেশন করেন। ছোটরা পাত পেড়ে হইহই করে খায়। সেদিনও এ রকম হইহই করে খাওয়ার ব্যাপার ছিল। হঠাৎই টাকা কম পড়ে যায়। এ দিকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে। সে তো বাতিল করা যায় না। সব বাতিল করা যায়, শখ বাতিল করা যায় না, বাধা মানা যায় না। তাই এর-ওর কাছে থেকে ধার নিতে হল।

অবিনাশ মাস্টার নিজের চোখে শুধু সবটা দেখেননি, এক সময় জীবনকৃষ্ণবাবুর সামনে গিয়ে হাজিরও হয়েছেন। ছোটদের পাশে বসে গরম খিচুড়ি চেখে নেমন্তন্ন খেয়েও দেখেছেন। আহা কী আনন্দ!

জীবনকৃষ্ণ পাকড়াশির শখ নিয়ে দিঘির নিবাস গ্রামের মানুষের গর্বের সীমা নেই। সে তো হবেই। তাই না?

ছবি: *দেবাশিস দেব*

মশার কামড়ে কাবু হয়ে থাকে সুমেরু অঞ্চলের রেনডিয়ার

মশাদের ঠান্ডা করা যাবে কি?

পাহাড়ের ঠান্ডাতেও রেহাই নেই মশাদের হাত থেকে! তা বলে সব মশাই কি খারাপ?

যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

মশার যন্ত্রণায় কি একটা সামান্য কথাও গুছিয়ে বলার উপায় নেই!

যারা বলে ঠান্ডায় মশা বাঁচে না, তাদের এক বার আলাস্কায় পাঠিয়ে দিলে হয়। আলাস্কায় গরম কালেও বেশ ঠান্ডা, আমাদের এদিককার তুলনায়। আর মশা? মশার চালচরিত্র বুঝতে এক বার ওই এলাকায় গিয়েছিলেন কয়েক জন বিজ্ঞানী, তাদের এক-এক বারে এক সঙ্গে কামড়ে ধরছিল ১০০টারও বেশি মশা। তবু এ নাকি ওদিককার তুলনায় কিছুই না। ওখানে যে-সমস্ত তৃণভোজী প্রাণী চরে বেড়ায়, তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করো মশা কাকে বলে। বল্গা হরিণ, ক্যারিবু, রেনডিয়ার— এদের অনেকেরই মাথায় বেশ ভয়-পাওয়ানো গোছের বড়-বড় শিঙের জঙ্গল আছে, কিন্তু মশারা সে সবে ডরায় না। বরং উল্টোটাই হয়। গরম কালে বরফ গলতেই সেখানে মশা জন্মাতে শুরু করে, সংখ্যায় তারা কোটি কোটি, অথচ আলাস্কা বা গোটা সুমেরু অঞ্চলে প্রাণী এমনিতেই কম। একটা ঘাস-চিবোনো হরিণ সামনে পেলেই তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মশার পাল। কোনও হরিণকে বেঁধে রাখা হলে নিশ্চিত মশারা তাকে রক্তশূন্য করে মেরে ফেলত। রক্তচোষাদের হাত থেকে বাঁচতে হরিণের দল পালিয়ে যায় আরও উঁচু এলাকায়, যেখানে তুলনায় বেশি ঠান্ডা, অথবা বেছে নেয় এমন ঝড়ের মতো হাওয়ার অঞ্চল যেখানে মশাগুলোর ডানার জোরে কুলোয় না। কিন্তু মশার হাত থেকে বাঁচলেও হরিণদের পেট ভরানোর মতো ভাল খাবারদাবার সেখানে জোটে না। ইদানীং পৃথিবী যত গরম হচ্ছে মশার সংখ্যা বাড়ছে, হরিণগুলো দুবলা হয়ে যাচ্ছে, আর তারাও বোধ হয় মনে-মনে বলছে,

পৃথিবী থেকে মশা হঠাও।
এটা আমাদের কথা, বলা ভাল আমাদেরই কথা!
মশা আমাদের কী ক্ষতিটাই না করছে! শরীর থেকে রক্ত চুরি নিয়ে আমরা অতটা চিন্তিত নই, বরং বেশি বিরক্ত কামড়ের জায়গায় চুলকোতে-চুলকোতে চামড়া ছড়ে যাচ্ছে বলে। আর রোগ-বিরোগের কথা ভাবো! ভয়াবহ ম্যালেরিয়া, সেই সঙ্গে ডেঙ্গি, জ়িকা। মশার কামড়ে মরি না, কিন্তু মরি এই সব রোগে। মনে ভাবি দুনিয়া থেকে মশা হঠাতে না-পারলে পৃথিবীর সর্বনাশ ঠেকায় কে। ঘরে ঘরে প্লাগে গুঁজে বিষ-তেল জ্বালিয়ে, কয়েল পুড়িয়ে আমরা নিজেদের ক্ষতি করছি বটে, কিন্তু মশাগুলোকে মারতে না-পারি, ভাগাতে পারছি— এই এক বড় স্বস্তি।
দুনিয়া থেকে সমস্ত মশা হঠানোর কথায় আবার কেউ-কেউ বলেন, পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার রকমের মশা আছে। সবাই কিন্তু সমান খারাপ না। মাত্রই হাতে-গোনা কয়েকটা রক্তখোর মশা মানুষের ভীষণ শত্রু। কিন্তু বাকিরা! সব মশা রক্ত খায় না। আবার যারা রক্ত খায় তাদের ভিতরেও সে কাজটা করে কেবল মেয়ে-মশারা, কেননা ডিম পাড়ার জন্য তাদের দরকার কিছু প্রোটিন, সেটা তারা পায় আমাদের বা অন্য নানা রকম স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীর ফুটো করে রক্ত খেয়ে। ধরে-ধরে হিসেব করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ মশা আসলে নিরামিষাশী, তারা খায় গাছের রস। দিনের বেলায় বাগানে ঢুকলে দেখতে পাবে গাছের গায়ে বসে বসে অনেক মশা রস খাচ্ছে।
রক্ত খেয়ে টুসটুসে মশা মারলে লাল রক্ত হাতে লাগে, এই মশাগুলোকে মারলে প্রায় স্বচ্ছ বা ময়লাটে তরল বেরোবে।
গাছের রস খায় অবশ্য আরও অনেক প্রাণী— যেমন পিঁপড়ে, অ্যাফিড, লিফহপার ইত্যাদি। অ্যাফিড বা লিফহপাররা তো আবার গাছের রস পুরোটা আত্মসাৎ করতে না-পেরে ফোঁটায় ফোঁটায় বের করে দেয় শরীর থেকে। সেটাও এক ধরনের মিষ্টি রস। বহু পিঁপড়ে সরাসরি গাছ থেকে রস না-খেয়ে, অথবা খাওয়ার পরেও, অ্যাফিড বা লিপহপারের গা থেকে শিশির-বিন্দুর মতো বেরিয়ে আসা সেই মিষ্টি রস খায়। এই মিষ্টি রসটাকে বলে হানিডিউ— মধু-শিশির।
মশারা যে আদতে নিরামিষাশী, তার প্রমাণ অ্যাফিড বা লিফহপারদের শরীর থেকে পিঁপড়েদের মতো করে তারাও মধু-শিশির শুষে খায়।

জলের ভিতর মশার শূককীট, মাছেদের খাবার

খোদ পিঁপড়েদের কাছ থেকেও চেয়ে খায় গাছের রস। পিঁপড়ের সারিকে কখনও সামনে থেকে লক্ষ করেছ? মাঝে মাঝেই দুটো পিঁপড়ে একে অপরের শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে কী ইঙ্গিত করে, আর অমনি তাদের একটি, রস খেয়ে পেট ভরিয়ে ফিরছে যে, সে অপর পিঁপড়েটার মুখে কিছুটা রস উগরে দেয়। সেটা মশারাও শিখে গেছে। তারা পিঁপড়েদের গায়ে পা ঠেকিয়ে একটু বুলিয়ে দেয় আর অমনি পিঁপড়েরা রস উগরে দেয়। বোঝে না যে, যাকে কৃপা করল সে তাদের জাতের কেউ নয়।
মনে রাখার মতো একটা কথা হল, বহু মশা ফুলের মধু খেতে এসে গাছে গাছে পরাগমিলন ঘটায়, যেমনটা করে মৌমাছি, মাছি বা মথ-প্রজাপতিরা। তার মানে মশাগুলো প্রকৃতিতে একেবারে কাজের কাজ কিছু করে না, এটা ঠিক নয়। আর সব থেকে বড় কাজের কাজটা তারা করে থাকে নিজেদের জীবন দিয়ে। অজস্র প্রাণী— পাখি থেকে বাদুড়-চামচিকে, মশা খেয়ে বেঁচে আছে। একটা বাদুড় এক রাতে ৬০০-৭০০ মশা সাবাড় করে ফেলতে পারে। মশাদের ছোটবেলা কাটে জলে, আর মশার বাচ্চা খেয়ে বড় হয় মাছেরা। কাজেই, কয়েকটা বদমাশ মশার জন্য সাড়ে তিন হাজার মশার উপরে দুর্নাম চাপানোটা নাকি ভাল হচ্ছে না।
এ নিয়ে আরও কিছু বলতাম, কিন্তু কানের পিছনে সেই তখন থেকে একটা হতচ্ছাড়া... উঃ...

একটা পুরুষ মশা, গাছের রস খেয়ে বিশ্রাম করছে

অ্যাফিডদের দঙ্গলে মধুশিশিরের লোভে ঘুরে বেড়াচ্ছে পিঁপড়ে

সম্পূর্ণ উপন্যাস

আড়ালে রয়েছে সে

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের শুরুর সময়টা বাংলার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন উত্তর ভারতে যেমন রাজত্ব করছিলেন বাদশা আকবর, তেমনই বাংলায় মোগল আধিপত্যকে নস্যাৎ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন বারো ভুঁইয়ারা। বাংলার দক্ষিণে ভাটি প্রদেশের যশোর রাজ্য ছিল সেই বারো ভুঁইয়াদের রাজত্বের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য এক রাজ্য।
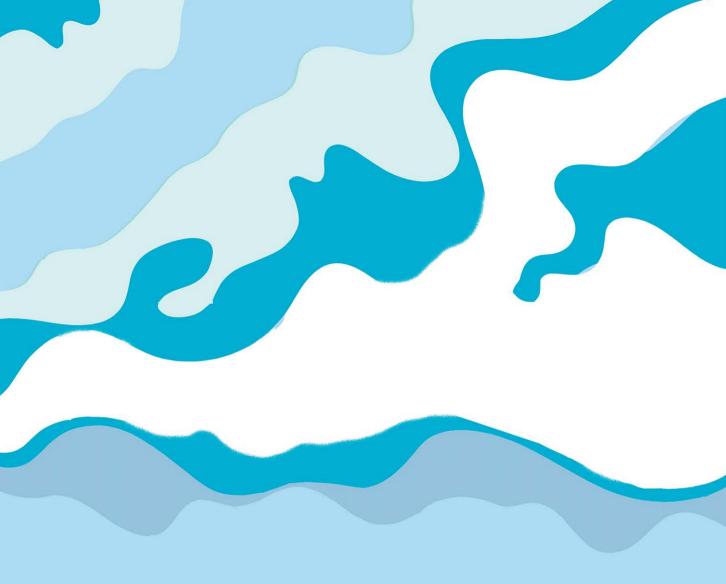
ছবি: বৈশালী সরকার

যশোরের তখনকার শাসক ছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য। ক্রীতদাসের বাজার, জলদস্যুদের তাণ্ডব আর যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে সে ছিল এক উত্তাল সময়। এই কাহিনি সেই সময়কার।

॥ ১ ॥

ঝড়-বাদলের রাতে

বড় জমিদারবাড়ির পূর্ব দিকের পাঁচিলটা ভাঙা। উষ্ণীষ জানে এই ঝড়-বাদলের রাতে পাইকরা বাড়ি পাহারাতেও ঢিল দেবে। তাই আজকেই সুযোগ!

ঘর থেকে বেরোনোর আগে চার দিকটা ভাল করে দেখে নিল উষ্ণীষ। মাটিতে পাতা গোলপাতার বিছানায় জগা গভীর ঘুমোচ্ছে। ও জানে এই ঘুম কাল বিকেলের আগে ভাঙবে না। আজকে জগার খাবারে ও এমন একটা গাছের শিকড় বেটে মিশিয়ে দিয়েছে যে, তার ফলে জগা খাবারটা কোনও মতে শেষ করেই ঢলে পড়েছে ঘুমে। উপায় ছিল না ওর। জগা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। আর জেগে থাকলেই বকবক করে মাথা খেয়ে ফেলে! আজ উষ্ণীষকে যে-বিশেষ কাজটা করতে হবে, তার জন্য ওর চাই সময় আর সেটা জগা জেগে থাকলে ও কিছুতেই পেত না। তাই পাশের জঙ্গল থেকে এই শিকড়টা খুঁজে আনতেই হয়েছে।

বাকলায় থাকাকালীন এক বৈদ্যরাজের কাছে কাজ করত উষ্ণীষ। তাঁর কাছেই বেশ কিছু ঔষধি গাছের কথা জেনেছিল ও। এই উনিশ বছর বয়সে কম জায়গায় তো ঘুরল না ও! আর কাজও করল নানান ধরনের। এই সময়ে বাংলায় সুস্থ ভাবে জীবনযাপন করা সব জায়গায় সম্ভব নয়। পাঠানরাজত্বের পরে গোটা বাংলাটাই এখন নানান ভুঁইয়াদের রাজত্বে ভাগ হয়ে গেছে। সব জায়গার শাসনব্যবস্থা ভাল নয়। তার সঙ্গে বাংলার এই দক্ষিণ অংশে আছে পর্তুগিজ় আর মগ জলদস্যুদের অত্যাচার।

হিন্দুস্থানের এখন যিনি বাদশা, সেই জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবরও সৈন্য দিয়ে এই ভুঁইয়াদের বাগে আনতে পারছেন না। হেরে, বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে সবাই। শেষে মানসিংহ এসে কিছুটা হাল ধরলেন বটে। কিন্তু দাক্ষিণাত্য বিজয়ের কাজে মানসিংহকে চলে যেতে হল। ফলে তাঁর পুত্র জগৎ সিংহ তাঁর জায়গায় সুবাদার হলেন বাংলার। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। তাঁর পনেরো-ষোলো বছরের পুত্র মহাসিংহ তার পর সুবাদার হলেন! ব্যস, তার পর থেকেই ভুঁইয়া-রাজারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন। এঁদের মধ্যে যশোররাজ প্রতাপাদিত্য অন্যতম প্রধান। আর প্রতাপাদিত্য এখন নিজেকে স্বাধীন রাজা হিসেবেও ঘোষণা করে দিয়েছেন। আর তার প্রতীকস্বরূপ রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন। নিজের পতাকা ও ত্রিকোণ মুদ্রা প্রকাশ ও প্রচলন করেছেন। উষ্ণীষ জানে, যে-রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তিনি সকলের আগে নিজের পতাকা আর মুদ্রা প্রকাশ করেন।

তবে ও এটাও শুনেছে যে, মানসিংহ নাকি আবার আসছেন।

এখন যশোর অঞ্চলে কিছুটা হলেও শান্তি এসেছে। কিছু দিন আগে পর্যন্তও সাধারণ মানুষজন হাবরি, মানে পর্তুগিজ় জলদস্যু ও ওদের সঙ্গী মগদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শুধু যে আড়পাঙ্গাসিয়া, মালঞ্চ, পশর, রায়মঙ্গল নদীতেই এদের উৎপাত ছিল, তা নয়। মাতলা আর বিদ্যাধরী নদীতেও এই জলদস্যুরা আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। গ্রামকে গ্রাম এদের অত্যাচারে খালি হয়ে গেছে। আসলে জলদস্যুরা নদীতেই শুধু নয়, ডাঙায় উঠেও গ্রামের মধ্যে ঢুকে যাকে পারে তাকে ধরে নিয়ে নিজেদের নৌকায় ভরে রাখে! এই ব্যাপারে ছোট বাচ্চা বা বুড়ো, কোনও বাছ-বিচার করে না তারা। তার পর এই সকল মানুষকে দাস হিসেবে নানান জায়গায় বিক্রি করে দেয়। তবে বাকলাসহ অন্যান্য জায়গায় জলদস্যুদের উপদ্রব থাকলেও প্রতাপাদিত্য নিজের যশোরে জলদস্যুদের ঠান্ডা করে দিয়েছেন একদম। নদীতে তাঁর সৈন্যরা টহল দেয় এখন। তার সঙ্গে নানান নদীর পাশে দুর্গ বানিয়েছেন। সেখানেও চলে পাহারা। ফলে যশোরে জলদস্যুরা কিছু সুবিধে করতে পারে না।

কিন্তু সব রাজ্য তো আর যশোর নয়। তাই অন্য জায়গায় জলদস্যুদের মানুষ অপহরণ করে বিক্রি করার মতো ঘৃণ্য দাস-ব্যবসা রমরম করে চলছে।

এমনই সৈঙ্গর নামে এক গ্রাম থেকে জলদস্যুদের দ্বারা উঠিয়ে নেওয়া, এক সম্ভ্রান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বংশের যমজ ছেলে-মেয়ের খোঁজে পাঁচ মাস হল উষ্ণীষ ঘুরেছিল। তার পর মাত্র সাত দিন হল ও এসে পৌঁছেছে এই মাধবপুর গ্রামে। যশোর রাজ্যের পূর্ব দিকে এই গ্রামটা। আর এখানেই মাঝারি এক জমিদার লোকেন সাহার বাড়িতে ও খুঁজে পেয়েছে ছেলে-মেয়ে দু'টিকে।

উষ্ণীষকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন আচার্য মহাময় মুখোপাধ্যায়। পাঁচ বছর বয়সে উষ্ণীষের বাবা-মা মারা যাওয়ার পরে এক পিসির কাছে মানুষ হয়েছিল ও। তার পর ওর বারো বছর বয়সে সেই পিসিকে মেরে ফেলে উষ্ণীষকেও জলদস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু ছোট থেকেই দুর্ধর্ষ উষ্ণীষকে ওরা আটকে রাখতে পারেনি। জলদস্যুদের নৌকা থেকে উষ্ণীষ পালিয়েছিল। তার পর নানান জায়গায় ঘুরে শেষে ওর ঠাঁই হয়েছিল মহাময় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

মহাময় ওঁকে নিজের মতো করে গড়েছেন। নানান জায়গায় কাজের জন্য পাঠিয়েছেন জীবনকে চেনার জন্য, নানান কিছু শেখার জন্য। তাঁর কথা মতোই যেমন সেই বৈদ্যরাজের কাছে কাজ করেছিল উষ্ণীষ, তেমনই বাকলার রাজার সেনাপতির কাছেও কাজ করেছিল। এমনকি কাজ করেছিল বিক্রমপুরের রাজা, বিখ্যাত কেদার রায়ের কাছেও।

মহাময়ের শিক্ষাতেই এই উনিশ বছর বয়সেই উষ্ণীষ এক জন সাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক হয়ে উঠেছে।

সৈঙ্গরের বিষ্ণুপদ গঙ্গোপাধ্যায়, মহাময়ের বন্ধু স্থানীয়। তাই তাঁর যমজ ছেলে-মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ায় বিষ্ণুপদ যেমন কষ্টে আছেন, তেমন মহাময়ও কষ্টে আছেন! মহাময়কে নিজের গুরু মানে উষ্ণীষ। ও জানে এমন সৎ, নির্ভীক মানুষটি না-থাকলে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ও মারা পড়ত! তাই উষ্ণীষ নিজেই মহাময়কে বলেছিল, "গুরুমশায়, আমি যদি ওদের খুঁজে দিতে পারি?"

"তুই!" মহাময় অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন ওর দিকে!

উষ্ণীষ বলেছিল, "আপনি কষ্ট পাচ্ছেন, দেখে আমার ভাল লাগছে না!"

"তুই পারবি?"

"হ্যাঁ," উষ্ণীষ চোয়াল শক্ত করে বলেছিল।

মহাময় বলেছিলেন, "কথা দিলি কিন্তু! ঠিক আছে, আমি এই কাজে তোকে নিযুক্ত করলাম।"

"আপনি আমায় শুধু ওদের কোনও নিশান দিন, যাতে দেখে চিনতে পারি!"

মহাময় বলেছিলেন, "এ আর কঠিন কী! ওদের বাবা বিষ্ণুপদ নিজেই তো ছবি আঁকে! ওকেই বলছি। ও নিজে ওর সন্তানদের ছবি এঁকেছিল।"

ছেলেটি ও মেয়েটির সেই হাতে-আঁকা ছবি নিয়ে পাঁচ মাস আগে বাকলা ছেড়ে নানা দিকে ঘুরে বেরিয়েছে উষ্ণীষ। সঙ্গী বলতে প্রিয় বন্ধু হাসান। ও খবর নিয়ে জেনেছে, সৈঙ্গরে যে জলদস্যুদের দলটা বড়দের সঙ্গে বাচ্চাদেরও তুলে এনেছিল, তাদের মধ্যে মগ যেমন ছিল তেমন ছিল পর্তুগিজ়রাও।

তাই প্রথমে আরাকানের পাশেই পর্তুগিজ়দের ঘাঁটি চট্টগ্রামে গিয়েছিল উষ্ণীষ। তার পর গিয়েছিল সন্দ্বীপে। সেখানে থেকে হুগলির সপ্তগ্রামেও গেছে। গেছে ব্যান্ডেলের দাসের হাটে। কথা বলেছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। তার পর সেই কথার সূত্র ধরে ক্রমে এসে পৌঁছেছে এই মাধবপুরের লোকেন সাহার বাড়িতে।

জমিদারির সঙ্গে-সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসাও আছে এই লোকেন সাহার। ধূমঘাটের ব্যবসায়ী সমিতির অধ্যক্ষ। ঢাকাই মলমল আর কুসুম ফুলের থেকে তৈরি কাপড় ছোপানোর রং বিক্রি করে অনেক টাকা করেছে লোকটা। সেই টাকাতেই জমিদারিটা কিনেছে। আর এই লোকেন সাহার বাড়িতেই ও খোঁজ পেয়েছে যমজ বাচ্চা দুটোর। জেনেছে, লোকেন সাহা সপ্তগ্রামের দাসের বাজার থেকেই কিনে এনেছে ওদের। এখানে লোকেন সাহার গিন্নির কাজে লাগানো হয়েছে মেয়েটিকে। আর ছেলেটিকে দিয়ে নিজের ফাইফরমাশ খাটায় লোকেন!

উষ্ণীষ বুঝেছিল যে, এদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে হলে লোকেন সাহার বাড়িতে থাকতে হবে ওকে। সেই ভাবেই এখানে কাজে লেগেছে ও। ঘোড়াদের দেখাশোনার কাজ মূলত। আর ও হাসানকে বলেছে গ্রামেই থাকতে। সময়মতো খবর দেবে। তার পর থেকেই উষ্ণীষ তক্কে-তক্কে থেকেছে বাচ্চা দুটোকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগের। অবশেষে আজ এসেছে সেই সুযোগ!

সেই বিকেল থেকে মুষল ধারায় বৃষ্টি নেমেছে আজ। জমিদার-বাড়ির সব লোকজন ঘরের মধ্যেই ঢুকে আছে। আজ রাতেই তাই সুযোগ এসেছে। এই এখানে থাকার সাত দিনের মধ্যে একটা কাজ করেছে উষ্ণীষ। ছেলেটি আর মেয়েটিকে বলে রেখেছে, ও আসলে কে। আর কেনই বা এসেছে এখানে। মনমরা বাচ্চা দুটো তার পর থেকে একটু ঠিক আছে। বাড়ি যেতে পারবে ভেবে খুশি আছে বলা যায়। উষ্ণীষ ওদের বলে রেখেছে যে, সব সময় যেন ওরা প্রস্তুত থাকে। কারণ পালানোর সুযোগ যে-কোনও সময়ে আসতে পারে।

ঘরের বাইরে বেরোল উষ্ণীষ। ওই বড় উঠোনের ও-পারে চাকরদের ঘর। বাচ্চা ছেলেটা ওইখানে আছে। আর মেয়েটা আছে মহিলামহলের পাশে দাসীদের ঘরে।

আকাশে মাঝে-মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটা ভরসা করেই এগোল উষ্ণীষ। আস্তাবল থেকে কোন ঘোড়াটা নেবে, সেটা ও ঠিক করেই রেখেছে। ও এ-ও জানে, পালিয়ে বেশি দূর একা যেতে পারবে না ও। তাই ওর প্রিয় বন্ধু হাসানের সাহায্য নিতে হবে ওকে।

হাসানকে আজ বিকেলেই গ্রামে গিয়ে খবর দিয়েছে উষ্ণীষ।

এখন বাচ্চাগুলোকে এখান থেকে বের করে ঘোড়ায় চেপে হাসানের কাছে দিয়ে দেবে। হাসান ওদের নদীপথে নিয়ে যাবে সৈঙ্গরে। আর উষ্ণীষ নিজে যাবে অন্য দিকে। ওকে যদি লোকেন সাহার পাইকরা ধরেও ফেলে, তা হলেও হাসানের নাগাল ওরা পাবে না! কারণ, ওরা হাসানকে চেনেই না।

দ্রুত পায়ে বড় উঠোনটা পার করে চাকরদের ঘরের দিকে এগোল উষ্ণীষ। ও জানে বাচ্চা ছেলেটা রাতে কোথায় থাকে। আর ওই দিকের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে কী ভাবে খুলতে হয়, সেটাও জানে!

এই কাজটা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে কী হবে উষ্ণীষ জানে। লোকেন সাহার লোকজন ওকে মেরে নদীর ধারে পুঁতে দেবে। তাই এই কাজটা শেষ করে ওকে বেশ কিছু দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে।

বৃষ্টিতে ভিজে গেছে উষ্ণীষ। কিন্তু সে-সব ওর মাথায় নেই এখন। চাকরদের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। তার পর কোমর থেকে একটা পাতলা লোহার পাত বের করে দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। পুরনো দরজা, ঠিক মতো বন্ধ হয় না। ফাঁকফোকর আছে যথেষ্ট। চাকরদের জন্য এখানে কে অত খরচ করে!

হাতের চাড়ে দরজার খিলটা খুলে দরজাটা ফাঁক করে খিলটা ধরে ফেলল উষ্ণীষ। তার পর নিঃশব্দে খিলটা নামিয়ে রাখল। পা টিপে-টিপে ও ভিতরে ঢুকল এ বার। তার পর একটু সময় নিল। কেউ শুনে ফেলল কিনা সেটা দেখা দরকার।

না, কেউ শোনেনি। ও এ বার হাত দুটো মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে অদ্ভুত স্বরে ব্যাঙের ডাক ডাকল। এই নানান পশু-পাখির ডাক নকল করার বিদ্যেটাও মহাময়ই শিখিয়েছেন ওকে।

দু'বার ডেকে চুপ করে গেল উষ্ণীষ। ছেলেটা কি শুনতে পেল? ওকে তো বলে দিয়েছিল এ ভাবে দু'বার ডাকবে!

আচমকা অন্ধকার ফুঁড়ে ওর সামনে বেরিয়ে এল ছেলেটা! চাপা গলায় বলল, "উষ্ণীষদা, তুমি এসেছ?"

উষ্ণীষ সময় নষ্ট না-করে বলল, "বোনকে নিয়ে এসো দ্রুত। আর সময় নেই!"

"আসছি," বলেই ছেলেটা আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

প্রায় দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল উষ্ণীষ। পারবে তো বাচ্চা ছেলেটা, বোনকে নিয়ে আসতে? যদি ধরা পড়ে যায়! এত দিনের সব পরিশ্রম কি বৃথা হয়ে যাবে? বাচ্চাগুলোকে কি ও এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারবে না?

অন্ধকারের সঙ্গে মিশে অপেক্ষা করতে লাগল উষ্ণীষ রায়! বাইরে তখন এক টানা বৃষ্টির শব্দ!

॥ ২ ॥

বঙ্গোপসাগরে, কোনও এক জায়গায়

নিজের জাহাজ থেকে সামনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দাভি ডি'ক্রুজ়। এটা কী দেখছে ও! গিয়েছিল ছ'টা বলিয়া আর দুটো পলওয়ার নৌকা। সেখানে ফিরে আসছে কিনা মোটে দুটো শতছিন্ন বলিয়া!

এই বলিয়া নৌকাগুলো লম্বাটে, কিন্তু ছোট। এক পাশে ছই আছে। আর খুব দ্রুত জল কেটে চলতে পারে। পলওয়ার নৌকা আবার এর চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। এই নৌকায় থাকে বড় মাস্তুল আর পাল। এই নৌকাগুলোয় অনেক জিনিসপত্র ধরে।

বলিয়া নৌকা করে গিয়ে দাভির জলদস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রামের মানুষজনের উপর। সেখানে যথাসাধ্য জিনিসপত্র লুঠ করে আর তার সঙ্গে ধরে আনে মানুষ।

এই ধৃতদের হাতের পাতা ছিদ্র করে তাতে বেতের সরু চাঁচ ঢুকিয়ে বেঁধে নিয়ে এসে পলওয়ার নৌকার খোলের মধ্যে জিনিসপত্র বোঝাই করার মতো করে ভরে রাখে। তার পর এই মানুষগুলোকেই ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয় নানান জায়গায়!

দাভি দুর্ধর্ষ জলদস্যু। ওর ভয়ে চট্টগ্রাম থেকে সুন্দরবনের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত সবাই কাঁপে। সেখানে ওর লোকজনের, নৌকার এ কী হাল হচ্ছে! গত দু'মাসে এই নিয়ে চার বার এমন হল! এ তো মহা মুশকিল! এ ভাবে চললে ওর সমস্ত নৌকা আর জাহাজ নষ্ট হয়ে যাবে! ওর জলদস্যুর দল ভেঙে যাবে!

দাভি পাশে দাঁড়ানো ওর সহকারী অলফন্সোকে বলল, "এ কী হচ্ছে!"

অলফন্সো থুতনির সুচালো দাড়িতে হাত বুলিয়ে মাথা নাড়ল। বলল, "প্রতাপাদিত্য নিজেকে রাজা ঘোষণা করার পর থেকে যা শুরু করেছে! মাতলা থেকে তার রাজধানী ধূমঘাট পর্যন্ত পর-পর অনেক দুর্গ বানিয়ে রেখেছে! তার সঙ্গে ছোট-ছোট চৌকি-নৌকা সারা ক্ষণ সমুদ্র, নদী আর খাঁড়িগুলোয় টহল দিচ্ছে! ছোট-ছোট রণতরীর বহর দিকে-দিকে পাহারা দিচ্ছে! আমরা যে নদীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে গ্রাম লুঠ করতাম, তাতে তারা বাধা দিয়ে আমাদের মেরে তাড়াচ্ছে! অনেককে মেরেও ফেলছে। এ ভাবে চললে আমাদের কাজ-কারবার সব পণ্ড হয়ে যাবে।"

দাভি মাথা নাড়ল। কথাটা সত্যি। এ ভাবে চলতে দেওয়া যাবে না! ও দেখল নৌকাগুলোকে একটু দূরের ছোট দ্বীপের পাশে লাগানো হয়েছে। আপাতত এখানে দু'দিন হল ওরা থানা গেড়েছে। কিন্তু যা হাল দেখছে, এখান থেকেও পাততাড়ি গোটাতে হবে। প্রতাপাদিত্যের নৌবহর, যাকে সবাই মীরবহর বলে, ওদের বেঁচে থাকাই মুশকিল করে দিয়েছে।

আগে কিন্তু এমন অবস্থা ছিল না। গোয়া থেকে ওরা নানান অপরাধ করে পালিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, মানে চট্টগ্রামে বা সন্দ্বীপে এসে আশ্রয় নিত। মগদের সহায়তায় সেখান থেকে ওরা নিশ্চিন্তে দস্যুবৃত্তি করত। কিন্তু সে দিন আর নেই! দাভি বুঝতে পারছে প্রতাপাদিত্যকে যদি আটকানো না-যায়, তা হলে কপালে দুর্ভোগ আছে।

অলফন্সো ওর বিশ্বস্ত সেনাপতি। এ ছাড়াও সিলভা, নাসিমান্তো, ব্রুনো, ফিলিপ-সহ আরও অনেক যোদ্ধা আছে ওর দলে। কিন্তু এ ভাবে চলতে থাকলে এদের ক'জন যে বেঁচে থাকবে, সেটাই প্রশ্ন!

দাভি বলল, "তোমায় যে বলেছিলাম খবর আনতে! 'সেই' লোকটির থেকে কোনও খবর পাওনি? প্রতাপের কোনও না-কোনও দুর্বলতা নিশ্চয়ই আছেই, তাই না? সেটা এক বার জানতে পারলে..."

অলফন্সো চোয়াল শক্ত করে বলল, "ধূমঘাট খুব উন্নত শহর। সেখানে আক্রমণ করা যাবে না। আর ধূমঘাট পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে অনেক দুর্গ আর তার সৈন্যদের আমাদের শেষ করতে হবে। সেটা সম্ভব নয়।"

"সেটা কি আমি জানি না?" দাভি বিরক্তিতে মাথার লাল কাপড়ের পাগড়িটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল জাহাজের পাটাতনে। বলল, "অন্য কিছু বলো, অন্য কিছু! 'সেই লোকটি' কোনও খবর পাঠায়নি? ওর পাঠানো মোহরে তো আমাদের সারা বছর চলবে না! ওর থেকে খবর চাই। এমন কিছু খবর, যাতে আমি প্রতাপের টুঁটি টিপে ধরতে পারি! যাতে ওকে দিয়ে আমার ইচ্ছেমতো কাজ করাতে পারি! বলো!"

অলফন্সো বলল, "উনি তো বলেছেন যথা সময়ে খবর পাঠাবেন! আশা করি..."

অলফন্সো কথা শেষ করার আগেই আচমকা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কারও একটা উঠে আসার শব্দ শুনতে পেল দাভি। ও ঘুরে দেখল

সিলভা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঢোলা জামাকাপড় মলিন হলেও চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল।

দাভি কৌতূহল নিয়ে তাকাল ওর দিকে। জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার!"

"ক্যাপিতেও, ভাল খবর আছে! 'সে' খবর পাঠিয়েছে!" সিলভার গলায় চাপা উত্তেজনা।

"কী খবর?" দাভিও উত্তেজিত হল।

"প্রতাপের প্রাণভোমরার খবর পাঠিয়েছে 'সে'। এক বার তাকে হাতের মুঠোয় নিতে পারলে..." ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে সিলভা হাসল।

দাভির একটা পা কাঠের। তাই খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল ওর দিকে, "প্রাণভোমরা? কী সেটা?"

"কী নয় ক্যাপিতেও, কে!" সিলভা হাসল। তার পর ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করল 'তার' থেকে পাওয়া গোপন সেই খবর।

॥ ৩ ॥

সুন্দরবনের জঙ্গলে

শিকার করতে উদয়ের একটুও ভাল লাগে না। কিন্তু রাজার ছেলেদের নাকি শিকার করতেই হয়! চিন্তামণি খুড়ো অন্তত তাই বলেন। কী যে সব যাচ্ছেতাই নিয়ম! উদয়ের বাবা, মানে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ছোট থেকেই দুর্দান্ত সাহসী! তখন থেকেই সে যেমন বীর যোদ্ধা, তেমন শিকারি হিসেবেও দারুণ।

উদয়েরও সাহস কম নেই। এই পনেরো-যোলো বছর বয়সে সে-ও বেশ কয়েকটা যুদ্ধে গেছে। সেখানে শত্রুপক্ষকে হারিয়েও দিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ হল বাধ্য হয়ে করা একটা খারাপ কাজ। কারণ, সেটা না-করলে শত্রুর হাতে নিজেদেরই মারা পড়ার ভয় থাকে। সঙ্গে নিজেদের প্রজাদেরও ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু শিকার? সেটা তো অমানবিক একটা ব্যাপার! একটা নিষ্ঠুরতা! অসহায় কিছু পশুকে সকলে মিলে পরিকল্পনা করে খুন করা। কেন? না, কেবল আনন্দের জন্য। নিজেকে সাহসী প্রমাণ করার জন্য। উদয়ের মোটেও এ সব ভাল লাগে না! কিন্তু চিন্তামণি খুড়ো যদি সেটা শোনেন!

চিন্তামণি আচার্য, প্রতাপাদিত্যের এক মন্ত্রী। বয়স্ক মানুষ। লম্বা। দোহারা চেহারা। মাথা কামানো। লোকটার চোখে-মুখে শান্ত ভাব থাকে সব সময়। তাও কেন কে জানে উদয়ের মোটেও ভাল লাগে না লোকটাকে। লোকটা সারা ক্ষণ উদয়ের পিছনে টিক টিক করেন। হয় কী নয় উদয়কে ধরে-বেঁধে জ্ঞান দেন! উদয়ের বিরক্তি লাগে। কিন্তু বাবার ভয়ে কিছু বলতে পারে না। উদয় জানে, ওর বাবা মহারাজ প্রতাপাদিত্য চিন্তামণির উপর রাজ্যের আইন-কানুন বিষয়ের ভার দিয়ে রেখেছেন। তাই তাঁকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গেই দেখেন। এই যে উদয় চিন্তামণিকে কিছু বলে না, এতেই যেন চিন্তামণি আরও পেয়ে বসেছেন! জ্ঞান দেওয়ার মাত্রা আরও বেড়ে গেছে! এই শিকারেও তো উদয় আসতে চায়নি।

তাই শুনে চিন্তামণিই ওকে বলেছেন, "ছি ছি! নিজেকে রাজপুত্র বলো তুমি? যশোর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে তুমি? এই সাহস তোমার! বাঘ না-মারলে, রাজা কখনও সত্যিকারের রাজা হয়?"

উদয় অবাক হয়ে বলেছে, "আমি কি যুদ্ধে যাইনি খুড়োমশাই? সাহস কি আমার নেই! নিরপরাধ প্রাণী মেরে নিজেকে বাহাদুর প্রমাণ করতে হবে?"

"হ্যাঁ হবে," চিন্তামণি বলেছেন, "রাজ্যের প্রজারা সব সময় শক্তিশালী ও সাহসী মানুষকে নিজেদের রাজা হিসেবে দেখতে চায়! সেখানে তুমি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ মহারাজ উদয়াদিত্য! তোমাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে না! বাঘ মারার মধ্যে যে সাহস আছে, সেটা তোমাকে দেখাতে হবে বই কী! প্রজারা না হলে তোমায় মান্যিগন্যি করবে কেন? তুমি যদি এই শিকারে না-যাও, তা হলে তো আমায় মহারাজকে ব্যাপারটা জানাতে হয়!"

এই শেষ কথার পরে আর কোনও কথা হয় না। কারণ উদয় জানে বাবার কানে এ সব কথা উঠলে বাবা যে কী করবেন কেউ জানে না! কারণ সবাই এটা ভাল করে জানে যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য এমনিতে দানশীল ও প্রজাবৎসল মানুষ। কিন্তু রেগে গেলে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না! তখন তিনি যে-কাউকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করেন না।

বাবার ভয়েই উদয় সুন্দরবনের জঙ্গলে এসেছে শিকারে। আর এসে কী বিপদেই যে পড়েছে! এবার ভাটি প্রদেশে বৃষ্টি হচ্ছে খুব। এমনিতেই যশোরের একটা বড় অংশ এই সুন্দরবন। এই অঞ্চল নদী আর খালের কাটাকুটিতে পূর্ণ! আর-একটু বেশি বৃষ্টি হলেই এই সব নদী-খাল-দিঘি জলে জলাকার হয়ে যায়! আজও প্রায় সে রকমই অবস্থা হয়েছে। তার মধ্যে উদয়াদিত্য আর ওর বন্ধু মোহন শিকারের বাকি দলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে!

উদয়, মোহনের আগ্রহে এক পাল চিতা-হরিণকে তাড়া করতে গিয়ে বাকি দলের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে! ওদের লোক-লস্কর আর শিকারি কুকুরের দল যে কোথায় পড়ে রয়েছে কে জানে!

এখন ঘন কালো মেঘ করে আছে মাথার উপর। জঙ্গলের মধ্যে এই দুপুরবেলাতেই কেমন যেন সন্ধের ছায়া! মুষলধারায় বৃষ্টি আর ঘন গাছপালার মধ্যে কিচ্ছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। বরং বৃষ্টিতে বনের মধ্যে সব কিছুই কেমন যেন কুয়াশায় মোড়া আর আবছা লাগছে!

উদয় ভাল করে চার দিক দেখে বোঝার চেষ্টা করল। কোন দিক দিয়ে এসেছিল ওরা! কিছুই তো বুঝতে পারছে না! এখন মোহনকে সঙ্গে করে ফেরত যাবে কী করে! ইস, শিকারে এসে কী বিপদেই না পড়ল!

মোহন বলল, "উদয়, হরিণের পালটা কোথায় গেল বল তো?"

উদয় বিরক্ত হয়ে বলল, "বনের মধ্যে পথ হারিয়েও তোর শিক্ষা হল না? এখনও হরিণ-হরিণ করে যাচ্ছিস? তুই কি জানিস না যে এমন পশুহত্যা আমার পছন্দ নয়?"

মোহন মাথা নাড়ল, "আরে ধুর! সারা ক্ষণ তোর এই বুড়োটেপনা হাবভাব ভাল লাগে না আমার! আর আমি হরিণ মারব বলেছি? আমি হরিণ ধরে পুষব। মহারাজের বাগানে কত হরিণ আছে। আমারও তেমন একটা হরিণের বাগান থাকবে। কী সুন্দর দেখতে বল! লালচে হলুদ শরীর। পেট, গলা আর লেজের নীচে সাদা! গায়ে সাদা ডোরা! আমার কী যে ভাল লাগে!"

উদয় হতাশায় নিজের মনে মাথা নাড়ল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতি সূর্যকান্তের ছেলে মোহনকুমার। ছোট থেকেই ওরা বন্ধু। খুব চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে এই মোহন। আর একটু পাগলাটে গোছেরও আছে। মানে মাথায় এক বার যা ঢুকবে, সেটা করেই ছাড়বে!

উদয় বলল, "দ্যাখ, ও সব বাদ দে এখন। কেমন মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে দেখছিস তো? এর পর আর লোকজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার উপর বাঘের আর গন্ডারের ভয় আছে! এখন আমাদের লোকজনদের খুঁজি চল। না হলে খুব বিপদ হবে।"

"তোর খালি ভয়! আরে কিছু হবে না," মোহন ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

উদয় বলল, "কিছু হবে না মানে? আমাদের কাছে বন্দুক নেই। শুধু এই তরোয়াল আর তির-ধনুক! বাঘ তাড়া করলে এই দিয়ে কতটা কী করতে পারব জানি না!"

মোহন হাসল। বলল, "এতেই হবে। আমি ঠিক এক তিরেই..."

মোহন কথা শেষ করতে পারল না। আচমকা বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে পিছনের দিকে বেশ কিছু পায়ের শব্দ শোনা গেল।

মোহন চেঁচিয়ে বলল, "ওই যে হরিণ!"

উদয় ঘুরে দেখল হ্যাঁ, সত্যি হরিণের সেই পালটাই বটে। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে দৌড়ে গেল। ও মাথা ঘুরিয়ে মোহনকে কিছু বলতে গেল। কিন্তু কোথায় মোহন!

মোহন সামনের ঝোপের উপর দিয়ে লাফ মেরে বৃষ্টির মধ্যে আবার ছুটেছে হরিণের পিছনে।

উপায়ান্তর না-দেখে উদয়ও দৌড়ল।

অরণ্য এখানে গভীর। সুন্দরী, পশুর, কেওড়া, গরান, গামুর, বাইন সহ আরও কত রকমের যে গাছ রয়েছে, তার ঠিক নেই! উদয় হাতের তরোয়াল দিয়ে সামনের ঝোপঝাড় কাটতে-কাটতে এগিয়ে যাচ্ছে। ওই মোহনের লাল রঙের ধুতি দেখা যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে পাগলটা! ও কি ভেবেছে হরিণের সঙ্গে দৌড়ে পারবে? উদয় তাও যথা সম্ভব দ্রুত এগোতে লাগল।

সামনে জঙ্গল যেন আরও গভীর। সেই সঙ্গে বৃষ্টিটাও যেন বাড়ল। আর কোথায় যেন একটা জলস্রোতের কুলকুল শব্দ পাওয়া যাচ্ছে! সামনে কি কোনও ছোট নদী বা খাল রয়েছে?

উদয় কী করবে বুঝে ওঠার আগেই আচমকা তীব্র একটা চিৎকার শুনল। মোহনের গলা! উদয়ের সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ও হাতের তরোয়ালটা শক্ত করে ধরে মোহনের চিৎকার লক্ষ করে জঙ্গলের মধ্যে আরও দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করল। আর দেখল সামনেই একটা খাল। তার এক দিকের পাড় অনেকটা ধসে গেছে। আর সেই জায়গা দিয়েই জলে পড়ে গেছে মোহন! মাটিতে পিছলে পড়ে যাওয়ার দাগ এখনও স্পষ্ট! উদয় দেখল জলের স্রোত বেশ বেশি। তার মধ্যেও একটা গাছের সরু শিকড় ধরে মোহন কোনও রকমে জলে ভেসে আছে আর চিৎকার করছে।

উদয় আর সময় নষ্ট না-করে হাতের তরোয়াল ফেলে দিয়ে খালের জলে লাফিয়ে পড়ল। আর জলে পড়েই বুঝল যে জলের যা স্রোত, তাতে মোহনকে হাত ধরে তোলা খুব কঠিন! কারণ উদয় এ বার নিজেই ভেসে যাচ্ছে!

এই সব খালের জলে কুমির থাকে! জলে পড়ে উদয়ের এটাই মনে হল। আসলে বন্ধুকে বাঁচানোর উত্তেজনাবশত এটা মাথায় ছিল না। এখন ভয় লাগল। কিন্তু সেটাকে জোর করে মন থেকে সরাল উদয়।

ও দেখল, মোহনের হাত থেকে গাছের সেই শিকড় ফস্কে গিয়েছে। আর ওরা দু'জনেই দ্রুত বেগে হাবুডুবু খেতে-খেতে ভেসে যাচ্ছে! এই খালগুলো গিয়ে মিশেছে কোনও বড় নদীতে। সেখানে গিয়ে পড়লে আর বাঁচার আশা নেই!

উদয় এই স্রোতের মধ্যেও প্রাণপণ সাঁতরে পাড়ের দিকে এগোতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ওর যেন নিজের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই আর! জলের তোড়ে তালগোল পাকিয়ে ভেসে যাচ্ছে। মোহনেরও একই অবস্থা। তা হলে কি এ ভাবেই শেষ হয়ে যাবে ওরা!

আচমকা সামনের স্রোতের মধ্যে কোত্থেকে বড়-বড় দুটো কাঠের খণ্ড এসে পড়ল! উদয় ওই অবস্থাতেও দেখল কাঠের খণ্ড দুটো গাছের মোটা লতা দিয়ে বাঁধা! উদয় ভেসে যেতে-যেতেই তার মধ্যে হাত বাড়িয়ে একটা কাঠ চেপে ধরল প্রাণপণে! দেখল মোহনও ঠিক ওর মতোই আর-একটা কাঠের খণ্ড চেপে ধরেছে! তার পর তাকাল পাড়ের দিকে। দেখল একটা ছেলে! খালি গা। পাথরে বাঁধানো শরীর যেন! হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরা। ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে আর বলছে, "লতা ধরে এগিয়ে আসুন! ভয় নেই। আসুন। আমি লতাদুটো গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি! ধীরে-ধীরে আসুন আপনারা!"

উদয় এ বার দেখল ওদের কাঠের খণ্ডের সঙ্গে বাঁধা লতা দুটো বড় বড় দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধা! ছেলেটা কে! এ ভাবে ওদের বাঁচাল কেন!

মোহন আর উদয় বেশ কসরত করে পাড়ে এসে উঠল অবশেষে। দু'জনেই বেশ ক্লান্ত। হাঁপাচ্ছে! মোহন তো বেশ কিছুটা জলও খেয়েছে!

বৃষ্টিটা এত ক্ষণে ধরেছে বেশ। উদয় সামান্য বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসল এ বার। ভাল করে দেখল, ছেলেটা উৎসুক মুখে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে!

উদয় বলল, "তুমি কে? আর আমাদের এ ভাবে বাঁচালে বলে ধন্যবাদ!"

ছেলেটা হাসল, "আপনারা বেঁচে গেলেন, সেটাই অনেক। ভাগ্যিস হিঙ্গের কাঠের খণ্ড পেয়েছিলাম! না হলে যে কী হত!"

হিঙ্গের কাঠ যে হালকা আর খুব সহজে জলে ভেসে থাকে, সেটা জানে উদয়। অনেকে মাছ ধরার জাল জলে ভাসিয়ে রাখার জন্য এই কাঠ ব্যবহার করে, সেটাও জানে!

উদয় এ বার কোলাহল শুনল হঠাৎ। সঙ্গে কুকুরের চিৎকারও শুনল। বুঝল ওই ওদের লোকজন আসছে। ওরাও নিশ্চয়ই খুঁজছিল ওদের। ওই শব্দ শুনে ছেলেটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, "আচ্ছা, আপনারা এখন সুস্থ আছেন যখন, আমি তা হলে আসি!"

"আরে, আরে, যাবে কোথায়?" উদয় ছেলেটার হাত চেপে ধরল, "আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ তুমি। এ কি সহজ কথা? আমাকে ঋণী করে চলে যাবে?"

"ও সব কিছু না," ছেলেটা হাসল, "এক জন মানুষের কাজই হল বিপদে অন্য মানুষকে সাহায্য করা। সেটাই করেছি মাত্র!"

উদয় দেখল ওদের লোকজন এ বার চলে এসেছে আরও কাছে। গাছপালার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেককে। ছেলেটা যেন সেটা দেখে আরওই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে চলে যাওয়ার জন্য।

উদয় ছেলেটার হাতটা আরও শক্ত করে ধরল। জিজ্ঞেস করল, "আরে যাবে কোথায়? জানো আমি কে? তোমায় জিজ্ঞেস করছি যেটা, সেটার উত্তর দাও। কে তুমি?"

ছেলেটা পিছনে ফিরে দেখল এ বার। লোকজন এসে গেছে। চারটে কুকুর গজরাচ্ছে! চার দিক দিয়ে সবাই ঘিরে ফেলেছে ওদের।

ছেলেটা কেমন যেন হতোদ্যম হয়ে বসে পড়ল জল-কাদার মাটিতে। তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, "আমি আপনাকে চিনি না। কে আপনি?"

ভিড়ের মধ্যে থেকে এক জন পদস্থ সৈনিক এ বার এগিয়ে এল। ধমক দিয়ে বলল, "প্রশ্ন করছিস কাকে? সত্যি জানিস না, উনি কে?"

ছেলেটা মাথা নাড়ল। জানে না।

উদয় সৈনিকটিকে হাত দিয়ে থামিয়ে বলল, "আমি উদয়াদিত্য গুহ। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তুমি এ বার নিজের পরিচয় দাও। আমি জানতে চাই কে আমাদের জীবন বাঁচাল?"

ছেলেটা মাথা নামিয়ে ভাবল কিছু ক্ষণ। তার পর বলল, "আমি খুব সামান্য এক জন মানুষ। সে রকম কেউই নই। আমার নাম উষ্ণীষ রায়!"

॥ ৪ ॥

মাঝ সমুদ্রে, মেঘলা দিনে

আকাশে আজ কালো মেঘ। সঙ্গে হাওয়াও দিচ্ছে বেশ। সমুদ্রের জলে বেশ বড়-বড় ঢেউ উঠছে। তিন মাস্তুলের ঘুরাব নৌকাটি ঢেউয়ের মাথায় মোচার খোলার মতো নাচছে। মিহির ভাবল সত্যি, মাল্লাদের কথা শুনে আরও কয়েকটা দিন পুরীতে কাটিয়ে আবহাওয়া অনুকূল হওয়ার পরে বেরোলে ঠিক হত। এখন এই মেঘ থেকে যদি ঝড়-বাদল হয় তা হলেই বিপদ! বঙ্গোপসাগরে নৌকা বা জাহাজডুবি খুবই সাধারণ ঘটনা। মিহির ভাল করে নৌকাটার দিকে তাকাল। ঘুরাব বেশ বড় নৌকা। অনেকটা জাহাজের মতো। বেশ শক্তপোক্ত ভাবে এই নৌকাগুলো বানানো হয়। সামনে-পিছনে যেমন বেশ বড় কয়েকটা কামান লাগানো থাকে, তেমন দু'দিকেও ছোট-ছোট কামান লাগানো থাকে। এমন নৌকা সামান্য ঝড় সহ্য করে নেবে। কিন্তু ঝড় যদি বাড়ে, যদি সেই ১৫০৭ শকাব্দের (১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ) মতো ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়, তা হলে তো খুব সমস্যা! মিহির নৌকার পাটাতনের এক পাশে কাঠের তৈরি ঘরের দিকে এগোল। সত্রাজিৎ নৌকার দুলুনিতে কিছুটা অসুস্থ বোধ করছে। যা আবহাওয়া, নৌকা আরও দুলবে। তখন সত্রাজিতের যে কী হবে!

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বোনের ছেলে মিহির আর ভূষণা রাজ্যের

ভুঁইয়া মুকুন্দরামের ছেলে সত্রাজিৎ, খুবই বন্ধু। সত্রাজিৎ মাঝে-মাঝেই যশোরে ঘুরতে আসে। এ বারও তেমনই এসেছিল। তার পরেই দুই বন্ধু ঠিক করে যে, ঘুরতে যাবে। সেই মতো ওরা পুরীধামে গিয়েছিল। সেখানে জগন্নাথ দেবের কাছে পুজোও দিয়েছিল দু'জনে। সেই পুজো সেরে আশপাশে আরও একটু ঘুরে দু'দিন হল ওরা নৌকায় উঠেছে। যশোরে ফিরতে আর-এক দিন মতো লাগবে। তবে আবহাওয়া খারাপ হলে কী হবে কে জানে!

মিহির কাঠের ছোট ঘরটায় এসে দেখল সত্রাজিৎ শুয়ে আছে। মিহির এগিয়ে গিয়ে সত্রাজিতের কপালে হাত দিল। জ্বর নেই। এই একটা বাঁচোয়া। এখন ভালয়-ভালয় বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

ভূষণার ভুঁইয়া মুকুন্দরাম ছেলের ব্যাপারে খুব ভয়ে থাকেন। আসলে সত্রাজিৎ শরীরের দিক থেকে দুর্বল প্রকৃতির। আর মুকুন্দরামের দুই পুত্র মারা যাওয়ার পরে তিনি সত্রাজিৎকে নিয়ে আরও বেশি চিন্তিত থাকেন। এই পুরীতেও তিনি সত্রাজিৎকে আসতে দিতে চাননি। মহারাজ প্রতাপাদিত্য আশ্বস্ত করে বলেছেন যে ওঁর নৌকা করে যাবে মিহিররা। সঙ্গে কুড়ি জন রক্ষী থাকবে। তাই ভয়ের কিছু নেই। মুকুন্দরাম বলেছেন যে, সত্রাজিতের দায়িত্ব তা হলে প্রতাপের উপর।

এখন সত্রাজিৎ যদি দ্রুত সুস্থ না হয়, তা হলে মুকুন্দরাম কী করবেন কে জানে! উনি ছেলের স্নেহে এতটাই অন্ধ যে, যুক্তি-বুদ্ধির ধার ধারেন না। প্রতাপকে যা-তা বলে অপমান করবেন নিশ্চয়ই! আর প্রতাপ, মিহিরের মামা হলেও খুব রাগী মানুষ! ভাগ্নে বলে রেহাই দেবেন না। মিহিরকে যে কী শাস্তি দেবেন কেউ জানে না। মিহিরের মনটা অস্থির লাগছে। সত্রাজিৎ কেন যে এমন দুর্বল!

মিহিরের হাতের স্পর্শে সত্রাজিৎ চোখ মেলে তাকাল।

মিহির জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে?"

সত্রাজিৎ হাসল। বলল, "ও ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ভেবো না। আমি..."

কিন্তু সত্রাজিৎ কথা শেষ করার আগেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল একটি ছেলে। মাল্লাদের সঙ্গে থাকে ছেলেটা। নাম হারু। ফাইফরমাশ খাটে।

মিহির হাঁপাতে থাকা হারুকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? এ ভাবে না-জিজ্ঞেস করে ঘরে ঢুকে পড়লি?"

হারু চোখ গোল করে হাঁপাতে-হাঁপাতে কোনও মতে বলল, "কত্তা, দেখে যান তাড়াতাড়ি! সর্বনাশ হয়েছে।"

হারুর কথায় এমন কিছু একটা ছিল যে, মিহির দৌড়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল নৌকার বড় পাটাতনের উপর অনেকেই এসে ভিড় করেছে। হারু পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সমুদ্রের দিকে দেখাল। আর মিহির দেখল উথাল-পাথাল সমুদ্রের বুকে, ঢেউয়ের আড়ালে দেখা যাচ্ছে দুটো ছোট জাহাজ। তাদের মাস্তুলে উড়ছে বড় লাল পতাকা। তাতে বালি-ঘড়ি আর রক্ত-মাখা তরোয়ালের চিহ্ন!

মিহিরের মেরুদণ্ড বেয়ে যেন ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল নিমেষে। এই নিশান ও চেনে। ও বুঝল, সামনে ঘোরতর বিপদ। কারণ ওই দুটো জাহাজ জলদস্যুদের!

॥ ৫ ॥

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজসভায়

সামনে দাঁড়ানো মোটা বেঁটে মানুষটার দিকে ভাল করে তাকালেন প্রতাপাদিত্য। লোকটার মুখে কেমন একটা ধূর্ত ভাব। লোকটা হাত জোড় করে কুতকুতে চোখ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওঁর দিকেই। লোকটার নাম লোকেন সাহা। কাপড়ের ব্যবসা করে ভাল সম্পত্তি করেছে। যশোরের পূর্ব দিকে মাধবপুর গ্রামে সম্প্রতি একটা জমিদারিও কিনেছে। ধূমঘাটের ব্যবসায়ী সমিতির মাথা। লোকটা এসেছে নালিশ নিয়ে। হুগলির হাট থেকে দাস হিসেবে কিনে আনা দুটো বাচ্চা ছেলে-মেয়েকে নাকি ওর কাছে কাজ করতে আসা একটা ছেলে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে! এমনিতেই বাচ্চাদের দিয়ে এ সব দাসের কাজ করানো প্রতাপাদিত্যের ভাল লাগে না। কিন্তু রাজা হলেই সব কিছুর প্রতিকার এক দিনে করা যায় না। তাই এই ব্যবস্থাটা এখনও তুলে দিতে পারেননি উনি। কিন্তু ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে এই নিয়ে কাজ করার। তাই লোকটার উপর একটা বিরক্তি আসছে। প্রতাপাদিত্য পাশে বসা শঙ্কর চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, "এর কথা পরে শুনব। আগে বলো, এর খাজনা কি ঠিকমতো শোধ করা আছে? লোকটি কোনও খাজনা বাকি রাখেনি তো?"

শঙ্কর পিছনে দাঁড়ানো সৌম্যদর্শন মানুষটির দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "লক্ষ্মীকান্ত, এই লোকেন সাহার খাজনা..."

লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রতাপের রাজস্ব বিভাগে দ্বিতীয় উচ্চতম পদে কাজ করেন। অল্প বয়সে মা মারা গিয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্তর। বাবা জিয়ো গঙ্গোপাধ্যায় সেই সদ্যোজাত শিশুকে রেখে সেই সময় থেকেই সন্ন্যাস নিয়ে দেশ ছাড়া। তবু মানুষটি নিজের চেষ্টায় এত দূর এসেছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান সর্দার শঙ্কর চক্রবর্তী তাঁর উপর খুব ভরসা করেন।

লক্ষ্মীকান্ত হাতের খাতা খুলে শঙ্করের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "খাজনা এক বছরের বাকি আছে।"

"বাকি আছে!" লোকটার হাবভাব দেখেই প্রতাপাদিত্যের বিরক্ত লাগছিল। এ বার যেন একটা অজুহাতও পেলেন লোকটিকে সামনে থেকে বিদায় করার। প্রতাপাদিত্য বললেন, "আগে খাজনা শোধ করবে, তার পর তোমার নালিশ শুনব।"

"কিন্তু হুজুর," লোকেন ছাড়ার পাত্র নয়, "আমার যে বড় ক্ষতি হয়ে গেল! রীতিমতো টাকা খরচ করে কিনেছিলাম ওদের... আর সেই ব্যাটা চোর..."

লোকেন কথা শেষ করার আগেই এক জন সান্ত্রী প্রায় দৌড়ে এসে দাঁড়াল সভায়। চোখে-মুখে উত্তেজনা। প্রতাপাদিত্যের অন্য পাশে বসা চিন্তামণি সান্ত্রীটিকে জিজ্ঞেস করল, "তোর আবার কী হল? বিচার চলছে এখানে, তার মধ্যে এ ভাবে ঢুকে এলি যে!"

ভৃত্যটি বলল, "হুজুর, রাজকুমার ফিরে এসেছেন। তবে মা যশোরেশ্বরীর কৃপায় খুব বাঁচান বেঁচে গিয়েছেন!"

বেঁচে গিয়েছে! প্রতাপাদিত্য উঠে দাঁড়ালেন। উদয় শিকারে গিয়েছিল উনি জানেন। কিন্তু সেখানে কোনও বিপদ হয়েছিল নাকি? এই বর্ষায় শিকারে যাওয়ার কোনও মানেই নেই! কিন্তু সব ব্যাপারে প্রতাপাদিত্য মতামত দেন না।

সান্ত্রীটি জোড় হাত করে বলল, "উনি আসছেন, নিজেই বলবেন।"

বলতে-বলতেই মোহনকে সঙ্গে নিয়ে উদয় ঢুকল রাজসভায়। প্রতাপ দেখলেন উদয়কে ক্লান্ত দেখালেও ও ঠিক আছে। মন শান্ত হল ওঁর।

উদয় আর মোহন সামনে দাঁড়িয়ে প্রথামতো করজোড়ে সব গুরুজনকে নমস্কার করল।

উদয় বলল, "মহারাজ, আমি ফিরে এসেছি। তবে আমি আর মোহন দু'জনেই খুব বিপদে পড়েছিলাম!"

সূর্যকান্ত এ বার জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তোমাদের? কেউ আক্রমণ করেছিল?"

উদয় মোহনের দিকে তাকাল। এমনিতে ফটফট করলেও মহারাজ বা সূর্যকাকার সামনে মোহন একদম ভিজে বেড়াল হয়ে থাকে। সাত চড়ে মুখে রা কাড়ে না।

উদয় সময় নিয়ে বিপদের কথা সবটা গুছিয়ে বলল এ বার।

"বাপ রে!" সূর্যকান্ত চমকে উঠলেন! বললেন, "এ তো খুব বাঁচান বেঁচে গেছ তোমরা।"

উদয় মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, সত্যিই তাই। ভাগ্যিস ও এসে আমাদের বাঁচাল! না হলে আর দেখতে হত না! মহারাজ, আমাদের

যে জীবন বাঁচিয়েছে, আমি কি সেই মানুষটিকে আপনার সামনে আনতে পারি?”

প্রতাপাদিত্য এত ক্ষণ কিছু না-বললেও সবটাই মন দিয়ে শুনেছেন। ওঁরও দেখার ইচ্ছে করছে কে এই ছেলে, যে এমন বুদ্ধি করে, সাহস দেখিয়ে উদয় আর মোহনকে বাঁচাল!

প্রতাপাদিত্য হাত দিয়ে উদয়কে ইঙ্গিত করলেন ছেলেটিকে সভায় আনার জন্য। উদয়ও সঙ্গে-সঙ্গে পিছনে দাঁড়ানো সান্ত্রীটিকে ইঙ্গিত করল।

সামান্য সময় পরে সান্ত্রীর সঙ্গে ছেলেটি এসে দাঁড়াল রাজসভার মাঝে। বেশ লম্বা, শক্ত-সমর্থ গড়ন ছেলেটির। কিন্তু মুখে এখনও বয়সের পরিপক্বতা আসেনি। গালে হালকা দাড়ি। চোয়াল শক্ত। তবে চোখ দু’টি বড়-বড় আর উজ্জ্বল!

“কী নাম তোমার?” শঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন।

ছেলেটি বলল, “উষ্ণীষ রায়!”

“এ-এ-এই তো! এই তো শয়তানটা!” আচমকা সভার এক পাশে সরে দাঁড়ানো লোকেন স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চিৎকার করে উঠল।

“চুপ, বেয়াদব!” সূর্য চিৎকার করে উঠলেন এ বার, “কে শয়তান? আর তোমায় কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে কি?”

লোকেন যেন কথাটা শুনেও শুনল না। বরং প্রতাপের সামনে এগিয়ে এসে বলল, “এই সেই ছেলে, যে আমার দাস দু’জনকে চুরি করে পালিয়েছে! এই সেই শয়তান! তবে আমাকে ও নিজের নাম বলাইচন্দ্র বলেছিল।”

“কী বলছ কী তুমি?” প্রতাপাদিত্য অবাক হয়ে তাকালেন লোকেনের দিকে। তার পর ছেলেটির দিকেও চাইলেন। দেখলেন ছেলেটা স্থির ভাবে তাকিয়ে রয়েছে লোকেনের দিকে।

লোকেন হাত জোড় করে বলল, “আমি একশো জন সাক্ষী আনতে পারি মহারাজ, যারা ওকে বলাই বলে শনাক্ত করবে। আমি হলফ করে বলছি, এই সেই চোর! আপনি মহারাজ, ন্যায়ের জন্য প্রসিদ্ধ! এখানে আপনার ছেলেকে এই চোরটা বাঁচিয়েছে হয়তো, কিন্তু তাই বলে ওর চুরি করাটা মিথ্যে হয়ে যায় না! আমি আপনার খাজনা মিটিয়ে দেব। কিন্তু আপনার সভায় কি আমি বিচার পাব না! রাজকুমারকে বাঁচিয়েছে বলে কি চোর রেহাই পেয়ে যাবে? যশোরের মানুষের হিতের সামনে কি তা হলে মহারাজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখটাই প্রধান!”

সূর্য রেগে গিয়ে বললেন, “তুমি চুপ করবে? না হলে এখনই পেয়াদা দিয়ে তোমায় বের করে দেব!”

লোকেনও ছাড়ার পাত্র নয়। ও বলল, “সে দিতেই পারেন। কিন্তু সঠিক বিচার যশোরের মানুষ পাবে না, এটাই কি ধরে নেব? আমাদের ব্যবসায়ী সঙ্ঘের সবাইকে বলে দেব? কী বলেন মহারাজ, আপনি কি একটা চোরকে ব্যক্তি-স্বার্থে ছেড়ে দেবেন?”

॥ ৬ ॥

মাঝ সমুদ্রে বন্দি

কাঠের ঘরটা বেশ ছোট। আসবাবহীন। তার মধ্যে মাটিতে সামান্য খড় বিছিয়ে ওদের শুইয়ে রাখা হয়েছে।

মিহির পাশে তাকাল, সত্রাজিৎ কেমন যেন ঝিমিয়ে আছে। এমনিতেই শরীর খারাপ ছেলেটার, তার উপর জলদস্যুরা ওদের ধরে আনার সময় মারধোর করেছে বেশ। তাতে যেন সত্রাজিৎ আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

মিহিরের সে ভাবে কিছু হয়নি। কিন্তু ও বুঝতে পারছে এই বোম্বেটেদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ হবে না। ওদের ধরার সময় সঙ্গের সৈন্যরা সে ভাবে প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি।

যা-ই হোক, কিন্তু মিহির এখন বুঝতে পারছে না কেন জাহাজ থেকে ওর বাকি সঙ্গীদের অন্য জাহাজে তুলে মাদ্রাজের দিকে দাস হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হলেও, শুধু ওদের দু’জনকে এ ভাবে ধরে আনা হল! ওদের কি তা হলে দাস হিসেবে বিক্রি করা হবে না! এই বোম্বেটের আসল উদ্দেশ্যটা কী!

মিহির কষ্ট করে উঠে বসল এ বার। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা আছে ওর। বেশ শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধেছে। তাও দু’-এক বার টানাটানি করল। নাহ, খোলা সম্ভব নয়। মিহিরের জল তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু আশপাশে জলের পাত্র রাখা নেই!

মিহির ভাবল, এই যে বেঁচে আছে এটাই অনেক। মিহির সত্রাজিতের দিকে তাকাল আবার। ছেলেটা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। কী হল সত্রাজিতের? শরীর কি খুব খারাপ লাগছে ওর? ও ভাবল এক বার ডাকে। কিন্তু তার আগেই ছোট্ট ঘরের দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল। মিহির দেখল দু’জন লোক এসে দাঁড়াল ছোট দরজাটার সামনে। দু’জনেই মাঝারি উচ্চতার। রোদে পোড়া মুখ। এক জনের গাল ভর্তি দাড়ি আর অন্য জনের শুধু থুতনিতে সুচালো দাড়ি। যে লোকটার গালে দাড়ি ভর্তি তার আবার ডান পা-টা হাঁটুর নীচ থেকে নেই। সেখানে একটা কাঠের পায়ার মতো লাগানো! এরা পর্তুগিজ, মিহির দেখেই বুঝল। আসলে বাংলাদেশে মোগলদের সঙ্গে-সঙ্গে উজবেক, পাঠান, আরব, পর্তুগিজ, ব্রিটিশ, ইতালীয়, দিনেমার, চৈনিক, মালয় থেকে শুরু করে মগ, সিংহলি সহ নানান জায়গার মানুষ দেখা যায়। মিহির মানুষ দেখলেই তাই চিনতে পারে। কাঠের পা-ওয়ালা লোকটার পোশাক দেখে একেই সর্দার বলে মনে হল মিহিরের।

লোকটা ভুরু কুঁচকে মিহিরকে দেখল। তার পর কড়া গলায় বলল, “তোদের জ্ঞান আছে এখনও? ঠিকমতো মারধোর করা হয়নি দেখছি!”

মিহির চোয়াল শক্ত করে লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলছে। স্বাভাবিক। এই বোম্বেটেগুলো বহু বছর হল এই বাংলাদেশে আছে। তাই এদের মধ্যে কেউ-কেউ কিছুটা বাংলা বলতে পারে।

কাঠের পা-ওয়ালা লোকটা বলল, “আমায় চিনিস? আমার নাম দাভি ডি’ক্রুজ! এই জাহাজের ক্যাপ্টেন! তোরা তো রাজা প্রতাপাদিত্যের লোক, না?”

মিহির এ বার মাথা নাড়ল। তার পর বলল, “উনি আমার মামামশায় হন। আপনারা যে কী ভুল করেছেন, এ বার বুঝতে পারবেন!”

দাভি হাসল। মিহির দেখল লোকটার সামনের দিকের উপর আর নীচের চারটে দাঁত সোনার! দাভি বলল, “সে আমাদের ভাবনা আমরা ভাবব। তোদের কী হবে সেটা ভাব!”

মিহির জানে এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। এই দাভি লোকটার নাম শুনেছে ও। কুখ্যাত জলদস্যু। দয়া-মায়া বলে কিছু নেই! ও বলল, “আমার বন্ধু অসুস্থ। আর আমাদের জল লাগবে!”

“জল লাগবে! বাদশা আকবর এসেছে!” দাভির পাশের লোকটা ভেংচে বলল।

দাভি লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “অলফন্সো, ওদের খাবার আর জল দাও! আমাদের কাজ না-হওয়া অবধি তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওদের,” তার পর মিহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, “বেশি চালাকি করবি না। চুপচাপ থাকবি। বুঝেছিস?”

আর কথা না-বলে ওরা বেরিয়ে গেল ঘরের থেকে। মিহির পাশে তাকাল। দেখল সত্রাজিৎ তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। চোখের ঘোলাটে ভাবটা আর নেই! মিহির ভাবল যাক, সত্রাজিৎ তা হলে আগের চেয়ে ভাল আছে।

ঘরের বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল দাভি। আজ বৃষ্টি নেই। তবে পাতলা আঁশের মতো মেঘ ভাসছে।

অলফন্সো বলল, “ওদের কি এখানেই রাখবেন, নাকি বাঘুর চরে নিয়ে তুলবেন?”

দাভি এগিয়ে গিয়ে জাহাজের কিনারায় দাঁড়াল। তার পর মাথা নাড়ল, “এখনই ওদের ডাঙায় তোলা ঠিক হবে না। প্রতাপের

সৈন্যবাহিনী খুব শক্তিশালী। ওদের গুপ্ত সৈন্য বিভাগও খুব মজবুত। সুখা নামে একটা লোক তার প্রধান! লোকটার চর চার দিকে ছড়ানো রয়েছে। তাই আপাতত আমরা ওদের এই জাহাজেই রাখব। আমাদের বাকি তিনটে জাহাজ আর ছ'টা নৌকা সজাগ ভাবে পাহারা দেবে। একটু দূরে একটা জনমানবহীন জঙ্গুলে দ্বীপ আছে। তবে সেটা নিয়ে চিন্তা নেই। এই চার দিকে জল থাকাটাই আমাদের সুরক্ষার জন্য সুবিধের।"

অলফন্সো জিজ্ঞেস করল, "তা হলে এ বার কী করতে হবে?"

"এ বার?" দাভি হাসল শব্দ করে। তার পর বলল, "পায়রা ওড়াও তা হলে।"

॥ ৭ ॥

পাখি যা খবর আনল

লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মুখ তুলে তাকালেন। যে ভৃত্য ছেলেটি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে, সে রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। ছেলেটির হাতে একটা তামার ছোট্ট গেঁজে। দেখেই লক্ষ্মীকান্ত চিনতে পারলেন। লম্বাটে এমন তামার ছোট ছোট কৌটোর মতো জিনিসটা ব্যবহার করা হয় পায়রার পায়ে বেঁধে চিঠি আদান প্রদান করার জন্য। ছেলেটির হাতে তার মানে কারও পাঠানো একটা চিঠি আছে। কিন্তু তাতে এমন হাঁপানোর কী হয়েছে!

লক্ষ্মীকান্ত তামার গেঁজেটা নিয়ে বললেন, "এমন হাঁপাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে?"

ছেলেটি বলল, "বাবু, এই চিঠি... মানে, এমন এক জন পাঠিয়েছে..."

"কে পাঠিয়েছে? আর গেঁজেটার তো মুখ বন্ধ। না-খুলেই বুঝলি কী করে, কে পাঠিয়েছে?"

ছেলেটি বলল, "লাল কাপড়ে মোড়ানো ছিল এটা। আর তাতে এমন একটা চিহ্ন ছিল যে..."

"কই দেখি!" লক্ষ্মীকান্ত হাত বাড়ালেন।

কোমরে বাঁধা গামছার ভিতর থেকে কাপড়টা বের করে দিল ছেলেটি! লক্ষ্মীকান্ত কাপড়টা দেখেই আর বসলেন না। তামার গেঁজেটা হাতে নিয়ে ফরাশ নেমে কাঠের খড়মটা পায়ে গলালেন। এক্ষুনি রাজসভায় যেতে হবে।

আজ আমজনতার জন্য দরবার খোলা নয়। তাই মহারাজ প্রতাপাদিত্য ছোট দরবারের কাছের কয়েক জনের সঙ্গে বসে আছেন। সকলের সেখানে ঢোকার অনুমতি নেই। কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 'সবাই' নয়। সর্দার শঙ্করের পরে সে-ই রাজস্ব বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। কাছারি-বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে ছোট রাজসভার দিকে এগোলেন লক্ষ্মীকান্ত। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই থমকে গেলেন। আরে বড় আম গাছটার নীচে কে বসে রয়েছেন? মহাময় না? এখানে মহাময় কী করছেন?

মহাময় লক্ষ্মীকান্তর ছোটবেলাকার বন্ধু। এক সঙ্গে লেখাপড়া করেছেন দু'জনে। পরে মহাময় বাকলায় চলে গিয়েছিলেন। বহু বছর যোগাযোগ নেই! সেই মহাময় আজ এখানে এসেছেন কেন?

লক্ষ্মীকান্ত এগিয়ে গেলেন গাছটার দিকে।

মহাময় শান্ত ভাবে বসেছিলেন, লক্ষ্মীকান্তকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "আরে মহাময়, কী ব্যাপার? তুমি এখানে! এত বছর পরে!"

মহাময় গায়ের পাতলা চাদরটা ঠিক করে বললেন, "তুমি আগে রাজামশায়ের কাছে হয়ে এসো। খুব জরুরি কাজে যাচ্ছ, বুঝতে পারছি। আমার তাড়া নেই। বিশেষ দরকারে আমি এসেছি। সময় নিয়ে বলতে হবে। আমি এই গাছের তলায় অপেক্ষা করছি।"

লক্ষ্মীকান্ত অবাক হলেন, "তুমি জানলে কী করে যে আমি মহারাজের কাছে যাচ্ছি?"

"তুমি এ ভাবে চাদর ছাড়া তো বেরোও না। সেই ছোটবেলা থেকেই দেখেছি। তা ছাড়া পৈতে গলায় জড়িয়ে রেখেছ! এ ভাবেও কারও সামনে যাও না! তাই বলছি আগে কাজ সেরে এসো। মহারাজকে বলে এসো জলদস্যুদের বার্তা।"

লক্ষ্মীকান্ত হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলেন মহাময়ের দিকে। খুব দরিদ্র ঘরের ছেলে ছিলেন মহাময়। কিন্তু ছোট থেকেই খুব বুদ্ধিমান। এমন শান্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ খুব কম দেখেছেন লক্ষ্মীকান্ত।

মহাময় বললেন, "তোমার হাতে জলদস্যুদের নিশান দেওয়া কাপড়! বাঁ হাতে পায়রার চিঠি পাঠানোর তামার গেঁজে! একটু খেয়াল করলে বোঝাই যায় যে তুমি খুব ব্যস্ত! তাই বলছি তুমি কাজ সেরে নাও, আমি এখানে বসে অপেক্ষা করছি!"

এত উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যেও লক্ষ্মীকান্ত হাসলেন। তার পর বললেন, "ঠিক আছে তুমি অপেক্ষা করো। কিন্তু এখানে নয়, কাছারি বাড়িতে, আমার ঘরে। আমি রক্ষীকে বলে দিচ্ছি! আর কাজ সেরে আমি দ্রুত ফিরে আসছি।"

মহাময় বললেন, "এই গাছের তলাই ভাল। আমার এখানেই ভাল লাগছে!"

লক্ষ্মীকান্ত জানেন মহাময় এক বার যখন বলেছেন, তখন আর কিছু বলা বৃথা। উনি মাথা নেড়ে মহারাজের ছোট সভার দিকে এগিয়ে গেলেন।

এই সভাঘরটা খুব সাধারণ ভাবে সাজানো। কয়েকটা ছোট-বড় আসন রাখা আছে অর্ধবৃত্তাকারে। সেখানে শঙ্কর, সূর্যকান্ত, চিন্তামণি, রডা, সুখা সহ আরও কয়েক জন বসে রয়েছেন। আর সকলের মাঝের সিংহাসনে বসে রয়েছেন প্রতাপাদিত্য।

প্রতাপাদিত্যর সামনে গিয়ে লক্ষ্মীকান্ত কোনও রকম ভণিতা না-করে বললেন, "মহারাজ, পায়রার মাধ্যমে এই চিঠি এসেছে। জলদস্যুদের চিঠি!"

"জলদস্যু!" প্রতাপাদিত্য অবাক হয়ে গেলেন, "হঠাৎ জলদস্যু কেন?"

প্রতাপাদিত্য শঙ্করের দিকে ইঙ্গিত করলেন। শঙ্কর লক্ষ্মীকান্তের হাত থেকে গেঁজেটা নিয়ে, গালা দিয়ে বন্ধ মুখটা খুলে পড়ে নিজের মনেই বললেন, "এ যে ফারসি ভাষায় লেখা!"

"কী লিখেছে?" প্রতাপাদিত্য অধৈর্য হলেন এ বার।

শঙ্কর চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "মহারাজ, দাভি ডিক্রুজ় নামের এক ভয়ঙ্কর জলদস্যু মিহির আর সত্রাজিৎকে মাঝ সমুদ্র থেকে অপহরণ করেছে। ওদের সঙ্গীদের ইতিমধ্যেই দাস হিসেবে চালান করে দেওয়া হয়েছে দূরে। আর মিহির ও সত্রাজিৎকে নিজের জাহাজে বন্দি করে রেখেছে শয়তানটা!"

"কী!" প্রতাপাদিত্যও উঠে দাঁড়ালেন এ বার। আকস্মিক সংবাদে অবাক ভাবটা কাটতে সময় লাগল একটু। তার পরেই তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল রাগে। সামনের বড় থামে ঘুষি মেরে বললেন, "এক্ষুনি মীরবহরকে বলো, ওদের আক্রমণ করতে! এত সাহস, আমার লোকেদের গায়ে হাত দেয়!"

মহারাজের সঙ্গে বাকিরাও উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে থেকে নৌ-সেনা প্রধান রডা বললেন, "ঠিক আছে মহারাজ। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।"

"দাঁড়ান মহারাজ দাঁড়ান, উত্তেজিত হয়ে ভুল কিছু করবেন না। মনে রাখবেন সত্রাজিৎও বন্দি ওদের হাতে। মুকুন্দরাম জানতে পারলে খুব সমস্যা হবে," চিন্তামণি পাশ থেকে বললেন। তার পর শঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেন, "চিঠিতে এটুকুই লেখা আছে?"

শঙ্কর সবার দিকে তাকালেন। তার পর বললেন, "এটা আসলে মুক্তিপণের চিঠি। লেখা আছে মাতলা দুর্গ থেকে আমাদের সৈন্য সরিয়ে

নিতে হবে। বিদ্যাধরী, আড়পাঙাসিয়া, রায়মঙ্গল, মালঞ্চসহ সব ছোট-বড় নদী থেকে আমাদের টহলদার নৌকা বা জাহাজ তুলে নিতে হবে সামনের দশ দিনের মধ্যে। আর এটা লিখিত ভাবে, সিলমোহর সমেত, ফরমান হিসেবে দিতে হবে যে, দাভি ডি'ক্রুজ়কে কেউ কোনও ভাবে আটকানোর চেষ্টা করবে না। তাকে তার ইচ্ছেমতো কাজ করতে দিতে হবে। সে দক্ষিণের গ্রামগুলো থেকে ইচ্ছেমতো খাজনা ও তার প্রয়োজনীয় জিনিস নিতে পারবে।"

"মানে?" প্রতাপাদিত্যর ফরসা মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। উনি বললেন, "ইচ্ছেমতো কাজ করতে দিতে হবে? খাজনা তুলবে? প্রয়োজনীয় জিনিস নেবে? মানে তো মানুষ ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করবে! এটা আবদার নাকি? কী ভেবেছে, আমার রাজত্বে এ সব বরদাস্ত করব আমি? আমি এ সব না-মানলে কী করবে শুনি?"

শঙ্কর শান্ত ভাবে কেটে-কেটে বললেন, "না হলে দাভি লিখেছে, মিহির আর সত্রাজিৎকে হয় বিক্রি করে দেবে দাস হিসেবে। নয়তো ওদের দুটো মাথা কেটে আপনাকে নজরানা পাঠাবে।"

॥ ৮ ॥

কারাগারের ভিতর

নদীর ধারের এই বাড়িটা বেশ বড়। দোতলা। বাড়িটায় মাটির নীচে আরও একটা তলা রয়েছে। এক তলা ও দোতলায় নানান কাজের জন্য দফতর রয়েছে। আর মাটির নীচের ওই তলাটায় রয়েছে কারাগার।

উষ্ণীষকে রাখা হয়েছে ওই কারাগারেরই একটা ছোট্ট ঘরে। ঘরের দেওয়ালটা স্যাঁতসেঁতে। মেঝেটা এবড়োখেবড়ো। ঘরের কোণের দিকে একটা ছোট জলের কুঁজো ছাড়া আর কিছু নেই। ওই মেঝেয় শুয়েই রাত কেটেছে ওর!

আর সারা রাত শুয়ে-শুয়ে ভেবেছে কেন যে মরতে ও সাহায্য করতে গেল উদয়াদিত্যকে! বেশ তো লুকিয়ে ছিল! কষ্ট হচ্ছিল জঙ্গলে, কিন্তু সেখানে এমন কয়েদি তো ছিল না। ও ভেবেছিল সব ঠান্ডা হওয়ার পরে মাদ্রাজের দিকে চলে যাবে। সেখানে কিছু কাজকম্মো খুঁজে নেবে। এই ভাটি অঞ্চলে আর থাকবে না। কিন্তু কপালের ফের এমন যে, আটকে গেল! যুবরাজকে বাঁচানোর পুরস্কার যে কারাগারে বন্দি হয়ে থাকা— সেটা ভেবেই অবাক লাগছে ওর! আর লোকেন সাহাকেও এখনই আসতে হল এখানে!

কাল রাতে এখানে ভাত আর একটা তরকারি দেওয়া হয়েছিল। সে সব কখন হজম হয়ে গেছে! বেলা কত বাড়ল কে জানে! দূরে কোথাও একটা মশাল রাখা আছে, তার ক্ষীণ আলো চুঁইয়ে আসছে শুধু। তাতেই যেটুকু দেখা যাচ্ছে! উষ্ণীষ মাথার নীচে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ল আবার! ভাবল মহাময় কী ভাবছেন, উষ্ণীষ কোথায় গেল!

আচমকা আলোটা যেন বাড়ল কারাগারের সামনের গলিপথে। আর তার সঙ্গে পায়ের শব্দও শোনা গেল। উষ্ণীষ ভাল করে শুনল। কে আসছে এ দিকে? উঠে বসল ও।

কারাগারের লোহার দরজার সামনে মশাল নিয়ে এসে দাঁড়াল দু'জন রক্ষী। এ বার দেখা গেল ওদের সঙ্গের মানুষটিকে। উষ্ণীষ চিনতে পারল। রাজসভায় দেখেছিল এঁকে। সর্দার শঙ্কর চক্রবর্তী!

রক্ষীরা দরজা খুলে দেওয়ার পরে শঙ্কর এসে ঢুকলেন ছোট্ট কারাগারে। চার দিকটা দেখলেন ভাল করে। তার পর উষ্ণীষের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সত্যি দু'জন দাসকে চুরি করে পালিয়েছ? আমায় সত্যি বলো।"

উষ্ণীষ সময় নিল একটু। তার পর বলল, "হ্যাঁ।"

শঙ্কর হাসলেন। বললেন, "দাস তো সম্পত্তি। তা চুরি করা ঘোরতর অপরাধ। তোমার দুটো হাত কেটে ফেলা হতে পারে। বা মহারাজের ইচ্ছে হলে মাথাটাও কেটে ফেলা হতে পারে! সমাজ বাঁচিয়ে রাখতে গেলে কঠোর শাসনের দরকার হয়, জানো তো?"

উষ্ণীষ কী বলবে বুঝতে পারল না। সবটাই এখন ওর হাতের

বাইরে।

শঙ্কর বললেন, "উদয় আর মোহনকে বাঁচিয়েছ তুমি! সেটাই এক মাত্র তোমার পক্ষে আছে! আচ্ছা, মহাময় মুখোপাধ্যায়কে চেনো তুমি?"

নামটা শুনেই চমকে উঠল উষ্ণীষ। মহাময়ের কথা এঁরা জানলেন কী করে!

শঙ্কর বললেন, "উনি এসেছেন এখানে তোমার হয়ে কথা বলতে! লক্ষ্মীকান্ত ওঁকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। মহাময় বলছেন যে বাচ্চাদের উদ্ধার করতে উনিই নাকি তোমায় পাঠিয়েছিলেন! এমনকি মহাময় নিজেই ওই দু'টি বাচ্চার দাম লোকেন সাহাকে দিতে চান! কিন্তু লোকেন মানছে না। তার নাকি সম্মানের ব্যাপার।"

উষ্ণীষ বলল, "আমি অনাথ। আচার্য মশাই, মানে গুরুদেব না-থাকলে আমি বেঁচে থাকতাম না।"

শঙ্কর তাকালেন ওর দিকে। তার পর বললেন, "ক'টা দিন এখানে থাকো। এখন মহারাজের খুব বিপদ চলছে। সেটা মেটা না পর্যন্ত..."

উষ্ণীষ হাত জোড় করে বলল, "আমার খিদে পেয়েছে খুব। কাল রাতে সামান্য ভাত দেওয়া হয়েছিল। তার পর আর কিছু দেওয়া হয়নি।"

"খাবার পাঠানো হবে তোমায়," শঙ্কর তাকালেন ওর দিকে। তার পর বললেন, "তুমি খুব সাহসী। কাজ দিলে সেটা নিষ্ঠা ভরে করো। তুমি কি জানতে চাও কী বিপদ চলছে মহারাজের?"

উষ্ণীষ বলল, "আমি সামান্য মানুষ হুজুর। রাজারাজড়াদের ব্যাপার জেনে কী করব!"

শঙ্কর বললেন, "তোমার যে দুটো ঘটনা এটুকু সময়ের মধ্যে জেনেছি, তাতে দেখলাম তুমি দু'বারই নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের বাঁচিয়েছ! আমার মনে হয় তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।"

উষ্ণীষ চুপ করে তাকিয়ে রইল শঙ্করের দিকে।

শঙ্কর বললেন, "মহাময় তোমার খুবই প্রশংসা করেছেন। আমি আবারও জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানতে চাও মহারাজের কী বিপদ হয়েছে?"

উষ্ণীষ বলল, "আমি কী বলি হুজুর!"

"আমার তোমাকে সৎ বলে মনে হয়েছে। তাই আমি নিজে থেকে এসেছি তোমার কাছে। তুমি কি আমাদের সাহায্য করবে?"

উষ্ণীষ বললেন, "দু'বার সাহায্য করে আমি আজ কারাগারে হুজুর! আর কাউকে আমি সাহায্য করতে চাই না।"

শঙ্কর তাকালেন ওর দিকে। তার পর বললেন, "তোমার জীবন, তোমার ইচ্ছে। তাও আমি কী বলছি সেটা শোনো অন্তত। তার পর ভাবো। নিজের শাস্তি কমানোর এটাই তোমার সুযোগ।"

উষ্ণীষ কিছু না-বলে তাকাল শঙ্করের দিকে। শঙ্কর সময় নিলেন একটু, তার পর বলতে শুরু করলেন।

॥ ৯ ॥

জলদস্যুদের দিকে

রডা লোকটি পর্তুগিজ়। লম্বা-চওড়া চেহারা। কম কথা বলেন। এত দিন এই দেশে থাকতে-থাকতে ভাঙা-ভাঙা বাংলাও বলতে শিখেছেন। লক্ষ্মীকান্ত দেখলেন, রডা এক মনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মুখ গম্ভীর। চোয়াল শক্ত।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য লক্ষ্মীকান্ত আর রডাকে পাঠিয়েছেন জলদস্যুদের প্রধান দাভি ডি'ক্রুজ়ের সঙ্গে কথা বলতে। কারণ কথা না-বলে তো উপায় নেই! দাভি বলেছে যে কেবল দু'জন আসতে পারে, তাও নিরস্ত্র অবস্থায়। তাই মহারাজ রডা আর লক্ষ্মীকান্তকে পাঠিয়েছেন।

সামনে বিস্তৃত সমুদ্র। জলদস্যুদের একটা ছোট নৌকা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদের নৌকাকে। লক্ষ্মীকান্তর বুকটা ঢিপঢিপ করছে। এমন খুনে মানুষজন উনি পছন্দ করেন না। কিন্তু এখন উপায় নেই। মিহির আর সত্রাজিতের জীবন বলে কথা! একটা ভুল কিছু হলেই দু'জনকে খতম করে দিতে হাত কাঁপবে না দাভির!

দাভি লোকটা ভারী বদমাশ। আগে গোয়ায় থাকত। সেখানে নানান অপকর্ম করে কয়েক বছর আগে এখানে পালিয়ে চলে এসেছে। আর এখানে আসার পরেই লুঠপাট করে সবাইকে তটস্থ করে রেখেছিল। একটা পা নেই লোকটার। কিন্তু দুর্দান্ত তরোয়াল চালায়! আর প্রচণ্ড নিষ্ঠুর।

লক্ষ্মীকান্তর উপর অনেকটা নির্ভর করেন প্রতাপাদিত্যসহ সবাই, তাই তাঁকে পাঠানো হয়েছে। আর রডা যেহেতু যশোরের নৌবাহিনীর প্রধান ও নিজে পর্তুগিজ়, তাই ভাল ভাবে যাতে কথাবার্তা হতে পারে— সেই কারণে তাঁকেও পাঠানো হয়েছে।

লক্ষ্মীকান্ত রডাকে বললেন, "আপনি কিন্তু মাথা গরম করবেন না। ওরা আমাদের উত্তেজিত করতে চাইবে।"

রডা কোনও উত্তর না-দিয়ে মাথা নাড়ালেন শুধু। লোকটা খুব সাহসী। বিশ্বস্তও। কিন্তু মাথাটা খুব গরম। প্রতাপাদিত্যের রাজসভায় নানান জাতির লোকজন রয়েছে। বাদশা আকবরের শাসন থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করছেন প্রতাপাদিত্য। তাই তাঁকে সবাইকে নিয়েই চলতে হয়। একতার মধ্যেই যে শক্তি, সেটা মহারাজ জানেন!

এ দিকে ওদের কাছে খবর আছে যে, আকবর বাদশা নিজের সেনাপতি মানসিংহকে আবার এখানে পাঠাচ্ছেন, প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকার করার জন্য! সেই মতো প্রস্তুতিও নিচ্ছে ওরা। এর মধ্যে এই অপহরণের ব্যাপারটা যে কী, বিপত্তি নিয়ে এসেছে!

ভূষণার জমিদার মুকুন্দরামের প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ আজকেই এসে উপস্থিত হয়েছেন যশোরে। যে কোনও মূল্যে সত্রাজিৎকে ছাড়ানোর জন্য মহারাজের উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন জলদস্যুদের কথা মেনে নিতে। বলছেন সত্রাজিতের কিছু হয়ে গেলে ওঁরা কিন্তু যশোর রাজ্যকে ছেড়ে কথা বলবেন না।

কিন্তু জলদস্যুদের কথা মেনে নেওয়া মানে ওদের ইচ্ছেমতো লুঠপাট করতে দেওয়া। দেশের মানুষকে ভয়াবহ দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দেওয়া! এমনিতেই অনেকে এই সব অঞ্চল ছেড়ে আগেই অন্য জায়গায় চলে গেছে, এর পর যদি জলদস্যুদের অত্যাচারে অন্যদেরও চলে যেতে হয় তা হলে প্রতাপাদিত্যের খুব বদনাম হয়ে যাবে। রাজস্ব কমে যাবে। রাজত্ব টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হবে! তাই সবাই মিলে মুকুন্দরামের মন্ত্রী গোপীনাথকে বোঝাচ্ছেন। বলা হচ্ছে যে একটা উপায় ঠিক হবে।

তাই এই উপায় করতেই লক্ষ্মীকান্ত আর রডাকে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু এই দৌত্য সফল না হলে কী যে হবে, কে জানে!

আচমকা দুম করে ভীষণ জোরে একটা শব্দ হল। কামান দাগছে কে? লক্ষ্মীকান্ত চমকে উঠলেন! দেখলেন রডাও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছেন দূরের দিকে।

ওই যে একটা জাহাজ! মাথায় তার নিশান উড়ছে! এ যে দাভি ডি'ক্রুজ়ের জাহাজ! তা হলে ওরা চলে এল!

লক্ষ্মীকান্ত নিজেকে মনে-মনে তৈরি করে নিলেন। দাভি কি মানবে ওদের কথা? ছাড়তে রাজি হবে মিহিরদের? নাকি ভয়াবহ কিছু অপেক্ষা করে আছে ওদের জন্য! যশোরের মানুষদের জন্য!

লক্ষ্মীকান্ত চোয়াল শক্ত করে তাকালেন সামনের দিকে। দূরের জাহাজটা কাছে আসছে ক্রমশ। লাল পতাকাটা স্পষ্ট হচ্ছে। বালি-ঘড়ি আর রক্ত-মাখা তরোয়ালের চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে!

॥ ১০ ॥

জাহাজের মধ্যে বদ্ধ ঘরে

দরজায় শব্দ হওয়ায় মিহির মুখ তুলে তাকাল। বুকের মধ্যেটা ধকধক করছে ওর। ও শুনেছে যে মহারাজের কাছে জলদস্যুরা কিছু শর্ত দিয়েছে আর বলেছে যে সেগুলো মানলে মিহিরদের ছেড়ে দেওয়া

হবে। কিন্তু কী-কী শর্ত দেওয়া হয়েছে, সেটা ও জানে না এখনও!

মিহির শুনেছে যে, লক্ষ্মীকান্ত ও রডা আসবেন এদের সঙ্গে কথা বলতে। এই জাহাজ থেকে বেশ কিছু ক্ষণ আগে তোপও দাগা হয়েছে। কেউ যদি জলদস্যুদের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসে তা হলে এমন তোপ দাগা হয়। আচ্ছা, তা হলে কি তখন লক্ষ্মীকান্তরা আসছিলেন?

কিন্তু সেও তো অনেকটা সময় হয়ে গেল। এখনও কিছু জানা হল না! মিহির সত্রাজিতের দিকে তাকাল। এখন ওর শরীর কিছুটা ভাল হয়েছে। কিন্তু এত ভয় পেয়ে আছে যে, একদম কুঁকড়ে বসে রয়েছে। কোনও কথাই বলছে না।

ঠিক এই সময়ে দরজায় শব্দটা হল। মিহির তাকাল মুখ তুলে। দেখল অলফন্সো এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। চোখ-মুখ শক্ত। দেখেই বোঝা যাচ্ছে রেগে আছে!

মিহিরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না। অলফন্সো নিজে থেকেই বলল, "তোদের জীবনের কোনও দাম নেই ওই প্রতাপের কাছে! নিজের দুটো লোককে পাঠিয়েছিল আজ। বলে কিনা আমাদের পঞ্চাশ হাজার মোহর দেবে, আমরা যেন তোদের ছেড়ে দিই! আরে তোরা এত সস্তা নাকি! আমরা পাতি চোর নাকি যে এ সব নেব। আমাদের চাই পাহারাহীন মুক্ত সমুদ্র, নদী আর খাঁড়ি। খাজনা তোলার অধিকার! আমাদের চাই লুঠ করার জন্য ফাঁকা জলপথ! সেখানে মাত্র ওই ক'টা মোহর!"

মিহির এ বার বুঝতে পারল ওদের কেন এ ভাবে ধরে রাখা হয়েছে।

মিহির জানে মহারাজ নরম ধাতের মানুষ নন যে, কারও জোরের সামনে মাথা নোয়াবেন। আকবর বাদশাকেই মহারাজ প্রতাপাদিত্য ভয় পান না তো কোথাকার এক দাবি! তা ছাড়া একটা জলদস্যুকে কী করে মহারাজ এমন ঘোরতর অন্যায় করতে দিতে পারেন!

কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যাটাও মিহির বোঝে। হাওয়ায় খবর ভাসছে যে মানসিংহ আসছেন যশোর জয় করার জন্য। তখন যদি ভূষণার সাহায্য না-পান প্রতাপাদিত্য, তা হলে সমস্যা হতে পারে। সত্রাজিতের কিছু হলে এটা নিশ্চিত যে ওর বাবা মুকুন্দরাম প্রতাপাদিত্যের শত্রু হয়ে যাবেন! যা মানসিংহের অবস্থানকেই জোরদার করবে।

অলফন্সো এবার পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল মিহিরের দিকে। হাতে একটা চকচকে ছুরি। তার পর বলল, "তোদের রডা না কে! সে এসে ক্যাপিতেওর গলা চেপে ধরতে গিয়েছিল! এত সাহস! পর্তুগিজ় হয়ে নিজের দেশের লোকের সঙ্গে গদ্দারি! মহারাজ কি ভেবেছেন যে আমরা মশকরা করছি? আমরা যে মশকরা করছি না সেটা বোঝাতে হবে তোদের ওই মহারাজকে। তাই এই দেখ কী করি আমি!"

কথাটা বলেই আচমকা মিহিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অলফন্সো। তার পর মিহিরের বাঁ-দিকের কানের লতিটা কর্ণকুণ্ডল, মানে কানের দুল সহ কেটে নিল এক কোপে!

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে কান চেপে ধরে মিহির পড়ে গেল কাঠের মেঝেয়। বুঝল গরম রক্ত আস্তে-আস্তে ওর হাত উপচে আংরাখার কাঁধ ভিজিয়ে দিচ্ছে।

॥ ১১ ॥

সেদিন সন্ধেয়, মন্ত্রণাকক্ষে

প্রতাপাদিত্য চোয়াল শক্ত করে তাকালেন রডার দিকে।

লক্ষ্মীকান্ত রডার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। মহারাজের মুখ দেখে উনি মনে-মনে ভয়ই পেলেন। কারণ শান্ত প্রতাপাদিত্য এক রকম। কিন্তু রেগে গেলে এই মানুষটার মধ্যেই যেন অসুর ভর করে। তখন উনি কী যে করবেন সেটা কেউ জানে না।

লক্ষ্মীকান্ত আরও ভয় পেলেন এই ভেবে যে, ওঁদের যে-কাজে পাঠানো হয়েছিল সেটায় ওঁরা সফল হননি। এর ফলে মহারাজ যদি ওঁদের কঠোর শাস্তি দেন!

শঙ্কর প্রতাপাদিত্যের মেজাজের সঙ্গে খুব ভাল করেই পরিচিত। উনি নিজে এ বার এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন রডার সামনে। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "কিছুতেই ওরা মানল না?"

রডা মাথা নাড়লেন, "ওরা অর্থ নিতেই চায় না। মানে এক বারও এই নিয়ে কথা বলেনি। আমরা যত বার এই প্রসঙ্গ তুলেছি তত বার ওরা বলেছে, এই নিয়ে কোনও কথা বলবে না। ওদের যা দাবি, সেটাতেই ওরা অনড়!"

শঙ্কর প্রতাপাদিত্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি মাথা ঠান্ডা করুন। এখন একটা ভুল পদক্ষেপ সব কিছু গোলমাল করে দেবে। এক দিকে জলদস্যুদের থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে হবে। অন্য দিকে মানসিংহের আক্রমণের আগে আমাদের দেখতে হবে যেন ভূষণার রাজা আমাদের বিরুদ্ধে না চলে যান!"

প্রতাপাদিত্য দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "আমার ইচ্ছে করছে নিজের হাতে ওদের সব কিছু গুঁড়িয়ে, ভেঙে তছনছ করে দিতে।"

শঙ্কর বললেন, "শাস্তি দেওয়া দরকার ওদের। আমি জানি। কিন্তু মিহিরদের উদ্ধার করে আনার পরে। তার আগে কিছু করা যাবে না।"

চিন্তামণি বললেন, "আমার মনে হয় আমরা যদি ওদের একটা মাসোহারা ঠিক করে দিই তা হলে ওরা এ সব করবে না। মাসে-মাসে টাকা পেয়ে গেলে ওরা খুশি থাকবে!"

"খুশি থাকবে মানে?" সূর্যকান্ত বিরক্ত হলেন, "আমরা কি কিছু বোম্বেটেদের খুশি করার জন্য আছি নাকি? আর প্রজাদের খাজনা ওদের দিয়ে দেব? এটা দেখে এবার বাকি বোম্বেটেরাও এমন শুরু করবে।"

চিন্তামণি আরও কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই এক জন সান্ত্রী এসে প্রতাপাদিত্যকে অভিবাদন করে সামনে দাঁড়াল। লোকটির হাতে একটা চৌকো বাক্স!

"কী এটা?" শঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন।

"এক জন দিয়ে গেল। বলল আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে।"

শঙ্কর হাতের ইঙ্গিত করলেন। সান্ত্রীটি এসে বাক্সটা নিয়ে সামনের নিচু মেজ-এর (টেবিল) উপর রাখল। তার পর উপরের ঢাকনাটা খুলে দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে বসে থাকা সকলের মুখ দিয়ে অস্ফুটে শব্দ বেরোল একটা। লক্ষ্মীকান্ত ভীত চোখে দেখলেন, ছোট্ট বাক্সটার মধ্যে, চৌকো সাদা কাপড়ের উপর রাখা আছে কেটে নেওয়া একটা কানের লতি। আর তাতে ঝুলছে একটা দুল! মুক্তোর দুলটা দেখে কারও চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না এটা কার!

প্রতাপাদিত্য নিজের সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। রাগে মুখ লাল হয়ে আছে মহারাজের। থরথর করে কাঁপছেন তিনি! মাথার শিরা ফুলে উঠেছে তাঁর। তিনি বাক্সটা হাতে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "কে দিয়ে গেছে এটা? তাকে ধরো। নিয়ে এসো এখানে। আমি নিজে তার চামড়া ছাড়িয়ে নেব!"

শঙ্কর এসে প্রতাপাদিত্যকে ধরলেন। উনি মন্ত্রী হলেও প্রতাপাদিত্যের বন্ধুও বটে। শঙ্কর বাক্সটা নিয়ে মেজ-এ রেখে সান্ত্রীদের ইশারা করলেন ওটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে। তার পর প্রতাপাদিত্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রতাপ, প্রতাপ! মাথা ঠান্ডা রাখতেই হবে। এ ভাবে রাগ করে কিছু হবে না।"

"রণতরী সাজাও। আমি নিজে যাব ওই জানোয়ারগুলোকে নিকেশ করতে। এত সাহস, মিহিরের কান কেটে পাঠিয়েছে! এত সাহস!"

শঙ্কর বললেন, "আপনি একটু শান্ত হন, মহারাজ। আমি বলছিলাম কী, আমরা যদি ওই ছেলেটিকে কাজে লাগাই... মানে উষ্ণীষকে! আমি প্রাথমিক ভাবে ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ও যদিও এখনও হ্যাঁ-না কিছু বলেনি। কিন্তু আপনি যদি..."

চিন্তামণি বললেন, "আরে তোমার মাথা খারাপ নাকি শঙ্কর! কোথাকার কে এক বাচ্চা ছেলে! সঙ্গে সে আবার চুরির দায়ে ধরা পড়েছে! কী যে তুমি বলো!"

"কাউকে যেতে হবে না। আমিই যাব!" প্রতাপাদিত্য হুঙ্কার দিলেন।

“আপনাকে যেতে হবে না মহারাজ,” সূর্যকান্ত এ বার শান্ত গলায় বললেন, “আমি বলিকে পাঠাব।”

“বলি?” প্রতাপাদিত্য তাকালেন।

সূর্যকান্ত বললেন, “বলি আমার চর। সঙ্গে নিপুণ যোদ্ধা। আপনার হয়তো মনে নেই মহারাজ, এর আগেও ও এমন কাজ করেছে। দেখুন, এখানে সবাই গিয়ে হইচই বাঁধালে মিহিরদের ওরা মেরে ফেলবে। তখন আর-একটা অশান্তি হবে। তার চেয়ে, বলি যাবে। গুপ্ত ভাবে হত্যা করবে দাভিকে। তার পর আগুন জ্বালিয়ে সামান্য দূরে যে নির্জন দ্বীপটি আছে, সেখানে ঘাঁটি গাঁড়া আমাদের সৈন্যদের সঙ্কেত দেবে। আমরা তখন কোশা নৌকা নিয়ে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ব ওদের উপর! দাভিকে মারলেই দেখবেন মহারাজ, ওরা কেমন ছত্রখান হয়ে যায়! তখন আর মিহিরদের বের করে আনতে আমাদের অসুবিধে হবে না।”

“কিন্তু ও যাবে কী করে?” শঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন।

সূর্যকান্ত বললেন, “প্রতি বৃহস্পতিবার করে দাভিদের বেশ কয়েক জন রায়মঙ্গলের চরে যে বাজার বসে, সেখানে যায় জিনিস কিনতে। সঙ্গে এক জন বৈদ্যকে নিয়ে যায় দাভির কানের চিকিৎসার জন্য। প্রতি বার বৈদ্যরাজ সতীনাথ সেন যান। এ বার তিনি যাবেন না। যাবে তার সহকারী। মানে সহকারী সেজে বলি। তার পর দাভির কাছে পৌঁছে বলি যা করার করবে।”

“মানে?” চিন্তামণি জিজ্ঞেস করলেন।

“দাভি একটা ওষুধ খায়। সেটা সতীনাথ সেন দেন। এ বারও দেবেন। তবে সেটা খেয়ে দাভি আর উঠবে না। একদম চির নিদ্রায় চলে যাবে!” সূর্যকান্ত কথাটা শেষ করে প্রতাপাদিত্যের দিকে তাকালেন।

“তুমি এ সব জানলে কখন?” প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন।

সূর্যকান্ত বললেন, “মহারাজ, আমি সুখাকে লাগিয়েছিলাম কাজে। ও সব খবর নিয়ে এসেছে। আমার মনে হয়েছিল দাভি আমাদের প্রস্তাব মানবে না। তাই আমি নিজে থেকেই গত কাল বৈদ্যরাজের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে রাজি করিয়ে এসেছি। বলিও তৈরি আছে। এ বার আপনি আজ্ঞা দিলেই আমরা কাজে লেগে যাব।”

প্রতাপাদিত্য আবার সিংহাসনে বসলেন। পাশে রাখা একটা পাত্র থেকে কর্পূর দেওয়া জল একটু খেলেন। তার পর একটা কৌটো খুলে পান বের করলেন। সেটা মুখে দিয়ে চিবোতে-চিবোতে ভাবলেন কিছু ক্ষণ। শঙ্করের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কী বলো?”

শঙ্কর বললেন, “চেষ্টা করা যেতেই পারে। কিন্তু এটা বিফল হলে তখন যদি ওই ছেলেটিকে ব্যবহার করা যায়...”

প্রতাপাদিত্য শঙ্করকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে সূর্যকান্তর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আজ মঙ্গলবার। গুরুবার মানে তা হলে পরশু?”

“হ্যাঁ মহারাজ,” সূর্যকান্ত বললেন।

চিন্তামণি বললেন, “এতে সফল হবে কি?”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হলেন, “সারা ক্ষণ অমন নিরাশার কথা বলেন কেন? আমাদের কিছু তো একটা করতেই হবে। সূর্যের পরিকল্পনাটা ভাল। সূর্য, তুমি কাজে লেগে পড়ো।”

লক্ষ্মীকান্ত জানেন যে, এই কোশা নৌকা খুব দ্রুত চলে। চৌষট্টি দাঁড়-যুক্ত হয় এগুলো। সঙ্গে পেতলের ঢালাই করা কামানও থাকে এই নৌকায়। দাভি মারা গেলে নেতৃত্বের অভাবে এর সঙ্গে পেরে ওঠা জলদস্যুদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সূর্যকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে মহারাজকে অভিবাদন করলেন।

প্রতাপাদিত্য মাথা নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করে শক্ত গলায় বললেন, “দেখো সূর্য, এই পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ না হয়।”

॥ ১২ ॥

রাতের অন্ধকারে, ধূমঘাটের কোনও একটি বাড়িতে

সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে দেখল জগৎসিংহ। লোকটি খবর নিয়ে এসেছে রাজসভা থেকে। আসলে রাজসভায় যা-যা ঘটছে, সেটা গোপনে জগৎকে এক জন জানায়।

এই জগৎসিংহ লোকটি বছর চারেক হল যশোরে এসেছে। সবাই ওকে পঞ্জাব থেকে আসা ব্যবসায়ী হিসেবে জানলেও, আসলে জগৎ এক জন গুপ্তচর! রাজা মানসিংহের হয়ে কাজ করে ও। যবে থেকে প্রতাপাদিত্য আকবর বাদশার বশ্যতা না-মেনে নিজেকে রাজা ঘোষণা করে নিজের নামে নিশান আর মুদ্রা প্রচলন করেছেন, তখন থেকে এই জগৎকে এখানে বসিয়েছেন মানসিংহ। কারণ আজই হোক বা কালই হোক মানসিংহ জানেন যে, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁদের আবার যুদ্ধ হবেই। তাই আগে থেকেই খবরাখবর নেওয়া দরকার।

জগৎ খুব কাজের লোক। ইতিমধ্যেই প্রতাপাদিত্যের রাজসভার মধ্যে সে এক জনকে নিজের দলে নিয়েছে। আর তার সাহায্যে প্রতাপাদিত্যর রাজকার্যে ফাটল ধরানোর কাজ ভালই এগোচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যেই মানসিংহ আসবেন যশোর আক্রমণ করতে, তাই তার আগে প্রতাপাদিত্যকে বিভ্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত আর দুর্বল করে দিতে পারলে মানসিংহের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

রাজসভার সেই লোকটিকে হাত করা ছাড়াও জগৎ দাভি নামে এক জলদস্যুকেও নিযুক্ত করেছে। দাভিও দেখেছে তার দু’দিক থেকেই লাভ! প্রতাপাদিত্য বাধ্য হয়ে তাকে ফরমান দিলে সে অবাধে লুঠপাট করতে পারবে আর অন্য দিকে জগতের কাছ থেকেও সে ভালই অর্থ পাবে! এ দিকে জগতের ভাগ্য ভাল যে, এর মধ্যে ভূষণার ভুঁইয়ার ছেলেও জড়িয়ে গেছে!

দাভির মাধ্যমে সত্রাজিৎ ও মিহিরকে অপহরণ করিয়ে প্রতাপাদিত্যকে তাই এখন ঘরে ও বাইরে জেরবার করে দেওয়া গিয়েছে। সেই দিক থেকে জগতের পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত সফল।

জগৎ দেখল সামনের লোকটি এখনও হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটি যে আসল জায়গা থেকে এসেছে সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। আসলে প্রতি বার ওর কাছে নতুন-নতুন লোক পাঠায় রাজসভার সেই লোকটি। কিন্তু ওদের সাঙ্কেতিক প্রশ্নটা একই থাকে। এ বারও এই নতুন লোকটি সেই সাংকেতিক প্রশ্নের ঠিক উত্তরই দিতে পেরেছে।

জগৎসিংহ জিজ্ঞেস করল, “তোমার খবর ঠিক তো?”

লোকটি বলল, “হ্যাঁ, হুজুর। আমার প্রভু এই চিঠিটা দিয়েছেন। এতে সব লেখা রয়েছে!”

জগৎ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। তার পর সিলমোহর ভেঙে পড়ল। তাতে লেখা—

‘ইগলকে মারতে শিকারি পাঠানো হচ্ছে। আপনি ইগলকে জানিয়ে দেবেন তার বিপদের কথা। বলবেন যা প্রাণদায়ী, তা-ই প্রাণঘাতক।’

জগৎ হাসলেন। দাভিকে মারতে যে পরিকল্পনা করা হবে, সেটা স্বাভাবিক। তবে সেটা দাভিকে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। এখানে ইগল যে দাভি, সেটা জগতের বুঝতে অসুবিধে হল না। খবরটা দাভিকে জগৎ নিজেই চিঠিতে জানাবে। ও-ই আজ ভোর রাতে পায়রা পাঠিয়ে দেবে।

জগৎ সামনে দাঁড়ানো লোকটির হাতে সামান্য ক’টা মুদ্রা দিয়ে বললেন, “এটা তোমার। সব কাজ হয়ে যাবে। আর তোমার প্রভুকে বোলো, মহারাজা মানসিংহ তার এই আনুগত্য ও কাজের মর্যাদা রাখবেন। আর প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার পরে তোমার প্রভুকে উপযুক্ত সম্মাননা দেবেন।”

লোকটি সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

জগৎ হাতের কাগজটা বড় পিলসুজের উপর রাখা প্রদীপের আগুনে ধরল। কাগজটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। সেটা পাশে রাখা একটা পিতলের পাত্রে ফেলে দিয়ে জগৎ তাকিয়ে রইল সে দিকে, যত ক্ষণ না কাগজটা ছাই হয়ে যায়।

এ বার পাশে রাখা কাগজ আর খাগের কলমটা টেনে নিল জগৎ।

দাভিকে ওই সতর্কবার্তা পাঠানোর আগে অন্য একটা চিঠি লেখা খুব দরকার। এখানে যা ঘটছে, তা সবিস্তারে মহারাজা মানসিংহকে জানাতেই হবে। প্রদীপের আলোয় জগৎসিংহ চিঠি লেখায় মন দিল।

॥ ১৩ ॥

জলদস্যুদের জাহাজে

রুটি আর মাংস খাওয়া শেষ করে পাশে রাখা পাত্র থেকে জল খেল দাভি। তার পর মুখ আর দাড়ি মুছে অলফন্সোকে জিজ্ঞেস করল, "ওই দুটো ছেলেকে খাবার দেওয়া হয়েছে?"

অলফন্সো মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ ক্যাপিতেও। কিন্তু ওরা খাচ্ছে না সে ভাবে।"

দাভি বলল, "খিদে পেলে ঠিক খাবে। অমন অনেক দেখা আছে আমার। তা, ওই ছেলেটার কান ঠিক আছে? ওষুধ লাগানো হচ্ছে?"

অলফন্সো মাথা নাড়ল, "আমরা যা পেরেছি লাগিয়েছি। আসলে কাল তো বৈদ্যরাজ আসবেন। ওকে ভাবছি এক বার দেখিয়ে নেব। বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে গেলে পরে আবার হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।"

দাভি মাথা নাড়ল, "আর তো ক'টা দিন। তার পর সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রতাপাদিত্য আমাদের কথা না-মেনে যাবে কোথায়?"

অলফন্সো হাসল। জাহাজের উপরের এই কাঠের ঘরটা বড়। হবেই। দাভির নিজের ঘর এটা। জানলা-দরজা সব খোলা এখন। দুপুরের রোদ আর হাওয়া আসছে ঘরে। ও বুঝতে পারল দাভির মেজাজ আজ খুব ভাল। স্বাভাবিক। গত কাল বড় একটা জাহাজ লুঠ করেছে ওরা।

আসলে যশোরের দিকে পাহারা থাকলেও মাঝসমুদ্র এখনও অরক্ষিত। সেই দিক দিয়ে একটা বণিক জাহাজ আসছিল। সেইখানে এক জন ব্রিটিশ ছিল। নাম জন হিল্ডেনহল। সে মশলা নিয়ে আসছিল মালাক্কা থেকে। আর তার সঙ্গে ছিল একটা রত্নের বাক্স। তাতে ছিল পায়রার ডিমের আকারের একটা মুক্তো ও আরও অনেক হিরে-জহরত!

সেই জাহাজ আক্রমণ করেছিল দাভির দলবল। সেখান থেকে বেশ কিছু মশলার বস্তা, কুড়ি জন ক্রীতদাস আর একটা বাক্স নিয়ে এসেছে ওরা। জন হিল্ডেনহলকে বন্দি করতে পারেনি ওরা। সে তার চার জন সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়েছে!

এখন সেই রত্নের বাক্সটা পড়ে আছে দাভির সামনে। অলফন্সো দেখল বাক্সটা। রুপোর। গায়ে সোনার জলে লেখা আছে জালাল-উদ্দিন-আকবর! লোকটা আকবর বাদশার জন্য উপহার নিয়ে যাচ্ছিল!

বাদশার জিনিস এখন দাভির হাতে! এই বাক্সটার মধ্যেকার পাথরগুলোর অনেক দাম! তার সঙ্গে লুঠ করে আনা মশলা আর মানুষ বিক্রি করেও অনেক রোজগার হবে দাভির! মশলা আর মানুষ সে ইতিমধ্যে সঙ্গের একটা বড় নৌকা করে পাঠিয়েছে সন্দ্বীপের উদ্দেশে।

বেশ কিছু দিন কোনও রোজগার হয়নি। জগৎসিংহের থেকে পাওয়া অর্থে আর কত দিন চলে। এ বার এক ধাক্কায় অনেক অর্থ এসে যাবে হাতে। তাই দাভির মন আজ খুব ভাল হয়ে আছে।

দরজায় শব্দ হল একটা। তার পরেই নাসিমান্তো আর ব্রুনো এসে ঢুকল ঘরে।

দাভি তাকাল ওদের দিকে, "কী দরকার? আমি এখন আরাম করব একটু। বিকেলে আবার কথা হবে।"

ব্রুনো বলল, "ক্যাপিতেও, পায়রার ডাক এসেছে। গেঁজের মুখটা গালার সঙ্গে কালো কাপড়ের টুকরো দিয়ে বন্ধ করা। যার মানে, খুবই জরুরি চিঠি আছে।"

দাভি ভুরু কুঁচকে তাকাল। জরুরি চিঠি! এখন! ও হাত বাড়িয়ে গেঁজেটা নিল। সিলমোহরটা দেখে চিনতে পারল ঠিক। জগৎসিংহের থেকে এসেছে চিঠিটা। দাভি দ্রুত হাতে গালা ভেঙে গেঁজের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করল।

অলফন্সো দেখল চিঠিটা পড়তে-পড়তে দাভির মুখে ধীরে-ধীরে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠতে লাগল।

॥ ১৪ ॥

সমুদ্রে মৃত্যুদূত

ছোট্ট নৌকাটা জলের ঢেউয়ে অল্প-অল্প নড়ছে। বিকেল হয়ে এসেছে এখন। সূর্য ডুবে গিয়ে আকাশে এখন নরম আলো ছড়িয়ে আছে। সামনে বড় জাহাজটা ছোট্ট টিলার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাহাজ থেকে দড়ির সিঁড়ি নেমে এসেছে! সেটা বেয়ে উপরে উঠতে হবে।

বলি নৌকায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকাল। জাহাজের উপর থেকে কয়েক জন নীচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বৈদ্যরাজ আসেননি আজ। সেই জায়গায় তাঁর সহকারী সাজিয়ে পাঠানো হয়েছে বলিকে।

যশোর রাজের যে ঢালী সৈন্যবাহিনী রয়েছে, সেখানে কাজ করে বলি। সূর্যকান্ত বলিকে পছন্দ করেন বেশ। কারণ বলি খুব বিশ্বস্ত আর ওর ভয়ডর বলে কিছু নেই।

এখানে বলিকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে, সেটা ঠিকঠাক করতে পারবে বলেই ওর বিশ্বাস।

জলদস্যুদের প্রধান দাভি ডি'ক্রুজের কানে কিছু একটা সমস্যা আছে। তাই বৈদ্যরাজের ওষুধ খেতে হয় ওকে। আর মাসে এক বার করে বৈদ্যরাজ নিজে এসে দাভিকে পরীক্ষা করে যান।

কিন্তু এ বার মহারাজের আদেশে বৈদ্যরাজ নিজে না-এসে বলিকে সহকারী সাজিয়ে পাঠিয়েছেন।

বলির কোমরবন্ধনীর মধ্যে ছোট্ট লম্বাটে একটা তামার মুখবন্ধ পাত্রে ওষুধ রয়েছে। সেটাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিতে হবে দাভিকে।

এটা একটা তীব্র বিষ। মানুষের শরীরে যাওয়ার খুব সামান্য সময়ের মধ্যেই বিষ তার কাজ শুরু করে দেয়। এমন বিষ প্রয়োগ করে এর আগেও বলি যশোর রাজ্যের কিছু বিদ্রোহী শত্রুকে গোপনে নিকেশ করেছে। তাই ও জানে, এই বিষ এক বার দাভির শরীরে গেলে কেউ দাভিকে বাঁচাতে পারবে না।

কিন্তু তার পরই হবে আসল কাজ। বারুদ, লৌহচূর্ণ দিয়ে তৈরি এক ধরনের গোলা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে বলি। সেটায় আগুন লাগিয়ে আকাশের দিকে ছুড়ে দিলে দারুণ উজ্জ্বল লাল আলো দেখা যায়। সেই আলোর সঙ্কেত পেলেই যশোরের নৌ-সেনার কিছু নৌকা সামনের ওই দ্বীপ থেকে দ্রুত এসে পৌঁছবে এখানে।

এখানে আসার আগে রডা আর লক্ষ্মীকান্তের থেকে বলি জেনে নিয়েছে যে জাহাজের উপরে, একটা কাঠের ছোট্ট ঘরে আটকে রাখা হয়েছে মিহির আর সত্রাজিৎকে। তাই বলি ঠিক করেছে দাভিকে মেরে ওর প্রথম কাজ হবে ওই আলোর সঙ্কেত পাঠানো আর তার পর ওই মিহিরদের ঘরে গিয়ে ঢোকা, ওদের রক্ষা করা।

কিন্তু সেটা কি সহজ হবে? দাভি মারা গেলে সকলের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। বলি ঠিক করে রেখেছে যে সেই সুযোগে ও ওই ঘরে গিয়ে ঢুকবে। এক বার নৌসেনা চলে এলে জলদস্যুদের আর কিছু করার থাকবে না।

বলি নিপুণ হাতে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল জাহাজের উপরে। দেখল জাহাজে গোটা কুড়ি লোক রয়েছে। জাহাজের পাটাতনের উপর দুটো কাঠের ঘর। একটা বড় আর অন্যটা ছোট। ছোট ঘরটার দরজা-জানলা বন্ধ। বলির বুঝতে অসুবিধে হল না যে, ওই ঘরেই মিহিরদের বন্দি করে রাখা হয়েছে।

"ওই দিকে," এক জন সুচালো দাড়িওলা লোক এসে বলিকে বড় কাঠের ঘরটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

বলি মাথা নেড়ে সামান্য হেসে ঘরের দিকে গেল। ছোট্ট একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরটায় ঢুকতে হয়। বলি ঢুকল ঘরে।

দেখল সামনেই বড় একটা বসার জায়গায় আধশোয়া হয়ে রয়েছে একটা লোক। লোকটার বয়স হয়েছে। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গালে ঘন দাড়ি। লোকটার ডান পায়ের হাঁটুর নীচ থেকে কাঠের খুঁটোর মতো লাগানো। এই লোকটাই যে দুর্ধর্ষ দাভি, সেটা বুঝতে পারল ও। ঘরে আরও চার জন রয়েছে।

বলি চার দিকটা ভাল করে দেখল। ঘরের তিন দিকে জানলা। তাতে কোনও শিক নেই। ও ঠিক করল দাভি ওষুধ খেয়ে ঢলে পড়লেই ও দ্রুত জাহাজের পাটাতনের দিকের জানলা দিয়ে গলে বেরিয়ে যাবে। ওই দিকে রোগা-পাতলা মতো যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে কাবু করা কোনও কঠিন কাজ হবে না। এক বার জাহাজের পাটাতনে গিয়ে পড়লে ওকে আর আটকায় কে!

দাভি বলির দিকে তাকিয়ে হাসল, তার পর একটা কাঠের বসার জায়গা দেখিয়ে ভাঙা বাংলায় বলল, "বসো।"

বলি বিনয় দেখিয়ে বলল, "না, আমি দাঁড়িয়ে থাকি। আপনার সামনে আমি বসতে পারি নাকি?"

"তাই?" দাভি হেসে ঘরের বাকি লোকদের দিকে তাকাল। তার পর বলল, "আমার সামনে বসতে পারো না, কিন্তু আমায় মারতে আসতে পারো, তাই না?"

"অ্যাঁ!" বলি চমকে উঠল।

দাভির হাসি মুখ নিমেষে পাল্টে গেল। ও ঘরের বাকিদের ইঙ্গিত করে বলল, "ওকে ধরো।"

বলি বুঝল, ও যে আসলে কে এবং কিসের জন্য এসেছে সেটা দাভি কোনও ভাবে জেনে গেছে। এ বার বিপদে পড়বে ও! কিন্তু ঘরে এত জন রয়েছে, সেখানে ও একা কী করবে? ওর জামার ভিতরে একটা ছোরা আছে। সেটা বের করবে?

বলি বলল, "কী সব বলছেন হুজুর... আমি..."

"ধর ওকে!" দাভি এ বার চিৎকার করে উঠল।

বলি বুঝল আর উপায় নেই। ও লুকোনো ছোরাটা বের করতে গেল। কিন্তু তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ধরে ফেলল চার জন। তার পর সামনের একটা বড় মেজ-এর উপর চেপে শুইয়ে দিল।

কাঠের পায়ে ঠক ঠক শব্দ তুলে ওর সামনে এসে দাঁড়াল দাভি। ওর কোমরের ভিতর থেকে এক টানে বের করল তামার সেই ছোট্ট লম্বাটে পাত্রটা!

দাভি পাত্রের মুখটা খুলল। তার পর বলল, "এটা খাইয়ে আমায় মারবি ভেবেছিলি?"

বলি তাকিয়ে রইল। কিছু বলার নেই আর!

দাভি মাথা নাড়ল, "তোদের রাজা কী ভুল যে করল, এবার বুঝতে পারবে। আমাকে যে মারতে চায় তাকে আমি ছেড়ে দিই না!"

দাভি ইশারা করল ওর লোকেদের। তারা চোয়াল চেপে বলির মুখটা খুলে ধরল। দাভি আর সময় নষ্ট না-করে পাত্রের সম্পূর্ণ তরলটা ঢেলে দিল ওর গলায়, তার পর সঙ্গে-সঙ্গে চেপে ধরল ওর নাক আর মুখ।

বলি চেষ্টা করল নিজেকে ছাড়াতে। কিন্তু পারল না। শ্বাসবায়ুর অভাবে মুখের তরলটা গিলে নিতে বাধ্য হল।

॥ ১৫ ॥

প্রতাপাদিত্যের রাজসভায়

সামনের কাঠের বড় বাক্সটার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন প্রতাপাদিত্য। কাঠের বাক্সে বলির কাটা মাথাটা রাখা। দাভি যত্ন করে কাঠের বাক্সের মধ্যে বালি বিছিয়ে তার উপর বলির কাটা মাথাটা পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতাপাদিত্যের কাছে। সঙ্গে একটা চিঠিও দিয়েছে শয়তানটা। বলেছে যে, এমন যদি আবার করা হয় তা হলে এ বার মিহির আর সত্রাজিতের কাটা মাথা দুটোও এ ভাবে পাঠানো হবে যশোর রাজের দরবারে!

প্রতাপাদিত্য সান্ত্রীকে হাতের ইশারায় বাক্সটা সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। তার পর মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

এখন রাত হয়ে গেছে। এমন সময় প্রতাপাদিত্য রাজসভায় আসেন না। কিন্তু জরুরি কাজ আছে বলে শঙ্কর ওঁকে ডেকে এনেছেন। রাজসভাটা এখন একদম খাঁ-খাঁ করছে। বাক্স নিয়ে সান্ত্রীটি চলে যাওয়ার পরে এত বড় ঘরে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এখন কেবল শঙ্কর চক্রবর্তী বসে রয়েছেন।

প্রতাপাদিত্য এ বার মুখ তুলে বললেন, "ধরা পড়ে গেল বলি! এটা কী করে সম্ভব! ও যে যাবে সেটা তো কেউ জানত না! তা হলে?"

শঙ্কর বললেন, "তা হলে কিছু না। আমার মনে হয়, আমাদের এর পর কী করতে হবে সেটা ভাবা উচিত।"

প্রতাপাদিত্য মাথা নাড়লেন, "এর পর কী হবে মানে? আর কী উপায় আছে কোনও? মুকুন্দরামের মন্ত্রী চলে গেলেও তিনি আজ সকালেই আবার চিঠি পাঠিয়েছেন যে, সত্রাজিৎ যদি আর পাঁচ দিনের মধ্যে না-ফেরত আসে তা হলে উনি আমাদের আক্রমণ করবেন। আর মানসিংহ তো এটাই চায়। আমাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করিয়ে সে এসে যশোর দখল করে নেবে।"

শঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে-করতে বললেন, "আজ রাতে এই বাক্সটা এসেছে। কাল সকালের মধ্যে আমাদের সবাইকে বলতে হবে যে বলিকে দাভি মেরে ফেলেছে। কারণ এই খবরটা কিছুতেই লুকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু শুধু এটুকু বললেই তো হবে না, আরও বলতে হবে যে রাজা হিসেবে এ সবের প্রতিকারের জন্য আপনি কী করছেন। তখন সমস্যা হবে। তাই আজই আমাদের কিছু একটা উপায় বের করতে হবে।"

প্রতাপাদিত্য তাকালেন শঙ্করের দিকে। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু উপায় কী! আমাদের কি পাহারা সরিয়ে নিতে হবে? দাভিকে যা খুশি তাই করার অনুমতিপত্র দিতে হবে! সেটা কি সম্ভব? প্রজাদের কী হবে? এমনিতেই ভাটি প্রদেশের অনেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে জলদস্যুদের অত্যাচারে। এতে চাষবাসের উৎপাদন কম হচ্ছে। রাজস্ব কমে যাচ্ছে! এর পর দাভি যদি এমন করতে থাকে, তা হলে তো আরও লোকজন পালিয়ে যাবে রাজ্য ছেড়ে! এতে রাজস্বের ক্ষতি। ফসল উৎপাদনের ক্ষতি। তার সঙ্গে যশোর রাজ্যের বদনাম হবে। নতুন লোকজন আসবে না এখানে। সব দিক থেকে সর্বনাশ হবে। ও দিকে লোকেন সাহা লোকটি শুনছি আরও ঝামেলা করছে। চার দিকে বলছে, ওই উষ্ণীষ না কে যুবরাজকে বাঁচিয়েছে বলে আমি নাকি তাকে চুরির শাস্তি দিচ্ছি না। আমি নাকি রাজা হিসেবে নিজের কর্তব্য করছি না। তুমি বলো শঙ্কর, এর মধ্যে আমরা কী করতে পারি? চার দিক দিয়ে সমস্যা ঘিরে ধরেছে আমায়!"

শঙ্কর উত্তর না-দিয়ে রাজসভার বড় দরজার দিকে হাত দিয়ে দেখালেন। তার পর বললেন, "সেই কারণেই আমি দ্বিতীয় একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। আপনাকেও বলেওছিলাম। আপনার হয়তো মনে নেই। এই দেখুন," বলে শঙ্কর জোরে বললেন, "এসো লক্ষ্মীকান্ত।"

প্রতাপাদিত্য দেখলেন লক্ষ্মীকান্ত এক জন সৌম্যদর্শন মানুষকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে। তার পর দু'জনেই জোড় হাতে, মাথা নত করে প্রণাম করলেন মহারাজকে।

প্রতাপাদিত্য অবাক হয়ে তাকালেন শঙ্করের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি!"

শঙ্কর বললেন, "মহারাজ, ইনি আচার্য মহাময় মুখোপাধ্যায়। বাকলায় থাকেন। পণ্ডিত মানুষ। ন্যায়শাস্ত্র আর গণিতে পারদর্শী। ইনি আমাদের সাহায্য করার জন্য কিছু বলতে চান!"

প্রতাপাদিত্য মহাময়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলতে চান আপনি?"

মহাময় বললেন, "মহারাজ, আমি কয়েক দিন আগেই এসে

পৌঁছেছি আপনার রাজধানী ধূমঘাটে। আমি উষ্ণীষের জন্য এসেছিলাম। এই লক্ষ্মীকান্ত আমার বাল্যবন্ধু। আমি সম্পূর্ণ ঘটনাটা জানি। আজ যে বাক্সয় কী এসেছে, সেটাও জেনেছি। বুঝেছি যে অবস্থা ঘোরতর।”

প্রতাপাদিত্য কিছু না-বলে তাকিয়ে রইলেন।

মহামায় বললেন, “মহারাজ, আমার মনে হয় এখন দুটো কাজ পর পর করা যেতে পারে।”

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন, “দুটো কাজ? যেমন?”

“স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দাভিকে হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতক বলিকে আপনি যে পাঠিয়েছিলেন, সেটা দাভিকে কেউ জানিয়ে দিয়েছিল। এখন সেই ব্যাপারে লক্ষ্মীকান্ত, সর্দার শঙ্কর মহাশয়, রডা, সুখা, চিন্তামণি মহাশয় আর সূর্যকান্ত মহাশয়—এর মধ্যে কেউ এক জন বিশ্বাসঘাতক।”

“কী বলছেন আপনি!” প্রতাপাদিত্য বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, “এঁরা সবাই আমার খুব কাছের ও বিশ্বস্ত!”

“মাফ করবেন মহারাজ, রাজনীতিতে খুব কম লোকই বিশ্বস্ত হয়। তবে লক্ষ্মীকান্ত যে এমন করবেন না, সেটা আমি জানি। ওঁকে চিনি বলেই বলছি,” মহামায় বললেন।

“সে রকম শঙ্করও করবেন না,” প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হয়ে বললেন, “সূর্য বা চিন্তামণিও...”

“দয়া করে যদি শোনেন আমার কথাটি,” মহামায় হাত জোড় করে বললেন, “আমি একটা প্রস্তাব দিতে চাই।”

শঙ্করও বললেন, “হ্যাঁ মহারাজ, শোনা যাক।”

প্রতাপাদিত্য মাথা নেড়ে আবার বসে পড়লেন।

মহামায় বললেন, “প্রথমত, আপনি কালকে সকালে বলির হত্যার খবর জানিয়ে আবার ওই ক’জনের সামনেই বলবেন যে পুনরায় আপনি এক জন গুপ্তঘাতক পাঠাবেন। তার পর গুপ্তচর মারফত রডা, সূর্য, আর চিন্তামণির উপর নজর রাখবেন। আমি নিজে লক্ষ্মীকান্তকে নিরীক্ষণ করব আর শঙ্কর মহাশয় আপনার সামনে থেকে সরবেন না। মানে সকলের উপর নজর থাকবে। তাদের সমস্ত গতিবিধি খুব খুঁটিয়ে আমরা দেখব। তার পর দেখা যাবে খবর পাচারের চেষ্টা হয় কিনা বাইরে।”

শঙ্কর বললেন, “মহারাজ, যদি কেউ ধরা না-পড়ে, তা হলে বোঝা যাবে যে লক্ষ্মীকান্ত বা আমি বিশ্বাসঘাতকতা করে গুপ্ত হত্যার খবর দাভির কাছে ফাঁস করেছি। কারণ আমরা আপনাদের সামনেই আটকে আছি! আর যদি কেউ খবর পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তা হলে সহজেই আমরা জেনে যাব কে অপরাধী!”

প্রতাপাদিত্য অবাক হলেন, “কী বলছ তুমি শঙ্কর! তুমি অপরাধী?”

শঙ্কর বললেন, “না, আমি অপরাধী নই। কিন্তু আমরা যখন অন্য পক্ষকে সন্দেহ করছি, তখন নিজেদের অবস্থানটাকেও তো নজরের মধ্যে রাখতে হবে, তাই না?”

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন, “আর দ্বিতীয়টা?”

মহামায় সময় নিলেন একটু। তার পর প্রতাপাদিত্যের দিকে তাকিয়ে সরাসরি বললেন, “সর্দার শঙ্করের সঙ্গে আমার এই নিয়ে আগেই কথা হয়েছে মহারাজ। উষ্ণীষকে আমরা মিহির আর সত্রাজিতের উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করত চাই।”

॥ ১৬ ॥

কারাগারের মধ্যে একলা

উষ্ণীষ চুপ করে তাকিয়ে থাকল। সামনে মশাল হাতে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাকে চেনে না ও। কিন্তু এই আধো আলোতেও দেখা যাচ্ছে লোকটিকে। খালি গা। খাটো করে ধুতি পরা। ছোটখাটো, কিন্তু মজবুত চেহারা। লোকটার কোমরে একটা ‘দাও’। এই তলোয়ারের মতো জিনিসটা হাতলের কাছে সরু হয়ে সামনের দিকে চওড়া হয়ে গিয়েছে।

কুকিদের হাতে এই অস্ত্রটা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।

উষ্ণীষ দেখল যে, লোকটার মুখে উল্কির মতো দাগ কাটা।

ও বুঝতে পারছে যে এ লোকটা পার্বত্য কুকি জাতির মানুষ। দুর্ধর্ষ সৈন্য হিসেবে সমগ্র দেশে এদের খুব নাম।

“তুমি খাবার পাচ্ছ?” লোকটির গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা। কথায় পার্বত্য টান স্পষ্ট।

উষ্ণীষ মাথা নাড়ল।

লোকটি এ বার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন। বললেন, “তোমায় একটা কথা বলছি, শোনো। আমার নাম সুখা। আমি চাই তুমি সর্দার শঙ্করের কথাটা মাথায় রাখো।”

“কী কথা মাথায় রাখব সুখা সর্দার?” উষ্ণীষ জিজ্ঞেস করল, “সর্দার আমায় সমস্যার কথা বলে বলেছেন, আমি সাহায্য করতে রাজি কি না? কিন্তু কিসের সাহায্য, তা-ই তো বুঝতে পারছি না।”

“উনি যা বলবেন, সেটা করার জন্য রাজি কি না জানতে চেয়েছেন!”

উষ্ণীষ অবাক গলায় বলল, “কিসের ব্যাপারে রাজি? মহারাজের আত্মীয়দের জলদস্যুরা ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আমি কী করব সেটাই তো বুঝতে পারছি না! আমায় কী করতে হবে সেটা জানতে হবে না?”

“না, জানতে হবে না,” সুখার গলায় এ বার রুক্ষতা, “মহারাজের পরে সর্দার শঙ্করই শেষ কথা। উনি যা বলবেন সেটা মুখ বুজে পালন করবে।”

উষ্ণীষ কী বলবে বুঝতে না-পেরে চুপ করে তাকিয়ে রইল।

সুখা এ বার হাত বাড়িয়ে ওর চুলের মুঠিটা শক্ত করে ধরল। তার পর এক বার ঝাঁকিয়ে বলল, “উনি ভাল মানুষ বলেই তোমার মত জানতে চেয়েছেন। না হলে সোজা কাপাসবনির মাঠে নিয়ে গিয়ে শূলে বসিয়ে দিতে বলতেন। তোমায় যে এখনও কিছু করা হয়নি, তার কারণ উনিই। যুবরাজকে তুমি বাঁচিয়েছ, ঠিক আছে। কিন্তু জানবে তাতে কিচ্ছু আসে যায় না আমাদের।”

মাথার চুলে খুব টান লাগছে উষ্ণীষের। কিন্তু তাও দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে আছে। ও জানে কষ্টটা দেখালে ওকে আরও কষ্ট দেওয়া হবে।

সুখা বলল, “বলো রাজি কি না! সর্দার যা বলবে তাতেই রাজি হতে হবে তোমায়! যে ভাবে বলবেন সে ভাবেই সাহায্য করতে হবে। আগুনে হাঁটতে বললে আগুনে হাঁটবে, কাঁটায় ঝাঁপাতে বললে কাঁটায় ঝাঁপাবে। না হলে কাপাসবনির জঙ্গল বা আমার কোমরের এই দাও!”

উষ্ণীষ তাকিয়ে রইল।

সুখা ওর মাথাটা ছেড়ে দিয়ে বলল, “আমি আবার কাল আসব। এক রাত আছে তোমার হাতে। হয় হ্যাঁ বলো নয়তো এখানেই শেষ হয়ে যাও!”

সুখা মশাল হাতে নিয়ে চলে যাওয়ার পরে আবার এই কুঠুরিটা আবছায়া অন্ধকারে ভরে উঠল। উষ্ণীষ ভাবল, ‘না’ বলা মানে কালকেই মরে যাওয়া। আর ‘হ্যাঁ’ বলা মানে আরও কয়েকটা দিন বেঁচে থাকা। তবে এটাও ঠিক, ‘হ্যাঁ’ বললে ওকে যে কী কাজ করতে দেবে, সেটা কেউ জানে না। এখন কী করবে উষ্ণীষ? সর্দার শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে?

কত ক্ষণ এভাবে বসে ছিল উষ্ণীষ, সেটা ওর মনে নেই। আচমকা আবছা অন্ধকার কুঠুরির বাইরের যে সরু গলিপথ, সেখানে একটা গলার স্বর শুনতে পেল ও, “উষ্ণীষ!”

ও চমকে উঠল। আরে, এ গলার স্বর যে ওর খুব চেনা! উত্তেজনায় বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল ও। দেখলে সামনে গরাদের ওই পারে আবছায়া একটা ছায়ামূর্তি। সঙ্গে কী সুন্দর কর্পূর আর চন্দনের গন্ধ! আলো নেই এখানে। কিন্তু এই মানুষটিকে চিনতে ওর আলোর দরকার হয় না। সেই ছোটবেলা থেকে এঁর স্নেহ-ছায়াতেই তো বড় হয়ে উঠেছে ও!

উষ্ণীষ দেখল অন্ধকার লোহার গরাদ খুলে দিচ্ছে এক সান্ত্রী। আর আবছায়ার মধ্যে ওর দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন মহামায়।

॥ ১৭ ॥

রাতের অন্ধকারে, ধূমঘাটের রাস্তায়

এত রাতে ধূমঘাটের রাস্তাঘাট সব শুনশান হয়ে গিয়েছে। ইটের বড়-বড় বাড়ির জানলা বন্ধ। তার মাঝে ক্বচিৎ কোনও-কোনও জানলা দিয়ে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। আকাশে মেঘ আছে বেশ। তার ফাঁকে-ফাঁকে চাঁদ উঁকি মারছে। রাস্তার দু’পাশে স্তম্ভের মাথায় লাগিয়ে রাখা মশালের আলোগুলো এখন বেশ ম্রিয়মাণ। চার দিকে আলো-আঁধারির জাল পাতা রয়েছে যেন। আর সেই আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত এগোচ্ছে এক জন ছায়াময় মানুষ।

সামনেই একটা বড় ঝাঁকড়া বট গাছ। তার পাশ দিয়ে রাস্তাটা বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে। মানুষটি সেই রাস্তায় বাঁক নিল। কাছেই একটা ছোট মন্দির। গোপীনাথজির! তার গা ঘেঁষে একটা বড়, ছড়ানো বাঁশঝাড়।

মানুষটি সেই বাঁশঝাড়ের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর মুখ দিয়ে পাখির শিসের মতো শব্দ করল একটা।

“এসেছ?” অন্ধকারের মধ্যে থেকে এ বার বেরিয়ে এল জগৎসিংহ।

মানুষটি বলল, “এ ভাবে বাইরে দেখা করার কী আছে? আপনার বাড়ির ছেলেটি বলল এখানে আসতে!”

জগৎসিংহ বলল, “আমার বাড়িতে বার বার দেখা করা সুরক্ষিত নয়। মানসিংহজি আমায় বলেছেন বাইরে দেখা করতে। সুখার গুপ্তচর বিভাগ খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কে বলতে পারে আমার বাড়ির ওপর নজর রাখছে না!”

মানুষটি বলল, “আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! আমি কি মশাল জ্বালাব?”

“না, একদম না,” জগৎসিংহ বলল, “আমরা কেউ কারও মুখ দেখতে আসিনি। এসেছি খবর নেওয়ার জন্য। তোমার মালিক কী খবর দিয়েছে?”

মানুষটি বলল, “আপনি যে জগৎসিংহ, সেটা এই অন্ধকারে বুঝব কী করে?”

জগৎসিংহ বলল, “কী প্রমাণ চাও বলো?”

মানুষটি বলল, “আমায় কে পাঠিয়েছে বলুন তো? কে আপনাকে প্রতাপাদিত্যের দরবারের গোপন খবর দেয়? এক মাত্র আসল জগৎসিংহ ছাড়া সেটা কেউ জানে না। আপনি বলুন।”

“তুমি যে আসল লোক সেটাই বা জানব কী করে? প্রতি বার তো নতুন-নতুন লোক আসে!” জগৎসিংহ পাল্টা জিজ্ঞেস করল।

মানুষটি বলল, “আমাদের গুপ্ত সঙ্কেতের প্রশ্নটি করুন।”

জগৎসিংহ বলল, “আচ্ছা বলো, না-তুলে না-ফেলে, তুমি কী ভাঙতে পারো?”

মানুষটি হাসল, বলল, “প্রতিজ্ঞা।”

জগৎসিংহ বলল, “ঠিক।”

“এ বার আপনি বলুন, কে আমার মনিব? কে আপনাকে রাজার ঘরের খবর দেয়? তবে বুঝব আপনি আসল জগৎসিংহ।”

জগৎসিংহ আরও কাছে এগিয়ে এল। তার পর ফিসফিসে গলায় বলল, “কেন আচার্যজি দেন। চিন্তামণি আচার্য!”

আর কথাটা বলা মাত্র খটখটি শব্দ হল আশপাশে আর মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার বাঁশবনের চার দিকটাই আলোয় ভরে উঠল।

জগৎসিংহ ভয় পেয়ে এ-দিক ও-দিক তাকাল। দেখল ভোজবাজির মতো কুড়ি-পঁচিশ জন লোক মশাল হাতে ঘিরে ফেলেছে বাঁশবন। তার মধ্যে শঙ্কর চক্রবর্তী ও সুখাকে চিনতে পারল ও। এরা কোত্থেকে এল!

জগৎসিংহ ভাবল, চিন্তামণির পাঠানো চরটি কে? আসলে প্রতি বার চিন্তামণি নতুন-নতুন লোক পাঠায়, যাতে কেউ ধরা না-পড়ে।

কিন্তু এ বার জানাজানি হল কী করে?

শঙ্কর এগিয়ে এসে জগৎসিংহের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "তা হলে চিন্তামণিই আমাদের ভিতরের খবর পাঠাচ্ছিল বাইরে? যাক, আমরা নিশ্চিত হলাম। ওর পাঠানো আসল চর এখন আমাদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। আর এই যাকে দেখছ, তোমার কাছে চিন্তামণির চর সেজে এসেছে, সে আসলে আমাদের লোক। তোমার আর রেহাই নেই জগৎসিংহ। গুপ্তচরবৃত্তির সাজা জানো তো?"

জগৎসিংহ বুদ্ধিমান লোক। ও বুঝল খুব বিপদে পড়ে গেছে। পালানোর আর উপায় নেই। এখন নিজেকে বাঁচানোই এক মাত্র কাজ। তাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে জগৎসিংহ হাত জোড় করে বলল, "আমি সব বলে দেব। শুধু আমায় প্রাণে মারবেন না। আমি ধূমঘাট কেন, এই যশোর রাজ্য ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু দয়া করে প্রাণে মারবেন না আমায়! আমি সব প্রমাণ দিয়ে যাব আপনাদের। এমনকি মানসিংহজির আক্রমণের সম্বন্ধেও আমি যা জানি সব বলে যাব। শুধু আমায় মারবেন না দয়া করে।"

সুখা নিঃশব্দে এগিয়ে এসে নিজের হাতের শক্ত দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধল জগৎসিংহকে। তার পর সেই চর সেজে আসা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি মহারাজের হয়ে কাজ করতে সম্মত হয়ে ভাল করেছ উষ্ণীষ।"

॥ ১৮ ॥

ইচ্ছামতী নদীর তীরে

চিন্তামণি ঘোড়ার পিঠে ঝুঁকে বসে আরও জোরে চাবুক চালালেন। ঘোড়াটা দৌড়ের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। আজ বৃষ্টি পড়ছে বেশ। চার দিক কাদা হয়ে গিয়েছে। নদীর ধারের নরম মাটিতে ঘোড়ার পা বসে যাচ্ছে। যতটা জোরে দৌড়নোর কথা, ঘোড়াটা ঠিক তত জোরে পারছে না। কিন্তু তবু চিন্তামণি চেষ্টা করছেন ঘোড়াটাকে আরও জোরে ছোটাতে!

চিন্তামণি পিছনে ফিরে তাকালেন এক বার। দশ জন ঘোড়সওয়ার তাড়া করে আসছে পিছনে। তাদের মধ্যে সুখা আর সূর্যকান্ত আছে সবার আগে।

চিন্তামণি আবার চাবুক মারলেন ঘোড়াকে। আরও জোরে দৌড় করাতে হবে। না হলে সমূহ বিপদ। জগৎসিংহ ধরা পড়ে গিয়ে যে ওর নাম বলে দেবে, সেটা ও ভাবতেই পারেনি।

যাতে কারও কাছে ধরা না-পড়ে যায়, তার জন্য জগৎসিংহের কাছে প্রতি বার নতুন-নতুন লোক পাঠাতেন চিন্তামণি। ওর খবরের ভিত্তিতেই দাভি ধরে ফেলেছিল বলিকে। চিন্তামণি ভেবেছিলেন ঝামেলা মিটল। কিন্তু মহারাজ আবার পরের দিন বললেন যে, ফের গুপ্তঘাতক পাঠাবেন। এটা শুনে চিন্তামণি ভেবেছিলেন যে, আবার তা হলে জগৎসিংহকে খবরটা জানাতে হবে। কারণ জগৎই তো দাভিকে খবরটা জানাবে।

চিন্তামণি সেই কবে থেকে মহারাজের সভায় আছেন। মন্ত্রীপদও পেয়েছেন। কিন্তু তবু ওঁর যেন কোনও গুরুত্বই নেই। সবটাই ওই শঙ্কর চক্রবর্তী আর সূর্যকান্ত গুহ! তাই চিন্তামণি ভিতরে-ভিতরে যোগাযোগ করেছিলেন মানসিংহের সঙ্গে। মানসিংহ তার উত্তরে ওকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, এই যশোরে মোগলদের এক জন গুপ্তচর আছে। তার নাম জগৎসিংহ। চিন্তামণি যেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

মানসিংহ আবার আসছেন যশোর আক্রমণ করতে। এটা জানার পর থেকেই চিন্তামণি ভেবেছিলেন যে, মানসিংহকে যদি সাহায্য করতে পারেন, তা হলে পরে ওঁর লাভ হবে। তাই রাজসভার নানান খবর উনি জানিয়েছিলেন জগৎসিংহকে। তার পর জগতের সঙ্গে পরামর্শ করেই ঠিক করেছিলেন যে, যশোরের মধ্যে যদি গোলমাল লাগানো যায় তা হলে মানসিংহের সুবিধে হবে যশোর জয় করতে।

সেই মতো জগতের মাধ্যমে দাভিকে খবর ও বুদ্ধি জুগিয়েছিলেন যে মিহির আর সত্রাজিৎকে অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসেবে জলদস্যুতা অবাধ করার দাবি জানাতে। এতে যশোরের মধ্যে যেমন অস্থিরতা তৈরি হবে তেমন ভূষণার সঙ্গেও যশোরের ঝামেলা বেঁধে যাবে। আবার দাভিরও লাভ হবে। অর্থাৎ সব দিক দিয়ে প্রতাপাদিত্য বিপাকে পড়বেন। মানসিংহের সুবিধে হয়ে যাবে।

আর সেই মতো পরিকল্পনাও এগোচ্ছিল। বলিকে মারা পর্যন্ত সবটাই নিখুঁত ছিল। কিন্তু তার পরেই আবার যেই দাভিকে মারার জন্য গুপ্তঘাতক পাঠানো হবে বলে মহারাজ বলির মৃত্যুর পরের দিন সকালে জানালেন, ভুলটা তখনই হল। এটা যে ফাঁদ, সেটা চিন্তামণি বুঝতে পারেননি। চিন্তামণি ভেবেছিলেন, এই খবরটা সঙ্গে-সঙ্গে জানাতে হবে জগৎসিংহকে। কিন্তু উনি বুঝতে পারেননি যে, ওঁর উপর এ বার নজর রাখা হয়েছে!

ওঁর পাঠানো লোকটিকে কব্জা করে ফেলে, তার জায়গায় ওই উষ্ণীষ ছেলেটিকে চর সাজিয়ে পাঠানো হয়। আর তাতেই ধরা পড়ে যায় জগৎসিংহ। আর সে-ও জানিয়ে দেয় চিন্তামণির নাম। এতে চিন্তামণির দোষটা আরও জোরালো ভাবে প্রমাণিত হয়।

চিন্তামণি জানেন, উনি যা করেছেন তাতে এক বার ধরা পড়লে ওর মৃত্যু নিশ্চিত। তাই ওঁর বাড়িতে ওঁকে গ্রেফতার করতে আসা শঙ্করকে আচমকা আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়ে উনি বাড়ির খিড়কির দরজায় রাখা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছেন।

নদীর ঘাটে ওঁর নামে সব সময় একটা দ্রুত গতির নৌকা বাঁধা থাকে। সেটায় উঠে পড়তে পারলে অনেকটা সুরক্ষিত থাকবেন উনি।

চিন্তামণি ঘোড়া ছোটাতে লাগল। পিছন থেকে সূর্যকান্ত চিৎকার করছেন। ওঁকে থামতে বলছেন। বলুক। ও সব শুনলে হবে না। ওঁকে যে করেই হোক বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

বাঁ দিকে নদী আর ডান দিকে উঁচু বাঁধ। মাঝের কর্দমাক্ত নদী পাড় দিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছেন চিন্তামণি। ঘাট বেশি দূরে নয়।

আচমকা নদী বাঁধের উপরে আরও ঘোড়া দেখতে পেল ও। দেখল নদী বাঁধের ঢাল বেয়ে ঘোড়ায় চেপে নেমে আসছেন শঙ্কর চক্রবর্তী আর লক্ষ্মীকান্ত।

চিন্তামণি ঘোড়ার মুখ বাঁ দিকে, নদীর ধার বরাবর ঘোরালেন। ওই দেখা যাচ্ছে ওঁর বেঁধে রাখা নৌকা। চিন্তামণি আবার চাবুক তুললেন মারবেন বলে। কিন্তু মারার আগেই হাওয়ায় শিসের শব্দ হল একটা। চিন্তামণি শব্দটা চেনেন। উনি আবার ঘোড়ার মুখ অন্য দিকে নিতে গেলেন, পারলেন না। একটা তির এসে গেঁথে গেল ওঁর চাবুক-ধরা হাতে! সঙ্গে-সঙ্গে আরও কয়েকটা একই রকম শব্দ পাওয়া গেল।

যন্ত্রণায় ছিটকে উঠলেন চিন্তামণি। ওঁর পায়ে, কোমরে আর পিঠে এসে গেঁথে গেছে তির। আর ঘোড়ার উপর বসে থাকতে পারলেন না উনি। গড়িয়ে পড়ে গেলেন কাদা-মাটিতে।

যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে চিন্তামণি দেখলেন বাকি সব ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

সূর্যকান্ত ঘোড়া থেকে নেমে এসে ঝুঁকে পড়লেন ওঁর উপর। তার পর বললেন, "আপনাকে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম আচার্য মশাই। আর সেখানে আপনি এমন করলেন! কেন করলেন? লজ্জা করল না?"

চিন্তামণি চোয়াল শক্ত করে বললেন, "আমিও গুরুত্ব চেয়েছিলাম। আর লজ্জার কিছু নেই। এটা রাজনীতি। ইতিহাসে আমিই এক মাত্র নই যে এমনটা করেছি! আমার আগেও অনেকে এমন করেছে, আমার পরেও অনেকে এমন করবে। ক্ষমতাই জীবনের শেষ কথা। রাজনীতি সেটাই শেখায়। আর রাজনীতিতে সব চলে।"

সুখা পাশ থেকে বলল, "সে যা-ই চলুক আচার্যমশাই, এ বার আপনি চলুন কাপাসবনির জঙ্গলে। শূল অপেক্ষা করছে আপনার। মহারাজ হুকুম দিয়েই রেখেছেন।"

চিন্তামণি যন্ত্রণার মধ্যেও বললেন, "দাভি ছাড়বে না তোমাদের, শেষ করে দেবে।"

এ বার ঘোড়ার উপর থেকে শঙ্কর বললেন, "কে, কাকে শেষ করে সেটা দেখা যাবে।"

॥ ১৯ ॥

মন্ত্রণা সভায়

প্রতাপাদিত্য নিজের সিংহাসনে বসে তাকালেন শঙ্করের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, "চিন্তামণির মৃত্যুদণ্ড কি কার্যকর হয়েছে? আর ওই শয়তান জগৎসিংহ?"

"মহারাজ, চিন্তামণি যা অপরাধ করেছে তার পর আর এক দিনও তার বাঁচার কথা নয়। তাকে কাপাসবনিতে নিয়ে গিয়ে শূলে দেওয়া হয়েছে। এই পৃথিবীতে সে আর নেই! আর জগৎসিংহ ভেবেছিল সে চিন্তামণিকে ধরিয়ে দিলে তার দণ্ড আমরা মাফ করে দেব। কিন্তু আমরা জানি শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই জগৎকেও চিন্তামণির পাশেই শূলে চড়ানো হয়েছে," শঙ্কর বললেন।

প্রতাপাদিত্য ভুরু কুঁচকে মাথা নত করে বসে রইলেন কিছু ক্ষণ। স্বাভাবিক। চিন্তামণিকে উনি আচার্য মনোনীত করেছিলেন। মান্যও করতেন। তিনি যে এমন একটা কাজ করবেন সেটা ভাবতেই পারেননি।

শঙ্কর বললেন, "মহারাজ, আপনি আর মন খারাপ করবেন না। এ বার আমাদের পরবর্তী কাজের সময়।"

প্রতাপাদিত্য মুখ তুলে তাকালেন। তার পর ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করা হবে এ বার! ওদের একটা জাহাজে ওরা মিহিরদের আটকে রেখেছে। বাকি তিনটে জাহাজ ওই জাহাজটাকে পাহারা দিচ্ছে। চিন্তামণিকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে, কিন্তু দাভি! ওই ব্যূহ ভেদ করে মিহিরদের কাছে আমরা পৌঁছব কী করে?"

"কিছু একটা পরিকল্পনা করতে হবে," রডা বলল।

"কী পরিকল্পনা সেটা বলো," প্রতাপাদিত্য এ বার বিরক্ত হলেন, "দ্রুত সত্রাজিৎ বাড়ি না-ফিরলে মুকুন্দরাম যশোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। ভাবতে পারছ, এর ফল কী হতে যাচ্ছে?"

শঙ্কর পাশে বসা মহাময়ের দিকে তাকিয়ে এ বার ইঙ্গিত করলেন।

মহাময় উঠে দাঁড়ালেন এ বার। হাত জোড় করে বললেন, "মহারাজ, আমার কিছু বলার আছে।"

প্রতাপাদিত্য মাথা নাড়লেন। এই লোকটি খুবই বুদ্ধিমান। এঁর কথা শুনেই ওদের মধ্যে থেকে বিশ্বাসঘাতক ধরা পড়েছে। তাই এঁর কথার একটা গুরুত্ব আছে।

মহাময় শান্ত ভাবে কেটে-কেটে বললেন, "আমি মহামন্ত্রী সর্দার শঙ্করের সঙ্গে শলা করেছি। আমাদের মনে হয় দাভিকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে আমরা ওর শর্ত মেনে নিচ্ছি!"

॥ ২০ ॥

দাভির জাহাজে

দাভি হাতের কাগজটা দেখল আবার। ভাঙা গালাটা দেখল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সিলমোহরটা যশোররাজ প্রতাপাদিত্যেরই বটে! এতে কোনও ভুল নেই। চিঠিটা পর্তুগিজ ভাষাতেই লেখা। অবশ্য এটা অস্বাভাবিক কিছু না। প্রতাপাদিত্যের অধীনে বেশ কিছু পর্তুগিজ মানুষ কাজ করে। রডা নামক নৌবাহিনীর প্রধান মানুষটিই তো এর এক উদাহরণ!

সামনে দাঁড়ানো অলফন্সো জিজ্ঞেস করল, "ক্যাপিতেও, খবরটা তা হলে সত্যি?"

দাভি উঠে দাঁড়াল এ বার। মুখে চওড়া হাসি। বলল, "সম্পূর্ণ! তাই চিঠিটা বারবার পড়লাম! আমাদের প্যাঁচ কাজে লেগেছে!"

"তা হলে কবে থেকে?"

"কাল সকাল থেকে আস্তে-আস্তে ওরা পাহারা সরাবে। প্রথমে নদী আর মোহনার থেকে জাহাজ আর নৌকা সরাবে। তার পর নানান দুর্গে নির্দেশ যাবে যাতে আমাদের গতি রোধ না-করা হয়। আর কিছু দিনের মধ্যে মহারাজের ফরমানও এসে যাবে আমাদের নামে যে, আমাদের কার্যকলাপে যেন কেউ বাধা না দেয়!"

দাভি কথাটা শেষ করা মাত্র ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা জলদস্যুরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। হাতে ধরে তরোয়াল আর লাঠি জাহাজের কাঠের পাটাতনে ঠুকে-ঠুকে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। হো-হো শব্দ করতে লাগল।

দাভি হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বলে পাশে রাখা একটা কাঠের বাক্সে উঠে বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "আমাদের যা উদ্দেশ্য, তা এত দিনে সিদ্ধ হয়েছে। আমরা কয়েক দিন সবাই মিলে জোরদার পাহারা দিয়েছি, নজরদারি করেছি। তাতে আমাদের জয় হয়েছে। আজ থেকে আমাদের উৎসব শুরু হবে। আমাদের চারটে জাহাজ আর ছ'টা নৌকায় যারা এত দিন অতন্দ্র পাহারা দিয়েছে, তাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ। সামনে আমাদের অনেক কাজ। প্রচুর গ্রামে আমাদের যেতে হবে। এত দিনে ওরা অনেক সম্পদ জমিয়েছে। সে সব তো আসলে আমাদেরই। তার সঙ্গে দাসব্যবসাতেও মন্দা এসেছিল আমাদের। এ বার সে দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। হুগলি আর মাদ্রাজ শহরে নতুন দাস ব্যবসার কেন্দ্র খুলেছে। সামনে শুধু দাস আর সম্পদের হাতছানি! ফলে অনেক কাজ। তাই কাজে নামার আগে ক'দিন আনন্দ করে নাও সবাই। আজ থেকেই শুরু হোক এই উৎসব।"

"ক্যাপিতেও! ক্যাপিতেও!" ভিড়ের মধ্যে থেকে নাসিমান্তো হাত তুলল, "আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

দাভি মাথা নাড়ল।

"কিন্তু এটা যদি ভুয়ো খবর হয়?" নাসিমান্তো জিজ্ঞেস করল।

দাভি হাসল। তার পর মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করতে-করতে বলল, "আরে, মহারাজের ফরমান না-পেলে আমি ওই দুটোকে ছাড়ব নাকি? তবে এই কাগজ যখন এসেছে, তখন আমরা জিতে গেছি ধরে নেওয়াই যায়।"

সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল আবার।

দাভি বাক্স থেকে নেমে অলফন্সোকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল এ বার। তার পর বলল, "ওই দুটোকে আর দিনে দু'বার নয়, এক বার করে খাবার দেবে! ওদের ছাড়া পর্যন্ত যেমন চাপে রাখা হচ্ছে, সে ভাবেই রাখবে। বুঝেছ? ওরা যেন ফিরে গিয়ে পরে বলে যে, দাভি কতটা নিষ্ঠুর। যেন বলে, আমাদের কোনও কিছু করতেই হাত কাঁপে না!"

অলফন্সো মাথা নাড়ল।

দাভি বলল, "অন্যের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া ভয়টাই আমাদের ব্যবসার মূলধন। সেটা বজায় রাখা খুব দরকার।"

অলফন্সো বলল, "সে ঠিক আছে। ক'দিন খুব দুশ্চিন্তা গেছে, আমরা কিন্তু এখন থেকে টানা চার-পাঁচ দিন আনন্দ করব ক্যাপিতেও! বাকি কিছু ভাবব না!"

দাভি হেসে বলল, "একদম। আমাদের ভাল সময় শুরু হল যে!"

॥ ২১ ॥

প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রণা কক্ষে

সামনের ঘটি থেকে কর্পূর দেওয়া জল খেয়ে গলায় ঝোলানো উত্তরীয় দিয়ে মুখ মুছলেন প্রতাপাদিত্য। লক্ষ্মীকান্ত দেখলেন মহারাজের মুখ-চোখ উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে।

প্রতাপাদিত্য বেশ কিছু দিন হল ঠিক মতো খাওয়াদাওয়া করছেন না। লক্ষ্মীকান্ত জানেন যে, যত ক্ষণ না মিহিরদের ছাড়িয়ে আনা হচ্ছে, তত ক্ষণ মহারাজের মনে শান্তি আসবে না।

এখন দুপুর। আজ কথা ছিল দরবার বসবে। মহারাজ প্রতি সাত দিনে দু'বার করে প্রজাদের সামনে যান, তাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ শোনেন। আর যতটা সম্ভব ততক্ষণাৎ তার প্রতিকার

করেন।

প্রতাপাদিত্য তরুণ বয়সে কিছু কাল আগ্রায় আকবর বাদশার দরবারে ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত শুনেছেন যে, আকবর খুবই পছন্দ করতেন প্রতাপাদিত্যকে। আর এখন সেই আকবরের বিরুদ্ধেই লড়াইয়ে নেমেছেন মহারাজ! জগৎসিংহকে মারার আগে ওর থেকে জানা গেছে যে, মানসিংহ নাকি কাশী পর্যন্ত চলেও এসেছেন!

মানসিংহ এখানে এসে পৌঁছনোর আগে যে করেই হোক মিহিরদের ছাড়িয়ে আনতে হবে। গত পরশু ভূষণায় দূত পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দু'দিনের মধ্যে সত্রাজিৎকে যশোরে নিয়ে আসা হবে। ওঁরা যেন আর-একটু ধৈর্য ধরেন।

তাই আজ দরবার বাতিল করে সবাই মিলে জড়ো হয়েছেন এই মন্ত্রণা কক্ষে।

সে দিন মহাময়ের কথা শুনে প্রতাপাদিত্য যেমন অবাক হয়েছিলেন, তেমন রেগেও গিয়েছিলেন। কী! জলদস্যুদের সব কথা মেনে নিতে হবে!

তখন মহাময় ওঁকে শান্ত করে বলেন যে, পুরো ব্যাপারটাই হবে সাজানো। বলেন, "জলদস্যুদের অন্যমনস্ক করে ওদের প্রতিরক্ষা দুর্বল না-করে দিলে হবে না মহারাজ। তাই এটা মিথ্যে-মিথ্যে জানাতে হবে। তার পর ওরা প্রতিরক্ষায় ঢিল দিলেই এমন একটা কিছু করতে হবে, যা দাভি বা ওর লোকেরা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারবে না।"

তাই মহাময়ের পরামর্শ অনুযায়ী, দাভিদের জানানো হয়েছে যে ওদের সব দাবি মেনে নেওয়া হবে। তার পর কী ভাবে মিহিরদের ছাড়িয়ে আনা যায়, তার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।

মন্ত্রণা কক্ষের মাঝখানে বিশাল বড় এক মেজ। তাতে বিছানো রয়েছে একটা মানচিত্র। মহাময় নিজেই তৈরি করেছেন এটা। রডা আর লক্ষ্মীকান্তর থেকে জেনে নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে কোথায় দাভির চারটে জাহাজ রয়েছে, সেটাও মানচিত্রে দেখানো হয়েছে!

সুবিধে একটাই যে, ওই জায়গার কাছেই একটা ছোট দ্বীপ রয়েছে। যদিও সেখানে এতটাই গভীর জঙ্গল যে, ওই দ্বীপে না আছে প্রতাপাদিত্যের সৈন্য, না আছে জলদস্যুদের কোনও বাহিনী।

মহাময় সেই দ্বীপের ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "মহারাজ, আমি সর্দার শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ করে ইতিমধ্যেই ওই দ্বীপের এক পাশে সুবিধেমতো জায়গায় কিছুটা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছি।"

প্রতাপাদিত্য অবাক হয়ে তাকালেন শঙ্করের দিকে। দেখলেন শঙ্কর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

"কেন? ওটা ছোট্ট একটা দ্বীপ! ওতে কী লাভ হবে?" প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন।

মহাময় বললেন, "আমি এক প্রকার অস্ত্রের গূঢ় কথা জানি, মহারাজ। এখানেই এসেই আমি সর্দারের সঙ্গে পরামর্শ করে সেটা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করিয়েছি! অস্ত্রটা ওই দ্বীপে নিয়েও যাওয়া হয়েছে।"

"অস্ত্র!" প্রতাপাদিত্য আরও অবাক হলেন!

মহাময় বললেন, "এমন অস্ত্র, যা শত্রুকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করে দেবে।"

প্রতাপাদিত্য বললেন, "কিন্তু মিহির আর সত্রাজিৎ ওই জাহাজে বন্দি রয়েছে। জাহাজের কিছু হলে ওরাও বাঁচবে না। তা ছাড়া জাহাজ ধ্বংস তো আমরা কামান দিয়েও করতে পারি। কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হবে না! কামানের গোলা চালালে ওরা তৎক্ষণাৎ মিহিরদের মেরে ফেলবে।"

মহাময় মেজ ঘিরে দাঁড়ানো, শঙ্কর, সূর্যকান্ত, রডা, উদয়াদিত্য, সুখা ও লক্ষ্মীকান্তের দিকে তাকালেন। তার পর বললেন, "আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে শত্রুর মন অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা, যাতে শত্রুশিবিরে হইচই পড়ে যায়!"

"কিন্তু," সূর্যকান্ত বললেন, "সেটা কী করে হবে? কোনও রকম শব্দ হলেই তো দাভি সতর্ক হয়ে যাবে।"

"কাজটা নিঃশব্দে হবে," মহাময় বললেন, "কিন্তু তার আগে আরও একটা কাজ হবে।"

"কী কাজ?" প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন।

মহাময় বলল, "তার আগে উষ্ণীষ জলে সাঁতার কেটে মূল জাহাজের কাছে চলে যাবে। যেহেতু গোটাটাই রাতের অন্ধকারে হবে, তাই কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না কিছু।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান," প্রতাপাদিত্য বললেন, "তার মানে শত্রুদের অন্যমনস্ক করার সুযোগে আপনার ওই ছেলেটি জাহাজে উঠে ওদের ছাড়িয়ে আনবে?"

"হ্যাঁ, ও সেটা করতে সক্ষম!" মহাময় বলল।

"কিন্তু ও একা পারবে? তা ছাড়া বাকি জাহাজ আর নৌকাগুলো থেকে যদি লোকজন চলে আসে!" রডা জিজ্ঞেস করলেন।

"তা পারবে না কেউ। জাহাজ থেকে কেউ নামতেই পারবে না। কারণ আমার অস্ত্র ওদের জাহাজ থেকে জলে নামতে দেবে না," মহাময় শান্ত ভাবে বললেন!

"সে কী রকম অস্ত্র!" সূর্যকান্ত অবাক হলেন, "বলছেন শব্দ হবে না, আবার এমন বস্তু যে, তা জাহাজ থেকে কাউকে জলে নামতেও দেবে না! কী জিনিস ওটা?"

"বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কথা শুনেছেন?" মহাময় জিজ্ঞেস করলেন।

প্রতাপাদিত্য বললেন, "সে তো বহু দূরের এক দেশ। সমুদ্র পার করে যেতে হয়। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য!"

"হ্যাঁ, ওদেরই ব্যবহার করা এক অস্ত্র। সপ্তম শতকে ওরা ওই অস্ত্র ব্যবহার করে আরবদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। এক ইহুদি, নাম কাল্লিনিকোস, এই অস্ত্রটা বানিয়েছিল। সে-ই বাইজেন্টাইন সম্রাটকে এটা দিয়েছিল। খুব কম মানুষ জানে কী সেই অস্ত্র, আর কী করেই বা এটা ব্যবহার করা যায়!"

প্রতাপাদিত্য আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "কী অস্ত্র এটা? কিসের তৈরি?"

মহাময় বললেন, "নাফ্‌ৎ, কলিচুন, সোরা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয় এই জিনিস। এর বেশি আমি বলতে পারব না মহারাজ। আমার গুরুর বারণ আছে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," প্রতাপাদিত্য সামান্য অধৈর্য হলেন যেন, "কিন্তু এটা কী করে?"

"এক আশ্চর্য কাজ করে মহারাজ!" মহাময় বললেন, "এটা জলে আগুন ধরিয়ে দেয়! আর কোনও ভাবেই সেই আগুন নেভানো যায় না।"

"জলে আগুন ধরিয়ে দেয়!" প্রতাপাদিত্য অবাক হয়ে গেলেন, "সেই আগুন নেভে না!"

"না, সাধারণ কোনও ভাবেই নেভে না। শুধু এক ভাবে সেই আগুনকে নেভানো যায়। আমিই জানি সেটা। মহারাজ, আমরা সেই আগুনই জ্বালিয়ে দেব মূল জাহাজ বাদে বাকি তিনটে জাহাজের চার ধারে।"

"কিন্তু জাহাজের কাছে কী ভাবে পৌঁছবে ওই আগুন?" সূর্যকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, "আলো দেখলেই তো ওরা সতর্ক হয়ে যাবে।"

মহাময় বললেন, "এক অদ্ভুত নল তৈরি করেছি। সেই নলের মধ্যে এই তরল ভরা যায় আর তার পর তার মধ্যে চাপ দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত ওই তরল ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই তরলের বৈশিষ্ট্য হল, এটি জল স্পর্শ করা মাত্র জ্বলে ওঠে!"

"মানে ওই রং খেলার পিচকারির মতো? এ তো বহু প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশেই ব্যবহার করা হয়," উদয় এই প্রথম কথা বলল।

"হ্যাঁ যুবরাজ," মহাময় সামান্য হাসলেন, "আমরা তিনটে এমন বড় পিচকারি তৈরি করেছি। তার মাধ্যমে ওই তরল ভরে তিনটে

জাহাজ লক্ষ করে ছুড়ব ওই ছোট্ট দ্বীপের থেকে! আর সেই তরল, জল স্পর্শ করা মাত্র জ্বলে উঠবে। জলে, জাহাজে আগুন লেগে যাবে। সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠবে। চার দিকে হইহই পড়ে যাবে। আর সেই সুযোগে...”

শঙ্কর বললেন, “উষ্ণীষ আসল জাহাজে উঠে পড়বে!”

প্রতাপাদিত্য চোয়াল শক্ত করে বললেন, “আপনি নিশ্চিত, এতে কাজ হবে?”

“কোনও কিছুই সম্পূর্ণ নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না মহারাজ। কিন্তু আপনি বলুন এ ছাড়া আমাদের আর কী উপায় আছে?” মহাময় জিজ্ঞেস করলেন।

প্রতাপাদিত্য দেখলেন সবাই নিঃশব্দে মাথা নেড়ে মহাময়ের কথাকেই সমর্থন করছেন।

প্রতাপাদিত্য আবার ঘটি থেকে কর্পূর দেওয়া জল খেলেন একটু। তার পর বললেন, “ঠিক আছে। আজ সকালে ওই শয়তানগুলোর কাছে বার্তা গেছে। আজ ওরা অসতর্ক থাকবে। তাই আজকে রাতেই যা করার করতে হবে আমাদের। সূর্যকান্ত, তুমি ব্যবস্থা করো।”

উদয় বলল, “মহারাজ, আমিও যেতে চাই!”

প্রতাপাদিত্য তাকালেন উদয়ের দিকে। তার পর বললেন, “নিশ্চয়ই যাবে। আমি চাই মহাময় আচার্য, রডা, সুখা আর তুমি যাও ওই ছেলেটির সঙ্গে।”

রডা বললেন, “আমাদের সঙ্গে কিছু ছোট নৌকা থাকবে। তাতে আমাদের ঢালী সৈন্যরা থাকবে। তা ছাড়া নৌকা আরওই দরকার, কারণ ওর সাহায্যেই আমরা মিহিরদের উদ্ধার করে আনতে পারব।”

প্রতাপাদিত্য সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তা হলে সব ঠিক আছে? আপনারা এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আর দেরি করবেন না। যেতেও তো বেশ কিছু সময় লাগবে।”

সবাই বেরোতে যাবে, তখনই প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, আচার্য মশাই, একটা কথা বলুন। আপনার এই অস্ত্রটার নাম কী?”

মহাময় ফিরে তাকালেন প্রতাপাদিত্যর দিকে। তার পর মৃদু হেসে বললেন, “তরল আগুন। ইংরেজরা তাদের বইয়ে একে বলে ‘গ্রিক ফায়ার’।”

॥ ২২ ॥

প্রাসাদের ছাদে

আজ অমাবস্যা। চার দিক অন্ধকার হয়ে আছে। বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে সামনে ছড়িয়ে থাকা ধূমঘাট নগরের দিকে তাকালেন প্রতাপাদিত্য। দূরে-দূরে রাস্তার পাশে মশালের আলো জ্বলে আছে। বড়-বড় বাড়ি, খাল, ছোট-ছোট সাঁকো, বাগান দিয়ে সমস্ত নগরটা সাজানো। ভাবলে অবাক লাগে, এক সময় এখানে গভীর বন ছিল। অনেক কষ্ট করে ওঁর বাবা বিক্রমাদিত্য ও খুড়োমশাই রাজা বসন্ত রায় এই যশোর রাজ্য তৈরি করেছিলেন। বাবা তো মারা গেছেন আগেই। আর রাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য বশত তিনিও আর এখানে থাকেন না। রাজ্যের ছ’আনা ভাগ নিয়ে রায়গড়ে চলে গেছেন।

প্রতাপাদিত্য তাও একাই সামলে এসেছেন এই রাজত্ব। কিন্তু এত সাধের সেই রাজত্বই আজ এক অদ্ভুত বিপদের মুখোমুখি।

“মহারাজ,” পিছন থেকে শঙ্করের গলার স্বর শোনা গেল।

প্রতাপাদিত্য পিছন ফিরলেন। দেখলেন, হাতে একটা কাচের বাতি নিয়ে শঙ্কর এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশে লক্ষ্মীকান্তও রয়েছেন।

এমন সময় তো শঙ্কর আসেন না। অবশ্য আজ তো সাধারণ দিন নয়। আজ সমুদ্রের বুকে কী যে হবে! হয়তো সেই কারণেই এখানে এসেছেন শঙ্কর। এই মানুষটাকে ছোট থেকে দেখছেন প্রতাপাদিত্য। খুব সাহসী আর বুদ্ধিমান মানুষ। প্রতাপাদিত্য ওঁকে ভরসাও করেন খুব।

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার?”

শঙ্কর বললেন, “সমস্যা দেখা দিয়েছে মহারাজ। সেই লোকেন সাহা লোকটি বণিক শ্রেণিকে খেপিয়ে তুলেছে। বলছে মহারাজ নাকি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ন্যায় বিচার করছেন না। ওর দাসদের যে চুরি করেছে, সেই চোর যুবরাজকে বাঁচিয়েছে বলে মহারাজ নাকি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। লোকেন সাহা বলছে, আর দু’-দিনের মধ্যে এর প্রতিকার না-হলে গোটা ধূমঘাট জুড়ে নাকি সমস্ত বণিক হরতাল করবে। আমি খবর নিয়েছি একটা বড় অংশের ব্যবসায়ীরা ওর পক্ষে। জমিদাররাও আস্তে-আস্তে ওর পক্ষে যাচ্ছে। কেউ-কেউ নাকি তলায়-তলায় মানসিংহের সঙ্গেও যোগাযোগ শুরু করেছে।”

প্রতাপাদিত্য চোয়াল শক্ত করলেন। বললেন, “আমি জানতাম, এটাই হবে। তাই ওই ছোকরাকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলেছিলাম!”

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, “মহারাজ, ছেলেটি কিন্তু অন্যায় করেনি। অত ছোট বাচ্চাদের ধরে যে দাসের মতো খাটায়, সে কি ভাল মানুষ? লোকেন সাহা খুবই খারাপ একটি লোক। আমি নিশ্চিত এমন কিছু না হলেও ও অন্য কিছু নিয়ে ঘোঁট পাকাত!”

ছাদটা বেশ বড়। প্রতাপাদিত্য হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, “ও সব বলে এখন কী হবে। যে সমস্যা হয়েছে, সেটা সামলাতে হবে। তা ছাড়া সত্যি তো কেউ কারও দাস চুরি করলে সেটা গর্হিত অপরাধ। আমার ছেলেকে ওই ছোকরা বাঁচিয়েছে, কিন্তু তাতে তার চুরির দোষ ঢাকে না। বাচ্চা দুটো কোথায় আছে জেনে, তার বাবাকে খবর দিলে সে এসে দাম মিটিয়ে বাচ্চা দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারত। চুরিকে আমি সমর্থন করি না। আমিও চাই উষ্ণীষের শাস্তি হোক। রাজা হলে তাকে রাজার মতো ন্যায়ও করতে হয়। রাজার জীবন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়।”

শঙ্কর বললেন, “মহারাজ, ছেলেটি খুবই সাহসী ও বুদ্ধিমান। মহাময় নিজে তৈরি করেছেন ওকে। এই যে জলদস্যুদের কাছ থেকে মিহিরদের ফিরিয়ে আনতে ওকে বাছা হয়েছে, তার কারণ ছেলেটি অসম্ভব ভাল সাঁতারু। ক্ষুরধার বুদ্ধি। গায়ে খুব জোর। সঙ্গে সুযোদ্ধা। আর শুধু এই কাজেই নয়, ভবিষ্যতেও ও আমাদের নানান কাজে লাগবে। আমি নিশ্চিত লোকেনকে ডেকে ওর সঙ্গে একটা সমঝোতা করা যাবে। লোকটি অর্থপিশাচ! ওর খাজনার একটা ভাগ মুকুব করে দিলেই ও এ সব আর করবে না।”

“আমি পারিতোষিক দিয়ে লোককে চুপ করাব?” প্রতাপাদিত্য রেগে গেলেন এ বার, “আমি রাজা, বেনে নই! আমি জানতাম, এমন কিছু হবে, তাই রডাকে যা বলার বলে দিয়েছি!”

“মানে?” শঙ্কর অবাক হলেন।

“মানে,” প্রতাপাদিত্য পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলেন শঙ্করের দিকে, বললেন, “বলেছি কাজ শেষ হওয়া মাত্র উষ্ণীষকে যেন মেরে ফেলে। তার পর ওর দেহ নিয়ে এসে এখানে আমরা নগরের মধ্যে সবাইকে দেখাব যে, আমি অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দিই না!”

“এটা কী করলেন মহারাজ!” লক্ষ্মীকান্ত আর থাকতে না-পেরে বলে উঠলেন, “এ যে বিশ্বাসঘাতকতা। লোকেন সাহার মতো একটা নীচ লোকের কথায় একটা ভাল, সাহসী ছেলেকে এ ভাবে মেরে দেবেন! বাচ্চা ছেলেমেয়েদের যারা খাটায়, যারা অত্যাচার করে তারা তো অমানুষ। আমার তো মনে হয়, আপনার নিয়ম করে এই দাস ব্যবসা, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের দাস হিসেবে কেনাবেচা করার ব্যাপারটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।”

“কী বললে!” প্রতাপাদিত্য চিৎকার করে উঠলেন, “তোমার এত বড় সাহস, আমার মুখের ওপর কথা বলো!”

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, “মাপ করবেন মহারাজ, আমি আপনার ভৃত্য। আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আমি চাই আপনার সব সময় মঙ্গল হোক। তাই আপনাকে সুপরামর্শ দেওয়াই আমার কাজ। কিন্তু এখন আপনি যা করছেন তা অন্যায়। আমি মানুষ হিসেবে কারও অন্যায়ই মেনে নেব

না। সেই কারণেই...”

“চোপ,” প্রতাপাদিত্য প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠলেন। সেই আওয়াজে রাত্রির ছায়াচ্ছন্ন রাজপ্রাসাদও যেন কেঁপে উঠল!

তিনি বললেন, “তুই এখন আমার মুখে-মুখে কথা বলছিস! এত বড় সাহস! দূর হয়ে যা। বেরিয়ে যা আমার রাজ্য থেকে। না-বেরোলে আমি সান্ত্রী দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দেব। আমি তোকে এক দিন সময় দিলাম। তার মধ্যে সব গুটিয়ে ধূমঘাট ছেড়ে চলে যাবি। না হলে তোকে সবার সামনে নগরের মূল চকে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দেব। আর এক্ষুনি আমি তোর সমস্ত ধনরত্ন বাজেয়াপ্ত করলাম। দরকারি সামগ্রী ছাড়া আর একটা কিচ্ছু নিয়ে যাবি না এখান থেকে। বুঝেছিস? এখন বেরিয়ে যা এখান থেকে। বেরিয়ে যা!”

লক্ষ্মীকান্ত মশালের লালচে-হলুদ আলোয় দেখলেন প্রতাপাদিত্যের ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কপালের শিরাটা দপদপ করছে! উনি জানেন, প্রতাপাদিত্য এক বার রেগে গেলে যা-খুশি-তাই করে ফেলেন। তা ছাড়া এমন করে অপমান করার পরে আর কেনই বা উনি এখানে থাকবেন!

শঙ্কর কিছু বলতে গেলেন। কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত বাধা দিলেন তাঁকে। বললেন, “সর্দার, আপনি দয়া করে কিছু বলবেন না,” তার পর মাথা নত করে প্রণাম জানালেন প্রতাপাদিত্যকে। বললেন, “আপনি সুস্থ থাকুন মহারাজ। মা যশোরেশ্বরীর জয় হোক! মহারাজের জয় হোক! আমি এলাম মহারাজ!”

মশালের আলোর বৃত্তের বাইরে, ছাদের অন্ধকারে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেলেন লক্ষ্মীকান্ত!

॥ ২৩ ॥

সেই রাতে, জাহাজের বন্দিরা

দরজায় শব্দ হল এ বার। মিহির কাঠের মেঝে থেকে উঠে বসল। দেখল সত্রাজিৎ ঘুমোচ্ছে। মিহিরেরও ঘুম পাওয়ার কথা, কিন্তু কানের ব্যথায় ঘুমোতে পারছে না।

ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো বাতির আলোয় মিহির দেখল অলফন্সো ঢুকল দরজা দিয়ে। লোকটা সামান্য টলছে। বাইরে খুব হইচই আর গান বাজনা হচ্ছে। দুমদাম করে বন্দুকও ছুড়ছে কেউ-কেউ। কিসের যে এত ফুর্তি এদের কে জানে!

আগে দিনে দু’বার খাবার দিত। এখন দাভির কথা মতো এক বার করে দিয়েছে। খিদের চোটে গা গোলাচ্ছে মিহিরের।

অলফন্সোর হাতে দুটো মাটির পাত্র। তাতে গলা-গলা কী যেন খাবার। ওদের দিকে সেই পাত্র দুটো মাটিতে ঘষটে এগিয়ে দিল লোকটা। তার পর ময়লা দাঁত বের করে হাসল।

মিহির কিছু না-বলে তাকিয়ে রইল।

অলফন্সো বলল, “তোদের কষ্টের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তোদের ওই রাজা আমাদের সামনে মাথা নত করেছে। আমরা যা চাই, তাই দেবে বলেছে। এবার তার লিখিত ফরমান হাতে এলেই তোদের ছেড়ে দেব। বুঝেছিস? নে, এখন খেয়ে নে।”

অলফন্সো ওকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার পর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেল মিহির। কিন্তু আওয়াজ শুনে ও বুঝল দরজায় কেবল হুড়কো টানা হয়েছে, তালা-চাবি দিতে ভুলে গেছে লোকটা।

কিন্তু মহারাজ এই জলদস্যুদের কথা মেনে নিয়েছেন! সত্যি! এটা আদৌ সম্ভব!

মিহির মাথা নিচু করল। ও যদি মহারাজকে ও তাঁর সঙ্গীদের সঠিক চিনে থাকে, তা হলে জলদস্যুরা কোথাও বড় একটা ভুল করছে। কারণ যে প্রতাপাদিত্য আকবর বাদশাকে তোয়াক্কা করেন না, তিনি কি না দাভি ডি’ক্রুজের কাছে হার মানবেন! এটা হয়?

॥ ২৪ ॥

ঠিক সেই সময়ে, ছোট্ট সেই দ্বীপে

আজ অমাবস্যা। চার দিকে অন্ধকার। তবে চোখ সয়ে যাওয়ায় এখন অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া সমুদ্রের জলের নিজের কেমন যেন একটা আভা থাকে। তাতেও চার পাশ আবছা দেখা যায়।

মহাময় সামনে তাকালেন। ওই দেখা যাচ্ছে চারটে জাহাজ। আলো জ্বলছে সেখানে। মাঝে-মাঝে বন্দুক ছোড়া হচ্ছে শূন্যে। গানও ভেসে আসছে দমকা হাওয়ার সঙ্গে।

চারটে জাহাজের মধ্যে তিনটে জাহাজ ছোট। আর একটা বেশ বড়। সেটাই যে আসল জাহাজ, সেটা রডা বলে দিয়েছেন সবাইকে।

৬টা নৌকাও দেখা যাচ্ছে। তবে তাতে লোকজন নেই। বোঝাই যাচ্ছে যে, খুশির খবর পেয়ে সবাই জাহাজগুলোয় উঠে আনন্দ-উৎসবে মশগুল হয়ে আছে। বিশেষ করে ওই ছোট ৩টে জাহাজেই যেন মূল উৎসব লেগেছে!

মহাময় তাকালেন উষ্ণীষের দিকে। বললেন, “নৌকাগুলোয় যে কেউ নেই, এতে কাজটা কিছুটা হলেও সহজ হয়ে গেল। যা বলেছি মনে আছে তো? ওদের বাঁচাবে, আর নিজেও বাঁচবে। মনে থাকে যেন!”

উষ্ণীষ মাথা নাড়ল। মহাময় যা বলেন, সেটা উষ্ণীষ সব সময় মেনে চলে।

উষ্ণীষ এ বার তাকাল পাশে দাঁড়ানো উদয়াদিত্য ও সুখার দিকে। ওরাও ইশারায় বলল যে, এগিয়ে যেতে একদম প্রস্তুত দু’জনেই।

উষ্ণীষ কোমরে হাত দিয়ে দেখল। মুখ-বন্ধ থলিটা ঠিক আছে। এই থলিতে বালি, পশুর মূত্র ও জারিত ফলের রস ও এক ধরনের অম্লের মিশ্রণ (ভিনিগার) রয়েছে। আর রয়েছে এক বিশেষ ধরনের শিকড়।

উষ্ণীষ এ বার এক হাতে ঢাল আর অন্য হাতে হিঙ্গের কাঠের গোলক ধরে এগিয়ে গেল জলের দিকে।

এই ঢালটা খুব কাজের জিনিস। ঢালিয়ান কচ্ছপের খোলস থেকে এই ঢালগুলো তৈরি। এগুলো দিয়ে যেমন আঘাত আটকানো যায়, তেমনই বুকের তলায় পেতে তার উপর শুয়ে হাত দিয়ে জল কেটে ভেসে-ভেসে এগিয়ে যাওয়াও যায়! যশোর রাজ্যের থেকে এই ঢাল নানান জায়গায় রফতানি করা হয়।

আর হিঙ্গের কাঠ হালকা বলে সহজেই জলের উপর অনেকটা আয়তনে ভেসে থাকে।

জলে নামার আগে ঢালটাকে মাটিতে রেখে উষ্ণীষ কোমরে হাত দিয়ে তরোয়ালটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। তার পর ঢালটাকে জলের উপর পেতে তার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে দু’ হাত দিয়ে নৌকার দাঁড় বাওয়ার মতো করে নিঃশব্দে জল কেটে এগোতে লাগল। ওর পিঠের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে কাঠের গোলকটা! ওর পিছনে উদয়াদিত্য ও সুখাও একই ভাবে এগোতে লাগল।

ওদের সবার পোশাক গাঢ় রঙের। ঢালটাকেও কালো রঙে রং করা হয়েছে। তাই দূর থেকে ওদের দেখা সম্ভব নয়।

মহাময় তিনটে নলাকার বড় পিচকারি তরল ভরে প্রস্তুত করে রাখলেন। রডা পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁরা আছেন দ্বীপের এক ধার ঘেঁষে গাছপালার মধ্যে। তিনটে বড় পিচকারির সঙ্গে চারটে মাঝারি মাপের কামানও আনা হয়েছে। সবই গাছের আড়ালে রাখা আছে এমন করে, যাতে দূরের জাহাজ থেকেও ওগুলো দেখা না-যায়।

হাতে ধরা বালি-ঘড়িটা দেখলেন মহাময়। উপরের অংশটা যখন সম্পূর্ণ খালি হয়ে যাবে, তখন বোঝা যাবে যে উষ্ণীষরা ঠিক জাহাজের কাছে পৌঁছে গেছে। সেই ভাবেই সময় মাপা রয়েছে।

পরিকল্পনা হল এই যে, অন্য তিনটে জাহাজের গায়ে ও আশপাশে ওই তরল-আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। আর সেই সুযোগে উষ্ণীষ একা উঠে যাবে বড় জাহাজে। তার পর জাহাজের বারুদ রাখার জায়গায় গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জাহাজটার ক্ষতি করে দেবে। এই জাহাজে কেউ যদি থাকে, তারাও এর ফলে বিভ্রান্ত হবে, আর সেই সুযোগে রডার বর্ণনা অনুযায়ী ঘরে ঢুকে মিহির আর সত্রাজিৎ দু’জনকে মুক্ত করবে। এখন ওদের দু’জনকে যদি আচ্ছন্ন করে রাখা হয়, তবে ওদের এক রকম শিকড় খাইয়ে হুঁশে ফেরানো হবে। তার পর ওদের জলে নামিয়ে দেবে উষ্ণীষ। আর সেখান থেকে ওদের নিয়ে আসবে উদয়াদিত্য ও সুখা। উষ্ণীষ শেষ পর্যন্ত দেখে তার পর নিজে ফিরে আসবে!

বালি-ঘড়ির দিকে অধীর আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন মহাময়। আর একটু সময়... আর একটু... আর... এই বার!

মহাময় রডার দিকে তাকিয়ে দ্রুত ইঙ্গিত করলেন। রডাও সঙ্গে-সঙ্গে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত সুরে একটা তীক্ষ্ণ শিস দিলেন। সঙ্গের সৈনিকরা আর দেরি না-করে মাটিতে গাঁথা বড় একটা কাঠের সঙ্গে আটকানো বিশাল তিনটে পিচকারির পিছনের দণ্ডটি ধরে প্রচণ্ড জোরে চাপ দিতে-দিতে এগিয়ে গেল। সেই প্রচণ্ড চাপে বিশেষ তরলটি ধনুকের মতো বেঁকে ওই দূরের তিনটে ছোট জাহাজ ও তার সংলগ্ন সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল।

তরলটি জল স্পর্শ করামাত্র দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। আর সেই আগুন কাঠের জাহাজ বেয়ে নিমেষে তিনটে জাহাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

রাতের অন্ধকারের মধ্যে জলদস্যুদের তিনটে জাহাজ দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল!

॥ ২৫ ॥

তখন সমুদ্রের মধ্যে

তিনটে জাহাজ জ্বলছে। মানুষজনের পরিত্রাহী চিৎকার শোনা যাচ্ছে! উষ্ণীষ আর অপেক্ষা করল না। জলের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে উদয়াদিত্য আর সুখাকে বলল, “আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। এই হিঙ্গের গোলকটা আপনারা ধরুন। আমি নোঙরের শিকল বেয়ে উঠে যাচ্ছি। তার পর মিহির আর সত্রাজিৎকে এই পথেই নামিয়ে আনব।”

উদয়াদিত্য বলল, “তুমি একা যাবে? আমি সঙ্গে যাই?”

“না যুবরাজ, আপনার জীবন আমি বিপন্ন হতে দিতে পারি না। আমার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। আর আমি একাই কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি।”

সুখা বলল, “তুমি যাও। আমরা এখানে আছি। দেরি কোরো না। ওরা এখন আগুন নিয়ে প্রচণ্ড অন্যমনস্ক হয়ে আছে। ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন।”

তরোয়াল আর কোমরে বাঁধা থলিটা সামলে নোঙরের মোটা লোহার শিকল বেয়ে দ্রুত জাহাজের উপর উঠে গেল উষ্ণীষ।

জাহাজ প্রায় শুনশান। শুধু এক জন লোক অসহায়ের মতো জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে জ্বলতে থাকা তিনটে জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে!

উষ্ণীষ বড় একটা গুটিয়ে রাখা পালের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসল। দেখল বড় কাঠের ঘরটা থেকে এবার আলুথালু পোশাকে এক জন প্রৌঢ় মানুষ বেরিয়ে এসেছে। লোকটার একটা পা কাঠের। এই তা হলে দাভি ডি’ক্রুজ়!

লোকটা চিৎকার করে পর্তুগিজ় ভাষায় কিছু বলছে। ওরা অন্যমনস্ক এখন। এটাই সুযোগ।

উষ্ণীষ দ্রুত আবছায়ার মধ্যে এগোল। ও জানে না এই জাহাজে ঠিক কত জন লোক রয়েছে। কিন্তু যত জনই থাকুক না কেন, মহাময় ওকে বলে দিয়েছেন, এমন জাহাজে ঠিক কোথায় বারুদ রাখা থাকে।

এ বার সেইখানে যাওয়ার সময় এসেছে। ওই নীচে খোলের মধ্যে নেমে যাওয়ার সিঁড়ি। উষ্ণীষ পাশ থেকে একটা ছোট্ট মশাল তুলে নিল। তার পর নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

॥ ২৬ ॥

তখন, জলদস্যুদের জাহাজে

অলফন্সো বিভ্রান্ত হয়ে তাকাল জ্বলতে থাকা তিনটে জাহাজের দিকে। কী হল এটা? মাঝ সমুদ্রে এমন ভাবে হঠাৎ আগুন লাগল কী করে জাহাজ তিনটেয়! তাও একই সঙ্গে! আর আশপাশের সমুদ্রের জলও যে দাউদাউ করে জ্বলছে! এমন ঘটনা তো ও জীবনে দেখেনি।

অলফন্সো দেখল নিজের ঘর থেকে দাভি হতচকিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এই জাহাজ থেকে অনেকেই ওই তিনটে জাহাজে গেছে আনন্দ করতে। এই জাহাজে এখন মোটে পাঁচ-ছ'জন আছে। তাও জাহাজের খোলে রয়েছে তারা। সেখানেও সব আনন্দে এমন মশগুল যে হয়তো আগুনের ব্যাপারটা জানতেই পারেনি।

তিনটে জাহাজ থেকে লোকজন পরিত্রাহী চিৎকার করছে। বালির বস্তা খুলে আগুনে ঢালছে, কিন্তু কিছুতেই আগুন নেভার নাম নেই! কী যে হল, কিছুতেই বুঝতে পারছে না অলফন্সো।

দাভি সামান্য খুঁড়িয়ে এগিয়ে এল। অলফন্সো দেখল, দাভির মাথায় টুপি নেই। গায়ের জামাও কোনও মতে পরা। এলোমেলো হয়ে আছে লোকটা। আর শুধু তা-ই নয়, চোখে-মুখে আতঙ্কও ফুটে উঠেছে!

দাভি জিজ্ঞেস করল, "এটা কী হল? এমনটা হল কী করে? নাসিমান্তো কই? সিলভা কই? ব্রুনো, ফিলিপ এরা কই?"

অলফন্সো বলল, "ওরা তো মানে... ওই... ওই জাহাজে গেছে আমোদ করতে!"

"আমোদ করতে!" দাভি চিৎকার করে উঠল, "আমি বলেছি আনন্দ করতে, তার মানে কি নিজেদের কাজকম্মো সব ভুলে গিয়ে উন্মাদের মতো মেতে উঠতে হবে? এখনও সব কাজ শেষ হয়নি। ফরমান এখনও এসে পৌঁছয়নি। সে দিকে কারও খেয়াল আছে? সব ওই জাহাজগুলোয় উঠেছে কেন গিয়ে?"

অলফন্সো বলল, "ক্যাপিতেও, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী হল!"

দাভি আরও চিৎকার করল, "এখানে তুমি একা কেন? বাকি কি কেউ নেই?"

"ওই জাহাজের খোলে বসে খাওয়াদাওয়া করছে বাকিরা। আসলে রাতে কী আর হবে ভেবে সবাই... আর আপনিও বললেন আমোদ..." অলফন্সো কী বলবে বুঝতে পারল না।

দাভি চিৎকার করে বলল, "তুমি বন্দিদের কাছে যাও। দেখো ওরা কী করছে! আর ওই জাহাজ থেকে ওরা আসবে কী করে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কী হচ্ছে এ সব!"

অলফন্সো বিভ্রান্ত হয়ে তাকাল জ্বলন্ত তিনটে জাহাজের দিকে। দেখল ওই জাহাজ থেকে কেউ-কেউ জ্বলন্ত অবস্থায় লাফ দিয়ে সমুদ্রে পড়ছে। কিন্তু সেখানেও তো আগুন! অসহায় ভাবে ওই দিকে তাকিয়ে রইল অলফন্সো। দেখল দাভিও নিজের ঘরের দিকে এগোচ্ছে। অলফন্সো বুঝল, ওদের দ্রুত নোঙর তুলে এই জায়গা থেকে পালাতে হবে। কিন্তু তার আগে এক বার দেখে নিতে হবে বন্দিরা ঠিক আছে কি না!

অলফন্সো আর সময় নষ্ট না-করে মিহিরদের ঘরের দিকে এগোল। আর ঠিক তখনই জাহাজের খোলের মধ্যে থেকে প্রচণ্ড জোরে একটা বিস্ফোরণ হল। কাঠ, লোহা সব যেন ফেটে পড়ল! এবং তার ধাক্কায় অলফন্সো ছিটকে পড়ল দূরে। আর একটা ভাঙা কাঠ নিমেষে গেঁথে, এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল ওকে!

শব্দ করে হেঁচকি তুলল অলফন্সো। তার পর চির কালের মতো স্থির হয়ে গেল।

॥ ২৭ ॥

উদ্ধারের মুহূর্তে

বারুদে আগুন লাগিয়ে উষ্ণীষ নিজেকে লুকিয়ে নিয়েছিল বালির বস্তার আড়ালে। সব জাহাজেই এই বালির বস্তা থাকে। কারণ কাঠের জাহাজে আগুন লেগে যেতে পারে যে-কোনও সময়ে।

বিস্ফোরণের অভিঘাতে জাহাজটায় বেশ বড় একটা গর্ত হয়ে গেছে। জাহাজটা এক দিকে কাতও হয়ে গেছে। জল ঢুকে আসছে হু হু করে!

উষ্ণীষ দেখল খোলের মধ্যে বেশ কয়েক জন মৃত জলদস্যু পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। মানে এরা এখানেই বসে ছিল কোনও ঘরে। দেখেই বুঝতে পারছে, এরা আনন্দে মত্ত ছিল।

কিন্তু আর অপেক্ষা করলে হবে না। উষ্ণীষ দ্রুত জাহাজের পাটাতনে উঠে এল। দেখল এক পাশে একটা লোক স্থির হয়ে পড়ে আছে। লোকটার বুকের মধ্যে একটা ভাঙা, সুচালো কাঠ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে। উষ্ণীষ বুঝল কী করে হয়েছে ব্যাপারটা। কিন্তু এ সব দিকে তাকালে হবে না। ও রডার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ছোট কাঠের ঘরটার দিকে এগোল।

দরজাটা বিস্ফোরণে হেলে গেছে। তাও বন্ধ আছে। যদিও শুধু হুড়কো টানা রয়েছে দরজার পাল্লায়। কোনও তালা দেওয়া নেই। উষ্ণীষ সময় নষ্ট না-করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। দেখল কাঠের মেঝেয় শুয়ে রয়েছে দু'জন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে দু'জনে দুর্বল। ভীতও। এক জনের কানে ময়লা কাপড়ের পট্টি লাগানো। এ-ই নিশ্চয়ই মিহির! শুনেছিল, মিহিরের কানের একটা অংশ কাটা হয়েছিল।

"কী হচ্ছে এ সব! এটা কিসের বিস্ফোরণ? জাহাজটা এমন কাত হয়ে গেছে কেন? তুমি কে? আমাদের মারতে চাও!"

এক সঙ্গে অনেক প্রশ্ন ধেয়ে এল উষ্ণীষের দিকে।

উষ্ণীষ বলল, "আমি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাছ থেকে আসছি। আপনাদের ছাড়াতে এসেছি আমি। চলুন," কথাটা বলেই উষ্ণীষ এগিয়ে গিয়ে তরোয়াল দিয়ে মিহির আর সত্রাজিতের হাতের বাঁধন কেটে দিল। তার পর বলল, "আপনারা আমার পিছনে থাকুন।"

মিহির আর সত্রাজিৎ দুর্বল হলেও প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ওর পিছন-পিছন বেরিয়ে এল ঘর থেকে। উষ্ণীষ বুঝল, এদেরকে শিকড়টা খাইয়ে চাঙ্গা করতে হবে না।

জাহাজটা অনেকখানি কাত হয়ে পড়েছে। জল ঢুকে আসছে দ্রুত। একটু দূরের অন্য তিনটে জাহাজ পুড়তে-পুড়তে কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে। এখনও লোকজনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

উষ্ণীষ জাহাজের নোঙরের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, "আপনারা শিকল ধরে নেমে যান দ্রুত। আপনারা আগে নামুন, আমি তার পর নামছি। দেরি করবেন না। যান!"

মিহির এক মুহূর্ত ফিরে তাকাল ওর দিকে। তার পর বলল, "তুমি ভাই, একা কী করে করলে?"

উষ্ণীষ বলল, "আমি এখানে একা, আসলে একা নই। জলে যুবরাজ আর সুখা সর্দার রয়েছেন। ওঁরা আপনাদের নিয়ে যাবেন। দয়া করে যান এ বার। আর দেরি করবেন না।"

মিহির আর সত্রাজিৎ শিকল বেয়ে জলের দিকে নামতে-নামতে দেখল, ওদের দেখে জল থেকে উদয়াদিত্য আর সুখা হাত নেড়ে, চিৎকার করে নিজেদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে।

উষ্ণীষ পিছন ফিরে দেখল এক বার। জাহাজে কেউ নেই। সেই দাভি লোকটা কই! সে-ও কি মারা গিয়েছে?

উষ্ণীষ সামনে তাকাল এ বার, জলের মধ্যে নেমে গেছে মিহির আর সত্রাজিৎ। আশপাশের জ্বলন্ত জাহাজ থেকে আসা আলোয় দেখা যাচ্ছে সব। জল জুড়ে ভাসছে কাঠের জ্বলন্ত টুকরো, ভাঙা মাস্তুল, মৃতদেহ!

উষ্ণীষ চিৎকার করে বলল, "আপনারা এগোন, আমি আসছি!"

উদয় আর সুখা হিঙ্গের কাঠের দুটো গোলক বেঁধে দিল মিহির আর সত্রাজিতের পিঠে। তার পর নিজেরা সাঁতার দিয়ে ওদের টেনে এগোতে লাগল ওই দ্বীপের দিকে। ওরা জানে বেশি দূর এ ভাবে যেতে হবে না, কারণ এ দিকের অবস্থা দেখে রডা দ্রুত গতির বলিয়া নৌকা পাঠিয়ে

দিয়েছেন ইতিমধ্যে।

বেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে উদয়াদিত্যরা। যাক! এ বার আর এই জাহাজ থেকে ওদের কেউ আঘাত করতে পারবে না। উষ্ণীষ ভাবল এ বার ও নামতে পারবে। সেই মতো কোমরে তরোয়াল গুঁজে, সামনে ঝুঁকে পড়ে উষ্ণীষ লোহার শিকলটা ধরল। কিন্তু আর কিছু করার আগেই একটা দড়ির ফাঁস এসে আচমকা জড়িয়ে গেল ওর শরীরে। তার পর এক হ্যাঁচকা টানে কে যেন ওকে ছিটকে ফেলল জাহাজের পাটাতনে।

উষ্ণীষ দেখল, দড়ির অন্য প্রান্তটা ধরে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেই লোকটা। লোকটার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে। বাহুতেও ক্ষত চিহ্ন। কিন্তু তাও লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগুনের আঁচে লোকটার মুখটা যেন জ্বলছে। কাঠের পা-টা একটা ভাঙা বাক্সের কোনায় আটকে কাত হওয়া জাহাজে নিজের ভারসাম্য রাখছে।

উষ্ণীষের লোকটাকে চিনতে অসুবিধে হল না। ও বুঝল হেরে যাওয়ার আগে শেষ লড়াই দিতে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভাটি প্রদেশের ত্রাস, দাভি ডি'ক্রুজ়।

॥ ২৮ ॥

তখন, সেই দ্বীপে

বলিয়া নৌকাটা তীরে আসতেই রডার নির্দেশে সেটাকে টেনে বালুতটের উপরে নিয়ে এল সৈন্যরা। নৌকা থেকে মিহির, সত্রাজিৎ সহ সুখা আর উদয়াদিত্যও নামল। নৌকার দাঁড়ি দু'জন নামল সকলের শেষে।

রডা এগিয়ে এসে মশালের আলোয় ভাল করে দেখলেন মিহির আর সত্রাজিৎকে। নাহ, কানের ওই ক্ষতটা ছাড়া আর কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে দু'জনকেই খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। স্বাভাবিক, যা গেছে ওদের উপর দিয়ে।

রডা এ বার দ্রুত পিছন ঘুরে আবার নিজের জায়গায় এগোল। পিছন-পিছন বাকি সবাই সেই জায়গার দিকে গেল।

ওই দূরে তিনটে জাহাজ জ্বলছে। আর সবচেয়ে বড় জাহাজটা কাত হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে যে আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই ডুবে যাবে!

রডা উদয়াদিত্যকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওই ছেলেটির কী হল?"

"উষ্ণীষ?" উদয়াদিত্য বলল, "ও আমাদের সুরক্ষিত ভাবে এগিয়ে দিয়ে নিজে আটকে পড়েছে জাহাজে। আমাদের এক্ষুনি ওকে উদ্ধার করার জন্য সৈন্য পাঠাতে হবে। না হলে ওই ডুবন্ত, আগুন লেগে যাওয়া জাহাজ থেকে ওকে বাঁচানো যাবে না। আপনি এক্ষুনি নৌকা প্রস্তুত করে ওকে বাঁচানোর বন্দোবস্ত করুন।"

রডা কিছু না-বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"কী হল!" উদয়াদিত্য উত্তেজিত হয়ে বলল, "কী বললাম আপনাকে? সৈন্য পাঠান এক্ষুনি!"

"মাফ করবেন যুবরাজ। আমি তা পারব না," রডা মাথা নামিয়ে নিলেন।

"পারবেন না মানে কী? একটা অল্পবয়সি ছেলে নিজের জীবন বিপন্ন করে এদের বাঁচাল। এর আগে আমাকেও মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছে, আর তাকে এ ভাবে মরতে দেবেন আপনি!" উদয়াদিত্য কী বলবে যেন বুঝতে পারল না।

রডা বললেন, "আমি নিরুপায়। আর এই অবস্থায় আমি..."

রডাকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে উদয়াদিত্য চিৎকার করে উঠলেন, "নিরুপায় মানে? আমি যশোরের যুবরাজ, আমার কথা আপনি শুনতে বাধ্য! আমি হুকুম করছি আপনাকে যে, এক্ষুনি সৈন্য পাঠান। এক্ষুনি।"

রডা বললেন, "আমি সত্যি নিরুপায়। আমার কাছে মহারাজের হুকুম আছে। উষ্ণীষকে মেরে ফেলতে হবে। ওর কাজের শাস্তি দিতে হবে। ওকে জাহাজ থেকে উদ্ধার করে আনতে গেলে ও যা ছেলে, ঠিক পালিয়ে যাবে। তাই ঝুঁকি নিতে পারব না আমি। জাহাজ সমেত ওকে শেষ করে দিতে হবে আমায়। আর এই কাজে যে আমায় বাধা দেবে তাঁকেও আমাকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনি দয়া করে আমাকে বাধা দেবেন না যুবরাজ।"

উদয়াদিত্য অবাক হয়ে কিছু ক্ষণ কথা বলতেই পারল না। তার পর পাশে দাঁড়ানো মহাময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচার্য মহাশয়, আপনি কিছু বলবেন না?"

মহাময় মাথা নামিয়ে নিলেন।

রডা আর সময় নষ্ট না-করে হুকুম দিলেন, "তোপ দিয়ে চারটে জাহাজকেই উড়িয়ে দাও এক্ষুনি! যত ক্ষণ না জাহাজগুলো সম্পূর্ণ ডুবে যাবে, তত ক্ষণ তোপ দাগবে। তার পর সেখান থেকে ওই উষ্ণীষের শরীরটা উদ্ধার করে আমরা ধূমঘাটে নিয়ে যাব। এ বার দাগো কামান। দাগো!"

উদয়াদিত্য অবাক হয়ে দেখল ওর চারটে মাঝারি মাপের কামান রডার নির্দেশ মতো তৈরি করা শুরু হল। ও অসহায়ের মতো তাকাল দূরে ডুবন্ত জাহাজের দিকে। চোখে আচমকা জল এল ওর! বুঝল এখন বড় অসহায় ও। যে ওকে এক দিন বাঁচিয়েছিল, আজ তাকে বাঁচাতে কিছুই করতে পারল না।

কিন্তু এই মৃত্যু-দৃশ্য দেখা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। উদয়াদিত্য সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ২৯ ॥

ডুবন্ত জাহাজে শেষ লড়াই

দাভি জ্বলন্ত চোখ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। উষ্ণীষ দেখল দাভির এক হাতে তরোয়াল আর অন্য হাতে ওকে আটকানো ফাঁসের দড়ির প্রান্ত। ও বুঝল, এখান থেকে জ্যান্ত বেঁচে বেরোনো খুব সহজ কাজ হবে না! এক দিকে জাহাজ ডুবছে আর অন্য দিকে ও দাভির সামনে ফাঁসে আটকে রয়েছে। দাভির সমস্ত দলটাই শেষ হয়ে গেছে। ফলে দাভি এখন আহত বাঘের মতো মরিয়া। উষ্ণীষ জানে, দাভি ওকে ছাড়বে না।

দাভি ফাঁসের দড়ির প্রান্ত ধরে এ বার এক হ্যাঁচকা টান দিতে গেল। কিন্তু উষ্ণীষ তৈরি হয়েই ছিল। তাই তার আগেই ও পাল্টা টান দিল একটা। আর দাভি হুড়মুড় করে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল।

উষ্ণীষ কোমর থেকে দ্রুত তরোয়াল বের করে নিজের ফাঁসের বাঁধনটা কেটে দিল। ও দেখল দাভিও উঠে পড়ল মাটি থেকে, তার পর কোমর থেকে হুইল-লক পিস্তলটা বের করে ওর দিকে তাক করে গুলি চালাল।

উষ্ণীষ দ্রুত মাথা নিচু করল। গুলিটা ওর মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে পিছনে, কাত হয়ে পড়া মাস্তুলে লাগল। একটাই গুলি থাকে এই পিস্তলে। সেটা ফুরিয়ে যাওয়ায় আর উপায় নেই দেখে দাভি হাতের পিস্তলটাই ছুড়ে মারল ওর দিকে। উষ্ণীষ সেটা লুফে নিয়ে নিজের কোমরবন্ধের মধ্যে গুঁজে রাখল।

দাভি এই সময়টুকুর মধ্যে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। তার পর দরজা বন্ধ করতে গেল। ও বুঝল যে, উষ্ণীষের সঙ্গে ও পেরে উঠবে না।

কিন্তু দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করার আগেই উষ্ণীষ লাথি মেরে দরজাটা আবার খুলে দিল। আর সেই ধাক্কায় দাভি ছিটকে পড়ল দূরে রাখা একটা মেজ-এ। আর মেজ-এর উপর থেকে একটা বড় কাঠের বাক্স উল্টে পড়ে গেল কাঠের মেঝেয়।

উষ্ণীষ দেখল সেই বাক্স থেকে সোনাদানা ছিটকে পড়ল ঘরে। আর বেরিয়ে পড়ল আর-একটা বাক্স। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বাক্সটা দামি। রুপোর। গায়ে কী যেন লেখাও রয়েছে।

দাভি উঠে দাঁড়াতে গেল। আর তখনই আবার, জাহাজটা আরও কাত হয়ে গেল আচমকা। দাভি উল্টে পড়ে গেল। উষ্ণীষ নিজেও পড়ে

গেল। দেখল এই ঘরেও এ বার জল ঢুকছে। আর জাহাজটা কাত হয়ে যাওয়ায় ওই রুপোর বাক্সটা ঢাল বেয়ে গড়িয়ে চলে এল ওর কাছে।

দাভি আবার একটা সিন্দুক ধরে উঠে দাঁড়াল। উষ্ণীষ ওই বাক্সটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে তরোয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ও বুঝল এখান থেকে ওদের মধ্যে যে-কেউ এক জন বেঁচে ফিরবে। এ বার এই ভাঙা আর ডুবন্ত জাহাজেই হবে শেষ যুদ্ধ।

দাভি হিংস্র মুখে তাকাল ওর দিকে। তার পর কোনও মতে ওই ঢালু মেঝে বেয়ে এগিয়ে আসতে গেল ওর দিকে। আর ঠিক তখনই দূরে শব্দ হল! তোপ দাগা হচ্ছে! আর একটু পরেই হঠাৎ সমস্ত জাহাজটা থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা লোহার গোলা আছড়ে পড়ল জাহাজে। জাহাজের কাঠের পাটাতন চুরমার হয়ে গেল। কাঠের টুকরো ছিটকে গেল চার দিকে।

উষ্ণীষ পড়ে গেল আবার। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর আগেই আবার পর পর কয়েকটা গোলা এসে আছড়ে পড়ল জাহাজে। একটা গোলা এসে ঢুকল এই ঘরের মধ্যে। আর উষ্ণীষের চোখের সামনেই তার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দাভি!

উষ্ণীষ উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু বড় একটা কাঠের আলমারি এ বার পড়ে গেল ওর উপর। আর ওর নীচে চাপা পড়ে উষ্ণীষ দেখল, সমস্ত জাহাজটা আস্তে-আস্তে তলিয়ে গেল জলের তলায়! আচমকা সমস্ত শব্দ যেন বুজে এল। চার দিক কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। শ্বাস বায়ু ফুরিয়ে এল যেন।

জলের নীচ থেকে উপর দিকে তাকাল উষ্ণীষ। মাথার উপর অতল ঘোলাটে জলরাশি। তাতে আগুনের হলকা। ভাঙা জাহাজের টুকরো ভাসছে। গায়ের উপর আলমারি পড়ে আছে ওর। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

উষ্ণীষ শরীরের মধ্যের শ্বাস বায়ুটুকু প্রাণপণে ধরে রেখে সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলা দিল আলমারিটাকে।

॥ ৩০ ॥

প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদে

প্রতাপাদিত্য নিজের প্রাসাদের দোতলার দালানে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন। কাল সারা রাত ঘুমোতে পারেননি উনি। মিহির আর সত্রাজিৎকে কি মুক্ত করা গেছে? ভূষণার মুকুন্দরাম দুপুরের মধ্যে চলে আসছেন এই আশ্বাস পেয়ে যে, তাঁর ছেলে মুক্ত হয়ে আসছে।

মুকুন্দরামকে আমন্ত্রণ না-জানিয়ে উপায় ছিল না। কারণ তিনি প্রায় আক্রমণ করেই দিতেন, আর এক দিনও দেরি হলে।

কিন্তু মিহির আর সত্রাজিৎ কোথায়? উদয়াদিত্য আর রডাই বা কই! কত বার করে রডাকে বলেছিলেন প্রতাপাদিত্য যে, কাজ হয়ে গেলেই যেন এক জন দূত মারফত খবর পাঠান! এত অস্থির লাগছে!

প্রতাপাদিত্য কাল রাতে কিছু খাননি। সকালেও কেবল একটু শরবত ছাড়া আর কিছু মুখে তোলেননি। এতটাই উদ্বেগ হচ্ছে যে, বলার নয়।

শঙ্কর পাশ থেকে বললেন, "মহারাজ, এত অস্থির হবেন না।"

"কী বলছ তুমি? অস্থির হব না?" প্রতাপাদিত্য শঙ্করের দিকে তাকালেন, "মুকুন্দরাম এসে পড়লেন বলে। আর তার মধ্যে যদি ওরা না এসে পৌঁছয়, তা হলে কী হবে ভাবতে পেরেছ? আর কত মিথ্যে বলে আমি তাঁকে আটকে রাখব? আচ্ছা শঙ্কর, একটা কথা বলো আমায়, মহাময় আচার্য কি আদৌ ভরসার পাত্র?"

"নিশ্চয়ই," শঙ্কর অবাক হলেন, "এ কথা বলছেন কেন?"

"লক্ষ্মীকান্ত কেমন আমার উপর কথা বলল দেখলে তো? তার পরিচিত লোক! তাই জিজ্ঞেস করছি! ওই তরল আগুন না কী, সে সব কাজ করবে কি? আর না-করলে..."

"মহারাজ! মহারাজ!" সূর্যকান্তের গলা পেয়ে প্রতাপাদিত্য থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন বিশাল বড় দালানের অপর প্রান্ত থেকে সূর্যকান্ত প্রায় দৌড়তে-দৌড়েতে আসছেন।

প্রতাপাদিত্য এ বার নিজেই এগিয়ে গেলেন। সূর্যকান্ত দাঁড়িয়ে পড়লেন কাছে এসে। তার পর হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "মিহির, সত্রাজিৎ সহ সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে মহারাজ। এক তলায় আছে সবাই।"

"তাই!" প্রতাপাদিত্য যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তার পর শঙ্করের দিকে ঘুরে হাসলেন উজ্জ্বল ভাবে। আর তাঁকে ইশারা করে হাঁটতে লাগলেন এক তলার বৈঠকখানার দিকে।

নীচের বৈঠকখানায় বসেছিল সবাই। প্রতাপাদিত্য গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই উঠে দাঁড়াল।

প্রতাপাদিত্য কোনও দিকে না-তাকিয়ে সোজা গেলেন মিহির আর সত্রাজিতের কাছে। প্রথমে সত্রাজিৎকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ঠিক আছ তো?"

সত্রাজিৎ দুর্বল হলেও হাসি মুখে বললেন, "আমি ঠিক আছি মহারাজ। কিন্তু মিহিরকে ওরা আহত করেছে।"

পাশ থেকে মিহির বলল, "ওটা কোনও আঘাতই নয়। মহারাজ, আমরা যে ঠিকমতো ফিরতে পেরেছি, সেটাই অনেক। তবে যে ছেলেটি আমাদের বাঁচাল, সেই উষ্ণীষ..."

প্রতাপাদিত্য হাত তুলে মিহিরকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, "উদয় কোথায়?"

রডা এগিয়ে এলেন এ বার। তার পর বললেন, "উনি নিজের প্রাসাদে চলে গেছেন মহারাজ। উদয় খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। আসলে উষ্ণীষকে মেরে দেওয়াটা উনি মানতে পারেননি। আমরা তোপ দেগে সব ক'টা জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছি। উষ্ণীষও সেই একটা জাহাজেই ছিল। মহাময় আচার্যও কষ্ট পেয়েছেন বলেই আর এ দিকে আসেননি। নিজের অতিথিশালায় ফিরে গেছেন। কাল সকালেই শুনলাম উনি চলে যাবেন।"

প্রতাপাদিত্য চুপ করে শুনলেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "উষ্ণীষকে কি তোমরা মারা যেতে দেখেছ?"

রডা বললেন, "না, মানে ওই জাহাজেই তো ছিল... তাই... আমাদের সৈন্যরা তাকে খুঁজছে। ডুবুরিও নামানো হয়েছে জলে। ওর দেহ পেলেই নিয়ে আসবে। তবে দাভির মৃতদেহটা আমি নিয়ে এসেছি।"

প্রতাপাদিত্য বললেন, "তার মানে সে মারা গেছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত নও, তাই তো? দেখো, আমি মানুষ চিনি। উষ্ণীষ সহজে হেরে যাওয়ার ছেলে নয়। তাই আমি চাই চার দিকে যেন চর লাগানো হয়। যদি ও মারা না গিয়ে থাকে, তা হলে যেন ওকে বন্দি করা হয়।"

সুখা বললেন, "মহারাজ, ওকে নিয়ে জাহাজ ডুবে গেছে। আমরা দেখেছি সেই জাহাজের ডুবে যাওয়া।"

প্রতাপাদিত্য হাসলেন, "জীবন বিচিত্র সুখা। মানুষ তার চেয়েও বিচিত্রতর এক প্রাণী। আমি কোনও ফাঁক রাখতে চাই না। যা বললাম করো। সবাই জানুক উষ্ণীষকে আমরা শাস্তিস্বরূপ মেরে ফেলেছি, কিন্তু তলায়-তলায় তোমরা ওর খোঁজ জারি রাখো। কারণ আমার দৃঢ় ধারণা উষ্ণীষ মারা যায়নি!"

সুখা মাথা ঝুঁকিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন।

রডা এ বার জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি কাউকে পাঠাব যুবরাজকে ডেকে আনার জন্য?"

প্রতাপাদিত্য মাথা নাড়লেন। বললেন, "ওকে সময় দাও। উদয় নবীন, এখনও রাজনীতি বোঝে না। আমারও মন ভাল নেই উষ্ণীষের এমন পরিণতিতে। কিন্তু লোকেন সাহা ব্যবসায়ী মহলে খুবই প্রভাবশালী। তাঁকে চটিয়ে কিছু করা মানে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঝামেলা ডেকে আনা। সামনে মানসিংহ আসছে। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের ব্যবসায়ীদের সমর্থন ও অর্থ সাহায্য দরকার। তাই উষ্ণীষকে শাস্তি দিয়ে ওদের কাছে ন্যায় বিচার করা হল, সেটা বোঝানো দরকার ছিল।

আসলে রাজার মুকুটের সোনাটাই সবাই দেখতে পায়, তার ভিতরকার কাঁটার কথা কেউ জানে না। রাজা হিসেবে আমাদের এমন সব সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা মানুষ হিসেবে আমাদের নিজেদেরই ভাল লাগে না। কিন্তু এটাই রাজনীতি। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলি দিতে হয় আমাদের। উদয় নিজে যে দিন রাজা হবে, সে দিন বুঝবে। যাক, তোমরা রাজ্যে ঘোষণা করে দাও যে দাভি ডি'ক্রুজ় মৃত। মিহিররা সুরক্ষিত এবং উষ্ণীষকেও তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সবাই জানুক যশোর রাজের কাছে ব্যক্তি স্বার্থ নয়, জনগণের জন্য ন্যায় বিচারই শেষ কথা।"

॥ ৩১ ॥

লোকেন সাহার বাড়িতে

প্রদীপের আলোটা উস্কে দিয়ে সামনে বসা ছেলেটার দিকে তাকাল লোকেন সাহা। এই ছেলেটা এই নিয়ে দ্বিতীয় বার এল ওর কাছে। ছেলেটা এমন রাতের অন্ধকারেই আসে নিঃশব্দে। তার পর রাতের অন্ধকারেই মিলিয়ে যায়। প্রথম দিন বিশ্বাস না-করলেও আজ ছেলেটা ওকে যে একটা নীলাভ মুক্তো দিয়েছে, তাতে ছেলেটাকে ওর খুব কিছু খারাপ মনে হচ্ছে না!

লোকেন বলল, "আপনার প্রস্তাব ভাল। মুক্তোটি আরও ভাল। কিন্তু সত্যি কি মানসিংহজি এই যশোর দখল করার পরে আমাকে খেলাত আর রাজার উপাধি দেবেন?"

ছেলেটা বলল, "দেখুন, আমার হুজুর বাইরে পাল্কিতে বসে আছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, ওর সঙ্গেই কথা বলুন। চলুন, ওঁর সঙ্গে কথা বলে নেবেন। আমরা জগৎসিংহকে কাজে লাগিয়েছিলাম যশোর রাজকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু উনি ব্যর্থ হলেন। এ বার আপনার কাছে এসেছি। একেই সবাই জানে যে, আপনার বাড়িতে চুরি করেছে যে-চোর, তাকে প্রতাপাদিত্য নিজের স্বার্থে শাস্তি দেননি। আমরা চাই সেটা নিয়ে আপনি আরও ঝামেলা পাকিয়ে তুলুন। হরতাল ডাকুন। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে প্রতাপাদিত্যকে নাজেহাল করে তুলুন। আমরা সেই সুযোগে যশোরে হামলা চালাব।"

লোকেন সাহা কুতকুতে চোখ নিয়ে ছেলেটাকে দেখল। মাথায় পাগড়িটা কপালের উপর নামানো। মুখের অনেকটা কাপড়ে ঢাকা। ছেলেটা পান খাচ্ছে। জড়ানো গলায় কথা বলছে।

ও বলল, "আরে মারা গেছে সেই চোরটা। মহারাজ আজ সবাইকে জানিয়েছেন সেটা। বলেছেন উনিই শাস্তি দিয়েছেন ওই চোরটাকে।"

ছেলেটা হাসল, "আরে সে তো গল্প কথা। চোরকে নাকি শাস্তি দিয়েছে! মৃতদেহ দেখেছে কেউ? আপনি এই দাবি তুলুন যে, মৃতদেহ না-দেখলে বিশ্বাস করছেন না। আর সেই চোরের হয়ে সালিশি করেছিল যে মহামায়, তাকেও শাস্তি দিতে হবে— এই দাবিও তুলুন।"

লোকেন সাহা বলল, "হ্যাঁ, সেটা করা যায়। তবে তার জন্য আমার আলাদা করে দাম লাগবে।"

ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। বলল, "আপনি দয়া করে আমার হুজুরের কাছে এক বার চলুন। উনি বাইরেই পাল্কিতে রয়েছেন। উনি আপনাকে বাকিটা বলে দেবেন। সঙ্গে আর-একটা কী পাথরও দেবেন বলছিলেন।"

আর-একটা পাথর? এমনই দামি নাকি? লোকেনের চোখদুটো লোভে চকচকে করে উঠল। হাতে ধরে থাকা মুক্তোটা আবার দেখল ও। এত দামি পাথর যখন কেউ দেয়, তখন তাকে অবিশ্বাস করে কী করে?

লোকেন উঠল, "চলো যখন বলছ। দেখি, তোমার হুজুর কী বলেন!"

লোকেন সাহা যখন ধূমঘাটে আসে, তখন এই বাড়িটাতেই ওঠে। এখানে একটা কাজের ছেলে ছাড়া আর কেউ থাকে না। রাত হয়েছে বলে ছেলেটি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

লোকেন পাথরটা ট্যাঁকে গুঁজে লোকটির পিছন-পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

গভীর রাত এখন। ধূমঘাটের রাস্তা শুনশান। পথের পাশের মশাল নিভে গিয়েছে। লোকেন জানে রাতে দু'বার চৌকিদার চক্কর দেয় পথে। এই দিকেও আসে। লাঠি ঠকঠক করে জানান দেয় উপস্থিতি। বেশ কিছু ক্ষণ আগে সে এসে জানান দিয়ে গেছে। আবার আসবে শেষ রাতে।

লোকেন বাইরে গিয়ে ছেলেটাকে অনুসরণ করে বাড়ির উল্টো দিকে একটা বড় অশ্বত্থ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা পাল্কির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ছেলেটা এক বার ডাকল, "হুজুর," তার পর পিছিয়ে দাঁড়াল কিছুটা।

পাল্কির মধ্যে থেকে শব্দ এল এ বার। অন্ধকার বলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তাও লোকেন দেখল একটা পা বেরোল পাল্কি থেকে। তার পর লোকটা বেরিয়ে এল। আবছায়ায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। পাল্কির বেহারারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে।

লোকটি হাতের তুড়ি দিয়ে তাদের ইশারা করল। একটি বেহারা পাথর ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে একটা মশাল ধরাল, তার পর আলোটা নিয়ে এগিয়ে এল এ দিকে।

"তু...তু...তু..." লোকেন সাহার কথা আটকে গেল যেন! ওর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

"হাসান!"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে লোকেন পিছন ফিরতে গেল, কিন্তু তার আগেই পিছন থেকে সেই ছেলেটা, মানে হাসান ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকেনের মাথার পিছনে মারল!

সারা পৃথিবী দুলে উঠল যেন! লোকেনের মাথা ঘুরে গেল। আঘাতের যন্ত্রণা মাথা থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ার আগে লোকেন শেষ বারের মতো দেখল, মশালের আলোয় পাল্কির সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে খরচোখে তাকিয়ে রয়েছে উষ্ণীষ।

মাটিতে পড়ে থাকা লোকেনের দিকে তাকাল হাসান। তার পর ঝুঁকে ওর ট্যাঁকের থেকে নীলাভ মুক্তোটা বের করে উষ্ণীষের হাতে দিল।

উষ্ণীষ সেটা কোমরবন্ধের মধ্যে রেখে দিয়ে বলল, "এই শয়তানটাকে লোভ না-দেখালে, এ ভাবে বেরিয়ে আসত না। মহামায় আচার্যর বুদ্ধির কাছে আর কেউ লাগে না।"

হাসান লোকেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "একে নিয়ে কী করব?"

উষ্ণীষ চোয়াল শক্ত করে বলল, "কপালখাঁড়ির নির্জন চরে ওকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে আসবে। ছোট-ছোট বাচ্চাদের কিনে তাদের দাস হিসেবে খাটানো, না? এ বার ওই নির্জন চরে পড়ে থাকুক। ওটা যশোর রাজ্যের বাইরে। ওখানে জলদস্যুদের ভালই আনাগোনা। ওকে যদি জলদস্যুরা ধরে, তা হলে বুঝবে দাস কিনে তাদের দিয়ে খাটানো কতটা অমানুষিক কাজ!"

হাসান ইশারা করল। বেহারারা এসে লোকেনের হাত-পা আর মুখ বেঁধে ফেলল দ্রুত। তার পর পাল্কিতে ঢুকিয়ে দিল।

হাসান তাকাল উষ্ণীষের দিকে। বলল, "বন্ধু, এ বার তুমি কী করবে?"

"আমি?" হাসল উষ্ণীষ, "আমার কাজ তো সবে শুরু হল বন্ধু। সামনে বিশাল এক জীবন পড়ে। তাতে কত দুঃখী, আর্ত মানুষ রয়েছে। তাদের সাহায্য করা, বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কাজ পড়ে রয়েছে যে!"

হাসান হাসল, "যখন আমায় দরকার, খবর দিয়ো।"

"নিশ্চয়ই", উষ্ণীষও হাসল পাল্টা। তার পর হাসানের হাত ধরে, বিদায় নিয়ে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

॥ ৩২ ॥

আড়ালে রয়েছে সে

বেশ কিছু দিন আগে রাজা বসন্ত রায়ের কাছ থেকে পত্র

পেয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্ত। প্রতাপাদিত্য তাঁকে বরখাস্ত করার আগেই রাজা বসন্ত রায় তাঁকে লিখেছিলেন, রায়গড়ে তাঁর রাজধানীতে চলে আসার জন্য। তখন সে প্রস্তাব তিনি নেননি। কিন্তু এখন যশোর ছেড়ে সেই দিকেই চলেছে তাঁর চারটে গরুর গাড়ির সাঁজোয়া। তাতেই বাড়ির লোকজন ও সামান্য মালপত্র রয়েছে।

যদিও লক্ষ্মীকান্তর নিজের গাড়িটি সকলের পিছনে, অন্য গাড়ির থেকে একটু তফাতে চলছে। ওঁর সঙ্গে রয়েছে ওঁর দুই ছেলে গৌরহরি ও রাম রায়।

গৌর জিজ্ঞেস করল, "বাবা, আমরা এত পিছিয়ে রয়েছি কেন?"

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "পিছিয়ে নেই বাবা! কাজ আছে একটা, তাই এই ভাবে যাচ্ছি।"

"কী কাজ বাবা?" ছোট্ট গৌর কৌতূহলী হল।

লক্ষ্মীকান্ত উত্তর না-দিয়ে গাড়োয়ানকে থামাতে বললেন গাড়ি। কারণ উনি সামনের গাছের আড়াল থেকে দেখতে পেয়েছেন সঙ্কেত। আলোর সঙ্কেত।

গাড়ি থামলে লক্ষ্মীকান্ত পাশে রাখা বাঁশিটা তুলে একটা সুর বাজালেন। এটা চিহ্ন। এমনটাই মহাময় বলে দিয়েছিলেন।

এ বার ছোট্ট মশালটা নিয়ে গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এল এক জন।

লক্ষীকান্ত গাড়ি থেকে নামলেন, সঙ্গে গৌরও নামল। রাম এরই মধ্যে ঘুমিয়ে কাদা।

লক্ষ্মীকান্ত ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এসেছ! তুমি বেঁচে আছ? কী করে ওই কালান্তক আগুন থেকে বাঁচলে? আমি তো ভাবতেই পারছি না!"

"মহাময় আচার্যমশাই ওই রাক্ষুসে আগুনের তোড় জানেন। আপনি যখন ওঁকে জানান যে, কাজের শেষে আমায় মেরে ফেলা হবে, তখন উনিই আমায় বলেছিলেন কী করতে হবে। বলেছিলেন ওই প্রলয়ঙ্কর আগুন আর ধ্বংসের সুযোগ নিয়ে আমি যেন নিজেকে বাঁচাই। তাই উনিই আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন এক অদ্ভুত মিশ্রণ। বালি, পশুর মূত্র এবং জারিত ফলের রস ও অম্লের মিশ্রণ দিয়ে তা তৈরি। গায়ে পড়ে যাওয়া আলমারি সরিয়ে জলের উপর থেকে যখন আমি ভেসে উঠি, আমার গায়েও আগুন লেগে গিয়েছিল। আমি দ্রুত একটা কাঠের পাটাতনে উঠে কোমর থেকে ওই মিশ্রণের থলি বের করে সারা গায়ে ঢেলে নিই। তাতেই নিমেষে আগুন নিভে যায়! তার পর আমি সেই পাটাতনের উপর শুয়ে দুই হাতের সাহায্যে জল কেটে দ্বীপে এসে উঠি। সেখান থেকে ধূমঘাটে আসা কোনও শক্ত কাজ নয়! কারণ আমার বন্ধু হাসান, আচার্য মশাইয়ের পরামর্শে সেখানে একটা ছোট্ট নৌকা গোলপাতা দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রেখে এসেছিল।"

"ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে তুমি বেঁচে আছ! মহারাজ এমন করবেন, আমি ভাবতে পারিনি," লক্ষ্মীকান্ত বললেন।

"দেখুন, আমার মহারাজের উপর রাগ নেই। উনি রাজা। রাজাকে অনেক অনভিপ্রেত কাজ করতে হয়। আমি আজ শুধু এসেছি আপনাকে একটা জিনিস দেওয়ার জন্য। শুনেছি যে আমার হয়ে কথা বলতে গিয়ে আপনি সর্বস্ব খুইয়েছেন! তাই এটা আপনার জন্য।" ছেলেটি কাঁধে ঝোলানো থলি থেকে বের করে লক্ষ্মীকান্তের হাতে একটা বাক্স দিল।

"কী এটা?" লক্ষ্মীকান্ত অবাক হলেন।

"বাক্স। রত্নপেটিকা বলতেন পারেন। দেখুন কী লেখা আছে! গায়ে।"

লক্ষ্মীকান্ত দেখলেন লেখা আছে, 'জালাল-উদ্দিন-আকবর'!

লক্ষ্মীকান্ত বললেন, "আরে, এ যে আকবর বাদশার নামের রত্নপেটিকা!"

"এখন এটা আপনার। এটা নিয়ে আপনি নতুন করে সব শুরু করুন। আমি জানি আপনি সৎ মানুষ। আমি জানি আপনি সবার ভাল করবেন। এক দিন আপনি অনেক, অনেক বড় হবেন।"

"আর তুমি? তোমার কী হবে?" লক্ষ্মীকান্ত অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি? আমি তো পথিক! পথেই জীবন কাটবে আমার। তার মধ্যেই আড়ালে থেকে মানুষের জন্য কাজ করব আজীবন। তবে আমার মতো করে।"

লক্ষ্মীকান্ত ছেলেটিকে কী বলবেন, ভেবে পেলেন না। শুধু মাথায় হাত রাখলেন আশীর্বাদের। অকারণেই জল এল চোখে।

ছেলেটি কোমরবন্ধ থেকে এ বার বের করল এক খণ্ড মন্ডা। তার পর গৌরের হাতে দিয়ে বলল, "এটা তোমার জন্য।"

ছোট্ট গৌর মন্ডাটা হাতে নিয়ে উজ্জ্বল মুখে হাসল।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"গৌরহরি গঙ্গোপাধ্যায়। সাবর্ণ গোত্র।"

ছেলেটি হাসল, "আরে, অত বলতে হবে না। নামটুকুই যথেষ্ট। আমি আসি তা হলে। কেমন?"

গৌর হেসে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছে। তবে তার আগে তোমার নামটা বলবে না?"

ছেলেটি বলল, "আমার নাম উষ্ণীষ রায়। এলাম।"

তার পর আর কাউকে কিছু বলতে না-দিয়ে মাটিতে ঘষে নিভিয়ে দিল মশালটা। আর নিজেও ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

লক্ষ্মীকান্ত বাক্সটি দিলেন গৌরের হাতে। তার পর ওই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। বললেন, "তুমি নিরাপদ থাকো, হে পথিক! মা যশোরেশ্বরী তোমায় রক্ষা করুন। সবার মঙ্গল করুন।"

(এই গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যদি বাস্তবের সঙ্গে কোনও মিল থাকে, তা হলে তা আকস্মিক ও অনিচ্ছাকৃত।)

আমার কুইজ়

দীপসুন্দর দিন্দা

প্রশ্ন

১. লেখক হিমানীশ গোস্বামীর ‘অভি-ধানাই পানাই’ গ্রন্থ অনুযায়ী যে শাড়ির বাহারি আঁচল (ধুতির ক্ষেত্রেও) অনেকটা বেশি থাকে, তাকে এক কথায় কী বলে?

২. এটি বাইবেলের দ্বিতীয় বই, যেখানে ইজ়রায়েলিরা মহান যিহোবার শক্তির সাহায্যে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। কী নাম বইটির?

৩. পৃথিবী-বিখ্যাত এই মেডাল বা

পদকগুলো প্রথম ডিজ়াইন করেছিলেন ফ্রান্সের জুলস ক্লেমেন্ট চ্যাপলিন। সেই পদকের শেষতম ডিজ়াইনার জাপানের জুনিচি কাওয়ানিশি। এটি কোন পদক?

৪. পুরুলিয়ার এই জায়গাটির নামকরণ নিয়ে অনেক মত রয়েছে। একটি মত বলে, স্থানীয় মুন্ডা জনজাতির দৌরাত্ম্যের কারণে তাদের ‘বাঘ’ খেতাব দেওয়া হয়। অপর একটি মত বলে, এই জায়গায় পাহাড়ের উপরটা একদম বাঘের মাথার মতো দেখতে। কোন জায়গা?

৫. ভারতের বাইরে, এই দেশেই প্রথম বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। কোন দেশ?

৬. ওড়িয়া সাহিত্যের এই ব্যক্তিকে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের জনক বলা
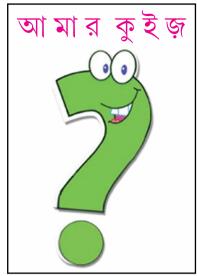
হয়। তাঁর কিছু গ্রন্থ হল ‘ছা মন আট গুন্থ’, ‘মামু’, ‘প্রয়াশিতা’ প্রভৃতি। কী নাম এই লেখকের?

৭. বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে উৎপন্ন হওয়া একটি চা এটি। এক কেজি এই চায়ের দাম প্রায় ষোলো কোটি টাকা। লন্ডন টি এক্সচেঞ্জ নামের একটি সংস্থা এটি প্রস্তুত করে। কী নাম এই চায়ের?

৮. এটি আমাদের শরীরের এক ধরনের ক্রোনোবায়োলজিক্যাল সমস্যা। লম্বা বিমানযাত্রার কারণে এটি দেখা যায়, যার ফলে খিদে, ঘুম অনিয়মিত হয়ে যায়। একে বিজ্ঞানের ভাষায় কী বলে?

৯. সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার এই স্থানে প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে একটি পার্কের উদ্বোধন হল। কোন জায়গায় এটি স্থাপিত হয়েছে?

১০. অসম রাজ্যের ডিমাবাসাও জেলার একটি গ্রাম। বর্ষা কালের শেষে অন্ধকারাচ্ছন্ন কুয়াশার রাতে রহস্যময় ভাবে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি এসে এখানে আত্মহত্যা করে, তাই একে ‘ভ্যালি অফ ডেথ’-ও বলে। কী নাম এই গ্রামের?

১১. ‘জাস্ট সেটিং আপ মাই টুইটার’— ২১ মার্চ ২০০৬ তারিখে করা এই টুইটটির বিশেষত্ব কি?

১২. উত্তর ভারতে প্রচলিত এই বাদ্যযন্ত্র ধনুক দিয়ে বাজানো হয়। মনে করা হয়, শিখদের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ এটির উদ্ভাবক। বাদ্যের গলার অংশটা দেখতে ময়ূরের মতো। এতে ধাতব পর্দা রয়েছে। কী নাম বাদ্যযন্ত্রটির?

১৩. মহারাষ্ট্রের পুনেয় অবস্থিত এক প্রাচীন সৌধ এটি। জনশ্রুতি রয়েছে, এই সৌধে নাকি প্রতি পূর্ণিমার রাতে ঘুরে বেড়ানো তরুণ পেশোয়ার আত্মা বলে, ‘কাকা, মাল ভাচওয়া’— যার বাংলা অর্থ ‘কাকা, আমার প্রাণ বাঁচাও!’ কী নাম এই অভিশপ্ত সৌধের?

১৪. লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলার চন্দনপুর এলাকার এই জায়গায় লোকজনের উপর ব্রিটিশরা প্রবল অত্যাচার করলেও তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ভাষায় বলে উঠেন ‘পিছাবো নি’, যার অর্থ পিছিয়ে যাব না। তার পর এই

শব্দটির নামেই হয়ে যায় জায়গার নাম। কী নাম জায়গাটির?

১৫. ভারতের পঞ্জাবের তৃতীয় জনবহুল শহর এটি। পুরাণে বর্ণিত এক রাক্ষস রাজের নাম থেকে এই শহরের নামকরণ হয়েছে। অন্য মতে এই শহরের নামের অর্থ জলের ভিতরের শহর। কোন শহর?

১৬. বিজ্ঞানী নরম্যান মেয়ার্স প্রথম এর ধারণা দেন। পৃথিবীতে প্রায় ৩৪টি স্থলজ এলাকাকে এই অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যার মধ্যে ভারতের চারটি। পূর্ব হিমালয়, ইন্দো-বার্মা, পশ্চিম ঘাট ও শ্রীলঙ্কা এবং সুন্দা ল্যান্ড। কোন অঞ্চল?

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প ‘গুপ্তধন’-এ একটি সাংকেতিক ছড়া রয়েছে— ‘পায়ে ধরে সাধা/ রা নাহি দেয় রাধা/ শেষে দিল রা/ পাগোল ছাড়ো
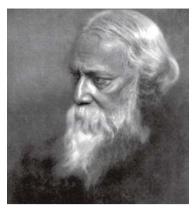
পা/ তেঁতুল বটের কোলে/ দক্ষিণে যাও চলে/ ঈশান কোণে ঈশানী/ কহে দিলাম নিশানী’—এই ছড়ার প্রথম অংশেই লুকোনো যে গ্রামের কাছে গুপ্তধন মিলবে, তার নাম। সেই নামটি কী?

১৮. ইনি এক জন বাঙালি চিত্রশিল্পী। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসো এঁর কাজ খুব পছন্দ করতেন। তাঁর কিছু চিত্র হল তালবীথি, পাইনবন, তুলসী মঞ্চ, তরমুজ রসিক, বাবু। কী নাম এই চিত্রশিল্পীর?

১৯. এটি এক ধরনের কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম হল কোলোকেসিয়া এসুলেন্টা। এর লতি দিয়ে চিংড়ি মাছের পদ ভীষণ সুস্বাদু। কোন গাছের কথা বলা হচ্ছে?

২০. ২০২১ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী চেলসি ফুটবল ক্লাবের অন্যতম ফিটনেস ট্রেনার ইনি। খেলোয়াড়দের মানসিক স্বাস্থ্য দেখাশোনার জন্যও এই ভারতীয় যোগা থেরাপিস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কী নাম তাঁর?

২১. আজ়াদ হিন্দ ফৌজের রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের এক জন গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক এই মহীয়সী নারী। তিনি নেতাজিকে গুলির হাত থেকে রক্ষা করতে ও নিজের স্বামীকে হত্যা করতেও দু’বার ভাবেননি। তাই নেতাজি তাঁর নাম দিয়েছিলেন ‘নাগিন’। কে এই বীরাঙ্গনা?

২২. এই বাঙালি ছিলেন ঊনবিংশ শতকের এক জন সাহিত্যিক ও ম্যাজিস্ট্রেট। মালদহে থাকাকালীন একটি প্রাচীন তাম্রলিপি উদ্ধার করে ইনি বিখ্যাত হন। সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের কারণে তাকে বিদ্যালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কী নাম এই বাঙালির?

২৩. শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত কোন নদীর গতিপথের উপর অবস্থিত?

২৪. অলিম্পিক্সে এক সময় এই খেলাটা অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সুইডেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড বেলজিয়াম সহ অনেক দেশ এই খেলায় পদক লাভ করে। গ্রাম বাংলায় খুব প্রচলিত এই খেলা। কোন খেলা?

২৫. হিমাচল প্রদেশের লাহুল ও স্পিতি জেলার লাহুল অংশের একটি হ্রদ এটি। এর আকৃতি প্রায় অর্ধচন্দ্রাকার। অধিক উচ্চতার কারণে অনেকেই এখানে ট্রেকিং করতে যায়। এটি একটি রামসার সাইট হিসেবেও পরিচিত। কী নাম এই হ্রদের?

২৬. ১৯৩৭ সালে টাইম ম্যাগাজ়িনে প্রথম কোন ভারতীয়কে সবচেয়ে ধনী বলে বর্ণনা করে তাঁর ছবি ছাপা হয়?

২৭. সতীশ রঞ্জন দাশ ছিলেন অবিভক্ত বাংলার অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং বড়লাটের এগজ়িকিউটিভ কাউন্সিলের আইনি সদস্য। তাঁকে ভারত-বিখ্যাত কোন আবাসিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়?

২৮. গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম নথিভুক্ত করা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গাড়ি এটি। প্রায় একশো ফুট লম্বা এই গাড়িতে ছিল সুইমিং পুল, হেলিপ্যাড, ইন্ডোর গেমস, খেলার মাঠ। গাড়িটির নাম কী?

২৯. ১৭৭৩ সালে আমেরিকার বুকে ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের উপনিবেশ থাকাকালীন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমেরিকানরা ব্রিটিশদের জাহাজ ভর্তি চায়ের বাক্স সমুদ্রে ফেলে দিয়ে চা আইনের প্রতিবাদ করেন। এই ঘটনা ইতিহাসে কী নামে পরিচিত?

৩০. খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এশিয়া উপমহাদেশের অঞ্চলগুলোর মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট এশিয়া, ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে যুক্ত করে অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আদানপ্রদান বাড়িয়েছিল এই পথ। পথটি কী নামে পরিচিত?

৩১. গ্যাভরিলো প্রিন্সিপ নামক এই ব্যক্তি বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের দু’জন উত্তরাধিকারীকে গুলি করে হত্যা করলে তার ফলস্বরূপ কোন কুখ্যাত ঘটনার সূত্রপাত হয়?

৩২. প্রাচীন অ্যাজ়টেক সভ্যতার মানুষেরা কোন ভাষায় কথা বলতেন?

৩৩. চোগিয়াল রাজবংশের পতনের পর কোন রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়?

৩৪. ছবি আঁকার একটি পদ্ধতি হল টেম্পোরা। এই পদ্ধতিতে রঙের সঙ্গে আর কোন বিশেষ জিনিস মেশানো হয়?

৩৫. মার্গারেট এলিজ়াবেথ মেগান এলিসন নামে এক জন আমেরিকান চলচ্চিত্র প্রযোজক ও উদ্যোক্তা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নাম রাখেন ভারতীয় উপমহাদেশের এক পর্বতশ্রেণির নামে। এই পর্বতে তিনি ট্রেক করেছিলেন। এটি কোন পর্বত?

৩৬. ‘এডি দ্য ঈগল’ নামের এই ছবিটি কোন ব্রিটিশ স্কি জাম্পারের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত?

৩৭. এটি একটি বাণিজ্যিক পদ্ধতি যা বই শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এটি আগে দশ সংখ্যার থাকলেও এখন তেরো সংখ্যার হয়। অধ্যাপক গর্ডন ফস্টার এটি তৈরি করেন। কী এটি?

৩৮. গুজরাতে জন্মগ্রহণকারী এই মহিলা গান্ধীবাদী নেত্রী ছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় একটি গোপন রেডিয়ো স্টেশন স্থাপন করে ঘোষকের কাজ করতেন তিনি। কী নাম?

৩৯. এই ভারতীয় জাহাজটি ‘টাইটানিক’-এর অনেক আগে, ১৮৮৮ সালে, আরব সাগরের জলে ডুবে গিয়েছিল। এতে প্রায় আটশো জন লোকের সলিল সমাধি হয়। কী ছিল সেই জাহাজের নাম?

৪০. থার্টি এইট প্যারালাল, কোন দুই দেশের সীমান্তবর্তী রেখা?

৪১. গ্রাম বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় এই খেলায় বাড়ির উঠোনে নরম জায়গায় আয়তাকার ঘর কেটে ভাঙা তৈজসপত্রের অংশ দিয়ে শূন্যে এক পা তুলে ঘর পেরিয়ে যেতে হয়। এটি কোন খেলা?

৪২. অ্যান্ড্রু হিউস নামে এক অভিযাত্রী ও তাঁর সহযোগী বন্ধুরা মিলে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে টি পার্টির আয়োজন করে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলেছেন। কোথায় হয়েছে ওই পার্টি?

৪৩. ইনি ছিলেন লোহরা রাজবংশের রানি এবং কাশ্মীরের হিন্দু সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিনিধি। কী নাম এই রানির?

৪৪. সন্তুর একটি বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র। এতে ক’টি তার থাকে?

৪৫. মিলাডা, চেকোস্লোভাকিয়ার এক মহিলা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের গৃহবধূ হয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম কী?

৪৬. হ্যারি পটার সিরিজ়ের এই চরিত্রের নাম এবং সুইৎজ়ারল্যান্ডের একটা গ্রামের নাম এক। কোন চরিত্র?

৪৭. একই শহরের মধ্যে অবস্থিত দু’টি ফুটবল ক্লাবের মধ্যে দ্বৈরথকে ফুটবলের ভাষায় ডার্বি বলে। সে রকম একটি ডার্বি হল নর্থ ওয়েস্ট ডার্বি। এটি কোন দুই ক্লাবের মধ্যে খেলা হয়?

৪৮. ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন কচুরি ও লুচির একটি মজার নাম দিয়েছিলেন। কী সেই নাম?

৪৯. ব্রাজ়িলের রিও ডি জেনিরোয় পর্তুগিজ় ভাষায় দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সংস্কৃত ও হিন্দু বেদান্ত বিষয়ক চর্চা এবং শিক্ষা প্রদান করে চলেছেন এই বিদেশিনী। এ জন্য তিনি ভারতের চতুর্থ অসামরিক পুরস্কার ‘পদ্মশ্রী’-ও পেয়েছেন। কী নাম তাঁর?

৫০. লাদাখের এক পাঠান পরিবারে জন্ম এই ব্যক্তির। ছোট থেকেই প্রচণ্ড সাহসের জন্য তিনি পাহাড়ি এলাকায় অভিযাত্রীদের সঙ্গে গাইডের কাজ করতেন। তাঁর নামেই ভারত ও চিন সীমান্তে অবস্থিত একটি উপত্যকার নামকরণ করা হয়েছে। কী তাঁর নাম?

উত্তর

১. অঞ্চল প্রধান।
২. দ্য বুক অফ এক্সোডাস।
৩. অলিম্পিক পদক।
৪. বাঘমুন্ডি।
৫. শ্রীলঙ্কা।
৬. ফকির মোহন সেনাপতি।
৭. দ্য গোল্ডেন বেঙ্গল।
৮. জেট ল্যাগ।
৯. রাজারহাট নিউটাউন।
১০. জাতিঙ্গা।
১১. এটি পৃথিবীর প্রথম টুইট।
১২. ময়ূরী বীণা।
১৩. শনিবারওয়াড়া।
১৪. পিছাবনি।
১৫. জলন্ধর।
১৬. বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট।
১৭. ধারাগোল।
১৮. পরিতোষ সেন।
১৯. কচু।
২০. বিনয় মেনন।
২১. নীরা আর্য।
২২. উমেশচন্দ্র বটব্যাল।
২৩. কাবেরী নদী।
২৪. কাছি টানাটানি।
২৫. চন্দ্রতাল হ্রদ।
২৬. মীর উসমান আলি।
২৭. দুন স্কুল।
২৮. দ্য আমেরিকান ড্রিম।
২৯. বস্টন টি পার্টি।
৩০. সিল্ক রুট।
৩১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
৩২. নাহুয়াটল।
৩৩. সিকিম।
৩৪. ডিমের কুসুম।
৩৫. অন্নপূর্ণা পর্বতশৃঙ্গ।
৩৬. মাইকেল ডেভিড এডওয়ার্ডস।
৩৭. আইএসবিএন নম্বর।
৩৮. উষা মেহেতা।
৩৯. এসএস বৈতরণী।
(বিজলি নামেও পরিচিত)
৪০. উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়া।
৪১. কিতকিত।
৪২. হিমালয়ের বেসক্যাম্প (২১৩১২ ফুট উচ্চতা)।
৪৩. কোটা রানি।
৪৪. ১০০টি।
৪৫. মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি।
৪৬. গ্রিনডেলওয়াল্ড।
৪৭. ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও লিভারপুল এফ সি।
৪৮. লুচুরি।
৪৯. গ্লোরিয়া আরিয়েরা।
৫০. গোলাম রসুল গালওয়ান

জ্যাঠামশাইয়ের তালা

উল্লাস মল্লিক

জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, "সর্বনাশ!"

শুনে সবাই থমকে দাঁড়ালাম। বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছি। বাড়ির প্রায় কাছাকাছি। পেটের মধ্যে রাধাবল্লভি, ফিশ-ফ্রাই, মাটন, গোলাপজাম, ফুটবল মাঠের দর্শকদের মতো ঠাসাঠাসি করে আছে। বোনের আইসক্রিম এখনও শেষ হয়নি। নিমন্ত্রণ বাড়ি গেলে বোন দুটো কাজ করবেই। এক, জলের বোতলটা সঙ্গে করে নেবে। আর দুই, ফেরার পথে আইসক্রিমটা টুকে-টুকে খাবে। আমার তো হল থেকে বেরোতে না-বেরোতেই আইসক্রিম শেষ। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। প্রথমে ভেবেছিলাম, ওর ভাগ্যে বড় কাপগুলো পড়ে। সেই জন্য পাশাপাশি রেখে মেপেও নিয়েছিলাম এক বার। কিন্তু লাভ হয়নি। সাইজ় একই। সবচেয়ে যন্ত্রণার ব্যাপার, সারাটা পথ আমাকে দেখতে হয়। জ্যাঠামশাই বলেন, "বাবলি মা আমার, স্লো সাইকেল রেসে নামলে চ্যাম্পিয়ন হবে ঠিক।"

যাই হোক, জ্যাঠামশাই 'সর্বনাশ' বলে চুপ করে গেছেন। কিসের সর্বনাশ, কেন সর্বনাশ, কার সর্বনাশ— বিস্তারিত কিছু বলছেন না। বাবা বললেন, "কী হয়েছে দাদা, কার সর্বনাশ!"

জ্যাঠামশাই পাঞ্জাবির পকেট দুটো ভাল করে হাতড়ালেন। তার পর বললেন, "সবার সর্বনাশ, গেটের চাবিটা পাচ্ছি না রে!"

বাবা বললেন, "সে কী, পাচ্ছ না মানে? কোথায় গেল!"

"সেটা জানলে তো হয়েই যেত!"

"কোথায় রেখেছিলে?" বাবা বললেন।

"পাঞ্জাবির পকেটে।"

"ভাল করে দ্যাখো।"

"ভাল করেই তো দেখলাম," জ্যাঠামশাই বললেন, "মনে হয় রাস্তায় কোথাও পড়ে গেছে।"

দিনুজেঠু বললেন, "অত বড় চাবি, পড়ে গেলে টের পাবি না?"

চাবিটা বড়ই বটে। আমি অন্তত আগে অত বড় চাবি দেখিনি। হাতি-মার্কা তালার চাবি। কাল আমি আর বোন বিষ্ণুচকে মেলা দেখতে গেছিলাম জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। জমজমাট মেলা বসে বিষ্ণুচকে। মেলায় ঘুরে-ঘুরে চাউমিন, এগ রোল, জিলিপি খেলাম।

হঠাৎ জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, "ইউরেকা!" আমি অবাক হয়ে জ্যাঠামশাইয়ের দিকে তাকালাম। বিজ্ঞানের কোনও সূত্র আবিষ্কার করলেন নাকি জ্যাঠামশাই! ইদানীং মাঝে-মাঝে মনে হয় জ্যাঠামশাই যেন গভীর কোনও ভাবনায় ডুবে আছেন। নতুন সূত্রটুত্র আবিষ্কার হলেই ঝামেলা! কিছু দিনের মধ্যেই সিলেবাসে ঢুকে যাবে আর আমাদের মুখস্থ করতে হবে। আমি ভেবে দেখেছি, বিজ্ঞানীরা না-জন্মালে বিজ্ঞান এত কঠিন হত না। তাই একটু হতাশ গলাতেই বললাম, "কী হল জেঠু?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "পেয়ে গেছি! মুশকিল আসান। ওই দেখ, হাতি-মার্কা তালা।"

তাকিয়ে দেখলাম, একটা লোক বেশ কিছু বড় তালা নিয়ে বসেছেন। চিৎকার করছেন, "হাতি-মার্কা তালা, হাতিও ফেল করে যাবে। শ্বাসওঠা রুগির ঘরে এ তালা লাগিয়ে দিন, যমও ঢুকতে পারবে না।"

জ্যাঠামশাই এগিয়ে গেলেন তালাওয়ালার দিকে। সঙ্গে আমরাও। তালার উপরে হাতির ছাপ। তালাওয়ালা বললেন, "এই তালার দু'দিকে দুটো হাতি জুড়ে দিলেও ভাঙবে না।"

পাশে মাঝ বয়সি এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, "কিন্তু কী করে বুঝব?"

তালাওয়ালা একটু তাচ্ছিল্যের চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "দুটো হাতি ধরে আনুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ভদ্রলোক বললেন, "হাতি কি প্রজাপতি-ফড়িং, যে বললেই ধরে আনব!"

তালাওয়ালা বললেন, "তা হলে আমার কথা চুপচাপ বিশ্বাস করে নিন।"

জ্যাঠামশাই হাতি-মার্কা তালা কিনলেন একটা। তার পর বললেন, "এ বার সবাই বিয়েবাড়ি যেতে পারব। চোরের সাধ্য নেই এ তালা ভাঙে!"

এই বিয়েবাড়ি যাওয়া নিয়ে ক'দিন বাড়িতে টিভির 'টক-শো'-এর বিতর্ক চলছে। মায়ের পিসিমার বাড়ি বারুইপাড়ায়। আমাদের বাড়ি থেকে হাঁটা পথ। মায়ের পিসতুতো ভাইয়ের বিয়ে। সপরিবারে নিমন্ত্রণ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ক'দিন আগেই পাড়ায় পর পর দুটো চুরি হয়ে গেছে।

প্রথম চুরিটা হল, রাধাকান্ত রায়ের বাড়িতে। একটা দামি রেসিং সাইকেল আর রান্নাঘরের বেশ কিছু বাসন-কোসন গেল। বেশ হইচই পড়ে গেল পাড়ায়। রাধাকান্তবাবুর বাড়ির দুটো বাড়ি পরে আমার বন্ধু ছোটনের বাড়ি। ছোটন পর দিনই একটা কুকুর কিনে আনল। ঝোলা-ঝোলা কান, ঝাঁকড়া লোমওয়ালা লেজ। দেখলেই কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। ছোটন বলল, বিদেশি কুকুর, একটু বড় হলেই এই কুকুর সিংহের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে পারবে। চোরের বাপ-ঠাকুরদা বাড়ির ছায়া মাড়াতে পারবে না। কিন্তু মুশকিল হল, দু'দিন পর ছোটনদের বাড়িতে চোর পড়ল। চোর নাকি তার বাপ-ঠাকুরদা কে এসেছিল জানি না, কিন্তু সে কুকুরটাকেই চুরি করে নিয়ে পালাল!

সেই থেকে গোটা পাড়া আতঙ্কে। কবে না-কবে কার বাড়িতে রাতের অতিথি চলে আসে! এর মধ্যেই এসে গেছে সেই নিমন্ত্রণ। এখন বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়া তো সম্ভব নয়। মা বলেছিলেন, "সবাই যাক, আমি বাড়িতে থাকি।"

কিন্তু সেটা কী করে হয়। বিশেষ করে বিয়েটা যখন মায়ের পিসতুতো ভাইয়ের। সেই ভাই আবার দিদি বলতে আত্মহারা। ব্যাপারটা তা হলে শিবহীন যজ্ঞের কাছাকাছি চলে যাবে। বাবাকে যেতেই হবে কারণ, নতুন বৌ বাবার কলিগের মেয়ে। তিনি বাবাকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন থাকার জন্যে। তা হলে বাকি থাকলেন জ্যাঠামশাই। কিন্তু জ্যাঠামশাই নেমন্তন্নবাড়ি সহজে কামাই দেন না। তবু বাবা বললেন, "দাদা, তুমি থেকে যাও।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "সে কী করে হয়! ছেলের বাবা আমাকে বার বার বলেছেন নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতে! তা ছাড়া কার্ডও তো আমার নামে লেখা। আমি না-গেলে হয়?"

বাবা বললেন, "খুব ভাল কথা, তুমি বিকেল-বিকেল গিয়ে আশীর্বাদ করে চলে এসো। তার পর আমরা বেরোব।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "কিন্তু খাবারদাবার কি তখন রেডি হবে?"

বাবা বললেন, "তুমি তো বললে আশীর্বাদের জন্য যাবে। খাওয়াদাওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন!"

জ্যাঠামশাই বললেন, "অবনী, তোমার বয়সটাই শুধু বেড়েছে, বুদ্ধি এখনও হামা টানছে। আশীর্বাদ করে না-খেলে সেই আশীর্বাদের ঠিক অ্যাকশন হয় না।"

যুক্তি শুনে বাবা কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

জ্যাঠামশাই হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা, দিনুকে বললে কেমন হয়? ওর তো কাজকর্ম নেই! না হয় ক'ঘণ্টা আমাদের বাড়িটা পাহারা দেবে।"

দেখা গেল সে দিন দিনুজেঠুরও একই বাড়িতে নেমন্তন্ন। দিনুজেঠু ঠিক করে রেখেছেন, আমাদের সঙ্গে যাবেন। এই যখন অবস্থা, ঠিক তখনই বিষ্ণুচকের মেলায় জ্যাঠামশাই পেয়ে গেলেন হাতি-মার্কা তালা।

বাবা গেছেন চাবি খুঁজতে। আমরা বসে আছি বাড়ির সামনে ছোট ঘাস-জমিতে। দূরে বড়-বড় গাছের মাথার উপর এক ফালি বাঁকা চাঁদ উঠেছে। সামনের রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে। দু'-এক জন জিজ্ঞেসও করল বাড়ির বাইরে বসে আছি কেন। দিনুজেঠু বললেন, "হাওয়া খাচ্ছি।"

মুশকিল হল, ম্যারেজ হলে যাওয়ার দুটো রাস্তা। আমরা একটা দিয়ে গেছি, ফিরেছি অন্যটা দিয়ে। যাওয়ার রাস্তায় একটা কালীমন্দির পড়ে, ফেরার রাস্তায় শিবমন্দির। যাওয়ার সময় মা কালীকে দশ টাকা প্রণামী দিয়েছেন জেঠু। মেনু যেন জবরদস্ত হয়, বিশেষ করে পাঁঠাটা হয় কচি। আর ফেরার সময় শিবমন্দিরে প্রণামী দিয়েছেন যাতে হজম ভাল হয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "জেঠু, শিব কি হজমের দেবতা?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "সে তো বটেই! ভাল হজম না-হলে কি অত বড় ভুঁড়ি হয়!"

জ্যাঠামশাই বাবাকে বলেছেন, পা-পা করে এগোতে। একটা রাস্তা দিয়ে যাবে, অন্যটা দিয়ে ফিরবে। তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়, প্রতিটা ইঞ্চি যেন ভাল করে দেখে। এমনকি, হলে ঢুকেও একটু তল্লাশি চালায়।

তো বাবা গেছেন তো গেছেন। ফেরার নাম নেই। এ দিকে জ্যাঠামশাই অস্থির হয়ে পড়ছেন। অবনীকে দিয়ে কোনও কাজটাই ভাল ভাবে হওয়ার নয়। একটা চাবি খুঁজতে কত সময় লাগে! চাবি তো আর টাকা-পয়সা নয় যে, রাস্তায় পড়ে থাকলে মানুষ কুড়িয়ে নেবে।

আরও কিছু ক্ষণ গেল। বোনের আইসক্রিম এখনও শেষ হয়নি। জ্যাঠামশাই দিনুজেঠুকে পাঠালেন বাবার খোঁজ করতে।

দীনবন্ধু জেঠুও গেলেন তো গেলেনই, ফেরার নাম নেই। জ্যাঠামশাই তখন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। বললেন, "সব ক'টা অকম্মার ঢেঁকি! এ তো আলপিন নয়, বড় চাবি। খুঁজে পেতে কত ক্ষণ লাগে! আমাকেই যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।"

আমি বলে উঠলাম, "আমিও যাব।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "চল, তা হলে। ভালই হবে। এখন তিনটে জিনিস খুঁজতে

হবে আমাদের। দুটো ধেড়ে মানুষ আর একটা চাবি। চল, ভাগাভাগি করে খুঁজি।"

আমার ভাগে মানুষ খোঁজার দায়িত্ব, জ্যাঠামশাইয়ের চাবি। রাস্তায় লোকজন ভালই। আমি প্রত্যেকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছি। সেটা করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছি, ধাক্কাও লাগছে পথচলতি মানুষের সঙ্গে। এক-এক বার এক-এক জনকে দেখে চমকে উঠছি। ডিটো দিনুজেঠু কিংবা বাবার মতো দেখতে। দু'-এক বার প্রায় ডেকেও ফেলেছিলাম। এই অভিযানে না-বেরোলে জানতেই পারতাম না, এলাকায় বাবা বা দিনুজেঠুর মতো দেখতে এত লোক আছে। এ দিকে চাবি খুঁজতে গিয়ে কত কিছু যে খুঁজে পেলেন জ্যাঠামশাই! মেয়েদের চুলের তিনটে ক্লিপ, একটা গ্যাসলাইটার, দুটো সস্তা পেন, একটা ছুরি, একটা ছোট কাঁচি, হাফ পাতা লাল টিপ, একটা অর্ধেক খরচ হওয়া সুতোর টোটা, স্ক্রু-ড্রাইভার আর খুচরো তেরো টাকা। জ্যাঠামশাই একটা কালো পলিপ্যাকে সব জড়ো করলেন। বললেন পরে ল্যাম্পপোস্টে নোটিস সেঁটে দেবেন, যে-যার জিনিস প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যাবে।

এই ভাবে খুঁজতে-খুঁজতে ম্যারেজ হলের সামনে চলে এলাম আমরা। জ্যাঠামশাই বললেন, "এ বার আসল পরীক্ষা। হলের প্রতিটা আনাচ-কানাচ খুঁজতে হবে। ওয়াচ ডগের মতো হওয়া চাই।"

গেট থেকে শুরু করলাম আমরা। তার পর সিঁড়ি। তার পর হলে ঢুকে পড়লাম এক সময়। নতুন একটা ব্যাচ বসছে। জ্যাঠামশাই বললেন, "চেয়ার-টেবিলের তলাগুলো ভাল করে দেখবি।"

আমি বললাম, "বাবা, দিনুজেঠু চেয়ার-টেবিলের তলায় ঢুকতে যাবে কেন?"

জ্যাঠামশাই খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওহ্, চেয়ার-টেবিলের তলায় ওরা থাকবে কেন? আমি চাবি খুঁজতে বলছি।"

আমি বললাম, "ও, আসলে আমার ভাগে তো মানুষ ছিল।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "এখন মানুষ-ফানুস বাদ দাও। আমাদের দু'জনের লক্ষ্য একই। চাবি। ধরো, তুমি ব্রাজ়িল, আমি আর্জেন্টিনা। দু'জনের টার্গেট একই। বিশ্বকাপ। বুঝেছ?"

বুঝেছি তো বটেই! কিন্তু ব্রাজ়িলে আমার বিরাট আপত্তি। আমার ফেভারিট আর্জেন্টিনা। তাই দল বদলের কথা বলতে গেলাম জ্যাঠামশাইকে। কিন্তু তার আগেই হন্তদন্ত হয়ে এলেন ছেলের বাবা পরেশবাবু। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি। মাথার চুল এলোমেলো। দৃষ্টি বিভ্রান্ত। বোঝাই যাচ্ছে, চাপ সামলাতে পারছেন না।

জ্যাঠামশাইকে দেখেই বলে উঠলেন, "ধরণীধরবাবু, আপনি এখনও খাননি! বাড়ির আর সব কোথায়?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "না মানে, ইয়ে, তারা তো সব বাড়ি চলে গেছে।"

পরেশবাবু বললেন, "বুঝেছি, এক ব্যাচে জায়গা হয়নি। আসলে হলটা একটু ছোট হয়ে গেছে।"

পরেশবাবু এক রকম জোর করেই আমাকে আর জ্যাঠামশাইকে বসিয়ে দিলেন। তার পর জ্যাঠামশাইয়ের হাত থেকে কালো পলিপ্যাকটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, "আপনি আবার এসব উপহারটুপহার আনতে গেলেন কেন! আপনি এসেছেন, এটাই আমাদের কাছে অনেক! চেয়েচিন্তে নেবেন কিন্তু নিজের মনে করে।"

জ্যাঠামশাইকে কিছু বলতে না-দিয়ে পরেশবাবু মিশে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। জ্যাঠামশাই বললেন, "কী রে, খেতে পারবি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই কখন খেয়েছি, খিদে লেগে গেছে।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "আমারও, কতটা হেঁটেছি বল!"

দ্বিতীয় বারের খাওয়াদাওয়া ভালই হয়েছে। একটু দুশ্চিন্তা নিয়ে খাচ্ছিলাম অবশ্য। কালো পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে যদি কেউ উঁকি দিয়ে দেয় তো খেল খতম। যাই হোক, তেমন কিছু ঘটেনি। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে এলাম। এ রাস্তাতেও চাবির টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। তবে একটা নস্যির কৌটো পেলাম। ফিরে এসে দেখলাম, বাবা আর দিনুজেঠু পৌঁছে গেছে। ওঁরা নাকি যখন চাবির খোঁজে হলের ভিতর ঘোরাঘুরি করছিল, ওঁদেরও ধরে খেতে বসিয়ে দিয়েছেন গৃহকর্তা। শুনে বোন বলল, "মা, চলো না, আমরাও চাবি খুঁজতে যাই।"

মা ধমক দিয়ে বললেন, "তোমার আইসক্রিম এখনও শেষ হল না, আবার চাবি খুঁজতে যাবে!"

জ্যাঠামশাই হঠাৎ বলে উঠলেন, "আচ্ছা, একটা কাজ করা যায় না?"

দিনুজেঠু বললেন, "কী?"

"পর পর দু'বার বিয়েবাড়ি খেয়ে গায়ে যেন হাতির বল পেয়েছি। তোমাদেরও নিশ্চয়ই তাই? এসো, তালাটা ধরে তিন জনে টান দিই।"

দিনুজেঠু বললেন, "কিন্তু এ তো দড়ি নয়, তালা! তিন জনে ধরব কী করে!"

জ্যাঠামশাই বললেন, "বুদ্ধি থাকলেই উপায় হয়। এক জন প্রথমে তালা ধরবে, তার কোমর ধরবে এক জন, তার কোমর ধরবে আর এক জন। তার পর এক সঙ্গে হেঁইয়ো মার..."

দিনুজেঠু বললেন, "যুক্তি মন্দ নয়। আমি প্রথম তালা ধরব।"

বাবা বললেন, "ভগবান, আর কী লেখা আছে কপালে?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "অবনী, ধৈর্য এত কম হলে হয় না। জীবনে কিছু করতে গেলে ধৈর্য চাই। তোমার কি গাছতলায় রাত কাটানোর ইচ্ছে! নাও, লাইনটা আগে করে ফেলো। তার পর আমরা রেলগাড়ির মতো একটু-একটু করে এগিয়ে যাব দরজার দিকে।"

দু'বার খেয়ে আমিও শরীরে হাতির না-হলেও, ষাঁড়ের শক্তি টের পাচ্ছিলাম। ফলে রেলগাড়ির শেষ বগি হওয়ার আবেদন পেশ করলাম বড়দের কাছে। কিন্তু পত্রপাঠ নাকচ হয়ে গেল।

রেলগাড়ি একটু-একটু করে এগোতে লাগল দরজার দিকে। ইঞ্জিন দিনুজেঠু, দুটো বগি—জ্যাঠামশাই আর বাবা। বগি হতে না-পারার দুঃখ ভুলতে আমি মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে লাগলাম, "কু-ঝিক-ঝিক-কু-উ-উ-উ..."

কয়েক পা এগিয়েই রেলগাড়ি থেমে গেল। ইঞ্জিনের দাবি, প্রথম বগি তাকে কাতুকুতু দিচ্ছে। এ দিকে প্রথম বগির দাবি দ্বিতীয় বগি তাকে চিমটি কাটছে। যাই হোক, গাড়িকে গন্তব্যে পৌঁছতেই হবে। তাই ঝগড়া মিটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল রেলগাড়ি।

রেলগাড়ি থামল দরজার সামনে। দিনুজেঠু তালায় হাত দিয়েই বলে উঠলেন, "এ কী রে ধরণী, কী কাণ্ড করেছিস! তুই তো চাবিই দিসনি! চাবি তো লাগানো আছে তালায়।"

বাবা বললেন, "সত্যি তো, দ্যাখো কাণ্ড!"

মা এগিয়ে এসে বললেন, "ওমা, তাই তো!"

দিনুজেঠু বললেন, "ধরণীর ওই রকম কাজ-কারবার! ভাগ্যিস চুরিটুরি হয়ে যায়নি।"

জ্যাঠামশাই খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "দিনু, কবে তোর বুদ্ধি পাকবে! এ হল হাতি-মার্কা তালা। ঝোলানো থাকলেই যথেষ্ট। চোর ঘেঁষবে না। চাবি দেওয়া থাক বা না থাক!"

আর কিছু না-বলে জ্যাঠামশাই গটগট করে ঢুকে গেলেন বাড়ির ভিতর।

ছবি: *প্রসেনজিৎ নাথ*

ভেলোসির‍্যাপ্টরকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেছে প্রোটোসেরাটপ্স

ছবি: সমরজিৎ রজক
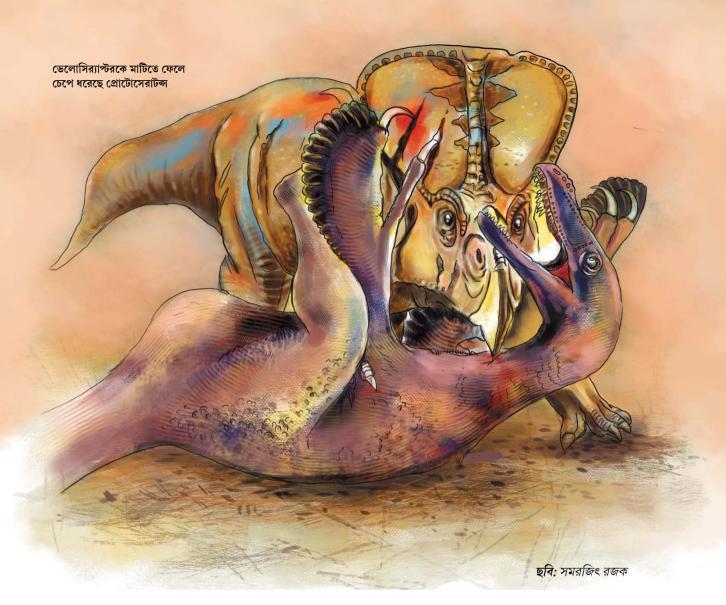
জীবাশ্মে টাইম ট্র্যাভেল

পাথরের খাঁজে-ভাঁজে লুকিয়ে থাকা কিছু জীবাশ্মে ধরা আছে অতীতের অদ্ভুত মুহূর্ত।

অচ্যুত দাস

মাংসাশী ডায়নোসর। নাম তার ভেলোসির‍্যাপ্টর। অতর্কিতে সে হামলা করেছে তৃণভোজী ডায়নোসর প্রোটোসেরাটপ্স-কে। দু'জনের মধ্যে প্রোটোসেরাটপ্সের চেহারাই তুলনায় বড়। হামলাকারীকে তাই সে চেপে ধরেছে মাটির উপর। ভেলোসির‍্যাপ্টরও কিন্তু হার মানার পাত্র নয়। প্রোটোসেরাটপ্স যতই কামড়ে তার হাত ভেঙে দিক, সে-ও পাল্টা নিজের নখ বসিয়ে দিয়েছে আক্রমণকারীর মাথায়। ঠিক এই মুহূর্তের দৃশ্যটার কেউ যেন ফটো তুলে রেখেছে। যে ফটো পুরনো আট কোটি বছরের! যে দৃশ্যেরই পুনর্নির্মাণ তোমরা দেখছ, এই লেখার শুরুতেই।

সে তো ফটোর মতোই

এক রকম ভাবে ভেবে দেখলে, জীবাশ্ম তো ফটোর মতোই। পাথরের ভাঁজে-খাঁজে লুকিয়ে থাকা জীবাশ্ম আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে পৃথিবীর অতীতের খণ্ডদৃশ্য। খুঁজতে-খুঁজতে দৈবাৎ এমন জীবাশ্মও মেলে, যাতে ধরা আছে খুব চাঞ্চল্যকর অতীত-মুহূর্ত। চিনের পড়শি দেশ মঙ্গোলিয়ায় আজ যেখানে গোবি মরুভূমি, আট কোটি বছর আগে সেখানেই ছিল ঘন বনজঙ্গল। নদীনালা।

জলাশয়। ডায়নোসরদের সে ছিল স্বর্গরাজ্য। একটু আগে উল্লেখ করা অদ্ভুত ওই জীবাশ্মটা ওখানেই পাওয়া গেছিল, ১৯৭১ সালে।

ভাবাচ্ছে যে প্রশ্নটা

তখন থেকেই যে প্রশ্নটা বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে— ওই জীবাশ্মের ওই দু'জন ওই অবস্থায় হঠাৎ অক্কা পেল কী ভাবে? কারও মতে, মারামারি করতে-করতে ওরা পড়ে গেছিল জলাশয়ে, যার তলার চোরাবালি ওদের ওই অবস্থাতেই গ্রাস করে। কেউ বলেন, আচমকা ধেয়ে আসা ভয়ানক ধুলোর ঝড়ে যুদ্ধরত অবস্থাতেই ওদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। কারও আবার মত, ভেলোসির‍্যাপ্টরের আঁচড়ে রক্তাক্ত প্রোটোসেরাটপ্স অত্যধিক রক্ত ক্ষরণে মারা যায় আর তার বিশাল শরীরের তলায় চাপা পড়ে মরে মারাত্মক আহত ভেলোসির‍্যাপ্টরও। এমন আশ্চর্য জীবাশ্ম, যা সাক্ষ্য দেয় সুদূর অতীতের অদ্ভুত মুহূর্তের— নিশ্চয়ই এই একটিই নেই?

অনন্ত অপেক্ষা

সে এক রকম বোলতা। পড়বি তো পড়, মাকড়সার জালে! একটা ছোকরা মাকড়সা জাল বেয়ে ছুটে আসছে তাকে ধরে খাবে বলে। ঠিক এই সময় গাছের গায়ের একটা ক্ষত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল গাছের বর্জ্য পদার্থ, রজন। ইংরেজিতে রেজ়িন। থকথকে জেলির মতো জবরদস্ত সেই প্রাকৃতিক আঠা রেজ়িনে ডুবে তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে যেতে হল শিকার ও শিকারি, উভয়কেই। জালে আটকানো বোলতার বিস্ফারিত খোলা চোখের সামনে নট নড়নচড়ন হয়ে হতভাগ্য ওই মাকড়সাটা অন্তহীন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে আজ ১০ কোটি বছর। এই মুহূর্তটা ধরা আছে একটা জীবাশ্মে (পাশেই তার ফটো), যা পাওয়া গেছিল মায়ানমারের এক খনিতে।

ফটো : ফ্লিকর

জলে জন্ম, না ডাঙায়?

ইকথায়োসর নামে একটা প্রাগৈতিহাসিক জলচর সরীসৃপের এমন অনেক জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যেখানে তারা বাচ্চাকে জন্ম দেওয়ার সময় মারা গেছে। এমন অনেক জীবাশ্মেই জন্মের সময় মায়ের পেট থেকে বাচ্চাগুলোর লেজ আগে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। যা থেকে বোঝা যায় যে, বাচ্চাগুলো জন্মাত জলে। কিন্তু ইকথায়োসরেরই একটা খুব পুরনো জীবাশ্মে দেখা যাচ্ছে, ডাঙায় সন্তানের জন্ম দিচ্ছে সে। এই জীবাশ্মে সন্তানের জন্মের সময় মায়ের পেট থেকে আগে তার মাথা বাইরে বেরিয়ে আসছে। তার মানে, কালক্রমে জলচর হয়ে ওঠার আগে ইকথায়োসর নামের ওই ভয়ানক দৈত্য একদা ডাঙাতেও থেকেছে! সেই ভয়াবহ সময়ে আমরা যে ডাঙার বাসিন্দা ছিলাম না, উফ কী ভাগ্যিস!

পনেরোটা ছানা

গোবি মরুভূমির প্রোটোসেরাটপ্সের কথা বলছিলাম শুরুতে। ওই মরুভূমিতেই প্রোটোসেরাটপ্সের একটা বাসার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যেখানে ৭ কোটি বছর আগে পাশাপাশি শুয়ে ছিল পনেরোটা খুদে প্রোটোসেরাপ্টর ছানা। তখনই হয়তো উঠেছিল বালির ঝড়! বালির পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে ছানাগুলো সেই যে ঘুমোল, সে ঘুম আর ভাঙেনি এত বছরেও।

শেষের সে দিন

শেষ করব উত্তর আমেরিকার নর্থ ডাকোটা প্রদেশের টানিস নামের একটা জায়গার কথা বলে। সেখান থেকে অনেকটাই দূরে, উত্তর আমেরিকার ল্যাজের দিকটায়, সেই উল্কাটা পড়েছিল, যার জেরে ডায়নোসররা বিলুপ্ত হয়। দূর টানিসেও সেই প্রলয়ের আঁচ এসেছিল নিশ্চয়ই, কারণ জলচর ও ডাঙার প্রাণীর জীবাশ্ম টানিসে এক সঙ্গে এত পাওয়া গেছে যে বোঝাই যায়, কোনও একটা বিপর্যয়ের জেরে নদীর জল ডাঙায় ঢুকেই সকলের মৃত্যু হয়েছিল। টানিসে এক ডায়নোসরের বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া অথচ প্রায় অক্ষত পা কিংবা ছাইভস্ম মাখা মাছেদের মৃতদেহ — সকলেই, হিসেব করে দেখা গেছে, ঠিক ডায়নোসরদের সংহারক ওই উল্কাপাতের সময়ের। ওই জীবাশ্ম-রাশি আজও প্রমাণ দিচ্ছে, এভারেস্ট পাহাড়ের চেয়েও উঁচু উল্কাটা ডায়নোসরদের মৃত্যু হয়ে নেমে এসেছিল সত্যিই। এসেছিল প্রায় ছ'কোটি ষাট লক্ষ বছর আগে।
কী ভাগ্যিস এসেছিল! নইলে আমরা এ লেখা পড়তে, এ সব জানতেই পেতাম কি?

হলুদ পুতুলের রহস্য

বিপুল দাস

হঠাৎ কানে এল, "দাদা, বাঁ দিকে কর্নারে মার।"

মাঠ ভর্তি মানুষ আজ। তনুর পায়ে বল পড়লেই আকাশ কাঁপানো চিৎকার উঠছে। মাঠে আজ তরুণ তীর্থের সাপোর্টার বেশি। ঘরের মাঠে ফাইনাল খেলা। পাড়া উজাড় করে লোক এসেছে। সবাই জানে তনুময় আজ গোল করবেই। বলতে গেলে তনু একাই তরুণ তীর্থকে ফাইনালে তুলেছে। তনু আজ খুব সাবধানে খেলছে। কোচ বিজনদা বারে বারে বলে দিয়েছে নিজেকে সামলে খেলতে। ওরা নাকি আজ ঠিক করেছে প্রথমেই তনুকে প্রচণ্ড চার্জ করে অকেজো করে দেবে। তনু বসে গেলে ওদের ট্রফি নেওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। ইতিমধ্যেই তনুকে বাজে ভাবে ফাউল করার জন্য দুটো ফ্রি-কিক পেয়েছে ওরা। কিন্তু ওদের ডিফেন্স ভেদ করা যায়নি। দুটো ফ্রি-কিকই আটকে দিয়েছে ওরা। একটা তো একটুর জন্য পেনাল্টি বক্সের বাইরে হয়েছে। নইলে নিশ্চিত পেনাল্টি পেত ওরা। আর সবাই জানে তনুময় সরকারের পেনাল্টি শট স্বয়ং লেভ ইয়াসিনও আটকাতে পারবে না।

তনু জানে এটা ভাইয়ের গলা। মাঠের এত দর্শকের চিৎকারের ভিতরেও ভাইয়ের গলার আওয়াজ ঠিক চিনতে পারল তনু। জানে এত লোকের মাঝে ভাই কোথাও নেই। তবু কানের পাশে কে যেন ফিসফিস করে বলল, "দাদা, বাঁ দিকে কর্নারে মার।"

তনু নিশ্চিন্তে বল ভাসিয়ে দিল বাঁ দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে পজ়িশন বদল করল নীহারের সঙ্গে। ও দিকে বাঁ দিকের কর্নারে নিখুঁত ভাবে বল রিসিভ করে পেনাল্টি বক্সের সামনে

বল ফেলেছে সাজ্জাদ। একদম হিসেব কষা পাস তনুর পায়ে এসে পড়েছে। ওদের দু'জন তাগড়াই ডিফেন্ডার এত ক্ষণে বিপদ বুঝতে পেরেছে। আসলে তনু আর নীহার এত দ্রুত জায়গা বদল করবে, ওরা ভাবতেই পারেনি। ওরা প্রায় সবাই মিলে তনুকে পাহারা দিতে গিয়ে সাজ্জাদ বা নীহারের দিকে অত খেয়াল রাখেনি। ওদের ডিফেন্ডার দু'জন তনুর পা লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি। পেনাল্টি হয় হোক, বল নয়, ওদের লক্ষ্য তনুময়ের পা। মুহূর্তে প্রায় তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরল তনু। একটু পিছিয়ে এসে ছোট্ট টোকায় বল তুলে দিল অরক্ষিত সাজ্জাদের পায়ে। সাজ্জাদের বাঁ পায়ের গোলার মতো শট ঢুকে গেল প্রগতি সঙ্ঘের জালে। আকাশ ফাটানো চিৎকার উঠল, "গো-ও-ও-ল।"

আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল সেই শব্দে। গাছের পাতা নড়ে উঠল। তারাও তো তরুণ তীর্থের সাপোর্টার। ওরা রোজ দেখে এই ছেলেগুলোর ঘাম-ঝরানো প্র্যাকটিস। আনন্দে যেন ওরাও কেঁপে উঠে বলছে, 'গো-ও-ও-ল'। যারা মাঠে আসেনি, যারা ঘরে শুয়ে-বসে ছিল, ভোলার মোড়ের লোকজন, সবাই বুঝতে পারল, তরুণ তীর্থ গোল দিয়েছে। নইলে এত গোল কিসের।

খেলা শেষের বাঁশি বাজার সঙ্গে-সঙ্গে মাঠে সব দর্শক ঢেউয়ের মতো ঢুকে পড়েছে। খেলোয়াড়দের জড়িয়ে ধরে আদর করছে সবাই। সাজ্জাদ আর তনুকে সবাই মিলে কাঁধে তুলে নিয়েছে। ক'দিন আগেই রথের মেলা গেছে। সেখানে সব বাচ্চা এ বার ভুভুজেলা বাঁশি কিনেছিল। সেগুলো অনর্গল বাজিয়ে যাচ্ছে ওরা। কান ঝালাপালা হলেও কেউ কিছু বলছে না ওদের। বল্লভপুরে আজ উৎসব। নন্দ রায়চৌধুরী রানিং ট্রফি প্রথম বারেই ঘরে তুলল তরুণতীর্থ। আজ মনে হয় সারা রাতই ক্লাবের ছেলেরা বাজি ফাটাবে। ওদের ক্যাপ্টেন এসে তনুর সঙ্গে ফ্যাকাসে হাসি হেসে হ্যান্ডশেক করে গেল। মাঠ আস্তে-আস্তে শূন্য হয়ে আসছে। এর পর পুরস্কার বিতরণ। সাজানো টেবিলের চার পাশে উৎসাহী দর্শকেরা এখনও গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আর রানার্স কাপ, আরও অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া হবে এখন। মাইকে দু'পক্ষের খেলোয়াড়দের ডাকা হচ্ছে।

॥ ২ ॥

তনুময় তাঁর ভাইয়ের নাম জানে না। হয়তো তার মা-বাবাও জানে না। তনু জানে না কী হতে পারত তার ভাইয়ের নাম। মনোময়, গীতিময়, মৃন্ময়, সন্ময়—অনেক কিছুই হতে পারত। কিছুই হয়নি। এক মিনিট আগে-পরে জন্মেছিল তারা দু'ভাই। তনুময় আগে, পরে তার ভাই। তাই সে দাদা। জন্মের সাত দিন বাদে তার ভাই জন্ডিসে মারা যায়। নামহীন অবস্থায়। তনুময় কোনও দিন তার মাকে জিজ্ঞেস করেনি তার সেই ভাইয়ের কি কোনও নাম রাখা হয়েছিল তনুময়ের সঙ্গে মিলিয়ে? মা আর বাবা হয়তো নিজেরা ওদের জন্মের পরেই কী-কী নাম রাখা হবে, সেটা নিয়ে কথা বলেছিলেন। পরে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার নাম তনুময় রাখা হয়। মৃত সন্তানের জন্য সেই মনে-করে-রাখা নামও মরে যায়। কিন্তু তনু মনে-মনে তাকে ভাই বলে ডাকে। তনু কাউকে বলে না, সেই ভাই সব সময় তার সঙ্গে থাকে। তনু অস্পষ্ট বুঝতে পারে, ভাই কী বলতে চায়। বললে কেউ বিশ্বাসও করবে না। কিন্তু মাঠে প্র্যাকটিসের সময়, কখনও একা অন্ধকারে বাড়ি ফেরার পথে ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করে। তখন কেউ তাকে দেখলে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাববে না। একা-একা কথা বলে যাচ্ছে। তনুর কথা কেউ বিশ্বাসও করবে না। কে জানে এটা কী করে ঘটে।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, সে-ই জন্ডিস হয়ে মরে গিয়েছিল। আর যে বেঁচে ছিল— তার নামই পরে তনু রাখা হয়। উদ্ভট চিন্তায় তনু নিজেই হেসে ফেলে। তাদের দু'জনের পরিচয় গুলিয়ে দিয়ে সে যেন মজা পায়। সে দিন বিজনদাকেও বলতে পারেনি।

"আমরা তো বুঝতেই পারিনি তুই কর্নারে বল ফেলবি। তোকে না সাজ্জাদকে, কাকে আটকাবে ওরা বুঝতেই পারেনি। আর নীহারকে তো খেয়ালই করেনি। ওদের প্রায় পুরো টিম আমাদের হাফে। তিনটে উইং অনেক পিছনে। ডিফেন্স বলতে দুটো স্টপার আর কিপার। পুরো বোকা বানিয়ে তোরা গোলটা দিলি। ওদের কোচ অনন্ত মিশ্রও তোর প্রশংসা করছিল। তোকে কি কেউ কানে-কানে বুদ্ধি দেয়? কেউ যেটা ভাবতে পারে না, তুই অবিশ্বাস্য ভাবে সেটাই করে দেখাস। ঈশ্বরটিশ্বর নয়, তোর ভিতরে একটা আলাদা প্রতিভা আছে। অলৌকিক ক্ষমতা। প্র্যাকটিস করে যা তনু। ডিটারমিনেশন, কমিটমেন্ট, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, আর লক্ষ্যে চূড়ান্ত একাগ্রতা— ব্যস, আর কিছু চাই না। লিখে রাখ, তুই এক দিন সুরজিৎ সেনগুপ্তের মতো কলকাতার ময়দান কাঁপাবি। তোর প্রতিভা আছে, কিন্তু মনে রাখিস এটা টিম-গেম। তুই একা দলকে জেতাতে পারবি না।"

মৃদু হাসল তনু। বিজনদার প্রিয় খেলোয়াড় সুরজিৎ সেনগুপ্ত। দেবতার চেয়েও বেশি ভক্তি করে বিজনদা। কিন্তু বিজনদা যখন বলল, তোকে কি কেউ কানে-কানে বুদ্ধি দেয়, তখন তার বুক কেঁপে উঠেছিল। বিজনদা কি ভাইয়ের কথা জেনে গেল? কী করে জানবে! পৃথিবীতে আর কেউ জানে না, তার সঙ্গে ভাইয়ের কথা হয়। আর কেউ শুনতে পায় না। মা-বাবাও নয়।

এ রকম আগেও হয়েছে। প্রথম টের পেয়েছিল ক্লাস ফোরে পড়ার সময়। তনুর ওই বয়সেই ভীষণ মাছ ধরার নেশা ছিল। পাড়ায় যত পুকুর ছিল, নদীতে, কাছে-দূরের খালে-বিলে ছিপ নিয়ে বসে যেত। আর ওর বঁড়শিতেই যেন বিশেষ কোনও গন্ধ থাকত। আর কেউ একটাও মাছ না-পেলেও তনু ঠিক পাবে। নয়ানজুলির কচুরিপানা সরিয়ে যেখানে তনু ছিপ ফেলে, তার পাশে ফেললেও তাদের ছিপে একটা পুঁটি মাছও ঠোকরায় না। অথচ তনু টপাটপ কই, শিঙি, মাগুর তোলে। সকলের চোখে হিংসে বুঝতে পারে তনু।

সন্ধে নেমে আসছিল। গত রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। খালবিল জলে টইটম্বুর। তনু জানে কাল রাত থেকে সমস্ত উপচে ওঠা পুকুর থেকে সব মাছ বেরিয়ে ধান খেত, পথের পাশের নয়ানজুলিতে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু এটাও তনু জানে, এ রকম জল হলে ছিপে মাছ ওঠে না। স্রোতে ভেসে এত খাবার আসে, ওরা আর বঁড়শির দিকে যায় না। নতুন জলের স্রোতে ওরা উজিয়ে ওঠে। ময়নার খালে যেন জোয়ার আসে। কত কিছু ভেসে যায়। কচুরিপানা, ভাঙা গাছের ডাল, সেই ডালে জড়িয়ে সাপ থাকে অসহায়ের মতো।

আজ একটাও মাছ পায়নি তনু। তবু ধৈর্য ধরে বসে ছিল। ফাতনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার চোখ টনটন করছিল। আজ একেবারে খালি হাত, এ রকম কোনও দিন হয়নি। জেদ চেপে যাচ্ছিল তার। বিকেলের আলো মরে আসছে, খেয়ালই করেনি। এখন ফাতনাটাও ভাল দেখা যাচ্ছে না। নাহ, আজ আর বসে থেকে লাভ নেই। এর চেয়ে দেরি হলে মায়ের হাতে মার জুটবে।

উঠে দাঁড়াতেই কানের পাশে কে যেন ফিসফিস করে বলল, "সাবধান দাদা, একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। একদম নড়বি না।"

তনুর ইচ্ছে করছিল পিছন ফিরে দেখতে, কে কথা বলল। তখনই টের পেল তার পায়ের উপর দিয়ে দড়ির মতো, কিন্তু পিচ্ছিল কিছু সরসর করে বেয়ে যাচ্ছে। দম বন্ধ করে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল তনু। চলে গেল সাপটা। দম ছেড়ে স্বাভাবিক শ্বাস নিল তনু। কিন্তু কে তাকে কানে-কানে

সাবধান করে দিল! পিছনে ভাল করে দেখল তনু। ময়নার খালের পার শূন্য। সেই প্রথম অস্বাভাবিক ব্যাপারটা টের পেল সে। ওই ডাকে যদি সে সতর্ক না-হত, তবে সাপের ঘাড়েই তার পা পড়ত আজ। নির্ঘাত মরণ ছিল তার কপালে। সেই বয়সে কোনও অলৌকিক বিষয় নিয়ে ভাবনার কথা তার মাথায় আসেনি। এক বার মনে হয়েছিল কেউ ডাকেনি, ওটা তার মনের ভুল। আবার মনে হয়, ভগবানই তাকে রক্ষা করার জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলেছিলেন।

এর পরের ঘটনা ঘটেছিল পাঁচ বছর বাদে। মধ্যমগ্রামে সুব্রত কাপের খেলায়। তনুর তখন ক্লাস নাইন। রাইট উইং পজ়িশনের প্লেয়ার হিসেবে তার বেশ নাম হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাবে খেলার ডাক আসে। তনু বল্লভপুরের তরুণ তীর্থ ছাড়া অন্য ক্লাবে খেলবে না, বলেই দিয়েছে। তাদের স্কুলেরই খেলা ছিল। সম্ভবত সাউথ জ়োনের খেলায় তাদের প্রতিপক্ষ ছিল মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল। বিজনদা বলে দিয়েছিলেন, ওরা মারাত্মক সাজানো টিম। পর পর তিন বছরের চ্যাম্পিয়ন। মোট সাত বার সুব্রত কাপ ঘরে তুলেছে।

খেলা শুরু হতেই তনু বুঝল, ওদের গেম-প্ল্যানিং খুব সাজানো। বিজনদা বলেছিলেন, "দেখিস, দশ-বারো গোল খাস না যেন!"

তত দিনে তনু, সাজ্জাদ আর নীহার মিলে নিয়মিত প্র্যাকটিসে একটা সুন্দর বোঝাপড়া তৈরি করে ফেলেছে। সুতরাং ওদের ভরসা ছিল, হারলেও দশ-বারো গোলে হারবে না।

খেলার গতি ওদের বিপক্ষ দল ইচ্ছেমতো বাড়াচ্ছিল, কমাচ্ছিল। কখনও ছোট-ছোট পাসে খেলে তনুদের হাঁপিয়ে তুলছিল, কখনও লম্বা পাসে খেলে ওরা দম নিচ্ছিল। হাফ-টাইমের আগে মধ্যমগ্রাম দুই-শূন্য গোলে এগিয়ে গেল। মাঠে এসে বিজনদা বললেন, "ডিফেন্স খোলা রেখে অল-আউট অ্যাটাকে গিয়ে লাভ নেই। তা হলে আরও গোল খেতে হবে। বরং ডিফেন্স আরও স্ট্রং কর।"

প্রত্যেককে ডেকে-ডেকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কে কী ভুল করেছে।

সেকেন্ড হাফের খেলা শুরুর আগে তনু, সাজ্জাদ আর নীহার কী যেন শলা করে নিল। সেন্টার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তনু প্রায় চিতা বাঘের ক্ষিপ্রতায় ওদের পেনাল্টি বক্সের সামনে পজ়িশন নিয়ে নিয়েছে। ওরা নিশ্চিন্তে উপরে উঠে আসছিল। সাজ্জাদ বেণুর থেকে পাস পেয়েই লম্বা থ্রু-পাস দিয়েছে মিলনকে। মধ্যমগ্রাম দ্রুত নেমে আসছে। মিলন ওদের এক জনকে ড্যাশ করে বল উঁচু করে তুলে দিল পেনাল্টি বক্সের মাথায়। তত ক্ষণে ওদের সবাই নীচে নেমে এসেছে।

"দাদা, হেড কর," স্পষ্ট শুনতে পেল তনু। কিন্তু সে জানে, হেড দিয়ে লাভ নেই। তার হাইট ভাল নয়। এই তার এক মাত্র দুর্বলতা। তার চেয়ে অনেক লম্বা সাজ্জাদ। তার চেয়েও আরও লম্বা ওদের কিছু প্লেয়ার হেড করে বল ক্লিয়ার করার জন্য তৈরি। তনু দেখল পেনাল্টি বক্সের মাথায় বলটা শূন্য থেকে যেন খুব স্লো-মোশনে ঠিক তার মাথার দিকেই নেমে আসছে।

"লাফা দাদা, পারবি তুই। ওঠ, আরও ওপরে ওঠ।"

কে? কে তাকে ধাক্কা মেরে শূন্যে তুলে দিচ্ছে! তার পায়ের তলায় যেন মাঠ নয়, স্প্রিং-বোর্ড রয়েছে। সমস্ত খেলোয়াড় এবং চার পাশের দর্শক অবাক বিস্ময়ে দেখছে, রকেটের মতো শূন্যে ছিটকে উঠেছে বল্লভপুরের ক্যাপ্টেন। আর উঠছে তো উঠছেই। তনুর মনে হল সে মহাশূন্যে উঠছে। কেউ ধাক্কা দিচ্ছে তাকে। সবাইকে ছাপিয়ে তার মাথায় পৌঁছে গেছে বল। ডান দিকে গোলের ভিতরে বল ঠেলে দিল তনু। সমস্ত মাঠ স্তব্ধ।

ওই একটাই গোল দিয়েছিল বল্লভপুর হাই স্কুল। ওরা আরও দুটো গোল দিয়েছিল। চার-একে খেলা শেষ হয়। সে বছর চ্যাম্পিয়ন হয় শিলংয়ের একটি স্কুল।

"মা, আমার কোনও ছোট ভাই ছিল?"

তনুর মুখে হঠাৎ এ কথা শুনে চমকে উঠলেন তনুর মা। এক দৃষ্টিতে তনুর চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন তনুকে। তার পরই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। কিছু ক্ষণ বাদে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললেন, "কে বলেছে তোকে?"

"বলো না! আমার কেমন যেন মনে হয়, আমার একটা ছোট ভাই ছিল। বল খেলার সময় মনে হয়, অনেক দূর কোনও জায়গা থেকে আমার খেলা দেখছে। আমি ভুল করলে বলে দিচ্ছে। অন্ধকারে বাড়ি ফেরার সময় মনে হয় আমার সঙ্গে-সঙ্গে কেউ হাঁটছে। যেন আমার বিপদ-আপদের দিকে নজর রেখেছে। স্পষ্ট টের পাই। তখন আমার শরীরটা শিরশির করে ওঠে।"

তনুর মা আবার চোখে আঁচল দিয়ে জল মুছলেন। তনুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

"মা, আমার সেই ভাইয়ের গল্প বলো।"

সে দিনই তনু জানতে পারে তার যমজ ভাইয়ের কথা। এক মিনিট আগে-পরে জন্মের কথা। দুর্বল হয়েই জন্মেছিল তনুর সেই এক মিনিটের ছোট ভাই। মা কোলেও নিতে পারেননি। সঙ্গে-সঙ্গে স্পেশ্যাল কেয়ার ইউনিটে তাকে রাখা হয়েছিল। বাঁচেনি, জন্ডিসে মারা যায়। মা জেদ ধরেছিলেন, মৃত শিশুর মুখ দেখবেন। মায়ের কোলে দেয়নি ওরা। মা গিয়ে দেখে এসেছিলেন। সারি-সারি কট। প্রত্যেকটায় একটা নম্বর লেখা ট্যাগ ঝুলছে। মশারি ঢাকা, উপরে একটা আলো জ্বলছে। সামনে গিয়ে মা দেখেছিলেন প্রাণের চিহ্নহীন হলুদ মুখের একটি শিশু। ডুকরে উঠেছিলেন।

"তার চেহারা কেমন ছিল মা?"

"হুবহু তোর মুখ, তোর মুখ ছিল লালচে ফরসা, ওরটা হলুদ।"

"মা, তার নাম কী রেখেছিলে তোমরা? আমার সেই মরা ভাইয়ের?"

"না তনু, আসলে আমার খুব মেয়ের শখ ছিল। মনে-মনে একটা মেয়েলি নামই ঠিক করে রেখেছিলাম। ডাক্তারবাবু যখন পরীক্ষা করে বললেন যমজ হবে, আমি তো জানি না ছেলে না মেয়ে। মেয়ের আশায় দুটো মেয়েলি নামই মনে-মনে রেখেছিলাম। তোর বাবাকেও বলিনি।"

"কী নাম রেখেছিলে মা?"

"কী হবে এখন সে নাম জেনে। সে কি আর কোনও দিন ফিরে আসবে? মরার আগে পর্যন্ত আমার বুকের ভিতরে জ্বালাবে শত্তুরটা। যা এখন, ভাল লাগছে না আমার।"

তা হলে সত্যিই তার একটি ভাই ছিল। কিন্তু মৃত সেই ভাই কেমন করে তাকে আগলে রাখে? একেই কি বলে নাড়ির টান? সেই ভাইয়ের কোনও স্মৃতিচিহ্নই কি নেই? বড় কাঠের বাক্সে, মায়ের স্টিলের ট্রাঙ্কে? মায়ের ঘরে গিয়ে তালা-খোলা ট্রাঙ্ক খুলল তনু। নাকে ন্যাপথালিনের গন্ধ এল। মায়ের শাড়ি, ব্লাউজ়, বোধ হয় বিয়ের বেনারসি, একটা পুরনো পঞ্জিকা, দুটো বড় কাঁসার থালা। তার নীচে তনু দেখল এক জোড়া উলের মোজা, উলের জুতো, দুটো ছোট্ট নীল ফ্রক। চার-পাঁচটা কাঁথা। তার মাঝে লাল-নীল-হলুদ সুতোর নকশা। আর তার পাশেই দুটো প্লাস্টিকের পুতুল। একটার মুখ লাল, অন্যটার মুখ হলুদ। মনে হয় যেন পুতুলটার জন্ডিস হয়েছে।

হলুদমুখো পুতুলটা হাতে নিয়ে অনেক ক্ষণ বসে রইল তনু। "ভাই," অস্ফুটে বলল সে। মুখের সামনে ধরে হলুদ গালের উপর চুমু দিল। আশ্চর্য হয়ে দেখল, পুতুলটার মুখের রং আস্তে-আস্তে অন্য পুতুলটার মতোই লালচে হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ছোট হতে-হতে এক সময় শূন্যে মিলিয়ে গেল হলুদ পুতুল। আর কোনও দিন ভাইয়ের ডাক শোনেনি তনু।

ছবি: *তারকনাথ মুখোপাধ্যায়*
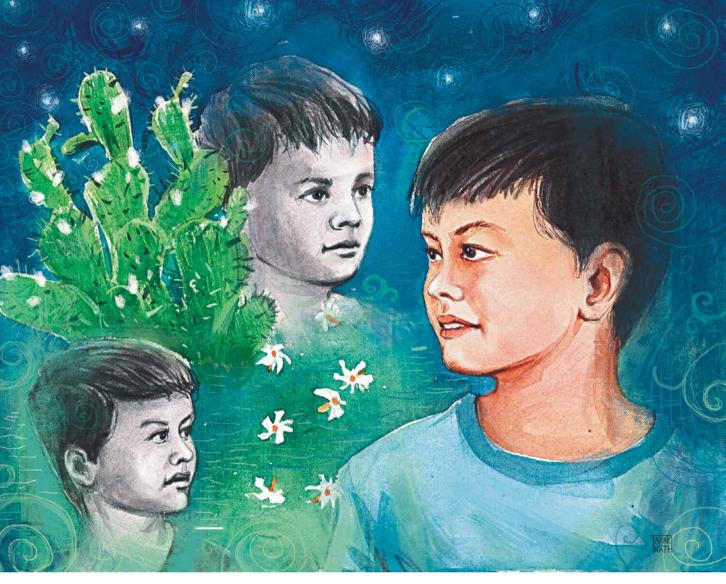
শিউলিতলায় ভোরবেলা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বছর জেরিকে খুঁজতে গিয়ে জুটেছিল জগু। এ বার জগুর অপেক্ষায় হাপিত্যেশ করে থেকে জুটল জলু।

"পুজোর দিনগুলোয় ভোর রাতে শিউলিতলায় জাদু হয়। এই সময়টা হারানো জিনিস ফেরত পাওয়ার মরসুম।"

বদ্যি বুড়ি কথাটা ভুল বলেনি। তবে সব সময় হারানো জিনিস ফিরে আসে, কথাটা পুরো ঠিক নয়। প্রতি বছর নতুন কিছু হাজির হওয়াটাকে তো আর ফিরে আসা বলে না। তাকে বলে আর্বিভাব! আমি জলুকে দেখে প্রথমে ভয় পেয়েই গিয়েছিলাম। জগুর মুখটা মনে করে অন্ধকারের মধ্যে মাঠে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। শিউলির গন্ধ মেশা ভোরের ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। গন্ধের ঘোরের মধ্যে শীত-শীত লাগছিল। এমনিতেই এই জায়গাটা একেবারে অন্য রকম। আমাদের মফস্‌সলটা বড়-বড় ফ্ল্যাটবাড়ি, শপিং মল আর ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢাকা পড়ে দ্রুত বদলে গেলেও এই জায়গাটায় সময় থমকে আছে।

লোকে বলে দশ মন্দিরতলা, হেরিটেজ সাইট। দশটা প্রাচীন শিবমন্দির দিয়ে ঘেরা মাঠ। মাঠের মাঝে দুর্গামণ্ডপ। মাঠের পিছন দিকে ঘাট বাঁধানো ঠাকুরপুকুর। আর পাশের রাস্তার ধারে শিউলি গাছটা। বদ্যি বুড়ি, আদ্যিকালের

মানুষ। সেসব রহস্য জানে। বলে, "পুজোর দিনগুলোয় শিউলিতলায় ভোরবেলায় 'আছে' আর 'নেই' এই দুই জগতের মধ্যেকার দরজাটা খুলে যায়। আর যত সব হারানো জিনিস 'নেই'-এর জগৎ থেকে ফিরে আসে। ম্যাজিক!"

কিন্তু আমার সঙ্গে তো বছর-বছর অন্য ম্যাজিক হয়ে চলেছে। জেরি ছিল কুকুরছানা। গলায় লাল ফিতে বাঁধা অবস্থায় ষষ্ঠীর সকালে এই শিউলিতলায় ঘুরঘুর করছিল। আমিই আদর করে তুলে এনেছিলাম বাড়িতে। জেরি নামটাও আমার দেওয়া। সে বছর জেরির দেখাশোনা করতে গিয়েই পুজো মাথায় উঠেছিল। কিন্তু বিজয়া দশমীর দিন ঠাকুর বিসর্জন দেখে ফিরে দেখি জেরি নেই। বেজায় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কত খুঁজলাম এ-পাড়া ও-পাড়া। পুজোর ভাঙা মণ্ডপে-মণ্ডপে। ঘটে ডোবানো আম পাতা আর একরাশ মনখারাপের দৃশ্য ছাড়া কিছুই খুঁজে পেলাম না।

বদ্যিবুড়ি বলল, "পুজো মিটে গেছে। শিউলি ফুল ঝরে-ঝরে ফুরিয়ে যাবে এ বার। এ বছর আর পাওয়া যাবে না।"

॥ ২ ॥

কিন্তু পরের বছর কী পাওয়া গেল? সে দিনও এমন ভোরে অপেক্ষা করেছিলাম নির্জন শিউলিতলায় এসে। কখন দুই জগতের মধ্যেকার দরজা খুলে যায়! নিজের মতো সময় বুঝে সে কোন 'নেই'-এর জগৎ থেকে জেরির সাড়া পাওয়ার জন্য ডাক দিলাম, "জেরি! জেরি!"

কুকুরের বদলে মানুষের সাড়া পেলাম। ছেলেটা নিজেই এগিয়ে এসে বলল, "আমাকে খুঁজছ?"

আমি বললাম, "জেরিকে খুঁজছি।"

"জেরি কে?"

"আমার কুকুর!"

"কবে হারিয়েছে?"

"গত বছর বিজয়ার দিন।"

"হারিয়েছে গত বছর বিজয়ার দিন। খুঁজছ এ বছর পঞ্চমীর দিন!"

ছেলেটা আমার কথায় অবাক হয়ে হেসেই ফেলল।

"সেই থেকেই খুঁজছি। তবে কিনা পুজোর সময় এই নির্জন শিউলি গাছের নীচে ভোর রাতে ম্যাজিক হয়..." বলতে-বলতে থেমে গেলাম। বদ্যিবুড়ির ওই সব রহস্যময় খবর ছেলেটা বিশ্বাস করবে কি না কে জানে! হয়তো আরও হাসবে!

আমি কথাটা চেপে গিয়ে ভাল করে দেখলাম ছেলেটাকে। আমারই বয়সি ছোট ছেলে। গায়ে ফুল হাতা জামা। হাফ প্যান্ট। জামাটা সাইজ়ে বেশ বড়। গায়ে ঢলঢল করছে।

ছেলেটা বলল, "ম্যাজিকের কথা আমায় বলতে পারো। আমিও কিছু ম্যাজিক জানি। আমার দাদু ম্যাজিকের শো করে। তবে এখন আমরা বাজনাদার হয়ে এসেছি মঞ্চে অনুষ্ঠান করব বলে।"

ম্যাজিকের কথা শুনিয়ে আমায় বেশ আপন করে নিয়ে ছেলেটা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমার নাম জগন্নাথ। লোকে ডাকে জগু বলে। পুজোর চার দিন তোমার সঙ্গে মনে হচ্ছে বেশ মজায় কাটবে!"

এর পর তার বাজনা শুনলাম আর ম্যাজিকও দেখলাম বটে চার দিন ধরে। ওইটুকু ছেলে, কী সুন্দর বাঁশি বাজাল। ট্যাঁই নানা, ট্যাঁই নানা কাঁসি বাজাল। দেশলাই কাঠি রুমাল চাপা দিয়ে ভ্যানিশ করার জাদু দেখাল। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি শোনাল যত রাজ্যের আজগুবি গল্প। সেগুলো নাকি আবার খুব গোপনীয়। আমাকে চুপিচুপি বলল, আমিই নাকি প্রথম বার ওই সব রহস্যের খবর শুনছি।

জগুদের বাড়ির উঠোনের এক পাশে এক ঝাড় ফণিমনসা গাছ আছে। গ্রীষ্মকালে ওদের দেশের রুখা মাটিতে যখন জলের অভাবে সব গাছ শুকিয়ে যায়, তখন ওই কাঁটাগাছে নাকি সাদা পদ্ম ফুলের মতো দেখতে থোকা-থোকা ফুল ফোটে এক-একটা রাত্তিরে। সেই রাতে কারও ঘুম ভাঙে না। কুকুর-বেড়ালও জেগে থাকতে পারে না পথে-ঘাটে। সেই সময় ফুল ফোটে তারার আলো পেয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেউ যখন জেগে থাকতে পারে না, তা হলে ফণিমনসা গাছে ফুল ফোটে, সেটা জানাজানি হল কী করে?"

এই শুনে জগু বলল, "এ বাবা, তুমি দেখছি কিছুই জানো না। কেউ আর ছোটরা কি এক হল! তা হলে তুমি গত বছর বিজয়া দশমীতে হারানো কুকুরছানা এ বছর পঞ্চমীর দিন খুঁজছ কেন?"

এই বলে জগু আমায় রীতিমতো ধমকে দিল, "বড়রা রাতে জেগে থাকলেও ফুল দেখতে পাবে না। ফুল দেখার কথা মনেই পড়বে না ওদের। সারা দিন কী করেছে তা-ই নিয়ে শুয়ে-শুয়ে গজর গজর করবে! ফুল দেখতে হলে অপেক্ষা করতে হয়। বিশ্বাস রাখতে হবে, কাঁটা গাছে ফুল ফোটে। ঘটনাটা বলি শোনো তা হলে, আমাদের রাবণের গুষ্টির সবার তো ঘরের মধ্যে শোয়ার জায়গা হয় না। তাই শীতকাল বাদে অন্য সময় আমরা ছোটরা দাদুর সঙ্গে দুয়ারে শুই। আমি জানতাম কাঁটা গাছটা ফুল লুকিয়ে রাখে। তাই রোজ রাত জেগে নজর রাখতাম। তো এক দিন রাতে ফণিমনসা গাছটার দিকে যেই না হঠাৎ চোখ পড়ে গেছে, দেখি এক-একটা পাপড়ি আঙুল তোলার মতো করে মাথা তুলছে। আমি তো শোয়া ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠোনে। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! গাছে এক-একটা পাপড়িকে জাগাতে আকাশে একের পর-এক তারা ফুটে উঠছে আর মিটমিট করে ইশারা করছে ফুলেদের!"

"বলো কী!"

"তা হলে আর বলছি কী!"

জগু এমন গোল-গোল চোখ করল যে, আমিও এত দিন পরে সাতসকালে দূর থেকেও টের পেতে লাগলাম, সেদিন রাতে ফণিমনসার ফুল আর আকাশের তারারা কী কাণ্ড করেছিল।

পুজোর চার দিনে জগুর কত কথা জানা হল। জগুর বাবা, মা, কাকা, কাকিমা সবাই পাথর-খাদানে কাজ করে। আর জগুর দাদুর ব্যান্ড পার্টি,

গানের দল, ম্যাজিকপার্টি আরও কত কী! পুজো, মেলা, বিয়েবাড়ি কত রকমের অনুষ্ঠানে ডাক পড়ে।

আমার জগুকে একেবারেই ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। অথচ দুগ্গাঠাকুর জলে পড়লেই বাজনদারদের দলের সঙ্গে ও চলে যাবে।

জগুকে লোভ দেখিয়ে বললাম, "তুমি এখানে, আমাদের বাড়ি থেকে যাও না জগু! কোথায় দূরদূরান্ত ঘুরে-ঘুরে প্রোগ্রাম করো। কষ্ট হয় না?"

জগু আমার প্রস্তাবটা একটুও না-ভেবে দেখেই বলল, "এমন করে দলছুট হয়ে যেখান-সেখানে থেকে যাওয়া কী যায়!"

জগু এমন অবহেলা করে বলল যে রাগ হয়ে গেল, "যেখান-সেখানে মানে! তুমি আমায় হেঁজিপেঁজি ভেবেছ! বছর চারেক আগে এলে আমার দেখাই পেতে না। সে সময় আমার মা-বাবা ছিল। পুজোর সময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। আজগুবি গল্প বলার জন্য একা আমাকে পেতে কোথায়?"

চেঁচিয়ে ওঠায় একটু হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম, দম নিয়ে একটু শান্ত হয়ে বললাম, "ওই রাস্তার ও ধারে আমাদের মস্ত বাড়ি আছে। আমার দাদু মস্ত ডাক্তার ছিলেন। বিরাট নামডাক। ডক্টর বৈদ্যনাথ বৈদ্য। কিন্তু এখন কেউ নেই। বাড়িতে শুধু আমি আর বদ্যিবুড়ি। বাড়ি ফাঁকা। খাঁ-খাঁ করে।"

আমার কথা শুনে জগুর দেখলাম চোখ ছলছল করছে।

"আমি থাকলে তুমি আনন্দ পেতে, তাই না? কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উপায় যে নেই। আমি না-থাকলে উঠোনের ফণিমনসা গাছগুলোর কী হবে? যদি বড়রা কাঁটা গাছ বলে কেটে ফেলে? তখন আকাশের তারাগুলো সারা রাত আমায় দোষ দেবে। আমায় কত দিকে যে নজর রাখতে হয়, তোমায় কী বলব!"

এই বলে জগু শিউলিতলায় ফিরে আসার প্রমিস করল, "আমি দাদুকে বলব পরের বছরেও তোমাদের বারোয়ারির অনুষ্ঠানের বায়না ধরতে। তুমি খুব ভাল। তোমার সঙ্গে দেখা তো হবেই।"

॥ ৩ ॥

'জগু, জগু!' বলে ডাক দিইনি গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই। শুধু অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলাম। জগুকে দেখে চিনতে পারব কি না, এই নিয়ে সংশয় ছিল। তবে একটাই শান্তি যে ছোটরা যত দিন ছোট থাকে, তত দিন একই রকম থাকে।

কিন্তু আমার সব আশায় জল ঢেলে জগুর বদলে এল জলু। সে-ও অবশ্য ছোট ছেলে। তবে সে জগুর মতো পটরপটর করে কথা বলে না।

ছেলেটা চুপচাপ দেখে আলাপ জমাতে বললাম, "আমার বাড়ি এখানেই। এটা আমাদের পাড়ার পুজো। খুব প্রাচীন পাড়া। ঐতিহ্যবাহী, এক চালার প্রতিমা। দেখেছ তো চার পাশে কেমন পুরনো-পুরনো মন্দির। ঘাটবাঁধানো পুকুর।"

জলু অত কিছুতে গেল না। সে মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল, "সারা বছর পুকুরটায় জল থাকে?"

"হ্যাঁ। কেন থাকবে না? অত বড় পুষ্করিণীতে জল থাকবে না কেন? এখানে বেশির ভাগ পুকুরেরই সারা বছর জল থাকে।"

"কী আশ্চর্য!" জলু চোখ ছানাবড়া করে বলল, "আমাদের দেশে গরমকালে সব পুকুরের জল শুকিয়ে যায়। এক আমার পুকুর ছাড়া। জল থাকে বলেই আমাকে জলু ডাকে লোকে। গ্রীষ্মকালে যখন গোটা এলাকা খটখটে, গাছ শুকিয়ে কাঠ, মাটি শুকিয়ে ফুটিফাটা, পাথর তাপে তপ্ত ঝামা, মানুষ শুকিয়ে চিমসে— তখনও জলুর পুকুরে জল টলমল।"

"তোমার নিজের একটা আস্ত পুকুর আছে?"

"হ্যাঁ! আর তাতে জল শুকোয় না!" জলু এত গর্ব করে বলল কথাটা।

কথায়-কথায় জানা গেল, জগুর মতো জলুও বাজনদারদের দলের সঙ্গে এসেছে। তবে ছৌ নাচের দলের অংশ সে। সপ্তমীর দিন বারোয়ারির মঞ্চে ছৌ নাচের অনুষ্ঠান হবে। সেই উপলক্ষে ওদের দল এখানে এসেছে। তার মানে জলু দশমী পর্যন্তও থাকবে কি না সন্দেহ। কী আর করা যাবে, জগু যখন এল না, তখন জলুই সম্বল। আজ দুপুরে বদ্যিবুড়িকে বলব, 'তোমার একটা কথাও ঠিক না। নেই আর আছে-র দেশের মধ্যে কোনও দরজা নেই। থাকলেও সেই দরজা দিয়ে নেই-এর দিকে যাওয়া যায়। ফিরে আসা যায় না!'

কথাটা দুপুরে বদ্যি বুড়িকে বলা হল না। এই পুজোর ক'দিন বুড়ির উপর বড় মায়া লাগে। মোবাইলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সেই 'একরোখা' লোকটার সঙ্গে ঝগড়া করে, "যা নিয়তি ছিল ঘটে গেছে। সে জন্য তুই ওইটুকু ছেলেটাকে দোষী মানিস! এ সময় ওর সবার আগে তোকেই দরকার! নিজের বাচ্চার প্রতি এমন নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে!"

বদ্যি বুড়ির সেই একরোখা লোকটা পাল্টা কী বলে, শোনা যায় না। তবে এমন কিছু বলে, যাতে বদ্যিবুড়ি বিস্তর কাঁদে। তাই আমি পুজোর দিনগুলোয় মোটের উপর বাড়ি ফিরি না। এক খাওয়ার সময় ছাড়া বাকি দিনটা মণ্ডপেই কাটিয়ে দিই। মণ্ডপে পাত পেড়ে খাওয়ালে খাওয়ার জন্য বাড়ি যাওয়ার দরকার পড়ে না। এতে অবশ্য বদ্যিবুড়ি রেগে যায়। কিন্তু ওই লোকটার সঙ্গে ঝগড়া চালাতে গিয়ে আর আমার উপর চেঁচানোর মতো শক্তি বুড়ির থাকে না।

বিকেলে তাই জলুকে জগুর আজব ফুলের গল্প শুনিয়ে বললাম, "এই শিউলিতলায় 'নেই' আর 'আছে'র মধ্যে একটা অদৃশ্য দরজা আছে।"

শুনে সে খুব একটা অবাক হল না। যেন এমন কথা আগেও শুনেছে। জলু বলল, "ওই ভাবে আছে না নেই, তা ঠিক করে কিছুই বলা যায় না। জানো, আমার পুকুরে এক বার একটা কথা-বলা টিয়া পাখি এসে হাজির হয়েছিল। সারা দিন জল খায়, দানা খায়, আর গাছের ডালে বসে বিড়বিড় করে, 'ফেরার দেশে কোনও দিন ফিরব না।'

“ভাবলাম, ভালই তো। পাখিটা এখানে থেকে যাবে। সেই মতো তার আরাম করে থাকার জন্য বড় খাঁচা বানালাম। কী খায় না-খায় বুঝতে হিমশিম খেলাম। কত যত্নে রাখার ব্যবস্থা করলাম। পাখিটা দারুণ বন্ধু হয়ে গেল আমার। কিন্তু কিছু দিন থেকে-খেয়ে গল্প শুনিয়ে গোটা এলাকায় রটিয়ে বেড়াল, পুকুরের জলে নাকি মন খারাপ সারানোর অমৃত মিশে আছে।

“ব্যস, আর যায় কোথায়। দেশে দুঃখী লোকের অভাব! যেখানে যে ছিল ঘড়া, কলসি, কুঁজো নিয়ে এসে হাজির। দলে- দলে লোক আসছে তো আসছেই! এ বার পুকুরের জল বাঁচিয়ে রাখি কী করে? এলাকার ওই একটাই পুকুর, যেখানে প্রখর গ্রীষ্মেও জল থাকে। বৃষ্টিকে ডাক দেয়! বৃষ্টি দুষ্টুমি করলে জলের উপরটা সবুজ শ্যাওলার আস্তরণে ঢেকে দেয়। আকাশের ছায়া দেখা যায় না জলে। মুখ দেখার আয়না না-পেয়ে আকাশের মনে দুঃখ জমে কালো ঘন মেঘ করে আসে। এক সময় ভারী হয়ে আকাশটা ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। তখন ঝমঝম বৃষ্টি নামে আমাদের রুক্ষ দেশে।

“সেই পুকুরের জল যদি মন খারাপ সারাতে সব খরচ হয়ে যায়, তবে পরের গ্রীষ্মকালে কী হবে?

“আমি সবাইকে বোঝাতে বললাম, ‘টিয়াটা মহা মিথ্যুক! ও নিজেই কার না কার বাড়ি থেকে মন খারাপ করে পালিয়ে এসেছে। পুকুরের জল তো ও খেয়েছে, ওর নিজের মন খারাপ সারছে না কেন?’

“আমার কথার মানে বুঝতে পারল কি না পারল, কে জানে, তবে টিয়াটা সে দিনই চলে গেল। সেই থেকে আমার সে কী মন খারাপ! হয়তো অনেক কষ্ট পেয়ে টিয়াটা পালিয়ে এসেছিল। আমি সামান্য জল বাঁচাতে তাড়িয়ে ছাড়লাম। আমায় দিন-রাত কাঁদো-কাঁদো দেখে এক দিন কবিয়াল কাকা বলল, ‘অপেক্ষা কর। ঠিক ফিরে আসবে!’”

“ফিরে এসেছিল?”

“ধুর! ফিরে এলে অপেক্ষা করা শেষ হয়ে যাবে যে! তোমার অপেক্ষা করতে ভাল লাগে না?”

॥ ৪ ॥

জেরি ছিল আদরের, জগু মজাদার, আর জলু কেমন যেন। এ ভাবে কেউ মনের কথা বলে দেয়! পুজোর দিনগুলো ফুরোবে, শিউলি ঝরা শেষ হবে, আমার অপেক্ষা শুরু হবে। কারণ ‘নেই’ আর ‘আছে’, দুই জগতের মাঝের দরজাটা এক বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

ওই একরোখা লোকটা নিজের কাজের জায়গায় ফিরে যাবে। সেই পাঠানকোটে। সেনাবাহিনীর ডাক্তারবাবু সে। অবশ্য পুজোর ক’দিন এলেও লোকটা বাড়ি আসে না। এখানে একটা লজে ওঠে। আমার জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসে। বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু নিজেকে নিয়ে আসে না।

আমি ভাবি আসবে। লজের পাশে বিখ্যাত ব্যবসায়ীর প্রাচীন প্রাসাদের মতো বাড়িটা এখন সরকারি অফিস। বাড়িটা পাশ কাটিয়ে এলে পুকুর। পুকুরের পর দশ মন্দির ঘেরা এই মাঠ। মাঠের পিছনে শিউলিতলা। এ দিক দিয়ে আমাদের বাড়ি যেতে গেলে শিউলিতলা হয়ে যেতে হবে।

তাই শিউলি গাছের নীচে অপেক্ষা করাই সুবিধে। দিনের বেলা দাঁড়াতে পারি না। কারণ সবাই ঘটনাটা জানে। ওরা আমায় সহানুভূতি দেখাবে আর আমার মনে পড়ে যাবে, আমার জন্যই মা ‘নেই’-এর দুনিয়ায় চলে গেছে। আমি অধৈর্য হয়ে ট্র্যাফিক না-দেখে রাস্তা ক্রস করে আইসক্রিম পার্লারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ট্রাকটা চলে এসেছিল। মা আমায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল। কিছু দিন পরেই আমাদের পাঠানকোট থেকে ফেরার কথা ছিল পুজোর ছুটিতে। ফিরেওছিলাম। তবে বরাবরের জন্য। ওই একরোখা লোকটা আমায় বদ্যিবুড়ির কাছে রেখে ফিরে গিয়েছিল। বাড়িতে আর ফেরেনি।

তার পর থেকে প্রতি বছর পুজোর সময় লোকটা আমাদের মফস্‌সলে আসে। লজে থাকে। কখনও-কখনও হাঁটতে-হাঁটতে চলে আসে শিউলিতলা পর্যন্ত, খুব ভোরে। আমি আড়াল থেকে দেখে লুকিয়ে পড়ি। শিউলি ফুল ঝরে, গন্ধ ছড়ায়। সেই গন্ধে যেন তিরতির করে একটা পর্দা কাঁপে ‘নেই’ আর ‘আছে’ এই দুই জগতের মধ্যে।

আজ অষ্টমীর ভোর। আমি ঝুঁকে শিউলি ফুল কুড়োচ্ছিলাম। পিঠে একটা হাতের ছোঁয়া পেয়ে ফিরে তাকালাম।

রাতে ছৌ নাচের অনুষ্ঠান মিটে গেছে। “জলু চলে যাচ্ছ? থেকে যাও না ভাই আমার সঙ্গে।”

জলু আমায় জড়িয়ে কেঁদেই ফেলল। বলল, “কী করব বলো! আমি নেই দেখে যদি পুকুরটা সবাই মিলে ছেঁচে ফেলে সব জল ফাঁকা করে দেয়। তা হলে যে আমাদের এলাকার সব পুকুরেই জল ফুরিয়ে যাবে। বড়রা যা বোকা!”

“শুধু বোকাই নয়। ভীষণ নিষ্ঠুর! ছোটদের অপেক্ষা করিয়ে কষ্ট দেয়। শুধুই অপেক্ষা করায়।”

জলু আমার কষ্ট দেখে আরও কান্নাকাটি করে বলল, “মানুষ অপেক্ষা করে বলেই তো আমার পুকুরের জল শুকোয় না। জগুর ফণিমনসার ঝাড়ে ফুল ফোটে। তোমার অপেক্ষা করতে ভাল লাগে না?”

জলুকে ওর দলের লোকেরা ডাকছিল। ছেলেটার যেন কেমন-কেমন কথা। বলে, কবিয়ালকাকু শিখিয়েছে। তিনি নিশ্চয়ই এই জগতের কেউ নন। আমি হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললাম, “ফিরে আসবে তো? আমি কিন্তু অপেক্ষাই করব!”

সেই সময় পিছন দিকে হঠাৎ কারও দ্রুত পায়ের চলার শব্দ পেলাম। অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে কেউ আমাদের কথা শুনছিল। আমি ঘুরে তাকাতেই শিউলি গাছের ও ধারে, মন্দিরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

ছবি: *তারকনাথ মুখোপাধ্যায়*

হাতে সময় বড্ড কম

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

নিমাইবাবু ঘড়িতে দেখলেন, ন'টা বাজতে আর তিন মিনিট বাকি আছে। টিভিতে খবরের চ্যানেল চলছিল। নিমাইবাবু রিমোট টিপে চ্যানেল বদলে ওমেগা প্লাসে দিলেন। এখন বিজ্ঞাপন চলছে। আর ঠিক তিন মিনিট পরে রাত্রি ন'টায় শুরু হবে রিয়্যালিটি শো, 'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ'। নিমাইবাবু গলা তুলে স্ত্রীকে ডাকলেন, "শুনছ, এ বার শুরু হবে।"

পারমিতা রান্না করছিলেন। কড়াইটা উনুন থেকে নামিয়ে গ্যাসটা বন্ধ করে খানিক ক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভাল লাগছে না। এই শো-টা একদম ভাল লাগছে না। গুড়িয়া যে কেন এই অলৌকিক ভূতপ্রেতের রিয়্যালিটি শো-টায় প্রতিযোগী হয়ে গেল? চোখটা ছলছল করে উঠল পারমিতার। কারণটা অবশ্য তিনি জানেন। তবুও কত বার বারণ করেছিলেন মেয়েকে। সত্যি-মিথ্যে জানা নেই, কিন্তু এই রিয়্যালিটি শো-টা বড্ড বিপদসঙ্কুল।

'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ'-এর সিগনেচার টিউন শুরু হল। নিমাইবাবু আর-এক বার গলা তুলে তাড়া দিলেন, "শুরু হয়ে গেল তো, দেখবে না?"

পারমিতা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এক বার গুড়িয়ার ঘরে উঁকি দিলেন। মেয়েটা চুপ করে বসে লেখাপড়া করছে। বড় মায়া হল দৃশ্যটা দেখে। কী আপ্রাণ চেষ্টা করছে মেয়েটা, এই শো-টা জিতে পাঁচ লাখ টাকা পাওয়ার জন্য। সেই টাকায় বাবার চিকিৎসা করাবে। অথচ এই মেয়ে ছোটবেলায় বেজায় ভিতু ছিল। একটু অন্ধকার হলেই ছুটে এসে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলত। শুধু ছোটবেলায় কেন, এই তো কিছু দিন আগে পর্যন্ত রাত্রিবেলায় বাথরুমে গেলে মাকে জাগিয়ে যেত। সে এত সাহস সঞ্চয় করল কী করে? শুধু বাবার চিকিৎসার জন্য টাকাটা জোগাড় করতে হবে বলেই? পারমিতা সব সময় ঈশ্বরকে ডাকেন। ঈশ্বর যেন রক্ষা করেন গুড়িয়াকে।

গুড়িয়া ইউনিভার্সিটিতে এম এসসি পড়ে। খুব চুপচাপ, শান্ত স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু ভিতর-ভিতর ভীষণ জেদি। আর যে ব্যাপারে কথা দেয়, সেটা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে। যেমন এই শো-টার জন্য চ্যানেলের সঙ্গে গোপনীয়তার চুক্তি আছে। এক-একটা এপিসোড টেলিকাস্ট না-হওয়া পর্যন্ত, সেই এপিসোড সম্পর্কে একটা কথাও কোথাও বলা যাবে না। এমনকি, বাবা-মাকেও না। যেমন আজকে গুড়িয়া এলিমিনেট হয়ে যাবে না পরের এপিসোডের জন্য থেকে যাবে, সে বিষয়ে একটা

কথাও বলেনি। আজকে যেটা দেখানো হবে সেই শুটিং কোথায় হয়েছে, সে সম্পর্কেও বাড়িতে একটাও কথা বলেনি।

"এসো," অধৈর্য হয়ে নিমাইবাবু আবার ডাক দিলেন। পারমিতা ঘরে ঢুকতেই নিমাইবাবু বললেন, "আমাকে একটু তুলে বসিয়ে দাও তো।"

খাটের উপরেই নিমাইবাবুকে তুলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলেন পারমিতা।

"গুড়িয়া দেখবে না?" জিজ্ঞেস করেই নিমাইবাবুর খেয়াল হল, গুড়িয়া কোনও শো-ই দেখে না। টিভিতে শো-টা শুরু হল। সঞ্চালিকা দেবদত্তা বলতে শুরু করল, "আজ আবার আমরা হাজির হয়েছি নতুন এক তথাকথিত ভৌতিক বাড়ির সামনে। আপনাদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, ১৬ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে শুরু হয়েছিল 'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ' সিজ়ন ওয়ান। আগের রাউন্ডে তুহিন আর পাপড়ি এলিমিনেট হয়ে যাওয়ার পরে আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে চার জন প্রতিযোগী। সমুদ্র, কঙ্গনা, বাপ্পাদিত্য আর সঞ্জনা। নিয়ম একই আছে। প্রতি বারের মতো এ বারেও চার জন প্রতিযোগীকে দেওয়া হবে কয়েকটা টাস্ক। আজকে চার জন প্রতিযোগীর মধ্যে যে তিন জন প্রতিযোগী টাস্কগুলো সম্পূর্ণ শেষ করে প্রথম এই বাড়ির থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তারাই যাবে পরের রাউন্ডে। কোনও প্রতিযোগী যদি টাস্ক শেষ করার আগে ভয় পেয়ে বেরিয়ে আসে, সে এলিমিনেট হয়ে যাবে। সবার আগে আসুন, এক বার দেখে নিন এই বাড়িটা।"

টিভির স্ক্রিনে ভেসে উঠল বাড়িটা। আগের এপিসোডগুলোর মতোই একটা ভাঙাচোরা তিন তলা বাড়ি। একদম উপরের তলাটা অসমাপ্ত। বাড়িটা দেখলেই কী রকম যেন বুকের ভিতরটা করে ওঠে। পারমিতা কপালে হাত ঠেকালেন। দেবদত্তা বলতে থাকল, "আমরা আজ এসেছি তারাপীঠের কাছে এক জায়গায়। প্রতি বারের মতো এ বারেও আমরা অনেক রিসার্চ করে এই বাড়িটা পেয়েছি আর প্রতি বারের মতো এ বারেও এই বাড়িটা সম্পর্কে 'বিশ্বাস অবিশ্বাস' সেগমেন্টে বলবেন স্থানীয় এক মানুষ, সুকুমার দাস।"

টিভির পর্দায় সুকুমারবাবুর মুখ দেখা গেল। মাঙ্কিক্যাপ ঢাকা মুখ, গলায় মাফলার। সুকুমারবাবু বলতে শুরু করলেন, "অনেক কাল আগে এই বাড়িটা আসলে একটা হোটেল করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা শুরু হয়েছিল। তখন তারাপীঠের আশপাশে এত হোটেল ছিল না। কলকাতার এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এইখানে হোটেলটা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। আমি তখন সবে মাধ্যমিক পাশ করেছি। হোটেলটা তখন একটু-একটু করে তৈরি হচ্ছিল। প্রথমে এক তলা, তার পর দোতলা, তার পর তিন তলাটা হতে শুরু হয়েও শেষ আর হয়নি, সেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তবে হোটেলটা দোতলা হয়ে যাওয়ার পরই চালু হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় যারা তারা মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে দূর-দূর থেকে আসতেন, এক-দু'রাত এখানে কাটিয়ে যেতেন। ভালই চলছিল হোটেলটা। তার পর কী যে হল। শুনেছি এক বার দুই বন্ধু থাকতে এসেছিল। হোটেলের লোকজন ভেবেছিল, সবাই যেমন এখানে মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে আসে, দুই বন্ধু সে রকমই এসেছিল। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। কী সেই উদ্দেশ্য, আজও কেউ জানে না। তবে এক রাতে দুই বন্ধুর মধ্যে খুব ঝগড়া হয়েছিল। পরের দিন সকালে এক বন্ধুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল আর অন্য বন্ধুর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। হোটেলের খাতায় ভুয়ো ঠিকানা দেওয়া ছিল। তখনকার দিনে তো পরিচয়পত্র হোটেল দেখত না। পুলিশও ময়নাতদন্ত করিয়ে কিচ্ছু বুঝতে পারেনি। সেই মৃত ব্যক্তির মৃতদেহের খোঁজ করতেও কেউ আসেনি। পুলিশই তারাপীঠ শ্মশানে বেওয়ারিশ লাশের মতো তার দাহ করেছিল।

"এর পরই এই হোটেলে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতে থাকে। রাতের বেলায় সেই মৃত ব্যক্তিকে দেখা যেত। সে নাকি কিছু খুঁজত। অনেক বোর্ডার রাতের বেলায় ঘরের মধ্যে তাকে দেখেছে। যিনি হোটেলের মালিক ছিলেন তিনি অনেক তান্ত্রিক ওঝাকে এখানে এনেছিলেন। কিন্তু কেউ কোনও সুরাহা করতে পারেনি। এক তান্ত্রিক বলেছিলেন, ওই আত্মা এখানে বাস্তুআত্মা হয়ে আছে। সে যেটা খুঁজছে যত দিন না সেটা খুঁজে পাচ্ছে, কোনও শক্তি এই আত্মাকে তাড়াতে পারবে না। হোটেলটার দুর্নাম বাড়তে থাকল। কেউ আর পারতপক্ষে এখানে এসে থাকত না। হোটেলের মালিক জলের দরে হোটেলটাকে বিক্রি করে দিলেন। যিনি কিনলেন তিনি স্থানীয়। কিন্তু তিনিও হোটেলটা চালাতে পারলেন না। আস্তে-আস্তে পরিত্যক্ত হয়ে গেল হোটেলটা। এখন শুধু এই ভাঙাচোরা বাড়িটাই দাঁড়িয়ে আছে।''

সুকুমারবাবু বলা শেষ করলেন। দেবদত্তা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আজও কি সেই আত্মা রয়েছে?"

"সবাই তো তা-ই বলে। অনেকেই দেখেছে।"

"আপনি দেখেছেন?"

একটু চুপ করে থেকে সুকুমার বললেন, "হ্যাঁ, এক বার। দেখুন এই জায়গাটায় জনবসতি নেই। পারতপক্ষে খুব দরকার না-পড়লে এই রাস্তার সামনে দিয়ে রাতে কেউ খুব একটা যায় না। এক বার এক নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল। শর্টকার্ট করার জন্য এখান দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। ওই যে দোতলার ভাঙা জানলাগুলো দেখছেন, সেগুলোর পাল্লা তত দিনে সব ভেঙে পড়ে গেছে। ভিতরটা বাইরে থেকেই দেখা যেত। চাঁদনি আলোয় আমি পরিষ্কার দেখেছি, একটা ছায়ামূর্তি জানলার মুখে দাঁড়িয়ে আছে।"

দেবদত্তা বলল, "ব্যস, এটুকু দিয়েই আজকে আমরা আমাদের এপিসোড শুরু করব। আমরা এখানে সমীক্ষা করে দেখেছি ৭০ শতাংশ মানুষ আজও মনে করেন, এখানে বাস্তুআত্মা আছে। ৩০ শতাংশ মানুষ মনে করেন এ সব ভুল রটনা। তবে ঘটনা হচ্ছে, গত ৪০ বছরে এই হোটেল না হয়েছে চালু, না হয়েছে নতুন করে হাতবদল।

"প্রত্যেক এপিসোডে আমরা যেমন এই রকম বাড়িগুলোর বিভিন্ন জায়গায় নাইট ভিশন ক্যামেরা লাগিয়ে রাখি, আজ দুপুরে আমাদের টিম হোটেলের বিভিন্ন ঘরে, লবিতে ক্যামেরা লাগিয়ে এসেছে এবং আমাদের প্রতিযোগীদের জন্য কয়েকটা টাস্ক রেখে দিয়ে এসেছে। এ ছাড়া প্রতিযোগীদের জামায় লাগানো আছে বডি মাউন্টেড ক্যামেরা এবং হেডফোন মাইক্রোফোন সেট। প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে একটা করে পেনসিল টর্চ। এই শুটিং যখন হচ্ছে তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা। আমরা চার জন প্রতিযোগীকে রেখে এখান থেকে খানিকটা দূরে চলে যাব আমাদের কন্ট্রোল ভ্যানে। আসুন আমরা আর-এক বার দেখে নিই আমাদের আজকের চার প্রতিযোগী, সমুদ্র, কঙ্গনা, বাপ্পাদিত্য আর সঞ্জনাকে।"

টিভি স্ক্রিন জুড়ে যখন সঞ্জনা ওরফে গুড়িয়ার মুখটা দেখাতে থাকল, পারমিতার ভিতরটা কেমন করে উঠল। গুড়িয়ার মুখটা কেমন যেন ক্লান্ত অথচ অবিচল দেখাচ্ছে। টিভিতে ঘড়ি দেখাচ্ছে। ঘড়ির তিনটে কাঁটা এক জায়গায় হতেই চার জন পরিত্যক্ত হোটেলটার দিকে এগোতে থাকল। হোটেলের মধ্যে ঢুকে এক-এক জনকে এমন ভাবে টাস্ক দেওয়া আছে যাতে এক-এক জায়গায় কখনও কোনও দু'জন এক সঙ্গে না থাকে। সব সময় একা-একা থাকতে হবে। গুড়িয়ার প্রথম টাস্কটা পড়েছে এক তলায় ডান দিকে ঘুরে রান্নাঘরের পাশে, ভাঁড়ার ঘরে। টাস্কটা হচ্ছে ওই ঘরে রাখা একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তার পর সেই মোমবাতিটা নিয়ে আর-একটা ঘরে যেতে হবে। সেখানে একটা টিনের বাক্স রাখা আছে। বাক্সর তালাটা খুলে একটা খাম বের করতে হবে। সেই খামের মধ্যে লেখা আছে পরবর্তী টাস্ক।

গুড়িয়া পেনসিল টর্চটা জ্বালিয়ে ধীরে-ধীরে রান্নাঘর পেরিয়ে ভাঁড়ার ঘরে এসে মোমবাতিটা জ্বালাতেই দেখা গেল ঘরভর্তি পুরনো ভাঙাচোরা আসবাব আর কিছু তোবড়ানো বাসনপত্তর। গুড়িয়া মোমবাতিটা জ্বালিয়ে এক হাতে ধরে আর অন্য হাত দিয়ে শিখাটা আগলে নির্দেশ মতো ঘরটায় গেল। এই ঘরে এক কোণে রাখা আছে

একটা তোরঙ্গ আর চাবি। তোরঙ্গটার পাশে মোমবাতিটা বসিয়ে গুড়িয়া তালা খুলে ডালাটা খুলল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হল আর তখনই মোমবাতির আলোয় দেখা গেল, আবছা একটা ছায়া পিছন থেকে গুড়িয়ার গায়ে এসে পড়ল।

আর পারলেন না পারমিতা। ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তার পর গুড়িয়ার ঘরে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলেন, "আর করতে হবে না তোকে। এ সব ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

গুড়িয়া মায়ের পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল "পারব মা। পারতেই হবে আমাকে মা। বাবাকে আমি ভাল করে তুলব।"

মাকে শান্ত করতে গিয়ে আবেগে আজ প্রথম কথা ভাঙল, "আর একটা মাত্র এপিসোডের শুটিং বাকি মা, গ্র্যান্ড ফিনালে।"

॥ ২ ॥

স্পাইন চিলিং প্রোডাকশনের অফিসে কনফারেন্স রুম অন্ধকার করে জরুরি একটা মিটিং চলছিল। স্ক্রিনে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন দিয়ে আগামী দিনের প্রজেক্টগুলো নিয়ে আলোচনা করছিল রোহন। মন দিয়ে আলোচনা শুনছিলেন সংস্থার প্রধান রেশমি সেন। এমন সময়ে হঠাৎ কনফারেন্স রুমের দরজা ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন প্রহ্লাদ মিত্র। প্রেজেন্টেশনটা ঠিক মনের মতো লাগছিল না বলে রেশমি সেনের মেজাজটা বিগড়ে ছিল। সেটা আরও খারাপ হয়ে গেল এই ভাবে দুম করে প্রহ্লাদ মিত্র ঘরে ঢুকে পড়ায়। প্রহ্লাদের এই মিটিংয়ে থাকার কথা নয়। সব কিছুর একটা দস্তুর আছে। রেশমি বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার মিস্টার মিত্র?"

প্রহ্লাদ মিত্র তখনও হাঁপাচ্ছেন। চোখে-মুখে বেশ উৎকণ্ঠা। বললেন, "ভীষণ জরুরি একটা কথা আছে ম্যাম।"

"মিটিংটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেত না?"

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে প্রহ্লাদ মিত্র বললেন, "আসলে ম্যাম, ব্যাপারটা ভীষণই জরুরি। হাতে সময় বড্ড কম।"

রেশমি সেন সকলের দিকে এক বার চোখ বুলিয়ে বললেন, "প্লিজ় কন্টিনিউ।"

প্রহ্লাদের সঙ্গে কনফারেন্স রুমের বাইরে বারিয়ে এসে ব্রেকআউট জ়োনে যেতে-যেতে রেশমি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

একটু ইতস্তত গলায় প্রহ্লাদ বলতে শুরু করলেন, "ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ..."

'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ' স্পাইন চিলিং প্রোডাকশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো। প্রত্যেক শনিবার চ্যানেল ওমেগা প্লাসে ঠিক রাত্রি ন'টায় এক-একটা এপিসোড দেখানো হয়। হাই টিআরপি নিয়ে সিজ়ন ওয়ান শেষ হতে চলেছে। বাকি আছে শুধু গ্র্যান্ড ফিনালের শুটিং। পুরোদমে তার প্রস্তুতি চলছে। প্রহ্লাদ মিত্র এই সিরিজ়ের পরিচালক।

"কী হয়েছে 'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ' নিয়ে? এনি প্রবলেম?"

"সাংঘাতিক প্রবলেম ম্যাম। লাভপুরের কাছে যে জমিদারবাড়িটা গ্র্যান্ড ফিনালের শুটিং করার জন্য ফাইনাল করে রেখেছি, সেই বুকিং হঠাৎ ক্যানসেল হয়ে গেছে।"

"হোয়াট?" চোখ কপালে উঠে গেল রেশমি সেনের।

মুখ ছোট করে প্রহ্লাদ বললেন, "এই একটু আগেই ইমেল-টা পেয়েছি। জমিদারবাড়ির ট্রাস্টি থেকে মেলটা করেছে।"

"কী কারণ লিখেছে?"

"মেলে কিছু কারণ লেখেনি। তবে মেল-টা পাওয়া মাত্র আমি নবারুণবাবুকে ফোন করেছিলাম। উনিই ট্রাস্টির প্রধান। কনট্র্যাক্টটা তো ওঁর সঙ্গে হয়েছিল। খুলে কিছু বলেননি। তবে যা বুঝেছি, ওদের নিজেদের মধ্যে কোনও গন্ডগোল হয়েছে। কোর্টে মামলা-মকদ্দমা হয়ে স্টে অর্ডার হয়েছে। ১৭ তারিখ, অর্থাৎ যে দিন থেকে আমাদের ওখানে কাজ করার কথা, সে দিনই পরবর্তী শুনানি। মামলা-মকদ্দমার ব্যাপার। কত দিন চলবে, কেউ জানে না। কোনও ভাবেই শুটিংয়ের জন্য ওই জমিদারবাড়ি আর পাওয়া সম্ভব নয়।"

খুব চিন্তিত মুখে রেশমি সেন মোবাইলে ক্যালেন্ডারটা খুললেন। দিন ধরে পুরো প্ল্যান লেখা আছে। হিসেব করে দেখলেন, শুটিংয়ের আর মাত্র দশ দিন বাকি আছে। তার পরে পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ করে চ্যানেলের কাছে গ্র্যান্ড ফিনালের এপিসোডটা জমা করতে হবে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে এই জমিদারবাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল। রেশমি সেন দু'বার ঘুরে এসেছেন বাড়িটায়। কী ভাবে শুটিং হবে তার সমস্ত খুঁটিনাটি প্রোডাকশন টিমকে নিয়ে ছকে নেওয়া আছে। এখন নতুন করে আবার একটা বাড়ি খুঁজে বের করে তার পরে সময়ের মধ্যে শুটিং শেষ করা খুব কঠিন কাজ।

"আসুন আমার সঙ্গে," রেশমি সেন আবার কনফারেন্স রুমে ফিরে এলেন। সবাইকে বললেন, "আপাতত এই প্রেজ়েন্টেশনটা বন্ধ থাক। একটা ইমার্জেন্সি হয়েছে। এখন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

প্রজেক্টর বন্ধ করে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। রেশমি সেন দেবদত্তাকে বললেন, "এক্ষুনি গিয়ে 'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ'-এর ফাইলগুলো নিয়ে এসো।"

তার পর উপস্থিত সবাইকে ব্যাপারটা বললেন। লাভপুরের জমিদারবাড়িটা শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল হয়ে যাওয়ায় সবারই মাথায় প্রায় বাজ ভেঙে পড়ল। দেবদত্তা ফাইলটা এনে দেওয়ার পরে ফাইলের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে রেশমি সেন জানতে চাইলেন, "আমাদের সেকেন্ড, থার্ড চয়েসের বাড়ি কী-কী ছিল?"

ফাইল দেখার দরকার হল না। রোহনের মুখস্থ ছিল। রেশমি সেন ফাইল থেকে নাম বের করার আগেই রোহন বলে দিল, "দু'নম্বর ডায়মন্ড হারবারের বাড়িটা আর তিন নম্বর কোচবিহারের বাড়িটা।"

রেশমি সেন ফাইলটা রোহনের দিকে বাড়িয়ে বললেন, "এক্ষুনি ফোন করে দ্যাখো, আমাদের শিডিউল অনুযায়ী ১৭ থেকে ২০ তারিখ চার দিন বাড়িটা শুটিংয়ের জন্য পাওয়া যাবে কিনা।"

ফাইলে কনট্যাক্ট নম্বর দেখে রোহন ফোন করে এক মিনিটের মধ্যেই ফোনটা ছেড়ে দিয়ে মুখ ছোট করে বলল, "ডায়মন্ড হারবার হবে না। বিয়েবাড়ির জন্য বাড়িটার বুকিং হয়ে গেছে।"

দেবদত্তা ফিক করে হেসে ফেলল, "ভূতের বাড়িতে বিয়েবাড়ি?"

রেশমি কড়া গলায় দেবদত্তাকে ধমকে উঠলেন, "তোমার এখন হাসি পাচ্ছে? ক্রাইসিসটা বুঝতে পারছ না? গ্র্যান্ড ফিনালে করতে না-পারলে আমাদের কী পরিমাণ বদনাম হতে চলেছে বুঝতে পারছ? শুধু তাই নয়, গ্র্যান্ড ফিনালে আমরা করতে না-পারলে আমরা আর কোনও দিন কোনও রিয়্যালিটি শো-র কাজ পাব না। ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে যাব। আমাদের কোম্পানিটা পুরো ডুবতে চলেছে।"

রোহন তত ক্ষণে কোচবিহারের বাড়ির মালিককে ফোন করে ফেলেছে। কোচবিহারের বাড়িটাও হবে না। উপনির্বাচনের জন্য পুলিশ ক্যাম্প বুক করে রেখেছে। রেশমি সেন কপালের রগ দুটো চেপে বলে উঠলেন, "পেতেই হবে। পেতেই হবে। যেমন করে হোক একটা বাড়ি পেতেই হবে।"

রোহন ফাইলের পাতাগুলো ওল্টাচ্ছিল। অনেক বাড়ির ঠিকানা আছে এখানে। কিন্তু গ্র্যান্ড ফিনালের স্ট্রাকচার আর শর্ত মেনে এগুলোর কোনওটাই হবে না। হঠাৎ একটা পাতায় চোখ আটকে গেল রোহনের। পাতাটার মার্জিনে লেখা আছে একটা নাম, মাইকেল বিশ্বাস। আর সেই সঙ্গে তার মোবাইল নম্বর। হাতের লেখাটা রোহনের নিজের। লোকটা এক কালে প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিল। লোকটা একটু অদ্ভুত ধরনের কিন্তু সময় বিশেষে কাজের। এখন হাতে সে রকম কাজপত্তর নেই। যখন এপিসোডগুলোর জন্য নানা রকম বাড়ি খোঁজা হচ্ছিল তখন লোকটা কোনও এক সূত্রে খবর পেয়ে অফিসে দেখা করতে এসেছিল আর বলেছিল ওর কাছে অনেক রকম বাড়ির সন্ধান আছে। চাইলে

জোগাড় করে দিতে পারে। তবে লোকটা কাজের হলেও লোকটাকে কোনও কালেই পছন্দ নয় রোহনের। কী রকম যেন ধান্দাবাজ, ধুরন্ধর মনে হয়। এখন অবশ্য সে সব ভাবার সময় নেই। সব দিক চেষ্টা করে দেখতে হবে।

"ম্যাম, বাড়ি জোগাড় করে দেওয়ার একটা কনট্যাক্ট আছে।"

গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে রেশমি সেন চোখ বন্ধ করেই জিজ্ঞেস করলেন, "কার কনট্যাক্ট?"

রোহন সংক্ষেপে মাইকেল বিশ্বাসের নামটা বলতে রেশমি সেনও চিনতে পারলেন। তাগাদা দিয়ে বলে উঠলেন, "সব দিক চেষ্টা করতে থাকো। এক্ষুনি ফোন করো। হাতে সময় বড্ড কম।"

"ইয়েস ম্যাম," রোহন ফোন নম্বরে কল করতে রেশমি সেন বললেন, "ফোনটা স্পিকার মোডে নাও, আর আমাদের ক্রাইসিসটা বেশি বুঝতে দিয়ো না।"

রোহন ফোন করতেই ও প্রান্তে ফোনটা ধরে মাইকেল বিশ্বাস অমায়িক গলায় বলল, "নমস্কার স্যর। দেখুন, আপনার নামটা কিন্তু আমি সেভ করে রেখেছি। জানতাম কোনও না-কোনও দিন আপনি ঠিক ফোন করবেন। বলুন, এই অধম আপনার কি সেবা করতে পারে?"

রোহন গলাটাকে একটু গম্ভীর রেখেই বলল, "আপনি কাজ খুঁজছিলেন না?"

মাইকেল বিশ্বাস একটু খিক খিক করে হাসল, "তা তো সব সময় খুঁজছি। হাতে তো সে রকম কোনও কাজ নেই। দিন-রাত কাজের সন্ধান করছি। কিন্তু আপনি যখন ফোন করে যেচে কাজ দিতে চাইছেন মানে দরকারটা আপনার।"

রোহন এক বার রেশমি সেনের দিকে তাকাতেই রেশমি সেন ইশারায় কিছু নির্দেশ দিলেন। সেটা বুঝে নিয়ে রোহন বলল, "সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক। 'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ' দেখেন?"

"দেখি তো। শনিবার-শনিবার রাত্রি ন'টায় ওমেগা প্লাসে। তবে স্যর, আপনারা যে বাড়িগুলোয় শুটিং করেছেন, আমাকে একটি বার সুযোগ দিলে আরও ভাল সব এ-ক্লাস ভূতের বাড়ি জোগাড় করে দিতাম।"

"ধরুন সেই সুযোগই আপনাকে দিচ্ছি। পরের এপিসোডের জন্য আমাদের একটা বাড়ি দরকার।"

"পরের এপিসোড মানে গ্র্যান্ড ফিনালে। খবর আছে স্যর, বাকি সব এপিসোডের শুটিং হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই গ্র্যান্ড ফিনালের জন্যও বাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন। শেষ মুহূর্তে কোনও বিপদে পড়লেন নাকি স্যর?"

"উফ! অত কথায় আপনার কী দরকার? আমাদের শর্তগুলো আশা করি জানেন।"

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! এক, এমন ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে দিতে হবে, যে-বাড়ির ব্যাপারে সে রকম কোনও প্রচার নেই। মানে যে বাড়ির কথা সে রকম ভাবে কেউ জানে না। দুই, বাড়িটার একটা ইতিহাস থাকবে।"

"যদি ঠিক মতো কালকের মধ্যে বাড়ি জোগাড় করে দিতে পারেন তা হলে আমাদের রেশমি ম্যাম আর আমাদের ডিরেক্টর মি. মিত্র বাড়িটা দেখতে যাবেন।"

"এক দিনটা বড্ড কম হয়ে গেল। আর একটু বেশি সময় চাই।"

"কেন? আপনি যে বললেন আপনার হাতে প্রচুর বাড়ি আছে। আমাদের হাতেও কিন্তু প্রচুর লোক আছে।"

"না নেই স্যর। তা হলে আমাকে ফোন করতেন না। পাঁচ দিন সময় লাগবে আমার। আর টাকাকড়ির ব্যাপারটা এখন বলে নিলে ভাল হয় না কি?''

রেশমি সেন ইশারায় রোহনকে রাজি হয়ে যেতে বললেন। ''টাকাকড়ির ব্যাপারে পরে কথা হবে, আগে বাড়িটা তো ফাইনাল হোক," বলে রোহন ফোনটা ছাড়তেই রেশমি সেন বললেন, "একা মাইকেল বিশ্বাসের ওপর ভরসা করে বসে থাকলে হবে না। আরও খোঁজ করো।"

॥ ৩ ॥

মাইকেল বিশ্বাসের ভাইপো বিল্টু আর ভাগ্নে লাল্টু। কাজে-অকাজে ওরাই মাইকেল বিশ্বাসের চেলা। ওদের অবশ্য 'চেলা' শব্দটায় ঘোর আপত্তি আছে। নিজেদের বলে স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট। রোহনের সঙ্গে কথা হয়ে যাওয়ার পরে দু'দিন কেটে গিয়েছে। এই দু'দিনে সব রকম চেষ্টা করে মনের মতো কোনও বাড়ি না-পেয়ে প্রায় হতাশ হয়ে শেষ মুহূর্তে একটা জব্বর প্ল্যান মাথায় এসেছে মাইকেলের। মাইকেলের আফসোস হচ্ছে, ইস, এই বাড়িটার কথা মাথায় আগে এল না কেন? যে বাড়িটার কথা ভাবছে, তার কোনও মালিক নেই। অর্থাৎ কাউকে কোনও ভাড়া দিতেও হবে না। স্পাইন চিলিং প্রোডাকশনের থেকে যা টাকা পাবে, পুরোটাই লাভ। হাতে সময় বড্ড কম। পাঁচ দিন সময় চেয়েছিল মাইকেল। তার মধ্যে দু'দিন হাবিজাবি জায়গায় বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতেই কেটে গিয়েছে। হাতে আর মাত্র তিন দিন। প্ল্যান অনুযায়ী এক জনের সঙ্গে কথা বলেছে। সে আজ থেকে কাজ শুরু করবে। সেটা ঠিকঠাক হলে প্রথমে স্পটে পাঠাতে হবে নিজের চেলাদের। আজকে রাতের মধ্যে ফাইনাল করে ফেলতে হবে সব কিছু।

মাইকেল ফোন করে ডেকে নিয়েছে বিল্টু আর লাল্টুকে। কাজটা উদ্ধার করতে হবে বিল্টু আর লাল্টুকে দিয়ে। বিল্টু আর লাল্টু দুই মূর্তি এক সঙ্গেই মাইকেলের বাড়ি এসে হাজির হল। ডোরবেল টিপতেই মাইকেল দরজা খুলতে লাল্টু বলল, "কী ব্যাপার মামা, এত জরুরি তলব?"

মাইকেল বেরিয়ে এসে বাড়ির দরজাটা বন্ধ করে বলল, "চল। বড় কাজ পেয়েছি। ঠিকমতো নামাতে পারলে দাঁওটাও বেশি।"

বিল্টু এক বার আড় চোখে লাল্টুর দিকে তাকাল। কাকার দাঁও বেশি বা কম যা-ই হোক, ওদের ভাগ্যে সেই একই ছিটেফোঁটা জুটবে। বেশি টাকা চাইলে কাকা ধমকে বলে, "কম বয়সে হাতে বেশি টাকা পেলে উচ্ছন্নে যাবি। যতটুকু তোদের মোগলাই, কষা মাংস খাওয়ার জন্য দরকার, ততটুকুই হিসেব করে দিয়েছি।"

তা সেই মোগলাই, কষা মাংস খাওয়ার টাকাও বহু দিন জুটছে না। কারণ মাইকেলের হাতে কোনও কাজ নেই। লাল্টু জানতে চাইল, "কাজটা কী বলবে মামা?"

বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে-হাঁটতে মাইকেল বলল, "হাতে সময় বড্ড কম। কিন্তু ব্যবস্থা করতেই হবে।"

কাকা বা মামা এ রকম আনমনা মানে বিল্টু-লাল্টুরা জানে, এইরকম সময় বিস্তারিত জিজ্ঞেস করে কোনও লাভ হবে না। মাইকেল আনমনা হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে এসে একটা হলুদ ট্যাক্সি ধরল। পিছনে বিল্টু আর লাল্টু বসল। মামার মতো কিপটে লোক যখন ট্যাক্সি ধরল, তার মানে সত্যিই একটা বড়সড় কাজ আছে। বিল্টুদের অবাক করে দিয়ে ট্যাক্সি এসে থামল একটা শপিং মলের সামনে।

বিল্টু আর লাল্টু কিছুই বুঝতে পারছে না, হঠাৎ শপিং মলে কেন? মনের মধ্যে অবশ্য একটা আশা উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল। মামা এক বার বলেছিল শপিং মলে নিয়ে গিয়ে জামা কিনে দেবে। খাওয়াবে। আজকে কি সেই শুভ দিন? মামা বড় কাজ পাওয়ার পর খাওয়াবে? এই শপিং মলের ছাদে ফুড কোর্ট আছে।

মনের মধ্যে আশাটা আরও জোরালো হতে থাকল যখন এসক্যালেটর করে এক-একটা তলা বেয়ে-বেয়ে উঠে ফুড কোর্টে এসে থামল মাইকেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাবারের কাউন্টারের দিকে না-গিয়ে অন্য একটা ফাঁকা-ফাঁকা কোণে এল। সেখানে প্লাইউড ঘেরা একটা ঘর। ঘরটায় কোনও জানলা নেই। শুধু সামনে আর পিছনে একটা করে দরজা। একটা দরজার উপর লেখা আছে 'এন্ট্রি', আর-একটা দরজায় 'এগজ়িট'। দুটো দরজারই কোনও পাল্লা নেই। শুধু একটা করে মোটা কালো কাপড় ঝুলছে। ঘরটার মাথায় লেখা আছে 'হন্টেড ভিলা'।

ঘরটার বাইরে কোনাকুনি একটু দূরে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে বসে ঝিমোচ্ছে একটা লোক। মাইকেল তার কাছে এগিয়ে গিয়ে

টেবিলটা ঠুকে বলল, "শো দেখা যাবে?"

লোকটা মাইকেলের দিকে না-তাকিয়েই চোখটা অল্প খুলে ঘাড়টা একটু চুলকে নিয়ে বলল, "না, বন্ধ আছে।"

মাইকেল রেগে উঠে বলল, "তা হলে চেয়ার-টেবিল পেতে টিকিটের বাক্স নিয়ে এখানে কি ঘুমোতে এসেছিস হতচ্ছাড়া?"

লোকটা এ বার মাইকেলের দিকে তাকিয়ে চোখ বড়-বড় চোখ করে বলল, "ও মাইকেলদা, আপনি!"

"চিনতে পেরেছিস তা হলে?"

লোকটা জিভ কেটে বলল, "কী যে বলেন মাইকেলদা, আপনাকে চিনতে পারব না?"

মাইকেল বিল্টু আর লাল্টুকে দেখিয়ে বলল, "আমার ভাইপো আর ভাগ্নে। ওদের তোদের শো দেখাতে নিয়ে এলাম।"

লোকটা আক্ষেপের গলায় বলল, "ইস, এক বারটি যদি ফোন করে আসতেন মাইকেলদা।"

"আরে, তোর ফোন নম্বর আমার কাছে সেভ করা আছে নাকি? তোর সঙ্গে এক বার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। তখন তো বলেছিলি, শো খুব ভাল চলছে।"

লোকটা কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "সে তো অনেক দিন হয়ে গেল। সে সব দিন গেছে মাইকেলদা। এখন আর একদম খদ্দের হচ্ছে না। এই তো গত দু'দিন এক জনও আসেনি। সামনের মাস পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া আছে। তার পর ভাবছি অন্য ব্যবসা করব। আপনার কাছে নতুন কোনও ব্যবসার বুদ্ধি আছে নাকি মাইকেলদা?"

"সে তোকে অনেক ব্যবসার বুদ্ধি দিয়ে দেব। আপাতত আমার ভাইপো-ভাগ্নে দুটোকে শো দেখানোর ব্যবস্থা কর। বড় মুখ করে নিয়ে এলাম ওদের।"

লোকটা মাথা চুলকে বলল, "সেই তো মাইকেলদা। আপনার ভাইপো-ভাগ্নে মানে আমারও ভাইপো-ভাগ্নে। তবে সমস্যা একটাই।"

"কী আবার সমস্যা?"

লোকটা নিচু গলায় ফিসফিস করে বলল, "ভূতেরা আজকে আসেনি। আমিও জোর করিনি। এলেই তো পেমেন্ট দিতে হবে।"

মাইকেল খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "এই জন্যই তোর ব্যবসা চলছে না। কুঁড়ের বাদশা সব। লোকে কি অপেক্ষা করবে ভূতের জন্য না ভূত অপেক্ষা করবে লোকের জন্য? ব্যবসাটা করতে গেলে জিনিসটা তোকে ভাল ভাবে বুঝতে হবে।"

লোকটা আরও মাথা চুলকোতে থাকল, "সে আপনি ঠিকই বলেছেন মাইকেলদা।"

তার পর লোকটা একটু ভেবে বলল, "দু'জনের মধ্যে এক জনকে তো কিছুতেই পাওয়া যাবে না। কারণ সে দেশের বাড়িতে।"

"দেশের বাড়ি কোথায়?"

"সে পুরুলিয়ার এক গ্রামের দিকে।"

"এ বাবা। এ দিকে আমার যে খুব জরুরি দরকার।"

"মানে আপনার ভাইপো-ভাগ্নেকে শো এক্ষুনি দেখানোর দরকার?" লোকটা বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

মাইকেল ছটফট করে উঠে বলল, "হ্যাঁ, তা-ই। তা-ই!"

লাল্টু আর বিল্টু কিছুই বুঝতে পারছে না। মামার সঙ্গে অনেক জায়গায় গেলেও মামা এখানে কখনও নিয়ে আসেনি। লোকটার সঙ্গে মামার কী সম্পর্ক, সেটাও বুঝতে পারছে না।

মাইকেল লোকটাকে কড়া গলায় বলল, "তোর যদি বিন্দু মাত্র কৃতজ্ঞতা থাকে আমার জন্য, তা হলে দ্যাখ কী ব্যবস্থা করতে পারিস।"

"আপনি তো সবই জানেন। এক জন ভূতে চলবে?"

"নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। ডাক তাকে। আমরা অপেক্ষা করছি।"

লাল্টু একটু ফুসরত পেয়ে মাইকেলকে সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "মামা উনি কি ওঝা? ভূত ডাকতে পারেন?''

মাইকেল হেঁয়ালি করা গলায় উত্তর দিল, "দেখতেই পাবি সেটা। আর সে জন্যই তো তোদের নিয়ে আসা।"

লোকটা মোবাইলে নিচু গলায় কারও সঙ্গে কথা বলে মাইকেলকে বলল, "মিনিট চল্লিশেক সময় লাগবে মাইকেলদা। আপনারা কি তা হলে একটু বসবেন?"

"কোথায় বসব? এখানে তো নিজেরটা ছাড়া কোনও চেয়ারই রাখিসনি।"

লোকটা যেন অপরাধ বোধে মাথা চুলকোতে থাকল, "কী আর আপনাকে বলি দাদা। তা হলে একটা কাজ করতে পারেন। আপনারা বরং ফুডকোর্টে গিয়ে বসুন।"

"তোরা একটু দাঁড়া। আমি চট করে ঘুরে আসছি,'' মাইকেল লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

লাল্টু আর বিল্টুর মনটা আশায় দুলছে। মামা নিশ্চয়ই এটিএম থেকে টাকা তুলতে গেছে। ওরা ঘুরে-ঘুরে ফুডকোর্টে কোথায় কী পাওয়া যায় দেখছে। ফুডকোর্টের ছোট-ছোট কাউন্টারের মাথায় এক-একটা জিভে জল ঝরানো মেনু লেখা বোর্ড টাঙানো আছে। কোনওটা চাইনিজ়, কোনওটা মোগলাই পরোটা, পিৎজ়া আরও কত কী! কোনও-কোনও কাউন্টারে আবার প্লেটে খাবার পর্যন্ত সাজিয়ে সেলোফেনে মুড়ে রাখা আছে। কিপটে হলেও মামা বা কাকার মন বোধ হয় আজ উদার। খরচ করার মন না-থাকলে কেন ট্যাক্সি করে নিয়ে এল? সামনে বড় কাজ আছে বলেই মনটা এ রকম ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ। লাল্টু-বিল্টুকে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী খাবি, ঠিক করেছিস?"

"আমি ভাবছি যদি চিকেন চাউমিন আর ফ্রায়েড রাইস একটা করে নিয়ে হাফ-হাফ ভাগ করে খাই?"

"আপত্তি নেই। কিন্তু সাইড ডিশ?"

"সেটাও যদি চিলি চিকেন আর সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন নিয়ে হাফ-হাফ ভাগাভাগি করে নিই?"

"না, সুইট অ্যান্ড সাওয়ারটা বড্ড মিষ্টি। তার চেয়ে গার্লিক চিকেনটা ভাল হবে।"

"গার্লিক চিকেনটা আবার আমার খুব পাতলা লাগে।"

"তোরা এখানে?" মাইকেল পিছন থেকে এসে দু'জনের কাঁধে হাত রেখে বলল।

"হ্যাঁ চলো। আগে ওই কোনার কাউন্টার থেকে কার্ড করে টাকা ভরাতে হবে। তার পর সেই কার্ড দিয়ে যে-কোনও কাউন্টার থেকে ইচ্ছেমতো খাবার কেনো।"

লাল্টু আর বিল্টু পা বাড়াল। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু মাইকেল কোনার কাউন্টার ছাড়িয়ে এসক্যালেটরের মুখে এসে নীচে নামতে থাকল। বিল্টু উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল, "ফুডকোর্টে যাবে না কাকা?"

মাইকেল গজগজ করে উঠল, "কাজের সময় শুধু খাওয়ার চিন্তা!"

বিল্টু আর লাল্টুর মুখ দুটো শুকিয়ে গেল। চুপ করে মাইকেলের সঙ্গে শপিং মলের বাইরে বেরিয়ে এল। রাস্তাটা পেরিয়ে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। সেখান থেকে চা আর একটা করে প্রজাপতি বিস্কুট নিয়ে খেতে-খেতে মাইকেল বলল, "তোদের দু'জনকে কালকেই বেরিয়ে পড়তে হবে। হাতে সময় বড্ড কম।"

"কোথায়?"

গম্ভীর গলায় মাইকেল বলল, "গোবর্ধনপুর।"

দু'জনে বিস্মিত গলায় বলে উঠল, "গোবর্ধনপুর, মানে আমাদের দেশের বাড়ি?"

মাইকেল মাথা নাড়ল, "ঠিক তা-ই। তবে তোদের দু'জনকে একাই যেতে হবে।"

বিল্টু চিন্তিত গলায় বলল, "তুমি যাবে না? ওখানে তো বড় হয়ে কখনও যাইনি। কাউকে চিনি না।"

"না, বিশেষ কারণে আমি এখনই যেতে পারব না। যথা সময়ে যাব। চিন্তা করিস না। তোদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

"কোথায়?"

"আদুরিপিসির বাড়ি। আর তোদের যা কাজ সব বুঝিয়ে দেব।"

"ওরে বাবা। আদুরিঠাকুরমাকে কখনও চোখে দেখিনি। তবে বাবার মুখে শুনেছি তিনি প্রচণ্ড রাগী আর ঝগড়ুটে।"

"তাতে তোদের কী? আমাকে তো ভীষণ ভালবাসেন। ফোন করে তোদের কথা বলতেই বললেন, আজই পাঠিয়ে দে। কিছুতেই শুনছেন না। আমি বুঝিয়েসুজিয়ে কাল তোদের পাঠাব বলেছি।"

"কিন্তু আদুরিঠাকুরমার কাছে গিয়ে কাজটা কী বলবে তো। একটু তো হিন্ট দাও।"

মাইকেল চায়ের দোকানের কাচের বয়াম থেকে আর-একটা প্রজাপতি বিস্কুট নিয়ে বলল, "একটা শুটিংয়ের কাজ। আমি লোকেশন ম্যানেজারের কাজটা পেয়েছি। বিষয়টা এমনই যে, গোবর্ধনপুরের কাছে একটা জমিদারবাড়ি আদর্শ লোকেশন। এ সব কিন্তু একান্ত গোপনীয়। কারও সঙ্গে আলোচনা করবি না। এমনকি, নিজেদের মধ্যেও ফিসফাস করে নয়। মনে রাখবি দেওয়ালেরও কান আছে আর দেওয়াল কিন্তু কালা নয়।"

মাইকেল যে টালিগঞ্জ পাড়ায় টুকটাক কাজকর্ম করে, সেটা জানা আছে। তবে কখনও আউটডোর খোঁজার কাজ পেয়েছে শোনেনি। ইতিউতি শুটিংয়ের দলে কাজ করেছে। এমনকি, দরকার পড়লে টুকটাক এক্সট্রা রোল করে দিয়েছে, ওই মৃত সৈনিকের রোলের মতো।

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, "কোন সিনেমার শুটিং কাকা?"

লাল্টু জানতে চাইল, "হিরো-হিরোইন কে?"

মাইকেল রেগে উঠে বলল, "এত প্রশ্ন করিস না। বললাম না, দেওয়ালেরও কান আছে। আমাদের কাজ শুটিং লোকেশন ঠিক করা। আমার বাড়িটা হাতের তালুর মতো চেনা। শুধু..."

মাইকেল চুপ করে গেল।

"শুধু কী কাকা?"

মাইকেল দু'জনের দিকে খানিক ক্ষণ উদাস চোখে তাকিয়ে থাকল। তার পর দু'জনের কাঁধে আলতো করে থাবড়া মারতে-মারতে বলল, "আমার বিশ্বাস, তোরা ঠিক পারবি। এক বার শো-টা দেখে নে। আচ্ছা শোন, দু'বাড়িতেই আমি বলে দিচ্ছি। দু'-চার দিনের জন্য জামাকাপড় গুছিয়ে কাল দুপুরে ভাতটাত খেয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যাবি। বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে নিস। আদুরিপিসির জন্য একটু মিষ্টিফিষ্টি নিয়ে যাস। দুপুর-দুপুর বর্ধমান লোকাল ধরতে পারলে বিকেলের মধ্যে বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছে যাবি। ওখান থেকে বাসে ঘণ্টা দেড়েক। মানে..."

মাইকেল হাতের তালুতে একটা ঘুষি মেরে বলে উঠল, "সন্ধের মুখ, খাপে খাপ। আদর্শ সময়।"

কিছুই মাথায় ঢুকছে না বিল্টু আর লাল্টুর। বিল্টু বলল, "কালকের বদলে কয়েক দিন পরে গেলে হয় না কাকা? পাড়ায় ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে। রবিবার ফাইনাল।"

প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল মাইকেল, "না-না, এটা আরও বড় ফাইনাল। গ্র্যান্ড ফিনালে। হাতে সময় বড্ড কম। কালকেই যেতে হবে তোদের। আর তোদের এখানে রাজকার্য আছেটা কী? টুয়েল্ভের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে তো দুটোয় বসে আছিস! ফুটবল খেলে-খেলে তো গোল্লায় যাচ্ছিস!"

"কিন্তু কিছুই তো বুঝতে পারছি না, ওখানে গিয়ে করবটা কী?"

"বললাম তো, সব বুঝিয়ে দেব," মাইকেল আবার ঘড়ি দেখে বলল, "চল। সময় হয়ে গেছে। ভূত নিশ্চয়ই এত ক্ষণে চলে এসেছে।"

রাস্তা পেরিয়ে শপিং মলের দিকে যেতে-যেতে মাইকেল কাউকে একটা ফোন করল, "হ্যালো শিবেনদা, আজকে রাতের কাজটা মনে আছে তো... কালকে আমার ভাইপো-ভাগ্নে পৌঁছে যাবে... হ্যাঁ-হ্যাঁ, পেমেন্ট আমি পেলেই তুমি পেয়ে যাবে... আগে কাজটা তো করো।"

॥ ৫ ॥

অনেক বছর পর শীতটা এ বার বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। এখন রাত্রি একটু বাড়তে না-বাড়তেই রাস্তাঘাট একদম শুনশান হয়ে যায়। চরাচরে চাপ কুয়াশা। গোবর্ধনপুরের মতো গ্রামগুলো সন্ধে নামতে না-নামতেই একেবারে নিঝুম হয়ে যায়।

গোবর্ধনপুর গ্রামটা বড় রাস্তা থেকে বেশ একটু ভিতরে। বড় রাস্তা থেকে গোবর্ধনপুর গ্রাম পর্যন্ত পাকা রাস্তা নেই। আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা। তার দু'দিকে ধানের ক্ষেত। গ্রামে ঢোকার এই মুখটায় দীননাথের ছোট্ট হোগলা ঘেরা দোকান। দীননাথ ভোরের মুখেই দোকান খুলে ফেলে। চা-বিস্কুট থেকে শুরু করে দুপুরে ভাত-তরকারি, সব কিছুই পাওয়া যায় দীননাথের দোকানে। দোকানটা একলাই চালায়। স্থানীয় চাষিরা ওর খদ্দের। বিকেলে সবাই বাড়ি ফিরে গেলে দীননাথের আর তেমন খদ্দের হয় না। তবুও দীননাথ দোকান বন্ধ করে না। একলা মানুষ। দোকানটাই দীননাথের সব। দীননাথের দোকানে একটা রেডিয়ো আছে। যত ক্ষণ দোকান খোলা থাকে, রেডিয়োটাও খোলা থাকে। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে বা অবসরে রেডিয়ো শোনাই দীননাথের এক মাত্র নেশা। রাতে নিজের খাওয়ার জন্য রুটি-তরকারিটাও দীননাথ দোকান বন্ধ করার আগে তৈরি করে নিয়ে যায়।

দীননাথের একটা পোষা কুকুর আছে। তার নাম লালি। লালি সারা দিন দীননাথের দোকানের চার পাশে ঘুরঘুর করে। সময়-সময়ে খাবার জন্য দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। দোকান বন্ধ করে দীননাথ যখন বাড়ি যায়, লালিও পিছন-পিছন যায়।

আজকে দীননাথ প্রত্যেক দিনের মতো রাতের রুটি করার ফাঁকে ফাঁকে দোকান বন্ধ করার তোড়জোড় করছিল। লালি দোকানের বাইরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ লালি ডেকে উঠল। লালির ডাকগুলো দীননাথ খুব ভাল করে চেনে। এই ডাকটা মানে কেউ এ দিকে আসছে। দীননাথ মুখ তুলে দেখল বড় রাস্তার ধার দিয়ে সাইকেল গড়িয়ে কেউ এক জন হেঁটে আসছে। আর-একটু এগিয়ে আসতে দীননাথ চিনতে পারল। লালিকে মৃদু ধমকে বলল, "কী রে, তুই চিনতে পারছিস না যে? ও তো শিবেন ঠাকুর।"

শিবেন ঠাকুর গ্রামের রক্ষাকালী মন্দিরের পূজারি। এই দিকে খুব একটা আসে না। মন্দিরটা গ্রামের ভিতর। দীননাথ গায়ে কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এল। শিবেন ঠাকুর আর-একটু এগিয়ে আসতে দীননাথ গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, "কী গো ঠাকুর, এ দিকে কোথায় গিয়েছিলে? সাইকেলের কী হল?"

শিবেন ঠাকুর আর-একটু এগিয়ে এসে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে বলল, "একটা কাজে গিয়েছিলাম।"

দীননাথের বেশ অবাক লাগল। বড় রাস্তা ধরে অনেকটা গেলে পরের গ্রামটা পড়ে আর এই অন্ধকারে শিবেন ঠাকুর একা-একা ও দিক থেকেই সাইকেল গড়িয়ে নিয়ে আসছে। কোথায় গিয়েছিলে জিজ্ঞেস করায় শিবেন ঠাকুর স্পষ্ট কোনও উত্তর দিল না। শিবেন ঠাকুরের মুখটা দেখে মনে হচ্ছে বেশ চিন্তিত। দীননাথ বলল, "ঘরে ফিরছ তো? দাঁড়াও, আমারও দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। ঝাঁপটা ফেলে দিয়ে এক সঙ্গে যাব।"

শিবেন ঠাকুর আপত্তি না-করে সাইকেলটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে দোকানের মধ্যে এসে বেঞ্চে বসে বলল, "একটু চা হবে রে দিনু? সাইকেল টানতে-টানতে হাঁপিয়ে গেলাম।"

দীননাথ রুটি করে উনুনটা তখনও নিভিয়ে ফেলেনি। শিবেন ঠাকুর বড় একটা আসে না। সাইকেলটা দেখেই বুঝতে পেরেছে পিছনের টায়ারটা পাংচার হয়েছে। সামান্য চা খেতে চেয়েছে শিবেন ঠাকুর। দীননাথ না বলতে পারল না। চায়ের জল চাপিয়ে দীননাথ জানতে চাইল, "তোমার শরীর ঠিক আছে তো ঠাকুর?"

শিবেন ঠাকুরের মধ্যে একটা দোলাচল চলছিল। মাইকেলের কাজটা করতে সঙ্গে খুব বিশ্বাসযোগ্য কাউকে চাই। মাইকেল যদিও

ওর ভাইপো-ভাগ্নেকে কাল পাঠাবে বলেছে, কিন্তু ওরা ছেলেমানুষ। গোবর্ধনপুর গ্রামটাকেই চেনে না। দীননাথ লোকটা সাদাসিধে। এক বার বাজিয়ে দেখা যেতেই পারে। শিবেন ঠাকুর জিজ্ঞেস করল, "তুই এখানে কত দিন আছিস রে দিনু?"

দীননাথ হেসে ফেলল। শিবেন ঠাকুর গ্রামে নতুন। শিবেন ঠাকুরের বড়মামা মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। বড়মামা মারা যাওয়ার পর শিবেন ঠাকুর মন্দিরের পূজারি হয়েছে। দীননাথ হেসে বলল, "কত পুরুষ আমার এই গ্রামে আছি জানি না। এই গ্রামের বাইরে কোথাও যাইনি। আজন্ম এখানেই আছি।"

"তোর এই দোকানটা কত বছরের?"

"অত হিসেব জানি না। সে অনেক কাল হবে। এ সব কেন জিজ্ঞেস করছ গো ঠাকুর?"

"বলছি। আচ্ছা, তুই তো রোজ দোকান বন্ধ করে একা-একা হেঁটে গ্রামের মধ্যে ফিরিস, তাই তো?"

এ আবার কেমন ধারা প্রশ্ন? সবাই তো জানে এখানে ধারেপাশে আর কোনও দোকান নেই। দীননাথ চা ছাঁকতে-ছাঁকতে বলল, "একা কোথায় ফিরি? ওই যে লালি থাকে সঙ্গে।"

"আহ, তোর কুকুরের কথা বলছি না। মানুষ, মানুষ। তুই তো একা মানুষ রাতে হাঁটতে-হাঁটতে গ্রামের মধ্যে ফিরিস। আচ্ছা, কখনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিস?''

দীননাথের মাথায় ঢুকল না, এ সব কী জিজ্ঞেস করছে শিবেন ঠাকুর। বলল, "অস্বাভাবিক কী গো? নাও, চা-টা ধরো। বিস্কুট খাবে?"

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিল শিবেন ঠাকুর। এই শীতে কড়া করে চা-টা বেড়ে বানিয়েছে দীননাথ। চায়ে চুমুক দিয়ে একটু চনমনে হল শরীরটা। নাহ, দীননাথকে যদি দলে নিতে হয় তা হলে এত রাখ রাখ ঢাক ঢাক করে বললে হবে না। সরাসরি বলতে হবে।

"তুই রাতের বেলায় একা-একা যেতে-যেতে কখনও ভূত দেখিসনি দিনু?" শিবেন ঠাকুর বড়-বড় চোখ করে জিজ্ঞেস করল।

"ভূত!" হো হো করে হেসে উঠল দীননাথ, "এখানে ভূত কোথায় থাকবে গো ঠাকুর? গ্রাম পর্যন্ত পথের দু'দিকে ফাঁকা চাষের মাঠ। রাস্তার দিকে কয়েকটা বড়-বড় গাছ আছে বটে, কিন্তু গাছের ডালেও ভূতপ্রেত, শাঁকচুন্নি কোনও দিন দেখিনি, শুনিওনি।"

দীননাথের হাত ধরে টেনে শিবেন ঠাকুর দোকানের বাইরে দূরে একটা জায়গা দেখাল। ওই দিক থেকেই শিবেন ঠাকুর হেঁটে আসছিল। দীননাথ জিজ্ঞেস করল, "কী দেখাচ্ছ বলো তো? ওই দিকে কী আছে? চাষের মাঠ, দুটো পুকুর, পুকুরপাড়ে তাল গাছ..."

"আহ!" বিরক্ত হয়ে উঠল শিবেন ঠাকুর, "আর কী আছে ভাল করে দ্যাখ।"

দীননাথ চোখটাকে ছোট করল। চাঁদনি আলো থাকলেও চরাচরে কুয়াশা পর্যন্ত আর তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শিবেন ঠাকুর এক দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, "এই বললি আজন্ম এই গ্রামে আছিস। আর ও দিকে কী আছে জানিস না?"

হঠাৎ মনে পড়ে গেল দীননাথের, "পুরনো জমিদারবাড়ি... হরিমতী পাঠশালা।"

দীননাথের কাঁধটা দু'বার চাপড়ে দিল শিবেন ঠাকুর, "এই তো ঠিক দেখেছিস। আর ওই হরিমতী পাঠশালায় আছে ভূত।"

হরিমতী পাঠশালা একটা পুরনো পরিত্যক্ত পাঠশালা। গ্রামে যখন জমিদার প্রথা ছিল, সেই জমিদারদের বাগানবাড়ি ছিল ওটা। পরে জমিদারদের শরিকদের মামলা-মকদ্দমা হওয়ায় ও বাড়ি আর কারওই হল না। বাড়িটার এক তলার একটা ঘরে গ্রামেরই এক মানুষ, অশ্বিনী ভট্টাচার্য পাঠশালাটা করেছিলেন। অশ্বিনী ভট্টাচার্য অনেক কাল মারা গিয়েছেন। তা ছাড়া অনেক দিন হল, কাছেই হাই স্কুলও হয়ে গিয়েছে একটা। তাই পাঠশালাটা অনেক দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। চার ক্লাস পর্যন্ত এই পাঠশালায় পড়েছে দীননাথ। তবে কোনও দিন শোনেনি, হরিমতীর পাঠশালায় ভূত আছে। জমিদারবাড়িটা এখন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে বটে, তবে দুপুরবেলায় কৃষকরা অনেক সময় ওখানে জিরোতে আসে।

"কী বলছ গো ঠাকুর, পাঠশালায় ভূত?" বিস্মিত চোখে দীননাথ জিজ্ঞেস করল।

শিবেন ঠাকুর এ বার দীননাথের কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকাতে থাকল, "হ্যাঁ ভূত, আমি নিজের চোখে দেখেছি। এই মাত্র দেখে আসছি। আর দ্যাখ, ওখানেই ফস করে সাইকেলের টায়ারটা পাংচার হয়ে গেল।"

"না গো, আমি দেখিনি... বিশ্বাস করো," দীননাথ মাথা ঝাঁকাতে থাকল।

"আমি দেখিয়ে আনব তোকে। কালকে... না না, কালকে নয়। কালকে অন্য কাজ আছে। পরশু। পরশু ঠিক এই সময় হরিমতীর পাঠশালায় ভূত দেখিয়ে আনব তোকে।"

শিবেন ঠাকুরের নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়েছে। নির্বিঘ্নে বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। দীননাথ তাড়াতাড়ি দোকানটা বন্ধ করে বলল, "চলো, বাড়ি ফিরি।"

॥ ৬ ॥

রিমোট দিয়ে টিভিটা বন্ধ করে আর্যশেখর চৌধুরী গম্ভীর গলায় ডাক দিলেন, "গোবিন্দ! গোবিন্দ!"

এত ক্ষণ টিভিতে 'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ' দেখছিলেন আর্যশেখর। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গোবিন্দও দেখছিল। আর্যশেখর শনিবার রাতে টাটকা এপিসোড দেখেন না। দেখেন মঙ্গলবার দুপুরে রিপিট টেলিকাস্ট। নিজের লাইব্রেরিতে বসে টিভিতে এই অনুষ্ঠানটা দেখেন। এই শোয়ের অন্যতম প্রতিযোগী নাতি বাপ্পাদিত্য।

আর্যশেখর কেন শনিবার রাতে এই শো-টা দেখেন না, সবাই জানে। রাতে ভৌতিক ব্যাপারস্যাপার দেখতে ওঁর প্রবল অসোয়াস্তি হয়। বুক ধড়ফড় করে। গ্যাস-অম্বলের ওষুধ খেতে হয়। কিন্তু মুখে এই কারণটা কিছুতেই প্রকাশ করেন না। আর্যশেখরের প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে বাড়ির কেউ এই ব্যাপারে মুখ খুলতে পারে না। আর্যশেখরের ডাক শুনে গোবিন্দ দৌড়ে এসে বলল, "স্যর।"

"ডাক তোর ছোড়দাকে।"

ছোড়দা মানে বাপ্পাদিত্য। বাড়ির নাম বাপ্পা। গোবিন্দ বুঝতে পারল স্যর খুব রেগে আছেন। তবে রেগে থাকার কারণ বুঝতে পারল না। স্যরের তো খুশি হওয়া উচিত। যদিও গোবিন্দ শনিবার থেকেই জানে, কিন্তু স্যর তো এই মাত্র জানলেন, ছোড়দা আজ সেকেন্ড হয়ে পরের রাউন্ডে উঠেছে। পরের শনিবার আবার ছোড়দাকে দেখা যাবে পরের এপিসোডে। কী সাহস ছোড়দার। একটুও ভয় পায় না।

গোবিন্দর দিকে মুখ তুলে আর্যশেখর হুংকার দিয়ে উঠলেন, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কী! কথা বুঝতে পারিস না? বাপ্পাকে এক্ষুনি ডাক।"

গোবিন্দ পড়ল মহা দোটানায়। ছোড়দার কড়া নির্দেশ আছে, এপিসোড দেখার পর দাদু ডাকলে যা হোক করে গোবিন্দ যেন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এমন ধমকানি খেয়ে যেতেই হল ছোড়দার কাছে। গোবিন্দ দোতলায় এসে দেখল ছোড়দা মোবাইলে কারও সঙ্গে শো নিয়েই কথা বলছে। তার মধ্যেই গোবিন্দ বলল, "স্যর এক্ষুনি লাইব্রেরিতে ডাকছেন তোমাকে।"

ফোনটা নামিয়ে বাপ্পা জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"জানি না। ভীষণ রেগে আছেন মনে হল।"

বাপ্পার হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ মঙ্গলবার। বলল, "তোমাকে কী বলে রেখেছি গোবিন্দদা?"

"আজ কোনও উপায় নেই। তোমাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে যেতে না-পারলে আমার চাকরিটাই যাবে।"

বাপ্পা বলল, "বুঝেছি। এই এপিসোডে ফার্স্ট হইনি। তাই তো?"

"সে আমি কী জানি? তুমি গিয়ে দ্যাখো।"

গোবিন্দর পিছন-পিছন বাপ্পা এক তলায় দাদুর লাইব্রেরিতে নেমে এল। বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের এক দিকে আর্যশেখর গুম মেরে বসে আছেন। বাপ্পা আসতেই খুব গম্ভীর গলায় টেবিলের উল্টো দিকে চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, "বোসো।"

আর্যশেখর এক কালে দুঁদে ব্যারিস্টার ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। অবসরযাপনের প্রিয় জায়গা কিন্তু এই লাইব্রেরিটাই। তিন দিকে দেওয়ালে ঠাসা আইনের বই। আর্যশেখর গম্ভীর গলায় বললেন, "তোমাকে আমি কোনও দিন স্কুলের পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার জন্য চাপ দিয়েছি?"

বাপ্পা মাথা নাড়ল, "না।"

"তুমি অঙ্কে কাঁচা, কোনও দিন ভাল নম্বর পাওনি, কিছু বলেছি? কোনও দিন স্পোর্টসে গোল্ড মেডেল আনার জন্য চাপ দিয়েছি?"

বাপ্পা আবার মাথা নাড়ল, "একদম না।"

"কিন্তু আজ আমি তোমার কাছে জবাবদিহি চাইছি, তারাপীঠের হোটেলে তুমি সেকেন্ড হলে কেন? ওরা কি তোমার সঙ্গে কোনও অন্যায় করেছে? দশ বছর হয়ে গেল আমি ওকালতি ছেড়েছি। কিন্তু এই শুধু তোমার জন্য আমি আবার কালো কোট গায়ে চাপাব। আর তুমি জানো আমি কোনও কেস কোনও দিন হারিনি। চ্যানেল ওমেগা প্লাসের বিরুদ্ধে মামলা করব আমি। একেই যত সব ভূত-প্রেতকে মদত দিচ্ছে ওরা। তার উপর জোচ্চুরি। তোমার ফার্স্ট হওয়া উচিত ছিল। আমার রাগ হচ্ছে ওইখানে যে মেয়েটা, সঞ্জনাকে ওরা ফার্স্ট করে দিল, চৌধুরী বংশের ছেলে হয়ে তুমি প্রতিবাদ পর্যন্ত করলে না!"

বাপ্পা স্পাইন চিলিং প্রোডাকশনকে সমর্থন করে বলল, "মাঝে-মাঝে একটু এ-দিক ও-দিক করতে হয়। তা ছাড়া এই এপিসোডে সঞ্জনা সত্যিই ভাল করেছে। আর তুমি বুজরুকি, কুসংস্কারের কথা বলছ, চ্যানেল তো কোথাও সত্যি-মিথ্যের দায় নেয় না। 'বিশ্বাস অবিশ্বাস' সেগমেন্টে বলে দেয় তো। আর আমি তো পরের রাউন্ডে উঠেছি। তুমি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? এটা তো একটা মজা।"

"না, মজা নয়। জীবনে যে জিনিসটা করবে, সিরিয়াসলি করবে। গেমটা তা হলে কী জন্য খেলছ? উইনার হয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা পাবে বলে? তুমি চাইলে আমিই তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ লক্ষ টাকা।"

বাপ্পা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ফার্স্ট তো হতেই হবে। ওর লক্ষ্য পাঁচ লক্ষ টাকা নয়। ফার্স্ট হয়ে প্রমাণ করতে চায়, ভূত বলে আসলে কিছুই নেই। মানুষ শুধু শুধু ভূতের ভয় পায়। এই নিয়ে একটা ভিডিয়ো করে ইউটিউবে দেবে। এ ছাড়া ফেসবুকে একটা গ্রুপ খুলেছে, 'ভূতের যম'। সমানে সেখানে 'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ'-এর সমালোচনা করে পোস্ট দিচ্ছে। নিজে অ্যাডমিন হলেও স্পাইন চিলিং প্রোডাকশন যাতে বুঝতে না-পারে তাই নিজের ভাল নাম বা ছবি কিছু রাখেনি। ছদ্মনামে আছে। গ্রুপটা দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। মেম্বার, ফলোয়ার, রিচ সব বাড়ছে। এর পর ফার্স্ট না হলে ওর কথা বিশ্বাস করবে কে? দাদুকে বলতে পারছে না গ্র্যান্ড ফিনালে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ও আর সঞ্জনা। দাদুর পেটে কথা থাকে না। বললেই এটা চার দিকে রাষ্ট্র করে বেড়াবে।

"কী ভাবছ? শেষে কি চৌধুরী বংশের মুখে চুনকালি মাখাবে?"

বাপ্পা পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করল, "কোথায় ভাবলাম পরের রাউন্ডে যাওয়ার জন্য তুমি আমাকে অভিনন্দন জানাবে। তা না, তুমি আমাকে বকাবকি শুরু করলে।"

"বকাবকি করব না! ছি ছি আমার তো দেখে মাথাটা গরম হয়ে গেল। একটা মেয়ে তোমার চেয়ে বেশি সাহসী? দ্যাখো, যদি ফার্স্ট হতে না পারো, তা হলে এখনই শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে বেরিয়ে এসো। গোটা পৃথিবীকে দেখিয়ো না, ভয় পেয়ে তুমি এলিমিনেট হয়ে গেলে! সাবধান করছি তোমাকে। তোমার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে আছে।"

বাপ্পা মিটমিট করে হাসতে থাকল, "চুক্তিপত্রটা তো তুমি নিজেই দেখেছ। আমি ও রকম দুম করে বেরিয়ে আসতে পারি না। চুক্তিভঙ্গ হবে। তখন চ্যানেল কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কেস করবে।"

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন আর্যশেখর, "তুমি আমাকে আইন শেখাচ্ছ? আইনের ভয় দেখাচ্ছ? দেখাও দেখি তোমার চুক্তিপত্রটা এক বার। ওমেগা প্লাসের ব্যবসার দফারফা করে দেব।"

বাপ্পা দাদুর হাত দুটো টেনে ধরে বলল, "তার চেয়ে আমার ওপর একটু ভরসা করে ধৈর্য ধরে দ্যাখোই না, ফার্স্ট হতে পারি কিনা!"

॥ ৭ ॥

সকাল-সকালই ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে মামার বাড়ি অর্থাৎ বিল্টুদের বাড়িতে চলে এল লাল্টু। বড়মামিকে প্রণাম করতে বড়মামি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার রে, তোরা দু'টিতে হঠাৎ করে আমাদের দেশের বাড়ি গোবর্ধনপুর যাচ্ছিস?''

লাল্টু এক বার আড় চোখে বিল্টুর দিকে তাকিয়ে মাইকেলমামার শেখানো কথাগুলোই বলতে শুরু করল, "আসলে অনেক দিন ধরে গ্রাম-প্রকৃতি দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আমাদের। মাইকেলমামা শুনে বলল..."

"মাইকেল? ও মানে আমাদের বাঁকু? বড্ড গুলিয়ে দিস। আচ্ছা, ও না হয় নিজের নাম নিজেই বদলে মাইকেল রেখেছে, তা বলে তোরাও ওই নামে ডাকবি? ছোটবেলার মত বাঁকুমামা, বাঁকুকাকা বলতে পারিস না? তা, কী বলেছে বাঁকু?"

"বলেছে যে এটা লজ্জার, নিজেদের গ্রাম থাকতে কোথায় গিয়ে গ্রাম দেখতে পাব ভাবছি। মাইকেলমামা সরি বাঁকুমামাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে আদুরি ঠাকুরমার সঙ্গে কথা বলে। ওঁর কাছে গিয়েই কয়েকটা দিন থাকব। এর পর রেজ়াল্ট বেরিয়ে গেলে কলেজে ভর্তি হলে টানা ক্লাস হবে। আর সময় হবে না।"

"তা ভাল করছিস। কত দিন যাওয়া হয়নি গোবর্ধনপুরে। আহা, ছবির মতো গ্রাম। সব ভাল করে ঘুরে-ঘুরে দেখবি। রক্ষাকালীর মন্দির আছে। খুব জাগ্রত। পুজো দিবি পরীক্ষার রেজ়াল্ট যাতে ভাল হয়। তা হ্যাঁরে, বাঁকু এত উদ্যোগ নিয়ে তোদের পাঠাচ্ছে, আবার কোনও গন্ডগোলের ব্যাপার নেই তো?"

"না-না," লাল্টু আর বিল্টু একসঙ্গে বলে উঠল, "একদম চাপ নিয়ো না। শুধুই গ্রাম দেখা..." বলতে-বলতেই ওরা একে অপরের দিকে তাকাল আর মনে পড়ে গেল গতকাল শপিং মলের ঘটনাটা।

বেজায় অন্ধকার ঘর। অন্ধকার এতটাই নিকষ যে, পাশে লাল্টুকে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না বিল্টু।

"এ কোথায় আমাদের ঢোকাল রে মাইকেলকাকা?"

অন্ধকার থেকে লাল্টুর গলা ভেসে এল, "কিছুই তো বুঝতে পারছি না রে।''

অন্ধকারে সাবধানে এক পা, এক পা করে এগোতে গিয়ে কিছু একটা জিনিসে ঠোক্কর খেল বিল্টু আর অমনি দূরে কোথাও 'টিং' করে আওয়াজ হয়ে একটা মোমবাতি জ্বলে উঠল। সেই মোমবাতির আলোয় আবছা বোঝা গেল এটা ঠিক ঘর নয়, একটা সুড়ঙ্গের মতো জায়গা। আর সুড়ঙ্গটা সোজা নয়। আঁকাবাঁকা।

বিল্টু সাবধানে আর-এক পা এগোতে যেতেই আবার পায়ে ঠোক্কর খেলো জিনিসটায়। জিনিসটা অনেকটা সাদা বলের মতো। পায়ের কাছ থেকে বলটা কুড়িয়ে দেখতে গিয়েই ভীষণ চমকে উঠল বিল্টু। যেটা এত ক্ষণ বল মনে হচ্ছিল, সেটা আসলে মানুষের খুলি। খুলিটার চোখের কোটরে হঠাৎ ধিক ধিক করে একটু লাল আলো ফুটে উঠল। আর খুলিটা হি হি করে হেসে উঠল। চমকে উঠে হাত থেকে খুলিটা ফেলে দিল বিল্টু। অমনি আবার চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল।

"লাল্টু তুই কোথায়?"

"এই তো তোর পিছনেই..."

বিল্টুর হঠাৎ মনে হল ওর গায়ের উপর দিয়ে সরসর করে কী একটা চলে গেল।

"কিছু বুঝতে পারলি? কী যেন একটা গায়ের ওপর দিয়ে চলে

গেল?”

লাল্টু একইরকম কাঁপা গলায় উত্তর দিল, “এটা আমাদের কী শাস্তি দিচ্ছে রে মাইকেলমামা?”

“কিছু বুঝতে পারছি না। কী করে বেরোনো যায় বলো তো?”

“সেটাই তো বুঝতে পারছি না। মাইকেলমামা আমাদের মোবাইলগুলো পর্যন্ত নিয়ে নিল। না হলে মোবাইলের টর্চ জ্বালাতে পারতাম।”

“এক কাজ কর। তুই পেছন থেকে দুটো হাত আমার দুই কাঁধে রাখ। আমাদের একসঙ্গে ছুঁয়ে থাকা দরকার।”

কাঁধে দুটো হাতের স্পর্শ পেয়ে লাল্টুর কীরকম সন্দেহ হল।

“অ্যাই বিল্টু, তুই কি আমার পিছনে?”

“না তো আমি তো সামনে আছি। তুই তো আমার কাঁধে হাত রেখেছিস।”

“তুই আমার সামনে তা হলে পিছন থেকে কে আমার কাঁধ ধরে আছে?”

“কী যা তা বলছিস? কে আবার পিছন থেকে তোর কাঁধে হাত দেবে? একে এই অবস্থা, এর মধ্যে ফালতু ভয় দেখাস না।”

“আরে কী আশ্চর্য! আমি কেন তোকে ভয় দেখাতে যাব? ভাবছি এখান থেকে কী করে বেরোনো যায়।”

“মাইকেলকাকা তো বলে দিল সোজা যেতে। পিছন ফিরে লাভ নেই।”

“ধুর এবার ছাড় তো মামার কথা। কোনদিন পেটে কী আছে বলে? সবে তো খুলি। বাকি কঙ্কালটা হয়তো সামনে পড়ে রয়েছে। সব সময় বদ মতলব। দাঁড়া আমি ইউ-টার্ন করছি। যেদিক দিয়ে ঢুকেছি সেদিক দিয়েই বেরোব। তুইও ইউ-টার্ন করে পিছন থেকে আমার কাঁধদুটো ধর।”

এইবার লাল্টু সামনে আর বিল্টু পিছনে হয়ে গেল। হঠাৎ লাল্টুর মাথার পিছনে কে একটা চাঁটি মারল।

“আহ মারছিস কেন? কাঁধ ধরতে বললাম তো?”

“আরে, খামোকা তোকে আমি মারব কেন? আরে-আরে তুই আবার পিছন থেকে আমার কান ধরেছিস কেন?”

“আমি তোর পিছনে কোথায়? আমি তো সামনে...”

দু’জনেই বুঝতে পারল অন্ধকারের মধ্যে ঘোর বিপদে পড়েছে। এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের ওরা দু’জন শুধু নয়, আরও কেউ একজন আছে। সে কি ভূত? বিল্টু আর লাল্টু দু’জনেই অল্প-অল্প করে ঘামতে থাকল।

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, “তোর কি মনে হয় সত্যি ভূত? নাকি কোনও মানুষ এই অন্ধকারে ভূত সেজে আছে?”

“সেটা কী করে সম্ভব? কখনও তোর পিছন থেকে কাঁধে হাত দিচ্ছে, কখনও আমার পিছন থেকে কাঁধে হাত দিচ্ছে। কান মলে দিচ্ছে। চাঁটি মারছে। সামনে-পিছনে যাচ্ছে, আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“একটা কথা বলছি বিল্টু শোন। যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছিলাম খেয়াল করেছিস ওখানে কোনও পাল্লা ছিল না। শুধু কালো পর্দা ছিল। তা হলে ডান দিকের দেওয়ালটা ধর। যা থাকে কপালে। তার পর আমরা আস্তে-আস্তে এগিয়ে ঠিক দরজাটা পেয়ে যাব।”

দু’জনে দেওয়াল ধরে পা-পা করে এগোতে থাকল। কিন্তু অনেক হাতড়েও দরজাটা আর খুঁজে পেল না। এমন সময় ক্ষীণ একটা নীল আলো জ্বলে উঠল। সেইসঙ্গে একটা খোনা গলা, “পাঁলাচ্ছিস কোঁথায়? আঁমার গুঁহায় এঁকবার যেঁ ঢুঁকেছে তাঁর নিঁস্তার নেঁই।”

চমকে উঠে দু'জন পিছনে ফিরে দেখল সেই মড়ার খুলিটা শূন্যে ভাসছে আর তার চোখে ধিকিধিকি সেই লাল আলোটা জ্বলছে-নিভছে। লাল্টু বিল্টুকে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ একটা কালো কাপড় ছাদ থেকে খুলিটার মাথায় এসে পড়ল আর মেঝে দিয়ে কাপড়টা সরসর করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। তার পর সেটা পর্দার মতো উড়ে ছাদের দিকে চলে গেল। খুলিটা কোথায় যেন ভ্যানিশ করে গেল। আর ভেসে উঠল ভয়ঙ্কর মুখের একটা লোক। তার আলখাল্লার মতো পোশাক। মাথায় কালো হুডি। ভয়ঙ্কর দেখতে লোকটা হঠাৎ ওদের দিকে দৌঁড়ে আসতে শুরু করল। যা থাকে কপালে 'জয় বাবা ব্রুস লি' বলে লাল্টু ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপর। 'ও মাগো' বলে চিৎকার করে উঠল লোকটা। সঙ্গে-সঙ্গে ভিতরে একটা আলো জ্বলে উঠল।

"ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও," লোকটা চিৎকার করতেই থাকল। লাল্টুও লোকটার বুকের উপর বসে কিল মারতে-মারতে পাল্টা চিৎকার করছে, "আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? চাঁটি মারছ, কান মলছ, ভয় দেখাচ্ছ। এবার দ্যাখো কেমন লাগে।"

এমন সময় ভিতরে বাকি আলোগুলো জ্বলে উঠল। সামনে দিয়ে ঢুকল মাইকেল আর টিকিট বিক্রি করার লোকটা। মাইকেল সকলের উপরে গলা চড়িয়ে বলল, "লাল্টু ছেড়ে দে ওকে। ও আর্টিস্ট।"

লাল্টু লোকটার বুকের উপর থেকে উঠে দাঁড়াল। লোকটা মুখ থেকে মুখোশটা খুলে ফেলল। ওই ভয়ঙ্কর মুখের পিছনে ভীষণ গোবেচারা একটা মুখ। সেই মুখটা যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে বলল, "মাইকেলদা তোমার ভাইপো-ভাগ্নেরা এত বিটকেল বলোনি তো!"

বিরক্ত মুখে মাইকেল লোকটাকে বলল, "এত সহজেই ধরে ফেলল তোকে? পাঁচ মিনিটও হয়নি। পনেরো মিনিটের শো করিস কী করে?"

লোকটা মুখের যন্ত্রণা সামলে বলল, "শো তো এখন প্রায় হয়ই না মাইকেলদা। প্র্যাকটিসে নেই।"

"বললে হবে? তোর উপর ভরসা করে আছি রে গজু। হাতে সময় বড্ড কম।"

"নতুন কোনও ভূতের সিনেমার রোল বুঝি?" গজু জিজ্ঞেস করল।

"ভূত, কিন্তু সিনেমা নয়। তোকে অনেক বড় দায়িত্ব দেব। তোদের সাহসিকতার একটা পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। তোরা সসম্মানে পাস করেছিস। এই লাল্টু আর বিল্টু, গজুর সঙ্গে হাত মেলা।"

লাল্টু আর বিল্টু হ্যান্ডশেক করে বলল, "বড্ড লেগেছে বুঝি গজুদাদা? সরি বুঝতে পারিনি।"

গজু কিছু বলার আগেই মাইকেল বলল, "না বোঝারই কথা। বুঝতে পারলেই খেলা শেষ। আজ থেকে গজুও তোদের পার্টনার।"

"মানে?"

"কাল তোরা গোবর্ধনপুর যাবি। আর গজু যাবে পরশু। তোদের যেমন বলব কাজটা কাল শেষ করে রাখবি। পরশু গজু গিয়ে ফিনিশিং টাচ দেবে। এটা প্রথম পর্ব। এই কাজে তোদের আর-একজন পার্টনার থাকবে তার সঙ্গে আমার সব কথা বলা আছে।"

"আমরা কি এইখানে দাঁড়িয়ে কথা বলব? বাইরে ফুডকোর্টে গিয়ে ধীরেসুস্থে কথা বললে হয় না মামা?"

"না, হয় না। প্রথমত, এসব খুব গোপনীয় আলোচনা। প্রকাশ্য জায়গায় বসে কথাবার্তা বলা যাবে না। আর দ্বিতীয়ত তোরা কাল খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাবি। হাবিজাবি খেয়ে পেট খারাপ করানোর রিস্ক আমি নিতে পারব না। সবচেয়ে বড় কথা ধীরেসুস্থে চলার সময় এটা নয়। বলছি না, হাতে সময় বড্ড কম।

বিল্টু বলল, "ঠিক আছে। তবে তোমায় লিখিত ভাবে কথা দিতে হবে গোবর্ধনপুরের কাজটা সেরে আমরা ফিরে আসার পর এই ফুডকোর্টে একদিন তোমাকে ভরপেট চাইনিজ় খাওয়াতে হবে।"

মাইকেল গম্ভীর ভাবে বলল, "অ্যাই গজু তোর কাছে কাগজ পেন আছে?"

"না মাইকেলদা।"

মাইকেল ধমকে উঠল, "কাগজ-পেন সঙ্গে রাখিস না কেন বল তো? মনে থাকে যেন, বিল্টু তুই বাড়ি গিয়ে লিখে রেখে মনে করে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিবি।"

"ঠিক আছে। তবে এই জায়গাটা বড্ড দমবন্ধ লাগছে। বাইরে তো চলো।"

একটু চিন্তা করে মাইকেল বলল, "ঠিক। এত কিছুর পর তোদের একটু চাঙ্গা করার দরকার। চল বাইরে চায়ের দোকানটায় যাই। গজু ভূতের জামাকাপড় বদলে আসুক। তোদের ছোট করে বড় ব্যাপারটা বলে দিই।"

আবার সেই চায়ের দোকান। তবে এবার আর চায়ের সঙ্গে প্রজাপতি বিস্কুট নেই। মাইকেল চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে বলল, "আমাদের একটা ভূতের বাড়ি তৈরি করতে হবে।"

"মানে?" বিল্টু আর লাল্টু এক সঙ্গে বলে উঠল।

"শুটিংয়ের জন্য একেবারে রিয়েল-রিয়েল।"

"ও আচ্ছা," এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট হল বিল্টু আর লাল্টুর কাছে, "ভূতের বাড়ি তৈরি করতে হবে মানে সেট তৈরি করতে হবে, তাই তো? তুমি বুঝি এখন সেট তৈরির বরাত পেয়েছ?"

"আরে না। কিচ্ছু সেট তৈরি করতে হবে না। লোকেশন ম্যানেজার হিসেবে আমি জোগাড় করে দিয়েছি। আস্ত একখানা জমিদারের বাগানবাড়ি আছে গোবর্ধনপুরে। দিব্যি ছমছমে বাড়ি। কিন্তু বাড়িটায় একটা জিনিসেরই অভাব।"

"কিসের?" সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

"ভূতের। আর সেই ভূতটাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই কেল্লা ফতে। সমস্যা একটাই, হাতে সময় বড্ড কম।"

হঠাৎ লাল্টু চকচকে চোখে বলে উঠল, "বুঝেছি সেই ভূতই হবে গজুদাদা।"

মাইকেল বিল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "লাল্টুর মাথায় এল, তোর মাথায় এল না কেন? কতবার তোদের বলেছি শুধু বয়সেই নয়, বুদ্ধিতেও হতে হবে সমান-সমান। তবে গজু যে ভূত হবে এটা আমরা চার জন ছাড়া আর এক জন মাত্র জানবে। গোবর্ধনপুর গ্রামের রক্ষাকালী মন্দিরে পুরোহিত।"

"আর একটু খুলে বলবে এত কাণ্ড কেন করা হচ্ছে?"

"কিছুটা তোদের বলতে পারি। দেখি বাকিটা তোরা বুদ্ধি খরচ করে ধরতে পারিস কিনা। চ্যানেল ওমেগা প্লাস। শনিবার রাত্রি ন'টা, রিয়েলিটি শো।"

"ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ!" এক সঙ্গে মনে পড়ে বলে উঠল বিল্টু আর লাল্টু।

"কারেক্ট।"

"ফাটাফাটি হচ্ছে শো-টা।"

"কিন্তু গ্র্যান্ড ফিনালের জন্য সেরা বাড়িটা খুঁজে পেতে ওদের ভরসা আমি। আমার ভরসা তোরা। তবে হাতে কিন্তু সময় বড্ড কম।"

"যে ফার্স্ট হবে পাঁচ লাখ টাকা পাবে।"

একটু আনমনা হয়ে ভেবে মাইকেল বলল, "মন দিয়ে কাজ করলে সেই পাঁচ লাখ টাকা তোরাও পেতে পারিস।"

চোখ কপালে তুলে বিল্টু আর লাল্টু বলল, "কী ভাবে?"

"গ্রান্ড ফিনালেতে তোদের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির ব্যবস্থা করে দেব। ডিরেক্টর তো আমার কথায় উঠছে-বসছে।"

"খেতে আয় তোরা। ট্রেন ধরার সময় হয়ে যাচ্ছে তো?" বড় মামিমার গলা পেয়ে সম্বিৎ ফিরল লাল্টুর। বিল্টুকে বলল, "চল।"

॥ ৮ ॥

বর্ধমান স্টেশনে নেমে সীতাভোগ, মিহিদানা খেয়ে বাসে চাপল বিল্টু আর লাল্টু। ভাগ্যক্রমে বাসে ভিড় হওয়ার আগেই দু'জনে বসার জায়গা পেয়ে গেল। মাইকেল বলে দিয়েছিল বাসের কন্ডাক্টরের সঙ্গে

কথা বলিয়ে দেওয়ার জন্য। যাত্রী সামলাতে-সামলাতে ব্যস্ত কন্ডাক্টর প্রথমে কিছুতেই ফুসরত পাচ্ছিল না। বর্ধমান টাউন ছাড়িয়ে ফাঁকা জায়গা দিয়ে যখন বাস ছুটতে শুরু করল, অবশেষে কন্ডাক্টরের সময় হলো। লাল্টু মোবাইলে মাইকেলকে ধরে কন্ডাক্টরকে কথা বলতে বলল।

বাসের আওয়াজে কন্ডাক্টর কী বলছিল, ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছিল না, তবে কন্ডাক্টরের মুখ-চোখ দেখে বুঝতে পারছিল, লোকটা বেশ বিস্মিত হচ্ছে। আসল কারণটা বুঝতে পারল যখন সন্ধে নামার মুখে কন্ডাক্টর দু'জনকে ফাঁকা একটা জায়গায় নামিয়ে দিল। তখন সূর্য ডুবতে চলেছে। চার দিকে শুধু ধু ধু চাষের মাঠ আর চরাচর ঘিরে কুয়াশার একটা বলয়।

বিল্টু বলল, "বাসটা এ আমাদের কোথায় নামিয়ে দিল রে লাল্টু?"

"মাইকেলমামার কথা কী শুনতে কী বুঝেছে! মনে হচ্ছে ভুলভাল জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে।"

"এবার উপায়? বড় রাস্তাটা একদম ফাঁকা। কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছে না।"

"মামাকে ফোন কর বিল্টু।"

ফোন করতে গিয়ে বিল্টু দেখল মোবাইলের সিগনাল স্ট্রেন্থ খুব কম। বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় ধরতে পারল মাইকেলকে, "কাকা কন্ডাক্টরকে কী বলেছ? অদ্ভুত একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে।"

"ঠিক জায়গাতেই নামিয়েছে। দূরে একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছিস?"

দু'জনে আর-একবার চোখ বোলাল। এবার খেয়াল করল সত্যিই অনেক দূরে মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

"ওই বাড়িতেই যেতে হবে তোদের। ওখানেই হবে শুটিং।"

একটা পায়ে হাঁটার রাস্তা আছে। ওই রাস্তা ধরে দু'জনে পিঠে ব্যাগ প্যাক নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মাইকেলের সঙ্গে কথা বলতে থাকল, "ওই বাড়িতেই কি আদুরি ঠাকুরমা থাকে?"

"দূর বোকা। আদুরিপিসির বাড়িতে যাবি রাতে থাকতে। এখন বাড়িটাতে যা। একটু ঘুরে ফিরে দ্যাখ। আমি শিবেন ঠাকুরকে পাঠাচ্ছি। তবে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি। লোকটা কিন্তু মহা গুলবাজ। বুদ্ধি করে বুঝে নিবি কোনটা সত্যি বলছে আর কোনটা গুল। গ্রামে ওর কথা একটা লোকও বিশ্বাস করে না।"

"যাচ্চলে! তুমি না সব সময় সব গন্ডগোলের লোকদের সঙ্গে কাজ দাও।"

"বেশি কথা বলিস না। বড় কাজ। অনেক লোককে নিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে করতে হবে।"

"তুমি কবে আসবে বলো তো?"

"বলেছি তো, যথা সময়ে। সবাই মিলে গিয়ে এক জায়গায় পড়ে থাকলে হবে? অনেক প্ল্যানিংয়ের কাজ আছে। আমাকে মুহূর্তে-মুহূর্তে ডিরেক্টর প্রহ্লাদ মিত্র ফোন করছে। তোদের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির আইডিয়াটা শুনে লাফিয়ে উঠেছে। কত যে থ্যাঙ্কস দিয়েছে। এবার আমার নাম ডোবাস না।"

মাইকেল ফোনটা ছেড়ে দিল। সূর্যটা অস্ত গিয়ে ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসছে। দু'জনে কোনও রকমে পুরো অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগে পৌঁছে গেল জমিদারবাড়িটায়। এককালের জমিদারের বাগানবাড়িটা এখন ভাঙাচোরা অবস্থা। দেখলেই কী রকম গা ছমছম করছে। বিল্টু লাল্টুকে বলল, "ভেতরে দেখবি নাকি এখানেই অপেক্ষা করবি?"

"এখানে মাঠের মধ্যে কোথায় বসব? চল, ভেতরে গিয়ে থামের পাশে সিঁড়িতে বসি।"

অনেকক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি। খিদে-খিদে পাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে একটা বিস্কুটের প্যাকেটও নেই।

"কী করা যায় বলো তো?" লাল্টু জিজ্ঞেস করল।

বিল্টু একটু চিন্তা করে বলল, "আরে, কাকাকে ফোন কর। ওই যে কী শিব ঠাকুর না কে আসবে বলল, কাকাকে বল ও যেন আমাদের জন্য একটু খাবারদাবার নিয়ে আসে।"

"গুড আইডিয়া," লাল্টু ফোনটা বের করে দেখল সিগনালের স্ট্রেন্থ একেবারে শূন্য।

"এই মরেছে, আমার তো সিগন্যাল আসছে না। তোরটা একটু দ্যাখ।"

বিল্টু মোবাইল দেখে বলল, "আমারটায়ও নেই।"

"এবার উপায়?"

"উপায় একটাই। এখানে অপেক্ষা করতে হবে। এখন তো গুগ্‌ল ম্যাপও দেখতে পাব না। গোবর্ধনপুর চিনে যাব কী করে?"

অন্ধকার একটু-একটু করে আরও গাঢ় হচ্ছে। আকাশে ঝিকমিক করে তারা ফুটে উঠছে। একফালি চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়াতে শুরু করল। সেই সুন্দর রুপোলি আলোয় আরও ছমছমে দেখাচ্ছে জমিদারবাড়িটা। ঠান্ডাটাও বাড়ছে আর সেই সঙ্গে বাড়ছে মশা। ভাগ্যিস দু'জনে বুদ্ধি করে দুটো হুডি দেওয়া জ্যাকেট এনেছিল। ব্যাকপ্যাক থেকে সেগুলো বার করে সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলল। লাল্টু চিন্তিত গলায় বলল, "ভাবতে পারছিস যদি ওই শিবেন ঠাকুর না আসে, কী হবে?"

চটাস চটাস করে গালের উপর কয়েকটা মশা মেরে বিল্টু বলল, "তা হলে আমাদের সারারাত্রি এখানে মশার কামড় খেয়ে অ্যানিমিয়া হয়ে মরতে হবে।"

লাল্টু উঠে দাঁড়িয়ে বলল "যা বলেছিস। চল, একটু হাঁটাহাঁটি করি। তা হলে মশাটা যদি একটু কম কামড়ায়।"

"কোথায় হাঁটবি? ওই বাড়ির ভেতরটা দেখেছিস? কেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা দরজারও পাল্লা নেই।"

লাল্টু আবার বসে পড়ল, "ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির লোভ দেখিয়ে মামা আমাদের এ কোন আতান্তরে ফেলল?"

ঠিক এই সময় জমিদারবাড়ির অন্ধকার একটা ঘর থেকে একটা আওয়াজ আসতে থাকল, টুং টুং টুং টুং। দু'জনে চুপ করে গেল। একদম নিস্তব্ধ পরিবেশ যেখানে ঝিঁঝির ডাকের আওয়াজ পর্যন্ত নেই, সেখানে এই আওয়াজটায় গা কেমন শিরশির করছে।

শুকনো গলায় বিল্টু বলল, "কী ব্যাপার বল তো? সত্যি এটা ভূতের বাড়ি নাকি?"

"দু'জনে আছি তো। চল, একটু সাহস করে ভেতরে গিয়ে দেখি।"

লাল্টু উঠে দাঁড়াতেই খপ করে ওর হাতটা ধরে টানল বিল্টু, "কী দরকার? শেষে কোন বিপদে পড়ি! শুনেছি ভূত-প্রেত-আত্মা অনেক রকমের হয়।"

"বড্ড ভিতুর ডিম তুই। এই সাহস নিয়ে পাঁচ লাখ জিতবি?"

"তুই যে কত বড় সাহসী কালকেই শপিং মলে দেখা হয়ে গেছে। ভেতরে কিন্তু গজু নেই।"

"ঠিক আছে। আমি একাই দেখছি," বলে লাল্টু সবে ভিতরে যাওয়ার জন্য দু'পা বাড়িয়েছে এমন সময় ভিতর থেকে টুং টুং আওয়াজটা বন্ধ হয়ে নতুন একটা আওয়াজ শুরু হল, খস খস খস খস। মনে হল অন্ধকার ঘরটা থেকে একটা হাড়জিরজিরে ছেলে এক ঝলক উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল।

লাল্টু থেমে পাথরের স্ট্যাচুর মতো হয়ে গেল। বিল্টুর ভিতরটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। বলল, "শোন ভাই, এটা ঝগড়া, তর্কর সময় নয়। ঢের হয়েছে। বাঁচার একটাই উপায়। চল, এখানে বসে না থেকে বড় রাস্তায় যাই। কখনও না-কখনও একটা বাস তো আসবে।"

লাল্টু মেনে নিল। আর কোনও দিকে তাকানো নেই। মাথা নিচু করে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। সবে কয়েক পা এগিয়েছে হঠাৎ কার সঙ্গে যেন ধাক্কা লেগে ঝনঝন করে একটা আওয়াজ হয়ে পিলে চমকে উঠল দু'জনের। মুখ তুলে দেখল একটা লোক সাইকেলসুদ্ধ মাটিতে পড়ে রয়েছে। লোকটা মাটিতে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে বলল, "অন্ধ নাকি ভূত? দেখে চলতে পারো না?"

“আপনি কে?”
লোকটা ধুলো ঝেড়ে উঠে বলল, “আগে বলো তোমরা কে?”
“আমরা মানে...”
“আচ্ছা, তোমাদের কি মাইকেলবাবু পাঠিয়েছেন? তোমরা কি মাইকেলবাবুর ভাইপো আর ভাগ্নে?”
“আপনিই বুঝি শিবেন ঠাকুর?”
“হ্যাঁ।”
“সরি বুঝতে পারিনি।”
শিবেন ঠাকুর বলল, “ঠিক আছে। ব্যালেন্স হারিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়া অভ্যেস আমার ছোটবেলা থেকেই। এখন শুধু বয়স হয়েছে বলে কোমরে একটু বেশি লাগে, এই যা।”
“বাঁচালেন। চলুন, তা হলে এবার আদুরিদিদিমার বাড়ি যাওয়া যাক।”
“না না, আগে কথাটা হয়ে যাক। মাইকেলবাবু বলে দিয়েছেন, যা কিছু কথা বলার এখানেই বলতে হবে।“
“ঠিক আছে বলুন।”
“শোনও ভাই, তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ আমি পূজারি। আমার চেয়ে ভাল কেউ বুঝতে পারে না কোথায় অতৃপ্ত আত্মা আছে আর কোথায় নেই।”
শিবেন ঠাকুর চাঁদের আলোয় ছমছমে জমিদারিবাড়িটা দেখিয়ে বলতে থাকল, “এখানে অতৃপ্ত আত্মা আছে আর সেই আত্মাকে আমি মন্ত্র দিয়ে এখানে বেঁধে রেখেছি। না হলে এই আত্মা কবে গোবর্ধনপুরে গিয়ে আজকে এর বাড়ি, কালকে ওর বাড়ি ইচ্ছেমতো ঘোরাফেরা করত আর উৎপাত করত।''
“মন্ত্র দিয়ে আপনি ভূত বেঁধে রেখেছেন?” লাল্টু আর বিল্টুর মনে পড়ে গেল মাইকেল সাবধান করে দিয়েছে লোকটা মহা গুলবাজ। বুদ্ধি করে বুঝতে হবে কোনটা সত্যি কাজের কথা বলছে।
লাল্টু ফস করে বলে ফেলল, “কী মন্ত্র শুনি?”
শিবেন ঠাকুর রেগে উঠল, “ছেলেছোকরা তোমরা। মন্ত্রের কী বুঝবে? আমি হিমালয় থেকে তন্ত্রসাধনা করে এসেছি। কিসকিসা নিশার দিন বিশেষ একটা মন্ত্র বললে পৃথিবীর কোনও ভূতের সাধ্য নেই আমার কেটে দেওয়া গণ্ডি ছেড়ে বেরোনোর।”
লাল্টু জানতে চাইল, “কিসকিসা নিশা, সেটা আবার কী?”
গম্ভীর গলায় শিবেন ঠাকুর বলল “কিংকর্তব্য সমসং কিয়দংশ সার্থকম। এই মন্ত্র আমি পঞ্চাশ বছর কৈলাসের চূড়ায় তপস্যা সিদ্ধি করে পেয়েছিলাম।”
লাল্টু বলে ফেলল, “পঞ্চাশ বছর আপনি হিমালয়চূড়ায় তপস্যা করেছিলেন? আপনার বয়স কত?”
শিবেন ঠাকুর বিরক্ত মুখে বলল, “তোমরাও দেখছি মূর্খ। জানো না হিমালয়ের চূড়ায় তপস্যা করলে বয়স বাড়ে না। তোমরা জানো, আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কতবার হ্যান্ডশেক করেছি। নেতাজি আমাকে আমার কাছে নিয়মিত পরামর্শ নিতেন। যখন ফৌজ গঠন করছেন তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘শিবেনবাবু ফৌজ গঠন করছি, কী নাম দেওয়া যায় বলুন তো?’ আমি বলেছিলাম, ‘আজ়াদ হিন্দ ফৌজ।'''
বিল্টু আর নিতে পারছিল না। শিবেন ঠাকুরকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “দেখুন, সোজা কথা বলি। মাইকেলকাকা কিন্তু আমাদের বলে দিয়েছেন, আপনি মহা গুলবাজ। তার প্রমাণ বেশ পাচ্ছি। এই অন্ধকারে মশার কামড় খেতে-খেতে আমরা আপনার গুল শুনতে রাজি নই। কাজের কথা কিছু থাকলে বলুন। না হলে আমাদের আদুরিঠাকুরমার বাড়িতে পৌঁছে দিন।”
হা হা করে হেসে উঠল শিবেন ঠাকুর, “গুলবাজ। গুলবাজ। আসল ব্যাপারটা কী জানো? পৃথিবীতে চিরকাল মহাত্মাদের মূর্খ লোকেরা গুলবাজ বলে এসেছে। এই যেমন ধরো গ্যালিলিও। তিনি যখন বলেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে মূর্খ লোকেরা ওকে গুলবাজ বলেছিল। আমি সময়ের চেয়ে শুধু এগিয়ে।”
লাল্টু ছটফট করে উঠে বলল, “চটপট কাজের কথাটা বলে দিন দেখি আর এখানে থাকতে পারছি না।”
গলাটা খাঁকরিয়ে পরিষ্কার করে শিবেন ঠাকুর বলল, “কাজের কথা একটাই। এই বাড়িতে ভূত আছে সেটা গ্রামের মানুষকে তাদের মঙ্গলের জন্য অনতিবিলম্বে বিশ্বাস করাতে হবে। ভয়ঙ্কর অতৃপ্ত ক্ষুধার্ত আত্মা। তাই বুঝতেই পারছ প্রলয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাওয়ার আগে কিছু একটা প্রতিকার করতেই হবে। হাতে সময় বড্ড কম।”
লাল্টু ফিক করে হেসে ফেলল, “এই যে বললেন, পৃথিবীর কোনও ভূতের সাধ্য নেই আপনার কেটে দেওয়া গণ্ডি ছেড়ে বেরোনোর।”
বিল্টু চোখ পাকিয়ে লাল্টুকে থামিয়ে বলল, “কী করতে হবে আমাদের?”
“মাইকেলবাবু লিখে দিয়েছেন। এই দ্যাখো,” শিবেন ঠাকুর মোবাইল বের করে হোয়াটসঅ্যাপ দেখাল। সেটা পড়ে লাল্টু আর বিল্টু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একসঙ্গে বলে উঠল, ''প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটর।''
শিবেন ঠাকুর বলল, “আমি অসাধারণ। তোমরা সাধারণ। তোমাদের মতো আর-এক সাধারণ মানুষ আছে। তার নাম দীননাথ। দীননাথের কথা গ্রামের মানুষ সক্কলে বিশ্বাস করে। সে যদি কথাটা বলে এই বাড়িতে ভূত আছে, তা হলেই সবাই বিশ্বাস করবে। আমি তাকে বোঝাব। তোমরা আমাকে সমর্থন করবে। মাইকেলবাবুর সেরকমই নির্দেশ আছে। দীননাথের গ্রামে ঢোকার বড় রাস্তার মুখে একটা দোকান আছে। তোমরা তো আদুরিপিসির বাড়িতে থাকবে। ওখানে সব নিরামিষ। মুরগির মাংস, হাঁসের ডিম যদি খেতে চাও, দীননাথের দোকানে যাবে। ডিম খাবে আর যত লোক দোকানে আসবে তাদের বোঝাবে। জনস্বার্থেই এই কাজ করা।”

॥ ৯ ॥

মোবাইলের স্ক্রিনে বাপ্পাদিত্যর নামটা দেখে খুব আশ্চর্য হল গুড়িয়া। এখনও সব পর্বের টেলিকাস্ট শেষ হয়নি। একমাত্র প্রোডাকশনের লোকেরা আর ওরা জানে ‘ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ’-এর দু’জনেই ফাইনালে উঠেছে। আর জানে লাস্ট রাউন্ডে হেরে যাওয়া প্রতিযোগী সমুদ্র।
প্রথম-প্রথম সব প্রতিযোগীদের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সবাই সবাইয়ের ফোন নম্বর নিয়েছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতা যত এগিয়েছে, এলিমিনেশন শুরু হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা তত বেড়েছে। গুড়িয়া এমনিতে খুব চুপচাপ ধরনের মেয়ে। নিজের থেকে কাউকে ফোন করে না। কেউ ফোন করলে যথাসম্ভব কম কথা বলে। আর বাপ্পাদিত্য তো কখনওই ফোন করেনি আগে।
ফোনটা কি ধরা উচিত ছিল? গুড়িয়ার মনে একটা দোলাচল চলছে। স্পাইন চিলিং প্রোডাকশনের থেকে সম্প্রতি একটা নতুন নিয়ম বলা হয়েছে। প্রতিযোগীরা নিজেদের মধ্যেও ফোনে কথা বলতে পারবে না। ডিরেক্টর প্রহ্লাদ মিত্র আলাদা করেও গুড়িয়াকে বুঝিয়েছিলেন, “অন্য কোনও প্রতিযোগী যদি কোনওভাবে তোমাকে ফোন করে, বুঝবে তোমাকে দুর্বল করে দিয়ে ও তোমাকে হারিয়ে দিতে চাইছে। একদম কথা বলবে না।”
আজ সকালে বাপ্পাদিত্য আর গুড়িয়াকে ডেকেছিল প্রোডাকশন। গ্র্যান্ড ফিনালের প্রোমোর শুটিং ছিল। সেখানে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন এই প্রতিযোগিতাটা জিততে চায়? মানসিকভাবে কতটা আত্মবিশ্বাসী? জীবনে কোনদিন মিথ্যে কথা বলেনি গুড়িয়া। পুরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেছে, বাবার চিকিৎসার টাকার জন্য এই শো-টা সে জিতবেই। তখন ক্যামেরার পিছনে বসেছিল বাপ্পাদিত্য। হাঁ করে শুনছিল গুড়িয়ার কথা। শুটিং হয়ে যাওয়ার পর গুড়িয়া বেরিয়ে এসেছিল। বাপ্পাদিত্য

কেন জিততে চায় সম্পর্কে কী বলেছে, শোনেনি।

এসব ভাবতে ভাবতেই আবার ফোনটা আবার বেজে উঠল। আবার বাপ্পাদিত্য। একটু ভেবে ফোনটা ধরল গুড়িয়া। গম্ভীর গলায় বলল, "হ্যালো।"

নরম গলায় বাপ্পাদিত্য জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ সঞ্জনা?"

"ভাল।"

"সকালে তোমার সঙ্গে কথা হল না। প্রোমোর শুটিং করেই তুমি বেরিয়ে গেলে।"

গুড়িয়া কোনও উত্তর দিল না। খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে বাপ্পাদিত্য বলল, "তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।"

"বলো," ঠান্ডা গলায় বলল গুড়িয়া।

"দ্যাখো, আমি চাই তুমি উইনার হও।"

গুড়িয়া বুঝতে পারল না বাপ্পাদিত্য কেন এটা বলছে? তা হলে কি প্রহ্লাদ স্যারের কথাই ঠিক? ফোন করে কথার প্যাঁচে গুড়িয়াকে দুর্বল করে দিতে চাইছে? অথচ বাবার জন্য এই ফাইনালটা জিততেই হবে। এত দূর এসে সেকেন্ড হওয়া মানে পাঁচ লক্ষ টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। ওই টাকায় বাবার চিকিৎসা হবে এটাই তো বরাবর ভেবে এসেছে গুড়িয়া।

গুড়িয়া চুপ করে থাকল। উল্টোদিক থেকে বাপ্পাদিত্য বলল, "তুমি খুব অবাক হচ্ছ তাই না?"

"হুম। এতগুলো এপিসোড এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পেরিয়ে আমরা তো প্রত্যেকে চেয়েছি উইনার হতে। আর মাত্র এক ধাপ বাকি। তুমি আর আমি। হঠাৎ করে তুমি কেন হেরে গিয়ে আমাকে উইনার করতে চাইছ, বুঝতে পারছি না।"

"স্বীকার করছি সঞ্জনা। গত তিন মাস ধরে আমরা একটার পর-একটা এপিসোড শুট করেছি সবাইকে হারিয়ে যাতে ফাইনালে পৌঁছতে পারি। আজকে গ্র্যান্ড ফিনালেতে শুধু তুমি আর আমি। আমাদের মধ্যে কেউ একজন উইনার হবে। সে দিক থেকে ধরতে গেলে তুমি আর আমি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে গত তিন মাসে আমরা বন্ধু হয়ে গেছি।"

গুড়িয়া কিছুতেই বুঝতে পারছে না বাপ্পাদিত্যর উদ্দেশ্যটা কী। চুপ করে থাকল। বাপ্পাদিত্যই বলতে থাকল, "তোমাকে একটা কথা বলব সঞ্জনা? আমি আজই জানলাম কাকুর অসুস্থতার ব্যাপারে। তুমি আগে কোনওদিন আমাদের কাছে কিছু বলোনি। শুনে খুব গর্ব হচ্ছে তোমার জন্য। এত এপিসোড পেরিয়ে আমি এটাও বুঝেছি তুমি আসলে ভীষণ ভিতু মানুষ, কিন্তু সাংঘাতিক মনের জোর তোমার।"

এবার প্রথম বারের জন্য ভেঙে পড়ল গুড়িয়া, "আমার আর কোনও উপায় ছিল না। খুব নিম্নবিত্ত পরিবার আমাদের। বাবাকে কিছুতেই হারাতে চাই না। বাবার চিকিৎসার জন্য অনেক চেষ্টা বিফলে গেছে। কপালগুণে এই শো-টার অডিশনে পাশ করে কম্পিটিশনে আছি। সৎভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করব। জানি গ্র্যান্ড ফিনালেটা সহজ হবে না। সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব। শুধু আমার সঙ্গে যেন কোনও অন্যায় না হয়।"

"আমাকে ভুল বুঝো না সঞ্জনা। সব ভয় জয় করে তুমি আজ ফাইনালে পৌঁছেছ গর্ব করার মতো একটা লক্ষ্য নিয়ে। প্রাইজ়মানির টাকায় তুমি কাকুর চিকিৎসা করাবে। কাকু ভাল হয়ে উঠবেন। ফাইনালে যদি আমি জিতেও তোমাকে এই পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে দিতে চাই, আমি জানি তোমার প্রবল আত্মসম্মান বোধ থেকে তুমি সেটা নেবে না। সঞ্জনা তুমি যদি আমাকে হারিয়ে দাও আমার একটুও দুঃখ হবে না।"

গুড়িয়া ম্লান হাসল, "আমিও এতদিনে চিনেছি তোমাকে। জানি তুমি ভূতে বিশ্বাস করো না। অসম্ভব সাহসী তুমি। তোমাকে হারানো খুব কঠিন। তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমি জানি গ্র্যান্ড ফিনালেটা খুব শক্ত হবে। অনেক কঠিন-কঠিন টাস্ক দেবে ওরা। কিন্তু যখনই আমি ভয় পাব আমি চোখ বন্ধ করে আমার বাবা-মায়ের মুখটা মনে করব।"

"তোমাকে আমি দুটো কথা বলার জন্য ফোন করলাম সঞ্জনা। আমার তোমাকে বলতে অস্বস্তি হচ্ছে, কিন্তু সত্যি কথাটা হল আমি বড়লোক বাড়ির ছেলে। আমার দাদু আর্যশেখর চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার। আমার বাবা, কাকারা সবাই প্রতিষ্ঠিত। প্রচুর উপার্জন ওঁদের। আমাদের টাকার কোনও অভাব নেই। তাই উইনার হয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা পাওয়ার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই আমার। আজকে আমি এক মাত্র তোমাকে সত্যি কথাটা বলছি। আমি একজন যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য। আমি উইনার হয়ে প্রমাণ করতে চাই যে, প্রত্যেকটা এপিসোডে আমাদের যে এক-একটা ভৌতিক বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন টাস্ক দিয়ে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সেগুলো সব রিয়্যালিটি শো-র বাণিজ্যিক স্বার্থে। গ্র্যান্ড ফিনালের পর আমি সব ব্যাখ্যা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করব। আমার এখন একটাই চিন্তা দাদুকে নিয়ে।"

"মানে?"

"সেটাই তোমাকে বলছি। দাদু চান আমি ফার্স্ট হই। অন্যথা কিছুতেই মেনে নেবেন না। দাদুর ধারণা আমি যদি রানার আপ হই, তা হলে সেটা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে হবে। দাদু সঙ্গে-সঙ্গে মামলা করবেন। তুমি ফার্স্ট হয়েও প্রাইজ়মানি পাবে না। ক'দিন ধরে দাদু সব প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী থেকে শুরু করে চুক্তিপত্র সব পড়ে-পড়ে একেবারে মুখস্থ করে ফেলেছেন।"

গুড়িয়া আরও ভেঙে পড়ল। এরকমও হয়? নাকি প্রহ্লাদ স্যারের কথাটাই ঠিক? বাপ্পাদিত্য এসব বলে ওকে দুর্বল করে দিতে চাইছে।

"তুমি একদম ভেবো না সঞ্জনা। উকিল বাড়ির ছেলে আমি। আমিও পড়ছি সব নিয়ম আর চুক্তি। কিন্তু আর-একটা ব্যাপার জানানোর জন্যও তোমাকে ফোন করলাম। হয়তো তুমি ব্যাপারটা জানো না। আমারও জানার কথা নয়। প্রোডাকশনের একজন মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে।"

"কী?"

"দ্যাখো, গ্র্যান্ড ফিনালে কোথায় হবে আমাদের আগে থেকে জানার কথা নয়। এইটুকু শুনলাম লাভপুরের কাছে এক জমিদারবাড়িতে গ্র্যান্ড ফিনালের শুটিং করার জন্য সব ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সেখানেও কী এক মামলা-মকদ্দমার কারণে শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল হয়ে প্রোডাকশনের মাথায় হাত পড়েছে। এখন হাতে সময় বড্ড কম। হন্যে হয়ে নতুন লোকেশন খুঁজছে।"

বাপ্পাদিত্য আরও কিছু ক্ষণ কথা বলে ফোনটা ছেড়ে দিল। গুড়িয়ার মাথায় আর কিছুই ঢুকছে না। সামান্য একটা রিয়্যালিটি শোয়ের পিছনে এত সব জটিল ব্যাপারস্যাপার। তা হলে কি এত চেষ্টার পরও কিছুতেই জিততে পারবে না? বাবাকে ভাল করে তুলতে পারবে না? মনটা একদম ভেঙে গেল গুড়িয়ার। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

॥ ১০ ॥

"ওঠ... ওঠ..."

গলাটা প্রথমে মনে হচ্ছিল দুঃস্বপ্নের মধ্যে ভেসে আসছে। চোখটা খুলতেই তড়াক করে ঘুমটা ছুটে গেল বিল্টুর। সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং আদুরিঠাকুরমা। আর এত ক্ষণ আদুরিঠাকুরমাকে নিয়েই দুঃস্বপ্ন দেখছিল বিল্টু।

দুঃস্বপ্ন দেখবে নাই বা কেন? উফ কাল যা গিয়েছে! একে ট্রেন-বাসের ধকল। তার পর ভূতের বাড়িতে মশার কামড়। তার পর গুলবাজ শিবেন ঠাকুরের বকবকানি। আর সবশেষে আদুরিঠাকুরমা। সে এক কাণ্ড। শিবেন ঠাকুর যতই গুলবাজ হোক লোকটা তো আদুরি ঠাকুরমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। না হলে কাল কী যে হত! আর সেই পৌঁছতে গিয়েই যত বিপত্তি। আদুরিঠাকুরমা গলা ফাটিয়ে কী

ঝগড়াটাই না করল শিবেন ঠাকুরের সঙ্গে। ঝগড়া মানে এক তরফা। আদুরিঠাকুরমা একাই চিৎকার করে গেল। কেন শিবেন ঠাকুর এত রাত করে দুই নাতিকে বাড়ি পৌঁছতে এসেছে? নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিল। বাসের সময় তো কখন পেরিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ওরা বড় রাস্তায় এই ঠান্ডায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। এইবার যদি সর্দিজ্বর কিছু হয়, তার দায় কে নেবে?

ঝগড়া শুনতে-শুনতে বিল্টু আর লাল্টু বুঝতে পেরেছিল মাইকেলকাকা আসলে আদুরিঠাকুরমাকে ফোনই করেনি। কারণ আদুরিঠাকুরমার কোনও মোবাইলই নেই। যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে সব শিবেন ঠাকুরের মারফত। কলকাতা থেকে দুই রক্তের সম্পর্কের নাতি আসবে শুনে প্রথমে আদুরিঠাকুরমা ভেবেছিল শিবেন ঠাকুরের গুল। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন শিবেন ঠাকুর যখন ওদের নিয়েই এল, তখন দেরি করে নিয়ে আসার জন্য শুরু হল বকাবকি। আদুরিঠাকুরমাকে সেই কোন ছোটবেলায় দেখেছিল। আদুরিঠাকুরমার এখন ওদের চিনতে পারার কথা নয়। তাও ভাগ্যিস অস্বীকার করেননি। কিন্তু তার একটু পরেই মনে হয়েছিল চিনতে না পারলেই বোধ হয় মঙ্গল ছিল।

উঠোন পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার আগেই আদুরিঠাকুরমা বলেছিল, "দাঁড়া বাপধনেরা," তার পরে ঘরের মধ্যে থেকে দুটো গামছা নিয়ে এসে বলেছিল, "ওই পাশে কলঘর। আগে চান করে আয় দেখি।"

এই ঠান্ডার রাতে চান? আঁতকে উঠেছিল বিল্টু আর লাল্টু। কিন্তু আদুরিঠাকুরমা কোনও কথাই শোনেনি। ট্রেনে-বাসে এসেছে। কত রকম লোকের সঙ্গে গা ঠেকাঠেকি হয়েছে। কত রোগজীবাণু গায়ে লেগে রয়েছে। ঠেলে পাঠিয়েছিল, "যা বাবারা ভাল করে চান করে আয়।"

সেই চান করে কী কাঁপুনি, কী কাঁপুনি। ওদিকে আদুরিঠাকুরমা তো শিবেন ঠাকুরের কথা বিশ্বাসই করেননি যে সত্যি নাতিরা আসবে। রান্নাবান্নাও কিছুই করেননি। বাড়িতে মুড়ি ছিল। আর ছোলা। সেই ছোলা মুড়ি চিবিয়েই রাতে শুতে গিয়েছিল। এদিকে মোবাইলে সিগন্যাল ফিরে এলেও মাইকেলকাকাকে কিছুতেই ধরতে পারেনি। ভেবেছিল পরীক্ষার পর কলকাতায় যেমন বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়, এখানেও সেরকম বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে। এর মধ্যেই আদুরিঠাকুরমা এসে ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছেন। বাইরের আলো দেখে মনে হচ্ছে, এখনও সেরকম সকালই হয়নি।

"ও বাপধনের কী হল?" আদুরিঠাকুরমা ঘুমন্ত লাল্টুকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"বোধ হয় রাত্রে চান করে নিমুনিয়া হয়েছে।"

"অমন অলক্ষুনে কথা সাতসকালে বলতে নেই। কোনও কথা কখন গায়ে লেগে যায়," বলতে-বলতে আদুরিঠাকুরমা লাল্টুকে ধরে ঝাঁকাতে থাকলেন, "ওঠ বাবা, ওঠ। বেশি বেলা করে উঠে খেলে অম্বল হয়ে যাবে যে।"

লাল্টু ধড়ফড় করে উঠে বলল, "আবার চান করতে হবে নাকি দিদিমা?"

"তা তো হবেই বাবা। তবে দিনমানে কলঘরে চান করতে হবে না। সর্ষের তেল দেব। চুবচুবে করে গায়ে মাথায় মেখে পুকুরে যাবি। বেশ করে মাথা ডুবিয়ে চান করে আসবি।"

প্রতিবাদ করে উঠল লাল্টু, "কলকাতায় শীতকালে তিন দিনে এক দিন চান করি।"

শুনেই স্বমূর্তি ধারণ করলেন আদুরিঠাকুরমা, "এইজন্যই তোদের এরকম খ্যাংরা কাঠি চেহারা। ঠিক মতন চান করবি না, খাবি না..."

বিল্টু কথা ঘোরাতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তুমি অনেক ভোরবেলায় ওঠো ঠাকুরমা?"

"সে সূর্য ওঠার আগে। কাজ কী কম। ভোর-ভোর চান করে গাছের থেকে ফুল তুলে রক্ষাকালীর মন্দিরে দিয়ে আসি..." বলতে-বলতে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন আদুরিঠাকুরমা।

"কী হল ঠাকুরমা?"

"একটা কথা মনে পড়ে গেল।"

"কী?"

"শিবেনটাও তোদের মতো বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আমিই গিয়ে রোজ ওকে ঠেলে তুলি। আজ গিয়ে দেখি জেগে বসে আছে। চোখ জবাফুলের মতো লাল। বলল, কাল সারা রাত নাকি ঘুম হয়নি। আমার ওকে আরও দু'-চার কথা শোনানোর বাকি ছিল। কাল তোদের অত রাত্রে নিয়ে এল। সব কথা কাল বলা হয়নি। কিন্তু ওর মুখ দেখে মায়া হলো। ভাবলাম, থাক পরে বলব। তা শিবেন নিজেই এগিয়ে এসে একটা কথা বলল।"

"কী বলল?"

"এখানে এক জমিদারবাড়ি আছে। সেখানে এক পাঠশালা ছিল। হরিমতী পাঠশালা। সেখানে নাকি ভূত এসে বাসা বেঁধেছে। অবশ্য শিবেনের কথা তো। মহা গুলবাজ। আমি বললাম প্রমাণ দেখাতে পারবি? তা, ও তোদের কথা বলল। তোরা নাকি পারবি। কোনটা যে ঠিক আর কোনটা যে গুল। তা, হ্যাঁ বাপধনেরা তোদের নাম নিচ্ছে কেন বল তো?"

লাল্টু একবার দ্রুত বিল্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "না এটা গুল নয়। আমাদেরও মনে হয়েছে। বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদেরও মনে হচ্ছিল। আমরা শিবেন ঠাকুরকে বলেছিলাম। উনিও স্বীকার করেছেন।"

ভীষণ রেগে উঠলেন আদুরিঠাকুরমা, "এই ভয়টাই করছিলাম। শেষে আমার বাড়ি আসতে গিয়ে তোদের ভূতে ধরল? তাই ভাবছি এত বেলা পর্যন্ত পড়ে-পড়ে ঘুমচ্ছিস কেন? চিন্তা করিস না। সেরকম হলে তোদের ওঝা দিয়ে ঝাড়িয়ে আনব। কিন্তু শিবেন বলল, হরিমতী পাঠশালা। তোরা বলছিস বড় রাস্তা। শিবেন এমন গুল দেয়। দাঁড়া ওকে গিয়ে বাকি দু'-চার কথাটা বরং শুনিয়েই আসি।"

"না, না ঠাকুরমা। যাওয়ার দরকার নেই। ভূত কি আর শুধু পাঠশালাতেই থাকে? রাতে মাঝে-মাঝে এ-দিক ও-দিক ঘুরতেও বেরোয়।"

"বুঝেছি। আজ সাবু খেয়ে থাক। পরে রক্ষাকালীর তাগা বেঁধে দেব।"

আদুরিঠাকুরমা চিন্তিত হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার মাইকেলকে ফোনে ধরার চেষ্টা করতে থাকল। অনেকবার চেষ্টা করার পর ঘুম জড়ানো গলায় মাইকেল ফোনটা ধরল, "হ্যালো, এত সকালে ফোন করে বিরক্ত করছিস কেন?"

লাল্টুর মাথা গরম হয়ে গেল, "ঘুমোও তুমি। আর এদিকে আমাদের মরার উপক্রম হয়েছে..."

সব শুনে মাইকেল বলল, "কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে। অনেকদিন পরে কাল নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম। ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে তোদের ঢোকা পাক্কা। প্রহ্লাদ মিত্রর সঙ্গে সব কথা হয়ে গেছে। এটা চমক থাকবে। কাউকে কিছু বলবি না। আর তোদের একটাই কাজ বাকি।"

"আবার কী কাজ?"

"ব্রজহরি জেঠুর বাড়িতে যা।"

"তিনি আবার কে?"

"গোবর্ধনপুরের একমাত্র ইতিহাসবিদ। কিন্তু এত ইতিহাস জানে যে সব গুলিয়ে ফেলে। তোদের হরিমতী পাঠশালার আসল ইতিহাসটা ওঁর মুখ থেকে বের করে আনতে হবে। মনে রাখবি চ্যানেল ইতিহাসের গল্পটা ওঁর মুখ থেকেই সরাসরি রেকর্ড করবে। 'বিশ্বাস অবিশ্বাস' সেগমেন্টে দেখাবে।"

"তুমি কবে আসছ?"

"আপাতত আজ গজু যাচ্ছে। কাজ আছে। আমি যথা সময়ে যাব। তোরা আর দেরি না করে ব্রজহরি জেঠুর বাড়িতে যা। ইতিহাসের গল্পটা মোবাইলে রেকর্ড করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করিস। প্রহ্লাদ মিত্রকে

শোনাতে হবে।"

॥ ১১ ॥
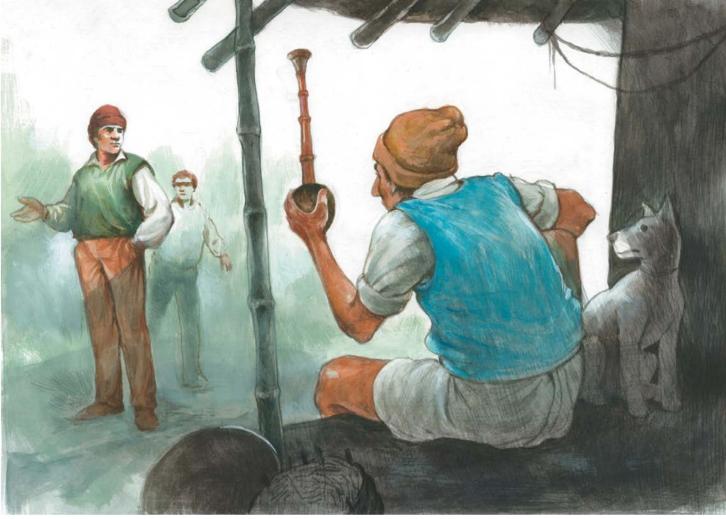
ব্রজহরি মুখোপাধ্যায়ের মাটির দোতলা বাড়ি ঘেরা পাঁচিলে কোনও দরজা নেই। এককালে হয়তো দরজা ছিল, এখন শুধু চৌকাঠটুকুই রয়েছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে বিল্টু আর লাল্টু ভিতরটা দেখল। একটা উঠোন। তার একদিকে একটা ধানের গোলা, আর-একদিকে গোয়াল। গোয়ালে দুটো গরু জাবর কাটছে আর কেউ কোথাও নেই। বিল্টু একটু গলা তুলে বলল, "এক্সকিউজ় মি।"

লাল্টু বলল, "এখানে এসব ইংরেজি চলবে না বুঝেছিস।"

তার পর নিজেই গলা তুলল, "কেউ আছেন?"

এবারও কাউকে দেখা গেল না। বিল্টু বলল, "চল ভিতরে গিয়ে দেখি।"

ইতস্তত পায়ে দু'জনে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির দালানে উঠল। সামনে একটা বন্ধ দরজা। সবে তার কড়াটা নাড়তে যাবে, এমন সময় পিছনে একটা খ্যানখ্যানে গলায় 'চোর', 'চোর' চিৎকার শুনে চমকে উঠল। পেছন ফিরে দেখল একটা বুড়ো লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে। বুড়োটার গায়ে একটা ফতুয়া আর খাটো করে পরা ধুতি। বুড়োটা তারস্বরে চিৎকার করতেই থাকল, "আজ তোরা চুরি করে পালাবি কোথায়?"

বিল্টু ভয়পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আমাদের চোর বলছেন?"

বুড়োটা চিৎকার করতে-করতে কাশতে থাকল। তার পর কাশি সামলিয়ে বলল, "যারা ছিঁচকে চুরি করতে আসে তাদের কি চোর না বলে ডাকাত বলে সম্মান দেব?"

বুড়োটা যা চিৎকার করছে, এখনই আশপাশ থেকে লোক ছুটে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি বুড়োটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল বিল্টু, "আপনি ভুল করছেন। আমি মাইকেল বিশ্বাসের ভাইপো বিল্টু।"

লাল্টু গলা মিলিয়ে বলল, "আর আমি মাইকেল বিশ্বাসের ভাগ্নে লাল্টু। ব্রজহরিবাবুকে কোথায় পাব বলতে পারেন?"

বুড়োটা গলার শিরা ফুলিয়ে বলতে থাকল, "ভাইপো-ভাগ্নে দিয়ে আমাকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিস? জানিস আমি কে?"

"আজ্ঞে না। সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি।"

বুড়োটা এবার নিজেই নিজের পরিচয় দিল, "আমিই হচ্ছি ব্রজহরি মুখুজ্জে। গোবর্ধনপুর তো ছাড়, সাতটা টাউন আমাকে একডাকে চেনে। ক'দিন ধরেই চোর আসছে। আমি তাই গোয়ালে লুকিয়ে থেকে রোজ তক্কে-তক্কে আছি। আজ ব্যাটা ধরেছি তোদের। এবার তোদের দেখাব আমার ক্ষমতা কত। এক হাঁকে সাতটা টাউন থেকে লোক ছুটে আসবে।"

"ও আপনিই ব্রজহরিদাদু। আমরা তো আপনার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছি।"

দু'জনে গিয়ে ঢিপঢিপ করে প্রণাম করল ব্রজহরি মুখোপাধ্যায়কে। প্রণাম পেয়ে একটু শান্ত হয়ে আবার পরিচয় জানতে চাইলেন, "কে তোরা?"

"ওই যে বললাম। আমি বিল্টু মাইকেলকাকার ভাইপো।"

"কে মাইকেল?"

হঠাৎ বিল্টুর মনে পড়ল মাইকেলকাকার নামটা নিজের নেওয়া, পিতৃদত্ত নাম নয়। বাড়ির ডাকনামটা ঘোর অপছন্দের। তাই নিজেই নিজের নাম পাল্টে মাইকেল রেখেছে।

"আজ্ঞে আমার দাদুর নাম নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।"

ব্রজহরি দু'জনকে আপাদমস্তক দেখে বললেন, "ও নিপেনকাকা, তা নিপেনকাকার বংশধররা তো কেউ আর গোবর্ধনপুরে থাকে না। সব শুনেছি কলকাতায় থাকে। ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে একটা শুনেছি অপোগণ্ড হয়েছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বোধ হয় সেই মাইকেলকাকার কথা বলছেন যাকে আপনি বাঁকু বলে চেনেন। উনিই বলেছেন আপনি বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ। ব্যাপার হচ্ছে বাঁকুকাকাকে এখন এমন গোপনীয় কাজ করতে হয় যে নিজের ছদ্মনাম রাখতে হয়েছে, মাইকেল। গোপনীয়তার স্বার্থে আপনিও মাইকেল বলবেন।"

ব্রজহরিবাবু কী বুঝলেন কে জানে। কিছুক্ষণ নিজের মনে বিড়বিড় করলেন। তার পর ওদের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা তা হলে নিপেনকাকার কে?"

বিল্টু বলল, "নাতি। আমার বাবার বাবা।"

একইসঙ্গে লাল্টু বলল, "নাতি। আমার মায়ের বাবা।"

ব্রজহরি জোরে-জোরে মাথা নাড়তে থাকলেন, "সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বল, মাইকেল কেন পাঠিয়েছে তোদের? মাইকেল নিজে এল না কেন?"

বিল্টু গলা নামিয়ে বলল, "কাকা আসলে ইচ্ছে থাকলেও সব জায়গায় আসতে পারে না। খুব গোপন একটা কাজ করে।"

"কোথায়? সিবিআই না সিআইডি?" ফিসফিসে গলায় ব্রজহরিবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

বিল্টু বলল, "সিবিআই।"

একইসঙ্গে লাল্টু বলল, "সিআইডি।"

ব্রজহরিবাবুর চোখ কপালে উঠল, "ওরে বাবা! সিবিআই সিআইডি দুটোতেই একসঙ্গে কাজ করে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে কাউকে বলবেন না যেন। কাকা বলেছে একমাত্র আপনাকেই বিশ্বাস করে বলা যেতে পারে।"

"সে তো বটেই। সে তো বটেই।"

"আপনার সঙ্গে একটা গোপন কথা ছিল। হয়েছে কী সিবিআই আর সিআইডির কাছে একইসঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর কেস এসেছে। হরিমতী পাঠশালার কথা শুনেছেন তো? সিবিআই আর সিআইডির কাছে খবর এসেছে ওখানে নাকি সম্প্রতি ভূতের উপদ্রব হচ্ছে। কাকা আমাকে পাঠিয়েছে সিবিআই-এর জন্য আসল খবরটা জোগাড় করতে।"

লাল্টুও গম্ভীর গলায় বলল, "আর মামা আমাকে পাঠিয়েছে সিআইডির জন্য গল্প জোগাড় করতে।"

ব্রজহরিবাবু নিজের মনে চিন্তা করে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "আমি জানতাম, আমি জানতাম হরিমতী পাঠশালায় একদিন আত্মা জেগে উঠবেই। তা সিবিআই আর সিআইডির জন্য একই ইতিহাস বলতে হবে না আলাদা-আলাদা?"

"একটাই বলুন। মামা বলেছে একমাত্র সত্যি গল্পটা নাকি আপনিই কেবল জানেন। আর আপনি ভয়ানক ব্যস্ত মানুষ। সবসময় ইতিহাস চর্চায় ডুবে থাকেন। আমরা যেন বেশি বিরক্ত না করি আপনাকে। যা বলবেন মোবাইলে রেকর্ড করে নেব।"

ব্রজহরিবাবু আরও গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, "দাঁড়া।"

তার পরে বাড়ির ভিতর থেকে একটা হুঁকো নিয়ে এসে দু' টান দিয়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে বললেন, "মাইকেল ঠিক বলেছে। আমিই একমাত্র ইতিহাসটা জানি।"

"মানে ওখানে তা হলে ভূত আছে আপনি কনফার্ম করছেন?"

"থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। তাতে ইতিহাসের সামান্য অদলবদল হয়।"

"মানে?"

"ভূত যদি থাকে, তা হলে তার একরকম ইতিহাস। ভূত যদি না থাকে তা হলে আর আর-এক রকম ইতিহাস। ভূত যদি প্রাচীন হয় তার একরকম ইতিহাস, ভূত যদি টাটকা হয় তার আর-এক রকম ইতিহাস। ভূত যদি পুরুষ হয় তার এক রকম ইতিহাস, নারী হলে আর-এক রকম ইতিহাস। রোগে ভুগে মরলে এক রকম ইতিহাস, বেঘোরে মরলে আর-এক রকম। মাইকেল কোন ইতিহাসটা শুনতে চায়?"

বিল্টু লাল্টুর দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে বলল "সিবিআই আর সিআইডি গোপনে তদন্ত করে জেনেছে পুরুষ ভূত আছে এবং সে টাটকা। বেঘোরে মরেছিল সে। আপনি ওই ইতিহাসটাই বলুন, মোবাইলে রেকর্ড করি।"

ব্রজহরিবাবু বললেন, "মাইকেল দেখছি অপোগণ্ড থেকে বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। আমিও ঠিক এইটাই ভেবেছিলাম।"

"তা হলে ইতিহাসটা শুনি। মোবাইলে রেকর্ডিং চালু করলাম।"

চোখ বন্ধ করে এক মিনিট ভাবলেন ব্রজহরিবাবু। তার পর হুঁকোয় আর-একটা টান দিয়ে শুরু করলেন, "আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তখন ভীষণ আন্দোলন চলছে। সেই সময় এক আন্দোলনকারী হরিমতী পাঠশালায় ঘাঁটি গেড়ে ছিল..."

লাল্টু মধ্যিখানে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ব্রজহরিবাবু ভয়ানক রেগে উঠে বললেন, "বাধা দিবি না, বাধা দিবি না। ইতিহাসের ছন্দ কেটে যায়। আমার মস্তিষ্কের ইতিহাসের পাতা থেকে এক-একটা ঘটনা আমার চোখের পিছনে সিনেমার রিলের মতো ভাসে। আমি শুধু ধারাবিবরণী দিয়ে যাই। বাধা পেলে ইতিহাস বিকৃত হয়ে যাবে।"

বিল্টু চোখ পাকিয়ে ইশারায় লাল্টুকে চুপ করতে বলে বলল, "না না, আপনি বলুন। তার পর? কে সেই আন্দোলনকারী?"

হুঁকোতে টান দিয়ে ব্রজহরিবাবু বলতে শুরু করলেন, "তাকে কেউ দেখতে পেত না। ভোরবেলায় সে বেরিয়ে যেত আর রাতের বেলায় ফিরে আসত। একবার পুলিশ ঠিক তার সন্ধান পেয়ে গেল। পুলিশ রাত্রিবেলায় এসে পুরো হরিমতী পাঠশালা ঘিরে ফেলল। তার পর গুডুম গুডুম করে গুলি করে মেরে ফেলল সেই আন্দোলনকারীকে। কিন্তু তার একটা প্রবল ইচ্ছে ছিল। পঞ্চাশ বছর পর সে এসে দেখবে এই সমাজের কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা। সে-ই হরিমতী পাঠশালায় ফিরে এসেছে। এই হচ্ছে আসল গল্প। মাইকেলকে বলবি সিবিআই আর সিআইডির খাতা দেখতে। লেখা আছে সব দিন ক্ষণ আর মৃত্যুকালীন বয়ান।"

ব্রজহরিবাবু কাশতে থাকলেন। বিল্টু আর লাল্টু দ্রুত নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলে নিল। তার পর ব্রজহরিকে বলল, "এমনিতে সব ঠিক আছে। কিন্তু ওই গুডুম গুডুমটা চলবে না।"

"কেন?"

"গুডুম গুডুম শব্দটা কেউ শুনেছিল কি?"

ব্রজহরিবাবু একটু চিন্তা করে বললেন, "ওটা তোদের বোঝানোর জন্য বললাম। আসল ইতিহাস বলছে পুলিশের সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক ছিল।"

বিল্টু উঠে পাঁচিলের এক কোনায় গিয়ে মাইকেলকে ফোন করে গল্পটা বলে মতামত নিল। তার পরে ফিরে এসে বলল, "কাকা বলছে গল্পটা আর-একটু বাড়াতে হবে আর আর-একটু বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে।"

ব্রজহরিবাবু রেগে উঠলেন, "বিশ্বাসযোগ্য মানে? ইতিহাস ইতিহাসই। টেনে ছোট বড় করা যায় নাকি? মাইকেল চাইলেই তো তাকে ইচ্ছেমতো বিকৃত করা যায় না।"

"না-না আপনি একদম ঠিক ইতিহাস বলেছেন। কিন্তু কী বলুন তো, এক, এখানে ভূত নিয়ে লোকে নানা কথা বলছে আর ও দিকে পঞ্চাশ বছরের পুরনো কেস কোর্টে উঠবে। জজসাহেব তার খুঁটিনাটি জানতে চাইবেন।"

ব্রজহরিবাবুর চোখ চকচক করে উঠল, "কীই! জজসাহেব আমার মুখ থেকে ইতিহাস শুনবেন?"

"আলবত শুনবেন। সিবিআই আর সিআইডি-র এক সঙ্গে কেস। তবে আপাতত আজকে গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপে একটা মিটিং বসবে শুনেছি

সেখানে আপনাকে আগে গল্পটা বলতে হবে যাতে গ্রামের সবাই সমর্থন করে।"

ব্রজহরিবাবু বললেন, "তোদের একটা কথা বলি। এই গ্রামে সব মূর্খ। ইতিহাস বোঝার মতো বুদ্ধি নেই কারও নেই।"

"সেটাই তো আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, যাতে সবাই বুঝতে পেরে বিশ্বাস করে।"

ব্রজহরিবাবু আবার ভাবতে থাকলেন। দু'বার হুঁকো টানলেন। তার পর বললেন, "ফের চালু কর তোদের রেকর্ডিং। শোন তবে প্রকৃত ইতিহাস..."

॥ ১২ ॥

রেডিয়োতে অনুরোধের আসর সবে শেষ হল আর বাইরে লালি কুঁই কুঁই করে ডেকে উঠল। দীননাথ রুটি সেঁকতে-সেঁকতে মুখ তুলে দেখল শিবেন ঠাকুর আসছে। তবে বড় রাস্তার দিক থেকে নয়, গ্রামের দিক থেকে। আজ সঙ্গে সাইকেল নেই।

শিবেন ঠাকুর এসে দোকানের ভেতর বেঞ্চে বসে বলল, "চা খাওয়াবি তো দিনু? পরশু চা-টা বড্ড খাসা বানিয়েছিলিস।"

দীননাথ বলল, "বোসো ঠাকুর। সে নয় তোমায় চা খাওয়াচ্ছি। কিন্তু কী ব্যাপার বলো তো? তুমি রোজ-রোজ রাতে এদিকে ঘুরঘুর করতে আসছ?"

শিবেন ঠাকুর গম্ভীর মুখে বলল, "বড্ড চিন্তায় আছি রে দিনু। গ্রামের কল্যাণের জন্য কিছু একটা তো ব্যবস্থা করতে হবে।"

"মানে?"

"ভুলে গেলি? এই যে তোকে পরশু বললাম হরিমতী পাঠশালায় ভূত আছে।"

দীননাথ মাথা ঝাঁকালো, "না ঠাকুর। তুমি সেদিন বলার পর আমি বিস্তর ভেবে দেখলাম, পাঠশালায় ভূত থাকতে পারে না।"

শিবেন ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বলল, "বিশ্বাস করছিস না তো আমার কথা?"

দীননাথ ফস করে বলে ফেলল, "তোমার কথা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। তবে..."

"তবে কী?"

"আজকে হঠাৎ করে সবাই বলাবলি করছে। চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনা হয়েছে। বাঁকুর ভাইপো-ভাগ্নেরা আমার দোকানে খেতে এসেছিল। ওরা বাইরের ছেলে, ওরাও বলছিল। এমনকি ব্রজজেঠু ইতিহাসও বলছে।"

শিবেন উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, "দ্যাখ দিনু, কী শুনছিস কানকে বিশ্বাস করবি না। যা নিজের চোখে দেখবি তাই বিশ্বাস করবি, অন্যকে বিশ্বাস করাবি। গ্রামের সবাইকে বলবি যে শিবেন ঠাকুর মা রক্ষাকালীর একনিষ্ঠ সেবক তন্ত্রসিদ্ধ পূজারি, বাজে কথা বলে না। চল আমার সঙ্গে আজকেই তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

দীননাথ মুখ ছোট করে বলল, "অপরাধ নিয়ো না ঠাকুর। গ্রামের লোকে যা বলে সেটাই ফস করে বলে ফেলেছি। কিন্তু কী বলো তো আমি তোমাকে ঠিক অবিশ্বাস করছি না। হয়তো তুমি ওদিক দিয়ে আসছিলে। কিছু দেখেছ। মনের ভুল হতে পারে।"

শিবেন ঠাকুর প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকাল, "মনের ভুলে একই জিনিস বারবার দেখা যায় না। আর তুই আমার কথায় কেন বিশ্বাস করবি? বলছি তো কখনও কারওর মুখের কথায় বিশ্বাস করবি না। নিজের চোখে দেখবি, তার পর কষ্টিপাথরে সোনা যাচাই করার মতো যা দেখবি তা বিশ্বাস করবি। তুই চল আমার সঙ্গে।"

শিবেন ঠাকুর জোরাজুরি করতে থাকল। দীননাথ বলল, "তা একবার যেতেই পারি তোমার সঙ্গে। তা হলে তুমি চা-টা শেষ করো। আমিও তত ক্ষণে উনুন বন্ধ করে ঝাঁপ ফেলে দিই।"

"তাই কর। তবে তাড়াতাড়ি কর। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।"

"ভূত দেখার আবার লগ্ন হয় নাকি ঠাকুর?"

শিবেন ঠাকুর বিরক্ত হল, "আহ্‌। বড্ড মূর্খর মতো প্রশ্ন করিস। সব কিছুর গ্রহ, নক্ষত্র, লগ্ন হয়। আজ কিসকিসা নিশা। আজ তোকে ভূত দেখিয়ে আনবই। তুই গোছা। আমি চট করে একটা ফোন করেনি।" ধুতির কোঁচড় থেকে মোবাইলটা বের করল শিবেন ঠাকুর।

"কাকে আবার ফোন করছ গো?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে শিবেন ঠাকুর বলল, "ওই একজন যজমানকে। কালকে ওদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো আছে। কিন্তু এদিকে যা অবস্থা..."

নিজের কাজ শেষ করতে-করতে মুখটা আকাশের দিকে তুলে তাকাল দীননাথ। আকাশে একফালি চাঁদ। বিস্মিত গলায় দীননাথ বলল, "কাল সত্যনারায়ণ পুজো? কাল তো পূর্ণিমা নয়?"

"আহ আবার বড্ড কথা বলছিস। দিনরাত রেডিয়ো শুনে-শুনে তোর এই অবস্থা হয়েছে। সাধারণ সত্যনারায়ণ পুজো পূর্ণিমার দিন হয়। এটা স্পেশ্যাল সত্যনারায়ণ পুজো। তোকে একটু আগে কী বললাম? কিসকিসা নিশা। চাঁদটাকে ভাল করে দ্যাখ। সাদা মেঘগুলোকে ডেকে-ডেকে কেমন ডান দিক থেকে টেনে বাঁ দিকে ছুড়ে দিচ্ছে।"

বলতে-বলতে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে শিবেন ঠাকুর গজুকে ফোন করে চাপা গলায় বলল, "হ্যালো, আমরা রওনা দিচ্ছি। মিনিট পনেরো লাগবে পৌঁছতে।"

ও পাশ থেকে গজু তাগাদা দিল, "যা করার তাড়াতাড়ি করুন। বড্ড মশা কামড়াচ্ছে। আপনারা দেরি করলে আর থাকতে পারব না।"

শিবেন ঠাকুর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না না চিন্তা করবেন না। আমরা এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি।"

ফোনটা ছেড়ে দোকানের ভিতর ফিরে এল শিবেন ঠাকুর। আবার দীননাথকে তাড়া দিল, "হয়েছে তোর?"

"হ্যাঁ হয়ে গেছে, চলো। তুমি যখন এত করে বলছ, দেখেই আসি।" গায়ে কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নিল দীননাথ। বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। পিছন-পিছন চলল লালি। বেশ ঠান্ডা আজকেও। এটা বড় রাস্তা হলেও সেরকম গাড়ি যায় না এই রাস্তায়। শেষ বাস রাত সাতটা নাগাদ বেরিয়ে যায়। তার পর মাঝে-মাঝে টুকটাক গাড়ি যায়।

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ঠাকুর? তুমি হঠাৎ করে হরিমতী পাঠশালার দিকে গিয়েছিলে কেন?"

"বিশ্বাস করবি? ক'দিন ধরে একটা অশুভ স্বপ্ন দেখছিলাম।"

"কী অশুভ স্বপ্ন?"

"আরে, এই জমিদারবাড়িটার দিকে আমি তো একেবারেই আসি না। তাই স্বপ্নে প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না জায়গাটা কোথায়? শুধু বাড়িটা চেনা-চেনা লাগছিল। তার পর হঠাৎ করেই হরিমতী পাঠশালা লেখাটা স্বপ্নে দেখলাম। তখনই বুঝতে পারলাম কিছু একটা ইঙ্গিত আমার কাছে আসছে। রক্ষাকালী মাকে স্মরণ করলাম। স্বপ্নের মধ্যে রক্ষাকালী মায়ের গলা শুনতে পেলাম, এই গ্রামকে অশুভ আত্মার থেকে রক্ষা করতে আমাকে একদিন সন্ধেবেলার পরে অকুস্থলে যেতে হবে। ব্যস, সূর্য ডুবতেই সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।"

দীননাথ মাথা ঝাঁকাল। সরল মনের মানুষ। শিবেন ঠাকুরকে ঠিক অবিশ্বাসও করতে পারছে না। যদিও শিবেন ঠাকুর আগে সব বলেছে তবু আর-একবার শুনতে ইচ্ছে করল। জিজ্ঞেস করল, "তার পর গিয়ে কী দেখলে?"

"কী দেখিনি! আসলে কী বল তো দিনু, কী দেখলাম, কী দেখেছি আর আজকে কী দেখব সবই মায়ার খেলা। হয়তো আমি যা দেখেছি, তুই তা দেখবি না। তা বলে তো সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যায় না। তবু তোকে বলি আমি যখন বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছলাম, আমার মনে হল ভিতর থেকে কেউ যেন আমাকে 'আয়' 'আয়' বলে ডাকছে। তুই তো জানিস নির্জলা উপোস করে রক্ষাকালীর পুজো করি আমি। আমার প্রাণে ভয় ডর নেই আর এই গ্রামকে রক্ষা করতে আমাকে যদি প্রাণ দিতে হয় তাতেও আমি পিছুপা নই। তাই এগিয়ে গেলাম। প্রথমেই গিয়ে

দালানটায় উঠলাম। আর উঠতেই আমার বাঁ হাতটা শিরশির করে উঠল। এটা একটা ভীষণ ইঙ্গিত,” শিবেন ঠাকুর গলা কাঁপিয়ে বলল।

“কিসের ইঙ্গিত ঠাকুর?”

“ভয়ঙ্কর অশরীরী আত্মার উপস্থিতির,” শিবেন ঠাকুর কম্বলের মধ্যে থেকে ডান হাতটা বের করে দেখিয়ে বলল, “এই দ্যাখ, ডান হাতে তাবিচ মাদুলি সব আছে বলে ডান হাতে কিছু হয় না। সব ঝামেলা এই বাঁ হাতে।”

“তা হলে বাঁ হাতেও ওইসব তাবিচ মাদুলি পরে নাও।”

“পরে নাও বললেই তো হয় না। অনেক কঠিন-কঠিন সাধনা আছে।”

“তার পর?”

“সব অন্ধকার ক্লাস ঘর। আমি ক্লাস ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি অদৃশ্য কিছু আমার পিছু নিয়েছে। বুঝলাম স্বপ্নে সত্যি দেখেছি। এই সেই ভয়ঙ্কর অশুভ অতৃপ্ত আত্মা। ভাবছি কে সে? কী চায়? আমার কাছে অবশ্য ভীষণ শক্তিশালী তন্ত্রমন্ত্র আছে। এতই শক্তিশালী যে এক লাইন আওড়ালেই ভূত আমার পুত হয়ে বশীভূত হয়ে যাবে। কিংকর্তব্য সমসং কিয়দংশ সার্থকম। কিছু বুঝলি মন্ত্রটার? কিন্তু আমি এই মন্ত্র আওড়ালাম না। কেন বল তো?”

দীননাথ একটু ভেবে বলল, “কেন?”

“আরে বাবা, স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথা ভাবলেই চলবে? গ্রামের এত মানুষের কথা ভাবতে হবে না? বড়মামা মারা যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল, ভাগ্নে গোবর্ধনপুরের দায়িত্ব তোর। আমাকে তো ভাবতেই হবে কে এই ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা? কোথা থেকে এসেছে? কেন এসেছে? কী ক্ষতি করতে এসেছে?”

মুখ তুলে চাইল দীননাথ। প্রায় অর্ধেক রাস্তা চলে এসেছে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয় কুয়াশামাখা বাড়িটা দুঃখীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। মনটা কেমন যেন খারাপ হতে থাকল দীননাথের। এক সময়ে চার ক্লাস পর্যন্ত এ ভাবেই হেঁটে যেত হরিমতীর পাঠশালার দিকে। অশ্বিনী মাস্টারের কথা বড্ড মনে পড়ছে।

॥ ১৩ ॥

হাঁটতে-হাঁটতে শিবেন ঠাকুর আর দীননাথ একটা সময়ে জমিদার বাড়ির সামনে চলে এল। সঙ্গে লালি। জনমানবহীন জায়গায় রাত বেশ নিঝুম হয়েছে। রাতের শীতকালের আকাশ ঝকঝকে হলেও চাঁদের এক ফালি আলোয় গম্ভীর দেখাচ্ছে জমিদারবাড়িটা। বাড়ি ঘিরে পাঁচিলটা এখন আর কিছুই নেই। শুধু কিছু ইতিউতি ভাঙা ইটের টুকরো পড়ে আছে। বাড়িটার সামনে এককালে কেয়ারি করা বাগান ছিল। কিন্তু এখন শুধুই আগাছা। শীতকালে সাপের ভয় নেই। তবু সাবধানে আগাছা পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে দরদালান পৌঁছল দু’জনে। এখানে শুধু চাপ-চাপ অন্ধকার।

সেই দূর থেকেই যখন জমিদারবাড়িটা দেখতে পেয়েছিল বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছিল দীননাথের। এখন বাড়িটায় পৌঁছে মনটা আরও উদাস হয়ে গেল। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই স্কুল করতে আসা দিনগুলো। সত্যি সে কত বছর আগেকার কথা। তার পর আর কোনওদিন আসা হয়নি এই বাড়িটার সামনে।

জমিদারবাড়িটা এত বড় হলেও একটামাত্র হল ঘরের মতো বড় ঘরে অশ্বিনী মাস্টার শুরু করেছিলেন হরিমতী পাঠশালা। কোনও সাইনবোর্ড ছিল না। বাইরের দেয়ালের একদিকে রং দিয়ে কাঁচা হাতে লেখা থাকত নামটা।

“তোমার মোবাইলের টর্চের আলোটা একটু এখানে ফেলো তো ঠাকুর।”

“কেন রে?” বলতে-বলতে শিবেন ঠাকুর আলো ফেলল।

দীননাথের মনটা খারাপ হয়ে গেল। হরিমতী পাঠশালা লেখাটা আর নেই। ও জায়গার পলেস্তারাই এখন খুলে গিয়েছে। সেই কথা শিবেন ঠাকুরকে বলল। শিবেন ঠাকুর কী যেন চিন্তা করল। তার পর দেওয়ালের কাছে নাকটা নিয়ে গিয়ে শুঁকে বলল, “অক্ষরগুলোর কেমন যেন গন্ধ পাচ্ছি। তোরা কোন ঘরটায় বসে লেখাপড়া করতিস?”

“এই তো,’’ পাশেই পাল্লাবিহীন দরজাটা দেখাল দীননাথ। যদিও ঘরের মধ্যে চাপ অন্ধকার, কিন্তু দীননাথ যেন সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে স্মৃতির থেকে। ঘরের ভিতর কোনও বেঞ্চ ছিল না। মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসতে হত। ঘরের চার কোনায় চারটে মাদুর। তাতেই প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি চারটে ক্লাস। যারা চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষায় পাস করত, অশ্বিনী মাস্টার টাউনের একটা স্কুলের সঙ্গে তাদের বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দিতেন। দীননাথ অবশ্য বৃত্তি পরীক্ষা দেয়নি। লেখাপড়ায় তেমন মাথা ছিল না। তবে এই পাঠশালাটাকে বড় ভালবাসত। যতদিন পড়েছে কোনওদিন কামাই করেনি। সকাল-সকাল পুকুরে চান করে হাতে স্লেট, খড়ি নিয়ে ঠিক সময়ে মাদুরে নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ত। সবাই নিজের-নিজের স্লেট আর খড়ি নিয়ে আসত। দেওয়ালের একদিকে ছিল একটা ব্ল্যাকবোর্ড। ওই ব্ল্যাকবোর্ডে অ-আ-ক-খ থেকে ব্যাকরণ বিজ্ঞান সব শেখাতেন অশ্বিনী মাস্টার।

শিবেন ঠাকুর ফিসফিস করে বলে উঠল, “কিছু বুঝতে পারছিস দিনু?”

সম্বিৎ ফিরে দীননাথ বলল, “কই না তো? বড্ড ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে।”

আস্তে-আস্তে শিবেন ঠাকুর মাথা ঝাঁকাতে থাকল, “বাতাসটা জায়গায়-জায়গায় কীরকম ভারী বুঝতে পারছিস না? পছন্দ করছে না... পছন্দ করছে না...”

“কে পছন্দ করছে না? কী পছন্দ করছে না?” দীননাথ অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল।

“বুঝতে পারছিস না?” শিবেন ঠাকুর গলাটা আরও গম্ভীর করল।

“না তো।”

“আমি বুঝতে পারছি। আমার যে তন্ত্রসাধনা করা আছে। একটা ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত বইছে, বুঝতে পারছিস?”

দীননাথ বলল, “কী করে বুঝব? গা-টা তো কম্বলমোড়া।”

“তবে খুলে ফ্যাল কম্বল। তবে সাবধানে। খুব সাবধানে।”

কম্বল থেকে হাতটা বার করতে একটু শীত-শীত করে উঠল। তবে তা তো হতেই পারে। এখন তো শীতকাল। চাপা গলায় শিবেন ঠাকুর বলল, “চল আর-একটু এগোই। স্পষ্ট ইঙ্গিত পাচ্ছি। ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত।”

জমিদারবাড়ির ভিতরের ঘরগুলোর দরজা-জানলা আর একটাও আস্ত নেই। দুটো ঘর পেরিয়ে হঠাৎ দীননাথের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল শিবেন ঠাকুর। একটা ঘরের ভিতর অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জ্বলজ্বল করছে চারটে মার্বেলের গুলির মতো আলো।

‘‘কে? কে?’’ বলতে-বলতে শিবেন ঠাকুরের গলাটা একটু কেঁপে উঠল। দীননাথ একটু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ঘরের অন্ধকারে ঢুকে দু’বার নাকটা টানল। গন্ধটা চেনা।

“তোমার মোবাইলের টর্চটা আর-একবার জ্বালাও দেখি।”

শিবেন ঠাকুর মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে কাঁপা হাতে দীননাথের দিকে এগিয়ে দিল। দীননাথ সেই আলোটা ঘরের ভিতর ফেলেই হো হো করে হেসে উঠল, “এই বুঝি তোমার ভূত?”

ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ছাগল আর তার ছানা। হঠাৎ আলো পড়ায় তারা যেন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে। দীননাথ বলল, “গন্ধ শুঁকেই বুঝেছি এই ঘরে ছাগল আছে। চলো আর ভূত দেখে কাজ নেই। বলেছিলাম কিনা তোমাকে কী দেখতে কী দেখেছ! অনেক রাত হয়েছে। এবার বাড়ি ফিরি চলো।”

শিবেন ঠাকুর বিড়বিড় করে বলল, “তাই ভাবছিলাম। এখানে তো থাকার কথা নয়।”

“কিছু বললে?”

“তুই হয়তো সাদা চোখে বুঝতে পারলি না দিনু। আমি তন্ত্রসাধনা

দিয়ে বুঝতে পারছি দুটো ছাগলই ভূতগ্রস্ত। না হলে চোখের মণির জ্যোতিতে আবছা রক্তকরবীর ছায়া থাকত না। খেয়াল রাখতে হবে কেউ যেন এই ছাগলকে রক্ষাকালী মায়ের কাছে বলি চড়াতে না নিয়ে আসে। ওই রক্ত মাটিতে পড়লেই সর্বনাশ। বুঝেছি। বুঝেছি। আত্মা এখন রাস্তা খুঁজতে দোতলায় চলে গেছে। সেরকমই যে কথা।"

"সেরকমই কথা! কিসের কথা?"

"তন্ত্র শাস্ত্রের। কিসকিসা নিশার কথাটা একদম মনে ছিল না। আমি এখনও স্পষ্ট টের পাচ্ছি সে আছে।"

"কোথায় আছে?"

"দোতলায় হামাগুড়ি দিচ্ছে।"

ঠিক এরকম সময়ে দোতলায় একটা আওয়াজ হল। লালি 'কুঁইই' করে অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল। কেউ যেন এক দিক থেকে আর-এক দিকে দৌড়ে গেল। আর তার পরেই সরসর করে একটা আওয়াজ হলো। দীননাথের হাত ধরে শিবেন ঠাকুর সিঁড়ির ধাপ বেয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এসে উপরের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, "ওই দ্যাখ দিনু, উপরে দ্যাখ।"

এবার সত্যিই দীননাথ অবাক হয়ে দেখল উপরের বারান্দায় একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। দীননাথ চুপ করে ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। অবাক করার মতো দৃশ্যই বটে। গলা ছেড়ে দু'বার ''কে? কে?'' বলল। ছায়ামূর্তিটা একটুও নড়ল না। শিবেন ঠাকুর শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলল, "বিশ্বাস হল এবার?"

দীননাথ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। জীবনে কোনওদিন ভূত দেখেনি। শুধু গল্প শুনেছে। ভূতকে এমনিই দেখতে হয় বুঝি? একটু চিন্তা করে দীননাথ বলল, "চলো তো একবার ওপরে গিয়ে দেখি।"

"একদম না," শিবেন ঠাকুর সাবধান করে দিয়ে বলতে থাকল, "তোর না আছে মাদুলি, না তাবিচ না মন্ত্রের গ্রন্থি। তোকে আমি নিয়ে এসেছি। আমার একটা দায়িত্ব আছে। শেষে তোর কাঁধে ভূতে ভর করিয়ে গ্রামে নিয়ে যাব? গ্রামে মড়ক নেমে আসবে। নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছিস, এ অতি ভয়ঙ্কর পাজি আত্মা।"

আর ঠিক তখনই উপরে আর-এক অন্ধকার কোণ থেকে এক মহিলা কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসতে শুরু করল, ''আয়... আয়... এসেছিস... আয়... আয়... এসেছিস?"

দীননাথের অবাক হওয়ার পালা ক্রমশ বাড়তে থাকল। মাথা ঠিক কাজ করছে না। শিবেন ঠাকুরকে বলল, "সত্যি কি তা হলে এখানে আত্মা আছে?"

"নিজের চোখে দেখছিস শুনছিস, এর পরেও প্রশ্ন? আত্মা একটা নয়, দু'-দুটো। তুই তো এই গ্রামে আজন্ম আছিস। দেখেশুনে কিছু বুঝতে পারছিস কাদের আত্মা?"

দীননাথ দু'দিকে মাথা নাড়ল, "নাহ।"

এমন সময় ছায়ামূর্তির হাতে একটা বেত বেরিয়ে এল। শিবেন ঠাকুর উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, "বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছ. এ নির্ঘাত অশ্বিনী মাস্টারের আত্মা। আমার গণনা সেরকমই বলছিল।"

"কিন্তু ব্রজজেঠু তবে যে বলছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী? আর অশ্বিনী মাস্টার কোনওদিন বেত রাখতেন না।"

"অশ্বিনী মাস্টার যে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল না, কে বলল? তখন হয়তো বেতের দরকার হত না। তা বলে এখনও দরকার হয় না কে বলল?" তার পর উপর দিকে তাকিয়ে শিবেন ঠাকুর গলা ছেড়ে বলল, "আপনি যদি ফিরে এসেছেন তা হলে বলুন কী চান?"

উপর থেকে একটা খ্যানখ্যানে গলা ভেসে এল, "মুক্তি মুক্তি।"

আর অন্যদিকে অন্ধকার কোণ থেকে আবার ভেসে এল সেই মহিলা কণ্ঠ, ''আয়... আয়... এসেছিস... আয়... আয়... এসেছিস?" আর তার পরেই ছায়ামূর্তিটা শূন্যে ভেসে উঠে সেই গলার ডাকের দিকে উড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দীননাথ।

॥ ১৪ ॥

রেশমি সেনের রাতে ঘুম উড়ে গেছে। গ্র্যান্ড ফিনালের শুটিংয়ের জন্য হাতে আর একদম সময় নেই। সামনের শনিবার সেমি ফাইনালের এপিসোড টেলিকাস্ট হয়ে যাবে। গোটা পৃথিবীর লোক জেনে যাবে ফাইনালে হাড্ডিহাড্ডি লড়াই হবে সঞ্জনা আর বাপ্পাদিত্যর মধ্যে। প্রোমোর পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ হয়ে গিয়েছে। রবিবার থেকে প্রচার শুরু হবে। তার সঙ্গে পাবলিক ভোটিং শুরু হবে। এত আয়োজন কিন্তু শুটিংয়ের লোকেশনই ঠিক হয়নি।

চার দিকে হন্যে হয়ে লোক পাঠিয়েছেন রেশমি সেন। রোহনকে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ওড়িশায়, ঝাড়খণ্ডে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেউই গ্র্যান্ড ফিনালের উপযুক্ত একটা ভূতের বাড়ির সন্ধান দিতে পারছে না। অফিসে নিজের চেম্বারে রগ-দুটো চেপে বসেছিলেন রেশমি সেন। এমন সময় এসে ঢুকলেন প্রহ্লাদ মিত্র। মুখে যেন কোনও টেনশনই নেই। একমুখ হেসে বললেন, 'গুড মর্নিং ম্যাম। মনে হচ্ছে প্রবলেম সলভ্ড। বাড়ি একটা পাওয়া গেছে। আমি আজই দেখতে যাব।"

"পাওয়া গেছে? সত্যি?" রেশমি সেন উল্লাসিত হয়ে উঠলেন, "কোথায়?"

প্রহ্লাদ মিত্র রেশমি সেনের উল্টো দিকের চেয়ারে গুছিয়ে বসে বলতে শুরু করলেন, "বলছি আপনাকে। আগে বাড়িটার ফটোগুলো দেখুন। বর্ধমানের গোবর্ধনপুর গ্রামের কাছেই জায়গাটা। হরিমতী পাঠশালা।"

প্রহ্লাদ মিত্র মোবাইলটা বাড়িয়ে দিলেন রেশমি সেনের দিকে। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো একগুচ্ছ ফটো দেখতে-দেখতে রেশমি সেন খুশি হয়ে বললেন, "বাড়িটা তো দিব্যি মনে হচ্ছে। এত বড় জমিদারবাড়িটার নাম, হরিমতী পাঠশালা?"

"সব বলছি ম্যাম। যা তথ্য জোগাড় করেছি, বাড়িটা একদম পোড়োবাড়ি। কেউ থাকে না। চারদিকে ধু ধু চাষের মাঠ। বাড়িটা দেড়শো বছরের পুরনো এক জমিদারবাড়ি। স্বাধীনতার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই বাড়ির বাসিন্দারা মামলা-মকদ্দমা করে সবাই ছেড়ে চলে গিয়েছে। পরে তো জমিদারি প্রথাটাও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাড়িটা আর কোনও দাবিদার ছিল না। বহু বছর আগে গোবর্ধনপুর গ্রামের এক মাস্টারমশাই ওখানে নিজের মায়ের নামে একটা পাঠশালা খুলেছিলেন, হরিমতী পাঠশালা। গ্রামের কৃষকদের ছেলেমেয়েদের ধরে-ধরে এনে ওখানে পড়াতেন। তবে ক্লাস ফোর পর্যন্ত ছিল। সেই মাস্টারমশাই হঠাৎ করেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যান। তার পর থেকেই বাড়িটা হন্টেড। দেখুন ফটো দেখেই কেমন গা ছমছম করছে। তিন-চারটে ঘর আছে যেখানে সূর্যের আলো ঢোকে না। স্বভাবতই এই ঘরগুলো খুব ঠান্ডা আর এখন তো শীতকাল। এই ঘরগুলোয় ঢুকলেই একটু বেশি স্যাঁতস্যাঁতে ঠান্ডা মনে হবে। এই ঘরগুলোয়ই টাস্ক রাখব আমরা। গ্র্যান্ড ফিনালেতে তিনটে টাস্ক নতুন বাড়িতে নতুন করে ভেবেছি। এখন শুধু আপনার অ্যাপ্রুভাল দরকার।"

"কে জোগাড় করল বাড়িটা?"

"মাইকেল বিশ্বাস ম্যাম।"

"মাইকেল বিশ্বাস মানে যার সঙ্গে রোহন কথা বলেছিল?"

"হ্যাঁ ম্যাম। এখন রোহন নেই বলে আমিই কনট্যাক্ট রাখছি। বাড়িটা গ্র্যান্ড ফিনালে করার জন্য একেবারে আদর্শ। একেবারে আমাদের ট্যাগলাইনের মতো, ওরা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, বিশ্বাস অবিশ্বাস আপনাদের।"

"আদর্শ বলছেন কেন?"

"তার কারণ, এখানে ভূতের উপদ্রবটা খুব সম্প্রতি শুরু হয়েছে। বুঝতেই পারছেন এখনও গ্রামের বাইরে খবরটা বেরোয়নি। মিডিয়ায়ও খবরটা আসেনি। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে কারও কোনও স্ট্যাটাসও নেই। এইবার চিন্তা করে দেখুন ম্যাম, গ্র্যান্ড ফিনালের শুটিং ওখানে হবে। সেটা নিয়ে তো একটা হইচই হবে। মিডিয়া আসবে।

মিডিয়া ব্যাপারটা কভার করবে। কাগজে বেরোবে, টিভিতে প্রাইম টাইমে খবরে থাকবে। সব জায়গায় এই নতুন ভৌতিক জায়গা নিয়ে হইচই চলবে। পাবলিকের উৎসাহ একেবারে তুঙ্গে থাকবে। আর ঠিক তখনই আমাদের গ্র্যান্ড ফিনালে টেলিকাস্ট হবে। ভাবতে পারছেন ম্যাম, টিআরপিটা কোথায় যাবে? শুধু সিজ়ন টু কেন, ওমেগা প্লাসের সঙ্গে হয়তো আমাদের সিজ়ন থ্রি পর্যন্ত চুক্তি হয়ে যাবে।”

রেশমি সেন শুনছিলেন আর ভাবছিলেন। প্রহ্লাদ মিত্র যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয় এর চেয়ে ভাল কিছু আর হবে না। তবু সাবধান হলেন, “ভাল করে খোঁজখবর নিয়েছেন মিস্টার মিত্র? কোনওরকম ধোঁকাবাজি হলে কিন্তু আমাদের চরম বদনামই হবে না ওমেগা আমাদের স্পাইন চিলিং প্রোডাকশনকে একেবারে ব্ল্যাকলিস্টেড করে দেবে।”

“একদম চিন্তা করবেন না ম্যাম। তা ছাড়া আমাদের আর উপায় কী? বাড়ি তো আর কোথাও পাওয়া গেল না। হাতে সময় বড্ড কম। এই আপনাকে বললাম আর আজকেই যাচ্ছি। মাইকেল বিশ্বাস নিজেও যাচ্ছে। আমি ওখানে গিয়ে আরও ভাল করে খোঁজখবর করে আপনাকে ফোন করব।”

“ঠিক আছে। সব যদি ঠিক মনে করেন একেবারে ফাইনাল করে ফেলবেন। যা বাধা পড়ছে এইবার। কিন্তু এখন কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।”

“রাইট ম্যাম। মাইকেলও এই কথাই বলেছে। প্রোডাকশনের বেশি লোক এখন গেলেই উৎসাহী লোকের ভিড়ভাট্টা বাড়তে থাকবে। তা হলেই গন্ডগোল। একবার যদি রটে যায় যে, ওখানে শুটিং হবে তা হলে মেলা বসে যেতে পারে।”

“না-না, এত কষ্টে যখন বাড়িটা পাওয়া গেছে তখন এসব রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না।”

“একদমই না। আমাদের তো শুধু লোকাল লোককে নিয়ে ভয় নয় ওই যে বিজ্ঞান যুক্তিবাদীর একটা ক্লাব সমানে আমাদের পিছনে লেগেছে ওরাও যদি হাজির হয়ে যায়?”

রেশমি বললেন, “সে রিস্ক তো আছেই। ফেসবুকে ‘ভূতের যম’ বলে গ্রুপটার কথা বলছেন তো? এমনিতেই ওরা আমাদের খুব পিছনে লেগেছে। কোথা থেকে যে আমাদের সব খবর জোগাড় করে ফেলছে। তা ছাড়া, আমরা তো প্রতিযোগীদের কিছুতেই জানতে দিতে চাই না যে কোথায় এই শুটিং-টা হবে।”

“হাতে সময় বড্ড কম। খুব দ্রুত কাজটা সেরে ফেলব। ফাইনাল হয়ে গেলে প্রোডাকশনের দু’-একজনকে ডেকে নেব। অনেক জিনিস বুঝে নেওয়ার ব্যাপার আছে। ক্যামেরা লাগাতে হবে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কী ব্যবস্থা আছে দেখতে হবে। টাস্ক তৈরি করে প্লেসমেন্টটা ফাইনাল করে নিতে হবে।”

“আচ্ছা মি. মিত্র, আর-একটা ব্যাপার। আমাদের তো স্থানীয় একজন বিজ্ঞ মানুষকে দরকার যিনি নিজের মুখে পুরো ইতিহাসটা বলেন ওই ‘সত্যি মিথ্যে’ সেগমেন্টটা।”

প্রহ্লাদ মিত্র জিভ কাটলেন, “দেখেছেন সেই ভিডিয়োটাই আপনাকে দেখানো হয়নি। মাইকেল কাজের। সেটাও পাঠিয়ে দিয়েছে। শুধু যে ভদ্রলোক এটা বলছেন তিনি একটু আবেগপ্রবণ। উৎসাহের আতিশয্য আছে।”

বলতে-বলতে প্রহ্লাদ মিত্র আবার হোয়াটসঅ্যাপে একটি ভিডিয়ো চালালেন। রেশমি সেন শুনতে শুরু করলেন উত্তেজনায় টইটম্বুর হয়ে বলা ব্রজহরি মুখোপাধ্যায়ের কথা।

“সে অনেক কাল আগেকার কথা। ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয়নি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রবল বিক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে যাচ্ছেন ইংরেজদের দেশ ছাড়া করে ভারতমা-কে স্বাধীন করতে। সেই সময় এই অঞ্চলে এসেছিল এক অত্যন্ত অত্যাচারী ইংরেজ পুলিশ অফিসার মি. ওয়েলিংটন। ওয়েলিংটন সাহেব এসে যেখান থেকে পারছিল হয় এক-একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ধরে খপাখপ গুলি করে মেরে দিচ্ছিল না হয় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল। এই ইতিহাস ক’জন জানে? সেই সময় একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ঠিক করলেন ওয়েলিংটন সাহেবকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবেন। একদিন ওয়েলিংটন সাহেব সপরিবারে এখানে আর-এক গোরা সাহেবের বাড়িতে এসেছিল। তো রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘোড়ার গাড়ি চেপে সাহেব-মেম নিজেদের বাড়ি ফিরছে, এমন সময় এক বীর সংগ্রামী সেই গাড়িতে ওয়েলিংটন সাহেবকে লক্ষ করে একটা বোমা ছুড়েছিল। কিন্তু সেই বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সোজা গিয়ে মেমসাহেবের গায়ে লেগেছিল। মেমসাহেব মারা গিয়েছিল। বেঁচে গিয়েছিল অত্যাচারী ওয়েলিংটন সাহেব। শুধু বেঁচেই যায়নি একেবারে গুলি খাওয়া পাগলা বাঘ হয়ে উঠেছিল। একদিকে ওয়েলিংটন সাহেব খ্যাপা ষাঁড়ের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিল কে এই কাজ করল, আর-একদিকে সেই অকুতোভয় সংগ্রামী এক অদ্ভুত মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। তিনি তো চাননি মেমসাহেবকে মারতে। এই ইতিহাস ক’জন আজ জানে?”

ভিডিয়োতে দেখা গেল ব্রজহরি হুঁকোয় আর-একটা টান দিয়ে বাকিটা বলতে থাকলেন, “সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী চাইলেন শুদ্ধ হতে। গোপনে আশ্রয় নিলেন পরিত্যক্ত জমিদারের বাগানবাড়িতে। থাকতেন হরিমতী পাঠশালার ঘরে। অবশ্য তাঁকে কখনও দেখা যেত না। তিনি শুধু রাত্রে শুতে আসতেন। কিন্তু এই খবর ঠিকই একদিন পৌঁছে গেল ওয়েলিংটন সাহেবের কাছে। একরাত্রে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে পুরো জমিদারবাড়ি ঘিরে ফেলল ওয়েলিংটন সাহেব। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী ওয়েলিংটন সাহেবের বন্দুকের সামনে অকুতোভয় হয়ে বলে উঠলেন, ‘বন্দেমাতরম। আমার শরীর বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু আমার আত্মা থেকে যাবে এখানে। যেদিন আমার আত্মা মেমসাহেবকে হত্যা করার গ্লানিমুক্ত হবে, সেদিন আমার আত্মা আবার জেগে উঠবে এখানে। আমি দেখব আমার স্বাধীন ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে কত উন্নত হয়েছে? আমি ৭৫ বছর পরে ফিরে আসব। এই ইতিহাস ক’জন জানে?”

ভিডিয়োটা শেষ হল। রেশমি সেন মোবাইলটা প্রহ্লাদ মিত্রর হাতে ফেরত দিতে-দিতে বললেন, “একটু অতিরঞ্জিত হল না? গল্পটা কোথাও যেন বিপ্লবী ক্ষুদিরামের গল্পের সঙ্গে মিল আবার কোথাও ঋষি অরবিন্দর সঙ্গে। তা ছাড়া হরিমতীর পাঠশালার সেরকম কোনও রেফারেন্সই তো পেলাম না।”

“আপনি এত ভাববেন না ম্যাম। আমাদের স্ক্রিপ্টরাইটার অসীমবাবুকে দিয়ে সব ঠিকঠাক করিয়ে দেব। তা ছাড়া আমরা তো যত এপিসোড করেছি, আমরা কখনও বলিনি বাড়িগুলোয় ভূত আছে। আমরা শুধু জনশ্রুতিটুকু স্থানীয় মানুষদের মুখের থেকে শুনিয়েছি। আপনি শুধু ‘গো অ্যাহেড’টা দিয়ে দিন। হাতে সময় বড্ড কম। তা হলে রওনা দিই?”

রেশমি সেন বললেন, “আপাতত তো এ ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না। ভাল করে বুঝেশুনে নেবেন কিন্তু মি. মিত্র।”

॥ ১৫ ॥

রেশমি সেনের সঙ্গে কথা বলে কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে সন্ধের মুখেই প্রহ্লাদ মিত্র হাইওয়ের কাছে একটা ধাবায় পৌঁছে গেলেন। জায়গাটা গোবর্ধনপুর থেকে দশ কিলোমিটার মতো দূরে। মাইকেল এই ধাবাতেই আসতে বলেছে। প্ল্যান হয়েছে এখানে রাতের খাওয়াদাওয়া করে রাত্রি একটু নির্জন হলে প্রহ্লাদ মিত্রকে হরিমতী পাঠশালা দেখাতে নিয়ে যাবে। ধাবায় পৌঁছতেই মাইকেল বলল, “চলুন স্যর, চটপট লাইট একটু ওয়ার্কিং ডিনারটা করে নিই। হাতে সময় বড্ড কম।”

যদিও মোটেই লাইট নয়, একেবারে চর্ব্যচোষ্য খাওয়ার অর্ডার দিল মাইকেল। তার পর রুটি-মাংস খেতে-খেতে হঠাৎ চুকচুক করে আওয়াজ করে উঠল।

“কী হল? গলায় লাগল নাকি?” প্রহ্লাদ মিত্র জিজ্ঞেস করলেন।

“না, স্যর। বুকে লাগছে। বড্ড আফসোস হচ্ছে।”

“কিসের আফসোস?” প্রহ্লাদ মিত্র জানতে চাইলেন।

“ওই স্যর আমি রোহনকে বলেছিলাম। যদি আপনারা প্রথম থেকে আমাকে এই প্রজেক্টে রাখতেন, এক সে বড় কর এক ভূতের বাড়ি আপনাদের দেখিয়ে দিতাম। এক-একটা বাড়ি শুধু দেখতেন স্যর। এ বলে আমাকে দ্যাখ তো ও বলে আমাকে দ্যাখ। ‘ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ’ একটা অন্য লেভেলের সিরিজ় হত। তবে গ্র্যান্ড ফিনালের জন্য যে বাড়িটা ঠিক করেছি, একেবারে সুপার ডুপার লেভেলের। তা হলে স্যর, দেখছেন তো আমার ওপর ভরসা করে ভুল করেননি।”

প্রহ্লাদ মিত্র বললেন, “আগে নিজে একবার দেখি জায়গাটা।”

“সে তো স্যর আজকে রাত্রেই দেখে নেবেন।”

“কোনও গন্ডগোলের ব্যাপারস্যাপার নেই তো?”

“একদমই নয়। দেখুন স্যর, কোথাও কোনও পারমিশন নেওয়ার দরকার নেই। বাড়িটার এখন কোনও মালিকই নেই। ভাড়া লাগছে না। আপনাদের খরচ সব দিক থেকে কমিয়ে দিলাম। আমার পেমেন্টটা একটু দেখবেন স্যর। অ্যাডভান্সটা যদি দিয়ে দেন। আমার কিন্তু খরচ খরচা সমানে হয়ে যাচ্ছে।”

“আগে ফাইনালটা হয়ে যাক। চিন্তা করছেন কেন? গ্র্যান্ড ফিনালেটা ভালভাবে উতরে গেলেই আমরা সিজ়ন টু-র প্রস্তুতি শুরু করে দেব। তখন ওই বাড়িগুলো জোগাড় করে দেবেন। আচ্ছা, বাড়িটায় রাতে আপনার সত্যি গা ছমছম করেছে?”

মাইকেল একটু ঝুঁকে বলল, “কী বলছেন স্যর? আপনাকে কী বলেছি? এই দেখুন বলতে গিয়েই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। গোবর্ধনপুর আমার দেশের বাড়ি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার জানেন। গ্রামে প্রচলিত ছিল ওই বাড়ি নিয়ে যেন কোনও আলোচনা না হয়। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন। সবাই বলবে জানি না।”

“কেন? কিন্তু ব্রজহরিবাবু তো সেরকম কিছু ভিডিয়োয় বলেননি।”

“বলবেন না তো। আরে যত বড়ই ইতিহাসবিদ হন, থাকেন তো গোবর্ধনপুরে। প্রচলিত বিশ্বাস ওইসব নিয়ে আলোচনা করলেই আত্মার নজর পড়বে সেই বাড়ির দিকে।”

প্রহ্লাদ মিত্রর হাতের রুটি মুখের কাছে থেমে চিন্তিত গলায় বললেন, “এত ভৌতিক বাড়ি নিয়ে কাজ করলাম, এরকম তো কোথাও শুনিনি।”

“কারেক্ট স্যর। আপনি এত ভৌতিক বাড়ি নিয়ে কাজ করেছেন। আপনার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেখুন, আত্মা অনেক রকমের হয়। খারাপ অতৃপ্ত আত্মা হলে ওদের চোখে দেখাও যেতে পারে না-ও যেতে পারে। দেখা গেলে কখন দেখা যাবে কেউ জানে না। হয়তো আপনার পিছন-পিছন চলেছে, আপনি বুঝতেও পারলেন না আবার হয়তো দেখতেও পেলেন। এই আছে এই নেই। ঘরের মধ্যে সরসর করে হয়তো দেওয়াল দিয়ে উঠে আপনার মাথার ওপর বাদুড়ের মতো ঝুলতে থাকল। আপনি বুঝতেও পারেন, না-ও বুঝতে পারেন। হরিমতী পাঠশালায় হয়তো প্রতিযোগীরা আত্মা খুঁজছে আর ও দিকে আত্মা হয়তো কন্ট্রোল ভ্যানে আপনার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি বুঝতেও পারেন, নাও বুঝতে পারেন। কিচ্ছু বলা যায় না। হাইলি আনপ্রেডিক্টেবল।”

মাইকেল এমনভাবে বলল যে, প্রহ্লাদ মিত্রর গলা শুকিয়ে গেল। ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বললেন, “আপনার সেরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে নাকি?”

মাইকেল আর-এক প্লেট মাংসের অর্ডার দিয়ে বলল, “আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি শুধু আপনার জন্য রাতে বাড়িটায়

ঘুরে আসার পর আমার গা-টা কীরকম অল্প-অল্প জ্বরে ম্যাজম্যাজ করছিল। কোনও ওষুধেই ম্যাজম্যাজানি কমছিল না। শেষকালে পরশু শিবেন ঠাকুর আমাকে একটু ঝাড়ফুঁক করে একটা তাবিচ দিল। আপনি হয়তো ভাবছেন এই বিজ্ঞানের যুগে এ সব ঝাড়ফুঁকে কে বিশ্বাস করে? আমিও করি না। কিন্তু নিজেই দেখলাম। আমি স্যর আপনাকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি। শুটিংয়ের সময় আপনিও একটা শিবেন ঠাকুরের দেওয়া তাবিচ পরে নেবেন আর এই কথাটা কাউকে বলবেন না।"

"কেন?"

"সবাই তাবিচ পরে নিলে প্রতিযোগীরাও চাইবে। তা হলে আত্মাটা আসবে কী করে?"

"আপনি তা হলে বলছেন আত্মা আসবেই?"

"হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যর। কিন্তু তাকে দেখা যাবে কি যাবে না কেউ গ্যারান্টি দিতে পারবে না।"

"অবিশ্বাস্য লাগছে। কোনও গন্ডগোল নেই তো?"

মাইকেল একটা দম নিয়ে বলল, "স্যর আমি মাইকেল বিশ্বাস, বিশ্বাস বংশের ছেলে। আমার পদবি বিশ্বাস। আমরা যা বিশ্বাস করি তা বিশ্বাস করি। যা বিশ্বাস করি না, তা বিশ্বাস করি না। বুঝলেন তো? কিন্তু ওই যে ঝাড়ফুঁক করে আমি একদম ফিট ঝরঝরে হয়ে গেলাম, এর পর বলুন বিশ্বাস না করে থাকা যায়?"

এতবার 'বিশ্বাস' 'বিশ্বাস' শুনতে-শুনতে হাতে রুটি মাংস রয়েই গিয়েছিল প্রহ্লাদ মিত্রর। একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আপনাকে বিশ্বাস করি।"

"তা হলে আপনাকে আর একটা জব্বর প্ল্যান বলি। আপনি বলেছিলেন একটা যুক্তিবাদীর দল ফেসবুকে আমাদের পিছনে লাগছে। আমার হাতে দু'জন প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটর রয়েছে। খাসা দুটো ছেলে। ওদের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি দিয়ে ঢুকিয়ে দিন গ্র্যান্ড ফিনালে-তে। একেবারে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা হয়ে যাবে। পাল্টা যুক্তি দেব আমরা।"

"ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি ? শেষ মুহূর্তে কী ভাবে দেব আমরা? না এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। শোয়ের ফরম্যাট পাল্টাতে পারব না। রবিবার থেকে প্রোমো চালু হবে।"

॥ ১৬ ॥

গোবর্ধনপুর গ্রামে একটাই ক্লাব আছে। যুবশক্তি সঙ্ঘ। যুবশক্তি সঙ্ঘের দু'জন সভাপতি। এক জন বয়স্ক, তিনি গ্রামপ্রধানও, তিমির মল্লিক। তিমিরবাবু সারা বছর পুজোপার্বণ নিয়ে থাকেন। আর তাঁর ধ্যানজ্ঞান যাত্রাপালা। যে কোনও পুজোপার্বণে যাত্রা হবেই।

যুবশক্তি সঙ্ঘের আর-এক জন সভাপতি তরুণ, তাতান ভৌমিক। খেলাধুলো নিয়ে থাকে। নিজের একটা সমবয়সি দল আছে। তিমিরবাবু সম্পর্কে তাতানের পিসেমশাই হন। ক্লাব পরিচালনা নিয়ে দু'জনের প্রায়ই ঠোকাঠুকি হয়। আজ দুপুরে তাতান ক্লাবে নিজের দলের জরুরি একটা মিটিং ডেকেছে। আলোচ্য বিষয়, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। বিষয় গুরুতর।

হাবুলের ক্লাবে আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, ঢুকে দেখল তাতানদা গম্ভীর ভাবে পায়চারি করছে। সবাই চুপ করে আছে। দেখেই বুঝল কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে তাতানদা একেবারে তেতে আছে। সবে ফিসফিস করে নান্টুকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, ব্যাপারখানা কী, এমন সময় তাতানের চোখে পড়ে গেল। তাতানদা পায়চারি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে হাবুল, এক মাত্র তোকেই জিজ্ঞেস করা বাকি ছিল। তুই কখনও হরিমতী পাঠশালায় ভূত দেখেছিস? সামনের মাঠটায় তো আমরা অনেক ফুটবল খেলেছি। কতবার উঁচু কিক হরিমতী পাঠশালায় পড়েছে। তুই বল কুড়িয়ে এনেছিস। কোনওদিন ভূত দেখেছিস?"

হাবুল কিছুই বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "ভূত! কই না তো।"

তাতান হাতের তালুতে ঘুষি মেরে বলে উঠল, "তার মানে এগারো জনের মধ্যে এক জনও দেখেনি। এবার একটা নিষ্পত্তি করতে হবে। গোবর্ধনপুরের বদনাম আর পিসেমশাই সেটা সমর্থন করছেন।"

হাবুল এবার না-বলে থাকতে পারল না, "একটু খুলে বলবে তাতানদা?"

তাতান রেগে উঠল, "একে দেরি করে আসিস তার উপর গ্রামের কোনও খবর রাখিস না। গত দু'-তিন দিনে হুটপাট কী সব হয়ে যাচ্ছে। এবার সর্বনাশ হবে।"

হাবুল ভয়ে-ভয়ে জানতে চাইল, "কী হুটপাট? কী সর্বনাশ?"

"উফ। আদুরিঠাকুরমার কাছে তাঁর দুই নাতি এসেছে কলকাতা থেকে। তা আসুক, ভাল কথা। আসতেই পারে। তা, তারা আসতে গিয়ে নামল কোথায়? এক মাইল দূরে হরিমতী পাঠশালা যাওয়ার রাস্তার মুখে সন্ধেবেলায়। তা ভুল জায়গায় যদি নেমেছিস সন্ধেবেলায়, বড় রাস্তা ধরে বাড়ি চলে আয়। তা নয়, তারা মাঠ ভেঙে গেল হরিমতী পাঠশালায়। কেন? জিজ্ঞেস করলে বলছে ওরা নাকি প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটর। বড় রাস্তায় ভুল করে নেমেই বুঝেছে কাছাকাছি ভূত আছে। তা আছে, আছে। গিয়ে কোন ভূতকে দেখল জানিস?"

"কাকে?"

"মহা গুলবাজ শিবেন ঠাকুরকে।"

"তার পর?"

"শিবেন ঠাকুর পিসেমশাইয়ের মাথা খেয়েছে। বলছে আপনাদের বলিনি কারণ আপনারা আমাকে চিরকাল গুলবাজ বলেন। এইবার দেখুন দু'-দু'জন সাক্ষী। ওদিকে ব্রজজেঠু যথারীতি ইতিহাস বলতে শুরু করেছে। একবার এমনি আন্দোলনকারী তো আর-একবার স্বাধীনতা সংগ্রামী। দ্বিতীয়টা আবার পিসেমশাইয়ের মনে ধরে গেছে। আর শুধু ওই কলকাতার ছেলেদুটোই নয়। শিবেন ঠাকুর দিনুকাকাকে পর্যন্ত ভূত দেখিয়ে এনেছে। বুঝতেই পারছিস দিনুকাকার মতো সৎ সত্যবাদী লোক যখন বলছে, এবার সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আজ চণ্ডীমণ্ডপে পিসেমশাই সভা করেছে আর একটা সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

"কী সিদ্ধান্ত?"

"হরিমতী পাঠশালার সামনে, মানে আমাদের খেলার মাঠে রক্ষা কালীমন্দিরের ব্রাঞ্চ হবে। আর হবে যাত্রাপালার পাকা মঞ্চ। শিবেন ঠাকুর বলেছে সামনের সোমবার কী সব কিসকিসা নিশা আছে, মন্দিরের খুঁটি আর যাত্রামঞ্চের ভিতপুজো এক সঙ্গে হবে। পিসেমশাইয়ের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে আর তার সামনে হবে যাত্রামঞ্চ। এখন এই জোড়া সুযোগ পেয়ে 'জয় মা', 'জয় মা' বলে লাফাচ্ছে। ওখানে মন্দির আর যাত্রামঞ্চ হওয়া মানে বুঝছিস? আমাদের খেলার মাঠটা যাবে।"

তাতান উত্তেজনায় আবার খানিকটা পায়চারি করে নিয়ে বলল, "কিছু একটা সাংঘাতিক চক্রান্ত আছে। ফটিক হরিমতী পাঠশালায় দুটো ছাগল রাখে। ফটিক বলছে কাল রাতে গাড়ি করে দু'জনে এসেছিল। আজ দুপুরেও বেশ কয়েক জন লোক এসেছিল। তারা গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখেছে। কারা আসছে? কেন আসছে?"

"এখন উপায়?"

"উপায় একটা কিছু খুঁজে বের করতেই হবে।"

"কিছু ভেবেছ?"

"ফেসবুকে একটা যুক্তিবাদী গ্রুপ আছে, 'ভূতের যম'। আমি তার মেম্বার। ওরা অনেক সিরিয়াস কাজ করে। ওখানে দিয়েছি একটা পোস্ট। সবাই কমেন্টে ফটো দিতে অনুরোধ করেছে। আজ দুপুরে ফটিককে নিয়ে গিয়েছিলাম ফটো তুলতে। ভূতের ভূ নেই। শুধু মানুষ কেন, ফটিকের ছাগলরা পর্যন্ত ভূত দেখেনি।"

"কী করে বুঝলে?"

"দুর পাঁঠা। ছাগল ভূত দেখলে ওর ম্যাঁ ম্যাঁ ডাকটাই বদলে

যেত। এখন খেলার মাঠটা বাঁচাতেই হবে। সবাইকে বলে রাখলাম, গতিপ্রকৃতির উপর কড়া নজর রাখ।”

॥ ১৭ ॥

শেষ পর্যন্ত উপায়ন্তর না-পেয়ে ‘ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ’-এর গ্র্যান্ড ফিনালেটা হরিমতী পাঠশালাতেই হবে ঠিক হয়ে গেল। মাইকেল যেদিন রাত্রিবেলায় প্রহ্লাদ মিত্রকে হরিমতী পাঠশালা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিনও গজুকে আগের থেকে পাঠিয়ে রেখেছিল। ঠিক যেভাবে গজু দীননাথকে জমিদারবাড়ির দোতলা থেকে ভেলকি দেখিয়েছিল, সেই একই ভেলকি প্রহ্লাদ মিত্রকেও দেখিয়েছিল। একতলায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে ফটিকের ছাগল দুটোর জ্বলজ্বলে চোখ আর দোতলায় গুজুর এক দর্শনেই প্রহ্লাদ মিত্র কুপোকাত হয়ে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে ভেতরে ঢুকে দোতলায় গিয়ে সরেজমিনে সব কিছু দেখতে চাননি। বাইরে থেকেই রেশমি সেনকে ফোন করে পুরো ফাইনাল করে নিয়েছিলেন। ঠিক করেছেন, বাকি যা দেখার প্রোডাকশনের ছেলেরা দেখে নেবে।

আজ রাত্রে গ্র্যান্ড ফিনালের শুটিং হবে। শুটিংয়ে যাতে বেশি লোকজনের ভিড় না হয়, তাই যথাসম্ভব গোপনীয়তা রাখা সত্ত্বেও তাতানের দলবল ব্যাপারটার আঁচ পেয়েছে। দূর থেকে বাইনোকুলার দিয়ে দেখেছে দুপুরবেলায় প্রোডাকশনের কয়েক জন এসে ঘরে-ঘরে ক্যামেরা লাগিয়েছে। শুটিংয়ে ব্রজহরিবাবুকে লাগবে নিজের মুখে ইতিহাস বলার জন্য। মাইকেল শিবেন ঠাকুরকে দিয়েই ব্যবস্থা করে রেখেছে, যথাসময়ে যাতে ব্রজহরিবাবু চলে আসেন। ব্রজহরিবাবু হুঁকো খেতে-খেতে তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্য দিকে কলকাতা থেকে দেবদত্তা, বাপ্পাদিত্য আর সঞ্জনাকে নিয়ে রওনা হয়েছে গোবর্ধনপুরের দিকে। আর-একটা গাড়িতে আছে মাইকেল আর প্রহ্লাদ মিত্র। রোহন প্রোডাকশনের অন্যদের নিয়ে কন্ট্রোল ভ্যান নিয়ে আগেই পৌঁছে গিয়েছে। আজকে যে গ্রান্ড ফিনালের শুটিং আছে, সেটা লাল্টু-বিল্টুকে কিচ্ছু জানায়নি মাইকেল। বলেছে পরশু শুটিং।

বিপত্তি বাঁধল সন্ধের মুখে। শিবেন ঠাকুর যখন দীননাথের দোকানের সামনে দিয়ে ব্রজহরিবাবুকে নিয়ে বড় রাস্তায় চুপিচুপি যাচ্ছিল এমন সময় লালি ভৌ ভৌ করে ডেকে উঠল আর দীননাথের চোখে পড়ে গেল। দীননাথ দোকান থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে বসলো, “এই ভর সন্ধেতে কোথায় যাও ঠাকুর দু’জনে মিলে?”

শিবেন ঠাকুর অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল, “তোকে যা দেখিয়েছি, তাই ব্রজজেঠুকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।”

ব্রজহরিবাবু শেখানো কথা নিজের মতো করে বললেন, “ইতিহাসটা নিজের চোখে মিলিয়ে দেখতে হবে তো দিনু। অন্যর কথায় কান দিলে চলে? হয়তো সেই অতৃপ্ত আত্মা এই জন্যই অতৃপ্ত যে ইতিহাসটা জানার চেষ্টা করছে।”

“চলো, তা হলে আমিও আর-একবার দেখে আসি।”

শিবেন ঠাকুর প্রমাদ গুনল। মাইকেল বার বার বারণ করে দিয়েছে ব্রজজেঠু ছাড়া আর কেউ যেন না আসে। দীননাথকে বোঝানোর চেষ্টা করল, “তুই তো একবার দেখেছিস। বার বার কী দেখবি? বার বার দেখলে আত্মা রুষ্ট হয়।”

“সে হোক। চলো, দেখি আমিও একবার ভাল করে দেখে আসি সেদিন যা দেখলাম সেটা ঠিক না মনের ভুল। এই নিয়ে তিমিরবাবু বলছেন ঠিক আর তাতান বলছে ভুল। সেই থেকে মনটা বড় খচখচ করছে।”

শিবেন ঠাকুর ছটফট করে বলে উঠল, “আহ, ও সব ছেলেছোকরারা কী বোঝে? তিমিরবাবুর কত দিনের অভিজ্ঞতা বল তো? যা দেখেছিস ঠিক দেখেছিস। যা দেখিসনি ভুল দেখেছিস। তুই দোকানেই বসে-বসে রেডিয়ো শোন। তোর গিয়ে কাজ নেই।”

কিন্তু দীননাথকে ঠেকানো গেল না। জেদ ধরে বসল, “না, চলো সেদিন দু’জনে মিলে দেখেছি। আজ তিন জনে মিলে দেখে আসি।”

শিবেন ঠাকুর দেখল সময় বয়ে যাচ্ছে। অগত্যা দীননাথকে নিয়ে বড় রাস্তা ধরতে হল। পিছু নিল লালি। এই সময় দীননাথের দোকানের এক অন্ধকার কোণে বসে হাঁসের ডিমসেদ্ধ খাচ্ছিল বিল্টু আর লাল্টু আর কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছিল। ওরা একটু এগিয়ে যেতেই বিল্টু দাঁড়িয়ে লাল্টুকে বলল, “কী ব্যাপার বল তো? এরা সব কেঁচে দেবে নাকি? কাকা বলেছে পরশু গ্র্যান্ড ফিনালের শুটিং। আজ কাল যেন সব চুপচাপ থাকে।”

লাল্টু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, “চল গিয়ে দেখি।”

একটু দূরত্ব রেখে শিবেন ঠাকুরদের পিছু নিল বিল্টু আর লাল্টু। ওদিকে সন্ধে গড়িয়ে রাত্রি নেমে যাওয়ার পর লাল্টু-বিল্টুদের বাড়ি ফিরতে না দেখে আদুরিঠাকুরমা কিছু ক্ষণ ছটফট করে বাড়ির বাইরে এসে ওদের খোঁজ করতে লাগলেন। এক জন কৃষক বাড়ি ফিরছিল। সে জানাল, “তোমাদের নাতিকে তো দেখলাম বড় রাস্তা ধরে উত্তর দিকে যাচ্ছে। ওদিকে শিবেন ঠাকুর, ব্রজজেঠু আর দিনুদাকেও যেন যেতে দেখলাম।”

আদুরিঠাকুরমা খানিক ক্ষণ চিন্তা করলেন। বড় রাস্তা ধরে উত্তর দিক মানে হরিমতী পাঠশালা। এখন তো গ্রামে ওই নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। মন্দিরের খুঁটিপুজো না-হওয়ার আগেই কী অলক্ষুনে জায়গাটাতে শিবেন নাতিদুটোকে নিয়ে যাচ্ছে? এবার যদি নাতিদুটোকে ভূতে ভর করে, কী হবে? গভীর চিন্তিত হয়ে আদুরিঠাকুরমাও হাঁটা লাগালেন হরিমতী পাঠশালার দিকে। অতএব একটু পরেই চাঁদনি আলোয় কালো ফিতের মতো বড় রাস্তায় দেখা গেল শিবেন ঠাকুরদের, একটু পিছনে বিল্টুদের আর সকলের পিছনে আদুরিঠাকুরমাকে। একবার বিল্টু পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেয়ে গেল আদুরিঠাকুরমাকে। সঙ্গে-সঙ্গে লাল্টুর জামাটা খপ করে ধরে সাবধান করে দিয়ে বলল, “দ্যাখ, পিছনে কে আসছে?”

“আদুরিদিদিমা। সর্বনাশ! লুকিয়ে পড়। লুকিয়ে পড়।”

বড় রাস্তার ধারে একটা গাছের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল দু’জনে। ভাগ্য ভাল আদুরিঠাকুরমার চোখের জ্যোতি কম। উনি ওদের দেখতে না-পেয়ে পাশ দিয়ে এগিয়ে হনহন করে হাঁটতেই থাকলেন। বিল্টুরা এবার সবার পিছনে হয়ে হাঁটতে থাকল। কিছু ক্ষণের মধ্যে সবাই পৌঁছে গেল বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর কাছে। বিল্টুরা অবশ্য পুরোটা গেল না। কাছাকাছি গিয়ে আর একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে থাকল। ওখান থেকেই দেখতে পেল, শিবেন ঠাকুরদের দেখতে পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল কয়েক জন। তার মধ্যে মাইকেলকে চিনে নিতে অসুবিধে হল না।

“বুঝতে পারছিস মামা আবার আমাদের ফাঁকি দেওয়ার প্ল্যান করেছে?” লাল্টু উত্তেজিত হয়ে উঠল।

“এবার আমরা কিছুতেই হতে দেব না। দরকার হলে বদলা নেব। সব ভন্ডুল করে দেব।”

‘শশ্‌শ্‌’ ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বিল্টুকে চুপ করতে বলে লাল্টু বলল, “শুনতে দে।”

“কী হচ্ছে রে এখানে?” পিছন থেকে আদুরিপিসির গলা পেয়ে শিবেন ঠাকুর চমকে উঠে পিছন ফিরে বলল, “আপনি এখানে?”

“আমার নাতি দুটো নাকি এ দিকে এসেছে?”

“না-না পিসি। এখানে কেউ আসেনি।”

দীননাথ বলল, “তোমার নাতিরা তো আমার দোকানে বসে হাঁসের ডিম খাচ্ছিল।”

শুনে আদুরিঠাকুরমা ভয়ানক রেগে উঠলেন, “ঝাঁটা মারব তোকে। ভর সন্ধেবেলায় আমার নাতিদুটোকে হাঁসের ডিম খাইয়েছিস? গায়ে এবার আঁশটে গন্ধ ছাড়লে ভূতে ধরবে না? বাড়িতে নিয়ে গিয়েই চান করাতে হবে দুটোকে।”

আদুরিঠাকুরমার চিৎকার-চেঁচামেচিতে লালি ঘেউঘেউ করে ডেকে

উঠল। আর মাইকেল প্রহ্লাদ মিত্রকে নিয়ে এগিয়ে এল। তার পর ভীষণ অবাক হল দীননাথ আর আদুরিপিসিকে দেখে।

"পিসি তুমি?"

চোখ কুঁচকে আদুরি মাইকেলকে চিনতে পেরে বললেন, "বাঁকু তুই? তুই আবার কী জন্য এসেছিস?"

ব্রজহরিবাবু আদুরিঠাকুরমার কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "তুমি ওর ডাক নাম নিয়ো না। ওর ছদ্মনাম মাইকেল। সিবিআই আর সিআইডির খুব বড় অফিসার। মস্ত কাজে ইতিহাস খুঁজতে এসেছে। দেখছ না আমি না-চেনার ভান করছি।"

"রাখ তোর নাম। অত বুঝি না বাপু, এই বাঁকু নাতিদুটো কোথা গেল?"

মাইকেলের চোখ কপালে উঠল, "ওরাও এসেছে নাকি? শিবেনদা এ রকম তো কথা ছিল না।"

প্রহ্লাদ মিত্র কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। শিবেন ঠাকুর উত্তর দেওয়ার আগে মাইকেলকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও গন্ডগোল নাকি মাইকেলবাবু?"

মাইকেল তাড়াতাড়ি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল, "না-না, কোনও গন্ডগোল নয়। আসলে আমি এসেছি শুনে সবাই একটু দেখা করতে আসছে। চিন্তা করবেন না, আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি।"

প্রহ্লাদ মিত্র মাথা ঝাঁকাতে থাকলেন, "কী আর ম্যানেজ করবেন! শুটিংয়ের ভিড় তো জানেন। সব এবার ভেস্তে না যায়। তীরে এসে তরী ডুবতে চলেছে।"

মাইকেল ব্যস্ত হয়ে উঠল, "দিনুদা, দেখা হয়ে গেছে। পিসিকে নিয়ে বাড়ি যাও।"

দীননাথকে অনেক বুঝিয়ে আদুরিপিসিকে বাড়িতে ফেরত পাঠাল মাইকেল।

॥ ১৮ ॥

রাত আরও কিছুটা গড়াল। স্পাইন চিলিং প্রোডাকশনের সবাই যখন ব্যস্ত প্রস্তুতি শেষের, রাস্তার দু'দিক থেকে দুটো বাহন এগিয়ে এল। একটা বড় এসইউভি অন্যটা বাইক। বাইক থেকে নামলেন তিমিরবাবু। কোমরে হাত দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, "এখানে হচ্ছেটা কী?"

এসইউভি থেকে নেমে এগিয়ে এলেন আর্যশেখর চৌধুরী। তাঁরও একই প্রশ্ন।

প্রহ্লাদ মিত্র জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা কারা?"

"আমি হচ্ছি তিমির মল্লিক। গোবর্ধনপুরের গ্রামপ্রধান। খবর পেলাম বাইরে থেকে সব লোকজন এসে গ্রামের বাইরে ভিড় করছে।"

আর্যশেখর চৌধুরীও নিজের নাম পরিচয় দিলেন।

প্রহ্লাদ মিত্র বললেন, "আপনি স্যর বাপ্পাদিত্যর দাদু। আপনি তো এখানে থাকতে পারবেন না।"

"কেন?"

"নিয়ম হচ্ছে, প্রতিযোগীদের বাড়ির লোক প্রতিযোগিতার জায়গায় কেউ থাকতে পারবেন না।"

ভয়ঙ্কর রেগে উঠলেন আর্যশেখর চৌধুরী, "আমাকে আইনকানুন, নিয়ম শেখাচ্ছ? প্রথমত, বাপ্পা বলেনি ও এখানে গ্র্যান্ড ফিনালে খেলতে এসেছে। আমি নিজের সূত্র মারফত খবর পেয়েছি। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের সংবিধানে আছে যে, কোনও ভারতীয় ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় স্বাধীন ইচ্ছেতে যেতে পারে। এটা মৌলিক অধিকার। কোনো আপত্তি থাকলে হাইকোর্টে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেব।"

প্রহ্লাদ মিত্র ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "ঠিক আছে স্যর। আপনি থাকুন। চা-বিস্কুট খান।"

"না। আমি আপনাদের কন্ট্রোল ভ্যানের মধ্যে থাকব। দেখতে চাই বাপ্পাদিত্যর সঙ্গে কোনও অন্যায় হচ্ছে কি না।"

তিমির মল্লিক তখনও কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি। আমি গ্রামপ্রধান। গ্রামে কী হচ্ছে, না হচ্ছে তা জানার সাংবিধানিক অধিকার আমার আছে।"

প্রহ্লাদ মিত্র উত্তর দেওয়ার আগে ব্রজহরিবাবু বললেন, "এঁরা আমার মুখ থেকে ইতিহাস শুনে রেকর্ড করতে এসেছেন।"

"কিসের ইতিহাস?"

"যেটা তোমাকে বলেছি। হরিমতী পাঠশালার।"

তিমিরবাবু এক জনের হাতে ক্যামেরা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কি খবরের কাগজের না টিভি কোম্পানির?"

"টিভি। তবে অন্যরকমের। আপনার আপত্তি আছে?" প্রহ্লাদ মিত্র কড়া হওয়ার চেষ্টা করলেন।

"আলবত আছে। ব্রজজেঠু যাই ইতিহাস বলুন তার কোনও মান্যতা থাকবে না আমি সমর্থন না করলে। আমি গ্রামপ্রধান।"

ব্রজহরিবাবু আর তিমিরবাবুর মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। প্রহ্লাদ মিত্র মাথায় হাত দিয়ে একটু পায়চারি করে রেশমি সেনকে ফোন করলেন, "ম্যাম সব ঠিক ছিল। হঠাৎ করে গ্রামের থেকে একের পর-এক লোক এসে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করেছে।"

"সে কী! আপনাদের বাধা দিচ্ছে?"

"না, নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করছে। আর এদিকে বাপ্পাদিত্যর দাদু রিটায়ারড ব্যারিস্টার আর্যশেখর চৌধুরী এসে নানান আইনের ভয় দেখাচ্ছেন।"

"আমি ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। এ দিকে আমিও পড়েছি মহা প্রেসারে। চ্যানেল খবর পেয়েছে আমাদের গ্র্যান্ড ফিনালের শুটিং নিয়ে কিছু একটা গন্ডগোল চলছে। যা হোক করে আপনি তাড়াতাড়ি শুটিং শুরু করে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিন।"

প্রহ্লাদ মিত্র ঘড়ি দেখে বললেন, "এখন তো সবে ন'টা বাজে ম্যাম। আমাদের তো বারোটার থেকে শুরু করার কথা।"

"না-না, বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। এখনই করে নিন। না হলে আমাদের বারোটা বেজে যাবে। দেবদত্তাকে বলুন।"

প্রহ্লাদ মিত্র তাড়াতাড়ি দেবদত্তা আর রোহনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাপ্পাদিত্য আর সঞ্জনা কোথায়?"

"ওরা গাড়িতে অপেক্ষা করছে।"

"ওদের এক্ষুনি রেডি করিয়ে দাও আর তুমিও রেডি হয়ে নাও। রোহন, তুমি ব্রজহরিবাবুর টেকটা নেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

মেকআপ আর্টিস্ট এগিয়ে এসে ব্রজহরিবাবুকে বলল, "আসুন, আপনাকে একটু হালকা মেকআপ করিয়ে দিই।"

তাই শুনে তিমিরবাবু আবার গর্জে উঠলেন, "মেকআপ মানে? দাড়িগোঁফ নাকি? তা হলে আমার মেকআপটা আগে করে দাও। তেত্রিশ বছর ধরে যাত্রায় সব রকম রোল করার অভিজ্ঞতা আছে আমার। কত রকম মেকআপ করেছি। দেখি তোমরা কেমন করো?"

"না, আপনি যেরকম ভাবছেন সেরকম নয়। হালকা একটু গালে, কপালে পাউডার বুলিয়ে দেব।"

"না-না, আগে আমারটা করো। ব্রজজেঠুর সঙ্গে আমিও বলব। গ্রামপ্রধান হিসেবে হরিমতী পাঠশালার উন্নয়নের জন্য আমি কী ভেবেছি।"

প্রহ্লাদ মিত্র নিচু গলায় মেকআপ আর্টিস্টকে বললেন, "যা বলছেন করে দাও। হাতে সময় বড্ড কম। বাকিটা পোস্ট প্রোডাকশনে বুঝে নেব।"

মাইকেল বুঝল, শুটিংটা এখনই শুরু হবে। আর এখন হলেই বিপদ। গজুকে বলেছে রাত্রি সাড়ে এগারোটায় জমিদার বাড়িতে পৌঁছতে। এখন কী ভাবে গজুকে আগে আনা যায়। মাইকেল সকলের চোখের আড়ালে রাস্তা দিয়ে হেঁটে-হেঁটে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে গজুকে ফোন করল, "শোন তোকে একটু আগে আসতে হবে।"

গজু বলল, "কাঁচকলা যাব। আগের দু'দিন যাওয়ার পেমেন্ট

পাইনি। আগে দাও।"

"কত ক্ষণ ধরে অনলাইনে পাঠানোর চেষ্টা করছি কিন্তু এখানে একটুও নেটওয়ার্ক নেই..."

মাইকেলের কথা শেষ হল না। অন্ধকার ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল বিল্টু আর লাল্টু।

"কী ব্যাপার মামা? সব শুনেছি। তুমি আমাদের বাদ দিয়েই গ্র্যান্ড ফিনালে শুটিং করাচ্ছ?"

"আরে বোকা এটা রিহার্সাল।"

"আবার তুমি আমাদের বাজে কথা বলছ? ভুল বোঝাচ্ছ? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করি।"

মাইকেল দু'জনের কলার খামচে ধরে বলল, "একদম যাস না। তোদের ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি তা হলে আর হবে না। তোরা হচ্ছিস গ্র্যান্ড ফিনালের চমক। জিতলেই পাঁচ লাখ। এখন তোদের যদি দেখে ফেলে প্রতিযোগীরা, তা হলে কি আর ভয় পাবে? তোরা এখানেই অপেক্ষা কর। তোদের যেন কেউ দেখতে না পায়। আমি ঠিক সময় টুক করে তোদের পাঠিয়ে দেব।"

ওদের বুঝিয়ে মাইকেল আবার সবার কাছে ফিরে গেল। তত ক্ষণে ব্রজহরিবাবুর শুটিংটা শুরু হয়েছে। তিমিরবাবু অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন আর ব্রজহরিবাবু বলতে শুরু করেছেন, "হরিমতী পাঠশালার ইতিহাস শুরু পলাশির যুদ্ধের সময় থেকে যখন সিরাজ রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তখন এই হরিমতী পাঠশালা যে জমিদারবাড়িতে সেই জমিদারবাড়িটাই তৈরি হয়নি। তার দুশো বছর পরে এই জমিদারবাড়ি তৈরি হবে। অশ্বিনী ভট্টচাজ মাস্টার হবে। কিন্তু ইতিহাস ইতিহাসের মতো জন্ম নেয়। এই ইতিহাস ২০০ বছর আগে তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছিল।"

"কাট... কাট... এ সব কী হচ্ছে?" প্রহ্লাদ মিত্র মাথার চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে থাকলেন।

"কী বলব প্রহ্লাদদা," অসীমবাবু হতাশ হয়ে বললেন, "আমি তো ইতিহাসটা ওঁকে ঠিকঠাক করে মুখস্থ করিয়ে দিলাম। কিন্তু উনি শুনছেনই না।"

ব্রজহরিবাবু গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করতে থাকলেন, "আপনি প্রকৃত ইতিহাসের কতটুকু জানেন? আমি আপনার ইতিহাস বলে দিতে পারি, যে-ইতিহাস আপনার বাড়ির পর্যন্ত কেউ জানে না। আমার হুঁকোটা দিন তো।"

দেবদত্তা বলল, "না হুঁকো দেওয়া যাবে না। যে-কোনও ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। চ্যানেল ওমেগার পলিসি আনুযায়ী কোনও ধূমপানের দৃশ্য রাখা যাবে না।"

প্রহ্লাদ মিত্র মাইকেলকে ধমকে উঠলেন, "কাদের সব ধরে এনেছেন?"

"আমি দেখে নিচ্ছি। আপনি প্রতিযোগীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।"

দেবদত্তা বলল, "ওরা রেডি আছে। তুই সব চেক করে নিয়ে রেকর্ডিং শুরু কর রোহন। অনীশ, তুই আমার টেকটা শুরু করে নে।"

বুম হাতে নিয়ে দেবদত্তা বলতে শুরু করল, "নমস্কার। আজকে সেই বহু প্রতীক্ষিত রাত। 'ওদের সঙ্গে কত ক্ষণ'-এর গ্র্যান্ড ফিনালে। আমরা রয়েছি বর্ধমানের গোবর্ধনপুর গ্রামের উপকণ্ঠে। আজকে আমাদের দুই প্রতিযোগী সঞ্জনা এবং বাপ্পাদিত্য এখনই রওনা হবে। ওদের যথা জায়গায় পৌঁছনোর ফাঁকে আমরা 'বিশ্বাস অবিশ্বাস' সেগমেন্টে আপনাদের শোনাব এখানকার ইতিহাস। বলবেন স্থানীয় বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ব্রজহরি মুখোপাধ্যায়। এখন ঘড়িতে বাজে আটটা কুড়ি। আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে আমাদের আগের প্রত্যেকটা এপিসোডে আমরা রাত্রি বারোটার সময় এই প্রতিযোগিতা শুরু করেছি, এবারে কেন আগে? কিন্তু এটা সুপার ডুপার গ্র্যান্ড ফিনালে বলেই আমাদের আরও আগে শুরু করতে হচ্ছে..."

॥ ১৯ ॥

বড় রাস্তা থেকে মাঠের মধ্যে দিয়ে হরিমতীর পাঠশালা যাওয়ার রাস্তাটা ধরল গুড়িয়া আর বাপ্পাদিত্য। পরিষ্কার আকাশে ঝিকমিক করছে তারা। জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পথ। এখনও টর্চ জ্বালানোর দরকার পড়েনি। দূরে দেখা যাচ্ছে জমিদারবাড়িটা।

গুড়িয়া আর বাপ্পাদিত্যর জামায় লাগানো আছে ক্যামেরা, ল্যাপেল মাইক্রোফোন আর ট্রান্সমিটার। কানে হেডফোন। সেই হেডফোনে কন্ট্রোল ভ্যান থেকে নানান নির্দেশ দিচ্ছেন প্রহ্লাদ মিত্র। ওরা যা দেখছে, যা বলছে সব রেকর্ড হচ্ছে। কন্ট্রোল ভ্যানের মনিটরে দেখা যাচ্ছে।

গুড়িয়া সামনে ছিল। বাপ্পাদিত্য একটু পিছনে। হঠাৎ বাপ্পাদিত্য হাঁটার একটু গতি বাড়িয়ে গুড়িয়ার পাশে এসে ক্যামেরার চোখ বাঁচিয়ে একটা ইশারা করল। এর মানে ট্রান্সমিটার থেকে মাইক্রোফোনের জ্যাকটা খুলে ফেলা। প্রতিযোগিতার শর্তে এটা একেবারে আইনবিরুদ্ধ। ধরতে পারলে সোজা ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবে। গ্র্যান্ড ফিনালে পর্যন্ত পৌঁছে এটা কিছুতেই করবে না গুড়িয়া। বাপ্পাদিত্য নিজের তারটাকে খুলে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে হেডফোনে প্রহ্লাদ মিত্রর গলা শুনতে পেল, "বাপ্পাদিত্যর অডিয়ো ড্রপ করে গেল। তুমি কিছু অনুভব করছ সঞ্জনা?"

"না।"

আবার হেডফোনে প্রহ্লাদ মিত্রর গলা ভেসে এল, "রোহন কুইক, বাপ্পাদিত্যর লাস্ট সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি ডেসিবেল চেক করো।"

বাপ্পাদিত্য তারটা খোলার অনুনয় করেই যাচ্ছে। বেআইনি কাজটা ও ইতিমধ্যে করে ফেলেছে। এমনিতেই গ্র্যান্ড ফিনালে জেতার সাংঘাতিক মানসিক চাপ, তার উপর বাপ্পাদিত্য। চাপটা আর সহ্য করতে না পেরে গুড়িয়া তারটা খুলে ফেলে বলল, "প্লিজ় বাপ্পাদিত্য। ফাইনালটা আমাকে সৎভাবে খেলতে দাও।"

অসহায় গলায় বাপ্পাদিত্য বলল, "বিশ্বাস করো, আমি তাই চাই। আমি চাই তুমি ফাইনালটা জিতে কাকুর চিকিৎসার টাকাটা পাও। হাতে সময় বড্ড কম। আমরা বেশিক্ষণ ট্রান্সমিটারের তার খুলে রাখতে পারব না। প্রোডাকশনের লোকেরা চলে আসবে। শোনো চট করে তোমাকে ব্যাপারটা বলে দিই। এখানে বিস্তর গন্ডগোল ম্যানিপুলেশন আছে। আগেই খবর পেয়েছিলাম লাভপুরের কাছে যেখানে এরা গ্র্যান্ড ফিনালের ব্যবস্থা করেছিল সেটা শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল হয়ে যাওয়ার পর তড়িঘড়ি এরা এই জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে। নিয়মমাফিক আগে থেকে আমাদের জায়গাটা সম্পর্কে কিছু জানায়নি। কিন্তু আমার ফেসবুক গ্রুপ, 'ভূতের যম'-এ এই জায়গাটা নিয়ে একটা পোস্ট পরশুই পড়েছি। আমি যখন গাড়িতে বসেছিলাম তখন তাতান বলে যে ছেলেটা পোস্টটা দিয়েছিল তাকে মেসেঞ্জারে সব জানিয়ে চুপিচুপি বাড়িটাতে এসে লুকিয়ে সব দেখতে আর রেকর্ড করতে বলেছি। এটাও নিয়মবিরুদ্ধ। কাজেই ওই ভিডিয়ো আমার পেজে পোস্ট করলেই আমি ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে যাব। তোমাকে এইটুকুই শুধু একান্তে বলা, কোনওভাবে তাতানের মুখোমুখি হলে ভয় পেয়ে বেরিয়ে এসো না।"

"তুমি কেন এসব করছ? আমাকে উইনার করার জন্য? তোমাকে আমি আগেও বলেছি বাবার জন্য আমি সৎ ভাবে খেলে উইনার হতে চাই। কারও অনুকম্পা আমি চাই না।"

"আমি জানি সঞ্জনা তুমি খুব সাহসী। কিন্তু আমি প্রমাণ করতে চাই, প্রত্যেকটা এপিসোডে আমাদের যে এক-একটা ভৌতিক বাড়িতে বিভিন্ন টাস্ক দিয়ে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করানো হয়েছে সেগুলো সব শোয়ের বাণিজ্যিক স্বার্থে। তুমি চিন্তা করে দ্যাখো, আমরা এতদিন যে ভৌতিক পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছি, অদ্ভুত-অদ্ভুত কিছু জিনিস দেখেছি। সেগুলো মনে হতেই পারে অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বাইরে নয়।

"তোমাকে একটা উদাহরণ দিই সঞ্জনা। তোমার কালিম্পং এপিসোডটা মনে আছে? আমাদের একটা ইউক্যালিপটাস জঙ্গলের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কী বলা হয়েছিল যে ওই

ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল পেরিয়ে একটা বাড়ি আছে সেখানে আমাদের একটা রুমাল ফেলে আসতে হবে। যত ভূত ওই ইউক্যালিপটাস জঙ্গলেই আছে। শোয়ের ফরম্যাট অনুযায়ী স্থানীয় একজন মানুষ আগে আমাদের ওই জঙ্গল সম্পর্কে কী বলেছিলেন? জঙ্গল ঘোরার সময় অশরীরী আত্মারা সমানে নানান রকম বিচিত্র আওয়াজ করে, ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার বাধা সৃষ্টি করে। আসল ব্যাপারটা হলো ইউক্যালিপটাস জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যদি হাওয়া বয়, তা হলে প্রাকৃতিক কারণেই নানান রকম আওয়াজের সৃষ্টি হয়। এবার যদি তুমি সেই আওয়াজগুলো শুনে অশরীরী আত্মার গলা মনে করো, তুমি ভয় পেয়ে ফিরে আসবেই। সাত জন প্রতিযোগী ছিলাম আমরা। কিন্তু তুমি কী করে জঙ্গল পেরিয়ে ওই বাড়িটার মধ্যে রুমাল ফেলে এসেছিলে?"

গুড়িয়া আনমনা হয়ে উঠল। সেই ভয়ঙ্কর জঙ্গলটা ফুটে উঠল চোখের পিছনে। অন্ধকার রাত্রি। হাওয়া বইছে। কত রকম আওয়াজ। বুকের ভিতরটা ধুকপুক করছে, তবু চোখ বন্ধ করে শুধু দেখতে পেয়েছিল খাটে বাবা শুয়ে আছে। বাবাকে ভাল করে তুলতেই হবে। ঠিক সেই বাবাকে চাই, যে বাবা ছোটবেলায় দিঘার সমুদ্রের মধ্যে বুকে জড়িয়ে ধরে বড়-বড় ঢেউয়ের মধ্যে ডুব দিত। ওই বড়-বড় ঢেউ দেখে কী যে ভয় করত, কিন্তু বাবার গলাটা আঁকড়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে সব ভয় কেটে যেত। সেরকমই জঙ্গলটা বেরোনোর সময় গুড়িয়া সব সময় মনে করত বাবার গলাটা আঁকড়ে ধরে আছে।

গুড়িয়া বলল, "আমি পারবই। যে যত রকম ভাবে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করুক আমি পারবই।"

"জানি তুমি পারবে। আমার শুধু নতুন একটা চিন্তা কোথা থেকে দাদু খবর পেয়ে চলে এসেছেন। দাদু আমার হেরে যাওয়াকে কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না। পুরো নিয়মাবলি মুখস্থ করে এসেছেন। আমাকে যে ক্লজেই ডিসকোয়ালিফাই করুক না কেন, দাদু ঠিক মামলা করে দেবেন। নাও, এবার ট্রান্সমিটারের জ্যাকটা আবার লাগিয়ে নাও।"

জমিদারবাড়িটার কাছাকাছি চলে এসেছে। গুড়িয়ার চোখটা ছলছল করে উঠল। জ্যাকটা লাগাতেই প্রহ্লাদ মিত্রর উত্তেজিত গলা হেডফোনে ফিরে এলো, "এই তো, দু'জনেরই অডিয়ো ফিরে এসেছে।"

দেবদত্তা বলতে শুরু করল, "তোমাদের দুটো টাস্ক। একটা এক তলায়, আর একটা দোতলায়। কিন্তু এক সঙ্গে যাতে থাকতে না পারো, প্রথমে সঞ্জনা এক তলার টাস্ক করবে আর বাপ্পাদিত্য দোতলার। তার পর সঞ্জনা দোতলায় চলে যাবে আর বাপ্পাদিত্য নীচে নেমে আসবে। যে টাস্কগুলো আগে করে বেরিয়ে আসতে পারবে, সে উইনার।"

"বেস্ট অফ লাক," বাপ্পাদিত্য গুড়িয়াকে বুড়ো আঙুল দেখাল।

"তোমাকেও বেস্ট অফ লাক।"

॥ ২০ ॥

দু'জনে নিস্তব্ধ জমিদার বাড়ির দালানে উঠে এল। দালানের এক দিকে সার দিয়ে অন্ধকার এক-একটা পাল্লাবিহীন ঘর। পেনসিল টর্চ জ্বালিয়ে বাপ্পাদিত্য দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে দোতলায় উঠতে থাকল। গুড়িয়াও টর্চের আলো বুলিয়ে খুঁজতে শুরু করল কোথায় প্রোডাকশন দেওয়ালে ১ লিখে রেখেছে। গুড়িয়ার প্রথম টাস্ক এক নম্বর ঘরে।

দেওয়ালে টর্চের আলো বোলাতে-বোলাতে একটা জায়গায় গুড়িয়া দেখতে পেল দেওয়ালে লাল রঙে লেখা আছে হরিমতী পাঠশালা। লাল রঙটা কিন্তু বেশ জ্বলজ্বলে। গুড়িয়া লেখাটার উপর আঙুল ছোঁয়াতেই আঙুলটা চটচট করে উঠল। এটাই সন্দেহ হচ্ছিল। রংটা কাঁচা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই লেখাটা সদ্য। তার মানে বাপ্পাদিত্য যা বলল তাই কি সত্যি? প্রোডাকশনের লোক এ সব করছে? মনে একটু সাহস পেল গুড়িয়া।

কানে হেডফোনে সমানে নির্দেশে আসছে ঘরের মধ্যে ঢুকতে। সেইমতো দরজাটা পেরিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল গুড়িয়া। অদ্ভুত একটা স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা আর একটা ভ্যাপসা গন্ধ। এখন কাজ হচ্ছে একটা চক, ডাস্টার খুঁজে বের করা।

টর্চের আলোয় খুঁজতে-খুঁজতে গুড়িয়া একটা জায়গায় খুঁজে পেয়ে গেল চক আর ডাস্টার। হেডফোনে ভেসে এল টাস্কের নির্দেশ, "ভেরি গুড সঞ্জনা। এইবার তুমি একটা ব্ল্যাকবোর্ড খুঁজে পাবে। বহু পুরনো ব্ল্যাকবোর্ড। এই ব্ল্যাকবোর্ডেই একটা সময়ে অশ্বিনী ভট্টাচার্য ক্লাস করাতেন। সেই ব্ল্যাকবোর্ডে কয়েকটা ছোট-ছোট পাটিগণিতের অঙ্ক দিয়ে এসেছে আমাদের টিম। তুমি অঙ্কগুলো সল্ভ করে ফেলো। সেটা রেকর্ড হয়ে যাওয়ার পর ডাস্টার দিয়ে সলিউশনগুলো মুছে দেবে। বাপ্পাদিত্য এসে একই অঙ্ক সলভ করবে।

গুড়িয়া ব্ল্যাকবোর্ডটাকে খুঁজে পেল। কিন্তু এ কী? পাটিগণিতের অঙ্ক কোথায়? এ তো ক্যালকুলাস!

কন্ট্রোল ভ্যানের মধ্যে একটা উত্তেজনা দেখা দিল। দেবদত্তা উত্তেজিত গলায় বলতে থাকল, "আমরা কিন্তু ওখানে পাটিগণিতের অঙ্ক দিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু দেখুন এগুলো ভৌতিক ভাবে ক্যালকুলাস হয়ে গেছে।"

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন আর্যশেখর চৌধুরী, "ভয়ানক অন্যায়। বাপ্পা ক্যালকুলাস কী করে করতে পারবে? ও তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট নয়, আইন পড়ছে। আর অঙ্কতেও একটু কাঁচা। সঞ্জনা খবর পেয়েছি অঙ্কে এম এসসি পড়ছে।"

প্রহ্লাদ মিত্র বললেন, "ভূত পার্শিয়ালিটি করলে আমরা কী করতে পারি স্যর?"

শিবেন ঠাকুর আর্যশেখর চৌধুরীর পিছন থেকে আর্যশেখর চৌধুরীর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলে বলল, "কিসকিসা নিশার দিন কিচ্ছু বলা যায় না স্যর। আত্মার মধ্যে অঙ্কের চেতনা অতীব জাগ্রত হয়ে ওঠে।"

আর্যশেখর চৌধুরী রাগত চোখে জানতে চাইলেন, "কে আপনি?"

"আমি গোবর্ধনপুরের রক্ষাকালী মন্দিরের তন্ত্রসিদ্ধ পূজারি শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।"

আর্যশেখর চৌধুরী চিৎকার করে ধমকে উঠলেন, "এখানে কী করছেন? এক্ষুনি বেরিয়ে যান এখান থেকে। নিয়ম জানেন না, কন্ট্রোল ভ্যানে বাইরের কেউ থাকতে পারবে না। কালকেই আইন লঙ্ঘনের জন্য হাইকোর্টে তুলতে পারি। ছ'মাসের শ্রীঘর আর দশ হাজার টাকার জরিমানা নিশ্চিত। অনাদায়ে আরও এক মাস জেল।"

শিবেন ঠাকুর ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর্যশেখর চৌধুরী তখনও প্রবল মাথা নাড়াচ্ছেন, "না-না, এ অন্যায় কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। আর আপনারা যে একটু আগে বললেন অশ্বিনী মাস্টার ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়াতেন। গোবর্ধনপুরে কি ক্লাস ওয়ান থেকে ক্যালকুলাস পড়ানো হত?"

প্রহ্লাদ মিত্র বুঝতে পারছেন না কী হচ্ছে। বললেন, "এ সব আমি কী জানি? ভূতের পক্ষে কিছুই জানা অসম্ভব নয়। আমরা তো ক্লাস ফোরের পাটিগণিতের অঙ্ক দিয়ে এসেছিলাম।"

হেডফোনে অনেক অবান্তর কথা ভেসে আসছে। গুড়িয়া সেসব মাথায় ঢোকাচ্ছে না। মন দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডটা দেখছে। এখানে কোনও ক্যালকুলাসের প্রশ্ন নেই। একটা গোটা ইকোয়েশন সল্ভ করা আছে। তবে তার মধ্যে অনেক ভুল আছে। সেই ভুলগুলো ডাস্টার দিয়ে মুছে মুছে শুধরোতে থাকল। হঠাৎ পিছন থেকে একটা গলার আওয়াজ পেল, "দিদি...দিদি..."

কন্ট্রোল ভ্যানে হইহল্লা থেমে গেল। থমথমে গলায় দেবদত্তা জিজ্ঞেস করল, "সঞ্জনা তুমি কি কোনও গলার আওয়াজ শুনতে পেলে?"

গুড়িয়া পিছন দিকে না-ফিরে বলল, "আমাকে যেভাবেই ভয় দেখানোর চেষ্টা করো, আমি ভয় পাব না," তার পর ব্ল্যাকবোর্ডে ক্যালকুলাসের বাকি ভুলগুলো ঠিক করতে থাকল।

কন্ট্রোল ভ্যানে গলার আওয়াজ আর মনিটরে ক্যালকুলাস সল্ভ

করার দৃশ্য দেখতে-দেখতে দেবদত্তা বিস্ফারিত গলায় বলে উঠল, "কে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে সঞ্জনা?"

গুড়িয়া উত্তর দেওয়ার আগেই দোতলায় ধুপ করে একটা আওয়াজ হল। দোতলায় সামনের দিকে টর্চ জ্বালিয়ে এগোচ্ছিল বাপ্পাদিত্য। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে ধুপ করে পড়ে গেল। তার পর টর্চের আলোয় চমকে উঠল। একটা ছেলে মাটিতে পড়ে আছে। টর্চের আলোটা মুখে ফেলে দেখল, আরে এই তো তাতান। ফেসবুকে 'ভূতের যম' গ্রুপে ফটো দেখেছে। মেসেঞ্জারে একটু আগেও কথা হয়েছে। ওই তো বলেছিল পাটিগণিতের অঙ্কগুলোর কথা। তাতানকেই তো বলেছিল বোর্ডে কঠিন একটা অঙ্ক লিখে রাখতে। সঞ্জনা অঙ্কে খুব ভাল। আর বলেছিল অন্ধকার ঘরটায় এক কোনায় লুকিয়ে থাকতে। গোপনে সব ফটো তুলতে। কিন্তু তাতান দোতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে কেন?

এ সব চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ মনে হল সামনে কারা যেন এসে দাঁড়াল। বাপ্পা মুখ তুলে দেখল দুটো ছায়ামূর্তি। নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করল, "কে তোমরা?"

"আমরা হচ্ছি ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পাওয়া প্রতিযোগী। এর যা অবস্থা করেছি, তোমারও তাই অবস্থা করব, গজুকে যেমন করেছিলাম। আমরা থাকতে আর কেউ উইনার হবে না।"

'জয় বাবা ব্রুস লি,' বলে বিল্টু আর লাল্টু ঝাঁপিয়ে পড়ল বাপ্পাদিত্যের উপর। ওদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। কন্ট্রোল ভ্যানের মধ্যে এই দৃশ্য দেখে সবার অলক্ষ্যে মাইকেল বিশ্বাস কেটে পড়ল।

নীচের ঘর থেকে গুড়িয়া উপরে নানান রকম আওয়াজ পাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাপ্পাদিত্য কোনও বিপদে পড়েছে। সব কিছু ভুলে গুড়িয়া দোতলা যাওয়ার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে তখনও কেউ ডেকে চলেছে, "দিদি...দিদি..."

গুড়িয়া পিছন ফিরে তাকাল না। স্নায়ু শক্ত করে উপরে উঠে এল। কন্ট্রোল ভ্যান থেকে হেডফোনে নানান মন্তব্য আর নির্দেশ আসছে। বিরক্ত হয়ে কান থেকে হেডফোনটা নামিয়ে নিল। টর্চের আলোয় বুঝতে পারল বাপ্পাদিত্যর সঙ্গে দুটো ছেলের ধস্তাধস্তি চলছে। চিৎকার করে উঠল গুড়িয়া, ''স্টপ ইট।''

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাপ্পাদিত্যকে ছেড়ে থমকে দাঁড়াল বিল্টু আর লাল্টু। গুড়িয়া এগিয়ে গিয়ে ঠাসঠাস করে দুটো চড় মারল ওদের গালে।

আর্যশেখর চৌধুরী মনিটরে সব দেখে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পুলিশে ফোন করেছেন, প্রহ্লাদ মিত্র, মাইকেল বিশ্বাস থেকে শুরু করে শিবেন ঠাকুর, ব্রজহরি সবক'টাকে ধরে-ধরে জেলে পুরবেন। এ ভয়ানক লোক ঠকানোর চক্রান্ত। সবাই বলছে, 'আমি কিছু জানি না। কিছু বুঝতে পারছি না।' পুলিশ এসে পুলিশের কাজ করবে, বাকিটা উনি কোর্টে বুঝে নেবেন। তার পর নিজের ড্রাইভারকে সঙ্গী করে ধানের খেতের মধ্যে সরু রাস্তা দিয়ে রওনা দিলেন হরিমতী পাঠশালার দিকে।

হরিমতী পাঠশালায় পৌঁছে অল্প শুশ্রূষা করতে বাপ্পাদিত্য আর তাতান ভাল হয়ে উঠল। গায়ে শক্তি তারও কিছু কম নয়। কিন্তু ওরা দু'জন আচমকা আক্রমণ করেছিল। লাল্টু-বিল্টু অবশ্য ভুল বুঝতে পেরে ভয়ে কাঁপছিল। আর্যশেখর চৌধুরীর পায়ে পড়ে সব কিছু বলল। বাপ্পাদিত্যও সব বলল। আর্যশেখর চৌধুরী সব শুনে বললেন, "তোদের বয়স কম। লোভে পড়ে প্রথম অপরাধ করেছিস। কিন্তু তোদের ওই বাঁকা মাইকেল কাকা না মামাকে কী ভাবে সোজা করতে হয় দেখছি।"

সবাই নীচে এসে দেখতে পেল সিঁড়ির থামে হেলান দিয়ে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে চলেছে গুড়িয়া। নিজের মনে বলে চলেছে, "পারলাম না, এত দূর এসেও বাবার জন্য কিছু করতে পারলাম না।"

আর্যশেখর চৌধুরী এগিয়ে এসে গুড়িয়ার মাথায় হাত রেখে বললেন, "মা, তুমিই প্রকৃত সাহসী। উইনার।"

গুড়িয়া মাথা ঝাঁকাল, "না আমি এই অন্যায় শোয়ের উইনার হয়ে বাবার চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে চাই না।"

"কে বলল তোমাকে চ্যানেলের কাছ থেকে তোমাকে উইনারের প্রাইজ়মানি নিতে হবে? ওরা তোমাকে দেবে ক্ষতিপূরণ। তিন মাস ধরে তোমাকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ চষিয়ে বেড়ানোর ক্ষতিপূরণ। সেই মামলা করব আমি নিজে। দশ বছর আগে অবসর নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য আবার কালো কোট গায়ে চাপাব। আমি কোনওদিন কোনও কেস হারিনি। চলো এখন। আমার গাড়িতে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।"

জোৎস্নার আলোমাখা পথ ধরে সবাই বড় রাস্তার দিকে এগোতে শুরু করল। তাতান শুকনো গলায় বলল, "সরি দিদি। বাপ্পাদা হঠাৎ করে বোর্ডে ক্যালকুলাস করতে বলল। তখন আমি এখানে পৌঁছে গেছি। বই ছিল না। তাই ভুলভাল হয়ে গেছে।"

গুড়িয়া বলল, "একবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিলে ডিফারেন্সিয়াল আর ইন্ট্রিগাল ক্যালকুলাস যেমন মজার তেমন ইন্টারেস্টিং..."

এমন সময় পিছন থেকে আবার একটা ডাক শুনতে পেল, "দিদি...দিদি।"

গুড়িয়া ঘুরে দেখল একটা রোগা হাড় জিরজিরে ছেলে। ছেলেটা বলল, "আমি ফটিক। আমার ছাগল দুটোর কিছু হবে না তো?"

গুড়িয়া ছেলেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, "আজ থেকে তোমার ছাগলদের আর কেউ বিরক্ত করবে না।"

সম্পূর্ণ শঙ্কু কমিক্‌স

প্রফেসর রন্ডির টাইম মেশিন

কাহিনি: সত্যজিৎ রায় **চিত্রনাট্য ও ছবি:** অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আমি যদি কিছু করতে
পারতাম...

...প্রফেসর ক্লাইবার ছিল ধনী ব্যক্তি। পদার্থবিজ্ঞানের বাইরেও নানা রকম শখ ছিল। তার একটা ছিল দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা।
তোমার মনে হয় খুনটা ডাকাতেই করেছে? শিল্পদ্রব্য নেওয়ার জন্যই এই খুন...

ঘর থেকে দুটো মহামূল্য শিল্পদ্রব্য উধাও।
খুবই খারাপ লাগছে... ওর সঙ্গে মাদ্রিদে আলাপ হয়। আমার টাইম মেশিনের উপর প্রবন্ধ ওর খুব ভাল লাগে।

তুমিও তো টাইম মেশিন নিয়ে কাজ করছিলে...
করছিলাম... তবে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং টাকা-পয়সার অভাবে কাজটা আর এগোয়নি।

আর-এক জনের কাজ কিন্তু খুব ভালই এগিয়েছে শুনতে পাচ্ছি। তার অবিশ্যি টাকা-পয়সার অভাব নেই। প্রফেসর রস্তি। কাউন্ট লুইজি রস্তি।

আমি, কাউন্ট লুইজি রস্তি, যা করতে পেরেছি, আর কেউ তা পারেনি...

টাইম মেশিন!

দু'জন ছিল...
এক জন X@꩜꩜ তো মারাই গেল।
আর আছে প্রফেসর শঙ্কু... @꩜꩜! তাকে শেষ করে আমি একা রাজ করব...
রিং!
রিং রিং।
শঙ্কু বলছি।
আমি প্রফেসর রন্ডি। মিলান থেকে বলছি।
মাই হার্টিয়েস্ট কংগ্র্যাচুলেশনস!
থ্যাঙ্ক ইউ। এর মধ্যে অনেকেই দেখে গেছে... আমার যন্ত্র।
কিন্তু যত ক্ষণ না তুমি এসে জিনিসটা দেখে তোমার মতামত দিচ্ছ, তত ক্ষণ তো আমার শান্তি নেই। তোমার টাইম মেশিন নিয়ে প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমি জানি।
তোমার প্লেনে যাতায়াতের সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি আর আমার এখানেই থাকবে, বলাই বাহুল্য।
দুটো দিন দেখে বলছি, কবে যেতে পারব।

এত বড় একটা আবিষ্কারের প্রকৃত বিচার বিজ্ঞানীর দ্বারাই
সম্ভব। বিশেষ করে আমি যখন ওই একই ব্যাপারে কাজ
করে এখনও সফল হতে পারিনি, তখন যন্ত্রটা আমাকে
না-দেখানো পর্যন্ত রত্তির সোয়াস্তি হতে পারে না।
টাইম মেশিন!
মানুষের তৈরি যন্ত্র, যার
সাহায্যে অতীতে ও
ভবিষ্যতে সফর করা সম্ভব।
এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করব। এই যন্ত্রের
ব্যাপারে আমি ছেলেমানুষের মতো
কৌতূহল অনুভব করছি। এ সুযোগ
ছাড়া যায় না।

এসো নকুড়।
এসো, ভিতরে এসো।
কেমন আছ বলো।
শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছে না... মাথাটা...
তোমায় আগেও বলেছি... আমার তৈরি সেরিব্রিলান্ট ক'দিন খাও। মাথাটা পরিষ্কার ও অনুভূতিগুলো সজাগ রাখে।

অদূর ভবিষ্যতে আপনাকে একটা বড় বিপদের সামনে পড়তে হবে স্যর।

বিপদ মানে? কী রকম বিপদ?
সঠিক তো বলতে পারব না স্যর। তবে দেখলুম যেন আপনার ঘোর সঙ্কট উপস্থিত!

প্রায় প্রাণ নিয়ে টানাটানির ব্যাপার। তাই ভাবলুম আপনাকে জানিয়ে যাই।
বিপদ থেকে উদ্ধার পাব কি?

তা তো জানি না স্যর। শরীরটা...

ব্যাপারটা ঘটবে কবে, সেটা বলতে পারবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারি। ঘটনাটা ঘটবে একুশে নভেম্বর রাত ন'টায়। এর বেশি কিছু দেখলুম না স্যর।
আমি মিলানে পৌঁছব আঠেরোয়। অনুমান করা যায় যে মিলানে থাকাকালীন ঘটবে যা ঘটার।
তুমি কফি খাও। আমি তোমার জন্য সেরিব্রিলান্ট নিয়ে আসি।
Lufthansa
যত দূর জানি, রন্ডি সদাশয় ব্যক্তি। তা হলে কি বিপদটা আসবে রন্ডির যন্ত্র থেকে? যা হোক, যা কপালে আছে তা হবে।
তবে মরার আগে যদি এক বার অতীত ও ভবিষ্যতে ঘুরে আসতে পারি, তা হলে মন্দ কী?

ওয়েলকাম টু মিলান, প্রফেসর শঙ্কু।
থ্যাঙ্ক ইউ!
Milano Linate
আমার বাড়িটা শহর থেকে একটু দূরে।
চলো, তোমাকে শহরটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাই।
তোমার বক্তৃতা আমি নিজে না-শুনলেও ইতালিয়ান পত্রিকা 'ইল টেম্পো'-তে ছাপা হওয়ার পর সেটা পড়ি। তুমি মেশিন তৈরি করতে পারোনি জেনে আমি দুঃখিত।
তোমাকে এখানে আসতে বলার পিছনে আসল কারণটা আমি বলিনি। সেটা এখন বলি।

আমার যন্ত্র কাজ করছে ভালই। অতীত ও ভবিষ্যৎ দু'দিকেই যাওয়া যায়। এবং ভৌগোলিক অবস্থান জানা থাকলে নির্দিষ্ট জায়গাতেও যাওয়া যায়। যেমন কালই আমি খ্রিস্টপূর্ব যুগে গ্রিসে, দার্শনিকদের এক বিতর্কসভায় গেছিলাম।

দুপুরবেলা সেখানে গ্রিক ভাষায় বাগ্‌বিতণ্ডা শুনলাম কিছু ক্ষণ। অন্য কোনও নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে চাইলে কিন্তু পারতাম না।

কারণ আমার যন্ত্রে সেটা আগে থেকে স্থির করার কোনও উপায় আমি ভেবে পাইনি। এ ব্যাপারে আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।
LINATE PARKING
Pelledoca
ENTRATA
ENTRY

তুমি যদি এর একটা উপায় বাতলে দিতে পারো, তা হলে তোমাকে আমি আমার কোম্পানির এক জন অংশীদার করে নেব।
কোম্পানি?

হ্যাঁ, কোম্পানি। টাইম ট্রাভেলস ইনকর্পোরেটেড। যে পয়সা দেবে, সে-ই ঘুরে আসতে পারবে তার ইচ্ছেমতো অতীতে বা ভবিষ্যতে।

নিউ ইয়র্কের একটা কাগজে একটি মাত্র বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। তিন সপ্তাহে সাড়ে তিন হাজার এনকোয়্যারি এসেছে। আমি অবিশ্যি জানুয়ারির আগে কোম্পানি চালু করছি না। কিন্তু এর মধ্যেই আঁচ পেয়ে গেছি, এ ব্যবসায় মার নেই।

কত মূল্য দিলে তবে এই সফর সম্ভব হবে?
সেটা নির্ভর করে কত ক্ষণের জন্য এবং কত দূর অতীতে বা ভবিষ্যতে সফর, তার উপর। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের রেট বেশি। অতীতে ঐতিহাসিক যুগে দশ মিনিট ভ্রমণের রেট দশ হাজার ডলার। প্রাগৈতিহাসিক হলে রেট দ্বিগুণ হয়ে যাবে। আর দশ মিনিটের চেয়ে বেশি সময় হলে রেট প্রতি মিনিটে বাড়বে হাজার ডলার করে।

আর ভবিষ্যৎ?
ভবিষ্যতে সফরের তারতম্য নেই। নিকট ভবিষ্যতে যেতে চাও বা সুদূর ভবিষ্যতে যেতে চাও, তোমার খরচ লাগবে পঁচিশ হাজার ডলার।

তোমার এই মেশিনের দর্শকের ভূমিকাটি কী? সে কি সশরীরে গিয়ে হাজির হবে অতীতে বা ভবিষ্যতে?
না, সশরীরে নয়। সে উপস্থিত থাকবে ঠিকই...

কিন্তু অদৃশ্য, অশরীরী অবস্থায়। তাকে কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু সে নিজে সবই দেখবে।
PACI POPVLORVM SOSPITAE

পৃথিবীর কোন অংশে যাওয়া হবে সেটা আগে থেকে ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউডের বোতাম টিপে স্থির করা থাকবে। কত বছর অতীতে বা ভবিষ্যতে যাওয়া হবে তার জন্যেও আলাদা বোতামের ব্যবস্থা আছে।

এক বার পৌঁছে গেলে পর বাকি কাজটা স্বপ্নে চলাফেরার মতো সহজ হয়ে যাবে। ধরো, তুমি কায়রোয় গিয়ে হাজির হয়েছ। সেখান থেকে যদি গিজার পিরামিডের কাছে যেতে চাও, তো সেটা ইচ্ছে করলেই তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ স্থান পরিবর্তনটা যাত্রীর ইচ্ছে অনুযায়ী হবে। কিন্তু কালটা থাকবে অপরিবর্তিত।

তার মানে এক বার অতীত বা ভবিষ্যতে গিয়ে পৌঁছতে পারলে তার পর যেখানে খুশি যাওয়া চলতে পারে।
হ্যাঁ! কিন্তু ওই যে বললাম। দিন বা রাতের ঠিক কোন সময়ে পৌঁছচ্ছ, সেটার উপর আমার যন্ত্রের কোনও দখল নেই।

আমি কালই খ্রিস্টপূর্ব তিরিশ হাজার বছর আগের আলতামিরায় যাব বলে বোতাম টিপেছিলাম—ইচ্ছে ছিল প্রস্তর যুগের মানুষেরা গুহার দেওয়ালে কেমন করে ছবি আঁকে সেটা দেখব।
কিন্তু গিয়ে পড়লাম এমন এক অমাবস্যার মাঝ রাত্তিরে, যখন চোখে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তখন স্থান পরিবর্তন করে চলে গেলাম মোঙ্গোলিয়ায়... যেখানে তখন সকাল।

কিন্তু তাতে আমার উদ্দেশ্য সফল হল না। তাই আমার অনুরোধ, তুমি আমার যন্ত্রটা এক বার দেখো।
দেখব বলেই তো এসেছি। তবে সেটা শোধরানোর ব্যাপারে কত দূর কী করতে পারব, সেটা বলতে পারছি না।

আর তুমি যে তোমার ব্যবসায় আমাকে অংশীদার করে নেওয়ার কথা বলছ— তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু সেটার কোনও প্রয়োজন নেই।

আমি যা করব, তাতে যদি আমার বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার কোনও পরিচয় পাওয়া যায়, তাতেই আমি কৃতার্থ বোধ করব।

civico tempio di
San Sebastiano
eccetto

এ বাড়িতে কে-কে থাকে?
আমার একটা আধুনিক বাড়ি আছে রোমে।

আমার যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি সব এখানেই আছে। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট এনরিকোও বেসমেন্টের একটা ঘরে থাকে। তা ছাড়া এখন তো প্রায়ই এখান-সেখান থেকে বিজ্ঞানীরা আসছেন। অন্তত তিরিশ জন বিজ্ঞানী এসেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, আমি অসাধ্য সাধন করেছি।

এনরিকো, আমার সহকারী। ও তো থাকছেই। যদি আরও কাজের লোক দরকার হয় তো ব্যবস্থা করে দেব।
হ্যালো এনরিকো।
তোমার নাম আর কাজের সঙ্গে আমি যথেষ্ট পরিচিত। তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমি ধন্য।

আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। এটা অবিশ্যি ফ্যামিলি পরম্পরা বলতে পারো। আমার ঠাকুরদা ছিলেন এক জন ভারত-বিশেষজ্ঞ। সংস্কৃত জানতেন।

তোমার পদবি কী?

পেত্রি।
তার মানে, তুমি রিকার্ডো পেত্রির নাতি?
হ্যাঁ।

পেত্রির লেখা ভারতবর্ষের উপর বেশ কিছু বই আমি পড়েছি।

এসো... তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিই।

তুমি স্নান সেরে নাও।
একটায় লাঞ্চ।

পশু-চিকিৎসালয়!

দশ মিনিট হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা কেমন হল?
তুলনা নেই!
তুমি অসাধ্য সাধন করেছ!
আমার পরিকল্পিত মেশিনের সঙ্গে এটার যথেষ্ট মিল আছে। হয়তো তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব।

তবে স্বীকার করতেই হচ্ছে, এই টাইম মেশিনের জন্য বিজ্ঞানের জগতে তোমার নাম অমর হয়ে থাকবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আর কাজের লোক দরকার হবে না। এনরিকো সাহায্য করলেই হবে।

ভূত-ভবিষ্যতের চাবি! তোমরা কাল থেকে লেগে পড়ো...

তিন ঘণ্টাও লাগল না।

দেখা যাক কাজ করে কি না...
আমি নিশ্চিত, কাজ করবে।

নেবুক্যাডনেজারের ব্যাবিলন! ঐতিহাসিকদের আর কল্পনার সাহায্য নিতে হবে না। অবিশ্যি রন্ডির চড়া রেট কোনও ঐতিহাসিক দিতে পারবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দেখি, রন্ডিকে জিজ্ঞেস করে।

স্প্লেনদিদো শঙ্কু!
চমৎকার শঙ্কু! আমি যেটা পারিনি তুমি সেটা করে দিলে...
...ঐতিহাসিকদের কথা আমি ভাবছি না। আমি চাই যন্ত্রের সাহায্যে যতটা সম্ভব পয়সা কামিয়ে নিতে।
অবিশ্যি তোমার ব্যাপার আলাদা। আমি বলি কী, তুমি আরও কয়েক দিন কাটিয়ে টাইম ট্র্যাভেলের আরও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরে যেয়ো।
আমার আপত্তি নেই। টাইম ট্র্যাভেল জিনিসটা একটা নেশার মতো। আর দেখার জিনিসের তো অন্ত নেই।

তোমার শরীর খারাপ করল নাকি?
কাল ডিনারের পর শরীরটা খারাপ লাগছিল। আমার তৈরি সর্বরোগ-নিরাময়ক ওষুধ মিরাকিউরলের বড়ি খেয়ে এখন ভাল আছি।
যাক! তা আজ কোন সেঞ্চুরিতে যেতে চাও?
আজ থেকে এক হাজার বছর ভবিষ্যতে।
কোন দেশে যাবে?
জাপান। আমার ধারণা ভবিষ্যতে জাপান টেকনোলজিতে আর সব দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।
আমাকে একটু বেরোতে হচ্ছে। এগারোটা নাগাদ ফিরে এসে তার পর...
কী ব্যাপার বলো তো?
বিপদ!
কার বিপদ?

তোমার এবং আমি তোমায় সাবধান করেছি জানলে আমারও।
কী বিপদের কথা বলছ তুমি?
আমার বিশ্বাস, কাল রাতে তোমার ফলের রসে বিষ মেশানো হয়েছিল।
এ কথা কেন বলছ?
কারণ আর সব কিছু আমরা সকলেই খেয়েছি। ফলের রসটা ছিল শুধু তোমার জন্যে।
কিন্তু আমাকে বিষ খাইয়ে মারার প্রশ্ন উঠছে কেন?
আমার মনে হয় টাইম মেশিনের ব্যাপারে ও কোনও রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করবে না। কারণ ওর ভয়, ব্যবসায় ওর ক্ষতি হতে পারে। ও চায় একাধিপত্য।
যে দিন মেশিনটা তৈরি হয় সে দিন প্রফেসর আনন্দের আতিশয্যে একটু বেশিই উত্তেজিত হয়ে মুখে যা আসছিল বলে যাচ্ছিল।

ওর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাইবার ও তোমার উদ্দেশে যে কী কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করেছে, তা বলতে পারি না। ক্লাইবার তো খুন হয়েছে। কিন্তু তোমাকে ও এক চোট দেখে নেবে সে-কথা বারবার বলছিল উত্তেজিত হয়ে।
তোমাকে মেশিনটা ব্যবহার করতে দিচ্ছে। কারণ তোমাকে শেষ করে ফেলার মতলব করেছে। কোনও বিজ্ঞানীকে এক বারের বেশি ব্যবহার করতে দেয়নি। তিন বছর ওর পাশে থেকে কাজ করেছি। কিন্তু মেশিন তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আমাকে ছুঁতে দেয়নি।
তুমি টাইম মেশিনে সফর করে দেখোনি এখনও?
সেটা করেছি। কিন্তু প্রফেসরের অজান্তে।
ও গত মাসে এক বার রোমে গিয়েছিল। সেই সময় মেশিন চাবি ছাড়া চালানোর ব্যবস্থা করেছি। রোজ রাতে আমি টাইম মেশিনের মজা উপভোগ করি। আমার নেশা ধরে গেছে। জানতে পারলে কী দশা হবে জানি না।
তুমি কি তা হলে বলছ, আমি এখান থেকে চলে যাই?
যদি থাকো, তা হলে অন্তত এমন কোনও জিনিস খেয়ো না যেটা আমরা খাচ্ছি না। বিষ প্রয়োগ করে খুন করাটা ওর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

আমার ওষুধের জন্য বিষ আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।
কিন্তু সেটা ও বুঝতে পারলে তো অন্য রাস্তা নেবে।
আমি বুঝিয়ে দেব যে, আমার ওষুধ যথেষ্ট কাজ করছে না। যাই হোক, আমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।
কী ব্যাপার শঙ্কু? কোনও বিপদ হয়েছে নাকি?
এনরিকো ছেলেটি একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ নয় তো?
না। আমার ধারণা এনরিকো যা বলছে, তাতে কোনও ভুল নেই।
কিন্তু সে ব্যাপারটা আমি সামলাতে পারব মনে হয়। তোমাকে ফোন করেছি এ-ব্যাপারে সাহায্যের জন্য নয়। তোমার কাছে একটা ইনফরমেশন চাই।
কী?
প্রথমে বলো— ক্লাইবারের খুনি কি ধরা পড়েছে?
কেন জিজ্ঞেস করছ?
কারণ আছে।

ধরা পড়েনি, তবে খুনের অস্ত্রটা পাওয়া গেছে। বাড়ির বাগানের একটা অংশে মাটির নীচে। তাতে অবিশ্যি আঙুলের ছাপ নেই। কাজেই রহস্য এখনও রহস্যই রয়ে গেছে।
খুনটা হয় কোন তারিখে?
তেইশে অক্টোবর। সময়টা জানার দরকার আছে নাকি?
তা হলে জেনে রাখো, ক্লাইবারের কাছে একটি সাংবাদিক আসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে, ঠিক সন্ধে সাড়ে সাতটার সময়ে। সে চলে যায় আটটার মধ্যে। তার কিছু পরেই ক্লাইবারের মৃতদেহ আবিষ্কার করে তার চাকর। পুলিশের ডাক্তার বলেছেন, খুনটা হয়েছিল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে।
বললে ভাল হয়।
কী মতলব করছ বলো তো?
বলতে পারো এটা আমার অদম্য অনুসন্ধিৎসা।
অনেক ধন্যবাদ।
তুমি সাবধানে থেকো এবং অযথা গোলমালের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না। পারলে একবার মিউনিখ ঘুরে যেয়ো।
যদি বেঁচে থাকি।

এনরিকো, তোমাকে এক বার মেশিন চালু করতে হবে, এক্ষুনি।

তুমি কি অতীতে যাবে, না ভবিষ্যৎ?
অতীতে। তেইশে অক্টোবর সন্ধে সাতটা পঁচিশে... কোলোন। জার্মানি।

দশ মিনিটের বেশি দিতে পারব না।
তেইশে অক্টোবর সন্ধে সাতটা পঁচিশ।

ক্লাইবারের বাড়ি!

ওই! সাংবাদিক এসে গেছে...
TAXI
B MY 9059
প্রফেসর ক্লাইবারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।
গলার স্বর খানিকটা বিকৃত করার চেষ্টা করছে।

চা... কফি...

না... আমি বেশি ক্ষণ সময় নেব না।

তুমি সময় দিয়েছ... অনেক ধন্যবাদ।
বোসো।
প্রফেসর ক্লাইবার, প্রথমেই জিজ্ঞেস করতে হয়, এই টাইম মেশিনের অনুপ্রেরণা কোথায় পেলে?

প্লিজ়
এক্সকিউজ় মি।

এক ঘায়েই শেষ।

প্রফেসর রন্ডি
ফিরে এসেছে!
প্রথমে বুঝতে
পারিনি! চটপট
করতে হবে!
প্রফেসর শঙ্কুকে এখানে
আসতে বলো।
ইয়েস স্যর।

যা ভেবেছিলাম... ক্লাইবারের হত্যাকারী আর কেউ নয়— স্বয়ং রন্ডি। কিন্তু জেনে লাভ কী? সে-ই যে খুনি, তার প্রমাণ আমি দেব কী করে?
টক টক।
কাম ইন।
মাস্টার আপনাকে মেশিন হলে আসতে বলেছেন।
কী ব্যাপার?
আমার ওষুধে পুরো কাজ দেয়নি। তাই শরীরটা দুর্বল লাগছে।
আমার একটা ইটালিয়ান ওষুধ খেয়ে দেখবে?
তা দেখতে পারি।
অসুস্থ শরীরে টাইম ট্র্যাভেল না-করাই ভাল।

তুমি বিশ্রাম করো। লাঞ্চে দেখা হবে।
মিরাকিউরল। এ ভাবে আর কত দিন?
রন্ডির একটা শাস্তির ব্যবস্থা না-করে দেশেই বা ফিরি কী করে?
এখন কেমন লাগছে?
খানিকটা জোর পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি অল্প করে খাব।
টক
টক
কাম ইন।
প্রফেসর এসে পড়ায় তোমার কাছে জানতে পারিনি, কোলোন সফরের ফলাফল।
তুমি যে এলে, যদি তোমার প্রফেসর টের পান?

প্রফেসরের অনেক দিনের অভ্যেস, দুপুরের লাঞ্চের পর এক ঘণ্টা ঘুমোনো। ইটালির সিয়েস্তার ব্যাপারটা জানো তো?

... প্রফেসর রন্ডিই যে ক্লাইবারের আততায়ী, সে-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। ছদ্মবেশ নিয়েও তার গলার স্বরে আমি তাকে চিনে ফেলেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, তাকে কী ভাবে দোষী স্যব্যস্ত করা যায়। প্রমাণ কোথায়?

গত মাসে রোমে যাচ্ছে বলে যায়নি। সে খবর আমার এক বন্ধুর থেকে আমি পেয়েছি।

অবশ্য রোমে না-গেলেই যে কোলোনে যেতে হবে, এমন কোনও প্রমাণ নেই। আমার এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বন্ধু আমায় বলেছে...

...যে একুশে রাত ন'টায় আমার এক বিপদ আসবে। বিপদ থেকে রক্ষা পাব কি না, সেটা সে বলতে পারেনি।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে, বিপদটা কী ভাবে আসবে।
এ ব্যাপারে তুমি টাইম মেশিনের সাহায্য নিতে চাইছ কি?

হ্যাঁ।
তা হলে এক্ষুনি চলো। এখনও পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় আছে।

আর দেরি করা চলবে না।

নকুড়ের কথা শেষ পর্যন্ত ফলতে চলেছে... মৃত্যু কি ঘনিয়ে এল?

এখন কেমন বোধ করছ? বুঝতেই পারছ তুমি বেঁচে থেকে আর-একটা টাইম মেশিন তৈরি করে ব্যবসায় ব্যাগড়া দাও, সেটা আমি চাই না। আজ ডিনারে তোমার খাবার জলে...

...একটু বেশি করে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। যাতে এ বার আর মাথা তুলতে না-পারো।

আমি চাই মিলানেই তোমার ইহলীলা সাঙ্গ হোক। কোনও-কোনও ভাইরাস ইনফেকশনে এখন লোক মরছে, কারণ তার সঠিক ওষুধ ডাক্তারে এখনও জানে না।
তুমিও তাতেই মরবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে...
সরি প্রফেসর, দশ মিনিট হয়ে গেছে। এ বার পালাতে হবে।
কী হল প্রফেসর?
একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে। দুটো কাজ করা দরকার। একটা হল আমার বন্ধু ক্রোলকে মিউনিখে ফোন করা।
আর দ্বিতীয়?
দ্বিতীয় কাজটা তোমাকেই করতে হবে। এতে একটু সাহসের প্রয়োজন হবে— যেটা তোমার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।
কী কাজ?

আমি রন্ডির স্টাডিতে দেখেছি তার পাইপের বিরাট সংগ্রহ। তার থেকে একটা পুলিশে দিতে হবে, আঙুলের ছাপের জন্য। পারবে?
পুলিশে আমার চেনা লোক আছে। এ বাড়িতে পুলিশের পাহারার বন্দোবস্ত সব আমাকেই করতে হয়েছিল।
ব্যস, তা হলে আর চিন্তা নেই।
এখন কেমন বোধ করছ?
খুব ভাল নয়।

মিরাকিউরল নেই?
রন্ডির কাজ। যখন বাগানে হাঁটতে গেছিলাম।
ওহ!
এনরিকো ঘরে নেই...

এনরিকো এখনও ঘরে ফেরেনি...

এক বার এনরিকোর ঘরে গিয়ে...
রাত ন'টা। তার মানে তো এখন...
এখন কেমন বোধ করছ? বুঝতেই পারছ তুমি বেঁচে থেকে আর-একটা টাইম মেশিন তৈরি করে আমার ব্যবসায় ব্যাগড়া দাও, সেটা আমি চাই না।

আজ ডিনারে তোমার খাবার জলে একটু বেশি করে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে এ বার আর মাথা তুলতে না-পারো।

আমি চাই মিলানেই তোমার ইহলীলা সাঙ্গ হোক। কোনও কোনও ভাইরাস ইনফেকশনে এখন লোক মরছে কারণ, তার সঠিক ওষুধ ডাক্তারে এখনও জানে না।

তুমিও তাতেই মরবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই...
...সব শেষ হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। তার পর লুইজি রন্ডি টাইম মেশিনের একচ্ছত্র সম্রাট। টাকার আমার অভাব নেই, কিন্তু টাকার নেশা বড়...

দুম!
দুম!
দরজা খোলো!
কে?
পুলিশ!

প্রফেসর!
এ সব কী হচ্ছে?
ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট প্রফেসর রন্ডি।
আমি প্রফেসর রন্ডি! ইটালির গর্ব! তোমার এত বড় সাহস, আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছ?
তুমি আমাদের দেশের গর্ব... কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই।
মিরাকিউরল খেয়ে নাও একটা। প্রফেসরের ঘর থেকে পাওয়া গেছে।
প্রফেসর রন্ডি, তোমার পাইপে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর প্রফেসর ক্লাইবারের...
...টেবিলের লাইটারের ফিঙ্গার প্রিন্ট একেবারে মিলে গেছে।
শঙ্কু বলছ?
হ্যাঁ, বলো ক্রোল।
সব ঠিক আছে তো?
হ্যাঁ ঠিক আছে। তুমি আর এনরিকো সত্যিই আমার বন্ধুর কাজ করেছে।

সমাপ্ত

দড়ি

স্বর্ণেন্দু সাহা

বাসটা থেমে গেল। শব্দ করছে ইঞ্জিন। ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে পিচের ঘষটানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সন্দীপ জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল একটু বিরক্ত হয়েই। সে পেশায় সাংবাদিক। অফিসে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। রাস্তার অন্যান্য গাড়িরও একই অবস্থা। চাকা ও পথের ঘর্ষণের শব্দ, মিছিলের দূষণে টইটম্বুর হয়ে গেছে চার দিক। সে দেখতে পেল, পাশের গাড়ির চাকা ঘুরছে যথেষ্ট গতিতে। কিন্তু এগোচ্ছে না। পিছন থেকে কেউ অমানুষিক শক্তিতে চেপে ধরে থাকলে এমন হতে পারে।

কোনও বাহনের পিছনে কিছু নেই। রয়েছে উপরে। দড়ি!

আকাশ থেকে নেমে এসেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে দড়ি। যত দূর চোখ যায়, তত দূর পর্যন্ত বিছিয়ে থাকা সমস্ত গাড়ি ও বাইককে আটকে ফেলেছে। শক্ত করে লেগে গেছে গাড়ির ছাদে ও দু'চাকার হ্যান্ডেলে। প্রত্যেকটা দড়ির অন্য প্রান্ত সটান উপরে উঠতে-উঠতে আকাশে মিলিয়ে গেছে যেন।

বাস-ড্রাইভার আবার চাপ দিল অ্যাক্সিলারেটরে। উইন্ডশিল্ডের কাচ দিয়ে সে-ও দেখতে পেয়েছে এই অদ্ভুত কাণ্ড। তার চোখ সামনে মেলে থাকা গাড়ির স্রোত ও দড়ির বাহিনীর দিকে। ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। এগোতে পারছে না।

যাবতীয় চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হওয়ার পরে, এক-এক করে লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করল গাড়ি থেকে। সন্দীপও নেমে এসেছে। অল্প শঙ্কা সত্ত্বেও সে হাত দিল দড়িতে। বেশ মোটা, পূর্ণবয়স্ক মানুষের ঊরুর সমান। রাস্তায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেও এগুলোর আদি বিন্দু দেখা যাচ্ছে না। কে ছুড়ল এ সব? গাড়িতে কেমন করে আটকে গেছে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। মাত্র একটা জায়গায় আটকে গিয়ে বাসের মতো বৃহৎ যানকে পর্যন্ত নড়তে দিচ্ছে না, এ কোন পর্যায়ের শক্তি!

হাত দিয়ে পরখ করতে গিয়ে আরও ভাল করে বোঝা গেল, দেখতে কিছুটা দড়ির মতো হলেও পরিচিত কোনও গোত্রের রশি নয় এই বস্তু। স্পর্শের অনুভূতি অনুযায়ী বাইরেটা রাবার দিয়ে তৈরি। ভীষণ মসৃণ। তেল জাতীয় কিছু লেগে না-থাকলেও, আঙুল পিছলে যাচ্ছে। স্বচ্ছ বাইরের অংশ। ভিতরে জেলি-গড়নের পদার্থ সামান্য যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। হালকা লাল রং। টেনে

একটুও নড়ানো যাচ্ছে না।

এই আধিভৌতিক জিনিস নিয়ে বেশি ক্ষণ গবেষণা করার জন্য কঠিন কলজে চাই। কেউ আর নিজের গাড়িতে ঢুকে বসার সাহস জোগাড় করতে পারল না। বাস, অটো যাত্রী-শূন্য হয়ে গেল। গাড়ি-সমেত আকাশে টেনে তুলতে যদি শুরু করে?

পুলিশ এল। এল দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের কর্মচারীরা। কেউ কোনও সুরাহা করতে পারল না। ধারালো কাঁচি পিছলে যাচ্ছে। ছুরি, কাটারি সব অকার্যকর। যাবতীয় অস্ত্র ব্যর্থ হল এতে আঁচড় কাটতে। গুলি চালিয়েও দেখা হল। দেড়শো কিলোমিটার বেগে ছুটে যাওয়া পেস বল যেমন সুদৃঢ় ডিফেন্সের মুখোমুখি হয়ে, ব্যাটে লেগে পাকা আপেলের মতো টুপ করে ব্যাটের সামনেই খসে পড়ে, তেমন ভাবেই দড়িতে ধাক্কা লাগার পর গুলি আলগোছে নীচে পড়ে গেল। ঘণ্টা তিনেক চেষ্টার পরেও, কিছুতেই কিছু না-হওয়ায় অগত্যা মানুষেরা হেঁটে বা রিকশাটিকশা ধরে ফিরতে থাকল নিজেদের বাড়ির দিকে।

রিকশা ও সাইকেল শুধু বেঁচে গেছে দড়ির হাত থেকে।

তারা বাড়ি ফিরে টিভি চালিয়ে জানতে পারবে, ফেসবুক খুলে বুঝতে পারবে, পরের দিনের খবরের কাগজ পড়ে নিঃসন্দেহ হবে, এই আজব ঘটনা শুধু এই মুলুকে তাদের সঙ্গেই ঘটছে না— ঘটছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। রেহাই পায়নি জাহাজ, ট্রলার ইত্যাদিও। গ্যারাজ বা যে-কোনও ছাউনির তলায় থাকা গাড়িগুলো এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে। বেগতিক দেখে সেই সব গাড়ি আর রাস্তায় বের করেনি কেউ। বাইক, স্কুটার সবারই ফাঁদে পড়া দশা।

কোত্থেকে এল এই ভয়াল দড়ির দল? উদ্দেশ্যই বা কী?

।। ২ ।।

সন্দীপ সাইকেল চালাচ্ছিল। পিছনের ক্যারিয়ারে ব্যাকপ্যাক রাখা। তার মতো বহু সাইকেল-আরোহী রাস্তায়। আপাতত নিজস্ব বাহন হিসেবে সাইকেলের চাহিদা আকাশছোঁয়া, তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদনও।

প্রায় এক-বছর পেরিয়ে গেছে, দড়িরা তাদের কব্জায় এসে যাওয়া কোনও গাড়িকেই ছাড়েনি। নেহাত বাধ্য হয়েই, গাড়ির মালিকেরা দড়ির সঙ্গে লেগে থাকা অংশটুকু বাদ দিয়ে, ধার দিয়ে গোল করে ফুটো করে কেটে বের করে নিয়ে গেছে গাড়ি। কিন্তু তা ফের রাস্তায় চালানোর চেষ্টা করা মাত্র নতুন দড়ি এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আসল আতঙ্কটা অন্য জায়গায়। তার মানে, কেউ তাদের দিকে নজর রাখছে চব্বিশ ঘণ্টা জুড়ে? কে? কেমন করে সম্ভব!

এখন সমগ্র বিশ্বের রাস্তাঘাট জুড়ে বিছিয়ে আছে দড়িরা ও তাদের সঙ্গে ঝুলছে ছোট্ট এক টুকরো ধাতু। গাড়ি ও তার সঙ্গে জড়িত বিশাল অর্থনীতির অংশটা একেবারে ভরাডুবি। বিশাল সংখ্যক মানুষ কাজ হারিয়েছেন। বিমানকে এই রশি খামচে ধরেনি ঠিকই, কিন্তু বিমান পরিবহণ চালু রাখা যায়নি। আকাশের দিকে-দিকে ঝুলছে দড়ি। কয়েকটা বিমান তাতে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়েছে। হেলিকপ্টার আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু তার গতি খুব বেশি নয়, এবং নগণ্য সংখ্যক মানুষই তা ব্যবহার করতে সক্ষম। যন্ত্রে টানা রিকশা, সাইকেল, নৌকা ইত্যাদির প্রতি দড়ির আগ্রহ দেখা যায়নি। তাই ওইগুলোই চলছে কেবল। কোনও দেশের সরকার, মিলিটারি, বিজ্ঞানী কেউ-ই, কোনও সংস্থাই সক্ষম হয়নি এদের কাটতে। সন্ধান পায়নি উৎসের। হাজার রকম চেষ্টার পরেও বিফল মনোরথ হতে হয়েছে। কাকভোর, দুপুর, মাঝ রাত, যে-কোনও সময়, গাড়ি আড়াল থেকে বের করে রাস্তায় নামালেই হুট করে দড়ি এসে পাকড়ে ফেলেছে।

সন্দীপ আপন মনে প্যাডল করছিল। দেখছিল আশপাশে চেয়ে। সেই প্রথম সপ্তাহের হুলস্থুল ভাব এখন আর নেই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে মোটামুটি। শুরুর কয়েক দিনেই বোঝা হয়ে গেছিল, তেল বা বিদ্যুতে চালিত কোনও যানই আপাতত আর বের করা যাবে না রাস্তায় ও জলে। এই খতরনাক বস্তুগুলো, গাড়ি দেখলেই তেড়ে এসে জুড়ে বসছে। বিকল্প কী তা হলে? হাঁটা আর সাইকেল, রিকশা মারফত দূরে-দূরে যাতায়াত করা সাময়িক ভাবে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু কখনওই দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ হতে পারে না। প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীরা একত্রে জড়ো হলেন নতুন ধরনের যান তৈরির প্রচেষ্টায়। এই কিম্ভূত দড়ি হেলিকপ্টারের প্রতি অসূয়া দেখাচ্ছে না। সুতরাং ছোট আকারের উড়ুক্কু যান বানাতে পারলে, তা এই দড়ি এড়িয়ে চলাচল করতে পারবে। সাধারণ গাড়ির বদলি হিসেবে ব্যবহার করতে হলে খরচও রাখতে হবে সাধ্যের মধ্যে। কাজ এক বছরে অনেকটাই এগিয়েছে। দেশ হিসেবে জাপান প্রথম পেটেন্ট নিয়েছে বায়ু-গাড়ির। প্রোটোটাইপ ভার্সন যথেষ্ট সাফল্যের মুখ দেখেছে। বাজারজাত করতে দেরি নেই।

যা-ই হোক, আসন্ন উড়ন্ত বাহন নিয়ে আগ্রহ নেই সন্দীপের। তার ক্ষমতা হবে না ওই জিনিস কেনার। সে যাচ্ছে তার চেনা এক প্রফেসরের বাড়ি। অরুণাভ দস্তিদার। আলাপ হয়েছিল সাংবাদিকতার কাজের সূত্রেই। পরিবেশের অবক্ষয় সম্বন্ধে একটা ফিচার লেখার সময় প্রাথমিক লেখাপড়া করতে গিয়ে এই ভদ্রলোকের সন্ধান মিলেছিল। নিভৃতে বাস করেন। আত্মভোলা পরিবেশ-বিজ্ঞানী। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-অধ্যাপক। তাঁর প্রবন্ধ নিয়মিত ছাপা হয় নামী দেশি-বিদেশি জার্নালে। ধীরে-ধীরে জরুরি আলাপের গণ্ডি পেরিয়ে সম্পর্কটা চলে আসে এক অসমবয়সি অথচ সমমনস্ক বন্ধুত্বের আওতায়। তার পর থেকেই দু'জনের মধ্যে নিয়মিত কথাবার্তা হত। গত কয়েক মাস ফোনে কথা হলেও সাক্ষাৎ হয়নি। কারণ, তাদের বাসস্থানের মধ্যে ব্যবধান তিরিশ কিলোমিটারেরও বেশি। অতটা পথ সাইকেল চালানো সহজ নয়। ফোনে প্রফেসরকে গত আট মাস ধরেই বেশ অন্যমনস্ক ঠেকছে তার। যেন ঠিক করে কথা শুনতে পাচ্ছেন না। কিংবা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অধিকাংশ সময়েই হু-হাঁ করছেন কেবল। অস্বস্তি হচ্ছিল সন্দীপের। প্রফেসর নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত। জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট জবাব মেলেনি। তার মধ্যে কৌতূহল বাড়ছিল। সে ঠিক করেছিল, এ বার সরাসরি মুখোমুখিই দেখা করে আসবে।

সন্দীপ এসে পৌঁছল। প্রফেসর স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু সে টের পাচ্ছিল, কোথাও একটা তাল কেটে গেছে। অযথা গৌরচন্দ্রিকায় না-গিয়ে সে প্রসঙ্গে এল। জবাবে প্রফেসর হাসলেন আলতো করে। বললেন, "চিন্তা তো আছেই। দেখছ না, কী হচ্ছে চার দিকে!"

"এটা নিয়ে চিন্তা করে আর কী হবে? কেউ তো কিছু বুঝতে পারেনি..." বলেই থেমে গেল সন্দীপ। স্যর কি তা হলে এই অদ্ভুত ঘটনার পিছনে কিছু খুঁজে পেয়েছেন, আর সেটার জন্যই তিনি উদ্বিগ্ন!

"কী মনে হয় আপনার? বস্তুটা কী আসলে?"

"লাখের উপর স্পেকুলেশন ছড়িয়ে আছে। আমি নতুন করে আর কী বলতে পারি? কী লাভ?" প্রফেসর হাতের পেন দিয়ে সাদা কাগজে অস্থির ভাবে হিজিবিজি কাটলেন।

“আপনি এ বিষয়ে আজ অবধি মুখ খোলেননি। গত একটা বছর ধরে আপনার কাজেরও কোনও খবর নেই। কিছুই কি মনে হয়নি?”

“হয়েছে,” তিনি বললেন। একটা মামুলি শব্দ। কিন্তু সন্দীপের মনে হল, যেন সেটা অতল কোনও কুয়ো থেকে ঠান্ডা জলের আবেশ নিয়ে উঠে এল। অনেক দিন ধরে চাপা পড়ে থাকা একটা লুকোনো শব্দ।

“কী?”

প্রফেসর চশমাটা আঁকড়ে ধরলেন আঙুলে। খসিয়ে আনলেন কানের উপর থেকে। বললেন, “ভেবেচিন্তে আমি যে-থিয়োরি খাড়া করেছি, সেটা আমার নিজেরই ঠিক করে বিশ্বাস হয় না।”

“কী থিয়োরি?”

প্রফেসর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “আমার মনে হয়েছে, এটা প্রকৃতির নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা। চেষ্টা বলব না ঠিক, এটা আমাদেরকে হুঁশিয়ার করার একটা মরমি উদ্যোগ। যানবাহন বন্ধ হওয়ার পর দূষণ কত কমে গেছে দেখেছ? আধুনিক মানবসভ্যতা যে রকমারি দূষণে পরিবেশ ভরিয়ে দিচ্ছে, ক্ষতি করছে, তাতে নিশ্চয়ই প্রকৃতির খুব আরাম হয় না। এটা সেই অপকার রোধের প্রথম পদক্ষেপ।”

সন্দীপ হাঁ হয়ে গেল, “প্রকৃতি!”

“হ্যাঁ।”

সন্দীপ খানিক ক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, “প্রকৃতি এত কাণ্ড করবে কেমন করে?”

“প্রকৃতির ক্ষমতা সম্পর্কে কি আমরা আদৌ কিছু জানি? প্রকৃতি আসলে কে, তা-ও কি আমরা একটুও জানি?”

“কে!” সন্দীপ হাসল, “কে মানে! আপনি বলতে চাইছেন, প্রকৃতি কোনও উচ্চতর বুদ্ধিমত্তার প্রাণী? এলিয়েন?”

প্রফেসর হাসলেন। চেষ্টা না-করেই যে-কেউ এই হাসিতে বিষণ্ণতা দেখতে পাবে, “এলিয়েন শব্দটা আজকাল অতি ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে। শোনায়ও হাস্যকর। ব্যাপারটা আদতে একেবারেই হাসি-মজার বিষয় নয়। ধরা যাক, এলিয়েন নয়, প্রকৃতি যদি একটা শক্তি হয়ে থাকে, যারা মহাবিশ্ব বানিয়েছে, বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টি করেছে, আমাদের তৈরি করেছে— তা হলে সে নিজেকে রক্ষার জন্য, নিজের সৃষ্টি রক্ষার তাগিদে রক্ষাকর্তা হিসেবেও কিছু বস্তু, প্রাণী তৈরি করতে সক্ষম। তাই না?”

সন্দীপ মাথা নিচু করল। প্রফেসরকে বরাবরই সে অমলিন শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আজকের বক্তব্য তার মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে। হ্যাঁ, নিখাদ তর্কের খাতিরে দেখলে স্যারের কথা এক ঝটকায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

“ইলেকট্রিক বাইক বা গাড়ি তো দূষণ ছড়ায় না। তা হলে তাদেরকেও আটকে ফেলার যুক্তি কী?”

অরুণাভ দস্তিদার সামান্য হাসলেন, “ওই সব গাড়ি যে-ইলেকট্রিক ব্যবহার করে, তার উৎসের অধিকাংশই তো জীবাশ্ম-জ্বালানি। ফলে পরোক্ষ ভাবে ব্যাপারটা তেমন আলাদা উপকারী হয়ে উঠছে না। বরং উল্টোই।”

সন্দীপ মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, এই দিকটা তার মাথায় আসেনি।

“আমরা যদি এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিই, তা হলে আর কোনও বিপদ ঘটবে না। আমরা মানিয়ে নিতে চাইনি। অবশ্য মানুষের স্বভাবই তাই। আমরা হেরে যেতে পছন্দ করি না,” প্রফেসর মাথা নাড়লেন আক্ষেপ সহকারে, “কিছু দিনের মধ্যেই উড়ন্ত গাড়ি এসে যাবে। জানি না, এর প্রতিক্রিয়া কী ঘটবে, কতটা ভয়ঙ্কর ঘটবে। হয়তো ওই উড়ন্ত বাহন বাণিজ্যিক ভাবে আসার আগেই কিছু ঘটে যাবে। নিজের নিকট ভবিষ্যৎ, নিজের আনন্দের কথা ভাবতে-ভাবতে আমরা বহু বছর ধরে মাদার নেচারকে অবজ্ঞা করে আসছি, জেনেশুনেই। তাই না? সবারই সহ্য করার একটা সীমা থাকে।”

“এই থিয়োরির কথা আমাকেই প্রথম বলছেন?”

“না। আন্তর্জাতিক স্তরে জানিয়েছি। কেউ বিশ্বাস করেনি। গুরুত্ব দেয়নি কানাকড়িও,” প্রফেসর মাথা ঝাঁকালেন হতাশ ভঙ্গিতে, “দড়িটা খুব জরুরি একটা সিম্বল। শক্তির প্রতীক। ব্যাখ্যাতীত ক্ষমতার এই নমুনা পাওয়ার পরেও কেউ কেন খতিয়ে ভাবেনি বলতে পারো?”

সন্দীপ নরম গলায় বলল, “দুশ্চিন্তা করবেন না। দেখাই যাক...”

কথা শেষ করার আগেই বাইরে একটা হইহল্লা শোনা গেল। চিৎকার নয়, বরং সমবেত হর্ষধ্বনি। দু'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দরজা খুলে বাইরে গেল। আশপাশের ছাদ লোকে লোকারণ্য। রাস্তায় ভিড়। সবার দৃষ্টি উপর দিকে। সন্দীপ চোখ তুলে তাকাল।

দড়িগুলো এক-এক করে ছেড়ে দিচ্ছে ধরে রাখা গাড়িদের অবশিষ্ট টুকরো। উঠে যাচ্ছে উপরে সড়সড় করে, মারাত্মক গতিতে। বাতাস কেটে উপরে ধেয়ে যাওয়ার একটা শিরশিরে শব্দ মিশে যাচ্ছে আবহাওয়ায়।

তা হলে শেষমেশ বিদায় নিচ্ছে নাকি বজ্জাতদের দল! বাঁচা যাবে। মুখ হাসিতে ভরিয়ে দড়িদের বিদায়-যাত্রা দেখতে লাগল সকলে। আকাশ থেকে নজর সরাচ্ছে না কেউ। প্রত্যেকের মন উদ্বেলিত হচ্ছে স্বচ্ছ আনন্দে। অনাবিল স্বস্তি ধুইয়ে দিচ্ছে তাদের।

এই আনন্দ বেশি ক্ষণ বজায় রইল না।

দড়িদের শেষ চিহ্ন দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার আগেই আকাশ লহমায় ঢেকে গেল পিঙ্গল বর্ণের এক আস্তরণে। সেই সঙ্গে অগুনতি ভারী ঢাকের শব্দের মতো গর্জনের প্রবাহ কাঁপিয়ে দিতে থাকল চামড়া ও রোমকূপ। শব্দটা কানে তালা লাগাচ্ছে না, অথচ তার ঘন স্রোতের ধাক্কা অনুভূত হচ্ছে। সূর্য আড়াল হয়ে যাওয়ায় এই গ্রহ আপাদমস্তক মুড়ে গেল ছায়ায়। কিসের ছায়া?

প্রথম ঝলক দেখায়, বিশ্ব জুড়ে সকলের ওটাকে বিশ্রী আকৃতির, বিপুল আয়তনের কোনও বদখেয়ালি মেঘ বলেই মনে হয়েছিল। খানিক পরে বোঝা গেল ওই আস্তরণ, অবিশ্বাস্য রকমের বিশাল এক প্রাণীর রক্ত-মাংসের জ্যান্ত মুখ। মুখটাকে প্রথাগত সৌন্দর্যের একদম উল্টো কোনও নিয়ম অনুসরণ করে সযত্নে নির্মাণ করা হয়েছে। চোখে পাতা নেই। ভুরু নেই। নাক, মুখের দুই দিকে বেঁকে কান পর্যন্ত উঠে গেছে। পেল্লায় চোয়াল। দাঁত নেই। ঠোঁটের মাঝের অংশ দখল করে রেখেছে তীক্ষ্ণ চেরা জিভ।

পলকে নিথর হয়ে গেল সমস্ত আনন্দ-উল্লাস। নিথর হয়ে গেল এলাকা।

শুরুতে মুখ, তার পর আস্তে-আস্তে দেখা গেল সমস্ত শরীর। শরীরটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। মানে, নেমে আসছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গর্জনের অভিঘাত। দেহে একটা অদৃশ্য চাপ টের পাচ্ছে সবাই। আর্তনাদ ও বিলাপে মুখর হয়ে উঠেছে অল্প আগের উচ্ছ্বসিত পরিমণ্ডল। অসহনীয় রকমের উষ্ণ হয়ে উঠছে পরিবেশ।

পৃথিবীর দুই গোলার্ধে হাজির হয়েছে এমন দুই চেহারা। কী হচ্ছেটা কী!

প্রফেসরের হাসি শুনতে পেল সন্দীপ। উন্মাদের হাসি। বলছিলেন, “আমাদের উপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি। তাই পাঠিয়েছে ধ্বংসের অনুচরদের।”

দুই বাক্যে ‘কর্তা’-র অনুল্লেখ সত্ত্বেও, কাকে নির্দেশ করা হচ্ছে, ধরতে অসুবিধে হল না সন্দীপের।

ছবি: *সুমন পাল*

ভ্যাম্পায়ার ব্যাট

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার এই প্রাণী নিঝুম অন্ধকারেই থাকতে ভালবাসে।

জয় সেনগুপ্ত

নামটা উচ্চারণ করলেই শিহরন জাগে, শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের স্রোত বয়ে যায় টাবলুর। ছবিটা দেখার পর প্রথম তিন রাত চোখ বুজলেই মনে হত, এই বুঝি গায়ের কাছে এসে বসেছে কালো কুচকুচে প্রাণীটা!

কিছু দিন আগে ছোটমামার সঙ্গে 'হররস অফ ড্রাকুলা' ছবিটা দেখে এসেছে টাবলু। কাউন্ট এমনিতে নিপাট ভদ্রলোক, কিন্তু গভীর রাতে তিনি হয়ে যান রক্তপায়ী বাদুড়— এক ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ার। তার পর মানুষের গলায় দাঁত বসিয়ে তিনি রক্ত পান করেন। যার গলায় সেই বাদুড় কামড়ায়, সে-ও পরিণত হয় রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়ারে। কিন্তু এ তো নেহাতই গল্প। ব্রাম স্টোকার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যা লিখেছিলেন। বাস্তবে মানুষ কখনও রক্তপিপাসু বাদুড় হতে পারে না।

অন্ধকারের বাসিন্দা

মানুষ ভ্যাম্পায়ার হতে না-ই বা পারুক, 'ভ্যাম্পায়ার ব্যাট' নামে প্রাণীর অস্তিত্ব কিন্তু সত্যিই আছে। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার শুষ্ক এবং আর্দ্র অঞ্চলে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট এক সঙ্গে অনেকে, এক-একটা কলোনি করে থাকে। বিশেষ করে মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলে ইত্যাদি রাষ্ট্রে এদের বিচরণ।

ঘোর অন্ধকারে, যেখানে আলো প্রবেশ করার কোনও উপায় নেই, সে রকম গুহা, অব্যবহৃত পুরনো কুয়ো, ফাঁপা গাছ বা পরিত্যক্ত বাড়িতে এক সঙ্গে ঝাঁকে-ঝাঁকে থাকে এরা। এখনও পর্যন্ত মোট তিন প্রজাতির ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

যেমন, ‘হেয়ারি-লেগড ভ্যাম্পায়ার ব্যাট’, ‘হোয়াইট উইংড ভ্যাম্পায়ার ব্যাট’ আর ‘কমন ভ্যাম্পায়ার ব্যাট’। দু’পাশে ডানা মেলে থাকা অবস্থায় একটা পূর্ণবয়স্ক বাদুড়ের দৈর্ঘ্য আট ইঞ্চির মতো, কিন্তু এদের শরীরটা খুব ছোট, প্রায় আমাদের বুড়ো আঙুলের সমান।

খাদ্যতালিকা

খুব অদ্ভুত বিষয় হলেও এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটির খাদ্যতালিকায় রক্ত ছাড়া আর কিছুই নেই। এরা দিনের বেলা ঘুমিয়ে কাটায়, অন্ধকার জায়গায়। আর যেই রাত্রি নামে পৃথিবীর বুকে, তখন শিকার ধরতে বেরোয়। শিকার মানে গরু, ছাগল, শূকর, ঘোড়ার মতো প্রাণী। এদের রক্ত শুষে খায় এরা। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এরাই এক মাত্র প্রাণী, যারা সাধারণত ঘুমিয়ে থাকা জীবন্ত প্রাণীর রক্ত খেয়েই জীবন ধারণ করে। পশু-পাখির রক্ত খেয়ে জীবন কাটালেও, হাতের কাছে পেয়ে গেলে মানুষকেও এরা ছাড়ে না। তবে তা খুবই কদাচিৎ ঘটে। প্রতি রাতে একটি বাদুড়কে তিরিশ গ্রামের মতো রক্ত খেতে হয়। শিকারের অভাবে পর পর দু’রাত যদি কোনও বাদুড় উপোস করতে বাধ্য হয়, তা হলে তার মৃত্যু অবধারিত। তবে এদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালবাসা খুব প্রখর। কোনও ভ্যাম্পায়ার ব্যাট যদি ক্ষুধার্ত থাকে, তখন স্ত্রী-বাদুড় নিজের পেটে পর্যাপ্ত রক্ত থাকলে, তা উগরে দেয়। না-খেয়ে থাকা বাদুড়গুলো তখন তা পান করে খিদে মেটায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, বাচ্চা জন্মানোর পর তিন মাস পর্যন্ত রক্ত নয়, সে তার মায়ের দুধ খেয়েই বেঁচে থাকে।

শিকার খোঁজার কৌশল

ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের শিকার সন্ধান করার ব্যাপারটি প্রাণিবিজ্ঞানীদের বেশ অবাক করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে এরা বিজ্ঞানের সাহায্য নেয়। কী রকম? এদের চ্যাপ্টা নাকে এক বিশেষ ধরনের তাপ-সংবেদী অঙ্গ রয়েছে। এই অঙ্গের সাহায্যে যাকে বাদুড়টি শিকার করবে, তার চামড়ার ঠিক কোন জায়গায় রক্তের স্রোত বইছে খুব মসৃণ ভাবে, অর্থাৎ রক্তনালী, তা এরা খুঁজে বের করতে পারে। প্রাণিবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, এই বাদুড়দের মস্তিষ্কে ইনফ্রারেড রিসেপ্টর থাকে, যা অন্ধকারে শিকারের অবস্থান বুঝতে সাহায্য করে। অন্ধকারে বাদুড় চলাফেরা করে কী ভাবে? বাদুড় রাতের বেলা উড়ে বেড়ায় আলট্রাসনিক শব্দতরঙ্গের সাহায্যে। শব্দতরঙ্গদের কম্পাঙ্ক মাপা হয় হার্জ একক দিয়ে। ২০-২০,০০০ হার্জ-এর কম্পাঙ্কের শব্দ মানুষ শুনতে পায়। এর চেয়ে বেশি বা কম কম্পাঙ্কের শব্দ মানুষ শুনতে পায় না। বাদুড় ওড়ার সময় ২০,০০০ হার্টজ়-এর চেয়ে বেশি কম্পাঙ্ক তৈরি করে। এই তরঙ্গ সামনের বস্তুতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। তাতেই তারা বুঝতে পারে, সামনে কোনও কিছু রয়েছে কি না। কিছু থাকলে বাধা এড়িয়ে দিক ঠিক করে।

শিকার ও শিকারি

আগেই বলা হয়েছে এই বাদুড়রা সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটায় আর গভীর রাতে যখন প্রায় সব স্তন্যপায়ী প্রাণীই ঘুমন্ত, তখন তাদের আক্রমণ করে। প্রথমে দাঁত বসিয়ে দেয় শিকারের চামড়ায়। এদের দাঁত খুব ধারালো ও লম্বা। ফলে খুব সহজেই চামড়ায় একটা ফুটো হয়ে যায়। এ বার সেই ফুটো দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে। এক টানা আধ ঘণ্টা রক্ত খেয়ে গেলেও শিকার তা বুঝতে পারে না। আর কোনও ব্যথাও অনুভূত হয় না। আসলে এই বাদুড়ের লালায় এমন এক ধরনের প্রোটিন আছে, যেটা শিকারের দেহ থেকে বেরোতে থাকা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। প্রোটিনটির নাম ড্রাকুলিন। নামটা অদ্ভুত, তাই না? ড্রাকুলার সঙ্গে বেশ মিল পাওয়া যাচ্ছে! তবে মানুষ বা অন্য প্রাণীর খুব সামান্য পরিমাণ রক্ত এরা পান করে থাকে— মাত্র এক কিউবিক সেন্টিমিটার বা এক গ্রাম। এতে কোনও ক্ষতি হয় না। এদের দংশনের ফলে শিকারের শরীরে জলাতঙ্ক ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। এমনিতে এই বাদুড়কে প্রাণী হিসেবে নিরীহই বলা যেতে পারে। শুধু বেঁচে থাকার জন্যই এদের রক্ত খেতে হয়।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

মৃতের সঙ্কেত

রাজেশ বসু

নভেম্বরের তেইশ আজকে। বিকেল প্রায় পাঁচটা। বসে আছি রোমানিয়ার রাজধানী শহর বুখারেস্টের সিটি সেন্টারের কাছে এক নামী হোটেলের রেস্তরাঁয়। বাইরে বেরিয়ে একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বেজায় শীত। তাপমাত্রা তিন-চার ডিগ্রিতে নেমে গেছে। তা ছাড়া ঘণ্টা খানেক ধরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়েই চলেছে। অগত্যা বেরোনো মুলতুবি রেখে রাদাউতি নামে এখানকার জনপ্রিয় একটি সুপ নিয়ে বসেছি।

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

কুচি করা মাংসে নানা রকম সব্জি আর ক্রিম মেশানো গরম পদ। জিভে ছ্যাঁকা লাগলেও আরাম হচ্ছে খুব।

আমি একলা নই, সঙ্গে রয়েছে আমার আইরিশ বন্ধু ও সহকর্মী মার্ক রবার্টসন। ইউরোপবাসী হলেও রোমানিয়ায় সে এই প্রথম বার এসেছে এবং ক্রমাগত আক্ষেপ করে চলেছে, আগে আসেনি বলে। আমি অবশ্য বছর তিনেক আগে এক বার আসি আর তখনই মুগ্ধ হয়ে যাই। প্রাচীনত্ব, আধুনিকতা আর নির্মল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে ভারী সুন্দর দেশ এই রোমানিয়া। মানুষজনও খুব মিশুকে আর অতিথিবৎসল। তাই ছুটি পেতেই সোজা চলে এসেছি এখানে। একেবারে টানা দিন পনেরো থাকার পরিকল্পনা আছে এ বার। তা ছাড়া টিকা আবিষ্কার হওয়ায় কোভিড বিধিও একটু শিথিল এখন। তবে রাস্তায় সে রকম ভিড় না-হলেও এই হোটেলে লোকজন ভালই এখন।

এর কারণ অবশ্য অন্য, বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত একটি বিজ্ঞান সম্মেলনে দেশের কিছু বিজ্ঞানী ও গবেষক এসেছেন এখানে। এই হোটেলেরই মূল সভাকক্ষে সম্মেলনের আয়োজন। ফলত ভিড় একটু রয়েছেই। অবশ্য যত দূর জানি, প্রত্যেককেই কোভিড নেগেটিভ এবং সম্পূর্ণ টিকাকরণের শংসাপত্র দেখিয়ে ঢুকতে হয়েছে আমাদের মতো।

সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত সেমিনারের সময় ছিল। যেটা আধ ঘণ্টাটাক হল শেষ হয়েছে। অনেকেই দেখছি চলে এসেছেন খাদ্য বা পানীয়ের স্বাদ গ্রহণে।

মার্ক ইতিমধ্যে সুপ শেষ করে ফেলেছে। বলল, "ঠান্ডাটা কাটছে না ঠিক! কফি নেওয়া যাক। কী বলো?"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিয়েছি, পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, "ভেরি গুড। তবে দু'কাপ না, তিন কাপ বলো, প্লিজ়।"

ফিরে দেখি জিন্‌সের উপরে মোটা পুলওভার আর মাস্ক পরা বছর তিরিশ-বত্রিশের এক জন যুবক, গায়ের রং আমার মতোই বাদামি। হাইটও তাই, ছ'ফুটের কাছাকাছি। তবে বুকের ছাতি আমার চেয়ে অনেকটাই চওড়া। মাথায় একটা কান-ঢাকা বিনি ক্যাপ।

"প্রফেসর রবার্টসন অ্যান্ড প্রফেসর ভাস্কর আচারিয়া, রাইট?"

'রাইট,'' বলল মার্ক।

"তোমাদেরকে দেখে যে কী ভাল লাগছে বোঝাতে পারব না,

অনুমতি দিলে বসতে পারি তোমাদের সঙ্গে,'' মুখের মাস্কটা চিবুক পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে বলল সে, "চিনতে পারছ আশা করি, আমি রিকার্ডো, রিকার্ডো...''

"বুগনার,'' বাধা দিয়ে বলল মার্ক, "তবে অনুমতির আর প্রয়োজন কী, কফির তদ্বির তো করেই দিয়েছ।''

সলজ্জ হাসল সে, "সরি, আসলে তোমাদেরকে এখানে দেখে এত..."

"আছ কেমন, সেমিনারে এসেছ নিশ্চয়ই?" আবার বাধা দিয়ে বলল মার্ক।

এ বারে আমিও চিনেছি। আমাদের কর্মক্ষেত্র জার্মানির উলম বিশ্ববিদ্যালয়ে জীব-পদার্থবিদ্যার একটা প্রজেক্ট ওয়ার্কে এক বছর মতো মার্কের সঙ্গে কাজ করেছিল সে। মূলত বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। কোনও একটা সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকত এদের পূর্বপুরুষ। রিকার্ডোর জন্ম অবশ্য এই দেশেই শুনেছি।

যাই হোক, ধূমায়িত কফির সঙ্গে তিন জনে মিলে একটু আড্ডা হল। সেমিনার বা বিজ্ঞান সম্মেলনেই এসেছে রিকার্ডো। মূলত জৈব প্রযুক্তির উপর সম্মেলন। দেশীয় বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাপত্র পড়েছেন। বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রিকার্ডো বলল, "অধিকাংশই সাধারণ আইডিয়া হলেও তাক লাগানো গবেষণাও কিছু আছে। আমরাও একটা দুর্দান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করছি। যদিও সেটা এখানে ইচ্ছে করেই আলোচনা করা হয়নি।''

"মানে বিষয়টা আপাতত গোপন রাখতে চাইছ, তাই তো?'' গরম কফির শেষটুকু এক ঢোকে শেষ করে বলল মার্ক।

"সে তো বটেই। অন্তত যার তত্ত্বাবধানে কাজ করছি, তার এটাই ইচ্ছে। তবে তোমাদের কিছুটা বলব। সঙ্গে অবিশ্বাস্য এমন কিছুও বলব, যা তোমরা ছাড়া কাউকে বলাও যায় না। আসলে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, ক'দিন ধরে তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। এ ভাবে দেখা হয়ে গেল,'' একটু যেন চিন্তাগ্রস্ত গলায় বলল রিকার্ডো।

"কী হে, কোনও গোলমালে জড়াওনি তো? সিরিয়াস কিছু না আশা করি," ভুরু কুঁচকে বলল মার্ক।

হাত কচলাল রিকার্ডো। লক্ষ করলাম দু'চোখের নীচে যেন রাত জাগার চিহ্ন। আমতা-আমতা করে বলল, "সে রকম কিছু না। তবে বিষয়টা এমন অদ্ভুত, জানি না কী ভাববে তোমরা! মারিয়াস ভাকারেস্কুকে জানো তো? অপ্টোগ্রাফি নিয়ে কাজ করেছিলেন একটা সময়। অপ্টোগ্রাফি জানো নিশ্চয়ই, মৃত্যুর চরম মুহূর্তে মানুষের চোখের রেটিনায় সে যা দেখেছে ধরা থাকে। ক্যামেরায় তোলা ফটোর মতো ডেভলপও করা যেতে পারে সে দৃশ্য।''

"আর সে ফটোকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে অপ্টোগ্রাম,'' বলল মার্ক, "ব্যাপারটা হাইপোথেটিক্যালি হয়তো ঠিক। কিন্তু কার্যকরী ভাবে এখনও এটা করা সম্ভব হয়নি। কল্পবিজ্ঞান বা গোয়েন্দা গল্পের থিম বলতে পারো। যেখানে খুন করার মুহূর্তে আততায়ীর চেহারা থেকে যাচ্ছে ভিকটিমের চোখের রেটিনায়, এ বারে তা ডেভলপ করে নিলেই খুনি গ্রেফতার। তা হলে এটাই তোমাদের গোপন গবেষণা।"

"বিষয়টা আমিও জানি। চোখের রেটিনায় যে রড কোষ থাকে তার মধ্যে আছে রোডোপসিন নামে আলোক-সংবেদী পিগমেন্ট বা রঞ্জক। এই রোডোপসিনের মাত্রা কৃত্রিম উপায়ে বাড়াতে পারলে রেটিনাকে ফটোগ্রাফিক নেগেটিভের মতো ব্যবহার করা সম্ভব। এ নিয়ে প্রচুর কাজকর্ম হয়েছে। যদিও সে ভাবে সত্যিই কিছু ফলপ্রসূ হয়নি এখনও। তবে মারিয়াস ভাকারেস্কু নামে কাউকে চিনি বলে মনে পড়ল না। লেখাপড়া সব নাকি আমেরিকায়। সেখানে কোনও একটি নামী প্রতিষ্ঠান থেকে চোখের ডাক্তারি পাশ করে। কিন্তু ডাক্তারি না-করে গবেষণায় আসে। এই অপ্টোগ্রাফি নিয়ে গবেষণাটা, সে দেশেই নাকি শুরু করেছিল একটা সময়। অনেক বছর মুলতবি ছিল, এখন আবার শুরু করেছে।"

"তবে কিন্তু একটা কথা," বলল রিকার্ডো, "মারিয়াস ভাকারেস্কুই বলো বা আমি, প্রকৃতপক্ষে আমরা দু'জনেই সহকারী মাত্র। মূল কাজটা করছেন প্রফেসর বরিস ডেফনার।''

"বরিস ডেফনার,'' বিড়বিড় করল মার্ক, "উঁহু, চিনি না মনে হচ্ছে।''

রিকার্ডো বলল, "না-চেনারই কথা। রোমানিয়ার এক জন খুবই প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী। কিন্তু একটু খামখেয়ালি গোছের। প্রচারের আলোয় থাকবেন না। অথচ বিজ্ঞানের কত শাখায় দক্ষতা। তিনিও এই অপ্টোগ্রাফি নিয়েই ভাল কাজ শুরু করছিলেন। কিন্তু বছর কুড়ি আগে এক মাত্র ছেলে পথ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর সব রকম গবেষণা ছেড়ে দেন। স্ত্রী-ও মারা গেছেন আগেই। ছেলেই সব ছিল তাঁর, বুঝতেই পারছ, শোকে পাথর হয়ে পড়েন। ডক্টর ভাকারেস্কুই প্রফেসর ডেফনারকে রাজি করিয়ে ফের গবেষণায় নিয়ে আসে। আমাকেও নির্বাচন করা হয়। কাজও ভাল এগোচ্ছিল। ঘটনা হচ্ছে, এমনই সময়ে প্রফেসর ডেফনার আচমকা মারা যান। মৃত্যুটা স্বাভাবিক না। আমরা যেখানে কাজ করছি, সেটা আটশো বছরের প্রাচীন একটা প্রাসাদ। পোশাকি নাম জিওফ্রি ম্যানসন। বিশাল আয়তন, একদম দুর্গের ধাঁচে তৈরি। রিটেজাট পাহাড়ের কোলে জায়গাটা। প্রাসাদেই থাকি সবাই। ভোরে উঠে হাঁটার অভ্যেস ছিল প্রফেসরের। সে দিনটা অবশ্য বিকেলে বেরোন। হাঁটতে-হাঁটতে হয়তো পাহাড়ের একেবারে ধারে চলে গেছিলেন। ছিয়াত্তর বছর বয়স। কোনও ভাবে পা ফসকে নীচে পড়ে যান। সে দিন আমি ম্যানসনে ছিলাম না। বুখারেস্টে আসি একটা কাজে। মাত্র দিন পনেরো আগের ঘটনা। প্রফেসর এই সম্মেলনে আসতে রাজিও হয়েছিলেন। বুঝতেই পারছ কী রকম দুঃখের ব্যাপার।''

মার্ক বলল, "তা তো বটেই। কিন্তু একটা জিনিস বুঝলাম না, শহরে এত জায়গা থাকতে ও রকম খাঁ-খাঁ মুলুকে ঘাঁটি করলে কেন তোমরা?"

রিকার্ডো বাকি কফিটুকু গলায় চালান করে ছোট একটা ঢেকুর তুলে বলল, "এ বুদ্ধি ডক্টর ভাকারেস্কুর। তিনি বিশাল ধনী, অর্থবান, প্রতিপত্তিশালী মানুষ। কী ভাবে এত টাকা করেছেন, তা জিজ্ঞেস কোরো না, বলতে পারব না। উত্তরাধিকার বিহীন প্রাসাদটি পড়েই ছিল। উনি সরকারের কাছ থেকে কিনে ভোল পাল্টে দেন। আধুনিক সব যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এনে দুর্দান্ত একটা ল্যাবও বানিয়ে ফেলেন। চার দিক নিরিবিলি, নির্জন। যাই বলো, নিভৃতে গবেষণার জন্য কিন্তু দারুণ জায়গা। ব্যবস্থা দেখেই হয়তো প্রফেসর ডেফনার রাজি হয়েছিলেন।"

"বুঝলাম," বলল মার্ক, "কিন্তু সঙ্গে অবিশ্বাস্যও কিছু আছে বলছিলে, সেটা কী?"

মাথা চুলকাল রিকার্ডো, "নিজে বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছি, কী করে যে বলি! ক'দিন ধরেই আজগুবি সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে ম্যানসনে। মাঝে-মধ্যেই মনে হচ্ছে কে যেন আমার পাশে-পাশে ঘুরছে। তার উপর সারা রাত ধরে অস্ফুট গলায় কুকুরের কান্নার আওয়াজ। এখানে আসার পর গত দু'দিন ধরে আওয়াজটা এমন শুরু হয়েছে, রাতে ঘুমোতেই পারছি না। মজার কথা, এ অভিজ্ঞতা কেবল আমার একারই হয়তো। ম্যানসনে আরও পাঁচ-সাত জন থাকে। দু'-এক জনকে কায়দা করে জিজ্ঞেস করে দেখেছি। তাদের যে এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে, মনে হল না। কেবল মিসেস দাচিয়ানা, প্রাসাদের হাউসকিপার, তিনি স্বীকার না-করলেও কেমন যেন এড়িয়ে গেলেন। ডক্টর ভাকারেস্কুকে এখনও কিছু বলিনি অবশ্য। জানি না, তাঁরও এরকম কোনও অভিজ্ঞতা হয়েছে কি না।''

মার্ক হেসে বলল, "তা আটশো বছরের প্রাচীন প্রাসাদ বা কেল্লায় দু'-চারটে ভূত তো থাকবেই, কী বলো ভাস্কর?"

আমি অবশ্য একটু গুরুত্ব দিলাম রিকার্ডোকে। আসলে বছর তিনেক আগে এই রোমানিয়াতেই আমার এক অভিজ্ঞতা হয়, যার প্রকৃত ব্যাখ্যা আজও আমি সঠিক ভাবে করে উঠতে পারিনি। আর সেটা হয়েছিল হাজার বছরের পুরনো এক দুর্গেরই মধ্যে। সুতরাং ও যা বলছে সত্যি না মিথ্যে তা পরের কথা, আগে শোনা যাক কী বলতে

চায়। তা ছাড়া চোখের নীচে অনিদ্রার চিহ্ন তো দেখতেই পাচ্ছি।

বললাম, "তুমি কি বলতে চাও, প্রফেসর ডেফনারের মৃত্যুর পরই এ সব শুরু হয়েছে?"

মার্কের দিকে এক পলক চেয়ে মাথা দোলাল রিকার্ডো, "হ্যাঁ, আমার সেটাই ধারণা। তা ছাড়া একটা কথা বলা হয়নি, প্রফেসর ডেফনারের একটা পোষা কুকুর ছিল। বেন। বয়স হয়েছিল। প্রফেসর ওকে সঙ্গে নিয়েই হাঁটতে যেতেন। ঘটনা হল, প্রফেসরের দুর্ঘটনার পর থেকে কুকুরটিও নিখোঁজ। অন্তত এখনও পর্যন্ত। জানি না, পুলিশ এখনও খুঁজছে, না হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"মানে, তোমার ধারণা কুকুরটিও মারা গেছে এবং তার আত্মাই প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ম্যানসনে," হেসে বলল মার্ক।

শুকনো হাসল রিকার্ডো, "ইয়ে, মানে কী বলব! পাগল ভাবছ আমাকে? কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করি কী করে। খুব ভাল হত তোমরা দু'জনে যদি দু'-চার দিন ওখানে কাটিয়ে আসতে। থাকার জায়গার অভাব নেই। আমি নিজেও রয়েছি মাস কয়েক। গবেষণা মোটামুটি যদ্দিন চলবে তদ্দিন পর্যন্ত পরিবার সমেত নিখরচায় থাকার চুক্তি। আমার অবশ্য পরিবার নেই, বিয়ে-থা করিনি। বাবা-মা অনেক দিন চলে গেছেন। একলা সন্তান। সুতরাং আমার অতিথি হয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো দিন কয়েক। তা ছাড়া এটাও ঠিক, তোমাদের পরিচয় পেলে ডক্টর ভাকারেস্কু নিজেই বিগলিত হয়ে পড়বেন। সত্যি বলতে, তাতে আমারও কদর বাড়বে একটু।"

মার্ক বলল, "প্রস্তাব মন্দ না। ছুটি কাটাতেই বেরিয়েছি। গেলেও হয়। আটশো বছরের প্রাচীন ফোর্ট বা প্যালেস, যাই বলো, অভিনব অভিজ্ঞতা হবে একটা।"

॥ ২ ॥

আজকে রবিবার। নভেম্বরের আটাশ। শেষমেশ চলে এসেছি মারিয়াস ভাকারেস্কুর জিওফ্রি ম্যানসনে। আজকে না, গত কাল। তবে দুঃখের কথা হল, মার্ক থাকতে পারল না। ডাবলিনে তার বাবা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ায়, সে আজ সকালেই দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। এখানে ধন্যবাদ দিতে হয় মারিয়াসকে। মার্কের জরুরি ফ্লাইটের টিকিটের সে-ই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয় সে দিনই, রিকার্ডোর সঙ্গে কথা বলার পরেই।

ব্যাপারটা এ রকম, বিল মিটিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছি তিন জনে, দেখি এক জন বেঁটেখাটো রোগা-পাতলা ক্ষয়াটে চেহারার ব্যক্তি এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। পরনে দামি সুট। দামি জুতো। চোখে ফিনফিনে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা। চৌকো মুখ। চাউনির মধ্যে কেমন একটা চতুরতা। আমাদের তিন জনের মতো ক্লিন শেভেন। মাথায় প্রায় পুরোটাই টাক, পিছনে আর কানের পাশে অল্প কিছু সাদা চুল। সঙ্গে খুব লম্বা করে আর এক জনও ছিলেন। কেউই মাস্ক পরেননি।

রিকার্ডো "ডক্টর ভাকারেস্কুও এসেছেন দেখছি," বলে বিড়বিড় করছে। মার্ক চাপা গলায় বলল, "আমরা তোমার বন্ধু আর জার্মানিতে ছাত্র পড়াই, এটুকুই বলবে।"

এ কথা বলার কারণ, বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে বিজ্ঞানকে জড়িয়ে কোনও রহস্যের খোঁজ পেলে সেটা সমাধানের জন্য বেশ আগ্রহী হয়ে পড়ি আমরা। সৌভাগ্যের বিষয়, কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্যও পেয়েছি। ফলে চেনা মহলে একটু পরিচিতিও হয়েছে। যদিও আমরা বিষয়টা গোপনই রাখতে পছন্দ করি।

যাই হোক, মারিয়াস দেখলাম আমাদের চেনে না। তবে জার্মানির উলম ইউনিভার্সিটিতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক-গবেষক জেনে বেশ খাতির করল। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর রিকার্ডোকে রোমানীয় ভাষায় কিছু বলে সে চলেই যাচ্ছিল। রিকার্ডো কথাটা তুলল, "এদেরকে বলছিলাম স্যর, ছুটিই যখন কাটাচ্ছে, আপনার ম্যানসনটা ঘুরে যেতে। আপনি যে ভাবে ওটার হাল ফিরিয়ে দিয়েছেন! তার উপর ওই রকম জায়গা, একদম প্রকৃতির মধ্যে, আমার অত বড় ঘর। আমার সঙ্গেই থাকতে পারে।"

মারিয়াস কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল রিকার্ডোর দিকে। তার পর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, "ঠিকই বলেছে রিকার্ডো। চলেই আসুন না আমার ওখানে। অন্য রকম অভিজ্ঞতা হবে। আর রিকার্ডোর রুমে কেন থাকবেন? চোদ্দোটা বেডরুম আমার ম্যানসনে। তার মধ্যে পাঁচটা রয়্যাল। ব্লু-বেডচেম্বারটা রেডি করে রাখব আপনাদের জন্যে। ট্রান্সপোর্ট নিয়েও ভাবতে হবে না। শুধু কবে যাবেন ঠিক করে রিকার্ডোকে বলে দিলেই হবে।"

মার্ক তো রাজিই। আমি একটু সঙ্কোচ করছিলাম। এটা ঠিক যে প্রফেসরের মৃত্যু বা রিকার্ডোর অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিষয়ে একটু কৌতূহল হয়েইছিল। তবু থাকাই তো না শুধু, খাওয়াদাওয়া আছে। রিকার্ডোকে চিনি ঠিক, কিন্তু গৃহকর্তার সঙ্গে সবে আলাপ। একেবারেই অচেনা। কিছুটা যেন গায়ে পড়েই আমন্ত্রণটা নেওয়া হল। শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছিল দু'-তিন দিন ভেবে জানাব রিকার্ডোকে।

কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে রিকার্ডো ফোন করে যেমন বলল, তাতে ঠিক করি দু'-তিন দিনের জন্য না-হয় ঘুরেই আসি। ঘটনা হচ্ছে, রিকার্ডোরা ফিরে যায় পর দিনই, চব্বিশ তারিখে। আর সে রাতে নাকি আবার সেই ভূতুড়ে অভিজ্ঞতা। এ বার মাত্রাও বেশি। ঘটনা একই, কুকুরের বিলাপ। তা-ও না-হয় ঠিক আছে, কিন্তু এ বারে অন্য কাণ্ড, পায়ের পাতায় কেমন ভেজা-ভেজা স্পর্শ। যেন কেউ ওর পায়ের পাতা চাটছে। কম্বল ধরেও টানছে। শেষে আলো জ্বালার পর সব বন্ধ হয়। ভয়ে বাকি রাত আর ঘুমোতেই পারেনি সে। ওর স্থির বিশ্বাস, প্রফেসরের কুকুরটির আত্মাই এ সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে। কারণ, সে নির্ঘাত মারা গেছে এবং সে জানে প্রফেসর ডেফনারের মৃত্যুও স্বাভাবিক না। কিছু বলার জন্যেই রিকার্ডোর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে সে। তা ছাড়া ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে শোয় রিকার্ডো, সুতরাং অন্য কেউ যে তাকে ভয় দেখাচ্ছে সে প্রশ্নও নেই। শুধু এই-ই না। আরও একটা নতুন কথা বলল, ল্যাবে প্রফেসর ডেফনারের শেলফে একটা নোটবুক পায় সে, উপরে বড়-বড় করে লেখা 'এসওএস', মানে 'সেভ আওয়ার সোলস' ছাড়া আর কী হতে পারে! অর্থাৎ প্রফেসর যে বিপদে পড়তে চলেছিলেন অথবা বিপদেই ছিলেন, বোঝাই যাচ্ছে। মারিয়াস ভাকারেস্কু পাশেই ছিল রিকার্ডোর, নোটবুকটা নিয়ে নেন। সে এটাকে পাত্তাই দেয়নি। বিষয়টা নাকি অন্য। সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের যাওয়াটা খুব জরুরি।

ফোনটা করেছিল মার্ককে। ও তখনই বলে দেয় যে আমরা যাচ্ছি। সত্যি বলতে তখনও আমার একটু গড়িমসি ছিল। ছুটি কাটাতে এসে আবার কোনও রহস্যে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল না।

যাই হোক, একটা দিন বাদ দিয়ে শনিবার এখানে পৌঁছই আমরা। বুখারেস্ট থেকে অনেকটাই দূর। প্রায় আট ঘণ্টা লাগল পৌঁছতে। কারপেথিয়ান পর্বতমালার দক্ষিণে রিটেজাট পাহাড়ি উপত্যকার একটা ঢালে পাথরের ভিতের উপর তৈরি তিন তলা বিশাল অট্টালিকা। কাস্‌লের ধাঁচেই তৈরি। চৌকো, ঢালু, পিচ্‌ড রুফ। রুফের চার প্রান্তে উঁচু-উঁচু চারটে গোল টাওয়ার, সেগুলোর মাথায় শঙ্কু আকৃতির চূড়া। টিপিক্যাল রোমানীয় প্রাচীন কাস্‌লগুলোয় যেমন থাকে।

আসার পথ একটু দুর্গমই বলতে হবে। মূল সড়কপথ থেকে বাঁক নিয়ে পাথুরে এবং প্যাঁচানো সরু পথে আরও তিরিশ মিনিট মতো যেতে হল আমাদের। রক্ষে, সূর্যের আলো ছিল মোটামুটি। চালক লোকটি বলছিল, বছরের এই সময়ে এ দিকে সারা দিনই প্রায় কুয়াশায় ঢাকা থাকে। নজর চলে না, সাবধানে গাড়ি চালাতে হয়। পাথরের পাঁচিল ঘেরা মস্ত লোহার মূল ফটকের সামনে যখন পৌঁছই, চার দিক মায়াবী রং ছড়িয়ে সূর্য প্রায় অস্তাচলে। হাতের ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে।

যাই হোক, আসল কথা যা বলছিলাম, মারিয়াস খাতির-যত্ন ভালই

করছেন আমাদের। দোতলায় পাহাড়ের ঢালমুখী অতিকায় একটি ঘর বরাদ্দ হয়েছে আমাদের থাকার জন্য। এটাই সেই ব্লু বেডচেম্বার। 'ব্লু' কারণ, নীল ক্যানোপি টাঙানো দু'টি বিলাস বহুল পালঙ্ক সমেত ঘরের সাজসজ্জায় নীল রঙের ছড়াছড়ি। দেওয়ালে নীল ওয়ালপেপার। উঁচু রিবড সিলিং। তাতে যে ঝাড়বাতি ঝুলছে সেটায়ও নীল রঙের ক্রিস্টাল। পায়ের নীচের নরম মখমলি কার্পেট, তার রঙও নীল। এ ছাড়াও জানলার পর্দা, সোফাসেট, চেয়ারের কুশন, বিছানার চাদর, পিলো-কভার, রেশমি-কম্বল, সবই নীল। বাথরুমে ঢুকে দেখলাম, সেটাও তা-ই। হালকা নীল দেওয়ালে বেসিন থেকে বাথটাব, গিজ়ার, জলের কলটল সবেতেই নীল রঙের বিভিন্ন শেড।

মার্ক খুব খুশি, "এ তো একেবারে ফাইভ স্টার হোটেলের রুম।"

"সে কালে লর্ড, লেডিরা থাকতেন এই সব ঘরে। ব্লু-বেডচেম্বার, রেড-বেডচেম্বার এ রকম নামে তৈরি হত এই সব প্রাইভেট বেডরুম। নামের রং মিলিয়ে ঘরের সাজ। গ্রেট-বেডচেম্বারও নামও হয়। সে আরও রাজকীয়। এ ম্যানসনেও আছে। সেটায় ডক্টর ভাকারেস্কু থাকেন। এই ঘরের ঠিক উপরে তিন তলায়," মার্কের কথার উত্তরে বলেছিলেন মিসেস দাচিয়ানা। এই ম্যানসনের হাউসকিপার। মারিয়াস আমাদের অভ্যর্থনা করে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। মিসেস দাচিয়ানাই আমাদের ঘর খুলে দেন। বছর ষাট-বাষট্টি বয়স। স্থূলকায়া হলেও চটপটে বেশ। এঁকেই রিকার্ডো তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল। সে-ও সঙ্গেই ছিল। চোখ টিপে বলে দিল, এখনই কিছু যেন না-বলি। তা অবশ্য আমরা বলতামও না। যদিও মার্ক একটু আলাপ জমিয়ে ফেলল ভদ্রমহিলার সঙ্গে। দেখলাম ভুরু কুঁচকে থাকাটা নিতান্তই অভ্যেস, আদতে মিসেস দাচিয়ানা মিশুকেই বেশ। কথা বলতে ভালবাসেন। ইংরেজিটাও ভাল।

বললেন, "এ অট্টালিকা আসলে কাস্‌লই ছিল একটা সময়। হাঙ্গেরির রাজ-পরিবারের ঘনিষ্ঠ এক অমাত্য তৈরি করে এই কাস্‌ল। তখন কারপেথিয়ান পাহাড়ের এই সব অঞ্চলে হাঙ্গেরি আর মলদাভিয়া রাজাদের জোর লড়াই। মোঙ্গলরাও হানা দিচ্ছে বারবার। এ সবের মধ্যে যদ্দুর শুনেছি, একটা সময় কাস্‌লের দখল যায় ওয়ালেচিয়ার ভ্লাদ পরিবারের হাতে। সবাইকে হটিয়ে তারাই তখন এই মুলুকের শাসনকর্তা। আইরিশ লেখক ব্রাম স্টোকার ওই ভ্লাদ পরিবারেরই এক জন, ভ্লাদ দ্য থার্ডকে রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে লিখল ড্রাকুলার গপ্পো। যা নিয়ে সিনেমা নাটক, কত কী! কিন্তু, গপ্পো গপ্পোই। লেখক নিজে যেমন কস্মিন কালেও এ তল্লাটে আসেনি, ভ্লাদ দ্য থার্ডও কখনও ট্র্যানসিলভানিয়ার ব্রান কাস্‌লে থেকেছেন কি না, তা নিয়েও অনেক তর্ক। পণ্ডিত মানুষেরা যা-ই বলুন, এটাই সত্যি। যদিও লোকজন ওটাকেই ড্রাকুলা, মানে ভ্লাদের কাস্‌ল বলে ভিড় জমাচ্ছে।"

হয়তো ঠিক। এই নিয়ে বিতর্ক আছেই। গত বার আমি যখন আসি, তখনই দেখে নিয়েছিলাম ব্রান কাস্‌ল। সেখানে এখন মিউজ়িয়াম হয়েছে। তবে এটা ঠিক যে স্টোকার সাহেবের কলমের এমন জোর যে, শুধু তার কাহিনি পড়েই কাস্‌ল দেখতে ছুটে আসে সবাই।

যাই হোক, আমরা মিসেস দাচিয়ানার কথায় সায় দিতে তিনি খুব খুশি! উৎসাহ নিয়ে ফের শুরু করলেন, "যা বলছিলাম, ভ্লাদদের হাতে কাস্‌ল গেল বটে, তবে তা কয়েক বছরের জন্যে। তুরস্ক থেকে অটোমানরাও হানা দিচ্ছে বার বার। শেষে একটা সময় ওদের হাতেই গেল কাস্‌ল। কিন্তু রাজচ্ছত্র যতই ক্ষমতাশালী হোক, কালের নিয়মে সে বিলীন হবেই। অটোমানরাও বিদায় নিল। ক্রমে এ দেশেরই এক ধনী অমাত্য কাস্‌লের মালিক হন। তিনিই এর নাম দেন জিওফ্রি ম্যানসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি এর দখল নিয়ে নেয়। যুদ্ধে জার্মানির পতন হলে কাস্‌লের দখল নেয় রুশ সৈন্য। বিশ্বযুদ্ধের পর তারাও চলে যায়। সেই থেকে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল এই কাস্‌ল বা ম্যানসন যা-ই বলো। রোমানি ভবঘুরেদের একটা দল কিছু দিন এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল শুনেছি। অবশ্য সে-ও অনেক কাল আগের কথা।"

"বাব্বা, এত কিছু জানেন, আমাকে বলেননি তো কখনও," রিকার্ডো বলল কপট অভিযোগের গলায়।

হাসলেন মিসেস দাচিয়ানা, "আমরা হলাম এই মুলুকের লোক। আর আমি ইতিহাস নিয়েই পড়েছি। মিস্টার দাচিয়ানা চলে গেছেন বছর দুয়েক। নিঃসন্তান আমরা। ডক্টর ভাকারেস্কু হাউসকিপারের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। টাকার আমার দরকার নেই। দরকার সময় কাটানোর। ইন্টারভিউ দিলাম। চাকরি হয়ে গেল। চলে এলাম। যদিও একটা কথা বলে রাখি, হয়তো কাজটা ছেড়ে দেব আমি।"

মনে হল, রিকার্ডো আমার পিঠে হাত ছোঁয়াল। জিজ্ঞেস করতে যাব, কেন, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ জরুরি কোনও কাজ মনে পড়ে যাওয়ায় বিদায় নিলেন ভদ্রমহিলা।

আমরাও ক্লান্ত ছিলাম খুব। ফ্রেশ হলাম প্রথমে। চা দেওয়া হয়েছিল ঘরে। সেটা পান করে যাই রিকার্ডোর ঘরে। আমাদের ঘরের একদম শেষ মাথায় একটা লোহার সিঁড়ির মুখে ওর ঘর। আমাদের ঘরের মতো অত বড় না-হলেও সে ঘরেও অনায়াসে তিন-চার জন হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারে। ঘরের মধ্যিখানে কিং সাইজ়ের বড় বিছানা। ফোরপোস্টার হলেও এর মাথায় চাঁদোয়া বা ক্যানপি নেই। তবে রিকার্ডো দেখলাম গোছানো মানুষ। ঘরটা বেশ পরিপাটি করে রেখেছে। বলল, "তোমাদের আরও একটা কথা বলিনি, চাদরে দু'ফোঁটা রক্তের দাগও দেখি সকালে উঠে। আসলে প্রথমে সেটা আমারই নজরে আসেনি। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। ম্যাট্রেসের নীচে রেখেছি ভাঁজ করে।"

বলতে-বলতেই সে চাদরটা টেনে বের করেছে। সিল্কের সঙ্গে কটন ফাইবার মেশানো মাখন-রঙা বেডশিট। কিন্তু, কথা হল, পুরো চাদরটা তিন জনে মিলে দেখেও কোনও রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেল না। স্বভাবতই ভাল রকম অপ্রস্তুত সে, "গুড হেভেন্স! ইটস ইমপসিবল! বিশ্বাস করো, একটুও ভুল দেখিনি আমি, পরিষ্কার রক্তের দাগ!"

মার্ক বলল, "কিছু মনে কোরো না। প্রফেসর ডেফনারের মৃত্যুতে একটা সাংঘাতিক শক তো হয়েইছে তোমার। এ রকম একটা প্রাচীন বাড়িতে রয়েছ। এর উপর যে কাজ করছ, সেটাও একটা গোলমেলে বিষয়। মাথায় চাপ তো পড়বেই।"

রিকার্ডো কয়েক সেকেন্ড কিছু ভাবল। তার পর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "চাপ কিন্তু আগে ছিল না। খুব সম্প্রতি হচ্ছে। কারণ, ডক্টর ভাকারেস্কু কেমন একটা ব্যবহার করছে যেন। অপ্টোগ্রাফির কোনও কাজে আমাকে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। অন্য কাজ করাচ্ছে। অপটিক্যাল নার্ভের উপর একটা রিসার্চ পেপার আছে ওর, সেটা বই হিসেবে ছাপবে, প্রুফ দেখছি বসে-বসে। এখন বলছে চক্ষু চিকিৎসার বিবর্তনের একটা ইতিহাস তৈরি করতে। বোঝো! মানে আমাকে এখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে বলছে। সরাসরি না-বলে কায়দা করছে। মোটামুটি এক বছরের চুক্তি করেছে, আমিও যাচ্ছি না।"

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মিসেস দাচিয়ানা এসে জানালেন, ডিনার রেডি। ডক্টর ভাকারেস্কু আজ একটু ব্যস্ত। আমাদের খাবার রুমেই দেওয়া হয়েছে। আগামী কাল এক সঙ্গে লাঞ্চ করবেন।

ঘড়িতে অবশ্য মোটে সন্ধে সাড়ে ছ'টা। কিন্তু, পশ্চিমের মুলুকে এটাই রীতি। সন্ধেতেই রাতের খাবার খেয়ে নেয় এরা। রিকার্ডোও ওর ঘরে খাবে। আমি আর মার্ক চলে এলাম আমাদের ব্লু-বেডচেম্বারের রয়্যাল রুমে। তখনও জানি না, পরের দিন থেকে বিশাল এই ঘরে একলা থাকতে হবে আমাকে।

॥ ৩ ॥

নভেম্বরের ঊনত্রিশ আজকে। সকাল দশটা বাজে। প্রথমেই বলে নিই, গত কাল রাতে মোটামুটি ভালই ঘুমিয়েছি। প্রথমটায় একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘুম আসতে চাইছিল না। মিসেস দাচিয়ানার বলা এই কাস্‌লের ইতিহাসটা ভাবছিলাম। কত বিচিত্র মানুষের আবেগ-

অনুভূতি, সুখ-দুঃখ আর ক্রূরতা-হিংস্রতারও সাক্ষী এই অট্টালিকা। সে সব মানুষদের চরিত্ররা কল্পনায় এসে ঢুকছিল মনের মধ্যে। শীতও করছিল খুব। ঘুম এক বারই ভেঙেছিল, কুকুরই ডাকছিল কোথাও যেন। ক্লান্ত থাকায় বা যে কারণেই হোক, ঘুমিয়ে পড়ি ফের।

সকাল ন'টায় ঘরেই প্রাতঃরাশ হাজির হল। মিসেস দাচিয়ানা নন, প্রায় তাঁরই বয়সি এক জন বৃদ্ধা সুদৃশ্য কাপ প্লেট, টি-পট, কাটলারি সব রুপোর ট্রে-তে সাজিয়ে রেখে গেলেন। ইনি ইংরেজি প্রায় বোঝেনই না। অতি কষ্টে বুঝলাম, তাঁর নাম এলভিরা আর মূলত তিনিই এই বাড়ির কুক।

দু'রাত্রি যেন এমনিই চলে গেল। এ ভাবে তো দিনের পর-দিন থাকা চলে না। ঠিক করলাম, প্রফেসর ডেফনার যেখান থেকে পড়ে গেছিলেন সে জায়গাটা দেখা দরকার। রিকার্ডো মোটামুটি বুঝিয়েও দিয়েছে জায়গাটা। বেশি দূর না, ম্যানসন থেকে বেরিয়ে গাড়ি-রাস্তা ধরে মিনিট কুড়ি হাঁটলে ঢাউস একটা গোল পাথর দেখতে পাব, সেটার ডান দিকে পাইনের সারি দেওয়া একটা সরু নুড়ি-পথ পড়বে। সামান্য হাঁটতেই পথের প্রায় উপরেই বিশাল একটা চ্যাটালো পাথর আসবে, যার কিছুটা পথ ছাড়িয়ে খাদের দিকে ঝুলে আছে ব্যালকনির মতো। প্রফেসর হয়তো ওটার একেবারে ধারে গিয়ে নীচে ঝুঁকেছিলেন। জায়গাটা বেশ খাড়াই। কোনও ভাবে পা ফস্কে নীচে পড়ে যান।

ভেবেছিলাম রিকার্ডোকে সঙ্গে নিয়ে যাব, কিন্তু সে আমার ঘরে এসে জানাল, মারিয়াসের বইয়ের কাজে বুখারেস্ট যাচ্ছে সে। আগামী কাল বিকেলের আগে ফিরতে পারবে না। কাজটা জরুরি, যেতেই হচ্ছে তাই। তবে রাতে গোলমেলে অভিজ্ঞতা আর কিছু হয়নি তার। আমাকে সঙ্গ না-দিতে পারার জন্যও একটু দুঃখ প্রকাশ করল সে। কেমন একটু চিন্তিতও মনে হল ওকে।

বললাম, "আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না, তোমার কাজ তুমি করো। আমি আছি।"

ও চলে যাওয়ার পর প্রথমে কাস্‌লটা ঘুরে দেখলাম যতটা সম্ভব। যতটা সম্ভব বলছি, কারণ মারিয়াসের ইচ্ছে নয় যে তিন তলায় যাই। কারণ সরাসরি না-বললেও বলেছে, "তিন তলায় যখন আসতে চাইবেন, বলবেন। সঙ্গে নিয়ে দেখাব।"

সুতরাং তাকে বলেই তিন তলায় যেতে হবে। লিফ্ট যেটি আছে সেটা তিন তলাতেই আটকে রাখা হয়েছে। মারিয়াস নিজে থাকেও তিন তলায়। প্রফেসর ডেফনারের ঘর আর ল্যাবরেটরিও তিন তলায়। এখানে আর একটা কথা বলতে হয়, প্রফেসর ডেফনারের অপঘাত মৃত্যু বা তাদের গবেষণার বিষয় অপ্টোগ্রাফি নিয়ে একটি শব্দও এখনও উচ্চারণ করেননি মারিয়াস। এটাও একটু আশ্চর্যের বিষয় আমার কাছে।

যাই হোক, যেটুকু ঘুরলাম তাতে বলতে হয় যে কাস্‌লের প্ল্যান বেশ জটিল। ঘরও অনেক। নানান মাপের, নানান কায়দার। সিঁড়িও অনেকগুলো দেখলাম। তার কোনওটা লোহার, কোনওটা পাথরের, আবার কোনওটা স্রেফ কাঠের। সিঁড়িগুলো সব কিন্তু সরাসরি তিন তলায় উঠে আসেনি। ভাগে-ভাগে উঠেছে, মানে এক তলা থেকে দোতলা উঠে শেষ হল একটি সিঁড়ি। দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি আবার একটু তফাতে। সেটাও এক টানা তিন তলায় ওঠেনি। তবে হয়তো সরাসরি তিন তলা পৌঁছনোর সিঁড়িও আছে। এখনও নজরে পড়েনি। সিঁড়িগুলোর সামনের দেওয়াল ঘেঁষে আবার এক-এক জন মধ্যযুগীয় প্রহরী দাঁড়িয়ে। সর্বাঙ্গ ইস্পাতের বর্ম আঁটা তাদের। মজা করে বলছি আসলে, বর্মগুলো অবশ্যই ফাঁকা। তবুও মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শরীরের লৌহরূপ দেখলে গা-টা একটু ছমছমিয়েই ওঠে যেন। ম্যানসনটাকে মধ্যযুগীয় ভাব দিতে এ রকম সব মূর্তি কিউরিও শপ থেকে কিনে এনে জড়ো করেছেন মারিয়াস। যদিও রিকার্ডো বলেছিল এগুলো নিয়ে মূলত ব্যবসা করে সে। ইউরোপে অনেক ধনী লোকজন নিজেদের প্যালেস সাজায় এ রকম কিউরিও আইটেম দিয়ে। মারিয়াস খুঁজে-পেতে কম দামে কিনে চড়া মূল্যে বিক্রি করে দেশ-বিদেশে।

অট্টালিকার মধ্যিখানটা কোর্টইয়ার্ডের মতো উন্মুক্ত। সেটাও অনেকটা জায়গা। ছোট একটা ফুটবল মাঠের সমান। সেখানে কিছুটা যেন এলোমেলো দাঁড়িয়ে রয়েছে নানা রকম পাথরের মূর্তিটুর্তি। কোর্টইয়ার্ডের ধার দিয়ে ছোট-ছোট বেদিতে ফুলগাছও লাগানো হয়েছে অনেক। রংবেরঙের ফুলে সুন্দর লাগছিল দেখতে। খড়ের টুপি পরা এক জন মোটাসোটা বেঁটে লোক প্লাস্টিকের পাত্র থেকে জল দিচ্ছিল। এই লোকটিও বয়স্ক, ষাটের উপরেই মনে হল। আমি এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলাম। নাম অ্যাড্রিয়ান এবং আমার কপাল ভাল যে, কিছুটা ইংরেজি জানে। কথা বলতেও ভালবাসে। বলল, গাছের পরিচর্যার সঙ্গে কাস্‌লের নানা রকম রক্ষণাবেক্ষণের কাজও তার। বাজারেও যেতে হয়। কুক এলভিরার কাজেও সে হাত লাগায়। জিজ্ঞেস করল বেড়াতে, না গবেষণার কাজে এসেছি।

উত্তর না-দিয়ে দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে প্রফেসর ডেফনারের প্রসঙ্গ তুললাম, "কী দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মানুষটা চলে গেলেন!"

"হ্যাঁ," মাথা দোলাল অ্যাড্রিয়ান, "খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আর কী কাজ-পাগল! ওই হাঁটতে বেরোনো ছাড়া তেতলার নিজের রুম আর ল্যাবেই কাটাতেন দিন-রাত। কী করে যে পড়ে গেলেন! কুকুরটাও ফিরল না। কে জানে সেটার কী হল। সারা দিন তো প্রফেসরের সঙ্গেই থাকত। ঘরের একটা কোণে কার্পেটে শুয়ে থাকত মুখ গুঁজে। বুড়ো হয়ে গেছিল খুব। প্রফেসরের সঙ্গে ফি-দিন যা বেরোত এক বার। কে জানে, হয়তো ফেরার পথ খুঁজে পায়নি। কিংবা রোমানিদের দল নিয়ে পালিয়েছে। ওদের এই সব বদ স্বভাব আছে, জানেন তো। এ দিকে সে দিকে ঘুরে দুষ্কর্ম করে বেড়ায় খালি।"

রোমানিদের দল, অর্থাৎ জিপসিদের কথা বলছে সে। এরা হল ভবঘুরে এক জাতি। মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ থেকে খ্রিস্টীয় ৬০০ থেকে ১১০০ অব্দের মধ্যে এরা ইউরোপ, আফ্রিকা এ সব দেশে জীবিকার জন্য পাড়ি দিয়েছিল। যাযাবর জীবনযাপনের কারণে এদেরকে জিপসি বলা শুরু হয়। বর্তমানে যদিও জিপসি সম্বোধন করাটা আইনবিরুদ্ধ। রোমা বা রোমানি পিপল বলে বোঝানো হয় এদের। রোমানিয়ায় এরা প্রচুর সংখ্যায় থাকে। তবে অধিকাংশই মূল জনস্রোতে মিশে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে।

"কাছেপিঠে এ রকম কোনও দল আছে নাকি এখানে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"জানি না। থাকতেও পারে," বলল অ্যাড্রিয়ান, "আসলে কী জানেন স্যর, কপাল। দুর্ভাগ্যই টেনে নিয়ে গেল প্রফেসরকে। সে দিন এখানে লোকজনও কম। আমি তো বাইরেই ছিলাম। দাচিয়ানার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো? আমাদের দু'জনেরই দাঁতের সমস্যা। রুট ক্যানালিংয়ের জন্য ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলাম একই দিনে। ওকে নিয়ে বেরোই। উরিকানি টাউনে। একটু দূর, এক ঘণ্টার মতো রাস্তা। লাঞ্চের পরেই বেরিয়ে গেছিলাম। চারটের সময় ম্যাডাম ফোন করে কিছু গ্রসারিও আনতে বলেন।"

"ম্যাডাম মানে?"

"ডক্টর ভাকারেস্কুর স্ত্রী। মিসেস ভাকারেস্কু," অবাক হয়ে বলল অ্যাড্রিয়ান।

অবাক হতেই হল। মারিয়াসের স্ত্রীও এই কাস্‌লে রয়েছেন, জানি না তো! রিকার্ডোও বলেনি। হতে পারে সে কারণেই তিন তলাটা প্রাইভেট রাখতে চান মারিয়াস।

"অতটা রাস্তা, কী ভাবে যাতায়াত করেন?"

"গাড়ি নিয়ে গেছিলাম। আমাদের এখানে তিনটে গাড়ি। বড় কালো এসইউভি-টা স্যরের ব্যক্তিগত। এ ছাড়া একটা জিপ আর ভ্যানও আছে। জিপটা নিয়ে যাই আমরা। একটা সময় নিজেই ড্রাইভ করতে পারতাম। এখন হাত কাঁপে খুব। লুসিয়ান নিয়ে গেছিল আমাকে। লুসিয়ান আমাদের ড্রাইভার... যে কথা বলছিলাম, কাছাকাছি চলে

এসেছি যখন, সন্ধে হয়ে গেছে, সাতটা বাজে প্রায়, ম্যাডাম আবার ফোন করে বললেন প্রফেসর এখনও ফেরেননি। মোবাইল নিয়েও যাননি, আমি যেন একটু খুঁজে দেখি।”

“সাতটা মানে তো অনেক সময়। এমনিতে উনি ফিরতেন কখন?”

“খুব বেশি দূর তো যেতেন না। এই জঙ্গলে মাঝেমধ্যে ভালুক বেরোয়। নেকড়েও আছে। তবে কখনও কাউকে আক্রমণ করেছে এমনটা শুনিনি। বিকেলের দিকে এমনিতে কমই বেরোতেন। পৌনে চারটে-চারটের মধ্যে বেরিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরতেন। দু’-এক বার দেরি যে হয়নি, এমনও না। তাই হয়তো কেউ সে ভাবে চিন্তা করেনি। সে দিন লোকজনও কম ছিল বললাম। রিকার্ডো স্যর বুখারেস্টে ছিলেন। আমরাও বেরিয়েছি। দু’জন গার্ডের এক জন ছুটিতে। ও দিকে স্যরেরও শরীর ঠিক ছিল না। ম্যানসন ছেড়েই বেরোননি। ম্যাডাম একটা জরুরি কাজে নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরোন, কিন্তু স্যরের শরীর খারাপ বলে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসেন। বুঝতেই পারছেন। আমরা অন্ধকারে যতটা পারি দেখি, শেষে ম্যাডামই পুলিশে জানান। তাও তাদের আসতে-আসতে প্রায় দশটা বাজে। এই ম্যানসনের এটাই সবচেয়ে অসুবিধে, যোগাযোগের খুব অসুবিধে।”

“প্রফেসরকে কখন পাওয়া গেল, সে রাতেই?” প্রশ্ন করলাম আমি।

অ্যাড্রিয়ান মুখ তুলে চাইল আমার দিকে, “আপনি স্যর, পুলিশের মতোই কথা বলেন কিন্তু! না। সে-রাতে পাওয়া সম্ভব নাকি! এমন একটা খাঁজে আটকে ছিলেন! উদ্ধার করতে-করতে পর দিন দুপুর বারোটা-একটা। আমরা তো ভেবেছিলাম যদি আগে উদ্ধার করা হত, বেঁচেও যেতে পারতেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অবশ্য বলল, অন্তত বিশ ঘণ্টা আগেই মারা গেছিলেন।''

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বেরোনোর ফটকের দিকে পা বাড়ালাম। পোর্টিকো অতিক্রম করে একশো গজ মতো নুড়িপথ পেরিয়ে লোহার মূল ফটক। পোর্টিকোয় একটা সাদা জিপ দাঁড়িয়ে। একটা স্কুটারও দেখলাম। দু’জন রক্ষীই ডিউটিতে। গায়ে ঘন সবুজ-রঙা উর্দি। দু’জনেই মূল লোহার ফটকে দাঁড়িয়ে মোবাইলে কিছু দেখছিল। আমাকে দেখে অভিবাদন করল। এই দু’জনের বয়স কম। তিরিশের নীচেই মনে হল। মজবুত গড়ন। এক জনের মুখে বাদামি হালকা চাপদাড়ি, অন্য জন ক্লিন শেভেন। চুল কালো।

“স্যর কি বাইরে বেরোচ্ছেন?” চাপদাড়ি জিজ্ঞেস করল।

বললাম, “হ্যাঁ, ভিতরে বসে থেকে কী করব আর, ঘুরে আসি একটু।”

চাপদাড়ি বলল, “সাবধানে ঘুরবেন। দূরে গেলে স্কুটারটা নিয়ে যেতে পারেন।”

ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, দরকার হলে অবশ্যই নেব। একটু কথাবার্তাও হল। চাপদাড়ির নাম ক্রোনিদ। দুর্ঘটনার দিন সে ছিল পঞ্চাশ মাইল দূরে, তার গ্রামের বাড়িতে। স্কুটারটা ওরই, ওটা নিয়েই গেছিল। অন্য জন হল ফ্লোরিন।

“প্রফেসরের কুকুরটা আর সত্যিই পাওয়া গেল না তবে?” হতাশ মুখ করে বললাম আমি।

“সেটাই তো আশ্চর্য। পুলিশ তো খুঁজছিল। ওদের কুকুর এনেও কত তল্লাশি করল। কিছুই হল না। কুকুরটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে,'' বলল ফ্লোরিন, “আমি কী ভাবছি জানেন, মানে আমার নিজের ধারণা আর কী... কুকুরটা অসুস্থ ছিল, অথবা কিছু হয়েছিল ওর। ডেফনার স্যর ওকে কোলে করে নিয়ে বেরোন সে দিন।”

“পোর্টিকো থেকে এই গেট পর্যন্ত অনেকটা হাঁটা। পুরোটাই কোলে করে হাঁটলেন, দেখলে তুমি?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“হ্যাঁ, মানে... হয়তো,জানি না,” আমতা-আমতা করল সে, “আসলে ক্রোনিদ ছিল না। পোর্টিকোতেই বসে ছিলাম। এই মেন গেটটা অটোমেটিক। পোর্টিকো থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।”

“হুম। তোমার কী ধারণা বলছিলে?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কথাটা এড়িয়ে গেল ফ্লোরিন, “কিছু না স্যর। এমনি বলছিলাম।”

বেরিয়ে এলাম। কাস্‌লটার কিছু ফটো নিলাম মোবাইলে। একটা কথা বলা হয়নি, কাস্‌লের ভিতরের ফটো নেওয়া চলবে না। এটাও বলে দিয়েছিল মারিয়াস। যাই হোক, জায়গাটা সত্যিই চমৎকার। শীত পড়ছে বলে পাতায় সবুজ কমে আসছে। যদিও ইউরোপের বিখ্যাত ‘অটম’-এর রঙিন রেশ এখনও রয়ে গেছে। লাল, হলুদ, কমলা, কত রকম রঙের বাহার গাছের পাতায়। জোরে বাতাস বইছে। আকাশও মেঘলা, কুয়াশা-কুয়াশা চার দিক। কানে উলের মাফলার, গায়ে মোটা জ্যাকেট চাপিয়েও শীত যাচ্ছে না।

রিকার্ডো যেমন বলেছিল, ম্যানসন থেকে বেরিয়ে গাড়ি-রাস্তা ধরে মিনিট কুড়ি হাঁটলে একটা বড়সড় গোল পাথর পাব। গাড়ি-রাস্তা আলাদা করে ধরার কিছু নেই, একটাই রাস্তা ম্যানসন থেকে বেরোলে। মিনিট কুড়ি না, মোটামুটি জোর পায়ে পনেরো মিনিটেই বর্তুলাকার প্রস্তরটি পাওয়া গেল। বেশ বড়। লম্বায় প্রায় আমার সমান। ব্যাসেও হাত পাঁচেক চওড়া। লক্ষণীয় হল, পাথরটায় বড় আকারের একটা বৃত্ত খোদাই করা। বৃত্তের মধ্যে একটা ক্রসও রয়েছে। ক্রস মানে কাটা চিহ্ন, গুণ চিহ্ন যেমন হয়। চিহ্নটা সাম্প্রতিক না, কারণ খোদাইয়ের দাগও পাথরের গায়ের মতো মসৃণ। চিহ্নটা কে খোদাই করল কে জানে, হয়তো নিতান্তই খেয়াল বশত। পাথরের ডান দিকে দিয়ে সরু একটা নুড়ি-পথও গেছে। খাদের কিনারা ধরে পর পর পাইন গাছও দেখতে পাচ্ছি। এই পথেই এগোলে বিশাল সেই চ্যাটালো পাথর মিলবে। যেখান থেকে প্রফেসর বরিস ডেফনার পড়ে যান।

ভাবলাম একটা ফটো নিই পাথরটার। মোবাইলটা বের করেছি সবে, দেখি দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে একটা বাচ্চা ছেলে চেয়ে আছে আমার দিকে। চোখাচোখি হতেই দৌড়। পরনে পাঁচমিশালি রঙের চকরাবকরা শার্ট আর লাল-নীল ডোরাকাটা ফুল-প্যান্ট। পায়ে কেডস মনে হল। যে পথে আমি যাব, সে দিকেই ছুটেছে। বাচ্চা ছেলে। বছর বারো-তেরো হবে মনে হল। একা-একা কোত্থেকে এল কে জানে।

যাই হোক, নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম সহজেই। বাঁকটা ঘুরে এক মিনিটও লাগল না চ্যাটালো পাথরটা পেতে। সত্যিই অদ্ভুত পাথরটার আকৃতি। কিছুটা অংশ এমন ভাবে নুড়ি-রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসেছে, ঠিক যেন একটা ঝুল-বারান্দা। সাবধানে দাঁড়িয়ে নীচটা দেখলাম। গাছপালায় ভর্তি। এবড়োখেবড়ো পাথরও উঁকি দিচ্ছে। অন্তত পাঁচ-ছ’শো ফুট নিচু তো হবেই। প্রফেসর ডেফনার এর মধ্যে কোথায় পড়েছিলেন কে জানে! দূরে তাকালে চার দিকেই উঁচু-নিচু পাহাড়। কিছু দূরে একটা লেকও রয়েছে মনে হল। জল চিক-চিক করে উঠছে মাঝে-মাঝে। লেকের ধার ঘেঁষে রংবেরঙের তাবু টাঙানো রয়েছে। রোমানি ভবঘুরেদের দল হতে পারে।

অ্যাড্রিয়ানের কথা মনে পড়ে গেল, সে বলছিল বটে এদের কথা। কিন্তু কত দিন হল এসেছে দলটা, সেটাও জানা জরুরি। তা ছাড়া সত্যিই কুকুরটিকে এরা নিয়ে গেছে কিনা, তারও প্রমাণ নেই। তবে একটু আগে দেখা ছেলেটো তা হলে ওখান থেকেই এসেছিল। এদের কেউ-কেউ এখনও নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরে মেলামেশা পছন্দ করে না। ছেলেটির হাবভাব দেখে সে রকম কোনও গোষ্ঠীরই মনে হল। চার দিকে চাইলাম, যদি ওকে দেখা যায়। দেখতে পেলাম না। কাস্‌লে ফিরে তো করার কিছু নেই এখন। ঠিক করলাম নুড়ি-পথটা ধরেই এগোনো যাক। দেখি কত দূর গেছে পথটা। হয়তো রোমানিদের ডেরাতেই পৌঁছব। কিন্তু আবহাওয়া ক্রমেই গোলমেলে রূপ নিচ্ছে। ফেরার পথ ধরলাম। প্রফেসরের কুকুরটার কথা ভাবছি। কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বেরিয়েছিলেন প্রফেসর ডেফনার। খুব অস্বাভাবিক কিছু না। অনেককেই দেখেছি তাদের পোষা কুকুরকে কোলে নিয়ে ঘুরতে। কিন্তু সেগুলো সাধারণত ছোট কুকুর, ল্যাপডগ। রিকার্ডো যা বলল, বেন ছিল মাঝারি সাইজ়ের। কোলে নেওয়া যেতেও পারে। কিন্তু কুকুর যদি অসুস্থ হয় ডাক্তারকেই ডাকার কথা আগে। বিশেষ করে সে কুকুর

যখন অত আদরের। নাহ, রহস্য ক্রমেই বেড়ে চলছে। আচ্ছা, এমন না তো, কুকুরটা আসলে মারা গেছিল! প্রফেসর কাউকে কিছু না-জানিয়ে কুকুরটিকে জঙ্গলের কোথাও সমাধিস্থ করেছিলেন। আর তার পর নিজেও ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জটিল চিন্তা! ফ্লোরিন কি এমনই কিছু বলতে গিয়েও বলল না?

কিন্তু তা-ই যদি হবে, সে দিন প্রফেসরের সঙ্গে কুড়ুল, শাবল, মানে গর্ত খোঁড়ার কোনও মজবুত সরঞ্জাম থাকা উচিত ছিল। অবশ্য তিনি কুকুরটির দেহ উপর থেকে ছুড়েও দিতে পারেন। কিন্তু তা হলে পুলিশ এত দিনে ঠিকই মৃতদেহ উদ্ধার করে ফেলত। নাহ, কিছুতেই যুক্তিগ্রাহ্য কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। ঠিক করলাম, কাস্‌লে ফিরে ফ্লোরিনের সঙ্গে আর এক বার কথা বলতে হবে।

এই সব ভাবছি, এমন সময় শিসের আওয়াজ। থেমে-থেমে বার বার। উৎস খুঁজে দেখি সেই ছেলেটি, কী ভীষণ ডাকাবুকো, নীচে নেমে গেছে কখন। খুব একটা নিচুতে না-হলেও তিরিশ-চল্লিশ ফুট তো হবেই, চ্যাটালো পাথরটার সামান্যই তফাতে। কোন পথে ঘুরে এল কে জানে! একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে কিছু উদ্দেশ্য করে। সেটাও দেখলাম, একটা বাজ পাখি। কাছেই একটা পাইন গাছের মাথায় বসে রয়েছে। মোবাইল বের করে ফটো নিতে যাব, শিসের মতোই তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে পাখিটা উড়ে গেল।

আর সেই মুহূর্তে ছেলেটিও চাইল আমার দিকে। এক মাথা কালো চুল। গায়ের রং ফরসা হলেও এ-দেশীয়দের সাদা না। তামাটে ভাব। পায়ে সাদা কেড্‌স। এই ঠান্ডায়ও কোনও গরম পোশাক নেই। সে বিরক্ত হয়েছে কি না ঠিক বুঝলাম না। স্থির চোখে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল। হাতের মুঠোয় নুড়ি ছিল, সেটা পাশে ছুড়ে দিয়ে একদম হনুমানের মতো তরতরিয়ে নেমে গেল নীচে। আর দেখতে পেলাম না। আসল কথা, নুড়িটা টং করে ধাতব কিছুতে লেগেছে। আমার এই মোবাইলের জুম খুব ভাল। টং শব্দের উৎস খুঁজে পেলাম কপাল জোরে। ছেলেটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছেই। একটা গাছের মোটা শিকড়ের খাঁজে পিতল জাতীয় কিছু একটা চকচক করছে। শুকনো পাতার জন্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক করলাম নীচে নেমে দেখব। ওইটুকু ছেলে নামতে পারলে আমিও পারব। যদিও ওর সঙ্গে আমার তুলনাই চলে না। পাহাড়ি মানুষ এরা, এ সবে অভ্যস্ত। শরীরও হালকা।

মোবাইলটা জ্যাকেটের পকেটে ভাল করে গুঁজে হেঁচড়েপেঁচড়ে নামলাম। ঘেমে কুলকুল। কে বলবে একটা সময়ে দার্জিলিংয়ে মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ট্রেনিং নিয়েছিলাম। মাঝ-চল্লিশে পৌঁছেই কী অবস্থা! শরীরচর্চা ফের শুরু করতে হবে দেখছি।

যাই হোক, আসল বিষয় হল, অতি কষ্টে যেটা উদ্ধার করলাম সেটা ইঞ্চি তিনেক ব্যাসের একটা লোহার বোতাম। পিতলের মতো লাগলেও মনে হল লোহার উপর রং করা। সোনালি ছিল হয়তো। বোতামের মধ্যিখানে হাঁ-করা সিংহের মুখ খোদাই করা। আড়াআড়ি দুটো ছিদ্র দেখে বোতামই মনে হচ্ছে। আগেকার দিনের লর্ড, ব্যারন, নাইটরা জমকালো পোশাকে হয়তো এ রকম বোতাম ব্যবহার করত।

উঠে যাওয়ার আগে আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখছি, একটা গাছের শিকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। শিকড়টা ধরেই কোনও মতে বাঁচালাম নিজেকে। কিছু একটা খোঁচা লাগল কনুইয়ের কাছে, মনে হল পেরেক জাতীয় কিছু। মাটিতে আটকে ছিল, টেনে তুলে দেখি একটা লোহার চাবি। কারুকার্য করা সুন্দর দেখতে। চার ইঞ্চি মতো লম্বা। মধ্যযুগীয় ছাঁদে তৈরি। প্রায় এমনই একটা চাবি আমার ব্লু-বেডচেম্বারেরও। বুকটা ধক করে উঠল! প্রফেসরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই তো? চাবির যে রকম অবস্থা দেখছি, মনে তো হয় না বহু কাল আগে থেকে রয়েছে। পড়েছে সম্প্রতিই, নয় তো লোহার আরও ক্ষয় হত। পকেটে সাবধানে রেখে কসরত করে উঠে এলাম পায়ে-পায়ে। কিছু তো পাওয়া গেল।

॥ ৪ ॥

কাস্‌লে ফিরতে লোহার ফটকে ফ্লোরিনকে দেখলাম। তার পার্টনার ক্রোনিদ পোর্টিকোয়। ওখানে একটা ছোট ঘর আছে নজরদারির জন্য। পালা করে দু'জায়গায় বসে দু'জনে। মেন গেটে হয়তো না-বসলেও চলে, সেটা যখন ভিতর থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যাই হোক, ফ্লোরিনকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রফেসর ডেফনারের হাতে সে দিন ওর কুকুর ছাড়া আর কিছু ছিল কি না?

"কুকুর ছাড়া আর কী থাকবে?" মাথা চুলকোল ফ্লোরিন, "হ্যাঁ, লাঠি নিত একটা হাতে, সেটা নেয়নি। কুকুরটা কোলে ছিল বলেই হয়তো। মাস্কও পরেছিল মুখে। আর তো কিছু মনে পড়ছে না। তা ছাড়া আমার এক বন্ধু ফোন করেছিল। কথা বলতে-বলতে একটু বেখেয়ালি হয়ে থাকব।"

আপাতত আর কিছু জানার নেই। বারোটাও বাজতে চলল। মারিয়াস ভাকারেস্কুর সঙ্গে লাঞ্চ করার কথা দুপুর সাড়ে-বারোটায়। সকালেই মিসেস দাচিয়ানা বলে গেছেন। ঘরে এসে দরজা লক করে রিডিং টেবিলে আমার সাদা রুমালটা বিছিয়ে বোতামটা রাখলাম। ধুলো, কাদা, মাটি লেগে আছে কিছুটা। এমনিতেই খালি হাতে তুলেছি। সত্যিই কাজের জিনিস হলে হাতের ছাপ পাওয়া মুশকিল হবে। মোবাইলে দু'পিঠেরই ফটো নিয়ে রাখলাম। একটু খয়েরি মতো দাগ রয়েছে একটা ধারে। কাদামাটিই, না অন্য কিছু? রুমালে মুড়ে সাবধানে তুলে রাখলাম আমার ব্যাগে। চাবিটা নিয়ে বসলাম এ বার। আমার অনুমান, এটা প্রফেসর ডেফনারের ঘরেরই চাবি। পতনের সময় কোনও ভাবে পকেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কথা হচ্ছে, এটা কি মারিয়াসকে দেব না পুলিশকে দেব? এমনিতেই আমি পুলিশের সঙ্গে এক বার কথা বলতে চাই। যা হোক, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপাতত খাওয়ার ব্যাপারটা সেরে আসি।

ভোজন পর্বটা অবশেষে তিন তলাতেই হল। সে-ও এক রয়্যাল ব্যাপার। বিশ ফুট লম্বা টেবিলের দুই প্রান্তে আমরা দু'জন, আমি আর মারিয়াস। ভেবেছিলাম মিসেস ভাকারেস্কুর সঙ্গে পরিচয় হবে। দেখলাম মারিয়াস একাই অপেক্ষা করছে। মিসেস দাচিয়ানা আর এলভিরা দু'জনে এক সঙ্গে পরিবেশনের দায়িত্বে। অ্যাড্রিয়ান সম্ভবত 'ম্যাডাম'কে সার্ভ করছে। কিচেন শুনলাম দুটো ফ্লোরেই আছে। পদের বিবরণে যাচ্ছি না। অনেক পদ। সবই রোমানীয় ডেলিকেসি। রান্নাও ভাল। ঘরের সাজসজ্জাও পিরিয়ড মুভির রয়্যাল ডাইনিংয়ে যেমন হয় সে রকম জমকালো।

"তা কেমন লাগছে আপনার? একটা মিডিভ্যাল ফিলিংস পাচ্ছেন কি?" আমি ঘরে ঢুকতে খোশ মেজাজে জিজ্ঞেস করল মারিয়াস।

বললাম, "রীতিমতো। ভাবছি শার্ট, জিন্‌স, জ্যাকেট সব খুলে রেখে টিউনিক, সারকোট এ সব পরে নিই।"

ফিল্মি কায়দাতে হাসল মারিয়াস, "যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি। প্রচুর খরচ। এত বড় একটা ম্যানসনের মেনটেনেন্স সহজ ব্যাপার না। এই ক'জন লোক মিলে কত পারবে! ভাবছি বিক্রি করে দেব এ বার। হোটেলও করতে পারি। এখন তো এটাই হচ্ছে চার দিকে। ছোট, বড় যত কাস্‌ল, ফোর্ট, ম্যানসন সব হোটেল হয়ে যাচ্ছে। খুব নামী হলে মিউজ়িয়াম। নয়তো হোটেল। আপনারা এসে ভালই হল, কয়েক লাইন পোস্ট করে দেবেন আমার সোশ্যাল অ্যাড্রেসে। আপনারা নামী মানুষ, জনগণ গুরুত্ব দেবে।"

"অবশ্যই," বললাম আমি।

এর পর টুকটাক কথা। জার্মানিতে আমি কী বিষয়ে পড়াই বা গবেষণা করি, মার্ক ডাবলিনে পৌঁছল কি না, এই সব। প্রফেসর ডেফনারের প্রসঙ্গটা তুলেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত, "মৃত্যুটা এত দুঃখজনক শুনলাম!"

"আসলে দোষটা আমাদেরই," একটু জল খেয়ে বলল মারিয়াস, "প্রফেসর ডেফনারকে রোজ-রোজ একলা বেরোতে দেওয়া উচিত

হয়নি। অত বয়স। হাত-পা কাঁপত। সে দিন আবার আমার নিজের শরীরটাও ভাল ছিল না। প্রেশার বেড়েছিল, মাথা ঘুরছিল খুব। তার মধ্যে ওই রকম একটা ব্যাপার।"

বললাম, "কুকুরটাও তো উধাও হয়ে গেল কেমন। পুলিশ কিছু পেল?"

"জানি না। পেলে তো জানাত," বলল মারিয়াস, "মনে হয় জিপসিদেরই কেউ নিয়ে গেছে। প্রফেসর পড়ে গেলে, সে-ও হয়তো লাফ দিয়েছিল। তাতে মারা না-গেলেও অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকবে। জিপসিরা দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে যায়।"

"হতে পারে। কিন্তু কুকুরটাকে পেলে প্রফেসর ডেফনারকেও দেখতে পাওয়া উচিত। জখম মানুষটিকে ফেলে নিশ্চয়ই চলে যাবে না।"

"ধুস। আপনি ওদের জানেন না। ও রকমই ওরা," আমার যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বলল মারিয়াস, "এই ম্যানসনের নামেই কত গুজব ছড়িয়েছে... আর আপনাকে একটা কথা বলি। বেড়াতে এসেছেন বেড়ান, ঘুরে দেখুন চার দিক। ট্রেকিংয়ে যান, হাইকিং করুন। বুকুরা লেকে দেখে আসুন। গ্লেসিয়াল লেক। তাক লেগে যাবে দেখলে। এখান থেকে একটু দূর বটে। লুসিয়ানকে বলে দিচ্ছি ঘুরিয়ে আনবে। তবে কিছুটা ডিসট্যান্স ক্লাইম্ব করতেই হবে। আপনার বয়স কম, পারবেন। আমি তো এই সিক্সটি প্লাসেই দু'বার রিটেজাটের মাথায় চড়েছি... প্রফেসরের চিন্তাটা মাথা থেকে সরান। ঘটনাটা মর্মান্তিক হলেও সেটা মিটে গেছে। তদন্ত, ময়নাতদন্ত সব করেছে পুলিশ। আমাদের দিক থেকে আর কিছু করার নেই।"

বললাম, "আসলে এমন এক জন মানুষ, এ ভাবে চলে গেলেন। আরও একটু আগে যদি আসতাম, দেখা হত অন্তত! শুনেছি চমকপ্রদ কিছু একটা কাজ করছিলেন প্রফেসর ডেফনার।"

অপ্টোগ্রাফির ইঙ্গিতটা দিয়েই ফেললাম শেষ পর্যন্ত। মারিয়াস অবাক হল না, "রিকার্ডো বলেছে তো? ও কতটুকু আর জানে! কোন এক গ্রামে একটা খামার বানিয়ে চাষবাস নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। গবেষণা ছেড়েই দিয়েছিলেন ডেফনার। কাকতালীয় ভাবে এক দিন দেখা হয়। এ রকম জায়গায় ল্যাব বানিয়েছি জেনে খুব উৎসাহ দেখালেন। মানুষজন বেশি পছন্দ করতেন না। জায়গাটা দেখতে আসেন প্রথমে। পছন্দ হয়ে গেল, বললেন সব নতুন করে শুরু করতে ইচ্ছে হচ্ছে আবার। আর কী! থেকে গেলেন। আমারও ভাল হল, এত বড় এক জন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করা তো কম কথা না। কিন্তু সে ভাবে আর তেমন কিছু করতে পারছিলেন না।"

রিকার্ডো যা বলেছিল, এ যে একদম বিপরীত। প্রসঙ্গ বদলে বললাম, "আপনার স্ত্রীও কি গবেষক?"

"কে? ওহ, আমার স্ত্রী? গবেষক তো বটেই, তবে ওঁর বিষয় হল ইতিহাস। বিশেষ করে মিডিভ্যাল পিরিয়ড নিয়েই ওঁর যত থিসিস। বুঝতেই পারছেন আমার পিছনে আসলে কার উৎসাহ-উদ্দীপনা! ক'দিন ধরে হাঁটুর ব্যথাও ভুগছে খুব। হাঁটতেই চাইছে না। তাই আর আপনার সঙ্গে আলাপ করাতে পারলাম না," বলল মারিয়াস।

বললাম, "প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচারে এ জায়গার তুলনা হয় না। কিন্তু মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি হলে তো খুবই অসুবিধে।"

"তা তো বটেই। আমরাও ভাবছি এটা নিয়ে," খাওয়া হয়ে গেছিল, কাটলেরি সরিয়ে ন্যাপকিনে মুখ মুছে দু'জনে উঠে দাঁড়িয়েছি পরস্পর। মিসেস দাচিয়ানাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরোলাম এক সঙ্গে।

লম্বা প্যাসেজের মাঝামাঝি মারিয়াসের রয়্যাল গ্রেটচেম্বার। একটু তফাতে নেমেছে দোতলায় যাওয়ার একটা সিঁড়ি। এটা আবার পাথরের। চওড়াতেও সরু। মারিয়াসের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ওঁর ঘরের সামনে পৌঁছে গেছি। এখানেও যথারীতি প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে বর্মাবৃত লৌহমানব।

"আপনার এই জিনিসটার উপর একটা ফ্যাসিনেশন রয়েছে দেখছি। সব ফ্লোরেই দেখছি এগুলো রেখেছেন দাঁড় করিয়ে," বললাম আমি।

"আসলে এটা ঠিক আমার না, মিসেস ভাকারেস্কুর শখ। সে যুগে তো আর বুলেটপ্রুফ পোশাক আবিষ্কার হয়নি। যোদ্ধারা এ রকম আপাদমস্তক লোহার বর্ম পরত। দেখলে কিন্তু সত্যিই একটা অ্যান্টিক ফিলিংস আসে," বলল মারিয়াস, "যাই হোক, তা আপনি কী ঠিক করলেন? যাবেন কোথাও বেড়াতে? না কি আগামী কালই ফিরছেন?"

বুঝলাম আমার উপস্থিতি আর চাইছে না মারিয়াস। বললাম, "হ্যাঁ, সে রকমই ভাবছি।"

মারিয়াস বলল, "ঠিক আছে। কখন বেরোবেন জানাবেন, আমি কার রেন্টালে বলে রাখব। তাড়া নেই, সন্ধের আগে জানালেই হবে আমাকে। কাল দশটাতেও বেরোলে ছ'টার মধ্যে বুখারেস্ট পৌঁছে যাবেন।"

এ কথা শোনার পর আর কী বলার থাকতে পারে! গায়ে পড়ে আর থাকাও যায় না। মানে আমার এখানে থাকার মেয়াদ আগামী কাল সকাল দশটা পর্যন্ত। রিকার্ডোর সঙ্গেও দেখা হবে না। তার ফিরতে বিকেল গড়িয়ে যাবে। তবে কিছু একটা কারণ দেখিয়ে পরশু দিনও ফেরা যেতে পারে। কিন্তু রিকার্ডোর সঙ্গে কতটা কথা বলা যাবে সেটারও ঠিক নেই। এতটা জার্নি করে সে যথেষ্ট ক্লান্তও থাকবে। তা ছাড়া মারিয়াস ফের কোনও কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে। রিকার্ডোকে কত টাকা দিচ্ছে জানি না। ভাল না-লাগলে ছেড়েই দিতে পারে কাজটা!

ও রকম একটা রাজকীয় ভোজনের পরও জিভটা কেমন তিতকুটে হয়ে গেল যেন। নীচে নেমে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। নামতেই মিসেস দাচিয়ানার সঙ্গে দেখা।

"আপনাদের খুব ছোটাছুটি করতে হয় দেখছি," বললাম আমি।

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। আপনাদের খাওয়া হল, এ বার অন্যেরা আসবে। সেটা আবার নীচের তলায়। ভাবুন, কত বার করে ওঠা-নামা। তাও লিফটে ওঠা যাবে না। ওটা কেবল শুধু বাবু-বিবির জন্য," ভুরু আরও কুঁচকে, কপালে আরও কতগুলো ভাঁজ ফেলে বললেন মিসেস দাচিয়ানা।

"বাবু-বিবি মানে ডক্টর ভাকারেস্কু আর তার স্ত্রী?"

"সে তো বটেই। তবে প্রফেসরও ব্যবহার করতেন, ওর ঘরের সামনেই তো লিফটটা। যে-ঘরে আজকে খেলেন, তার একেবারে উল্টো দিকের হাতায়। বাড়ির পিছন দিক ওটা। দরজায় ওঁর কুকুরের ছবি সাঁটা। পাশের ঘরটাই এদের ল্যাবরেটরি।"

বললাম, "ডক্টর ভাকারেস্কুকেও তবে অনেকটা হেঁটে উঠতে হয় লিফটে।"

"সিঁড়ি ভাঙতে তো হয় না। আর হাঁটাও তো ওই বারান্দাটুকু ঘুরে যাওয়া। ওটুকু হাঁটারই দরকার। গাড়িটাও রাখেন লিফটের সামনে।"

এটা ঠিক বুঝলাম না। জিজ্ঞেস করাও হল না। ভদ্রমহিলা এখন ভালই ব্যস্ত।

॥ ৫ ॥

ঠং ঠং করে একটা শব্দ হচ্ছে কোথাও। চিন্তায় ছেদ পড়ল আমার। বাকি দুপুরটা শুয়ে-বসে না-থেকে বেরোনোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়ায় ঘর থেকে আর বেরোইনি। ল্যাপটপ নিয়ে বসেছি নিজের কিছু দরকারি কাজ করতে। শব্দটা বড় ব্যাঘাত করছে। মনে হচ্ছে ঘরের বাইরে থেকে আসছে আওয়াজটা। কেউ যেন ঠং ঠং শব্দে পায়চারি করছে বারান্দার প্যাসেজ দিয়ে। যেন নীরব প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোহার বর্মগুলো প্রাণ পেয়েছে কোনও জাদুবলে। হেঁটে-চলে বেড়াতে শুরু করেছে নির্জন দুপুরে।

কিন্তু উপেক্ষা করে থাকতে পারলাম না। এ বার আওয়াজ আমার দরজায়। কী বিচ্ছিরি ভাবে নক করছে কেউ। "কে, কী চাই," জিজ্ঞেস করলাম বার কয়েক, সাড়া নেই। কী করব বুঝতে পারছি না। উঠলাম

সাহসে ভর করে। কী কাণ্ড! দরজা খুলতেই ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ল দু'জন লৌহমানব। প্রতিবাদ করার সময়ও দিল না। জাপটে ধরে কার্পেটে শুইয়ে দিল। কী ভীষণ শক্তি গায়ে! লোহার মানুষের সঙ্গে লড়বই বা কী করে! কিন্তু এরা কী চায়? আমাকেও একটা লোহার খোলস পরানো হচ্ছে। ভারী-ভারী লোহার এক-একটা বর্ম চাপিয়ে যাচ্ছে শরীরের বিভিন্ন অংশে। বুকের বর্মটা এত ভারী আমি দম নিতেই পারছি না। দেখতেও পারছি না কিছু। চিবুক পর্যন্ত ঢাকা প্রচণ্ড ভারী একটা শিরস্ত্রাণ মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে। ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম গলা ফাটিয়ে। আর ঠিক তক্ষুনি ঘুমটা ভাঙল আমার। বাপ রে বাপ! কী ভয়ানক স্বপ্ন!

এই শীতেও ঘেমে কুলকুল অবস্থা। সোয়েটার পরে শুয়েছিলাম, খুলে ফেলে একটু ক্ষণ বসে রইলাম। এক বার বাথরুম ঘুরে এলে ভাল। বালিশের পাশেই মোবাইল রাখি। সেটার টর্চ অন করে কার্পেটে পা রাখতেই যে কাণ্ডটা হল আবার সাংঘাতিক চমক! কেঁউ-কেঁউউ করে কুকুরের চিৎকার। কিন্তু ঘরে কুকুর এসে ঢুকল কখন? মোবাইলের আলো ফেলেছি সঙ্গে-সঙ্গেই। কোথাও কিচ্ছু নেই। বুকটা ধক করে উঠল। এতটাই ভুল শুনব? পায়ের পাতায় এখনও যেন বরফ লেগে রয়েছে, এত ঠান্ডা ছিল গা-টা। ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখছি না। রীতিমতো জেগে আছি এবং এখন আবার ঠান্ডাও লাগতে শুরু করেছে। রিকার্ডোর কথাগুলো মনে পড়ছে শুধু।

নাহ, একটা গভীর রহস্য রয়েছেই কোথাও। আর সেটা কুকুরকে জড়িয়েই। কুকুরই ফিরে আসছে বার বার। ভুল বললাম হয়তো। কুকুর নয়, কুকুরের আত্মা। কে এই কুকুর? প্রফেসর ডেফনারের 'বেন'? তাই যদি হয়, সে নিহতই হয়েছে। কী বলতে চায় সে? তার এবং তার মনিবার মৃত্যু স্বাভাবিক না? মানে কী, হোমিসাইড? খুন? কিন্তু তা মেনে নিলেও, কেন? কে করবে? মোটিভই বা কী? এবং কী ভাবে?

কিছু ক্ষণ ওই অবস্থাতে বসে রইলাম। নার্ভাস সিস্টেমকে সময় দিলাম শান্ত হতে। আসলে এ রকম ঘটনায় তাৎক্ষণিক প্রবৃত্তিতে চমকে গেলেও শেষ পর্যন্ত কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলি না আমি।

সত্যি বলতে, এ রকম ব্যাখ্যাহীন অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। যে ভাবেই হোক, মাথা ঠান্ডা রাখতে হয় এই সব সময়ে। এখনও তাই করছি। সারা দিনের কথা ভাবতে শুরু করলাম। আসলে দুপুরে ক্রোনিদের স্কুটারটা নিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছে ছিল। খারাপ আবহাওয়ার জন্যই আর বের হইনি। কাস্‌লটাই ঘুরি আবার। লিফ্টটা পিছনের দিকেই। গাড়ি-বারান্দা করা হয়েছে একটা সে দিকে। গাড়ির জন্য কংক্রিট র‍্যাম্পও তৈরি করেছে মারিয়াস। এমন ব্যবস্থা, দেখলাম গাড়ি লিফটের পাশেই পার্ক করা। ড্রাইভার লুসিয়ানের সঙ্গে আলাপও হয় সেখানে। মারিয়াসের গাড়ি পালিশ করছিল। বছর পঞ্চাশ বয়স। বালগেরিয়ান। মোটাসোটা। মাঝারি হাইট। ইংরেজি তেমন জানে না। তবুও হাতটাত নেড়ে বোঝাল যে এই লিফ্ট পাল্টানোর কথা চলছে। আরও বড়, আরও শক্তিশালী এলিভেটর বসবে। গাড়ি উঠে যাবে তাতে। সে ভাল, অনেক বিলাসবহুল বিল্ডিংয়েই এমন দেখেছি

আমি। গাড়ি সোজা উঠে গেল দশ-বিশ তলায়।

এই সব ভাবছি, আচমকা ফের শব্দ। দু'-চার সেকেন্ডের জন্যে চমকেই গেছিলাম। সত্যি, মনের যা অবস্থা হয়েছে! আরে, এ তো আমার মোবাইল বাজছে। অ্যালার্ম দিয়ে শুয়েছিলাম। রাত ঠিক দুটোয়। একটু নীতিরহিত, বেপরোয়া কাজ করতে বেরোব। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও নেই।

সব দুর্বলতা ঝেড়ে তৈরি হয়ে নিলাম দ্রুত। যা-যা দরকার হতে পারে আমার ছোট টুলবক্সে ভরে নিয়েছি। খুব শীত। পাজামার উপরেই জিন্‌সটা পরে নিয়েছি। সোয়েটারের উপরে জ্যাকেটটাও। দু'হাতে গ্লাভস আর মাথায় কান চাপা উলেন-টুপি চাপিয়ে বেরোলাম ঘর থেকে। সেই কুড়িয়ে পাওয়া চাবিটা সাবধানে রাখলাম জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে।

সামনে খাঁ-খাঁ লম্বা বারান্দা। গোটা বাড়িটা কেমন অস্বাভাবিক নিঝুম। অত বড়-বড় বারান্দাগুলোয় টিমটিমিয়ে তেলের বাতি জ্বলছে কাচের চিমনিতে। আদ্যিকালে যেমন জ্বলত। এ সব মারিয়াসের বুদ্ধি, অ্যান্টিক ফিলিং তৈরি করার জন্য। তেলের পিদিমগুলো যদিও কম পাওয়ারের বিজলি বাতি সব।

যাই হোক, আমাকে যেতে হবে একেবারে উল্টো দিকে, তিন তলার বারান্দায়। রিকার্ডোর ঘর পেরিয়ে তিন তলায় ওঠার একটা লোহার সিঁড়ি। পাথরের মেঝেয় দাঁড় করানো এক জন লোহার মানুষ। একটা হাতে লান্স বা বল্লম ধরা, অন্য হাতে গোল একটা ঢাল। ইনিই কি জাদুবলে টহল দিচ্ছিলেন একটু আগে? আরও এক জন সঙ্গী জুটিয়ে আমাকে ভয়ও দেখিয়ে গেলেন স্বপ্নে!

কেন জানি না, আর্মারটা নেড়েচেড়ে দেখলাম। কেউ লুকিয়ে রয়েছে কি না দেখছি যেন! মুখের বর্ম মানে শিরস্ত্রাণটা একটু টানাটানি করতে খুলে এল। টং করে মেঝের উপরে কী একটা পড়েছে। বেশ ভারী। কী করে যে এত লোহা গায়ে চাপিয়ে মানুষগুলো যুদ্ধ করত কে জানে। মুন্ডুটা পরিয়ে দিলাম ধড়ে। গোল একটা চাকতি মতো কিছু পড়েছে, আমি যে লোহার বোতামটা পেয়েছিলাম সে রকম। এটা আকারে বড়, ভারীও একটু। বুকের বর্মে লাগানো ছিল চাকতিটা। প্যাঁচে বা খাপে বসাতে লেগে গেল। উত্তেজনার পারদ ক্রমশ বেড়েই চলেছে আমার। মনে হচ্ছে, এ রকমই কিছু পেয়েছি আমি। বোতাম না, এ রকম কোনও আর্মার থেকে খুলে যাওয়া অংশ। ঠিক নিশ্চিন্ত নই যদিও। কাস্‌লে অন্তত পঁচিশ-তিরিশটা এরকম ফুলসুট আর্মার আছে। ঘুরে-ঘুরে দেখতে হবে কোনওটার থেকে কিছু মিসিং আছে কি না। সময় সাপেক্ষ কাজ। আমার আসল কাজটাই হবে না তা হলে।

লৌহরক্ষীকে ছেড়ে তিন তলায় উঠে এলাম। নিঝুম নিস্তব্ধ চার দিক। শীত খুব। হাওয়া বইছে জোর। চাঁদ উঠেছে, তবে এক টুকরো। তাও সেটা বারে-বারে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। ফলে এক টানা আলো-আঁধারির খেলা চলছে গোটা উপত্যকায়।

মিসেস দাচিয়ানার কথা মতো লিফট-শ্যাফটের উল্টোমুখী ঘরটা প্রফেসর ডেফনারের রুম। আর তার ঠিক পাশের রুমটাই নাকি মারিয়াসের ল্যাব। দেখলাম ল্যাব বলে আলাদা করে লেখাটেখা নেই কিছু। দরজার হাতলের নীচে ম্যাগনেটিক কার্ড এন্ট্রির সেন্সর আছে অবশ্য। ইচ্ছে করছে খুব ল্যাবে ঢুকি। সেন্সর ছাড়া এমনি সাধারণ লকও রয়েছে। কৌতূহল সংবরণ করলাম, আগে দেখতে হবে প্রফেসরের দরজায় চাবিটা খাটে কি না। এ দরজায় জিভ বের করা একটা কুকুরের সাদা-কালো ফটো। যেন হাসছে কুকুরটি। যেমন বলেছিলেন মিসেস দাচিয়ানা।

কপাল অত্যন্ত ভাল, কি-হোলে চাবি দিয়ে ঘোরাতেই খুলে গেল লক। চার পাশটা দ্রুত নজর বুলিয়ে নিলাম এক বার। লিফ্টের একটা সাইডে দাঁড়িয়ে থাকা জড় লৌহপ্রহরী ছাড়া মনুষ্য অবয়ব নেই কোথাও।

পিছনের দরজা বন্ধ করে টর্চ জ্বালালাম আগে। নিকষ অন্ধকার। কত দিন বন্ধ কে জানে, একটু গন্ধও হয়েছে। এ ঘরের প্ল্যান আলাদা। ঢুকেই সরু প্যাসেজ। তার পর চার ধাপ সিঁড়ি। নেমে ডান হাতের দেওয়ালে আলোর সুইচ। টর্চে দেখে নিয়ে জ্বালালাম। জ্বলল, কিন্তু মাত্র একটা আলো। ছোট একটা এলইডি টিউব। সেটার নীচেই প্রফেসরের রিডিং টেবিল। যাই হোক, এতেই কাজ হবে। ঘরের মাপ মনে হল আমার রুমটার মতোই। সিলিং অন্য রকম। কড়িবরগা দেওয়া। আমারটার মতো আর্চ দেওয়া রিবড ছাদ নয়। উঁচুও অনেকটা। ঢুকে একটা মস্ত ঝাড় বাতি। পিতলের ল্যাম্প বা ক্যান্ডেল হোল্ডারে অবশ্য কোনও পিদিম বা মোমবাতি নেই। নেহাতই শো-পিস। তবে বেশ রাজকীয়। নজর কেড়ে নেয়। ঘরের একটা দিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ পাথরের। বড় বড় স্ল্যাব একদম নিখুঁত ভাবে পরপর বসে গাঁথা হয়ে আছে। একটা গোল জানলাও রয়েছে মনে হল।

এ সব ব্যতীত অন্যান্য আসবাব মোটামুটি আমার ঘরের মতো হলেও আমার ঘরে হ্যাটস্ট্যান্ড নেই। শু-ক্যাবিনেটও ছোট। প্রফেসর হ্যাট পড়তে ভালবাসতেন। অনেক রকম হ্যাট ঝুলছে স্ট্যান্ডটা থেকে। এ ছাড়া আর একটা বড় পার্থক্য হল, আমার ঘরে কোনও বইটই নেই। এ ঘরের চতুর্দিকেই বইয়ের আলমারি। তাদের আকার, আয়তনও নানান রকম। আর সব ক'টিই ঠাসা বইয়ে। জার্নাল, ম্যাগাজ়িনের সংখ্যাও অনেক। মানে প্রফেসর তার সব কিছু নিয়ে পাকাপাকি ভাবেই চলে এসেছিলেন এখানে। এগুলোর উত্তরাধিকার কে হবে? মারিয়াস? জানি না। আমার তো মনে হয়, ভাল কোনও লাইব্রেরিকে দান করাটাই ঠিক হবে।

যাই হোক, এ সব নিয়ে পরে ভাবব। রিকার্ডোর সন্দেহ প্রফেসরের কাজ আত্মসাৎ করার মতলবে রয়েছে মারিয়াস। সেটার নিষ্পত্তি আগে করতে হবে। ঘর জুড়ে অনেক কাগজপত্র, ডায়েরি। আগে দেখব কম্পিউটারটা। রিডিং টেবিলে ডেস্কটপ নেই। ল্যাপটপ আছে দুটো। দুটোই অন করলাম। ব্যাটারি খুবই কম। সঙ্কেত দিচ্ছে লো-পাওয়ারের। তৈরি হয়েই এসেছি আমি। পাওয়ার ব্যাঙ্ক কানেক্ট করলাম। কিন্তু সমস্যা গেল না। ভেবেছিলাম পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকবে। সেটা নেই, কিন্তু তাতে লাভও নেই। হার্ড-ড্রাইভ পুরো খালি। কোনও ফাইলই নেই। এ রকম একটা অনুমান করেছিলাম। সঙ্গে সফটওয়্যার-রিকভারি-টুলস আছে কিন্তু ডেটা উদ্ধার করার সময় নেই। টুলবক্স থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার বার করে ল্যাপটপের কেস খুলে হার্ড-ড্রাইভটাই বের করে নিলাম। অন্যটারও একই অবস্থা, সব ডেটা ডিলিটেড। এটারও হার্ড ড্রাইভ নিতে হল। চূড়ান্ত অন্যায় কাজ করছি। ধরা পড়লে নির্ঘাত বার্গলারির দায়ে হাজতবাস হয়ে যাবে। কিন্তু এ ছাড়া কিছু করারও যে নেই।

ডায়েরি, নোটবুকগুলো ঘাঁটলাম এ বারে। নানা রকম কালি ব্যবহার করেছেন। অস্টোগ্রাফি নিয়ে প্রচুর লেখা দেখছি। প্রচুর কাটাকুটিও। নোটস, ড্রয়িং। একটা খাতায় বেনের ছবি এঁকেছেন অনেকগুলো। রিডিং টেবিলের ড্রয়ারে একটা ফটো পেলাম বেন আর প্রফেসরের। ছোট্ট বেন, ধবধবে সাদা। একদম ছোট্টবেলার। বেতের ঝুড়িতে রেখে তোলা। বাদামি লালচে রং গায়ের রোমের। গলায় লাল রিবন। জিভ বের করে ক্যামেরার দিকে চেয়ে যেন হাসছে। ঝুড়িটা প্রফেসরের হাতে। রোগাসোগা গড়ন। উচ্চতা মাঝারি মনে হল। বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি। কাঁচাপাকা চুল। মুখে একটু অযত্নের দাড়িগোঁফ।

একটা জিনিস দেখছি, ঘরের আসবাবে লক নেই কোনওটারও। ড্রয়ার, আলমারি, ওয়ার্ড্রোব, সবেতেই লকের ব্যবস্থা থাকলেও কোনওটিতেই চাবি দিয়ে রাখেননি প্রফেসর। এক গোছা চাবি ড্রয়ারেই পড়ে আছে। এতে অবশ্য আমারই সুবিধে হচ্ছে। কিন্তু কাজের জিনিস কিছু পাচ্ছি না। প্রফেসরের মোবাইলটাও দেখছি না। অ্যাড্রিয়ানের কথা অনুযায়ী প্রফেসর সে দিন মোবাইল নিয়ে বেরোননি, তবে সেটা গেল কোথায়? মারিয়াস নিজের কাছে রেখে দিয়েছে? হতে পারে। একটা নোটবুকে এই কাস্‌লের ডিজ়াইন নিয়ে নানা রকম ড্রয়িং। খুব জটিল করে এঁকেছেন।

আলমারিও ঘাঁটলাম। বিশেষ কিছু মিলল না। এক বাক্স কনট্যাক্ট লেন্স পেলাম শুধু। চশমার পরিবর্তে লেন্স ব্যবহার করতেন তা হলে। একটা নোটবুকে ফোন নম্বর পাওয়া গেল একটা, আন্ডারলাইন না-করা থাকলে খেয়াল হত না। ফটো তুলে নিলাম মোবাইলে। নাম্বারের পাশে ছোট করে লেখা আইভান। ভাল। ফোন করে দেখব। সময় হু-হু করে চলে যাচ্ছে, সাড়ে তিনটে বাজে। ল্যাবে আর কি ঢুঁ দিতে পারব? কোনও রকম ম্যাগনেটিক কার্ড কিন্তু পাইনি প্রফেসরের রুমে। এই চাবিতে কি খুলবে? টুল বক্সে একটা 'মাস্টার-কি' আছে আমার। সাধারণ লক খুলে ফেলা যায় সেটা দিয়ে। দেখা যাক কপাল কী বলে!

সব গুছিয়ে বেরোলাম ঘর থেকে। দরজা লক করলাম ঠিকঠাক। বাইরে যেন আরও শীত। চাঁদটাদ কিছু দেখা যাচ্ছে না। মেঘ-কুয়াশা সব মিলেমিশে চার দিক কেমন একটা আবছায়া জগৎ সৃষ্টি করে রেখেছে। মার্ক ঠিকই বলেছিল, এমন পরিবেশে দু'-চারটে ভূতপ্রেত না-থাকাটাই অন্যায়।

কিন্তু ঘটনা হল, এ বারে ভাগ্যদেবী বিরূপ। প্রফেসরের চাবিতে ল্যাবের দরজা তো খুললই না। উল্টে আমার 'মাস্টার-কি' দিয়ে চেষ্টা করতে কোথাও অ্যালার্ম বেজে উঠল পিঁ-ই-ই করে। কী সর্বনাশ! মারিয়াসের ঘর উল্টো হাতায়। হয়তো তার ঘরেই বেজেছে। নীচেও হতে পারে। ক্রোনিদ বা ফ্লোরিন ছুটে এল বলে! সোজা ছুটে লুকোনোর জায়গা নেই। লিফ্‌টটাও অচল করে রাখা হয়েছে। যা থাকে কপালে, ভেবে যে দিকে এসেছিলাম উল্টো দিকে ছুটলাম। একটা সুবিধে অন্ধকার, তা ছাড়া মারিয়াস ছাড়া সকলেই শোয় নীচের ফ্লোরে। কিছু সময় আছে নিজের ঘরে ফেরার। উঁহু, তাও কি পারব? দোতলা থেকে কেউ টর্চের আলো ফেলছে তিন তলায়। ল্যাবের সামনেই আলোটা ঘুরছে। দেওয়ালের কাছে ঘেঁষে ছুটছি, কিন্তু আলো এসে পড়তে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। লোহার সিঁড়ি পড়ল সামনে একটা। এক জন লৌহপ্রহরী দণ্ডায়মান। এর বর্মগুলো পরে ফেলে লুকিয়ে থাকা যায়, কিন্তু অনেকটা সময়ের ব্যাপার। একটা কাজ করা যায়, পর পর ঘর, যে-কোনও একটায় ঢুকে পড়লে হয়। তাই করলাম। সামনের দরজাটারই পিতলের হাতল ঘোরালাম। খুলল না। চাবি দেওয়া। বুকের মধ্যে ধক ধক করছে ভীষণ! ধরা পড়লাম বলে। কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কপাল ভাল, 'মাস্টার-কি' তার মাস্টারি দেখাল। লক খুলল। আমিও সুড়ুৎ করে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম ভিতর থেকে।

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করলাম। কোনও সাড়াশব্দ নেই বাইরে। হলেও বুঝতে পারছি না হয়তো, যেমন চওড়া দেওয়াল তেমনি মোটা-মোটা দরজা সব এখানে। টর্চটা অন করলাম। এ ঘরও প্রফেসর ডেফনারের কায়দায়। ঢুকে ছোট প্যাসেজ, তার পর চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘর। লাইটের সুইচ দেখতে পাচ্ছি। জ্বালব? জানলা থাকলে বাইরে আলো যাবে। প্রফেসরের ঘরে জানলা থাকলেও কপাট বন্ধ ছিল। পর্দাও ছিল মোটা। যদিও কিছুই আর ভাবতে হল না। সাহস করে সুইচ টিপে আলো জ্বলল না। হতে পারে অন্য কোনও সুইচ আছে বা অন্য ঘর থেকে আলো জ্বালানো যায়। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধও ঘরটায়। প্রফেসরের ঘরেও বদ্ধ ঘরের গন্ধ ছিল, কিন্তু এখানে কেমন অন্য রকম। চার ধাপের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বুঝলাম কেন?

এ ঘরটা আসলে মারিয়াসের অ্যান্টিক সামগ্রীর স্টোররুম। নানা রকম কিউরিও জিনিসে ভর্তি। দুটো ফুলসুট-আর্মার, মানে লোহার বর্মধারীও রয়েছে। একটা আর্মার দেওয়ালের ধারে, একটা খোলা প্যাকিং বক্সে শোয়ানো। বর্মগুলো আলগা-আলগা, খাপে-খাপে বসানো নেই। বুক, হাত, পা, মাথা সব আলাদা-আলাদা করে রাখা। কব্জির বর্মে টর্চের আলো পড়তে একটু খটকা লাগল। যে-চাকতিটা আমি পেয়েছি, ঠিক তেমনিই একটা চাকতি বর্মের উপরে লাগানো। অবিকল এক। সিংহের মুখওয়ালা, সাইজ়টাও মিলছে। অন্য হাতের বর্মটা পাশে শোয়ানো, কিন্তু সেটায় কব্জির অংশে চাকতি নেই। অথচ লোহায় প্যাঁচ রয়েছে। মানে সেটা খুলে পড়ে গেছে। খুব ভাল করে সব ক'টা অংশ দেখলাম। চাকতিটা নেই। খুব ইচ্ছে করছে আমার ঘর থেকে চাকতিটা এনে দেখি ফিট করে কিনা। রহস্যের জট দেখছি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই বর্মের অংশ যদি চ্যাটালো পাথরটার নীচে পড়ে, তবে সেটা ওখানে গেল কী করে? শুধু চাকতিটা নিয়ে কেউ নিশ্চয়ই ওখানে ফেলে আসবে না। এ-ও হতে পারে এই আর্মার-সেটে চাকতিটা ছিলই না। আমি যেটা পেয়েছি, এটার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিন্তু মন মানতে চাইছে না। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইটে ফটো তুলে নিলাম ভাল করে।

কপাল ভাল, ঘরে ফিরতে অসুবিধে হল না তেমন। তবে আরও কিছু ক্ষণ ছিলাম ওই ঘরে। চারটে নাগাদ একটা কল এসেছিল মোবাইলে। মারিয়াস। অসময়ে ফোন করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল আমি কোথায়? ঠিক আছি কি না। বললাম, "হ্যাঁ, ঠিকই তো আছি। কেন?"

"কিছু না। সিকিউরিটি বলল বার্গলারস অ্যালার্ম বেজেছিল। ফল্‌স মনে হচ্ছে। ঠিক আছে। ঘুমিয়ে পড়ুন তাড়াতাড়ি। কাল সকাল দশটায় গাড়ি কিন্তু।"

আরও একটু ক্ষণ অপেক্ষা করে বেরোই। জানি না, মারিয়াস টের পেল কিনা। বাইরে তখনও অন্ধকার। কেউ দেখলে পায়চারি করার ভান করব। ভোরে হাঁটছি আর কী! ঘরে ঢুকছি যখন, দেখি বারান্দার এক প্রান্তে গাউন পরিহিতা কেউ দাঁড়িয়ে দেখছেন আমায়। মনে হল মিসেস দাচিয়ানা।

॥ ৬ ॥

দুপুর পৌনে বারোটা। উরিকানি টাউনের পুলিশ-স্টেশন পলিশিয়া উরিকানিতে বসে আছি। পরিচয় জানিয়ে চার্জ-ইন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাই জানিয়ে অনুরোধ করেছিলাম। সে আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। তবে অফিসার একটু ব্যস্ত। মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করতে হবে। কফি পান করব কি না জিজ্ঞেস করল। ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু এই দুপুরেও এত শীত করছে নিয়েই নিলাম। তা ছাড়া ক্লান্তও লাগছে, ঘুমও পাচ্ছে খুব। কফি খেলে ভালই লাগবে। গত কাল যা একটা অ্যাডভেঞ্চার গেল। এখনও নার্ভগুলো সতেজ হয়নি যেন।

রুমে যখন ফিরি, ভোর প্রায় সাড়ে চারটে। এত উত্তেজিত ছিলাম প্রথমটায় ঘুমই আসছিল না। রহস্যের নেশায় ছুটে অনেক বিচিত্র কাণ্ডকারখানায় জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু এমন অবস্থা কখনও হয়নি। স্বাভাবিক যুক্তিতে কুকুরটির উধাও হওয়া ছাড়া সে রকম কোনও রহস্যই নেই। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে প্রচুর খটকা। প্রচুর পাজ়ল ছড়িয়ে। সমাধান করা যাবে না, এমন না, কিন্তু করব কী ভাবে? সেটাই ভেবে যাচ্ছিলাম। যাই হোক, এ ভাবে ঘুমিয়েও পড়ি এক সময়।

মিসেস দাচিয়ানা ফোন করে ঘুম ভাঙান। সকাল সাড়ে ন'টা বাজে তখন। বললেন, "ডক্টর ভাকারেস্কু আপনাকে ফোন করতে বললেন, এক বার ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঘুরেও গেছি। দশটার মধ্যে বেরোবেন বলেছিলেন, গাড়িও এসে পৌঁছল বলে।"

বললাম, "পাঁচ মিনিটে তৈরি হচ্ছি, আপনি ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসুন।"

মিসেস দাচিয়ানা এলেন আরও দশ মিনিট পর। রোজ যেমন থাকে, তেমনি পদ। মারিয়াস কোথায় জিজ্ঞেস করে জানলাম, তিনি আজ সকালেই ল্যাবে ঢুকে পড়েছেন। মানে তদন্ত করতে গেছেন, চোর শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পেরেছিল কি না। এক দিকে ভাল, প্রফেসরের ঘরটা সন্দেহের মধ্যে নেই, অন্তত এখনও পর্যন্ত।

মিসেস দাচিয়ানা প্লেট রেখে চলে যাচ্ছিলেন, যদিও মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চান। বললাম, "আপনি বলছিলেন, এখানে আর ভাল লাগছে না। কাজ ছেড়ে দেবেন..."

"হ্যাঁ। যতই ভোল ফেরানো হোক, এই হানাবাড়িতে আর ভাল

লাগছে না আমার। এটা সত্যিই অশুভ। বদনাম আছে,” বললেন মিসেস দাচিয়ানা। একটু চুপ করে থেকে শুরু করলেন আবার, “তখন বলিনি আপনাদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে জার্মান নাৎসি সেনাপতি এই ম্যানসনের দখল নেন, তিনি নিজে ইংরেজি লেখক ব্রাম স্টোকারের ওই ড্রাকুলা কাহিনিতে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস না ভয় কে জানে? নেকড়ে, বাদুড় এরা হল ড্রাকুলার সঙ্গী, সহচর। রোমানিয়ার এ সব অঞ্চলে প্রচুর নেকড়ে। সাহেবের হুকুমে নির্বিচারে নেকড়ে নিধন শুরু হল। যে সব নেকড়ে শিকারে মরত না, সেগুলোকে বেঁধে এনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত এখানে। কতটা নির্মম ব্যাপার! ঘটনা হচ্ছে, শেষে নেকড়েই প্রাণ নেয় সেই সেনাপতির। আগেই বলেছি, জার্মানদের হটিয়ে রুশ ও রোমানীয় সৈন্যরা কাস্‌লের দখল নিয়েছিল। অধিকাংশ জার্মান নিহত হয়। কিছু বন্দি, আর দু’-চার জন পালাতে পেরেছিল। সেনাপতি সাহেব পালিয়েছিলেন বটে। কিন্তু প্রাণে বাঁচেননি। জঙ্গলে এক দল হিংস্র নেকড়ের কবলে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। রুশরাও একটা সময় চলে যায়, কিন্তু এই ম্যানসনের নাম লোকমুখে ‘নেকড়ে দুর্গ’ হয়ে যায়। এখনও নাকি নিশুত রাতে মৃত সব নেকড়েদের আত্মা ঘুরে বেড়ায় এই ম্যানসনে।”

বললাম, “এ রকম লোককথা সব প্রাচীন বাড়ি, দুর্গটুর্গ নিয়ে সব দেশেই আছে। আপনি এত দিন আছেন, আপনার নিজের এ রকম কোনও অভিজ্ঞতা হয়েছে?”

“এত দিন হয়নি। কিন্তু, ইদানীং হচ্ছে। নেকড়ে না, কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। ডাকও ঠিক না, কান্না। এবং আমার বিশ্বাস, সেটা প্রফেসর ডেফনারের কুকুর বেনের,” বললেন মিসেস দাচিয়ানা।

“মানে, আপনার ধারণা বেনেরও মৃত্যু হয়েছে এবং ওর আত্মা ...”

“এ ছাড়া আর কী হতে পারে?” আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন মিসেস দাচিয়ানা, বিষয়টা যেন এমনই জলের মতো সরল, “আত্মা তো, স্পিরিট। নিরাকার, মৃত। তার করার কিছু নেই। করতে পারলে তো পৃথিবীতে সব খুনিই শাস্তি পেত। পুলিশকে ছুটতে হত না। আসলে সে কেবল কষ্ট করে কিছু সঙ্কেত দিতে পারে মাত্র। তাও অধিকাংশই পারে না। কেউ-কেউ পারে। যেমন বেন পারছে। তাও কত ক্ষণ পারবে জানি না। বুঝেছেন?”

“এই জন্যেই এখান থেকে চলে যেতে চান?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“হ্যাঁ। বেনের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার করারও কিছু নেই। এই ভাবে থাকা যায় না। তা ছাড়া সত্যিই এই হানাবাড়িতে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। আজকে মাসের শেষ দিন। দু’-এক দিনের মধ্যেই চলে যাব আমি। আমার গ্রামই ভাল।”

“সে দিন বেনকে শেষ কখন দেখেছিলেন, মনে আছে?”

“বেন বেশি নীচে নামত না। দিনে এক বার কেবল ওই প্রফেসরের বাইরে যা বেরোত। ঘরেই থাকত বেশি। ল্যাবে যেত কখনও-সখনও। নয়তো ল্যাবের বাইরে শুয়ে ঘুমোত। সে দিন মনে হচ্ছে প্রফেসরের সঙ্গে ল্যাবের মধ্যেই ছিল।”

“বেন কি অসুস্থ ছিল?” জিজ্ঞেস করলাম আমি, “ফ্লোরিন বলছিল প্রফেসর ওকে সে দিন বিকেলে কোলে নিয়ে বেরিয়েছিলেন।”

মিসেস দাচিয়ানার ভুরু অনেকটা কুঁচকে গেল, “ফ্লোরিন বলেছে! ওর তো মোবাইলে গেম খেলা ছাড়া কাজ নেই কোনও। ও বলেছে প্রফেসর বেনকে কোলে নিয়ে বেরোচ্ছিল? বলতে পারব না, অ্যাড্রিয়ানের সঙ্গে দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছিলাম আমি।”

“প্রফেসর কোনও রকম মানসিক চাপে ছিলেন?”

“মানে?”

“মানে, শুনলাম একটা জটিল গবেষণা করছিলেন। ডক্টর ভাকারেস্কুর দিক থেকে কোনও তাড়াহুড়ো ছিল কিনা?” এসওএস-এর বিষয়টা উল্লেখ না-করে বললাম।

“গবেষণার বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। তবে মন-মেজাজ কয়েক দিন যেন ভাল ছিল না প্রফেসরের। ডক্টর ভাকারেস্কুদের সঙ্গে ডিনার খেতেন এক সঙ্গে। কয়েক দিন একলাই খাচ্ছিলেন নিজের ঘরে। একলা মানে, বেনের সঙ্গে। বেন-ই ছিল তাঁর এক মাত্র বন্ধু।”

এর মধ্যে দেখি আচমকা মারিয়াস সস্ত্রীক এসে হাজির। বললেন, “আপনার গাড়ি এসে গেছে। ভাড়া দেবেন না, পে করা আছে। আর হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে এত দিন আলাপ করাতে পারিনি, ইনি তেরিকা, আমার স্ত্রী।”

তেরিকা ভাকারেস্কু অভিবাদন করলেন রোমানীয় কায়দায়। ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা। খয়েরি রঙা একটা লং-গাউন পরেছেন। মুখটা সরু, প্রসাধন বিহীন। চোখে-মুখে কেমন যেন একটা অহেতুক সতর্কতা। দেখে বুঝলাম না, হাঁটুর ব্যামোয় ভুগছিলেন কি না। প্রফেসর ডেফনারের প্রসঙ্গ তুলতে যাচ্ছিলাম, নাম করা মাত্র থামিয়ে দিলেন, “মাফ করবেন। ওঁকে আনাটাই ভুল ছিল আমাদের। নিজে তো গেলেনই, জানি না কুকুরটাকে কোথায় রেখে গেলেন।”

ভাব দেখে বুঝলাম, প্রফেসরের বিষয়ে কথা বলতে চাইছেন না। এই ক’দিনের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানালাম। আরও দু’-চারটে টুকটাক কথার পর বিদায় নিলেন ওঁরা। চলে যেতে মিসেস দাচিয়ানাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘এমন কি হতে পারে যে বেনকে রোমানি ভবঘুরেরা নিয়ে গেছে?’’

“না, না,” জোরে-জোরে মাথা নাড়লেন মিসেস দাচিয়ানা, “তা ছাড়া ওই সময়ে এখানে ওরা কেউ ছিলও না।”

“আপনি ঠিক জানেন?”

“একশো শতাংশ ঠিক জানি। ওরা এখানে এলেই আমার জন্য কিছু উপহার আনে। এই গত হপ্তায় এসেছে ওরা। হয়তো আসবে কেউ আমার খোঁজে। এরা আবার রোমাদের পছন্দ করে না। তাই অপবাদ দিচ্ছে। আমি বলছি, বেন নেই। কেউ তাকে মেরে ফেলেছে। আপনার নিজের কী মনে হয়?”

বললাম, “হ্যাঁ। আমারও তাই ধারণা।”

“আমি জানি। সেই জন্যই ভাকারেস্কুকে বলিনি আপনিই কালকে রাতে ল্যাবে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন,” বললেন মিসেস দাচিয়ানা।

ইতিমধ্যে অ্যাড্রিয়ান দেখি হাজির হল দরজায়, “আপনার গাড়ি অপেক্ষা করছে। স্যর দেরি করতে বারণ করলেন।”

মিসেস দাচিয়ানাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অবশেষে সুটকেস সমেত গাড়িতে উঠে বসি। কাণ্ড হল একটু পর। ড্রাইভার লোকটির মুখে মাস্ক, চোখে সানগ্লাস। বললাম, যাওয়ার পথে উরিকানি টাউন দিয়ে যাব। একটু নামার আছে। লোকটি মাথা নেড়ে সায় দিল। কিন্তু একটু পর মনে হল, যে-পথে এসেছিলাম সেটা না, গাড়ি অন্য পথ দিয়ে চলেছে। জিজ্ঞেস করতে বলল, শর্টকাটে যাচ্ছে। চালাতে-চালাতে ফোনেও কথা বলছে বার বার। আমি মোবাইলে গুগল ম্যাপ দেখছি। ইতিমধ্যে রিকার্ডোকে ফোন করে জানালাম ম্যানসন থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আমার নৈশ অভিযানের বিষয় কিছু বললাম না। মারিয়াস আগেভাগেই যে কার-রেন্টালে গাড়ি বুক করে রেখেছিল সেটাই বললাম। শুনে ও-ও বলল, ‘‘ঠিকই করেছ চলে এসে,’’ আরও বলল, ফেরার পথেই রয়েছে। উরিকানি পৌঁছতে আরও ঘণ্টা তিনেক লাগবে। পৌঁছে ফোন করবে।

যাই হোক, গোলমাল হল না। আরও মিনিট চল্লিশের মধ্যে উরিকানি পৌঁছে গেলাম। পাহাড়ি ছোট শহর। খুব সুন্দর। সাজানো, পরিচ্ছন্ন। একটা সময় এই সব মুলুক কয়লা খনির জন্য বিখ্যাত ছিল খুব। ড্রাইভার লোকটি বলল, সে বেশি ক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না। তাকে নির্দিষ্ট টাইমে বুখারেস্ট পৌঁছতে হবে। আমার উদ্দেশ্য তো থানায় আসার। কত ক্ষণ লাগবে জানি না। ছেড়েই দিই লোকটিকে। অ্যাপ ক্যাব ডেকে নেব, এ সুবিধে এখন সব দেশেই।

“স্যর, স্যর, এ বার আপনি যেতে পারেন। সোজা গিয়ে ডান দিকের ঘর,” এক জন কর্মী এসে জানাল আমায়। চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে

পড়েছিলাম। ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম।

ছিমছাম ঘর। ইনচার্জ ইনস্পেকটরের নাম পম্পিলিউ গ্রোসু। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। হাবেভাবে বেশ একটা পুলিশি গম্ভীরতা। বছর পঞ্চাশেক বয়স। পরিচয় দিয়ে বললাম, আপাতত মারিয়াস ভাকারেস্কুর ম্যানসন থেকে ফিরছি। সেখানে দিন তিনেকের অতিথি ছিলাম।

ভদ্রলোক কিছুটা শুনেই বললেন, "বরিস ডেফনারের বিষয়ে কিছু বলবেন? ভাল সময়ে এসেছেন। কিছু ক্ষণ আগেই আমাদের একটা টিম প্রফেসরের কুকুরটাকে পেয়েছে। এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা নালার ধারে। টিনএজারদের একটা দল ওখানে ক্যাম্পিং করতে গেছিল। তাঁবু টাঙাতে গিয়ে কুকুরটা পায়। ওরা নিজেরাই পুলিশকে ফোন করে ডেকে আনে। টনস অফ থ্যাঙ্কস টু দেম। কুকুরটা মারা গেছিল, কেউ হয়তো মাটিতে কবর দেয়। জিওফ্রি ম্যানসনে খবরও দিয়েছি, কাউকে পাঠিয়ে শনাক্ত করার জন্য। এক সেকেন্ড, ফটো দেখাচ্ছি।"

হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো ফটো। দুটো। প্রথমটায় গর্তের মধ্যে থেকে বের করা হচ্ছে একটা কুকুরের শব। অন্যটা কাছ থেকে নেওয়া, নিদারুণ দৃশ্য, কুকুরটার চোখ দুটো নেই। হয়তো সে কারণেই ছেলেগুলো পুলিশকে ফোন করেছিল। পম্পিলিউয়ের ধারণা, কোনও জানোয়ারে খুবলেছে কিংবা পচনের ফলেও হতে পারে নাকি।

তাই কী? জানি না। কোথাও যেন একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ দেখতে পাচ্ছি। অপরাধীও যেন চেনা। কিন্তু প্রমাণ নেই। পম্পিলিউকে কি জানাব আমার নিজের তদন্তের কথা? উঁহু, থাক, আর একটু পর। হার্ড ডিস্কে কী আছে নিজে দেখি আগে।

পম্পিলিউ অবশ্য নিজে অনেক কিছু প্রশ্ন করলেন আমাকে। মারিয়াস থেকে শুরু করে ম্যানসনে যারা আছে তাদের আচার-আচরণ, সন্দেহজনক কিছু দেখেছি কিনা, এ সব। ফ্লোরিনের কথা বললাম, সে বলছিল কুকুরটা অসুস্থ ছিল। কোলে নিয়ে বেরিয়েছিলেন প্রফেসর।

"এক মিনিট," বলে কম্পিউটারে একটা ফাইল খুললেন পম্পিলিউ, একটু চোখ বুলিয়ে বললেন, "এখানে দেখছি ফ্লোরিন লোকটা এই কথাটা উল্লেখ করেনি। প্রফেসর যেমন রোজ বেরোতেন, সে রকম বেরিয়েছিলেন। কুকুরও সঙ্গে ছিল। কুকুরটা অসুস্থ ছিল বলে কোলে করে নিয়ে বেরোন, এমন তো বলেনি সে। এখন তো আর একটা সম্ভাবনা দেখছি, কুকুরটা হয়তো মরেই গেছিল। প্রফেসর ওকে কবর দিয়ে নিজেও পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুনেছেন তো, কুকুরটা প্রাণ ছিল প্রফেসরের। ওঁর এক মাত্র ছেলেও মারা গেছিল দুর্ঘটনায়। বউও চলে গেছে। অবসাদে ভোগাই স্বাভাবিক।"

বললাম, "তা কী ভাবে সম্ভব, কুকুরটা পাওয়া গেছে এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। মানে প্রফেসর যেখান থেকে পড়েছেন তার থেকে অন্তত পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূর। তা ছাড়া কুকুরটার চোখ..."

"ইয়েস ইয়েস, আই গট ইয়োর পয়েন্ট," বললেন পম্পিলিউ। একটা ফোন আসছিল, ফোনটা ছেড়ে বললেন, "দেখুন বরিস ডেফনার লাইমলাইটের পিছনে থাকলেও তিনি এ দেশের এক জন নামী মানুষ। তাঁর ও রকম মৃত্যু নিয়ে আমাদের উপরেও চাপ আছে। আমরা যথেষ্টই গুরুত্ব দিচ্ছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সন্দেহজনক কিছু আমরা পাইনি। মনে তো হচ্ছে আত্মহত্যাই করেছেন। একটা লুজ় এন্ড ছিল, কুকুরটার হদিস মিলছিল না, সেটাও পাওয়া গেল।"

বললাম, "প্রফেসরের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা যদি বলেন।"

"বলছি, কিন্তু বলার কথা না। নেহাত আপনি বলেই..." আর একটা ফাইল খুললেন পম্পিলিউ, নজর বুলিয়ে বললেন, "টাইম অফ ডেথ হল সাত তারিখ দুপুর আড়াইটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। এর থেকে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এমনই একটা জায়গায় পড়েছিলেন, পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে যায় আমাদের।"

বললাম, "বুঝেছি, কিন্তু আপনি বলছেন আড়াইটে থেকে, কিন্তু উনি পৌনে চারটের সময় বেরিয়েছিলেন।"

"প্লিজ় ওয়েট, লেট মি ফিনিশ, মৃত্যুর কারণটাও শুনুন। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। এ বার কী বলবেন? আগেই মারা গেছিলেন, তার পর কেউ এনে নীচে ফেলে দিয়েছে? কী করে সম্ভব সেটা? মোটিভই বা কী? সে সময় সকলে ম্যানসনে ছিলেন। যাঁরা ছিলেন না, তাঁদের স্টেটমেন্টও আমরা ভেরিফাই করে দেখে নিয়েছি। কেউ মিথ্যে বলেনি," বললেন পম্পিলিউ। সাত তারিখ কে কোথায় ছিল তারও একটা বিবরণ সংক্ষেপে শুনিয়ে দিলেন ফাইল থেকে। অ্যাড্রিয়ান যেমন বলেছিল সে রকমই। কিন্তু কোথাও একটা খটকা আমার থেকেই যাচ্ছে। বিশেষ করে কুকুরটার খবর শোনার পর। পম্পিলিউ লোকটি যেন অতি সরলীকরণ করতে চাইছেন কেসটায়।

"আমি জানি আপনি কী ভাবছেন," আমার মুখ দেখে বললেন পম্পিলিউ, "হতে পারে ওই পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে থাকাকালীনই অ্যাটাকটা হয়। ম্যাসিভ অ্যাটাক। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান নীচে। প্রাণ হারিয়ে ঝুলে থাকেন কোনও গাছের উপর। একটু পর গাছের ডালটা ভার বইতে না-পেরে ভেঙে যায়, উনি নীচে পড়েন। ইনজুরি মার্কগুলোও তৈরি হয়।"

বললাম, ''হতে পারে! যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কুকুরের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এলে প্লিজ় জানাবেন।''

"আমার মনে থাকবে না। হঠাৎ কাজের প্রেশার বেড়ে গেছে আমাদের। অনেকটা এরিয়া কভার করতে হচ্ছে ইদানীং। জিওফ্রি ম্যানসনই তো কতটা দূর এখান থেকে। তবু কয়েক মাস হল ওটা আমাদের জুরিসডিকশনে চলে এসেছে," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন পম্পিলিউ। মোবাইল নম্বর দিলেন নিজের। আমি আরও এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম পোলিশিয়া-উরিকানি থেকে।

খিদে পাচ্ছে। ব্রেকফাস্ট হজম করে ফেলেছি মনে হচ্ছে। একটা বাজে প্রায়। একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে খাবারের অর্ডার দিলাম। মার্ককে সব জানাতে ইচ্ছে করছিল। থাক, রাত্তিরে শান্ত মনে করব। তাও ম্যানসন ছেড়ে যে চলে এসেছি, সেটা জানিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করলাম একটা। কুকুরের পরিণতিটাও জানালাম। মিসেস দাচিয়ানার কথাগুলো মনে পড়ছে খুব। আত্মার আর কতটুকু ক্ষমতা, সে একটু সঙ্কেত পাঠাতে পারে মাত্র। তাও সকলে পারে না। কেউ-কেউ পারে। প্রফেসর বরিস ডেফনার পারেননি। বেন পেরেছে। পম্পিলিউকে কি এ সব বলা যেত? বিশ্বাস করত সে?

রিকার্ডোকে ফোন করলাম একটা। রিং হয়ে-হয়ে থেমে গেল। ফোন ধরল না। ওর সঙ্গে এক বার দেখা হলে ভাল হত। খাওয়া হয়ে গেছিল, দাম মিটিয়ে ফুটপাতে নেমে আর এক বার কল করলাম রিকার্ডোকে। এ বারেও বেজে-বেজে থেমে গেল।

॥ ৭ ॥

ডিসেম্বরের দু'তারিখ আজকে। বিকেল চারটে এখন। পরশু রাতে ফিরেছি বুখারেস্টে। সরাসরি আসার কোনও ক্যাব পেলাম না। ফলে ঝক্কি পোয়াতে হল একটু। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে হল বুমবেসতি-জিউ বলে একটি টাউনে। সেখান থেকে সরাসরি বাস যায় বুখারেস্ট। প্রায় ছ'ঘণ্টার জার্নি ছিল। রাত সাড়ে আটটায় পৌঁছই। যে-হোটেলে ছিলাম সেখানে না-উঠে পিয়াতা উনিরি-তে একটা হোটেলে উঠেছি। লোকেশন হিসেবে খুব ভাল, মেট্রো, ট্রাম, বাস সব কয়েক পা হেঁটেই। ফিরে এসে আগে বসি হার্ড ড্রাইভ দুটো নিয়ে। কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। ডেটা উদ্ধার করতে পারছি না। ইতিমধ্যে মার্ককে মোটামুটি বিস্তারিত সব জানিয়েছি। ওর বাবা এখন বিপন্মুক্ত, হালকা একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। হার্ড ড্রাইভের ব্যাপারে বলল, ডেটা উদ্ধার না-হলে ড্রাইভটা ওকে এক্সপ্রেস কুরিয়ার করে দিতে। চেষ্টা করে দেখবে। সে তো করতেই হবে, আমি আরও এক বার চেষ্টা করছি। প্রসেসিং চলছে, দেখা যাক কী হয়।

বসে না-থেকে প্রফেসরের নোটবুকে পাওয়া ফোন নম্বরটায় কল করলাম। মনে হল এক জন বৃদ্ধ ফোন ধরলেন, "বুনা জিউইয়া?"

ইংরেজিতে হ্যালো আর কী। এর আগেও এ দেশে এসেছি, তখন কিছু ভোকাবুলারি শিখেছিলাম। এ বারে আরও একটু জ্ঞান বাড়িয়েছি। রোমানীয় আর ইংরেজি মিশিয়ে বললাম, "আমি প্রফেসর ডেফনারের কাছ থেকে আপনার নম্বরটা পেয়েছি..."

"বরিস, বরিস ডেফনার? সে তো মারা গেছে। কাগজে পড়েছি আমি। আপনি কে, পুলিশ না প্রেস? ইংরেজিতেই কথা বলুন। আমি বুঝি। লিখতে-বলতেও পারি।"

ধন্যবাদ জানিয়ে পরিচয় দিলাম।

ভদ্রলোক মনে হল খুশি হলেন, "আমিও ছাত্র পড়াতাম একটা সময়। বলুন, কী প্রয়োজন?"

"আসলে আমি প্রফেসর ডেফনারের জীবনী লিখতে চাই। সে জন্য অনেক তথ্যের প্রয়োজন। যদি একটু দেখা করা যায় আপনার সঙ্গে..."

"দেখা কেন করা যাবে না! কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন তো?"

"দুটো ডোজ়ই।"

"কোত্থেকে বলছেন আপনি?"

"বুখারেস্ট।"

"সে তো অনেক দূর। আমি থাকি গালাচি কাউন্টির একটা গ্রামে। যেতে-আসতেই আপনার আট-দশ ঘণ্টা লেগে যাবে। ফোনেই বলুন না, কী জানতে চান?"

একটু ভাবলাম, ফোনে কি বলা যায় আমি ডেফনারের মৃত্যুর তদন্ত করছি? বললাম, "আমার অসুবিধে হবে না। চলে আসব।"

ভদ্রলোক ঠিকানা দিলেন একটা। বললেন, ''যে-কোনও দিন আসতে পারেন। তবে সন্ধে যেন না হয়।''

ফোন রাখার পর খেয়াল হল, ভদ্রলোকের পুরো নামটা জানা হল না। অসুবিধে নেই অবশ্য, ঠিকানা তো দিয়েই দিলেন। সরল মানুষ মনে হল বেশ। কোত্থেকে ফোন-নম্বরটা পেলাম জিজ্ঞেসও করলেন না। হয়তো খেয়াল করেননি।

রিকার্ডোকে ফোন করলাম আবার। আশ্চর্য ব্যাপার বটে, এ বারে সুইচড অফ। ওখান থেকে ফিরে এই নিয়ে চার-পাঁচ বার ফোন করলাম ওকে। কল ব্যাক করা তো দূরের কথা, ফোনটাও দেখছি এখন সুইচড অফ করে রেখেছে।

কী করি, মিসেস দাচিয়ানাকে ফোন করলাম, "আচার্য স্যর?" ধরলেন ভদ্রমহিলা।

''হ্যাঁ,'' বলে জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন, ম্যানসনের কী খবর।

"খবর আর কী? যে রকম দেখেছিলেন, তেমনি আছে। আমি তো কাজ ছেড়ে দিয়েছি। এই কিছু ক্ষণ হল বাড়ি ফিরলাম। কফি নিয়ে বসেছি, আপনি ফোন করলেন। আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিই, অবশ্য এটা জানাই ছিল। প্রফেসরের কুকুরটিকে পাওয়া গেছে। যে দিন গেলেন, সে দিনই বিকেলে পুলিশ এসে জানাল।"

কুকুরটির চোখেও যে নির্মম আঘাতের চিহ্ন ছিল, দাচিয়ানা কি জানেন? হয়তো না। জানলে ঠিক বলতেন। আমি আর উল্লেখ করলাম না। বললাম, "আসলে একটা কারণে আপনাকে ফোন করেছিলাম। রিকার্ডো স্যরকে ফোনে পাচ্ছি না কিছুতেই।"

"রিকার্ডো, মানে বুগনার স্যর তো? উনিও তো কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি যে দিন যান, সে দিন বিকেলে উনি ফেরেন শহর থেকে। রাতে নাকি ডক্টর ভাকারেস্কুর সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল। আমি জানি না, এলভিরা বলছিল। তাতেই মনে হয় রাগ করে চলে যান। পর দিন সকালেই। সকাল বলতে খুব ভোরে। ম্যানসনের বাইরে থেকে ক্যাবট্যাব ডেকে নিয়েছিলেন হয়তো।"

অবাক হলাম খুব। রিকার্ডো কিছু বলল না তো আমাকে। বললাম, "ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে ফোন ধরবে না কেন? আমার সঙ্গে তো কিছু হয়নি। আর এখন তো দেখছি ফোনটাই সুইচ্‌ড অফ।"

"তাই তো! কী জানি! আপনি ডক্টর ভাকারেস্কুকে ফোন করে জিজ্ঞেস করুন না," একটু ভেবে বললেন মিসেস দাচিয়ানা।

ধন্যবাদ জানিয়ে লাইন ছেড়ে দিলাম। কী সব কাণ্ড হয়ে চলেছে? রিকার্ডো কাজ ছেড়ে দিল? বনিবনা হচ্ছিল না, সেটা বলেছিল। কিন্তু শেষ যা কথা হয়েছে, তাতে কাজ ছাড়ার কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। আমার প্রতিও যে কোনও বিরূপতা পোষণ করছে, এমনও মনে হয়নি। আর একটা মানুষ সাত সকালে, বলতে গেলে এক কাপড়ে ওই রকম একটা দুর্গম মুলুক থেকে চলে গেল! নাহ, ঘটনাটা মানতে কষ্ট হচ্ছে। এখুনি এক বার জিওফ্রি ম্যানসনে গেলে ভাল হত। অবশ্য, একলা গিয়েই বা কী করব? মারিয়াস তো ঢুকতেই দেবে না কোথাও। উত্তরও দেবে না ঠিকঠাক। ইনস্পেক্টর পম্পিলিউকে ফোন করব? কিন্তু জোরালো প্রমাণ তো নেই। তা ছাড়া মারিয়াস ধনী লোক। সব দেশেই বিত্তবানদের ঘাঁটাতে চায় না কেউ।

মাথা কাজ করছে না। শেষে মিসেস দাচিয়ানার কথা মতো মারিয়াসকেই ফোন করলাম। বার তিনেক রিং হতেই ধরল, "আপনি তো আচ্ছা লোক! পৌঁছে জানালেন না? গাড়িও শুনলাম ছেড়ে দিয়েছিলেন। তা আছেন কোথায় এখন? উরিকানিতেই?"

বললাম, "খুব দুঃখিত। কাজের চাপে দেরি হয়ে গেল। উরিকানি না, বুখারেস্টেই আছি। আপনাদের খবর বলুন, কেমন আছেন? গবেষণার কাজকর্ম কেমন চলছে, আপনিও তো কিছু বললেন না, কত দিন থাকলাম।"

মারিয়াস বলল, "বেড়াতে এসেছিলেন, সেখানেও কাজের কথা বলা যায়? ভালই আছি সবাই। তা উরিকানিতে হঠাৎ নেমে পড়লেন কেন?"

"কাজ ছিল একটা। খিদেও পাচ্ছিল হঠাৎ। ড্রাইভারকে বলেছিলাম অপেক্ষা করতে, রাজি হল না। তাড়া ছিল বলল," বললাম আমি।

"ও, আচ্ছা। ভাববেন না, পে করা ছিল বলে জিজ্ঞেস করলাম। কথাই ছিল যাওয়া-আসার দায়িত্ব আমার। ঠিক আছে, রাখি তা হলে?"

"একটা কথা, রিকার্ডোকে ফোনে পাচ্ছি না। ওকে একটু যদি ফোন করতে বলে দেন আমাকে," তাড়াতাড়ি বললাম আমি।

"রিকার্ডো? ওর কথা আর বলবেন না," বিরক্তির স্বরে বলল মারিয়াস, "কোনও কাজের না। ওকে এখানে না-আনলেই ভাল ছিল। চলে গেছে ও। কাজ ছেড়ে দিয়েছে। পালিয়ে গেছেও বলতে পারেন। কী করেছে জানেন? আমাদের সমস্ত রিসার্চ পেপার, সব কাজকর্ম চুরির মতলবে ছিল। এক সঙ্গে কাজ করার কোনও চুক্তিই মানেনি। কত নথিপত্র উধাও! বলেছিলাম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফেরত দিতে। ফেরত কি আর দেয়! সটান পালিয়েছে ম্যানসন থেকে।"

"কী বলছেন? অবিশ্বাস্য!" খুব অবাক গলায় বললাম আমি, "কিন্তু পালাল কী করে? আপনার গেট তো বন্ধ থাকে।"

"গেটে কি আর বলে রেখেছিলাম! বাড়ির লোক বেরোতে চাইলে ফ্লোরিনরা কেন আটকাবে?"

"তা ঠিক, পুলিশে খবর দিয়েছেন?"

"এখনও দিইনি। তবে দেব। গুডবাই," লাইন কেটে গেল। আশ্চর্য, কুকুরটাকে যে ওই অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেটারও উল্লেখ করল না মারিয়াস। নথিপত্র উধাও মানে কী? হার্ড ড্রাইভ বোঝাল? মারিয়াসের এই একটা স্বভাব, কক্ষনও স্পষ্ট করে কথা বলে না। আর এখন তো দেখলাম ফোন ছেড়ে দিতে পারলেই বাঁচে। নাহ, গন্ডগোল, ভীষণ গন্ডগোলের ইঙ্গিত পাচ্ছি। রিকার্ডোর বিষয়টা খুবই চিন্তার। কী জানি, ওর অবস্থাও প্রফেসর ডেফনারের মতো হয়নি তো?

মার্ককে ফোন করলাম আবার। সব শুনে ও-ও চিন্তিত। বলল, ওর এক রোমানিয়ান ছাত্র আছে, তার মা বুখারেস্টের পুলিশ বিভাগে উঁচু পদে চাকরি করে। ছেলেটিকে বলে দেখছে, যদি সে কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারে। ঘণ্টা খানেক পরে ফোন করে জানাচ্ছে।

এ দিকে এত মন্দের মধ্যে একটা ভাল খবর। অনেক লড়াইয়ের

পর একটা হার্ড ডিস্কের ডেটা কিছুটা উদ্ধার হয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোখ নিয়ে জটিল সব লেখা। ডায়াগ্রাম। স্কেচ। চোখের মণি, রেটিনা, অপটিক নার্ভ, আলোর তরঙ্গ... এরই মধ্যে-মধ্যে কয়েক ছত্র করে কবিতার লাইনও। রোমানীয়, ইংরেজি দু'ভাষাতেই। প্রফেসর ডেফনার যে কবিতাও লিখতেন, জানতাম না। এত গুণী মানুষ ছিলেন। আমার মূল বিষয় পদার্থবিদ্যা, শারীরতন্ত্রের বিষয়গুলো বেশ জটিল। বুঝতে একটু সময় লাগছে। একটা ফোল্ডার দেখছি, শুধু বেনের নামে। কুকুরটির উপর কোনও পরীক্ষা করছিলেন? মুশকিল হল, ফাইলগুলো অধিকাংশই খুলল না। যেটুকু বুঝলাম, একটা জিনিস পরিষ্কার, বেনের চোখে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন তিনি। কারণ, একটা জায়গায় নিজেই নোট লিখেছেন, 'অবশেষে সাফল্য। বেনের রোডোপসিন তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও বাড়ানো যাবে, কোনও ক্ষতি নেই। ওরও লাভ।'

বুকের মধ্যে দ্রিম-দ্রিম করছে আমার। দুইয়ে-দুইয়ে চার না বাইশ? সাংঘাতিক একটা অপরাধের মোটিভ দিনের আলোর মতো ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে। মেমরি কার্ডে ডেটাগুলো খুব সাবধানে তুলে রাখলাম। বারণ আছে। কিউরিওর একটি দোকানে কথা বলে রেখেছি। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ যেতে বলেছে।

তৈরি হয়ে বেরোচ্ছি, মার্কের ফোন এল। বলল, "আমার ছাত্রটির সঙ্গে কথা বললাম। বলল, অবশ্যই তুমি যেতে পারো ওর কাছে। ভিভিয়ান কস্তি ওর মায়ের নাম। কমিশনার। মুশকিল হচ্ছে, কোনও একটা বিশেষ কাজে আফ্রিকার মরক্কোয় গেছে। তিন-চার দিনে ফিরবে। অপেক্ষা করতে বলেছে।"

বললাম, "কী আর করা যাবে। যাই হোক, তোমাকে একটা ভাল খবর দিই, কিছুটা ডেটা রিকভার করতে পেরেছি।"

"আমি জানতাম তুমি পারবে,'' বলল মার্ক, "এনিওয়ে, কী পাওয়া গেল?"

যতটা বুঝেছি, বললাম ওকে। কুকুরের ফাইলগুলো মেলও করে দিলাম। শুনে আমার মতোই অবস্থা ওর। বলল, সব ঠিক থাকলে দু'-চার দিনের মধ্যে চলে আসছে এখানে।

॥ ৮ ॥

বুখারেস্ট থেকে গালাচি মোটামুটি আড়াইশো কিলোমিটার দূর। দেশের একদম পুব প্রান্তে মলদাভিয়া প্রদেশে এই শহর। ট্রেন, বাস সবই যাচ্ছে। আমি একটা ছোট গাড়ি ভাড়া করেছি। ট্রেনে বা বাসে গেলে সমস্যা হচ্ছে শহরে পৌঁছে ট্যাক্সি আমাকে ভাড়া করতেই হবে। কারণ আইভান সাহেবের গ্রাম মূল শহর থেকে আরও সতেরো কিলোমিটার দূরে। তাই একটা গাড়িই নিয়ে নিলাম। ঝক্কি কম হবে। চালক নিইনি। নিজেই চালাচ্ছি। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। চমৎকার রাস্তা। মোবাইলে গুগ্‌ল ম্যাপের সঙ্গে আমার লোকেশন শেয়ার করে নিয়েছি। সত্যি বলতে, মনের ভিতরে সারা ক্ষণ একটা চিন্তা না-থাকলে রীতিমতো উপভোগই করা যেত রাস্তাটা।

গত কাল কিউরিওর দোকানে শেষ পর্যন্ত আর যাইনি। কে জানে, মারিয়াসের এই সব জগতে যা চেনাজানা, হিতে বিপরীত না হয়ে

যায়। চাকতিটা দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল। জিনিসটা এখনও গোপন আছে। কোনও ভাবে মারিয়াসের কানে পৌঁছলে সতর্ক হয়ে যাবে সে। গুগল ঘেঁটে নিজেই যতটা পারি পড়লাম। খেয়াল হল, আমার উলম ইউনিভার্সিটি মধ্য যুগের এক জন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আছেন জোসেফিনা বেকার। আমার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয়। ওঁকেই ফোন করি। চাকতিটার ফটো আর মাপও জানাই হোয়াটসঅ্যাপে। সঙ্গে মারিয়াসের কাস্‌লে রাখা কয়েকটা লৌহ মানবের ফটোও।

জোসেফিনা খুবই চমকিত, কোন অ্যান্টিক শপে গেছি জিজ্ঞেস করল প্রথমে। বললাম, রোমানিয়ায় আছি, সেখানে একটি কাস্‌লে দেখলাম। যাই হোক, জোসেফিনা গড়গড় করে যা বলল, আমার অনুমানের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। চাকতিটা যে মধ্যযুগীয় যোদ্ধার বর্মের অংশ, সে তো আমি নিজেই দেখে এসেছি। সে কালে নানান মাপের নানান ডিজ়াইনের বর্ম তৈরি হত। সে এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রি। মাথা, বুক, পেট, হাত, পা, কনুই সব কিছুর জন্য তৈরি হত ইস্পাতের বর্ম। সেগুলো সাজানোও হত যে ওটা গায়ে চাপাচ্ছে, তার নাম পদ আর মর্যাদার অনুসারে। বর্ম কতটা শরীর ঢাকবে সেটা বিচার করে বর্মের নামও দেওয়া হত। যেমন জোসেফিনা বলল, "তোমার আর্মারটা সাধারণ ভাবে ফুলসুট বলে, পোশাকি নামটা খটমটে, প্যানপ্লি। মধ্য যুগের শেষের দিকে তৈরি হত এগুলো। আর চাকতি যেটা বলছ, ওটা মনে হচ্ছে হাতে যে লোহার বর্ম বা গনটলেট পরা হত সেটার উপরের গোল মেটাল পিসটা। এগুলোকে রনডেল বলা হত। রাউন্ড থেকে রনডেল। কাউটারও বলে অনেকে। রনডেল বলতে আবার ছুরিও বোঝায়, সেটাও সে যুগের। এই সব কাউটার বা রনডেলে যোদ্ধারা যার হয়ে লড়াই করছে অথবা যার সুরক্ষায় সে নিয়োজিত, তার বা তাদের প্রতীক খোদাই করা থাকত। অনেক সময় এগুলো বর্মের বিভিন্ন জয়েন্টের নাট হিসেবেও লাগানো হত।"

অনেক ধন্যবাদ দিই জোসেফিনাকে। এখন কথা হচ্ছে এই রনডেল প্রফেসর যেখানে পড়েছিলেন, সেখানে গেল কী ভাবে? আচ্ছা, এমন না তো, পুরো আর্মারটা বাইরে বের করা হয়েছিল? মারিয়াস এগুলো কেনাবেচা করে। হতেই পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে গাড়ি-রাস্তার কোথাও পড়ার কথা। অতটা দূর গেল কী ভাবে?

কী বলব, এই সব চিন্তার জন্য চোখের সামনে দিয়ে যে অসাধারণ সব দৃশ্য পিছলে যাচ্ছে, উপভোগই করতে পারছিলাম না। একটা সময় ইউরোপের অতি বিখ্যাত দানিয়ুব নদী-মোহনাও নজরে চলে এল। অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

অবশেষে আইভান সাহেবের ঠিকানায় যখন পৌঁছলাম, হাতঘড়িতে সকাল প্রায় সাড়ে দশটা। সাতটায় বেরিয়েছিলাম, মোটামুটি সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগল। এক তলা ছোট্ট বাড়ি। উজ্জ্বল লাল আর হলদে রং করা। কাঠের তক্তা জুড়ে-জুড়ে পাঁচিল। গেটও তাই। সেগুলো সব সবুজ রং করা। শহরে পৌঁছেই আমি মোবাইল থেকে ফোন করে দিয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। দীর্ঘ, একটু স্থূল আকৃতি। মাথার চুল সব সাদা। শীর্ণ লম্বা মুখ। চোখে পুরু কাচের চশমা। গায়ের ত্বকে ভাঁজ পড়লেও দেহভারে ঝুঁকে পড়েননি। নিজেই বললেন সেভেন্টি ফাইভ রানিং।

ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর ডেফনারেরই সহকর্মী ছিলেন। তবে দু'জনের বিষয় আলাদা। ডেফনারের মূলত জৈব রসায়ন। আইভান সাহেবের ইতিহাস। দু'জনেই বিপত্নীক। আইভান সাহেব নিঃসন্তান। প্রফেসর ডেফনার দুর্ঘটনায় এক মাত্র ছেলেকে হারিয়েছেন। দু'জনের বন্ধুত্ব ছিল খুব গভীর। শহর থেকে দূরে এই ফার্মহাউস বানিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন দু'জনে।

"কী ভালই না ছিলাম। মারিয়াস ভাকারেস্কু এসে সব কিছু গোল পাকিয়ে দিল!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আইভান সাহেব, "আমি একেবারেই চাইনি বরিস যাক মারিয়াসের ওখানে। কিন্তু এমন টোপ দিল, কাজ-পাগল মানুষ তো, গিলে ফেলল। ভিতরে-ভিতরে হয়তো ছটফট করছিল গবেষণায় ফিরে যেতে।"

"বুঝলাম না। একটু যদি পরিষ্কার করে বলেন," বললাম আমি।

ম্লান হাসলেন বৃদ্ধ, "কী আর বলি! আসলে সব কিছুর মূলে আমিই বলতে পারো। বছর পনেরো-ষোলো আগে আমার এক ছাত্র রোমানিয়ার মধ্যযুগীয় গুপ্তধনের উপর থিসিস লেখে। আমিই গাইড ছিলাম। বেশ খেটে ঘোরাঘুরি করে লিখেছিল। কাস্‌ল, ফোর্ট, ফোর্ট্রেসে লুকনো সম্পদের উপরেই মূল আলোকপাতটা করে ও। এ দেশে কাস্‌ল বা ফোর্টের তো আর অভাব নেই। কাস্‌ল আর ফোর্টের বেসিক তফাত জানো তো?"

বললাম, "কাস্‌ল মূলত মান্যগণ্য বিত্তবানদের ব্যক্তিগত আবাসগৃহ বলা যায়। নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কিছুটা দুর্গের ধাঁচে নির্মিত হত এগুলো। আর ফোর্ট মূলত সৈন্যসামন্তের নিরাপদে থাকার জন্য। যেমন ফোর্ট্রেস হল আরও বড় ফোর্ট।"

"চলবে। মোটামুটি এটাই মূল পার্থক্য," বললেন আইভান সাহেব।

ইতিমধ্যে এক জন মহিলা, ট্রে-তে ধূমায়িত কফি আর গরম ব্রাউনি রেখে গেছেন। বুখারেস্টের বিখ্যাত অ্যাপল কেক আর পিচ কুকিজ় এনেছিলাম। তাও দেখছি প্লেটে চলে এসেছে।

"সোফিয়া, আমার বোনের মেয়ে, ও মাঝেমধ্যে এসে থাকে এখানে," বললেন আইভান সাহেব। পরস্পর অভিবাদন করলাম আমরা।

"যা বলছিলাম," বৃদ্ধ শুরু করলেন আবার, "রিটেজাটের গায়ে ওই কাস্‌লটার কথাও লিখেছিল সে। সত্যি বলতে আমি ওটার বিষয়ে জানলেও সে ভাবে ঘুরে দেখিনি। আর তখন তো ওটা পরিত্যক্ত পড়েছিল। তবে কাস্‌লটা নিয়ে একটা গুজব আছে। সেটা হল একটা কুয়ো নিয়ে। বিষয়টা সাধারণ। সে কালে এই সব কাস্‌ল, ফোর্ট, ফোর্ট্রেসের অনেকগুলোতেই বেজায় জলের সমস্যা হত। সে জন্য গভীর সব কুয়ো খোঁড়া হত। গরিব সাধারণ মানুষ অথবা যুদ্ধে বন্দি সেপাইদের দিয়ে খোঁড়ানো হত এই সব কুয়ো। রিটেজাটের ওই কাস্‌লেও এমন এক কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। জার্মানরা খুঁড়িয়েছিল সেই কুয়ো। ঘটনা হচ্ছে, রাশিয়ানরা যখন ওই কাস্‌লের দখল প্রায় নিতে বসেছে, জার্মানদের পরাজয় নিশ্চিত, তখন জার্মানরা তাদের সব সোনাদানা, হিরে-জহরত, মানে তারা নিজেরা যা সব লুঠ করেছিল ওই কুয়োয় লুকিয়ে ফেলে। এরকম একটা বিপদের আগাম আশঙ্কা ছিলই নাকি তাদের। শোনা যায়, কুয়োটা নাকি সে জন্যেই তৈরি করে ওরা। কিন্তু সে কুয়োর মুখ ছিল লুকোনো। রাশিয়ানরা হয় সেটা জানত না, বা খুঁজে পায়নি। শোনা যায় বলছি, কারণ প্রত্যক্ষদর্শীর কোনও লেখা বা ছবি কেউ দেখেনি। কিন্তু গুজবটা রটে যায়। রোমানি ভবঘুরেরা ওটায় অনেক দিন ছিল। হয়তো তারাই ছড়ায় গুজবটা। আমার ছাত্রটি বলতে গেলে সেই গুজবের উপর নির্ভর করে কাস্‌লটার উল্লেখ করে। সে অবশ্য ওটার নাম দিয়েছিল উলফ কাস্‌ল। এর পিছনেও অবশ্য একটা কাহিনি আছে।"

"সেটা হয়তো জানি আমি," বললাম আমি। মিসেস দাচিয়ানার কাছ থেকে শোনা গল্পটা বললাম।

আইভান সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, এ রকমই। যাই হোক, এ রকম সব চমকপ্রদ গল্পটল্প শুনে আমিও যাই কাস্‌লটা সরেজমিনে দেখতে। আমার স্ত্রী তখন জীবিত। এ সব বিষয়ে সে-ও খুব উৎসাহী। প্রথম বারে ছাত্রটির সঙ্গে গেছিলাম। স্ত্রীর সঙ্গে আবার যাই। দু'বারই পণ্ডশ্রম। ফেরার সময় একটা কাণ্ড হয়। রোমানি ভবঘুরেদের একটা দল কাস্‌লটার কাছে ডেরা বেঁধেছিল। তাদের একটি মেয়ে খুব অসুস্থ ছিল। আমার স্ত্রী পেশায় চিকিৎসক। সে মহিলাটিকে সুস্থ করে তোলে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বৃদ্ধ দলপতি ওকে একটা ঝুরঝুরে কাগজ দেয়। সেটা নাকি ওরা কাস্‌লের কোনও চোরাকুঠুরি থেকে পেয়েছে। জার্মান ভাষায় লেখা কাগজটা দেখে আমাদের দু'জনেরই তখন ধারণা হয় যে, ওটাই হয়তো জার্মানদের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের ম্যাপ বা সঙ্কেত

জাতীয় কিছু একটা। ফলত আরও এক বার কাস্‌লে যাই আমরা। কিন্তু এ বারেও লাভ হল না। খুবই দুর্বোধ্য সে সঙ্কেত। যাই হোক, ইতিমধ্যে সময় গড়িয়েছে। আমার স্ত্রীও আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেছেন। বরিস আর আমি ফার্ম হাউস করে থাকতে শুরু করেছি। এমনই সময়ে পুরনো দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে সেই কাগজটা পাওয়া যায়। সেটার অবস্থা তখন আরও খারাপ। ভাঁজ খুলতে গেলে ছিঁড়ে যাচ্ছে। অনেক কসরতে সেটার কয়েকটা ফটো তোলে বরিস। ওর গুপ্তধনে আগ্রহ নেই। ম্যাপ বা হেঁয়ালিটা কী, জানতে খুব উৎসাহ। আসলে ওর ছিল বহুমুখী প্রতিভা, স্থাপত্যবিদ্যাতেও প্রচুর পড়াশোনা করেছিল। বলল, চলো ঘুরে আসি এক বার। দেখাই যাক না। কী বলব, এমনই কাকতালীয় ব্যাপার, ঠিক এই সময়েই মারিয়াস সস্ত্রীক হাজির হয় এখানে,” থামলেন আইভান সাহেব।

শুনতে আর বলতে গিয়ে দু’জনেই খাবার খেতে ভুলে গেছিলাম। সোফিয়া বলায় খেয়াল হল। ঘরে বেক করা চমৎকার ব্রাউনি। গরম গরম। খুব ভাল লাগল।

“হ্যাঁ, যা বলছিলাম,” কফিটাও শেষ করে দিয়ে ফের শুরু করলেন আইভান সাহেব, “মারিয়াসের স্ত্রীও ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন। আর্কিওলজিক্যাল বিভাগে কাজও করেছেন কয়েক বছর। আমার ছাত্রটি ওর থিসিসটা বই হিসেবে প্রকাশ করেছিল। তাতে ওই কাস্‌লের গুপ্তধনের কথাও ছিল। মারিয়াসের স্ত্রী, নামটা কী যেন...”

“তেরিকা,” বললাম আমি।

“হ্যাঁ, ও রকমই হবে। ঘটনা হচ্ছে, মারিয়াস আর তেরিকা দু’জনে মিলে ছাত্রটির সঙ্গে দেখা করে, কাস্‌লটিতেও যায়। লাভ যে হয়নি, বুঝতেই পারছ, কারণ এর পর তারা এখানেও আসে। আমার কাছে যে ওই সংক্রান্ত একটা ম্যাপ আছে, জানি না সেটা তেরিকা জানল কী ভাবে। এখানে এসে তারা ওই ম্যাপটি দেখতে চায়। এ জন্য অনেক অর্থেরও লোভ দেখায়। এমনকি বরিসকে বলে সে যে, যদি চায় নতুন করে আবার গবেষণায় ফিরতে পারে। টাকা যা লাগবে, সব সে দেবে। তবে গবেষণায় সাফল্য পেলে তাতে সহকারী হিসেবে মারিয়াস ভাকারেস্কুর নামটাও থাকবে। বরিস একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে কাজ করছিল হয়তো জানো। ছেলের ওই ভাবে অপঘাতে মৃত্যুতে গবেষণা বন্ধ করে দিয়েছিল সে। মারিয়াস নিজেও বিজ্ঞানী। বরিসের গবেষণার কথাটা জানত। আশা করি, বুঝতে পারছ এ বার টোপটা কী?”

“পরিষ্কার। গবেষণার সমস্ত খরচের দায়ভারের পরিবর্তে গুপ্তধনের চাবিকাঠি তুলে দিতে হবে। আবার গবেষণা যদি সফল হয়, তবে তা বরিস ডেফনারের একার কৃতিত্ব হবে না, সঙ্গে মারিয়াস ভাকারেস্কুর নামও জুড়বে।”

“একদম। মারিয়াস ধূর্ত লোক। সে জানত বরিস সাফল্যের দোরগোড়ায় এসে গবেষণা বন্ধ করেছিল। বরিসকে সে নিয়ে যায় ওই কাস্‌লে। যেটা সে তখন নতুন করে পুনরুদ্ধার করেছে। নিরিবিলি তো বটেই, গবেষণার সাজসরঞ্জাম দেখে রাজি হয়ে যায় বরিস।”

“আপনি কিছু বলেননি?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“কী আর বলব?” চশমাটা খুলে হাতে ধরে বললেন আইভান সাহেব, “বরিস কাজটা নিয়ে যে কতটা উৎসাহী হয়ে উঠেছিল, তা তো দেখতেই পাচ্ছিলাম। আমি শুধু বলেছিলাম, তোমার কি মনে হয়, গুপ্তধন আছে ও কাস্‌লে? হেসেছিল বরিস। বলেছিল, মনে হয় না, গিয়ে দেখি আগে। কাগজে যা আছে, তা নাকি কাস্‌লটার একটা বিল্ডিং প্ল্যান। তবে ওর ধারণা ছিল গুপ্তধন নেই। কুয়োর বিষয়টা অতিরঞ্জিত। শুধু গবেষণাটা শেষ করার টানে গেল ওই মুলুকে। নিয়তি কাকে বলে আর! মায়োপিয়া ছিল। দূরের জিনিস দেখতে পেত না। সে কিনা রোজ একলা পাহাড়ি পথে হেঁটে বেড়াবে! কুকুরটাও তো শুনেছি নিখোঁজ।”

“ছিল। এখন আর না,'' ভেবেছিলাম খারাপ খবরটা দেব না। কিন্তু বলেই ফেললাম। শুনে মাথায় হাত দিয়ে কিছু ক্ষণ বসে রইলেন আইভান সাহেব। তার পর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, “এ তো সাংঘাতিক ঘটনা। নিরীহ একটা কুকুরকে এ ভাবে কেউ মারবে কেন? পিছনে বিরাট রহস্য আছে।”

“সত্যি বলতে, সেই রহস্যের উত্তরের জন্যেই এত ছোটাছুটি,” বললাম আমি। রিকার্ডো বুগনার নামে এক জন গবেষকের আমন্ত্রণে আমিও যে দিন তিনেক থেকে এসেছি, সেটাও আর গোপন রাখলাম না।

“আসলে বরিসের মৃত্যুর তদন্তে নেমেছ তুমি। তাই তো?” মাথা দুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধ।

বললাম, “কিছুটা। বিষয়টা পুলিশই দেখছে। কিন্তু সত্যিটা ঠিক কী, জানতে আমি নিজেও একটু চেষ্টা করছি।”

আইভান সাহেব বললেন, “এ বারে আমিও বলি, আমারও একটু খটকা ছিল। তুমি ভারতীয়, কাজের ক্ষেত্রও জার্মানি। এ দেশে বরিসের কাজের কতটাই বা জানো তুমি। এ কথা বলছি কারণ, সে ছিল ভীষণই অন্তর্মুখী। প্রচারবিমুখ। কাউকে তোষামোদ করাও ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সুতরাং এমন মানুষকে কেনই বা কর্তৃপক্ষ জনসমক্ষে তুলে ধরবে। সে জন্য কোনও সম্মান বা পুরস্কার কখনও জোটেনি বেচারির। এ হেন মানুষটির জীবনী লিখতে চাইছে এক জন বিদেশি, খানিক অবাকই হয়েছিলাম। এনিওয়ে, উইশ ইউ অল সাকসেস। গড ব্লেস ইউ!”

প্রত্যুত্তরে অনেক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিই।

॥ ৯ ॥

ডিসেম্বরের চার তারিখ আজকে। তিন দিনের বেশি পেরিয়ে গেছে, কুকুরটার পোস্টমর্টেমে কী রিপোর্ট এল জানা দরকার। ইনস্পেক্টর পম্পিলিউ গ্রোসুকে ফোন করলাম। বেজে-বেজে থেমে গেল। খেয়াল হল, সকাল আটটা বাজে মাত্র। আর একটু পর করা উচিত ছিল ভাবছি, পম্পিলিউ কল ব্যাক করলেন, “কুকুরটার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তো?”

''হ্যাঁ,'' সুপ্রভাত জানিয়ে বললাম।

“সে তো বুঝতেই পারছি। ব্রেকফাস্টও করিনি এখন,” বললেন পম্পিলিউ, “যাই হোক, কেস একটু গোলমেলে। কুকুরটা গানশটে মারা গেছে। মোটামুটি হপ্তা চারেক আগে। বুলেট পাওয়া যায়নি শরীরে। এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। মানে খুব ক্লোজ় রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়। চোখের ক্ষতও স্বাভাবিক না। বুখারেস্ট থেকে ফুল রিপোর্ট আসলে কী ধরনের বন্দুক, বুলেট ব্যবহার করা হয়েছিল জানা যাবে।”

“সেটা কত দিন লাগতে পারে?” জিজ্ঞেস করলাম।

“অন্তত তিন হপ্তা। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা। কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কী ভাবে গুলি করা হয়, দেহের মধ্যে বুলেটের গতিপথ, সব কম্পিউটারে ফেলে দেখা হবে। চোখের ইনজুরিটাও ভাবাচ্ছে। সব তো এ ভাবে বলা যায় না। তদন্ত চলছে।”

“বন্দুকটা পাওয়া গেছে?”

“আশ্চর্য! ওটা পাওয়া গেলে তো অর্ধেক ঝামেলা মিটেই গেল,” হেসে বললেন পম্পিলিউ, “তবে আমরা খোঁজ নিচ্ছি প্রফেসরের নামে কোনও গান লাইসেন্স ছিল কি না, কিংবা উনি সঙ্গে আনঅথরাইজ়ড কোনও ফায়ারআর্মস...”

“মানে আপনি ধরেই নিচ্ছেন প্রফেসর নিজের কুকুরকে মেরে তার পর পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন?” বাধা দিয়ে বললাম আমি।

“এখনও পুরো সিদ্ধান্তে আসিনি। মানসিক অবসাদে মানুষ ওটাই করে। আর ইদানীং এটা একটু বেশিই হচ্ছে। তা ছাড়া আপনি নিজেই তো একটা ইম্পর্ট্যান্ট ক্লু দিয়ে গেলেন। ফ্লোরিন লোকটি প্রফেসরকে দেখেছিল কুকুরটাকে কোলে নিয়ে বেরোতে। অর্থাৎ অ্যাট দ্যাট টাইম দ্য ডগ ওয়াজ় অলরেডি ডেড। ফ্লোরিন বুঝতে পারেনি,” সহজ গলায় বললেন পম্পিলিউ।

বললাম, “কিন্তু, চোখের ইনজুরিটা? প্রফেসর নিজের কুকুরকে ওই

ভাবে আঘাত করবেন?"

"ওটা নিয়ে কথা বলেছি ডক্টর ভাকারেস্কুর সঙ্গে। সব তো আপনাকে বলা যায় না। মনে রাখবেন কেউই সন্দেহের ঊর্ধ্বে না। আপনি নিজেই ওই কাস্‌লে ছিলেন। হতে পারে দুর্ঘটনার দু'হপ্তা পরে গেছিলেন। কিন্তু যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন, তিনি ডক্টর ভাকারেস্কুর ল্যাব থেকে অনেক দামি জিনিসপত্র চুরি করে উধাও হয়েছেন। পার্সোনাল বিলংগিংস তো বটেই, নিজের ফোনটাও অফ করে রেখেছেন যাতে কেউ ওঁকে ট্রেস করতে না-পারে। ডক্টর ভাকারেস্কু সস্ত্রীক এসে এখানে রিপোর্ট করে গেছেন গত কাল বিকেলে। আর-একটা কথা, ওঁরা বন্দুক রাখেন না, বা লাইসেন্সের জন্যও কখনও দরখাস্ত করেননি। বুঝেছেন?"

লাইন ছেড়ে দিলেন পম্পিলিউ। প্রফেসর যে কী ভাবে পঁচিশ মাইল দূরে বেনকে মাটিতে পুঁতে দিয়ে আসবে, সেটাও আবারও জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল। থম হয়ে বসে রইলাম কিছু ক্ষণ। রিকার্ডোর বিষয়টাও অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে, ওকেই তো দেখছি অভিযুক্ত করার চেষ্টায় রয়েছে। এমনকি আমাকেও।

ডাবলিনে এখন সকাল ছ'টা। মার্কের প্রাতর্ভ্রমণের অভ্যেস আছে, জানি না উঠেছে কিনা। কল না-করে হোয়াটসঅ্যাপে পোস্টমর্টেমের খবরটা দিলাম ছোট করে। আধ ঘণ্টা পর ও নিজেই ফোন করল। আমার সঙ্গে পম্পিলিউয়ের কথোপকথনটা জানালাম বিশদে।

মার্ক বলল, "পম্পিলিউ লোকটা আসলে গুরুত্ব দিচ্ছে না কেসটায়। প্রফেসর ডেফনার অবসাদগ্রস্ত থাকলে, ওই রকম উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারতেন না।"

বললাম, "তা ছাড়া গুলি চলল, কেউ আওয়াজ পেল না? আমার তো ল্যাব আর মারিয়াসের ঘরটা আগে ভাল করে সার্চ করতে ইচ্ছে করছে। কে জানে, যে বন্দুকে বেন মরেছে, সেটা প্রফেসরের রুম থেকে না পাওয়া যায়!"

"কিংবা রিকার্ডোর রুম থেকে," বলল মার্ক।

আর তেমন কথা হল না। আমি প্রাতঃরাশ সেরে হার্ড ড্রাইভ দুটো নিয়ে বসলাম আবার। যদি আরও কিছু ডেটা উদ্ধার করা যায়। ঘণ্টা তিনেকের চেষ্টায় কিছুটা রিকভারি হল। অতি সামান্যই যদিও। ফাইলগুলো অধিকাংশই এনক্রিপ্টেড। তবুও যা পেলাম, তা যদি সত্যিই কার্যকরী করা সম্ভব হয়, নোবেল পুরস্কারের দাবিদার হয়ে উঠতে পারতেন প্রফেসর বরিস ডেফনার।

অপ্টোগ্রাফির মূল কথাটা হচ্ছে চোখের রেটিনার রোডোপসিন রঞ্জককে ফটোগ্রাফিক নেগেটিভের মতো ব্যবহার করে ফটো নেওয়া। যে ফোটোকে বলা হয় অপ্টোগ্রাম। কিন্তু জীবিত অবস্থায় রেটিনা নেওয়া সম্ভব না। মৃত্যুর পরে নিলেও অব্যবহিত পরেই নিতে হবে। অর্থাৎ বিষয়টা অত্যন্তই কঠিন।

প্রফেসর ডেফনার বিষয়টাকে সে জন্য একেবারে অন্য ভাবে ভেবেছিলেন। তিনি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের রেটিনার সিগন্যালটাই সরাসরি ধরার চেষ্টা করছিলেন। বিষয়টা এ রকম, চোখের রেটিনায় যে অগুনতি আলোকসংবেদী কোষ রয়েছে, সেগুলোয় আলো প্রতিফলিত হলে তারা অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে সিগন্যাল পাঠায়। মস্তিষ্ক সেই সিগন্যাল পড়লে আমরা দেখতে পাই। প্রফেসর এমন একটি ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করছিলেন, যা চোখে পরে থাকলে অটোমেটিক এই সিগন্যালগুলো কম্পিউটারে ছবির আকারে ফুটে উঠতে থাকবে। এমনকি, গত চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ব্রেন যা-যা সিগন্যাল রেটিনা থেকে পেয়েছে, সেটারও মেমরি পাওয়া যাবে। মস্তিষ্ক মানে তো আসলে একটা হার্ড ড্রাইভই। লক্ষ-কোটি স্নায়ুতে যাবতীয় মেমরি জমা থাকে। প্রফেসর ডেফনারের যন্ত্র এই ভিসুয়াল মেমরিও রিড করে ফেলবে, এবং সেগুলোর প্রিন্টও নেওয়া যাবে অনায়াসে।

এক কথায় যুগান্তকারী আবিষ্কার। ইনস্ট্রুমেন্টের একটা প্রাথমিক নামও ভেবেছিলেন, সিমুলেটর ফর অপ্টো সিগন্যালস। সংক্ষেপে 'এসওএস'। যেটা দেখেই রিকার্ডোর সন্দেহ হয় প্রফেসর কোনও বিপদে রয়েছেন। সাধারণ ভাবে এসওএসের মানে হল সেভ আওয়ার সোলস। রিকার্ডো ভেবেছিল প্রফেসর নিজের আর তার কুকুরের জীবনের আশঙ্কা মিন করেছিলেন।

যাই হোক, এখন আসল কথা হচ্ছে, মারিয়াস এই বিষয়টা কি জানে? নিশ্চয়ই জানে। রিকার্ডো এই জন্যেই বলছিল প্রফেসরের সব কাজ আত্মসাৎ করার লক্ষে আছে মারিয়াস। তা হলে কি 'এসওএস' তৈরির কাজ শুরু করেছে সে? যদিও আমার মনে হয় না মারিয়াসের একার পক্ষে এটা করা সম্ভব। অন্য দিকে রিকার্ডো, সে কি ইনস্ট্রুমেন্ট 'এসওএস'-এর বিষয়টা জানে? এর উত্তর, জানত না। নয়তো আমাকে ওটার চলতি অর্থটা বলত না। অবশ্য পরে বুঝে থাকতে পারে। কিন্তু কতটা পরে? তাও জানি না। এমন না তো, রিকার্ডোই হার্ড ডিস্ক থেকে ডেটাগুলো সরিয়ে অরিজিনাল ফাইল সব ডিলিট করে দিয়েছে?

অর্থাৎ স্থির কোনও সিদ্ধান্তে কোনও দিক থেকেই পৌঁছনো যাচ্ছে না। যে দিক থেকেই ভাবছি, ঝড়ের মতো পাল্টা প্রশ্ন উড়ে আসছে মাথায়। এমন জটিল রহস্যে সত্যিই কখনও পড়িনি।

ফের একটা ফোন আসায় বর্তমান চিন্তার জাল থেকে সাময়িক বিরতি হল। জার্মানি থেকে, জোসেফিনা বেকার।

"আর্মারটা নিয়ে ভাবছিলাম। তুমি যেখানে আছ, ওই বুখারেস্টেই এক জন হোটেল মালিক আছেন, উনিও জার্মান। আমাদের পারিবারিক বন্ধু। ওটো মিলবার্গ। ইস্ট ইউরোপে নানা দিকে হোটেল খুলেছে ও। ওই রকম মিডিভাল ফুলসুট আর্মার কিনে হোটেল সাজায়। তোমার পাঠানো ফটোগুলো আমি ওকে হোয়াটসঅ্যাপ করি। ও একটা আর্মার চিনতে পারল। মাস কয়েক আগে নিলামে বিক্রি হয় সেটা। এক জন ভদ্রমহিলার সঙ্গে দরাদরির প্রতিযোগিতাটা হচ্ছিল। মিলবার্গই জেতে। ভদ্রমহিলা মিলবার্গের উৎসাহ দেখে একটি ফুলসুট আর্মার বিক্রি করতে চান। মিলবার্গ এ জন্য অগ্রিম টাকাও কিছু দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও কারণে ডিলটা ক্যানসেল করে দেন ভদ্রমহিলা। তুমি যদি আরও কিছু জানতে চাও, মিলবার্গকে বলে রেখেছি, কথা বলতে পারো।"

আরও দু'-একটা কথার পর ফোন ছেড়ে দিল জোসেফিনা। ভদ্রমহিলার নামটা জানে না ও। আমার ধারণা মারিয়াসের স্ত্রীই হবেন। মিলবার্গকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। আপাতত এখন আর ফোন করলাম না। হার্ড ডিস্ক দুটো নিয়ে বসলাম আবার। আরও কিছু যদি জানা যায়। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক চেষ্টা করেও নতুন কিছু উদ্ধার হল না।

কী করি? রিকার্ডোর ফোনে আরও একটা কল করলাম। সুইচ্‌ড অফ যথারীতি। আশ্চর্য ব্যাপার বটে, লোকটা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! কোথায় পুলিশ খোঁজখবর করবে, তার বদলে তার বিরুদ্ধেই অভিযোগ নিচ্ছে। ঠিক আছে, অভিযুক্ত হলেও তো তার হদিস বের করতে হবে। জানি না, কী করছে ইনস্পেকটর পম্পিলিউ।

ল্যাপটপে আমার ফাইলটা খুলে বসলাম। যা-যা তথ্য পেয়েছি পর পর নোট করেছি টাইম দিয়ে। প্রফেসরের দুর্ঘটনার দিন কে কোথায় ছিল আবার দেখলাম। অ্যাড্রিয়ান আর মিসেস দাচিয়ানা ডাক্তারের কাছে গেছিল। এলভিরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। মারিয়াসের ব্লাড প্রেশার গোলমাল করছিল বলে দুপুর থেকে নিজের ঘরেই ছিল। রিকার্ডো তো ছিলই না, সে বুখারেস্ট এসেছিল। আর দুই রক্ষীর মধ্যে শুধু ফ্লোরিন ছিল। সেই-ই দেখেছিল প্রফেসরকে কুকুর কোলে বেরোতে। প্রফেসরের পরনে ছিল বড় গোল টুপি, মাফলার, ওভারকোট, আর শার্ট-প্যান্ট যা থাকে। পায়ে ছিল হাই অ্যাঙ্কেল বুট। ভুল নেই, পুলিশের রিপোর্টেও তাই। এমনকি কি-কার্ডটিও ছিল, সেটাও জেনে নিয়েছিলাম পম্পিলিউয়ের থেকে। শুধু একটা ওয়াকিং স্টিক থাকত, সেটা সে দিন নিয়ে বেরোননি। অথচ সে দিন ওয়েদার ভাল ছিল না। রোজই ওটা নিয়ে বেরোতেন। এটাও একটা খটকা। মুখেও মাস্ক ছিল। এমনিতে কাউকে খুব একটা মাস্ক পরতে দেখিনি ওখানে। প্রফেসর কি পরতেন? বিশেষ করে হাঁটতে যাওয়ার সময়ে? নাকি সে দিনই শুধু পরেছিলেন?

এটাও যেন একটা খটকা।

এ ছাড়া, আরও একটা খটকা এখন হল, জোসেফিনার ফোন করার পর। তেরিকা ভাকারেস্কুও সেদিন বেরিয়েছিলেন শুনেছি। কোথায়, অ্যাড্রিয়ানরা জানে না। কিন্তু পুলিশকে বলেছিলেন ক্লায়েন্টকে কোনও অ্যান্টিক আইটেম ডেলিভারি করতে বেরোন। আইটেমটা ফুলসুট আর্মার না তো? আর ক্লায়েন্টটা ওটো মিলবার্গ? নাহ, ফোন করতেই হল মিলবার্গকে। আমার অনুমান ঠিক। তেরিকা ভাকারেস্কুই সেই ভদ্রমহিলা। এবং দুপুর তিনটে নাগাদ মিলবার্গকে ফোন করে জানায় যে আর্মারটা তার ভালকানের হোটেলে ডেলিভারি দিলে চলবে কিনা? ভালকান টাউন মারিয়াসের কাস্‌ল থেকে খুব দূর নয়। ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা। ওখানে একটা হোটেল আছে মিলবার্গের। যদিও আরও ঘণ্টা দুই পর তেরিকা ফোন করে জানায় যে, কোনও কারণে অর্ডারটা ক্যানসেল করে দিচ্ছে। অগ্রিম যা নিয়েছিল ব্যাঙ্কে পাঠিয়েও দেয় অনলাইনে। দিনটা ছিল সাতই নভেম্বর, যে দিন প্রফেসর ডেফনারের দুর্ঘটনাটা ঘটে।

উত্তেজনায় বুকটা ধকধক করছে এ বার। অপরাধের ছকটা পুরোই যেন দেখতে পারছি। পম্পিলিউয়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ফোন করব না নিজেই যাব? আমার খটকাগুলো বলব বুঝিয়ে? রনডেল বা চাকতিটা দেব ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য? ঘটনাস্থল থেকে পেয়েছি ওটা। মুশকিলটা হচ্ছে পম্পিলিউ লোকটাকে ভরসা করতে পারছি না ঠিক। তা ছাড়া ভদ্রলোক ওর কাজে আমার নাক গলানো পছন্দও করছেন না মনে হয়। নিজে একটা লজিক ঠিক করে নিয়েছেন, তার বাইরে যাবেনই না। অথচ আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, যা দুর্ঘটনা সব কাস্‌লের মধ্যেই হয়েছে।

মার্ককে ফোন করলাম আবার, "আমার কী মনে হয় জানো, প্রফেসর ওই দিন কাস্‌ল থেকে বেরই হননি। যা ঘটার আগেই ঘটেছে। কাস্‌লেই। কুকুরটার মৃত্যু পর্যন্ত!" বললাম আমি।

"বুঝতে পারছি না, তুমি কী বলতে চাইছ?" বলল মার্ক, "তার মানে অন্য কেউ প্রফেসরের জামাকাপড় পরে বেরিয়েছিল?"

"একদম। আর সেই জন্যই কুকুরটা কোলে ছিল। কিন্তু মৃত কুকুর।"

"হুম। বুঝলাম। কিন্তু এটা কে হতে পারে?"

"আমার ধারণা মারিয়াস," বললাম আমি।

"বেশি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না?" বলল মার্ক, "মারিয়াস ওই দিন বাড়ির বাইরেই যায়নি। পুলিশ এসেও ওকে দেখেছে। এক মাত্র ওর স্ত্রী বেরোয়। তাও ফিরে আসে কিছু ক্ষণ পর।"

"ঠিকই। এবং মারিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে ফেরে। কেউ দেখেনি কারণ মারিয়াস লুকিয়েছিল আর্মার সুটে। এটা সেই ফুলসুট আর্মারটা, যেটা ওটো মিলবার্গকে ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল। আসলে ওটায় ছিল প্রফেসরের দেহ।"

"কিন্তু..."

"শেষ করতে দাও আমাকে," বললাম আমি, "আমি মারিয়াসের লিফট, ওর গাড়ি কোথায় থাকে সব দেখেছি। প্রফেসরের ঠিক কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে আমি জানি না। এইটুকু আমি প্রায় নিশ্চিত, তাঁকে আর্মারে বন্দি করে লিফ্‌টে নামিয়ে গাড়িতে তোলা হয়। এর পর তেরিকা ডেলিভারির নামে গাড়িটা নিয়ে বেরোয়। কিছু ক্ষণ পর প্রফেসর সেজে বেরোয় মারিয়াস। তার পর কাজ শেষ করে ফিরে আসে দু'জনে। কুকুরটা ফিরিয়ে আনা হয়, কারণ গানশটটা জানাজানি হয়ে গেলে কেসটাই অন্য দিকে টার্ন নেবে। পরে সময়-সুযোগ বুঝে কুকুরটাকে পুঁতে ফেলা হয়। কুকুরের চোখটা নষ্ট করার কারণ, ওরা ভেবেছিল অথবা জানত যে, প্রফেসর ওর কুকুরের উপর অপ্টোগ্রাফি পরীক্ষা করছিলেন। যদি কোনও ভাবে বেনের রেটিনায় কোনও সূত্র বা ফটো থেকে যায়। কে কী ভাবে ওই অসম্ভব কাজটা যে করবে, তখন অতশত ভাবেনি।"

মার্ক বলল, "ডিডাকশন ভালই করেছ। হাঞ্চ হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রমাণ তো কিছু চাই?"

বললাম, "ওটাই তো পরীক্ষা করাতে চাই। আর্মারের রনডেলে যে খয়েরি দাগ, সেটা রক্তের না হয়ে যায় না। হয় ওটা বেনের রক্ত, নয়তো প্রফেসরের। যারই হোক, রনডেলে দাগটা এল কী ভাবে? আর ওটা আলাদা করে প্রফেসর যেখানে পড়েছিলেন, সেখানে গেলই বা কী করে? আর্মারটা কিন্তু আমি দেখেছি। এখনও প্যাকিং বাক্সে পড়ে আছে। একটা রনডেলও মিসিং। মারিয়াসের ম্যানসন বা কাস্‌ল ঠিক ভাবে তল্লাশি করতে পারলেই সব জানা যেত।"

মার্ক একটু ভেবে বলল, "ঠিক আছে। আমি দেখছি ভিভিয়ানা কস্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা। একটু অপেক্ষা করো।"

॥ ১০ ॥

দুপুর প্রায় তিনটে। পলিশিয়া উরিকানিতে বসে আছি আধ ঘণ্টা হল। পম্পিলিউ বলেছে, তার সময় লাগবে। চারটে-সাড়ে চারটের আগে থানায় আসতে পারবে না। এমনিতেই রবিবার তার অফ ডে। তাও একটা কাজে এক বার ঘুরে যাবে। আমি চাইলে অপেক্ষা করতে পারি। ফোন না-করে আসার জন্যে একটু উষ্মাও প্রকাশ করেছে। আমি আসলে ইচ্ছে করেই করিনি, ভাবলাম এক বারে সামনাসামনি যা বলার বলব। আজকে যে রবিবার, খেয়ালই ছিল না একদম। আসলে আসব কি আসব না, এ নিয়ে দ্বন্দ্ব তো ছিলই।

মার্কও খুব একটা সায় দিচ্ছিল না। বলছিল, ওর সেই ছাত্রের মা, কমিশনার ভিভিয়ানা কস্তির ফেরার জন্যে অপেক্ষা করতে। বললাম, রিকার্ডো পাঁচ-পাঁচটা দিন ধরে নিরুদ্দেশ। আর বসে থাকা যায় না। তা ছাড়া পুলিশের উপর তলায় হয়তো যেতেই হবে। তা সে ভিভিয়ানা কস্তির কাছেই যাই বা সরাসরি অন্য কারও কাছে যাই। তবে প্রথমে পম্পিলিউয়ের সঙ্গে দেখা করাটা দরকার। তবে এ বারে গাড়ি না-নিয়ে মোটরসাইকেল ভাড়া করে এসেছি। এতে সুবিধে বেশি। চার চাকা যেতে পারবে না, এমন পথেও যাওয়া যায়। তবে অনেকটা রাইড। অভ্যেসও নেই। কোমর ব্যথা হয়ে গেছে।

বসে-বসে এ সব ভাবছি, সাড়ে তিনটে বাজে থানার ঘড়িতে। এক জন কর্মী এসে বলল, "খুব দুঃখিত, পম্পিলিউ স্যর ফোন করেছিলেন। বললেন আজকে আর থানায় আসতে পারছেন না। অন্য কাজে আটকে গেছেন, আপনি যদি আগামী কাল ফার্স্ট আওয়ারে আসেন।"

শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম। কথাটা আমাকেই ফোন করে বলতে পারত পম্পিলিউ। সত্যি বলতে আমার এমন একটা আশঙ্কা ছিলই। বলে-কয়ে না-এলে এমন সমস্যা হতেই পারে। হোটেল একটি, তাই বুক করেই এসেছি। সাত ঘণ্টা বাইক হাঁকিয়ে ফেরার প্রশ্নও নেই। অবশ্য হোটেলে পৌঁছতেও প্রায় এক ঘণ্টা লাগবে। আসলে এখানে সে রকম কোনও থাকার জায়গা নেই। অনলাইনে যেটা পাই, উরিকানি থেকে আরও সাঁইত্রিশ কিলোমিটার দূরে।

মোটরবাইকে চড়ে ভাবলাম, ফোন করে পম্পিলিউয়ের বাড়ি চলে গেলেও হয়। জিউভ্যালির কাছে কোথায় যেন থাকে বলছিল। কিন্তু তাতে সে আরও বিরক্ত হবে। এক বার ভাবলাম, সটান চলে যাই মারিয়াসের কাস্‌লে। সেও তো কাছেই, ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। ওকে গত কালই একটা প্রস্তাব দিয়েছি। পে-বুথ থেকে ফোন করে বললাম, প্রফেসর ডেফনারের গবেষণাটা আমি জানি। যেটা উনি শেষ করতে পারেননি, আমার সেটা করতে দু'হপ্তাও লাগবে না।

মারিয়াস ওইটুক শুনেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, "মানে? কী বলতে চান আপনি?"

বললাম, "আমি 'এসওএস' ইনস্ট্রুমেন্টের কথা বলছি। সিমুলেটর ফর অপ্টো সিগন্যালস। আপনি আশা করি এত দিনে আমার কাজ সম্পর্কে একটু-আধটু জেনেছেন। 'এসওএস'-এর কাজটা এখন যে পর্যায়ে রয়েছে, সেটা শেষ করা আমার কাছে..".

"দ্যাট ব্ল্যাক ডগ! রিকার্ডো কুকুরটার কাজ সব," নিজের মনেই

বিড়বিড় করল মারিয়াস, "ঠিক আছে, এতই যখন জানেন, কাজটা নিজেই করে ফেলুন না কেন? আমাকে জানানোর কী দরকার?"

বললাম, "দুটো কারণে। প্রথমটা হল, প্রফেসরের আরও কিছু প্রয়োজনীয় পেপার দেখার আছে। যা আপনার ওখানেই রয়েছে। ওখানে কাজ করলে তৈরি সেট-আপটা পাব। এতে সময় যেমন বাঁচবে, কাজের সুবিধেও হবে। আর দ্বিতীয়টা হল রিকার্ডোর মুক্তি। আমার বিশ্বাস ও আপনার..."

"রিকার্ডোর কথা ভুলে যান," আবারও কথা শেষ হতে দিল না মারিয়াস, "প্রথমটা ভেবে দেখতে পারি। তবুও কী প্রমাণ আছে, বরিসের কাজ জানেন আপনি?"

"ওঁর কুকুরটার চোখ দুটো উপড়ানো ছিল," শান্ত গলায় বললাম।

"বুঝলাম না," বলল মারিয়াস, কিন্তু স্পষ্ট বুঝলাম গলা কাঁপছে ওর, "যাই হোক, প্রস্তাবটা ভেবে দেখব। শুধু বিজ্ঞানের স্বার্থে।"

এই সব চিন্তার মধ্যে দিয়ে বাইক চালাচ্ছি। ওয়েদার একটু খারাপ এখন। মেঘ করেছে। কুয়াশাও বাড়ছে। একটু আস্তেই চালাচ্ছি। তেমন খাড়াই না-হলেও পাহাড়ি রাস্তা। সূর্যের ঝলমলে আলো থাকলে চার পাশটা উপভোগ করা যেত। যদিও একটু পর পর আলোই চমকাচ্ছে পিছন থেকে। চমকাচ্ছে মানে হেডলাইট ব্লিঙ্ক করছে পিছনের গাড়ি।

কী কাণ্ড! এ তো সেই সবুজ প্যানেল ভ্যানটা। থানার অদূরে দাঁড়িয়েছিল না? বাইকে যখন উঠছি, ভ্যানটাকে দেখেছিলাম। ভ্যানটা কি আমায় ফলো করছে? মনে তো হচ্ছে তাই, বারবার হেডলাইট ব্লিঙ্ক করছে কেন? ওভারটেক করবে? করুক না। পিছনে আরও একটা গাড়ি রয়েছে ভ্যানটার। আমি তো কারও জায়গা আটকে চালাচ্ছি না। তাও অনেকটা ডান পাশে সরে এসে জায়গা দিলাম। ভ্যানটা কিন্তু গেল না। পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তা আটকে। গতিক যে সুবিধের না, বলা বাহুল্য। আমি তৎক্ষণাৎ বাইক ঘুরিয়েছি পাশ কাটাব বলে। কিন্তু পিছনের গাড়িটা একদম আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। খাদের দিকে বা পাহাড়ে উঠে যাওয়া ছাড়া আমার দু'দিকই বন্ধ।

ইতিমধ্যে ভ্যান থেকে দুদ্দাড় দুটো লোক নেমে পড়েছে। হেভিওয়েট কুস্তিগিরের মতো চেহারা। দু'জনেরই পরনে হুডেড জ্যাকেট আর মুখে কালো মাস্ক। এক জনের হাতে বন্দুক। সেটা সোজা আমার দিকে তাক করে রোমানীয়তে খরখরে গলায় যা বলল তার মানে বুঝলাম, বেঁচে থাকতে হলে চুপটি করে ভ্যানে গিয়ে বসতে হবে আমাকে।

এমন সাংঘাতিক অবস্থায় কখনও পড়িনি। জানি না, কী এদের উদ্দেশ্য। সময় কাটাতে হবে, একটা গাড়ি যদি এসে পড়ে...

বললাম, "কাজটা ভাল করছ না, গোটা ইউরোপের লোক আমাকে চেনে। বিপদে তোমরাই পড়বে। টাকার দরকার হয়, আমি আরও বেশি..."

অন্য লোকটা আচমকা এগিয়ে এসে দুড়ুম করে একটা ঘুষি ছুড়ল, শেষ মুহূর্তে মাথা সরিয়ে নিলেও যেটুকু লাগল তাতেই বেসামাল হয়ে পড়লাম বাইকসুদ্ধ। বাঁ পা-টা ভাঙল কিনা কে জানে! ওঠার আগেই কেউ এসে জামা তুলে কোমরের কাছে কিছু একটা বিঁধিয়ে দিল। ইঞ্জেকশন। কে জানে কিসের! শরীরটা অবশ হয়ে গেল একেবারে। অন্ধকার হয়ে গেল চার দিক।

॥ ১১ ॥

নিকষ কালো অন্ধকার। এতটুকু নড়াচড়ার উপায় নেই। হাত-পা নাড়াতে গেলেই লাগছে কেমন। যেন একটা লোহার বিছানায় শুয়ে আছি টানটান। বিছানা বলছি কেন, একটা খাঁচা। একটা খোলস। আমার শরীরটা আটকে রয়েছে তাতে। কোনও মতে শ্বাসটুকু নিতে পারছি শুধু। শব্দও শুনতে পাচ্ছি, গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ।

মনে পড়ছে সব। আর বুঝতেও পারছি কিসের মধ্যে রয়েছি। সেই ফুলসুট আর্মার না-হয়ে যায় না। ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে এর মধ্যে পুরে ফেলা হয়েছে আমাকে। যতটা পারি চেষ্টা করলাম কোনও একটা বর্ম খুলে ফেলতে। পারলাম না। শিরস্ত্রাণের শ্বাস নেওয়ার ছিদ্রটুকু ছাড়া সব ডাক্ট-টেপ জাতীয় শক্ত কিছুতে সিল করা। তা ছাড়া শরীরে ব্যথাও খুব। বিশেষ করে বাঁ পা আর ডান দিকের কোমরে, যেখানে ইঞ্জেকশনটা বিঁধিয়েছিল। খুব সম্ভবত প্যানেল ভ্যানটায়ই তোলা হয়েছে আমাকে। গাড়িটা এত ক্ষণ চলছিল। থামল মনে হচ্ছে। গলার আওয়াজ পাচ্ছি কারও। কী বলছে, চেষ্টা করেও বুঝতে পারছি না। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। চোখ দুটোও কী ভীষণ ভারী!

কত ক্ষণ যে অচেতন হয়ে পড়েছিলাম, জানি না। চোখ খুলতে সেই নিকষ অন্ধকার। না, পুরো নিকষ না। আবছা-আবছা দেখতে পাচ্ছি। ধীরে-ধীরে উঠে বসলাম। বাঁ-পা টা এখনও নড়াতে পারছি না। কিন্তু কোথায় আমি? মুক্তিই বা পেলাম কী ভাবে? পাখি ডাকছে কোথাও। উঁহু, পাখি না। শিস দিচ্ছে কেউ। সেই রোমানি ছেলেটা। ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা। মাথা সমান উঁচু একটা পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে। আরে, এ পাথর চিনি আমি। মারিয়াসের কাস্‌লে যাওয়ার পথে মোড়ের সেই ক্রসচিহ্ন দেওয়া গোল পাথরটা। ডান দিকের সরু পথটাই তো গেছে সে চ্যাটালো পাথরটার দিকে। প্রফেসর ডেফনার যেটার উপর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, বা কেউ তাকে ফেলে দিয়েছিল। আমি কী ভাবে এলাম এখানে?

ছেলেটা জোরে-জোরে শিস দিচ্ছে এখন। আমার নজর আকর্ষণ করতে চাইছে? কিছু ইঙ্গিত করছে কি? পাথরটার গোল ক্রসে আঙুল দিয়ে টোকা দিয়ে যাচ্ছে অনবরত। এলোমেলো না, ডান দিকের নীচের খোপটায়ই আঙুলটা রাখছে বার বার। দু'চোখের দৃষ্টি স্থির আমার দিকে। আশ্চর্য, এমন আবছা আলোয়ও কেমন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। উঠে দাঁড়াতে গেলাম, পারলাম না। বাঁ পায়ের গোড়ালিটায় এমন যন্ত্রণা করে উঠল পারলাম না। কী সর্বনাশ! ভেঙে গেছে কি না কে জানে! এর মধ্যে আবার বৃষ্টি শুরু হল যে। ভিজে যাচ্ছি। আর কী মারাত্মক ঠান্ডা! ধড়ফড় করে উঠে বসলাম।

কিন্তু কোথায় কী? স্বপ্ন দেখছিলাম। সংবিত ফিরতে সময় লাগল। কিন্তু কী দেখছি, এ তো দুঃস্বপ্নেরও বেশি। মারিয়াস ভাকারেস্কু জলভর্তি একটা পেট-বটল হাতে নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। কী কুটিল দৃষ্টি! মুখে বরফ-ঠান্ডা জল দিয়ে হুঁশ ফেরানোর চেষ্টা করছিল। পিছন থেকেও কার যেন গলা পেলাম। তেরিকা ভাকারেস্কু। মারিয়াসের স্ত্রী।

"তা হলে, গোয়েন্দাপ্রবর? এ বার কী?" জিজ্ঞেস করল মারিয়াস।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল কোনও মিউজ়িয়ামে এনে ফেলেছে এরা আমাকে। এখন চিনতে পারছি। সেই ঘরটা। যেখানে মারিয়াসরা ওদের সব কিউরিও সামগ্রী স্টক করে। ঘরটায় ঢুকেছিলাম আমি। সময়ের অভাবে দেখতে পারিনি ঠিক করে। এখানেই সেই ফুলসুট আর্মারটা দেখেছিলাম। আমার চাকতি বা রনডেলটার মতো একটা রনডেল ছিল আর্মারটার একটা হাতের বর্মে। অন্যটা খাপ খায় কিনা দেখার ইচ্ছে ছিল আমার। যেটা আমি সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলাম। পম্পিলিউকে অফিসিয়ালি জমা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। এখনও কি আর সেটা আছে? হাত দুটোও পিছনে টেনে বাঁধা। পার্স, মোবাইল কিছুই সঙ্গে নেই বলে মনে হচ্ছে। যদিও কেন জানি না, এমন সাংঘাতিক অবস্থায়ও একটা জিনিস ভেবে ভাল লাগছে, অপরাধী চিনতে ভুল করিনি।

"কী হল? শার্লক হোমস যে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন!" ভুরু নাচিয়ে বলল মারিয়াস।

বললাম, "আমাকে এ ভাবে আনার দরকার ছিল না। আমি তো এমনিই আসতে চেয়েছিলাম। ছেলেমানুষের মতো কাজ করে ফেললেন। আমি বিদেশি। কিছু লোকজন আমাকে চেনেও। তারা জানে আমি এখানেই আসছিলাম। উরিকানির পুলিশ কিছু না-করলেও বুখারেস্টের পুলিশ আপনাদেরও ছেড়ে দেবে না।"

মারিয়াস বলল, "আরে, সেই জন্যেই তো এ ভাবে আনতে

হল। এসেছিলেন থানায়। অতিথি করে আনলে আরও পাঁচটা লোক সাক্ষী হত। এই পদ্ধতিটা ঠিক হল না? আর মোটর সাইকেলের চিন্তা করবেন না। ওটা পুলিশ কোনও একটা সময়ে কোথাও-না-কোথাও ঠিক পেয়ে যাবে।"

"ও সব থাক, কাজের কথা হোক আগে," তেরিকা ভাকারেস্কু এগিয়ে এসেছে, হাতে উদ্যত একটি বন্দুক, যার নলে সাইলেন্সার পাইপ লাগানো। হয়তো এই বন্দুকের একটি গুলিই বেনের প্রাণ নিয়েছিল। মারিয়াসকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে রোমানীয়তে ফিসফিসিয়ে কিছু পরামর্শ করল।

"আপনি কি সত্যিই মনে করেন বরিস ডেফনারের এসওএস মেশিনটা দু'হপ্তায় বানিয়ে ফেলতে পারবেন?" আমার কাছে ফিরে এসে বলল তেরিকা, "যদি পারেন, তবে এ যাত্রা আপনি পার পাবেন। তবে পরিবর্তে রিকার্ডোর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। সে একটি চোর এবং বিশ্বাসঘাতক। এখন বলুন কী ভাবে কাজ করবেন? তবে কোনও ভাবেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে বেরোতে পারবেন না। মনে রাখবেন, আপনি এখানে এসেছেন এ ম্যানসনের কেউ জানে না। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে কাজটা করতে হবে আপনাকে। এবং ওই দু'হপ্তার মধ্যেই। যেমন বলেছিলেন।"

বললাম, "কাজ শেষ হওয়ার পরে যে বেরোতে পারব তার নিশ্চয়তা কী? তা ছাড়া এ ভাবে হাত-পা বেঁধে রাখলে কাজই বা কী ভাবে করব?"

কেউ উত্তর দিল না। তবে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল মারিয়াস। আমি এত দুর্বল, নড়তেই পারছি না। ভাবছিলাম জোরে চিৎকার করি। লাভ নেই। পাথরের দেওয়াল ভেদ করে কতটা আওয়াজ বাইরে পৌঁছবে বা পৌঁছলেও মারিয়াসের লোকজন তাতে কতটা সাড়া দেবে সন্দেহ আছে। এখনও পর্যন্ত যখন বেঁচে আছি মাথা ঠান্ডা রেখে ভাবতে হবে বেরোনোর উপায়। 'এসওএস' যন্ত্র এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বানানো সম্ভবপর না। বিশেষ করে এ রকম মানসিক পরিস্থিতিতে।

মারিয়াসের হাতে বন্দুকের দায়িত্ব অর্পণ করে তেরিকা আবার কোথাও যেন অন্তর্হিত হয়েছিল। ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। আলো-ছায়া-আঁধারিতে সব কিছুই কেমন রহস্যাবৃত।

মিনিট কয়েক পর ফিরে এল তেরিকা। নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তপথ আছে। কারণ যে দরজা দিয়ে আমি ঢুকেছিলাম সে দিক দিয়ে বেরোল কি? অবশ্য সে দরজাটিও কোন দিকে, বলা শক্ত আমার পক্ষে। খুব সম্ভব, যে-ঘরে আমি ঢুকেছিলাম সেটার পিছনে এই ঘরটা। অ্যান্টিরুম বলে যাকে। সে কালে যেমন তৈরি হত।

“খেয়ে নিন। বাথরুমের প্রয়োজন হলে খুঁজে নেবেন। এ ঘরেই আছে। আগামী কাল কথা হবে,” কার্পেটের উপরে একটা নীল ক্যাসারোল আর জলের বোতল নামিয়ে দিয়ে বলল তেরিকা।

বললাম, “আমার জিনিসপত্রগুলো? সেগুলো পেতে পারি?”

“সব পাবেন। সেলফোন, ওয়ালেট,” বলল তেরিকা।

রনডেলটার কথা বলব কী, কেন যে আনতে গেলাম, “আরও কিছু ছিল আমার সঙ্গে?” জিজ্ঞেস করেই ফেললাম।

কেউ উত্তর দিল না। চোখ চাওয়াচাওয়ি করল এক বার শুধু। আমিও আর কথা বাড়ালাম না। দু'জনে চলে যেতে খুললাম ক্যাসারোলটা। পিৎজ়ার ছোট-ছোট টুকরোয় ভর্তি। ক্লান্তি, অবসাদ, আতঙ্ক আর অপমানে খিদেটা যেন ভুলেই গেছিলাম। খাবার সামনে দেখে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তেষ্টাও পাচ্ছে খুব। যা দিয়েছিল, খেয়েই ফেললাম সব। হাফ লিটারের বোতলটাও খালি করে দিলাম। এত ঘুম পাচ্ছিল, কার্পেটেই শুয়ে পড়লাম চিৎপাত হয়ে। শীত, যন্ত্রণা কিছুই টের পেলাম না।

॥ ১২ ॥

কত ক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। সত্যি বলতে এখনও ঘুমিয়ে আছি কিনা, তাও জানি না। কিংবা মরেই গিয়েছি হয়তো। চলে এসেছি অন্ধকার মৃতের জগতে। নিজেকে বার কয়েক চিমটি কাটলাম, ব্যথা তো ভালই লাগছে। তা ছাড়া এত কাঁপতামও না শীতে। শ্বাসকষ্টও হচ্ছে, সেটা হয় বাতাস খুব কম কিংবা ভ্যাপসা কেমন একটা গন্ধের জন্য।

দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলাম। নরম কার্পেট না, হিমশীতল অসমান পাথুরে মেঝেয় পড়ে আছি। গোড়ালির ব্যথা যায়নি, তবে সহ্য করা যাচ্ছে। ডান পা-টা নাড়াতে গিয়ে কিছু একটা লাগল। লাগল ঠিক না, আটকে গিয়েছে। হাতে টেনে এনে ছাড়ালাম। একটা খাঁচার মতো কিছু। সরু-সরু অনেক লাঠির মতো। ভাল করে অনুভব করতে হৃৎপিণ্ডটা তড়াক করে আলজিভে চলে এল যেন। লাঠি না, হাড়। খুব সম্ভব পাঁজরের খাঁচাটা। আর সেটা মানুষেরই। অর্থাৎ, কথা রাখেনি মারিয়াসরা। কাস্‌লের কোনও চোরাকুঠুরিতে চির নির্বাসন দিয়েছে আমায়। খাবারে কড়া মাত্রায় ঘুমের ওষুধ দেওয়া ছিল। মানে, আমাকে নিয়ে কোনও চান্স নেয়নি, অজ্ঞান করে এই মৃত্যুকুঠুরিতে ফেলে দিয়ে গেছে। এখানে তিলে-তিলে একটু-একটু করে মরব। কেউ জানতেও পারবে না আমার এই পরিণতি। বাইকটা হয়তো কোথাও কোনও খাদে পাওয়া যাবে। সকলে ভাববে পাহাড় থেকে পড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আমার। মৃতদেহটার জন্য খোঁজাখুঁজি চলবে কিছু দিন। একটা সময় তাও বন্ধ হবে। চিরতরে হারিয়ে যাব আমি। মার্ক হয়তো কিছু একটা চেষ্টা করবে। হতেও পারে পুলিশ এসে এক বার রুটিন তল্লাশি করে যাবে এই কাস্‌লে। কিন্তু, এই কুঠুরির হদিস আদৌ ওরা পাবে কী? এই সব কুঠুরি, অন্ধকূপ, ইংরেজিতে যেটাকে বলে ডানজিয়ন, অনেক কুবুদ্ধি খাটিয়ে তৈরি করা হত। লড়াইয়ে বন্দি, বিদ্রোহী, এমনকি অপছন্দের মানুষদের লুকিয়ে ফেলা হত এখানে। শুধু তাই নয়, নানা রকম উপায়ে তাদের উপর চলত অমানুষিক নিপীড়ন, নির্যাতন। ট্রানসিলভানিয়ার ড্রাকুলার ব্রান-কাস্‌লে সে সব সাজিয়েও রাখা আছে। মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের নমুনা। মারিয়াসের দয়া সে রকম কিছু অন্তত করেনি বা একেবারে প্রাণঘাতী কোনও ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলেনি।

চিন্তাটা হতে একটু বল পেলাম মনে। হাড় হয়তো ভাঙেনি। মচাকানোর উপর দিয়ে গেলে রক্ষে। হাত দিয়ে দেখলাম ফোলাটা আছে, তবে বাড়াবাড়ি রকম ফুলে যায়নি। স্পর্শ করতে পারছি। লিগামেন্টও হয়তো ঠিক আছে। উঠে দাঁড়ালাম কোনও মতে। জায়গাটা বোঝার দরকার। কিন্তু এত অন্ধকার, কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। খেয়াল হল হাতের ঘড়িটা রয়েছে। দামি ঘড়ি। শখ করে কিনেছিলাম। ভাগ্যিস এটা খুলে নেয়নি। নাইট ভিশন মোড অন করলে মৃদু আলোকিত হয়ে ওঠে ডায়ালটা। রাত ন'টা এখন। সাত তারিখ। মানে গোটা একটা দিন ঘুমের ঘোরেই কেটেছে।

যাই হোক, বেঁচে আছি এটাই বড় কথা। চোখটা কিছুটা সয়ে আসায় আবছা-আবছা বুঝতে পারছি জায়গাটা। সরু একটা ঘর। চওড়ায় দশ ফুট বড় জোর। লম্বায় আরও তিন গুণ হবে। ছাদ খুব নিচু। হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। ঘর জুড়ে যাবতীয় বাতিল জিনিসে ভর্তি। ভাঙা সিন্দুক, ভাঙা শিরস্ত্রাণ, মরচে ধরা তরোয়ালের খাপ, এ রকম আরও কত কী! যে নরকঙ্কালের বুকের খাঁচায় পা ঢুকে গেছিল, সেটাও দেখলাম। দেওয়ালে ঠেস দেওয়া আরও দুটো রয়েছে। আর রয়েছে কুকুর বা কুকুর জাতীয় প্রাণীর অজস্র কঙ্কাল, খুলি, হাড়গোড়। আমার অনুমান নেকড়ে। লোককথাকে তা হলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই জার্মান জেনারেলের মারা সেই সব নেকড়ের দেহাবশেষ। সত্যি, মানুষের নৃশংসতার শেষ নেই কোনও।

পা টিপে-টিপে সাবধানে এগোচ্ছি, পাথরের মেঝেয় কিসে যেন পা পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষীণ আর্তনাদ। জখম পা-টা ছড়িয়ে কোনও মতে উবু হয়ে বসে আলো ফেলতে যা দেখলাম, উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ড আবার লাফাতে শুরু করে দিয়েছে। রিকার্ডো! পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে সে। প্রায় অচৈতন্য। কানের কাছে নাম ধরে ডাকাডাকি করতে একটু যেন হুঁশ ফিরল। কিন্তু সে ভেবেছে, আমি ওকে উদ্ধার করতে এসেছি। আরও কিছু ক্ষণের চেষ্টায় কিছুটা ধাতস্থ হল অবশেষে। সংক্ষেপে বললাম আমিও কী ভাবে ওর সঙ্গী হয়েছি।

রিকার্ডো আচমকা কেঁদে ফেলল, “তোমার কথা জানি না। আমি পাপ করতে চেয়েছিলাম, তাই এই শাস্তি পেলাম। ভেবো না, প্রফেসরের মৃত্যুতে হাত আছে আমার। কিন্তু খুনি কে, আমি বুঝতে পেরে যাই। এত ক্ষণে তুমিও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। কিন্তু ওদের সটান ধরিয়ে দেওয়ার বদলে দুর্বুদ্ধি জেগে ওঠে আমার মাথায়। একটা নোংরা অর্থ পিশাচ হয়ে যাই আমি। তারই এই পরিণতি,” রীতিমতো কষ্ট করে এক-একটা শব্দ উচ্চারণ করছে সে। উত্তেজনা আর কৌতূহলে আমিও কাঁপছি, তবু বাধা দিলাম, “পরে শুনব। একটু শান্ত হও।”

মাথাটা একটু নাড়ল রিকার্ডো, “বাধা দিয়ো না, সময় কম আমার। এটুকু বলার জন্যেই হয়তো এখনও বেঁচে আছি,” খুব কষ্টে টেনে-টেনে শ্বাস নিয়ে বলল রিকার্ডো, “তোমাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখনও কিন্তু জানতাম না মারিয়াসদের কুকীর্তি। কিন্তু খটকা থেকেই গেছিল। এর পর তো আশ্চর্য সব ঘটনা। বেনের আত্মা ইঙ্গিত দিচ্ছিল বিষয়টার তদন্ত করার জন্য, ওই দ্যাখো এখানেও চলে এসেছে বেন। খুব রেগে আছে আমার উপর। সরি বেন। ভেরি সরি। কিন্তু একটু দাঁড়াও আমি বলে দিচ্ছি ভাস্কর স্যারকে... ব্যাঙ্কে আমার যে...”

কী কাণ্ড! এ তো ভুল বকছে। যদিও শরীরটা ছমছম করে উঠল আমার। বেনের অস্তিত্ব আমি নিজেও অনুভব করেছি। সত্যিই কি এখানে এসেছে সে! এসেই থাকুক। রিকার্ডোকে চাঙ্গা করতে হবে আগে। বললাম, “কথা বলে শক্তি ক্ষয় কোরো না। পরে শুনব। যে ভাবেই হোক, বেরোব এখান থেকে।”

শুনল না রিকার্ডো। স্বর বন্ধ হয়ে গেছিল। আবার কিছু বলার চেষ্টা করছে, শ্বাস তো নিচ্ছে না, যেন হাপর টানছে। কী সর্বনাশ! খুব খারাপ লক্ষণ। জানি না কী ভাবে সুস্থ করব ওকে।

“ওদের ছে..ছেড়ো...ন..না..,” কথাও জড়িয়ে যাচ্ছে এ বার। রোমানীয় না ইংরেজি মিশিয়ে ঘড়ঘড় করে কিছু বলল। আমি ওর মুখটা দু'হাতে ধরলাম। ‘বু..বুল...’ বিড়বিড় করে আচমকা স্থির হয়ে গেল রিকার্ডো।

নাড়ি দেখলাম। নেই। কোনও ভাষা জানি না, কী ভাবে আমার অবস্থাটা বোঝাব। স্তব্ধ হয়ে কত ক্ষণ বসে রইলাম ওর পাশে। কত দিন এখানে বন্দি হয়ে ছিল ও? ছ'দিন? সাত দিন? ছ'-সাত দিনের অনাহারে ওর মতো স্বাস্থ্যবান মানুষ দুর্বল হতে পারে, কিন্তু মরে যেতে পারে কী!

জানি না।

মাথাটা হেলে গেছিল, সোজা করে শোয়াতে গিয়ে নজরে এল কোমরের কাছে ক্ষতচিহ্নটা। কী কাণ্ড! এ তো বুলেট ইনজুরি। পাথরে আলো ফেলতে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগও নজরে পড়ল অনেক। রিকার্ডোর জামাতেও। জ্যাকেটের নীচে ছিল বলে প্রথমটায় বুঝিনি। বেচারি! প্রচুর রক্তক্ষয়ই মৃত্যুটাকে তরান্বিত করল। 'বুল' বলতে হয়তো বুলেট বোঝাতে চাইছিল।

জানি না কেন, হঠাৎই প্রচণ্ড রাগে আপাদমস্তক কাঁপতে শুরু করল আমার। মারিয়াসদের কী ভাবে শাস্তি দেওয়া যায়, তা-ই নিয়ে ভেবে চললাম আমি। কিন্তু সবার আগে আমাকে এই মৃত্যুকুঠুরি থেকে যে বেরোতে হবে!

ঘড়ির আলোয় দেওয়ালগুলো দেখতে শুরু করলাম। একটা দরজা আবিষ্কার করলাম, দেওয়ালের যে দিকটায় প্রস্থ কম। লোহার ছোট দরজা। রীতিমতো ভাল করে আটকানো বাইরে থেকে। বলা বাহুল্য, ওই দরজা দিয়েই মারিয়াসরা রেখে গেছে আমাদের। সরাসরি উল্টো দিকে কি আরও একটা দরজা থাকতে পারে? না, নেই। নিরেট পাথরের দেওয়াল। মানে বেরোতে হলে ওই লোহার কপাট ভাঙতে হবে। যা কোনও মতেই সম্ভব না।

বুঝতে পারছি, কেন রিকার্ডোকে এখানে লুকিয়ে রেখে এতটা নিশ্চিন্ত ছিল মারিয়াসরা। এই কুঠুরিতে আসার উপায়টাও এক মাত্র তারাই জানে। চিন্তাটা হতেই নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। সব চেয়ে মুশকিল হল ঘড়ির ব্যাটারিটা আচমকা ইস্তফা দিল। নিরেট নিথর অন্ধকারে রিকার্ডোর মৃতদেহের পাশে মৃতবৎই বসে রইলাম।

কত ক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। হয়তো ফের অচেতন হয়ে গিয়ে থাকব। একটা সময় খিদে আর তেষ্টায় শরীরটা এমনই আনচান করতে লাগল উঠে বসলাম। আন্দাজে রিকার্ডোর জামাকাপড় হাতড়াতে শুরু করলাম। লজেন্স, ক্যান্ডি এসব খাওয়ার অভ্যেস ছিল ওর। যদি দুটো-একটা পকেটে রেখে থাকে। না। নেই।

ঘড়ির আলোটা জ্বালাতে চেষ্টা করলাম। জ্বলল না। জানি না, কেন চিৎকার করে উঠলাম হঠাৎ! না। কিছুতেই না। কিছুতেই এই ভাবে তিলে-তিলে মরতে পারব না আমি। কী হল, ফের নতুন উদ্যম এল। দেওয়ালে হাত বোলাতে শুরু করলাম। বড়-বড় পাথরের স্ল্যাব বসানো দেওয়াল। কোথাও যদি কোনও একটা ফাটল বা আলগা পাথর থাকে। সিনেমা, গল্প-গাথায় যেমন থাকে।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে কত ক্ষণ উন্মাদের মতো হাত বুলিয়েছিলাম জানি না, আচমকা একটা দেওয়ালের নীচের দিকে নিছক পাথরই পেলাম না, মনে হল খোদাই করা রয়েছে কিছু। জায়গাটায় নেকড়ের হাড়গোড় ডাঁই করা ছিল। অতি কষ্টে সরিয়ে এই স্ল্যাবটা পেয়েছি। ডিপ করে খোদাই করা, আঙুল বোলানো যাচ্ছে। গোল একটা বৃত্ত। মধ্যিখান দিয়ে একটা ক্রস। অঙ্কের গুণ চিহ্নের মতো। আশ্চর্য, এই চিহ্ন আমি চিনি। এ তো সেই চিহ্নটা যেটা কাস্‌লের কাছে সেই গোল পাথরটার গায়ে দেখেছি। গত কাল রাতে ঘুমের অচেতনে সেই স্বপ্নটাও মনে পড়ছে। সেই রোমানি ছেলেটি, আঙুল বোলাচ্ছিল এই চিহ্নটায়। ডান দিকের নীচের খোপটায় আঙুল দিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিতও করছিল না? কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল? জানি না। হয়তো। আমি সে ভাবেই বারে-বারে আঙুল ছোঁয়াতে লাগলাম। আঙুল ব্যথা হয়ে গেল শুধু, কিছুই হল না। শেষে ঠেলতেও শুরু করলাম দু'হাত দিয়ে। না। পাথরের দেওয়ালে কোনও স্পন্দন নেই। আর পারছি না। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম ক্রসেই হেলান দিয়ে। ঠিক সেই মুহূর্তে অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা হল। পাথরটা ম্যাজিকের মতো কিছুটা ঘুরে গেল বাইরের দিকে। টাল সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা লম্বা হাড় তুলে আগল দিলাম, যদি বন্ধ হয়ে যায়। যতটা ফাঁক হয়েছে আমার শরীরটা গলে যাবে। হাত বাড়িয়ে বুঝলাম সিঁড়ির ধাপ। ঊর্ধ্বগামী। জানি না, কোথায় গিয়ে উঠেছে এই সিঁড়ি। ফের মারিয়াসের কবলে পড়তে চাই না।

একটা চিন্তা মাথায় এসেছিল। সেটা খুবই গোলমেলে। কিন্তু তা-ই করব। সময় লাগবে একটু। আরও কতগুলো হাড়গোড় টেনে এনে সিঁড়ির মুখটায় গুঁজলাম ভাল করে। জ্যাকেটটা খুলে রিকার্ডোর জামা আর জ্যাকেটটা গায়ে চাপালাম। দু'জনের একই হাইট। স্বাস্থ্য যদিও রিকার্ডোর অনেক মজবুত। আমার থেকে চওড়া বুকের ছাতি। অসুবিধে হবে না। হঠাৎ অন্ধকারে দেখলে প্রথমটায় বোঝা যাবে না। রিকার্ডো সব সময় মাথায় একটা বিনিক্যাপ পরে। সেটাও ছিল। পরে নিতে কান-মাথা সব ঢেকে গেল। জ্যাকেটের পকেটে একটা মাস্কও পেয়ে গেলাম। আমার কাছেও ছিল। রিকার্ডোরটাই পরব। তবে এখানে না। পুরোপুরিই দমবন্ধ হয়ে যাবে তা হলে। সব হয়ে গেলে বিদায় জানালাম রিকার্ডোকে। বললাম, 'বন্ধু ফিরে আসব। নিয়ে যাব তোমাকে এই নরক থেকে।'

প্রতিটি পা গুনে-গুনে গেছিলাম রিকার্ডোর কাছে, অন্ধকারে যাতে গুলিয়ে না-যায়। ফিরলামও সেই ভাবে। এ বারে একটা-দুটো হাড় রেখে নিজের শরীরটাকে আগে বের করলাম। হাড় দুটো রেখেই দিলাম সেই ভাবে। থাক, কে জানে উঠেই যদি ফের নেমে আসতে হয়।

এক জনের ওঠার মতো সরু সিঁড়ি। অসমান পাথরের ধাপ। কিন্তু শেষই হয় না যে! তার উপর প্যাঁচানো। উঠতেও হচ্ছে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে।

যাই হোক, অবশেষে ছোট একটা প্যাসেজে গিয়ে শেষ হল সিঁড়ি। উল্টো দিকে ফের নিরেট পাথরের দেওয়াল। এ বার? যুক্তি বলছে অবশ্যই আলগা পাথর থাকবে। সত্যিই তাই। বেশি কষ্ট করতে হল না। হাত বোলাতে-বোলাতে একই রকম চিহ্ন খোদাই করা পাথরের একটা স্ল্যাব পেলাম। এটাও আমার হাঁটুর কাছাকাছি। এ বারে খুব বেশি পরিশ্রমও করতে হল না। কয়েক বারের চেষ্টাতেই পাথর ঘুরল, কিন্তু সামান্য একটু। কিছুতে যেন আটকে যাচ্ছে। আমি হাত বাড়িয়ে ঠেললাম। কাঠের কিছু একটা রয়েছে উল্টো দিকে। হাতে হল না, ডান পা-টা ঢুকিয়ে ঠেলতে কিছুটা সরল। পাথরও ঘুরল সঙ্গে। আমি ঢুকে পড়লাম হেঁচড়েপেঁচড়ে। পাথরটাও বন্ধ হয়ে গেল।

॥ ১৩ ॥

প্রথমে দম নিলাম প্রাণ ভরে। তার পর ওই ভাবেই শুয়ে রইলাম কিছু ক্ষণ। শরীরে কোনও বল নেই আর। কী ভাবে যে উঠে এলাম নিজেই জানি না। কিন্তু কোথায়, কোন ঘরে এসে ঢুকলাম আমি? কেউ থাকলেই হয়েছে আর কী! কাঠের যেটায় আটকাচ্ছিল, ওয়ার্ড্রোব বা আলমারি জাতীয় কিছু হবে। সরিয়ে দেব আগের মতো? এ দিকের দেওয়ালটা পুরো পাথরের। বড়-বড় স্ল্যাবে তৈরি। কিন্তু পাথরে কোনও খোদাই চিহ্ন অনুভব করলাম না। মানে গোলমাল হলে, যে পথে এলাম, ফেরার উপায় নেই।

যা থাকে কপালে, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগোচ্ছি। নীচে নরম কার্পেট, অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু ঘরটা কেমন চেনা-চেনা না? চার দিকে ছড়িয়ে নানান আসবাবপত্র। মূর্তি-টুর্তি। শো-পিস। আমি কি সেই স্টোর রুমেই এসে পৌঁছলাম? উঁহু, এক দিকে একটা খাট রয়েছে। স্টোর রুমে খাট ছিল না। সামনে একটা খোলা দরজাও দেখছি। মৃদু আলো আসছে। ও পাশে আরও একটা ঘর। ক্যানোপি দেওয়া বিছানা দেখা যাচ্ছে। প্রমাদ গুনলাম। শেষে কি মারিয়াসদের ঘরে এসেই ঢুকলাম না তো? দাঁড়াতে গিয়ে হাতে লেগে কিছু একটা পড়ল শব্দ করে। মুহূর্তে স্পষ্ট মারিয়াসের গলা শুনলাম। রোমানীয়তে কিছু একটা বলল ঘুম ভেঙে।

কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ! যেমন আশঙ্কা করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত মারিয়াসের রুমেই এসে উপস্থিত হয়েছি। এটা ওর ঘরের অ্যান্টিরুম। মাস্কটা পকেট থেকে বের করে পরে নিলাম তাড়াতাড়ি, কিন্তু নিজেকে লুকোই কোথায়? হলদেটে আলো জ্বলে উঠেছে ঘরে। সে রকম জোরালো না-হলেও ঘরের সবই দৃশ্যমান। মারিয়াস হাতে রিভলভার নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। পোর্সেলিনের একটা পরির মূর্তি পড়েছে আমার

হাত লেগে। মারিয়াস সেটা দেখতে নিচু হয়েছে, ভাবলাম এই সুযোগ, বন্দুকটা কেড়ে নিতে হবে আগে। হল না। পারলাম না। মারিয়াস আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই কী অনুমানে সরে গেছে! কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান মাত্র। আমি এ বার চরমতম বিপদে। মারিয়াসের বন্দুকের নল আমার দিকে।

"কী ভেবেছ? রিকার্ডোর ভেক ধরে ভয় দেখাবে?" চোখ-মুখ বিকৃত করে বললেও বিস্ময় আর কিছুটা অবিশ্বাসের ছোঁয়াও মারিয়াসের গলায়।

যে-কোনও মুহূর্তে ট্রিগার টিপে দেবে মারিয়াস, তবুও মরিয়া হয়ে বললাম, "তোমার খেলা শেষ মারিয়াস, পিছনে দেখো।"

ওকে অন্যমনস্ক করতে বলেছিলাম। সত্যি বলতে পায়ে-পায়ে কেউ এগিয়ে আসছিল ওর পিছনে, কেউ মানে তেরিকা, মারিয়াসের স্ত্রী। কিন্তু আচমকা সে থেমে গিয়ে ভয়ানক একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল।

"গড ড্যাম ইউ, ইট্‌স দ্যাট রেচেড সায়েন্টিস্ট..." পাল্টা চিৎকার করে বলল মারিয়াস।

কিন্তু তেরিকা যেন শোনেইনি। সে আরও একটা অমানুষিক চিৎকার করে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মারিয়াসের উপর। মুহূর্তে দুড়ুম করে কান-ফাটানো আওয়াজ। সে আওয়াজের রেশ মিলিয়ে যেতে না-যেতেই পর মুহূর্তেই আরও একটা বিষম আওয়াজ। মারিয়াসের ঠিক মাথার উপরে মস্ত একটা ঝাড়বাতি ছিল, সেটা সটান গিয়ে পড়ল দু'জনের উপর।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বসে পড়েছিলাম কার্পেটে। সে এক অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আসলে মারিয়াস আমার উদ্দেশে ট্রিগার প্রেস করেই দিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তেরিকা গায়ের উপর পড়ায় বেসামাল হয়ে যায় সে। লক্ষ্যভ্রষ্ট বুলেট সিলিং খসিয়ে নামিয়ে আনে অন্তত আড়াইশো পাউন্ড ওজনের পিতলের বিশাল ঝাড়বাতিটি।

॥ ১৪ ॥

বুখারেস্ট বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসে আছি। সকাল এগারোটা এখন। ফিরে যাচ্ছি জার্মানি। স্টুটগার্টের ফ্লাইট কোনও কারণে ঘণ্টা চারেক লেট। আবহাওয়া খুব খারাপ। মার্কও আছে সঙ্গে। আর-একটু আগে ছিলেন প্রফেসর ডেফনারের বন্ধু আইভান সাহেব এবং পুলিশ কমিশনার সেই ভিভিয়ানা কস্তি। এমন একটা অপরাধের এ রকম নাটকীয় সমাপ্তিতে বলা বাহুল্য, ভাল রকম খাতিরযত্ন আর প্রচারও পেয়েছি আমরা। আজকে ডিসেম্বরের দশ, মার্ক সাত তারিখেই রওনা দেয় ডাবলিন থেকে। শেষ পর্যন্ত ভিভিয়ান কস্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিল ও। ভদ্রমহিলাও ফেরেন সাত তারিখেই। কেসটা তিনি নিজের হেফাজতে নিয়ে নেন। শুনেছি উরিকানির সেই ইনস্পেক্টর পম্পিলিউয়ের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে। প্রথম দিকে সে নিরপেক্ষই ছিল। কিন্তু আমি দ্বিতীয় বার যখন তার সঙ্গে দেখা করতে যাই, খবরটা সেই-ই হয়তো দেয় মারিয়াসকে। দু'জনের মোবাইল ফোনের কললিস্ট দেখা চলছে। এমনকি যে সংস্থাটির থেকে মোটরসাইকেল নিয়েছিলাম, তারাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ না-করতে পেরে উরিকানি থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল। পম্পিলিউ গড়িমসি করছিলেন।

যাই হোক, শেষ অবধি যে সুস্থ শরীরে যে ফিরে যাচ্ছি, এটাই বড় কথা। গোড়ালিটাও ভাঙেনি, মচকেই গিয়েছিল। ঠিকও হচ্ছে। সে রাতে বস্তুত আমাকে আর কিছুই করতে হয়নি। গুলির শব্দে এলভিরা, অ্যাড্রিয়ানরা ছুটে এসেছিল দোতলা থেকে। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন। পরিস্থিতি দেখে তারা যে খুব অবাক হয়েছে বা দুঃখ পেয়েছে মনে হয়নি। আসলে মারিয়াসের দুর্বিনীত ব্যবহারে সকলেই অতিষ্ঠ ছিল। সকলেই ভাবছিল কাজ ছেড়ে দেবে। অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ সব জায়গায় ফোন করা হয়। মারিয়াস ও তেরিকা দু'জনেই মারাত্মক জখম হয়েছিল। মারিয়াস বাঁচেনি। পরের দিনই সে মারা যায়। তেরিকা গুরুতর আহত হলেও হয়তো বেঁচে যাবে। সে তার কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেছে। তবে তার আতঙ্কের ঘোর এখনও কাটেনি। বারে-বারেই সে রক্তাক্ত রিকার্ডোকে দেখছে সামনে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি দিতে। সে রাতে নাকি সে এমনই দেখেছিল। তীব্র প্রতিহিংসা নিয়ে মারিয়াসের সামনে দাঁড়িয়েছিল রিকার্ডো। গোটা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে গলগল করে। রক্তাক্ত দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল মারিয়াসের গলা। আমাকে নাকি সে দেখেইনি।

মার্ক বলছিল, ''ওই রকম একটা জিনিস মাথায় পড়ে বেঁচে থাকলে আমিও কত হ্যালুসিনেট করতাম। হয়তো।''

জানি না, কী সত্যি। তবে রিকার্ডোর মৃত্যুটা সত্যিই ওর লোভের পরিণতি। প্রথমটায় সে ভেবেছিল প্রফেসর ডেফনারের কাজকর্ম সব আত্মসাৎ করতে চাইছে মারিয়াস। এটা সে কিছুতেই মানতে পারছিল না। খুব সম্ভবত প্রফেসরের ঘরের একটি নকল চাবি সে তৈরি করেছিল। তার পর সুযোগ বুঝে প্রফেসরের হার্ড ড্রাইভ থেকে যাবতীয় ডেটা নিজের একটি হার্ড ডিস্কে তুলে নেয়। ঊনত্রিশ তারিখে বুখারেস্টের উদ্দেশে সে কেবল মারিয়াসের কাজেই যায়নি। সে হার্ড ডিস্কটিও রাখতে গিয়েছিল। সঙ্গে আরও একটি জিনিস। যেটা সে অন্তিম সময়ে বলতে চেষ্টা করেছিল, বুল-বুল বলে। আসলে তা হল, বুলেট। এটা সেই বুলেট নয়, যেটা ওর গায়ে লাগে। এটা সেই বুলেট যা বেন-কে মেরেছিল। কিন্তু বুলেট বেনের গায়ে থাকেনি। সেটা ওকে ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। সেই বুলেটটিই ল্যাবের মধ্যে কোনও ভাবে পেয়ে যায় রিকার্ডো। হয়তো আমি তখন ছিলামও ওখানে। জানি না কেন আমাকে বলেনি সে। কিন্তু বুদ্ধি করে সেটা ব্যাঙ্কের লকারে রেখেছিল। ইতিমধ্যে কুকুর যে গানশটে মারা গেছে সে খবর পৌঁছয় ম্যানসনে। সম্ভবত তখন থেকেই কুবুদ্ধির শুরু রিকার্ডোর। এই জন্যে আমার ফোন এড়িয়ে যেতে শুরু করে। তেরিকার কথা অনুযায়ী বুলেটের পরিবর্তে প্রচুর টাকা দাবি করেছিল রিকার্ডো। অন্যথায় হুমকি দিয়েছিল, বুলেটটা প্রেস ডেকে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেবে।

কিন্তু মারিয়াস অন্য ধাতের মানুষ। অসীম তার ধনলিপ্সা। ক্রমশ জানা যাচ্ছে তার কুকীর্তির ইতিহাসও। আমেরিকায় গবেষণা ছেড়ে সে আসলে ট্রেজ়ার হান্ট করে বেড়াত। একটি-দু'টি সাফল্যও পেয়েছিল নাকি। এ ছাড়াও জালিয়াতি করে কোনও একটি ওষুধের কোম্পানি থেকে প্রচুর অর্থও সে হাতায়। রিকার্ডোর হুমকিতে ভয় পাওয়ার পাত্র সে নয়। সুতরাং ফের বচসা। এবং ফের গুলি। তেরিকার কথা অনুযায়ী রিকার্ডো মরেই গেছিল। ইতিমধ্যে তারা অনেক খাটাখাটনি করে ওই গুপ্তকুঠুরিটা আবিষ্কার করেছে। আবার এক জনকে পাহাড় থেকে ফেলা মুশকিল। তা ছাড়া সে এ বার সত্যি-সত্যি বন্দুকের গুলিতে মৃত। সুতরাং ওই কুঠুরিতে লুকিয়ে ফেলে তারা রিকার্ডোকে। ওটার হদিস যদি আগে জানা থাকত, তা হলে প্রফেসর আর তার কুকুরকেও ওখানে রেখে আসত হয়তো। খুব সম্ভব প্রফেসর মারা যাওয়ার পর তার কাগজপত্র, মোবাইল ঘেঁটে চোরাকুঠুরির হদিসটা পায় ওরা।

মারিয়াসের ভাড়া করা যে-দুর্বৃত্তের দল আমাকে প্যানেল-ভ্যানে তুলেছিল, তারাও সব ধরা পড়েছে। সেই গাড়ি আর আমার বাইকসমেত। গাড়ির নম্বরটা মনে থেকে গেছিল আমার। পুরোটা না, শেষের ক'টা নম্বর শুধু, ০৭ বি-ই-এন। সে দিন সাত তারিখ ছিল আর বি-ই-এন তো কুকুরটার নাম। লোকগুলোই বেনকে ওখানে কবর দিয়েছিল। চোখের ক্ষতটাও হয়তো ওদেরই করা! জানি না, আদৌ সেটার কোনও প্রয়োজন ছিল কিনা। হয়তো যেমন নির্দেশ দিয়েছিল মারিয়াস। গাড়ির ডিকিতে বেনের রক্তের দাগও পেয়েছে পুলিশ। এ ছাড়া আমার আর রিকার্ডোর মোবাইল ফোনগুলোও তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। সিম কার্ড ছাড়া অবশ্যই।

আমার কাছে প্রফেসরের যে হার্ড ডিস্ক দুটো ছিল, তা ইতিমধ্যেই তুলে দিয়েছি পুলিশের হাতে। এ ছাড়া প্রফেসরের গবেষণার অন্যান্য

সব নথি-কাগজপত্র রোমানিয়ার সরকার অধিগ্রহণ করেছে। তারা এ বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে।

তেরিকা অবশ্য বলছে প্রফেসরের মৃত্যুটা সত্যিই একটা দুর্ঘটনা। সে দিন ল্যাবরেটরিতে প্রফেসরের সঙ্গে মারিয়াসের রীতিমতো বচসা হয়। আসলে কাস্‌লের গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য বেশি চাপ দিচ্ছিল মারিয়াস। এ জন্য কয়েক দিন ধরেই মনোমালিন্য চলছিল। সে দিন কাজের সময় মারিয়াস ফের গুপ্তধনের প্রসঙ্গ তোলে। প্রফেসর সরাসরি বলে দেন আগে তিনি গবেষণা শেষ করবেন, গুপ্তধনটনের খোঁজ পরে দেখা যাবে। এতে মারিয়াস সাংঘাতিক রেগে যায়। এমনিতেই সে ছিল অত্যন্ত বদরাগী। বেন তার মনিবকে হেনস্থা হতে দেখে মারিয়াসকে কামড়াতে যায়। তেরিকার বক্তব্য অনুযায়ী, তখনই ভয়ে মারিয়াস গুলি করে দেয় বেনকে। জানি না, মারিয়াস সব সময় বন্দুক সঙ্গে রাখত কিনা, এবং তাও কিনা সাইলেন্সার ফিট করা। যাই হোক, প্রফেসর বাঁচাতে যায় বেনকে। কিন্তু মারিয়াসের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে যান। মাথা গিয়ে লাগে স্টিলের একটা টেবিলে। স্ট্রোকটা নাকি তখনই হয়। ম্যাসিভ অ্যাটাক যাকে বলে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনিও মারা যান।

ঘটনাপ্রবাহ এমনই যে পুরো ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনার মোড়ক দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না তেরিকাদের। আর্মারসুটে প্রফেসরকে ভরে প্লাস্টিকে মুড়ে ফেলা হয়। নামানো হয় লিফ্‌টে। ল্যাবের সামনেই লিফ্‌ট, অসুবিধে হয়নি। লিফ্‌ট থেকে নামতেই মারিয়াসের গাড়ি। তেরিকা বেরিয়ে যায় গাড়ি নিয়ে। যেন আর্মারটা ডেলিভারি দিতে যাচ্ছে কোথাও। এর পর প্রফেসর সেজে বেনকে নিয়ে বের হয় মারিয়াস। দু'জনেরই চেহারা ছোটখাটো। মানিয়ে যায়। ফ্লোরিন দেখেও সন্দেহ করেনি। সে-ও আসলে ঘোরে ছিল তখন। গেমটেম না, আফিমের নেশা তার। এর পর তো সোজা ব্যাপার। তেরিকা অপেক্ষা করছিল মারিয়াসের জন্য। প্রফেসরকে ফেলে দেওয়ার পর ওই আর্মারসুট মারিয়াস পরে নেয়। ঠিক যেমন-যেমন আমি অনুমান করেছিলাম। তাড়াহুড়োয় আর্মারের একটি রনডেল খসে নীচে পড়ে, যেটি আমি পাই। সেটায় খয়েরি দাগ রক্তের কিনা অবশ্য আর জানা যায়নি। কারণ, ওটা তারা ধুয়ে-মুছে যেখানে থাকার কথা, রেখে দিয়েছিল। কুকুরটাকে ফেলে আসেনি, কারণ সে বন্দুকের গুলিতে মারা গেছে। জানাজানি হলে মুশকিল। সুতরাং, ফেরত আনা হয় প্লাস্টিকে মুড়ে। পরে কোনও এক সময়ে ভাড়াটে দুষ্কৃতীগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়। মানে, মোটামুটি যে-রকম অনুমান করেছিলাম, মিলল সবই।

আমি গত কাল আর-এক বার সেই কাস্‌লে গিয়েছিলাম। ঠিক কাস্‌লে না, সেই রোমা ভবঘুরেদের ডেরায়। খুবই সহজ-সরল দেখলাম তাদের। দলপতি লোকটির সঙ্গেই মূল কথা হল। হানজি নাম। বয়স বলল পঁচানব্বই। আমি সেই ছেলেটির বর্ণনা দিয়ে দেখা করতে চাইলাম। হানজি কিছু ক্ষণ আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন আমি ওর কথা জানতে চাইছি। কোথায় ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে?

যা-যা ঘটনা হয়েছে সব বললাম। কাস্‌লের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাও বাদ দিলাম না। কী ভাবে মুক্তি পাই তাও বললাম। উত্তরে হানজি যা জানাল, তাও কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়! জার্মান নাৎসিরা যখন কেল্লা দখল করে নির্বিচারে নেকড়ে নিধন শুরু করল, তখন সেই ছেলেটি, নিকু ছিল তার নাম, নেকড়েগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করত। জার্মান সিপাইরা নেকড়ে গুলি করার আগেই সে কোনও ভাবে সতর্ক করে দিত নেকড়েদের। নিকুর একটি পোষা কুকুরও ছিল। কাণ্ড হচ্ছে, জার্মানরা সেই কুকুরটাকে ধরে কেল্লায় নিয়ে যায়। নিকু যায় খোঁজ করতে। জার্মানরা কুকুরকে তো ছাড়েইনি, নিকুকেও বন্দি করে লুকিয়ে ফেলে কোনও গুপ্ত কুঠুরিতে। যদিও নিকু কোনও ভাবে পালিয়ে আসে সেখান থেকে। পাথরে যে বৃত্তের মধ্যে ক্রুসচিহ্ন সেটা সেই-ই প্রথম খোদাই করে। ওটাই নাকি তাকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেছিল। যদিও ঘটনা এখানেই শেষ না। শেষ পর্যন্ত নেকড়ে বাঁচাতে গিয়ে জার্মানদের গুলিতেই অকালে মারা যায় নিকু। সে সব কবেকার কথা। হানজিও তখন প্রায় নিকুরই বয়সি।

মার্ককে এই সব আর বলিনি। ও এ সবে একেবারেই বিশ্বাস করে না। তবে মিসেস দাচিয়ানাকে ফোন করে বলেছি সব। তিনি খুবই খুশি। বললেন, কুয়োর বিষয়টা তিনিও শুনেছিলেন, কিন্তু ওটা যে একেবারেই গুজব, তা নাকি খোদ প্রফেসর ডেফনারই এক বার ওকে বলেছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যে আত্মাগুলো শান্তি পেল, এতে খুবই খুশি তিনি। আমি আর বললাম না, হয়তো সবাই না। কারণ রিকার্ডোকে পুরো পারলৌকিক মর্যাদায় সমাধিস্থ করা সত্ত্বেও সে নাকি এখনও নিয়মিত ভয় দেখিয়ে চলেছে তেরিকা ভাকারেস্কুকে।

আমাদের ফ্লাইটের ঘোষণা হচ্ছে। মার্ক কী ভাবছিল, ছোট একটা শ্বাস ফেলে বলল, "আমার কী মনে হয় জানো, তোমার একটা সিক্সথ সেন্স আছে, কিংবা তোমাদের ভাষায় যাকে বলে প্রেতযোগ। তোমার সঙ্গে অশরীরীদের একটা কানেকশন হয়ে যায়।"

পাশাপাশি

১। প্রত্যাখান। ৩। আওয়াজ। ৫। বিঘ্ন। ৭। এটি খেলে হজম হয়। ১২। হঠাৎ। ১৪। পেন। ১৬। সপ্তাহে যা সাতটি থাকে। ১৭। রাংতা। ১৮। শেষে 'ল' যোগ করলেই রক্তিম। ২০। ধুলো। ২১। ...সবজি। ২৩। সীতার বাবা। ২৫। খপ্পর। ২৭। দর। ২৯। বেশি খেলে বা বদহজম হলে যা হয়। ৩১। লজ্জা। ৩৩। কয়েকটা। ৩৪। গভীর। ৩৬। পাইন গাছের আঠা। ৩৮। ধারণ করে যে। ৪০। নূপুর। ৪১। জামার ফুটো সেলাই করার বিশেষ উপায়। ৪৩। অভ্যর্থনা। ৪৫। অঙ্ক। ৪৬। ভাপ। ৪৮। কানের নীচের নরম অংশ। ৫১। শুল্ক। ৫২। এই সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে মেলা হয়। ৫৪। হিরের একক। ৫৫। উত্তর প্রদেশের একটি প্রাচীন শহর। ৫৬। কীর্তি। ৫৭। ডাকঘর নাটকের সেই কিশোর বালক। ৫৮। পাকা রাস্তা। ৬০। কর্ম। ৬১। তির। ৬২। কুমড়োফুল, বকফুল, মাছের ডিম এ সব দিয়ে তৈরি একটি পদ। ৬৩। হাতি। ৬৪। কথা-বলা একটি পাখি। ৬৫। আকস্মিক বেগে আসে এমন। ৬৬। পাহাড়ের নিচু অংশ। ৬৭। তিন আর পাঁচের মধ্যবর্তী। ৬৮। চিত্ত। ৬৯। সাদা। ৭১। শান। ৭২। বালিশের ভিতর যা থাকে। ৭৬। রাজাকে সম্বোধন। ৭৭। শ্রেষ্ঠ। ৭৮। শুয়ে থাকা অবস্থা। ৭৯। বাংলা সাল। ৮০। শোণিত। ৮১। যা থেকে দড়ি হয়। ৮২। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী...জনসন। ৮৩। ব্যাধ। ৮৪। ঝটিকা। ৮৫। নুপূর। ৮৭। আঠালো একটি ফল। ৮৮। একটি শিকারি পাখি। ৮৯। দৃষ্টি। ৯০। মাঝিমাল্লাদের ভাষায় 'এগিয়ে চলো'। ৯১। রাগে মানুষ যা নিচু গলায় করে। ৯২। শোকে মানুষ যেমন হয়। ৯৩। দ্বিপ্রাহরিক ভোজের পর বাঙালি যা চিবোতে ভালবাসে। ৯৫। উন্নত। ৯৭। মুন্ডু ছাড়া শরীরের বাকি অংশ। ৯৮। পালা। প্রকরণ। ১০০। তিব্বতের একটি সরোবর। ১০২। বড়। ১০৩। রক্ষণ। ভরণপোষণ। ১০৬। ভাষার লিখিত রূপ। ১০৮। সূর্যের যা সাতটি। ১০৯। চোখের প্রসাধনী। ১১১। রাজাদের সাত... বাড়ি হয়। ১১৩। গুজরাতি নাচ একটি। ১১৫। শিঙাড়ার ভিতর যা থাকে। ১১৭। গাছের ভাল ফলনের ওষুধ। ১১৯। কোমল। ১২০। বছর। ১২১। লগ্নের কাব্য রূপ। ১২৩। পায়রা। ১২৪। শীতকালে এই সবজিটি দু'প্রকার হয়। ১২৭। শেষে 'ব' যোগ করলেই একটি আরবি বাদ্যযন্ত্র। ১২৯। কয়েকটি। ১৩১। গুজব। ১৩৪। চূড়ান্ত। ১৩৬। যিনি বিধান দেন। ১৩৮। কথিত, এই পাখি চাঁদের আলো পান করে। ১৩৯। জঙ্গল। ১৪০। আগে পা যোগ করলেই পদার্থবিদ্যার একটি প্রক্রিয়া। ১৪১। পৌরাণিক দুঃখী রাজা।

উপর-নীচ

১। মিষ্টি দ্রবণ। ২। ...মহরম। ৩। প্রকার। ৪। শক্তি। ৬। পঞ্জাবি খাবারের রেস্তরাঁ। ৮। কম। ৯। বেশি কথা বলা। ১০। গাছের ছানা। ১১। শেষ। ১৩। সজ্জা। ১৫। যার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। ১৯। ঘোড়া। ২২। সমাধি। ২৩। মানুষ। ২৪। রাস্তা। ২৬। ভানু পেল...। বিখ্যাত বাংলা ছবি। ২৭। রাক্ষস। ২৮। আপন। ৩০। ব্যাঙের ডাক। ৩২। খুব জাঁকপূর্ণ। ৩৫। ন্যায্য অধিকার। ৩৬। যুদ্ধ। ৩৭। শহর। ৩৮। ধরন। ৩৯। ....বত। সানাই ইত্যাদির ঐকতান। ৪২। পুষ্প। ৪৪। বাড়িতে তৈরি একটি মিষ্টি। ৪৭। আগ্রহ। ৪৯। অন্ধকার। ৫০। একটি রাগ। ৫১। ঠান্ডা লাগলে যেমন করে। ৫২। নরম একটি কাপড়। ৫৩। জিভ। ৫৬। নেতিবাচক উপসর্গ। ৫৯। সমাদর। ৬০। সাদা রঙের ঝুঁটিওয়ালা পাখি। ৬১। একশো। ৬৮। স্ফূর্তি। ৬৯। পৃথিবী। ৭০। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গঙ্গার তীরবর্তী একটি শহর। ৭৩। ধারের ইংরেজি। ৭৪। বন্যা। ৭৫। যে সময় আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল এ সব হয়। ৭৭। কাপড়। ৭৮। শর গাছে ভরা ভূমি। ৭৯। অভ্যস্ত। ৮১। মৃতদেহ। ৮৩। লজ্জা। ৮৫। গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল। ৮৬। হোটেল। ৮৭। ফাটক। ৮৮। যে সেনার সাহায্যে শ্রীরাম সেতু বেঁধেছিলেন, কথিত। ৯৪। সমাধান। ৯৬। বিলাপ। ৯৭। ধর্মের কাব্য রূপ। ৯৯। টুকরো। ১০১। দুধের উপরে ভাসে। ১০২। গাছের কাণ্ড। ১০৩। বাংলার একটি বিখ্যাত রাজবংশ। ১০৪। নতুন। ১০৫। পুরুষ। ১০৭। একপ্রকার সপুষ্পক গাছ। ১১০। 'দেখে রাজার...মোদের মন ভরে গেছে খুশিতে'। ১১২। শিব। ১১৩। হিসেবে গোলযোগ। ১১৪। এই পাতার রস সর্দিকাশিতে খুব উপকারী। ১১৬। খুবই ঝালমশলাদার। ১১৮। আরবোপন্যাসের পাখি। ১১৯। নিচু হওয়া। ১২০। হুঁশিয়ার। ১২২। নাটকের অভিনেতা। ১২৫। একটি ফল। ১২৬। যম। ১২৭। সূর্য। ১৩০। বাণ। ১৩২। নৃত্য। ১৩৩। 'আমি...সকালবেলার পাখি'-কাজি নজরুল ইসলাম। ১৩৫। নিযুক্ত। ১৩৭। গানের এটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

১	২	■	■	৩	৪	■	৫	৬	■	৭		৮	■	৯	■	১০	■	■	১১
১২		১৩	■	১৪		১৫	■	১৬		■	■	১৭			■	১৮	১৯	■	
■	২০		■		■	২১	২২	■	২৩		২৪	■	২৫		২৬	■		■	
২৭		■	২৮	■	■	■	২৯	৩০		■	৩১	৩২	■	৩৩		■	৩৪	৩৫	
	■	৩৬		৩৭	■	৩৮			■	৩৯	■	৪০		■	৪১	৪২	■		■
৪৩	৪৪		■	৪৫			■		■	৪৬			■	৪৭	■	৪৮	৪৯	■	৫০
■		■	৫১		■	■	৫২		৫৩	■	■		■	৫৪		■	৫৫		
৫৬				■	৫৭			■	৫৮		৫৯	■	৬০		■	৬১		■	
৬২		■	৬৩		■	■	৬৪			■	৬৫			■	৬৬		■	৬৭	
■	■	৬৮		■	৬৯	৭০		■	■	৭১		■	৭২	৭৩	■	■	৭৪	■	
৭৫	■		■	■	৭৬		■	৭৭		■	■	৭৮			■	৭৯		■	■
৮০		■	৮১		■	৮২			■	৮৩			■	■	৮৪		■	৮৫	৮৬
	■	৮৭		■	৮৮		■	৮৯			■	৯০			■	৯১			
৯২			■	৯৩		■	৯৪	■	■	৯৫	৯৬		■	■	৯৭		■		■
	■	৯৮	৯৯	■		■	১০০		১০১	■		■	১০২			■	১০৩		১০৪
■	১০৫	■	১০৬	১০৭	■	১০৮		■		■	১০৯	১১০		■	১১১	১১২		■	
১১৩		১১৪	■	১১৫	১১৬	■	১১৭	১১৮	■	১১৯			■	■	■		■	১২০	
	■		■	১২১		১২২	■	১২৩			■	১২৪	১২৫	■	১২৬	■	১২৭		■
১২৮	■	১২৯	১৩০	■	১৩১		১৩২	■	■	■	১৩৩	■	১৩৪	১৩৫		■	১৩৬		১৩৭
	■	■		■		■	১৩৮			■	১৩৯		■	১৪০		■	■	১৪১	

সমাধান ২০৬ পাতায়

সুদেষ্ণা ঘোষ

ছবি: কুনাল বর্মণ

KUNAL

র	দ			র	ব		বা	ধা		হ	জ	মি		ব		চা			স
স	হ	সা		ক	ল	ম		বা	র			ত	ব	ক		রা	তু		মা
	র	জ		ম		শা	ক		জ	ন	ক		ক	ব	ল		র		প
দা	ম		নি				ব	ম	ন		লা	জ		ক	টা		গ	হ	ন
ন		র	জ	ন		ধা	র	ক		ন		ম	ল		রি	ফু		ক	
ব	র	ণ		গ	ণি	ত		ম		হ	ল	কা		গ		ল	তি		ন
	স		ক	র			ম	ক	র			লো		র	তি		মি	রা	ট
অ	ব	দা	ন		অ	ম	ল		স	ড়	ক		কা	জ		শ	র		ভৈ
ব	ড়া		ক	রী			ম	য়	না		দ	ম	কা		খা	ত		চা	র
		ম	ন		ধ	ব	ল			ধা	র		তু	লো			বা		ব
গ		জা			রা	জ		ব	র			শ	য়া	ন		স	ন		
র	ক্ত		শ	ন		ব	রি	স		শ	ব	র			ঝ	ড়		ম	ল
ম		গা	ব		বা	জ		ন	জ	র		ব	দ	র		গ	জ	গ	জ
কা	ত	র		পা	ন		মী			ম	হা	ন			ধ	ড়		ডা	
ল		দ	ফা		র		মা	ন	স		হা		ডা	গ	র		পা	ল	ন
	ন		লি	পি		র	ং		র		কা	জ	ল		ম	হ	ল		ব
গ	র	বা		পু	র		সা	র		ন	র	ম				র		সা	ল
র		স		ল	গ	ন		ক	পো	ত		ক	পি		শ		র	বা	
মি		ক	তি		র	ট	না				হ		চ	র	ম		বি	ধা	তা
ল			র		গে		চ	কো	র		ব	ন		ত	ন			ন	ল

সম্পূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কমিক্‌স

কাহিনি: সমরেশ বসু

চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়

আআ
গোগোল ঘুম ভেঙে উঠে বসে।
কী হয়েছে গোগোল? আবার...
না-না-না!
কিচ্ছু হয়নি সোনা, কিচ্ছু হয়নি। উফ ভগবান, এই নিয়ে তিন বার হল!
ব্যাপারটা সিরিয়াস। কালকেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

ডাক্তারের চেম্বারে।
ঘটনাটা ঘটেছিল শ্রীনগরে, গত মাসে। আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রথমে কোনও সমস্যা হয়নি।
দু'দিন পরে গুলমার্গ যাওয়ার সময় আমরা যে বাসে যাচ্ছিলাম, সেটাতেই...
...একটা স্মাগলিং র‍্যাকেটের কয়েক জন লোকও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিল। মাঝ রাস্তায় পুলিশ হানা দেয়। তাতে ভয় পেয়ে ওরা গোগোলের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে... মানে, বুঝতেই পারছেন। ব্যাপারটা অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিটে যায়। পুলিশের...
...গুলিতে লোকটা মারা যায়। সেই থেকেই ঘুমের মধ্যে মাঝে-মাঝে...
তুমি তো সাংঘাতিক সাহসী ছেলে। এ রকম তো দেখাই যায় না। তা তোমার তো ভয় পাওয়ার কথা নয়। তাই না?
আমি ভয় পাইনি। খালি ঘুমের মধ্যে মাঝে-মাঝে ওই লোকগুলো... আমাকে মারতে...

আমরা খুব ভয় পেয়ে গেছি ডাক্তারবাবু। এটা ঠিক হয়ে যাবে তো?
নিশ্চয়ই। আসলে এটা একটা সাময়িক শক।

জাস্ট একটা ওষুধই দিলাম। এতেই কাজ হবে।

পারলে ওকে নিয়ে কয়েক দিনের জন্য কোথাও একটু ঘুরে আসুন। জায়গা চেঞ্জও এ সব ক্ষেত্রে খুব ভাল কাজ দেয়। সপ্তাহ খানেক বাদে আমাকে ফোনে জানাবেন।

তিন-চার দিনের জন্য পুরী গেলে কেমন হয়?

রণজয়ের বাড়িটা খালি পড়ে থাকে।
ওকেই বলি, কী বলো?
না-না, কারও বাড়ি নয়। থাকলে হোটেলে থাকাই ভাল। তুমি হোটেল দ্যাখো।
তুমি যা ভাবছ তা নয় নীতি। ওখানে কেউ থাকে না। শুনেছি খুব সাজানোগোছানো বাড়িটা।
তা হলেও, অন্যের বাড়িতে গিয়ে থাকা!
আরে বাবা, রণজয় অনেক বার করে বলেছে ওখানে গিয়ে থেকে আসতে। আমরা গেলে ও খুশিই হবে। তা ছাড়া বাড়িটার লোকেশনটা দুর্দান্ত। একেবারে সি বিচের উপরে। আমি ছবি দেখেছি। কেয়ারটেকারও আছে। ঘর থেকে সমুদ্র দেখা যাবে, ভাবতে পারছ?
দ্যাখো তা হলে কথা বলে।
আমরা ক'দিন থাকব?

পাঁচ দিনের মতো ছুটি নিয়ে গোগোলরা রওনা হল।

পুরীতে পৌঁছে।

সমুদ্রতটে বাড়িটায় পৌঁছে ওদের সকলের মন খুশিতে ভরে গেল।

সত্যিই অপূর্ব!

এই আপনাদের ঘর বাবু। বৌদিমণি, সব ভাল করে দেখে নিন। ঘরদোর সব সকালেই পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। কোনও অসুবিধে নেই।

আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি আপনাদের চা-জলখাবার নিয়ে আসছি। দাদাভাই, দুধ খাবে তো?
হ্যাঁ, খাব।

অপূর্ব!
ও দিকটা কী সুন্দর!
রণজয় ঠিকই বলেছিল।

কী সুন্দর দেখাচ্ছে চার দিক! অসাধারণ!

বাবু, আপনাদের জলখাবার।

কিছু ক্ষণ বাদে ওরা সমুদ্রে স্নান করতে গেল।

সেদিন দুপুরবেলা।
ধুর, ঘুম আসছে না একটুও!

গো-গো-ল!

কোথায় যাচ্ছ?

ঘুম আসছে না বাবা। একটু নীচে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখব?

যাও, তবে বাড়ির বাইরে যাবে না। আর একটু পরেই চলে আসবে।

তুমি আমার কথাটা এক বার ভাল করে শুনবে তো। আমি তো তোমার ভালর জন্যই বলছি।
একটা কথা বলবে না।

তুমি আমার কত ভাল চাও সেটা আমার জানা আছে। অনেক দিন ধরে অনেক বোকা বানিয়েছ আমাদের। আর নয়।

আরে রিয়া! রিয়া, তুমি চলে যাচ্ছে কেন? শোনো।

কালকেই আমি কলকাতায় ফিরব। মি. সেনের
সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। কাল বিকেলে
ওঁর সঙ্গে মিটিং আমার। আর তার পর...
তার পর কী?
তার পর
তুমি ফিনিশ
মি. বিক্রম!
তুমি কিন্তু শুধু-শুধু আমার উপর
রাগ করছ।
রিয়া,
শোনো।

ওরা বোধ হয় উপরে গেছে।
হঠাৎ!
পায়ের শব্দ। নীচে নামছে বোধ হয়।

গোগোল এক দৌড়ে বাড়ির বাইরে এল।

লোকটা নিশ্চয়ই
দেখতে পায়নি।

এই রে, মা ঘুম
থেকে উঠে
পড়েছে!

এক দিকে ভাল, এই ক'দিন আর ও সেই স্বপ্নটা
দেখেনি। যা চিন্তা হচ্ছিল!
ওই যে
তোমার ছেলে
এসেছেন।

গেটের বাইরে
ঘুরছিলাম, দূরে যাইনি।

দ্যাখো গোগোল,
নতুন জায়গায়
এ ভাবে একা-
একা বাইরে ঘুরে
বেরিয়ো না।
আমাদের কথা
একটু শোনো।

পর দিন সকালে গোগোল আগের দিনের ঘটনাটা বাবাকে বলল।

ভেরি ব্যাড গোগোল!

না-বলে কারও বাড়িতে ঢোকা, লুকিয়ে অন্যের কথা শোনা ভীষণ অন্যায়।
সরি বাবা, কিন্তু আমি...

দ্যাখো, প্রত্যেক মানুষের নিজের সমস্যা রয়েছে। ওঁরা নিজেদের সমস্যা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করছিলেন। তোমার সেগুলো শোনা কখনওই উচিত হয়নি।

ও রকম আর কখনও কোরো না যেন।

বাবা ঠিক কথাই বলছেন কিন্তু ওই ব্যাপারটা যেন...

পর দিন মা-বাবা মন্দিরে যাওয়ার পর গোগোল হোটেলের কাছাকাছি ঘুরতে বেরোল।
কোথায় ঘুরছ দাদাভাই?
ওই বাড়িটায় কে থাকে গৌরাঙ্গদা?
কেউ থাকে না তো!
কিন্তু আমি তো কাল দু'জনকে দেখলাম!
দু'জন মানে?
এক জন লোক, মানে ভদ্রলোক আর এক জন ভদ্রমহিলা। ওই বাড়িটাতেই দেখেছি।

গোগোল পুরো ঘটনাটা গৌরাঙ্গকে বলে।

তুমি ভুল দেখেছ গগ্‌লবাবু। ও বাড়ি বহু দিন খালি, আগে এক জন বাঙালিবাবু আসত, বয়স্ক লোক, কিন্তু অনেক দিন তাকেও দেখিনি।

অবাক ব্যাপার! গৌরাঙ্গদা আমার কোনও কথাই বিশ্বাস করল না! নাহ, ব্যাপারটা আমাকে দেখতেই হবে।

সে দিন বিকেলে ওরা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরোল।

বাবা, আইসক্রিম খাব।

চলো, ওখানে গিয়ে বসি।

লোকের ভিড়
প্রচুর।
সত্যি।
এই নাও, ধরো এটা।
আশ্চর্য ব্যাপার!
এর মধ্যেই
দু'জনের ভাব
হয়ে গেল!
সে দিন রাতে।
গোগোলের সমস্যাটা
বোধ হয় ঠিক হয়ে গেছে,
কী বলো?
হ্যাঁ।

তা হলে তুমি ডাক্তারবাবুকে আজই এক বার ফোন করে জানিয়ে দাও। কালকেই তো সাত দিন হয়ে যাচ্ছে।
ঠিক বলেছ।
ফিরে গিয়ে যদি এক বার দেখতে চান, তো দেখিয়ে নেব।
হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে।
এ বার তোকে কে বাঁচাবে?
না, মেরো না!
আ আ আ!
হা হা হা!
কাল এক বার ওই বাড়িটায় যেতে হবে।
পর দিন সকালে গোগোল আবার সেই বাড়িটার উদ্দেশে রওনা দেয়।

কী দেখছ খোকা?
কিছু না, এমনি।
এমনি-এমনি বাড়ির ভিতরে উঁকি মারছিলে?
স-সরি।
বেড়াতে এসেছ?
হ্যাঁ।
কোন হোটেলে উঠেছ?
হোটেলে না। ওই... ওই দিকের একটা বাড়িতে... সমুদ্রের ধারে।
বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছ নিশ্চয়ই। তাই তো?
হ্যাঁ।
কলকাতা থেকে এসেছ?
হ্যাঁ।

শোনো খোকা, তোমাকে একটা খবর জানিয়ে রাখি। এই বাড়ির ভিতরে না, একটা সাংঘাতিক ভূত আছে। ডেঞ্জারাস। যখন-তখন ও রকম উঁকিঝুঁকি আর মেরো না। বুঝতে পারছ তো?
ভূত?

বিশাল কালো ভূত! এই অ্যাত্তো বড়!
ভয়ঙ্কর চেহারা!

তা হলে আপনি থাকেন কী করে?

আমার ও সব ভূতের ভয় নেই।

তোমাকে সাবধান করছি, খবরদার আর এ দিকে নয়। যাও এখন।

পর দিন বিকেলে।

চলো উঠি, সকালে আবার ভুবনেশ্বর যাওয়া।

পর দিন ভুবনেশ্বরের পথে।

দেখবি সূর্য মন্দির কী আশ্চর্য সুন্দর! তোর খুব ভাল লাগবে।

বিকেলে ফেরার পথে।
কেমন লাগল গোগোল,
বললি না তো?

তুই এত অন্যমনস্ক হয়ে
আছিস কেন বল তো?

কই না তো! আমার
দারুণ লেগেছে।
আর দু'দিন থেকে তার পরেই
বাড়ি। ছুটি প্রায় শেষ।

ভূতটুত সব বাজে
কথা। কাল এক
বার বাড়িটায়
গিয়ে দেখব।

পর দিন দুপুরে।

কেউ
নেই।

দরজা খোলা!

উপরে যাই।
ওই ঘরটা খোলা!
কোনও সাড়াশব্দ নেই।

সেই ভদ্রমহিলা।

ঘুমোচ্ছেন। লোকটা বোধ হয় নেই।

এরা কি স্বামী-স্ত্রী?

হঠাৎ!
খুট

ক্যাঁচ

সর্বনাশ!

এ ঘরেই আসছে!
অ্যাই!

অ্যাঁই
ঝুপ
উফ! আর পারছি না!
উফ

ধাম!

দাদাজীঃ

দাদাভাই, কী হয়েছে তোমার?
গৌরাঙ্গদা!
আমি আসছি!
আ...
কী হয়েছে দাদাভাই? তুমি পড়ে গেছ নাকি বালিতে?
কী অবস্থা করেছ? সারা গায়ে ধুলোবালি মেখে রয়েছে। কোথায় দৌড়োদৌড়ি করছিলে বলো তো!
চলো, হাঁটতে পারছ তো?
হ্যাঁ।

ব্যাপারটা কী বলো দেখি? পড়ে গেলে কী করে? আর ওই লোকটা কে?
এই লোকটাই তো ওই বাড়িটায় থাকে। তাড়া করেছিল আমায়।

ওফ! আবার তুমি উল্টোপাল্টা বলছ দাদাভাই। লোকটা তো তোমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, আর ও বাড়িতে তো কেউ থাকে না। বললাম তো!

আচ্ছা, কাল বরং আমি এসে দেখব এক বার।
তুমি কিন্তু আর এ দিকে এসো না দাদাভাই। বাবা-মা জানতে পারলে কী ভাববে বলো তো!

বিকেলে।
দাদাভাই, তোমার কথা শুনে আমি ওই বাড়িতে ঘুরে এলাম।

কেউ নেই। দরজায় তালা।

যদি কেউ এসেও থাকে, তারা চলে গেছে নিশ্চয়ই। ওই নিয়ে তুমি আর ভেবো না।

ওরা কি তা হলে সত্যিই চলে গেছে?

সন্ধের আগে বেড়িয়ে চলে আসবে গোগোল। সন্ধেবেলা আমার কাছে অঙ্ক করবে।
আচ্ছা মা।

বিকেলে।
কী রে, তুই আবার ওই বাড়িটায় যাসনি তো?
গেছি।

তোকে না বারণ করলাম সে দিন...

কাল রাতে ফেরার ট্রেন। কালকের দিনটা ভাল হয়ে থাকো। কোথাও বেরোবে না।
আচ্ছা।

সকালে আমি আর তোমার মা একটু বেরোব।

পর দিন সকালে আবার...

খুট

ওটা কী চকচক করছে?
মনে হচ্ছে একটা কাপড়!

সোনালি রঙের কাপড়ের
পাড়। আটকে আছে।
মাটি সরাতে হবে।
উফ। আর
কত মাটি
সরাব!
কাপড়টা মাটির তলায়
কোথাও আটকে আছে।
কী গোগোল, ক্লান্ত
হয়ে পড়লে নাকি?

হুঁ! লোকটার দাড়ি আছে আর সব সময় কালো চশমা পরে। তাই তো?

হ্যাঁ-হ্যাঁ। শুধু দেওয়ালের ছবিটাতে এমনি চশমা পরে ছিল।

বুঝেছি।

কী হয়েছে?

ব্যাপার খুব সিরিয়াস গোগোল। চলো, মাটিটা খোঁড়া যাক।

এর নীচে কী আছে অশোকদা?

আমি যা ভাবছি, তাই যদি হয় তা হলে ভয়ঙ্কর কিছু...

খানিক বাদেই।
মাই গড!

যা ভেবেছি!

এই ভদ্রমহিলাকেই তুমি দেখেছিলে তো?
হ্যাঁ, কি-কিন্তু অশোকদা, ওই লোকটাই কি এই মহিলাকে...

সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তুমি একটা সিরিঞ্জ মাড়িয়েছিলে না, সেটা আনো তো!

গোগোল সেই সিরিঞ্জটা কুড়িয়ে এনে অশোক ঠাকুরকে দেয়।
এই যে।

ডেফিনিটলি ঘুমের ওষুধ পাওয়া যাবে।
প্রথমে ঘুম পাড়িয়ে পরে বোধ হয় গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে।

তার মানে আমি যে ওঁকে ঘুমোতে দেখেছিলাম, সেটা...
ইয়েস!

ভদ্রমহিলাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। না হলে ওই রকম অসময়ে সাধারণত কেউ ঘুমোবে কেন? এখন প্রশ্ন হচ্ছে লোকটা পালিয়ে গেছে নাকি এখনও পুরীতেই আছে। এক বার বাড়ির ভিতরটা ভাল করে দেখা দরকার।

চলো, আমরা থানা থেকে পুলিশ নিয়ে আসি। হাতে সময় কম।
আর এই ডেডবডিটা...

এখন থাক। এখুনি ফিরতে হবে আমাদের।
না হলে যদি লোকটা...

...এসে পড়ে... গোগোল!

ইয়া-য়া-য়া
গুম

এক পা-ও নড়ার চেষ্টা করবে না।

তোমাকে আমি খুব ভাল করে চিনি অশোক ঠাকুর। পুলিশের টিকটিকি... কলকাতা থেকে পিছু নিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই। আর ফিরতে পারবে না।
তোমার খেলা শেষ বিক্রম, নাকি রুদ্র, না মোহনলাল? কোনটা আসল নাম তোমার?

সব খবরই রাখো দেখছি। কিন্তু লাভ নেই।
পিস্তল ফেলে দাও বিক্রম। তুমি কিছুতেই পালাতে পারবে না।
তোমার সমস্ত চোরাই জিনিস এই বাড়ি সার্চ করলেই পাওয়া যাবে। এখনও বলছি সারেন্ডার করো, না হলে পুলিশ এলে...
একদম চোপ। কোনও পুলিশ আসবে না। এখুনি তোরাও খতম হয়ে...
অ্যাই ছোঁড়া!
সামনে আয়। এক্ষুনি।
আপনার পিছনে...

!!!
ইয়া-য়া-য়া
আআ
গাম

থানায় খবর দেওয়ার পর পুলিশের লোক বিক্রমকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে গোগোলের বাবা-মাকেও খবর দেওয়া হয়েছে। ওঁরাও থানায় আসছেন।

কিছু ক্ষণের মধ্যে গোগোলের বাবা-মা থানায় এসে হাজির হলেন।
POLICE STAT
কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব! চলুন, কোথাও বসে একটু কফি খাওয়া যাক।

বিক্রম লোকটা ভীষণ ডেঞ্জারাস। বহু শহরে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ক্রাইম করেছে প্রায় বিগত দশ বছর ধরে। সোনা পাচার কাণ্ডে ধরা পড়ে এক বার জেলও খেটেছে। এই মহিলাকে বিয়ে করে সম্ভবত বছর দুই আগে। মহিলার বাবার কাঠের ব্যবসা নর্থ বেঙ্গলে। সেই ব্যবসায় যুক্ত হয়ে ক্রমশ কাঠের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নেশার দ্রব্য চালান করত কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গাতেও। এর মধ্যেই মহিলার বাবা, মানে বিক্রমের শ্বশুর মারা যায় রহস্যজনক ভাবে। বিক্রম সেখানেও প্রাইম সাসপেক্ট। আমার কাছে কেসটা আসে মাস খানেক আগে, সেই থেকে ওকে ফলো করে যাচ্ছি। দু'বার হাত ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এবার ফাইনালি গোগোলের জন্যই ওকে ধরা গেল। থ্যাঙ্ক ইউ গোগোল।

বাইরে বেরিয়ে।
চলি গোগোল। আবার দেখা হবে।

তোর জন্য কোন দিন আমি মারা যাব, তখন বুঝবি!
আমি কী করব... আমি তো আর...
থাক! সন্ধেবেলা ট্রেন। শেষ বারের মতো সমুদ্রটা দেখে আসি।
আমি কি এ সব ইচ্ছে করে করি নাকি? নিজে থেকেই তো সব হয়ে যায়।

স মা প্ত

অকালবোধন

অঙ্কন মিত্র

ছবি: সৌমেন দাস

আট বছর আগে

উল্টো দিকের কাঠের টেবিলটার উপর, দমাস করে একটা ঘুষি পড়ল, "না-না, তুমি এ ভাবে একা ওদের ফেস করতে পারবে না। আমার কথাটা একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো, অভি। ফালতু মাথা-গরম কোরো না।"

এই কথাটা উচ্চারিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই, প্রথম বক্তার দিকে, উত্তেজিতভাবে ঝুঁকে

পড়ে, দ্বিতীয় মধ্যবয়সি ব্যক্তিটি বলে উঠলেন, "তুমি এটা কী কথা বলছ, অনিকেত? ওরা সকলে মিলে, বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, আমাকে চোর অপবাদ দিচ্ছে! আমি শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের টাকা চুরি করেছি? আমি? এত বড় মিথ্যেটাকে তুমি আমায় মুখ বুজে মেনে নিতে বলছ?"

কথাটা মুখ থেকে উগড়ে দিয়েই, রাগে ও অপমানে ফুঁসতে থাকা দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, ঘরের ভেজানো দরজাটাকে ঠেলে, বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

টেবিলের অন্য প্রান্তে বসা, বাহারি ফ্রেমের চশমা চোখে প্রথম ব্যক্তিটি তখন, বন্ধুকে থামাতে গিয়েও, নিরুচ্চারে তোলা হাতটাকে, আস্তে করে নামিয়ে নিলেন।

ব্যারাকপুরের 'ঘোষ অ্যান্ড বোস কটন মিল'-এর বন্ধ লোহার গেটের বাইরে, তখন লাল ও সাদা কাপড় দিয়ে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে, শ-দেড়েক শ্রমিকের লাগাতার ধর্না ও ধিক্কার-আন্দোলন চলছে। সময়টা পড়ন্ত সন্ধে।

ঘ্যাসঘ্যাসে মাইকে, গলা ফাটিয়ে মালিকবিরোধী স্লোগান ও আগুন-ঝরা বক্তৃতা দিচ্ছেন, একের-পর-এক ছোট-বড় শ্রমিক-নেতারা।

তাঁদের বক্তব্যের মূল নির্যাস হল, গত পাঁচ মাস ধরে, এই কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন এবং অন্য অর্থকরী সুযোগ-সুবিধে থেকে মালিকপক্ষ অন্যায় ভাবে তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেছেন। এবং এর পিছনে, এই কটন মিলের ষাট শতাংশের অংশীদার, অভিজ্ঞান ঘোষেরই মূল চক্রান্ত রয়েছে বলেই, তারা মনে করছে।

শ্রমিক-নেতাদের ধারণা, মিল-মালিক অভিজ্ঞান ঘোষ, এইভাবে ঘুরপথে কোম্পানির লোকসান দেখিয়ে, কারখানাটাকে বন্ধ করে দিয়ে, সেই পয়সায়, তলায়-তলায় অন্য ব্যবসায় লগ্নি শুরু করতে চান। তাই তিনি শ্রমিকদের বকেয়া টাকাগুলো মেরে দিতে চাইছেন।

তাই মালিকপক্ষের এই ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিতে আজ থেকে কারখানার মূল গেটে সমস্ত শ্রমিকরা মিলে, লাগাতার ধর্না ও অনশন শুরু করেছে।

এলাকার পরিস্থিতি এখন অগ্নিগর্ভ। তাই পুলিশও এসে থানা গেড়েছে, কারখানার গেট থেকে কিছুটা দূরে; তবে ওরা এখনও সামনে আসেনি।

মিলের দুই অংশীদার-মালিক ও ছেলেবেলার বন্ধু, অনিকেত বসু ও অভিজ্ঞান ঘোষ, এখন কারখানার অফিসঘরের মধ্যেই ঘেরাও হয়ে রয়েছেন।

হঠাৎ অভিজ্ঞানবাবু উত্তেজিত হয়ে অফিসঘরের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি সটান হাঁটা লাগালেন, শ্রমিকদের ধর্নামঞ্চের দিকে। একা।

কারখানার বিশ্বস্ত গেটকিপার, বাঁকেলাল, তাঁকে এ ভাবে বিক্ষোভকারীদের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বাঁধা দিল, "ও দিকে যাবেন না, সাব; ওরা বহুত খেপে আছে এখন। উল্টা-সিধা কিছু হয়ে যেতে পারে!"

কিন্তু বাঁকেলালকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেটের বাইরে বেরিয়ে এলেন অভিজ্ঞান।

ধর্নামঞ্চের দিকে দু'হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "দয়া করে থামুন আপনারা। আমাকে কিছু বলতে দিন, প্লিজ়। আমি শ্রমিকদের পাওনা টাকার এক বিন্দুও চুরি করিনি।"

মঞ্চের উপর মাইক হাতে জনৈক শ্রমিক-নেতা এ কথা শুনে, এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেলেন। মঞ্চ ঘিরে থাকা শ্রমিকদের দলও তখন নির্বাক ও জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকাল অভিজ্ঞানবাবুর দিকে।

হঠাৎ এই জন-জটলার পিছন থেকে উড়ে এল একটা রাগি বক্রোক্তি, "তুই-ই ব্যাটা চোর! আমাদের ভাত মেরে এখন আবার সাধু সাজতে এসেছিস!"

এই কথাটা উড়ে আসতে-না-আসতেই অভিজ্ঞানের পায়ের সামনে অন্ধকারের মধ্যে থেকে এসে পড়ল একটা তাজা দেশি বোমা!

মুহূর্তে আর্ত-নিনাদের সঙ্গে চার দিক ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেল। ধর্নামঞ্চের জটলা ভেঙে একশো-দেড়শো লোক, যে যেদিকে পারল, প্রাণভয়ে ছুট লাগাল।

অস্থায়ী মঞ্চটা কাত হয়ে গিয়ে, তার কাপড়ের এক পাশে আগুন ধরে গেল। তখন পুলিশ দৌড়ে এল, অবস্থা সামাল দিতে।

আধ ঘণ্টা পরে পরিস্থিতি একটু ঠান্ডা হলে দেখা গেল 'ঘোষ অ্যান্ড বোস কটন মিল'-এর জয়েন্ট-মালিক, মি. অভিজ্ঞান ঘোষের দগ্ধ ও রক্তাক্ত দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে; কারখানা-গেটের সামনে।

আর চাপ-চাপ টাটকা রক্তের ছাপে কারখানার বড় লোহার গেটটার নীল রং হয়ে উঠেছে বিষাক্ত লাল...

॥ ১ ॥

পয়ারের কথা

কব্জির ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে পয়ার মনে-মনে একটা ছোট্ট ক্যালকুলেশন করে নিল।

আগামিকাল যদি সকাল সাতটাতেও ওর ঘুম ভাঙে, তা হলেও প্রোগ্রামটা ঠিকঠাকই সময়ের মধ্যে ম্যানেজ করে নিতে পারবে ও।

বাড়ি থেকে ও যদি সকাল সাড়ে-আটটাতেও ফ্রেশট্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে, তা হলে ঝিলের বাড়ি গিয়ে ওকে পিক করে নিয়ে, স্যারের বাড়ি পৌঁছতে ওর মোটামুটি ন'টা-পনেরোর বেশি লাগা উচিত নয়।

এর মধ্যে অবশ্য যদি ঝিলের মা, অর্থাৎ কাকিমা, ওকে লুচি-তরকারি খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন, তা হলে আরও পনেরো মিনিট বেশি লাগবে স্যারের ওখানে পৌঁছতে।

তাও তো ও মেরেকেটে সকাল সাড়ে-ন'টার মধ্যেই স্যারের বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। আর তার পরই তো...

চলমান ভাবনা-তরঙ্গে ছেদ দিয়ে মোবাইলটা হঠাৎ কুঁইকুঁই করে উঠল মাথার-বালিশের নীচ থেকে।

তাড়াতাড়ি ভয়েস-মেসেজটায় হেডফোন গুঁজল পয়ার, "মনে রাখিস, কাজটা আগামিকাল তোকেই করতে হবে! এক চুলও যেন ভুল না হয়। ইউ হ্যাভ টু ডু দিস, ডুড!"

পরিচিত হুমকিটা শুনেই একটা টেনশনের দীর্ঘশ্বাস মোচন করল পয়ার। তার পর তাড়াতাড়ি ডিলিট করে দিল চলভাষের বুকে ফুটে ওঠা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরটাকে।

আলোটালো নিভিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে জড়সড় হয়ে শুয়ে পড়ল পয়ার। কিন্তু চোখের পাতা দুটো জোর করে বোজালেও, ওর এক ফোঁটাও ঘুম এল না চোখে।

পাশের ঘরের বন্ধ দরজার নীচ দিয়ে টিভির রঙিন ও ইতস্তত আলোর রেখা ভেসে আসছে; তার মানে বাবা-মা এখনও জেগে-জেগে পূজা-পরিক্রমা দেখছে টিভিতে।

বাবার এই পুজোর সময়টাতেই শুধু টানা দিন দশেক মতো ছুটি থাকে অফিস; সেই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত। সারা বছরভর হাড়-ভাঙা খাটুনির পর, বাবা তাই এই ক'টা দিন আর বাড়ি থেকে কোথাও বেরোতে চায় না। বলে, ''এই ক'দিন একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোব।''

পয়ারদের এই তো দু'কামরার ছোট্ট আস্তানা। ঘর থেকে বাইরে বেরোলেই সিঁড়ি; আর সরু সিঁড়িটা বেয়ে নীচে নামলেই ঘুপচি রান্নাঘর আর ছ্যাতলা পড়া বাথরুমটা প্রায় পাশাপাশি।

রান্নাঘর আর বাথরুমটা আবার জেঠুদের সঙ্গে শেয়ার করতে হয় ওদের।

এই দোমড়ানো-মোচড়ানো এক-চিলতে বাড়িটায় জেঠুরা নীচে থাকেন আর ওরা উপরে।

পয়ারের এই ঘরটাকে 'ঘর' না-বলে পায়রার খোপ বলাই উপযুক্ত। এ ঘরে একটা খাট আর ওর পড়ার টেবিলটা ছাড়া, মেঝের বাকিটুকু মায়ের ঠাকুরের সিংহাসনের দখলে চলে গিয়েছে। এক মাত্র সামনের জানলাটা দিয়ে পাড়ার জাগ্রত কালীমন্দিরের চুড়োটা দেখা যায়। সঙ্গে দূরের কয়েকটা নারকেল আর সুপারি গাছের সারি।

মাঝে-মাঝে আকাশের চাঁদটাও ভুল করে ওই জানলাটা দিয়ে মুখ বাড়ায়; তখন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে পয়ার চুপ করে তাকিয়ে থাকে আকাশের ওই রুপো-রঙা ফুটবলটার দিকে...

পয়াররা যাকে বলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার। ওদের পরিবারে চার বেলা অভাব আর অভাব— এই স্লোগানটা, একটা নিরবিচ্ছিন্ন, অন্তঃসলিলা নদীর মতো যেন সারা বছর ধরে বয়ে যায়।

মাথার কাছের টেবিলে থরে-থরে সাজানো এইচ এস সায়েন্সের মোটা-মোটা বইগুলোর দিকে তাকিয়ে এ কথাটা আরও হাড়ে-হাড়ে মালুম পায় পয়ার।

এ দিকে বাবার হার্টে আর মায়ের গল-ব্লাডারে এক বার করে অস্ত্রোপচার হয়ে গিয়েছে। সে জন্য অফিস থেকে করা ভারী-ভারী দুটো লোন এখনও পুরোপুরি শোধ করে উঠতে পারেনি বাবা।

মা যখন নীচের রান্নাঘরে খুন্তি নাড়তে-নাড়তে জেঠিমার কাছে এই সব নিয়ে চাপা-গলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে, তখন পয়ার এই কথাগুলোকে না-শুনতে চেয়ে তার পরও কিছুতেই ক্যালকুলাসের অঙ্কে মন বসাতে পারে না।

ও শুনতে পায় মা জেঠিমাকে বলছেন, "ওর বাবা তো লোন চোকানোর জন্য এখন সপ্তাহে পাঁচ দিন করে ওভার-ডিউটি করছে। এমন করলে লোকটার শরীরটা টিকবে কী করে বলুন তো?"

পয়ারের বাবা রানিগঞ্জের একটি কোলিয়ারিতে অফিস-ম্যানেজারের চাকরি করেন। সারা বছরই ওঁকে ওই খনি-অঞ্চলে অফিস-কোয়ার্টারে থাকতে হয়। বাড়ি ফেরেন ন'মাসে-ছ'মাসে, যখন টানা কয়েক দিনের ছুটি পান।

কিন্তু এত কিছুর পরেও ওঁর মাইনে খুবই কম। তাই পয়ারের মাকেও ঘরে বসে শাড়ির ফলস বসানো, পিকো করার কাজ করতে হয় সংসার চালাতে।

পয়ার বুঝতে পারে ওকে এইচ এস-এ এই সায়েন্স পড়াতে গিয়ে এতগুলো টিউশনের মাইনে গুনতে কী মারাত্মক পরিশ্রমই যে করতে হচ্ছে মা-বাবাকে! ব্যাপারটা ভাবলেই ওর বুক মুচড়ে চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

ও তখন মনে-মনে নিজের আগামী লক্ষ্যটাকে শক্ত করে জাপটে ধরতে চায়। এইচ এস-এ অন্তত দুটো বিষয়ে লেটার পেতেই হবে ওকে! সঙ্গে জয়েন্ট দিয়ে হয় মেডিকেল, না হলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সরকারি কলেজে মাথা গলানোর মতো একটা রেজ়াল্ট যে করেই হোক খাড়া করতেই হবে! এ ছাড়া যে বাবা-মায়ের এত জীবনপাত করা পরিশ্রমের মূল্য চোকাতে পারবে না ও।

পয়ারের ভাবনা চিরে, মোবাইলটা আবারও ভাইব্রেট করে উঠল। আবার একটা ভয়েস মেসেজ এসেছে। বলছে, 'নিজের ভবিষ্যতের কথা যদি ভাবতে চাস, তা হলে কাজটা তোকে করে দিতেই হবে, ভাই! ইউ হ্যাভ টু ডু দিস!'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পয়ার। কিছু ক্ষণ নীল আলো জ্বলা ফোনটার দিকে চঞ্চল-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার পর আবার কেঁপে ওঠা আঙুলের ডগা দিয়ে মেসেজটাকে মুছে দিল ফোন থেকে।

পয়ার ঘড়ি দেখল। রাত এখন একটা দশ। পাশের ঘরে টিভি নিভিয়ে বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। পয়ার আবার পাশ ফিরে শুল। কিন্তু ঘুম ওর চোখে নামতে চাইল না কিছুতেই।

ও মনে-মনে তখন প্ল্যান করা শুরু করল, কী করে নিউ আলিপুরের ঠাকুরটা দেখার পর অধিরাজস্যারকে বেহালার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজি করানো যায়।

আসলে আগামিকাল বেলা বারোটার মধ্যে বেহালা চৌরাস্তার কাছে পৌঁছনোটা ভীষণ-ভীষণ দরকার পয়ারের।

মহাসপ্তমী

"স্যর, বলছিলাম কী, রাসবিহারী মোড়ে নেমে আমরা যদি ওখানের দুটো বড় পুজো দেখার পর হেঁটে চেতলাটা সেরে নিই, তার পর তো ওখান থেকে ব্রিজ পেরোলেই নিউ আলিপুর... ওখানের পুজোটা দেখে নিয়ে বেহালার দিকে গেলে, কেমন হয়, স্যর?"

এক নিঃশ্বাসে সারা রাত ধরে ছকে রাখা প্ল্যানটাকে গড়গড়িয়ে উগড়ে দিয়ে সকলের মুখের দিকে ফিরে তাকাল পয়ার। ও বুঝল, ওর মনের অতলে লুকিয়ে থাকা কোনও কথাই এখানে উপস্থিত বাকিরা কেউ ধরতে পারেনি। ও মনে-মনে একটু হলেও নিশ্চিন্ত হল।

অধিরাজস্যার ওর কথা শুনে একটু ভেবে বললেন, "সেই ভাল। পুজোর মধ্যে সেই বেলা-দুপুরের আগে তো মেট্রোও অ্যাভেল করা সম্ভব নয়। ফলে নর্থে তো সহজে যাওয়াও যাবে না। সেক্ষেত্রে অটো-ফটো কিছু পেলে বেহালাটায় ঘুরে আসাই যায়। তাই চলো তা হলে।"

কথাটা বলেই অধিরাজস্যার বিজন সেতু পেরোতে থাকা হলুদ ক্যাবটার পিছনে বসা বাকিদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন।

জারুল কাঁধ শ্রাগ করল, "আমার কোনও চাপ নেই। তাই হোক।"

ঝিল সিরিয়াস মুখ করে বলল, "আমি কিন্তু রাস্তাঘাট বিশেষ কিছু চিনি না, স্যর। মা বলে দিয়েছে আমাকে সন্ধে নামার আগেই বাড়ি ফিরে আসতে।"

আবহ মুখে কিছু না-বলে হালকা করে হাসল একটু। ও বরাবরই কম কথা বলে।

পয়ার তখন সকলের চোখ এড়িয়ে আস্তে করে হাঁপ ছাড়ল একটা। তার পর পকেট থেকে নিঃশব্দে মোবাইলটা বের করে চটপট হোয়াটসঅ্যাপ করল একটা অচেনা নম্বরে, 'ঠিক দুপুর বারোটায় পৌঁছে যাব... বেহালা চৌরাস্তায়!'

নিউ আলিপুরের বড় সর্বজনীন দেখে বেরোতে-বেরোতেই, মোড়ের মাথা থেকে একটা ফাঁকা অটো পাওয়া গেল।

অধিরাজস্যর দরাদরি করার চেষ্টা করলেও অটোওয়ালা পানমশলা চিবোতে-চিবোতে মেজাজের সঙ্গে বলে উঠল, "পাঁচ জন যখন, তখন পুরো একশোই নেব। পোষালে বসে পড়ুন।"

স্যর বললেন, "তবে আর কী? বসে পড়ো সকলে।"

অটোটা ছাড়তেই ঝিল নাক-মুখ কুঁচকে বলে উঠল, "উফ্‌ফ, কী যাচ্ছেতাই হাঁটালেন স্যর আপনি! আর কিন্তু স্যর, আমি এত হাঁটতে-টাতটে পারব না। বেশি হাঁটলে, আমার নতুন চটিটা ছিঁড়ে যাবে না!"

জারুল ওর কথা শুনে বলল, "ও মা, পুজোর সময় না-হাঁটলে, ঠাকুর দেখাটা ঠিকঠাক এনজয় করা যায় নাকি? আরে বাবা, পুজোর সময় নতুন জুতো পরে পায়ে ফোস্কা পড়াটাও একটা পার্ট-অফ-লাইফ, বুঝলি?"

পয়ার এ সবের মধ্যে একটাও কথা বলল না। ও খালি নিজের রিস্ট ওয়াচটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিল এক বার। এখনই পৌনে-এগারোটা বাজে। তার মানে আর মাত্র এক ঘণ্টার থেকে সামান্য একটু বেশি সময় রয়েছে হাতে!

অটোটাকে বেহালার নবদল পুজো মণ্ডপের কাছে ছেড়ে দেওয়া হল।

নবদল বারোয়ারির ঠাকুর দেখে বেরিয়ে অধিরাজস্যর বললেন, "এখানে কাছাকাছি একটা কোথাও জমিদারবাড়ির বনেদি পুজো হয়, শুনেছি। যাবি নাকি এক বার ওটা দেখতে?"

জারুল লাফিয়ে উঠে বলল, "চলুন, স্যর, চলুন। আমি ওই জমিদারবাড়ি চিনি। ওর কাছাকাছি আমার মাসির বাড়ি। ওই তো, ওই দিকে।"

সবাই তখন জারুলকে ফলো করল।

কিন্তু এই সময় পয়ার একটু পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হল। কারণ আবারও একটা ভয়েস মেসেজ ঢুকেছে ওর মোবাইলে। পয়ার দ্রুত হেডফোনটা কানে গুঁজল। ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "ম্যান্টন বাসস্ট্যান্ড থেকে বাঁ দিক ধরে চৌরাস্তার দিকে একটু এগোলেই ভূপেন রায় রোডের ছোট মতো গলিটা পড়বে। আমি ওখানেই থাকব। ও দিকে ট্র্যাফিক পুলিশের ঝঞ্ঝাট বিশেষ থাকে না। ফলে প্রবলেম কিছু হবে না। কিন্তু... ইউ, বি কেয়ারফুল!"

ভয়েস মেসেজটা দ্রুত আঙুলের চাপে মুছে দিয়ে পয়ার ঘড়ির দিকে তাকাল। সোয়া-এগারোটা বাজতে চলেছে। ওর বুকটা ভয়ে কেমন যেন টিপটিপ করে উঠল। তবু মনের উত্তেজনা মনের মধ্যে ঠুসে রেখেই পয়ার আবার হনহন করে পা চালাল ওর এগিয়ে যাওয়া টিমটার দিকে।

জমিদারবাড়ির পুজোয় সপ্তমীর সকালে ঐতিহ্যবাহী কলাবৌ স্নানের ফটো তুলতে পেরে অধিরাজস্যর তো আনন্দে আপ্লুত। গলায় ডিজিটাল ক্যামেরা ঝুলিয়ে হাত-মুখ নেড়ে স্যর তখন ওদের বোঝাচ্ছেন ভাল ফটো তুলতে গেলে ক্যামেরার কোন অ্যাঙ্গেল, কোন ওয়াইড-শট, আর কী রকম ভাবে প্রাকৃতিক আলো-ছায়ার ব্যবহার দরকার হয়।

বাকিরাও তখন হাঁ করে স্যরের বকবকগুলো গিলতে-গিলতেই সামনে এগোচ্ছিল, রাস্তার দিকে কারওরই বিশেষ খেয়াল ছিল না।

পয়ার অবশ্য অধিরাজস্যরের ওই সব কারিকুরিতে এখন বিশেষ কান দিচ্ছিল না। ও কয়েক পা পিছিয়ে রাস্তার বাঁ দিকে নিজের সতর্ক দৃষ্টিটাকে বোলাতে-বোলাতে নিঃশব্দে এক মনে হাঁটছিল।

ওর বুকের মধ্যে এখন যেন একটা আয়লা অথবা আমপান ঝড় লাফালাফি করছে। বাকি চার জন যে এ ব্যাপারটার কিছুই টের পায়নি, এটাই যা ভরসা।

চোদ্দো নম্বর বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি পৌঁছে স্যর একটা অটোর খোঁজ করতে-করতে বললেন, "এ বার কি তবে বড়িশার দিকে যাব নাকি আমরা?"

পয়ার তখন হঠাৎ ভীষণ তৎপর হয়ে উঠে বলল, "না-না, স্যর,

আর-একটু সামনের দিকে হেঁটে আমরা ম্যান্টন মোড় পর্যন্ত যাই চলুন।"

আবহ বিশেষ কথা বলে না ঠিকই, কিন্তু এখন ও-ই হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, "কেন রে? হঠাৎ ম্যান্টন পর্যন্ত হাঁটতে চাইছিস কেন?"

আবহর এমন অতর্কিত খোঁচাটায় পয়ারের বুকের রক্ত চলকে উঠলেও ও কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, "আসলে ও দিকে আমাদের একজন রিলেটিভ থাকেন। মা বলেছে, পারলে এক বার ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসতে। তাই..."

আবহ আর কথা বাড়াল না। কী ভাগ্যিস যে, আবহ এ দিকের রাস্তাঘাট বিশেষ চেনেটেনে না!

অধিরাজ স্যরও আর এ নিয়ে বিশেষ কিছু বললেন না। তাই রাস্তার বাঁ দিকের ফুটপাত ধরে এক সঙ্গে আবার সকলে হাঁটা শুরু করল।

হঠাৎ রাস্তার বাঁদিকে সরু একটা গলি থেকে ক্রিমরঙা একটা গাড়ি হুস করে বেরিয়ে এসে আচমকা ওদের সামনে এসে ব্রেক কষল।

স্টিয়ারিংয়ের দিকের জানলার কাচ নামিয়ে একটি যুবক মুখ বাড়াল, "পয়ার, তাড়াতাড়ি কর... ওকে গাড়ির মধ্যে তুলে দে।"

কিন্তু তত ক্ষণে পয়ারের হাত-পাগুলো ভয়ে জমে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। ও এক-চুলও নিজের জায়গা থেকে নড়তে পারল না।

পয়ারের চোখের দৃষ্টিটাও যেন মুহূর্তের জন্য ঝাপসা হয়ে এল। ওর কানের মধ্যে হঠাৎ এই ভীষণ অড পরিস্থিতিতেও, ঝিলের মা, অর্থাৎ কাকিমার মায়াময় গলার স্বরটা আবার যেন গমগম করে উঠল, "তোকে আর-একটা লুচি দি, বাবা? আর-একটু আলু-চচ্চড়ি? পেট ভরে খা, পয়ার... তুইও কি ঝিলের মতো পাখির খাদ্য খাবি নাকি?"

চোখের জলটাকে কোনওমতে সংবরণ করে পয়ার তুতলে উঠল, "তুমি তো শু-শু-শুধু আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে বলেছিলে..."

পয়ারের মুখের কথাটা ফুরোনোর আগেই গাড়িতে বসা যুবকটি দরজা খুলে পয়ারের বুকে আচমকা একটা ঘুষি চালাল। বুক চেপে ধরে রাস্তার পাশে পড়ে গেল পয়ার।

আর তত ক্ষণে সেই আততায়ী যুবকটি ঝিলের হাতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে, ওর পাখির মতো লিকলিকে আর হালকা শরীরটাকে টেনে নিজের গাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

সমস্ত ঘটনাটাই ঘটল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

তাই অধিরাজ স্যর, জারুল, আবহ বা পথচলতি অন্য লোকেরা কিছু বুঝে বা করে ওঠার আগেই ক্রিমরঙা গাড়িটা আবার ইঞ্জিনে গর্জন তুলে সচল হয়ে রাস্তায় বাঁক নেওয়ার চেষ্টা করল।

আর রাস্তার পাশে পড়ে যাওয়া পয়ার তখন শুনতে পেল গাড়িটার মধ্যে থেকে করুণ কান্নায় আর্তনাদ করে উঠল ঝিল, "স্যর... পয়ার... এ সব কী হচ্ছে? আমাকে বাঁচান!"

ফ্ল্যাশব্যাক ১

আধ পোড়া বিদেশি দামি ব্র্যান্ডের সিগারেটটাকে পায়ে পিষতে-পিষতে উষ্ণীষদা বলল, "'শাইনিং আকাদেমি' ইশকুলটা এ দিকে কোথায় হবে তুই জানিস?"

পয়ার হাত তুলে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, "ওই তো, ওই দিকে। পেট্রল-পাম্পটার পরের বাড়িটাই..."

তার পর ও গলায় মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করল, "কেন গো, কোনও দরকার আছে ওখানে?"

উষ্ণীষ ক্যাজুয়ালি মাথা নাড়ল, "নাহ, এমনিই..."

পয়ার তবু উষ্ণীষকে অয়েলিং করার জন্য উপযাচক হয়েই বলল, "আমি তো ওই স্কুলের অনেককেই চিনি। আমার সঙ্গেই তো ওদের অনেকে কেমিস্ট্রি স্যরের ওখানে এক ব্যাচেই পড়তে যায়..."

পয়ারের এই উষ্ণীষ নামক বখাটে বড়লোক যুবকটির প্রতি এত সহৃদয়তার পিছনে একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে।

উষ্ণীষ বসু আসলে ওর জ্যাঠতুতো দাদা ছন্দকের কলেজের বন্ধু। ছন্দক আর উষ্ণীষ অবশ্য এক সঙ্গে এইচ এসও পাশ করেছিল, বছর-দুয়েক আগে।

উষ্ণীষরা বিশাল বড়লোক। ওর বাবার নাকি হাজার রকমের ব্যবসা আছে গোটা রাজ্য জুড়ে। বড়লোকের বিগড়ানো ছেলে বলেই কলেজের পড়া মাঝপথে দুম করে ছেড়ে দিয়ে, উষ্ণীষ এখন বিদেশে গিয়ে বিজ়নেস ম্যানেজমেন্ট পড়বে বলে ঠিক করেছে। ওর কথা অনুযায়ী ও আর কয়েক মাসের মধ্যেই স্টেটসে পাড়ি জমাতে চলেছে।

পয়ারের দাদুর শ্রাদ্ধের বাৎসরিক কাজের দিন সন্ধেবেলায় ওদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে এসেছিল উষ্ণীষ।

জেঠুদের অবস্থাও পয়ারদের মতোই। কষ্টেসৃষ্টে কোনওমতে সংসার চালাতে হয়। ছন্দক এখন পলিটেকনিক পড়ার পাশাপাশি একটা দোকানে ল্যাপটপ সারাইয়েরও পার্টটাইম কাজ করছে।

আর্থিক অবস্থার এত ফারাক সত্ত্বেও ছন্দকের সঙ্গে উষ্ণীষের বন্ধুত্বটা কোনওভাবে রয়ে গিয়েছে। তাই ওদের বাড়িতে প্রায় সময়ই উষ্ণীষ চলে আসে।

বাড়িতে বড়রা আছেন বলে ও পয়ারকে নিয়ে কালীমন্দিরের পিছনের সরু গলিটায় চলে এসেছিল।

উষ্ণীষ কয়েক দিন ধরেই পয়ারকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে ও বিদেশে গিয়ে সেটল করার পরই পয়ারের জন্যও বিদেশি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার এবং গবেষণা করার ব্যবস্থা করে ফেলবে। টাকাপয়সার চিন্তা পয়ারকে করতেই হবে না!

পয়ার প্রথমটায় ওর কথায় বিশেষ ভরসা পায়নি। উষ্ণীষদা বড়লোকের ছেলে। ওর পক্ষে যে সব স্বপ্ন দেখা সম্ভব, পয়ারের পক্ষে কি এই ভাঙা-বাড়িতে বাস করে সেই রকম চকচকে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর কোনও মানে হয়?

কিন্তু মনের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে পয়ারের এই সব যুক্তিজালগুলো দিনে-দিনে ফিকে হয়ে ছিঁড়ে পড়েছে।

ও ভাল ছাত্র। আরও একটু ভাল লেখাপড়ার সুযোগ, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণার সুবিধে, সচ্ছল রোজগার, বাবা-মায়ের জন্য একটা খুশিতে ভরা ভবিষ্যৎ, উষ্ণীষের কথা শুনতে-শুনতে এই সব সোনালি স্বপ্নগুলোর কুহক হাতছানি থেকে কিছুতেই নিজেকে আর মুক্ত করতে পারেনি পয়ার।

ও মোটামুটি মেনেই নিয়েছে উষ্ণীষদা বিদেশে গিয়েই ওর জন্যও একটা সেরা কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলবে। তাই এখন ও সুযোগ পেলেই উষ্ণীষদাকে তুষ্ট রাখার বাড়তি চেষ্টা করে যায়।

এখন পয়ারের এই মাখনগিরিতে উষ্ণীষ সামান্য উসখুস করে নিচু গলায় বলল, "তোর তো এখন ক্লাস টুয়েলভ চলছে, তাই না? তুই ওই শাইনিং আকাদেমিতে পড়া ঝিলম ঘোষ বলে কোনও মেয়েকে চিনিস?"

এই কথা শুনে পয়ার তো উষ্ণীষকে সাহায্য করার জন্য আরও কয়েক ডিগ্রি তৎপর হয়ে উঠল। সাগ্রহে বলল, "খুব চিনি। ওর ডাক নাম তো ঝিল। কাছেই থাকে। ওই দিকটায়। আমি আর ও তো এক সঙ্গে ফিজ়িক্সের টিউশনও পড়ি, এক ব্যাচে।"

পয়ার থামতেই উষ্ণীষ হঠাৎ ওর হাতদুটোকে খপ করে চেপে ধরল। হিংস্র নেকড়ের মতো ওর চোখ দুটো ধকধক করে উঠল।

পয়ার ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, "আহ, উষ্ণীষদা, লাগছে তো!"

কিন্তু উষ্ণীষ ওর কথায় বিন্দুমাত্র পরোয়া না-করে কেটে-কেটে বলল, "আই ওয়ান্ট দ্যাট গার্ল! আমি ওকে বুঝে নেব! এবং তুই ওকে যে ভাবে পারিস, আমার সামনে এনে ফেলবি! আর হ্যাঁ, এ কথাটা তুই কারও সঙ্গে শেয়ার করবি না। ছন্দকের সঙ্গেও নয়। মনে থাকবে?"

পয়ার উষ্ণীষের কথার মাথা-মুন্ডু কিচ্ছু বুঝতে না-পেরে ভয়ে-ভয়ে চুপ করে রইল।

তখন উষ্ণীষ ওর মুখের কাছে আরও খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, "কাজটা তোকেই করতে হবে, ভাই। যে কোনও মূল্যে। না হলে আমি কিন্তু তোর ভবিষ্যৎ, কেরিয়ার, সব ছারখার করে দেব!"

হঠাৎ ঝিলের ব্যাপার নিয়ে উষ্ণীষদা কেন এতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, তার কিছুই বুঝে উঠতে পারল না পয়ার।

ও তাই ভয়-পাওয়া গলায় তুতলে উঠে বলল, "ঠি-ঠিক আছে... আমি ঝিলকে তোমার সামনে আনার ব্যবস্থা করব।"

উষ্ণীষ ওর কথা শুনে বাঁকা হাসল, "কিসসু ঠিক নেই! কী ভাবে আনবি, সেটা ঠিক করেছিস?"

পয়ার ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল উষ্ণীষের দিকে। ঝিলকে উষ্ণীষদার সামনে এনে ফেলতে ওকে যে-কোনও নিখুঁত ষড়যন্ত্রের অংশীদার হতে হবে, এইটুকুনি সময়ের মধ্যে এতটা পয়ার আন্দাজ করে উঠতে পারেনি।

উষ্ণীষ বলল, "পুজোর সময়ই কাজটা করতে হবে। এখনও দু'মাস মতো সময় আছে হাতে। তার মধ্যে তুই একটা প্ল্যান ছকে নে, কী করে ওই মেয়েটাকে তুই নর্থ কলকাতা বা বেহালা অঞ্চলে পুজো দেখার নাম করে এনে ফেলতে পারিস। ও সব দিকে গলিঘুঁজি বেশি। ফলে সহজেই পুলিশের চোখ এড়িয়ে..." উষ্ণীষ কথাটা আর শেষ করল না। মৃদু হাসতে-হাসতে চুপ করে গেল।

কিন্তু ওই ইঙ্গিতটাতেই পয়ারের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। ও আস্তে-আস্তে মাটির দিকে মুখটাকে নামিয়ে নিল।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে উষ্ণীষ আবার বলে উঠল, "তোর এই কাজটা করে দেওয়ার পুরস্কার হবে স্টেটসের বড় কোনও ইউনিভার্সিটিতে এক চান্সে পড়ার সুযোগ পেয়ে যাওয়া! না হলে তোকেও যে আজীবন ছন্দকের মতো খারাপ ল্যাপটপ সারাতে-সারাতে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে যেতে হবে রে..."

এই কথা শুনে পয়ারের চোখের কোণদুটো নিজের অজান্তেই জ্বালা-জ্বালা করে উঠল।

উষ্ণীষ তখন ওর জিন্‌সের পিছন পকেট থেকে মানিব্যাগটাকে টেনে বের করে চারটে কড়কড়ে পাঁচশো টাকার নতুন নোট জোর করে পয়ারের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিতে-দিতে বলল, "এটা অ্যাডভান্স। রেখে দে। কাজটা ঠিকঠাক হলে তোকে আমি বড়লোক করে দেব। একটা কথা মনে রাখিস, উষ্ণীষ বসু কখনও কথার খেলাপ করে না!"

চারটে পীতাভ-সবুজ নোট হাতে ধরে অপমানে মাটিতে প্রায় মিশে যেতে-যেতে পয়ার সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "কিসের জন্য ঝিলকে এত দরকার তোমার?"

কালীতলার অন্ধকারময় গলিতে চোখ দুটোকে আগুনের গোলার মতো জ্বালিয়ে নিজের গালের উপর হাতের তালুটা ঘষতে-ঘষতে উষ্ণীষ উত্তর করেছিল, "ওই মেয়েকে চরম শিক্ষা না-দিতে পারলে, আমি মরেও শান্তি পাব না রে!"

॥ ২ ॥

জারুলের কথা

চার দিকে এত চরম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই ইন্টারভিউয়ের অফার-লেটারটা যে এ ভাবে ওর হাতে চলে আসবে, সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি জারুল। অবশ্য ওর জীবনের এই চরম অপ্রত্যাশিত অথচ ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট ইন্টারভিউটাকে এ বাড়ির সকলেই একটা চরম পাগলামি বলে মনে করবে, এটা ও ভালই জানে। কিন্তু জারুল নিজের মনের কাছে একদম বদ্ধপরিকর যে, ও বড় হয়ে ইনভেস্টিগেশন লাইনে যাবেই যাবে!

ও তাই মাঝেমধ্যেই নিজের ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে 'শার্লক' টিভি-সিরিজের শার্লক হোমসের অঙ্গভঙ্গিগুলো নকল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে।

কিন্তু দুটো অপ্রতিরোধ্য সমস্যা বার বার ওকে বিব্রত করে তোলে এই সময়। এক, ওর এই মাইনাস এগারো পাওয়ারের মোটা ফ্রেমের চশমাটা। আর দুই, 'মাই নেম ইজ় শার্লক হোম্‌স' বলার স্টাইলে ও কিছুতেই 'আমার নাম জারুল পাল'— এই কথাটাকে খাপ খাইয়ে উঠতে পারে না।

তবু এখনও ও প্রায় রাতেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে ফেলুদা গোয়েন্দাগিরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ও-ই তোপসের সঙ্গে নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে নতুন-নতুন রহস্যের সমাধানে কত দেশ-বিদেশে ছুটে যাচ্ছে!

এখন ও যেটা স্বপ্নে দেখে আরও একটু ছোটবেলায় সেই ভাবনাটাই কিন্তু ওর ফেভারিট দিবাস্বপ্ন ছিল। কত শীতের দুপুরে বুকের উপর 'ফেলুদা সমগ্র'টাকে উপুড় করে রেখে জারুল ভাবতে শুরু করত, ফেলুদা বুড়ো হয়ে গেছে, তাই তোপসেই এখন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কার্ড ছাপিয়ে বিদেশি ক্লায়েন্টের দিকে বাড়িয়ে ধরে। আর তখন তোপসের পিছনে ছোট মোড়াটা টেনে একটা প্যাড আর পেনসিল হাতে নিঃশব্দে এসে বসে পড়ে জারুল। তোপসেদা গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, "জারুল, এই ঠিকানাটা নোট করে নে তো..."

বড় হওয়ার পর দিবাস্বপ্নের আকাশকুসুমটা টুটে গেলেও মনে-মনে এক জন তুখোড় গোয়েন্দা হয়ে ওঠার বাসনাটাকে প্রাণপণে এখনও লালন করে জারুল। যদিও এ বাড়ির কেউই ওকে ওর এই স্বপ্ন সার্থক করার জন্য বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে রাজি নয়। সকলেরই মত, ও যখন ছাত্রী হিসেবে মোটামুটি ভালই, তখন ভাল করে লেখাপড়া করে ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়াটাই হবে ওর ঠিকঠাক ভবিষ্যৎ।

ও যে ভবিষ্যতে 'র'-এর এক জন সিক্রেট এজেন্টও হয়ে উঠতে পারে, সেটা কেউ যেন মানতেই চায় না এ বাড়িতে।

জারুল তাই মনে-মনে ভাবে মা বেঁচে থাকলে কক্ষনও ওকে ওর আপন লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে এমন করে পদে-পদে বাধা দিত না।

মা যখন হঠাৎ সেরিব্রাল অ্যাটাকে চলে গেলেন তখন জারুল সবে ফাইভে পড়ে। তার পর থেকে জারুল, মামা-মাইমার কাছে থেকেই মানুষ হয়েছে। ওর মামাতো বোন জৈমিনি এবার মাধ্যমিক দেবে। ও-ও সুযোগ পেলেই জারুলের পিছনে লাগে। বলে, "দ্যাখ দি, তুই যে মিতিনমাসির পর দু' নম্বর ঘ্যাঁতনপিসি হয়ে উঠবি বলে ভাবছিস, সেটা কিন্তু তোর ওই মোটা কাচ দেওয়া চশমাটার জন্য কখনওই সম্ভব নয়! এক তুই যদি লেডি কাকাবাবু, আই মিন, 'কাকিমণি' টাইপের কিছু একটা হয়ে উঠতে পারিস, তা হলেই হেব্বি জমে যাবে!"

এ সব কথা জারুল যত শোনে ততই ওর মাথাটা গরম হয়ে আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়তে চায়। মামা-মাইমাও জারুলের এই অতিরিক্ত রহস্যপ্রীতির বিরুদ্ধে সব সময় সরব।

মাইমা তো মাঝেমধ্যেই রাগ করে ওর উপর গর্জে ওঠে, "লেখাপড়া করে কোনও ভদ্রবাড়ির মেয়ে হাবিলদারের চাকরি করতে চায়, এ আমি কোনওকালে শুনিনি, বাবা!"

মামা অবশ্য সামনে কখনও ওকে কিছু বলে না।

তবে জারুল এক দিন আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছে, মামা বাবাকে ডেকে বলছিল, "মেয়েটার দিকে এ বার একটু নজর দাও, শারদ। যতই ও আমাদের চোখে-চোখে থাকুক, শেষমেশ মেয়েটা তো তোমারই। এইসব আজেবাজে গোয়েন্দা গপ্পো পড়ে-পড়ে ও যে লেখাপড়াটাকে গোল্লায় দিচ্ছে, সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না?"

বাবা কিন্তু মামার এই কথায় কোনও প্রতিবাদও করেনি আবার ওকে ডেকে কোনও শাসনও করেনি।

আসলে মায়ের মৃত্যুর শোকটা বাবাকে এমন করে ছুঁয়ে গিয়েছিল যে, বাবা সেই থেকে কিছুতেই যেন মেয়ের মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেই পারেন না। সকলেই যে বলে, জারুলের মুখটা যেন ওর মায়ের মুখ ছেঁচে বসানো হয়েছে...

জারুলের বাবা একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। মায়ের মৃত্যুর ঠিক পরে-পরেই বাবা স্বেচ্ছায় শহর থেকে অনেক দূরের একটা ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তখন তো খুব ছোট ছিল জারুল, তাই মায়ের মৃত্যু, বাবার দূরে চলে যাওয়া, এ সব নিয়ে ও খুব কান্নাকাটি

করত। কিন্তু এখন বড় হওয়ার পর জারুল বুঝতে পারে বাবা সেদিন বুকে অনেক ব্যথা নিয়েই দূরে সরে গিয়েছিলেন ওর থেকে। এখনও বাবা ওকে একটু দূর থেকে দেখাই পছন্দ করেন। ওকে দেখলেই যে বাবার মায়ের কথা ভীষণ মনে পড়ে যায়!

তাই জীবনের প্রথম এই চাকরির ইন্টারভিউটায় যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে এক বার পরামর্শ করবে বলে ভেবেও, শেষ পর্যন্ত আর করে উঠতে পারেনি জারুল। অবশেষে মামা, মামি, বোন, সকলকে এক রকম লুকিয়েই, ও পার্কস্ট্রিটে এই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন আকাদেমির নতুন এজেন্ট নিয়োগের প্রবেশিকা পরীক্ষাটায় চুপিচুপি গিয়ে বসেছিল।

ভৌতবিজ্ঞান, অঙ্ক, জীববিদ্যা, সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা— সব বিষয়ের প্রশ্নেই বেশ সহজে উত্তর করতে পেরেছিল পরীক্ষাটায়। জারুলের তখন মনে হয়েছিল এটা নেহাতই জয়েন্ট এন্ট্রান্সের একটা প্রস্তুতি পরীক্ষার মতোই। জল-ভাত ব্যাপার! সেই লুকিয়ে দিয়ে আসা পরীক্ষাটার রেজ়াল্ট হঠাৎ এই পুজোর মুখে এসে উপস্থিত।

তাও কী ভাগ্যিস মামার বাড়ির এই ঠিকানায় রেজ়াল্ট আর ইন্টারভিউয়ের কল-লেটারটা আসেনি! ওটা এসেছিল পাশের পাড়ায়। ওদের বন্ধ ফ্ল্যাটের ঠিকানায়। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে ওটা বন্ধই পড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়। বাবা কলকাতায় এলেও ওখানে বিশেষ থাকতে চায় না। আর জারুলের তো সেই ছোট থেকেই মামার বাড়িতে আস্তানা করা আছে। তাই এই মহার্ঘ চিঠিটার খোঁজ এখনও এ বাড়ির কেউই পায়নি।

কিন্তু সমস্যা হল জারুলের বয়স তো এখনও আঠারো পূর্ণ হয়নি। অথচ পরীক্ষার বিজ্ঞাপনে বলা ছিল, এই তদন্ত সংস্থার এজেন্ট-পদপ্রার্থীদের বয়স ন্যূনতম আঠারো হওয়া প্রয়োজন। ও বুঝতে পারছে না, তা হলে সব কিছু দেখে-শুনে ওর মতো একটা আন্ডার-এজেড, টুয়েলভে পড়া মেয়েকে কী করে ইন্টারভিউতে কল করল এই এজেন্সি? ওরা কি তবে ভুল করে ডেকেছে ওকে? মনে-মনে একটু হলেও কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলল জারুল।

অটোয় করে চলতে-চলতে ওর আরও মনে হল, পেশাদারি ইনভেস্টিগেশন লাইনে ফিজ়িক্যাল ফিটনেসের একটা আলাদা কদর আছে। সেখানে ওর চোখের এই মাইনাস পাওয়ারটা ওর স্কোর বোর্ডে একটা বড়সড় মাইনাস মার্কিং বসিয়ে দেবে না তো?

আকাশ-পাতাল ভাবতে-ভাবতে শেষ পর্যন্ত গড়িয়াহাটের অভিজাত একটা পাড়ায়, বহুতল বিল্ডিংটার আটতলার দুধ-সাদা টাইলসে মোড়া ঝকঝকে অফিসটায়, পায়ে-পায়ে প্রবেশ করল জারুল। তার পরেই তো ওর হাতে, এই অবাক করা অ্যাসাইনমেন্টটা এসে উপস্থিত হল!

জারুলের বায়োলজি স্যর অধিরাজবাবু মানুষটা ছোটখাটো, রোগা এবং এক-মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফওয়ালা। কিন্তু মানুষটা খুবই মিশুকে আর ভাল।

ওঁর বাড়ির এক তলায় পয়ার আর আবহ বলে দুই বন্ধুর সঙ্গে সেই ইলেভেন থেকে বায়োলজি পড়তে যায় জারুল। ব্যাচে আরও দুটো ছেলে মাঝেমধ্যে পড়তে আসে, তবে তাদের অত ভাল চেনে না ও। পয়ার, আর আবহ এক স্কুলে পড়ে। তা ছাড়া ওরা তিন জনে এক সঙ্গে ইংরেজি কোচিংয়েও পড়তে যায়। তাই অন্য স্কুলের বন্ধু হলেও পয়ার এবং আবহকে জারুল বেশ অনেক দিন ধরেই চেনে।

পুজোর আগের শেষ ক্লাস সেদিন। হঠাৎ অধিরাজ স্যর ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "কী রে, তোদের পুজোয় সব ঘোরাঘুরির প্ল্যান কদ্দূর?"

জারুল স্যরের এই কথাটাকে টপ করে ক্যাচ ধরার মতো লুফে নিল। ও যেন এই প্রস্তাবটা শোনার জন্যই হাঁ করে অপেক্ষা করছিল এত ক্ষণ।

ও তাই তড়িঘড়ি বলল, "স্যর, আপনিই এ বার আমাদের ঘুরতে নিয়ে চলুন না পুজোতে। তা হলে বাড়ি থেকেও সহজে পারমিশন পাওয়া যায়।"

অধিরাজ স্যর ওর কথা শুনে চোখ পাকিয়ে বললেন, "ওরে বাবা, পুজোর সময় যা ভিড়ভাট্টা হয় চার দিকে! আমি ও সবে ঠেলাঠেলি করে পেরে উঠব না বাপু!"

এমন সময় ঘরের অন্য প্রান্তে বসে থাকা ফরসা মতো আর-একটি মেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "সকাল-সকাল ঘুরতে গেলে অত ভিড় থাকবে না, স্যর।"

জারুল এই মেয়েটিকে আগে কখনও অধিরাজ স্যরের এই ক্লাসে দেখেনি। ও বোধ হয় অন্য বোর্ডের ক্লাস টুয়েলভে পড়ে। তবে ওর মুখটা চেনা আছে। ওই মেয়েটি পয়ারদের সঙ্গে ইংরেজি পড়তে যায়। জারুল তখন কয়েক বার ওকে দেখেছে, মনে পড়ল।

তবে এই মুহূর্তে মেয়েটির নামটা ঠিক মনে করে উঠতে পারল না জারুল। তাই ও ওর পাশে বসা আবহর কানের কাছে মুখটাকে নিয়ে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ওই মেয়েটার নাম কী রে?"

আবহ কিছু উত্তর করার আগেই ঘরের অন্যদিকে বসা পয়ার খুব উৎসাহ নিয়ে বলে উঠল, "চলুন না, স্যর। আপনি সঙ্গে থাকলে, নর্থ কলকাতা কিংবা বেহালার দিকের পুজোগুলো দেখে আসা যাবে। বাড়ি থেকে তো অত দূরে আমাদের একা-একা ছাড়তে চায় না। তা ছাড়া আপনি সঙ্গে থাকলে ঝিলের মা-ও ওকে আমাদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন।"

'ঝিল!' তার মানে ওর পুরো নাম, 'ঝিলম ঘোষ!' নামটা শুনেই জারুলের মাথার মধ্যে ঢংঢং করে, একটা অ্যালার্ম-ঘণ্টি নিজের থেকেই বেজে উঠল।

ও আড় চোখে এক বার ফরসা আর লিকলিকে দেখতে ঝিল বলে মেয়েটির আপাদমস্তক ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে, আবার স্যরের দিকে ঘুরে আবদেরে গলায় বলল, "প্লিজ় স্যর, আপনাকে এ বার পুজোয় আমাদের নিয়ে বেরোতেই হবে!"

অধিরাজ স্যর দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে ভেবে নিয়ে বললেন, "বেশ, তা হলে সপ্তমীর সকালেই একটা কিছু প্ল্যান করা যাক! কেমন? আমিও তা হলে ফেরার পথে টালিগঞ্জ হয়ে গড়িয়ায় চলে যাব। আমার দিদিরা ওই সময় বাড়ি ফাঁকা করে সবাই মিলে মধ্যপ্রদেশ বেড়াতে যাচ্ছে। ওদের নতুন বাড়িটায় তাই আমাকে পুজোর ক'টা দিন আবার পাহারার জন্য থাকতে হবে। তবে ওদের বাড়ির চার পাশটা বেশ নিরিবিলি। প্রচুর গাছগাছালিতে ভরা। তোরাও চাইলে ঘুরে যেতে পারিস ও খান থেকে।"

ঝিল চোখ বড় করে বলল, "স্যর, আমার মা কিন্তু সন্ধের পর কিছুতেই আমাকে বাড়ির বাইরে থাকতে অ্যালাও করবে না।"

অধিরাজ স্যর ঝিলের দিকে হাত তুলে আশ্বাসের গলায় বললেন, "তোর মায়ের সঙ্গে আমি ফোন করে কথা বলে নেব 'খন।"

এই আলোচনার পর-পরই অধিরাজ স্যরের সেদিনের ক্লাস মোটামুটি শেষে হয়ে গেল। সবাই যখন উঠব-উঠব করছে, এমন সময় জারুল খেয়াল করল পয়ার পড়ার ঘরের বাইরে বেরিয়ে মোবাইলটাকে হাতের আড়ালের মধ্যে নিয়ে, কাকে খুব সন্তর্পণে একটা টেক্সট মেসেজ করল 'সপ্তমীর সকালে বেরোনো হচ্ছে। অল ফাইনাল!'

পয়ারের এই মেসেজের মাথামুণ্ডু জারুল কিছুই বুঝতে পারেনি সেদিন। তবে ও সেদিন মনে-মনে বলেছিল, 'প্লিজ় ঠাকুর, দেখো, যেন ঝিলের মা ঝিলকে সপ্তমীর দিন ঠাকুর দেখার জন্য পারমিশনটা দিয়ে দেন... কারণ, ওই ঝিলের উপরই যে জারুলের জীবনের প্রথম ইনভেস্টিগেশন অ্যাসাইনমেন্টটার জীবন-মরণ সব কিছু নির্ভর করছে!'

মহাসপ্তমী

আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে বেশ কিছু ক্ষণ ফ্রেমে-বাঁধানো মায়ের ছবিটার দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল জারুল। এই

মুহূর্তে মা ছাড়া তো আর কেউ ওর পাশে নেই, এই দুঃসাহসিক কাজটায় মনের শক্তি জোগানোর মতো। এক মাত্র মায়ের ওই ফটোগ্রাফই নীরবে ওকে সাহস জোগাতে পারে, ওর জীবনের এই প্রথম তদন্তের কাজ সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সফল করার জন্য!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে চেনা মিষ্টির দোকানটাকে পেরিয়ে কয়েক পা এগোতেই পয়ার আর ঝিলকে এক সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে যেতে দেখতে পেল জারুল।

ঝিলও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ওকে দেখতে পেল। আর দেখতে পেয়েই ফরসা ঝিল ওর আপেল-গোলাপি গালে টোল ফেলে জারুলের দিকে মিষ্টি করে হাসল, "ভালই হল, তোর সঙ্গে রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল। আজ সারা দিন কিন্তু খুব মজা করব আমরা। ঠিক আছে?"

জারুল ছোট্ট করে সৌজন্যের হাসি হাসল একটা। তার পর ও ঘুরে তাকাল পয়ারের দিকে।

কিন্তু পয়ার ওকে দেখেই কেমন যেন সিঁটিয়ে গেল। জারুলের দিকে দায়সারা একটা হাসি দিয়েই ও সামনে কয়েক কদম এগিয়ে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে কানে চাপল।

পয়ারের মতো হাসিখুশি ছেলের হঠাৎ এমন আড়ষ্টতায় কেমন যেন একটু অবাকই লাগল জারুলের।

অধিরাজ স্যার সকাল দশটা নাগাদ বেরোবেন বলেছেন।

এখনও ঘড়ির কাঁটা সোয়া-ন'টাও ছোঁয়নি ভাল করে। যদিও আশপাশের ছোট-বড় পুজোমণ্ডপে ইতিমধ্যেই সপ্তমী পুজোর পুষ্পাঞ্জলি আর ঢাকের আওয়াজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই ঢাকের আওয়াজটা কানে ঢুকলেই মনটা কেমন যেন নেচে-নেচে ওঠে। জারুলেরও তাই-ই হচ্ছিল। কিন্তু মনের সেই আবেশটা উপভোগ করার আগেই ঝিল ওর গায়ে পড়ে আপনা থেকেই কলকলিয়ে কথা বলা শুরু করে দিল।

কয়েক দিনের মাত্র চেনাশোনা এই ঝিলের সঙ্গে। অথচ এর মধ্যেই ঝিল কত আপন করে কথা বলছে জারুলের সঙ্গে। সামান্যই কথা। তবু ঝিলের সরল মনটার স্পর্শ পেয়ে এই পুজোর সকালে ভারী ভাল লাগল জারুলের।

পাশাপাশি জারুলের সতর্ক ষষ্ঠেন্দ্রিয় ওকে জানান দিল, ঝিলের এই সরলতা আর অল্প ক্ষণের মধ্যেই ওকে ভাল বন্ধু করে নেওয়ার ক্ষমতাটাই জারুলকে ওর অভীষ্ট লক্ষ্যে সহজে কয়েক কদম এগিয়ে দিচ্ছে।

অধিরাজ স্যারের শেষ ক্লাসে সপ্তমীর সকালের এই প্যান্ডেল-হপিংয়ের প্ল্যানটা মোটামুটি পাকা হয়ে যাওয়ার পরই জারুল ভেবে নিয়েছিল, সপ্তমীর আগেই যে করে হোক, ওকে ওই ঝিল নামক মেয়েটির আরও ক্লোজ় বন্ধুবৃত্তে ঢুকে পড়তেই হবে। ওর জীবনের প্রথম ইনভেস্টিগেশন অ্যাসাইনমেন্টের ওটাই হবে প্রথম ধাপ!

আজকাল মহালয়া থেকেই মোটামুটি পুজোর হিড়িক শুরু হয়ে যায় শহরে। ফলে পঞ্চমীর বিকেলে ফিজ়িক্স টিউশনের পরই ফিজ়িক্সের ঋষিণ স্যারকে কাছাকাছি কয়েকটা বড় সর্বজনীন ওদের সঙ্গে করে নিয়ে দেখে আসার জন্য আবদার জুড়ে দিয়েছিল জারুল। তার আগে অবশ্য ও সামান্য গ্রাউন্ডওয়ার্ক করে মুখচোরা আবহর পেট থেকে একটা অব্যর্থ ইনফো বের করে নিয়েছিল যে, ঋষিণ স্যারের এই পুজোর আগের শেষ ফিজ়িক্স ক্লাসটাতেও ওদের ব্যাচেই ঝিল পড়তে আসবে।

ঝিল অন্য বোর্ডের ছাত্রী। কোনও বিষয়ই ওদের সঙ্গে কোথাও এক সঙ্গে পড়ত না। তাই জন্যই তো এত দিন ঝিলের সঙ্গে কখনও তেমন মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায়নি জারুল।

এখন ঝিলদের বোর্ডের অসময়ে মিড-টার্ম কিছু পরীক্ষার গুঁতোয়, ও সব স্যারের কাছেই কম-বেশি এক্সট্রা-ক্লাস করতে আসছিল। সেই সূত্রেই তো ঝিলকে প্রথম অধিরাজ স্যারের ওখানে দেখতে পেল জারুল। ভাগ্যিস সেদিন ঝিলকে ওই ক্লাসে দেখতে পেয়েছিল ও! ওই একটা দেখাতেই না কত জটিল অঙ্ক আজ সহজে মিলতে বসেছে ওর এই জীবনের প্রথম গোলকধাঁধার পর্দা-ফাঁস অধ্যায়ে!

যাই হোক, ঋষিণ স্যারের ক্লাসে ঝিলের এই ব্যতিক্রমী উপস্থিতিটাও সেদিন জারুলের পক্ষেই শাপে বর হল! ও তো এটাই চাইছিল। শেষ পর্যন্ত ওর কাজটা গুটিয়ে আনার আগে অন্তত এক বার ঝিলিক মেয়েটিকে ভাল করে পরখ করে নিতে হবে। সম্ভব হলে ওর সঙ্গে একটা আপাত বন্ধুত্বও পাতিয়ে নিতে। জারুল জানে, যে কোনও ভাল গোয়েন্দাকেই এ ভাবেই চুপিসারে তার গ্রাউন্ডওয়ার্কটাকে নিখুঁতভাবে অথচ নিঃশব্দে মজবুত করে রাখতে হয়। তাই সেদিন ঋষিণ স্যারকে শিখণ্ডী করে আসলে ঝিলের সঙ্গেই জোঁকের মতো লেগে ছিল জারুল।

সেই দু'দিন আগের মহাপঞ্চমী সন্ধের জেরেই ঝিল এখন ওর সঙ্গে কলকল করে ঝর্নার মতো বকে চলেছে সেটা বুঝতে কোনওই অসুবিধে হল না জারুলের।

কিন্তু অধিরাজ স্যারের বাড়ির কাছের বাঁকটাতে আসতে-আসতেই জারুল খেয়াল করল ওদের থেকে আবার কয়েক হাত এগিয়ে গিয়ে কানে হেডফোন গুঁজে পয়ার কাকে যেন খুব নিচু গলায় বলছে, "অধিরাজ স্যার সঙ্গে থাকবেন। আমরা ওই সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ স্টার্ট দেব স্যারের বাড়ি থেকে।"

জারুলের ইন্দ্রিয়গুলো আজ সম্ভবত একটু বেশি-বেশিই সতর্ক হয়ে উঠেছে। আজ যে ওর জীবনের প্রথম তদন্তের কাজ পূরণ করার দিন। তাই ও ভিতর-ভিতর উত্তেজনা অনুভব করছে। এ সবের পাশাপাশি জারুল পয়ারের ব্যাপারটা নিয়েও ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

পয়ার আজকে যেন একটু বেশি-বেশিই ঝিলের অভিভাবক হয়ে অনর্থক ওকে সব সময় আগলে রাখতে চাইছে নিজের পাশে। এক-দু'কদম ঝিলের থেকে এগিয়ে গেলেও আবার পিছন ঘুরে দেখে নিচ্ছে ঝিল কোথায় রয়েছে, ওর থেকে ঠিক কতটা দূরে।

আবার যে-ছেলে ঝিলকে 'জ্যাক-দাদা' হয়ে, 'জিল-বোন'-এর মতো এত করে আগলাতে চাইছে, সে তবু প্রতি পদক্ষেপে একটা অচেনা নম্বরে বার বার ফোন করে ওদের বন্ধুদের এই সামান্য পুজোর ঘোরাঘুরি নিয়ে কী এত পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর দিচ্ছে?

জারুল ওর প্রখর দৃষ্টি (মাইনাস এগারো হলেও) দিয়ে পরখ করে দেখেছে, পয়ারের ফোনে ওই বিশেষ নম্বরটি কোনও নামে সেট করা নেই! কে এই আড়ালচারী? ওদের পুজোর প্ল্যানিংয়ের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? পয়ারেরই বা ওই নম্বরধারীর সঙ্গে এত ধারাবিবরণী বিতরণের দরকার পড়ছে কেন? এর সঙ্গে জারুলের আজকের নিখুঁতভাবে ছকে রাখা প্ল্যানটা ভেস্তে যাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই তো?

মহাসপ্তমীর সকাল। চার দিকে ঝলমলে রোদ, আর পুজো-পুজো একটা আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তায় ইতস্তত লোকজনের ভিড়ও ভালই। এর মধ্যেই চেতলা ও নিউ আলিপুরের দুটো বড়-বড় পুজোর হালকা ভিড়ে ভরা মণ্ডপ দর্শনের পর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটা ফাঁকা অটো ভাড়া করে অধিরাজ স্যার ওদের বললেন, "চল তা হলে, এ বার বেহালার দিকটাতেই যাওয়া যাক।"

সবাই সম্মত হলে অটোটা ওদের 'নবদল'-এর পুজোমণ্ডপের সামনে এনে নামিয়ে দিল। এই ঠাকুরটাও থিমের প্রতিমা। বেশ অন্যরকম শৈল্পিক ভাবনা রয়েছে আঙ্গিকে।

যাই হোক, 'নবদল' দেখার পরই, জারুলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ও স্যারের দিকে ঘুরে বলল, "স্যার, আপনি কখনও বনেদি জমিদারবাড়ির পুজো দেখেছেন? এখানে, কাছেই তো তেমন একটা পুজো হয়। যাবেন?"

অধিরাজ স্যার বায়োলজির লোক হলেও সাহিত্যটাহিত্য নিয়ে ওঁর ভারী উৎসাহ আছে। ওঁর বাড়িতে পড়ার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটাই তো একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি। গল্পের বইয়ে একদম ঠাসা। তাই স্যারের যে এ প্রস্তাবটা মনে ধরবেই, এটা জারুল মোটামুটি আন্দাজ করেই ফেলেছিল। জমিদারবাড়ির পুজো শুনে ঝিলও কলকল করে উঠল

উৎসাহে, "ওয়াও! আমি এর আগে কখনও কোনও রাজবাড়ির পুজো দেখিনি।"

তার পর জারুলের দিকে ঘুরে ও জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তুই জানলি কী করে যে, এখানে জমিদারবাড়ির পুজো হয়?"

জারুল হেসে বলল, "ওই হেরিটেজ জমিদারবাড়িটার পিছনের পাড়াতেই যে আমার মাসির বাড়ি তাই। তা ছাড়া ওখানে কলাবৌ স্নানের উৎসবটাও অন্যান্য বারোয়ারি পুজোর মতো অত সাত-সকালে হয় না। আমরা এখনই ওখানে পৌঁছলে সম্ভবত ওদের ট্র্যাডিশনাল কলাবৌ স্নানের দৃশ্যটাও দেখতে পেয়ে যাব।"

সবাই তখন হইহই করে রাজবাড়ির পুজো দেখতে পা বাড়াল। আর জারুল মনে-মনে এই ভেবে খুশি হল যে, ঝিলিকের সরল সাদাসিধে মনটা ক্রমশ ওর প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে উঠছে। ঝিলিক আজ যত জারুলের প্রতি তুষ্ট হয়, ততই তো জারুলের লাভ! ঝিলকে আজকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে আরও একটু গাঢ় বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধতে পারলে, তবেই তো জারুল ওর তদন্তের কাজকে গুটিয়ে আনতে পারবে!

জমিদারবাড়ির আটচালায় কলাবৌ স্নানের কয়েকটা ফটো নিতে পেরে অধিরাজ স্যর রীতিমতো আপ্লুত এখন।

তাই জমিদারবাড়ি ছেড়ে আবার পথে নামার পর স্যর ওদের হাত-মুখ নেড়ে দারুণ উৎসাহের সঙ্গে বোঝাচ্ছিলেন, এই সব ঐতিহ্যবাহী পুজোর ফটোগুলো ঠিকঠাক সাদা-কালো এফেক্ট দিয়ে ক্যালেন্ডারের বিন্যাসে সাজাতে পারলে, কেমন চমৎকার একটা ব্যাপার হবে।

স্যরের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে ওরা সকলেই অধিরাজ স্যরের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল। কিন্তু তার ফাঁকেই জারুলের সতর্ক দৃষ্টি লক্ষ্য করল, পয়ার আবার পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে হেডফোনের ইয়ার-বাডটা কানে গুঁজতে-গুঁজতে ওদের থেকে কয়েক কদম পিছিয়ে পড়ল। জারুল স্যরের পাশ না-ছাড়লেও নিজের কানদুটোকে যথা সম্ভব এই জনবহুল পুজোর রাস্তাতেও পিছন ফিরিয়ে শুনতে পেল, পয়ার খুব নিচু গলায় কাউকে আবার খবর দিচ্ছে, "ম্যান্টনের দিকেই হাঁটা শুরু করেছি।"

এটা ঠিকই যে ওরা এখন চওড়া ডায়মন্ড হারবার হাই রোডের বাঁ ফুটপাত ধরে বেহালা চৌরাস্তার দিকে হাঁটছে, আর চৌরাস্তায় পৌঁছনোর আগেই ম্যান্টনের মোড়টা পড়বে।

এই ম্যান্টন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার প্রস্তাবটা একটু আগে পয়ারই দিয়েছে। না হলে স্যর তো আবার সকলকে নিয়ে অটোতেই উঠতে চাইছিলেন। কিন্তু পয়ার বলল ওই ম্যান্টন মোড়ে ওর কে এক জন আত্মীয় থাকে, যার সঙ্গে নাকি আজ ওকে এক বার দেখা করতেই হবে!

পয়ারের এই ব্যাপারটা কেমন যেন জোর করে মিথ্যে বলা বলে মনে হচ্ছে জারুলের। তার পর আবার এই রহস্যময় ফোন-কল... কিছুতেই কিছুর হিসেব মেলাতে পারল না জারুল।

পয়ারের কেসটা ঠিক কী? সঙ্গে যেখানে অধিরাজ স্যরের মতো এক জন গুরুজন রয়েছে, যেখানে ওরা বন্ধুরা মিলে এক সঙ্গে আনন্দ করে ঘুরতে বেরিয়েছে, সেখানে পয়ারের এই লুকোচুরি খেলাটায় মনটা বড়ই খচখচ করে উঠল জারুলের।

তাই না চাইতেও জারুলের ভুরুদুটো দুশ্চিন্তায় দ্বিতীয় বন্ধনী হয়ে উঠল। আর সেই সঙ্গে ওর মনটা কেবলই কু-ডেকে উঠল। পয়ারের এই রহস্য-ফোনের সঙ্গে যদি ঝিলের বিপদের কোনও যোগ থাকে! তা হলে যে ওর এত কষ্ট করে সাজানো সব প্ল্যান পুরো বরবাদ হয়ে যাবে!

জারুল নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। সামনের রোদে পুড়ে যাওয়া রাস্তাটা এখন ওর কাছে একটা কালো ধোঁয়াশার মতোই ঝাপসা লাগছে। ম্যান্টন মোড়ের কাছে পৌঁছতে না-পৌঁছতেই হঠাৎ পাশের সরু গলিটা থেকে একটা ক্রিমরঙা গাড়ি হুস করে বেরিয়ে এসে ঠিক ওদের সামনেটাতেই ব্রেক কষল।

ওরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়ির কালো কাচ নামিয়ে এক জন ঝাঁকড়া চুলের যুবক মুখ বাড়াল, "পয়ার! কুইক! ওকে গাড়িতে তুলে দে।"

রুক্ষ চেহারার যুবকটির চাবুকের মতো নির্দেশটা পেয়েও পয়ার কিন্তু কাঠের পুতুলের মতোই রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। এক পাও নড়ল না।

গাড়ির ছেলেটিই তখন ওই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হুট করে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসে পয়ারের বুকে সজোর ধাক্কা মারল। পয়ার ছিটকে ফুটপাতের উপর পড়ল। তার পর ছেলেটি হ্যাঁচকা টানে ঝিলের রোগা-পটকা শরীরটাকে তুলে নিয়ে গাড়ির সিটের মধ্যে আছাড় মারল। এক লাফে সামনের সিটে উঠে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘটনাটা এতটাই ঝড়ের বেগে ঘটে গেল যে, স্যর, আবহ বা জারুল, কেউই কিছু করে ওঠার ফুরসত পেল না। এমনকি পথচলতি লোকেরা পর্যন্ত দৌড়ে আসার সময় পেল না। হতভম্ব জারুল কেবল ওই চলন্ত গাড়ির মধ্যে থেকে ঝিলের আর্ত চিৎকারটাই শুনতে পেল, "স্যর! জারুল! আবহ! পয়ার!... এ সব কী হচ্ছে? আমাকে তোরা বাঁচা!"

গাড়িটা চোখের সামনে থেকে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগেই জারুল টের পেল ওর চশমার কাচ দুটো ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। ওর জীবনের প্রথম তদন্তের কাজ এখন ওই ঝাপসা হয়ে আসা কুয়াশার মধ্যেই, হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ...

ফ্ল্যাশব্যাক ২

গড়িয়াহাটের কাছেই একটি বিলাসবহুল পাড়ায় ঝাঁ-চকচকে নতুন বহুতল। 'মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্ট'। তারই আট তলায়, 'বোস ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি'-র অফিসটা খুঁজে পেতে খুব বেশি কষ্ট করতে হল না জারুলকে। আড়ষ্ট পায়ে কাচের দরজাটা ঠেলে ভিতরের নরম কার্পেটটায় পা ডোবাতেই, চার দিকের কনকনে ঠান্ডায় জারুলের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ঠিক তক্ষুনি সামান্য দূরে বসা রিসেপশন টেবিলটার পিছন থেকে একটি মেয়ে ঠোঁটে প্লাস্টিক-হাসি ঝুলিয়ে জারুলকে বলে উঠল, "কী সাহায্য করতে পারি বলুন?"

জারুল তখন কাঁপা-কাঁপা হাতে চড়া মেকআপ করা মেয়েটির দিকে ইন্টারভিউয়ের কল-লেটারটাকে বাড়িয়ে দিল।

মেয়েটি কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়েই এক-ঝলক কাগজটায় চোখ বোলাল। তার পর জারুলকে এক বার আপাদমস্তক মেপে নিয়ে, পাশে রাখা ইন্টারকমে ডায়াল করল। নিচু গলায় সামান্য বাক্যালাপের পর মেয়েটি আবার মুখের সেই মেকি হাসিটাকে ফিরিয়ে এনে বলল, "স্যর, তোমার, আই মিন, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন।"

কথাটা বলেই হাত তুলে পাশের দিকের একটা বন্ধ দরজার দিকে ইঙ্গিত করল রিসেপশনিস্ট মেয়েটি।

সাদা বন্ধ দরজাটার দিকে ধুকুপুকু বুকে এগিয়ে গেল জারুল। জীবনের প্রথম চাকরির ইন্টারভিউ। তার উপরে জারুলের এখনও চাকরি করার বয়স হয়নি। শুধু ছোটবেলা থেকে গোয়েন্দা হওয়ার শখ আর হঠাৎ করে এই গোয়েন্দা সংস্থার ইন্টারভিউর ডাক উপেক্ষা করতে না-পেরে ও এসে হাজির হয়েছে।

কিন্তু দরজাটার দিকে পা বাড়াতে-বাড়াতে আরও দুটো জিনিসে ভারী খটকা লাগল জারুলের। এক, এত বড় একটা অফিস খুলে বসে 'বোস ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি' শুধু ওকেই কেন ইন্টারভিউতে ডাকল? পরীক্ষায় তো অনেকেই বসেছিল ওর সঙ্গে। তাদের কাউকেই তো ও এখানে দেখছে না! আর কেউই পাশ করেনি নাকি? এটা কখনও হতে পারে? খটকা নম্বর দুই, এমন ঝকঝকে অফিসের যিনি মালিক, তিনি নিশ্চয়ই বেশ ব্যস্ত মানুষ হবেন। তা হলে তাঁর মতো এক জন হোমরাচোমরা বস, জারুলের মতো একটা পুঁচকে এবং অচেনা মেয়ের ইন্টারভিউয়ের জন্য কেন এত আগ্রহ নিয়ে বসে রয়েছেন?

এমন সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতেই জারুল দরজাটাকে সামান্য ফাঁক করে কাঁপা গলায় বলল, "মে আই কাম ইন?"

ভিতরের ঘরটা বেশ বড় এবং সুন্দর করে সাজানো। গোটা ঘরটাই

দুধ-সাদা। কোথাও এক কণা ময়লার দাগ নেই। চারদিকটা যেন হাতির দাঁতের মতো ঝকমক করছে। ঘরে কনকনে এসি-র হাওয়া বইছে। সেই পরিবেশে একটা গাঢ় নীল সুট ও চোখে সুন্দর সোনার ফ্রেমের চশমা আঁটা মধ্যবয়সি মানুষ ওর দিকে চোখ না-তুলেই সামনের চেয়ারটার দিকে হাত দেখালেন, "বোসো।"

জারুল রোবটের মতো পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে নিঃশব্দে বসে পড়ল। দেখে ল্যাপটপের স্ক্রিনটাকে নামিয়ে সরু করে ছাঁটা মরিচরঙা গোঁফ ও চকচকে করে কামানো গোল মুখের মানুষটি সামান্য হাসলেন। তার পর মাথার সামনের দিকের পাতলা হয়ে আসা চুলগুলোয় আলতো করে সোনার মোটা আংটি পরা আঙুলগুলো এক বার চালিয়ে নিয়ে বললেন, "আমি, অনিকেত বসু। আর তুমিই নিশ্চয়ই..."

জারুল তাড়াতাড়ি হাত দুটো জড়ো করে বলে উঠল, "জারুল। মানে, জারুল পাল। ক্লাস টুয়েলভে পড়ি।"

তড়বড়িয়ে টেনশনের মাথায় নিজের পরিচয়টা দিতে গিয়ে জারুল বুঝতে পারল ওর কথার শেষ অংশটুকু মুখ ফস্কে একটু কাঁচা-ই বেরিয়ে গিয়েছে।এখানে ওর বয়স বা ক্লাসের খতিয়ানটা দেওয়াটা ডাহা এক খানা বোকামি হয়ে গেল।

মধ্য-পঞ্চাশের অনিকেত বসু ওর কথা শুনে মৃদু হাসলেন। তার পর নিজের রিভলভিং চেয়ারটায় হালকা দোল খেয়ে বললেন, "তোমার মাথাটা যে পড়াশোনায় বেশ শার্প, তা তোমার প্রবেশিকা পরীক্ষাটার পারফরমেন্স দেখেই বুঝেছি। না হলে এত ছোট বয়সে তোমার মতো একটা মেয়ের পক্ষে ওই উত্তরগুলো করা বেশ টাফ ছিল। গুড! কিন্তু আমি যেটা বুঝতে চাইছি সেটা হল, তুমি কি মন-প্রাণ থেকেই গোয়েন্দা হতে চাও? দ্যাখো, শুধু গোয়েন্দা গপ্পের পোকা হয়ে ইনভেস্টিগেশন লাইনে আসার স্বপ্ন দেখাটা কিন্তু আদতে বোকামি। কারণ গল্পের গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে বাস্তবের তদন্তের বিস্তর ফারাক রয়েছে।"

একটু থেমে ভুরুটা সামান্য তুলে অনিকেত হঠাৎ ওকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাই দ্য ওয়ে, তুমি এই ইন্টারভিউটায় আসার আগে, বাড়ির লোকের পারমিশন নিয়ে এসেছ তো?"

ও তোতলাতে-তোতলাতে কোনও মতে বলল, "আমার মা নেই, স্যর। আর বাবা তো শহর থেকে দূরে ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। তাই আর কাউকে ঠিক..."

জারুল মাঝপথেই মিয়োনো মুড়ির মতো চুপসে থেমে গেল।

অনিকেত বসু কথাটা শুনে ওর মুখের দিকে কিছু ক্ষণ নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর চেয়ার-সমেত টেবিলের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, "তা হলে বুঝতে হবে, নিজের প্যাশনে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা তুমি নিজে-নিজেই নিয়েছ। রাইট? তোমার এমন আত্মবিশ্বাস দেখে ভাল লাগল।"

তার পর আবার ভুরুটাকে কুঁচকে তিনি বললেন, "কিন্তু মাই ডিয়ার লিট্‌ল লেডি, সব তো আর ওই লিখিত পরীক্ষা নয়। তদন্তের আসল কাজ তো ফিল্ডে নেমে করতে হবে। রাস্তা-ঘাটে রোদে-জলে ঘুরে-ঘুরে প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে আবার জীবনের ঝুঁকিও থাকতে পারে..."

জারুল খুব আশা নিয়ে অনিকেতের চকচকে মুখটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন ও আবার ওর আলো ফুরিয়ে আসা মুখটাকে মাটির দিকে নামিয়ে নিল। অনিকেত কিন্তু থামলেন না। মৃদু হেসে বললেন, "কিন্তু আমি তোমাকে একটা সুযোগ দেব!"

দপ করে আবার মুখটা উঁচু করল জারুল।

অনিকেত বললেন, "তোমার কনফিডেন্স আর বুদ্ধি, এ দুটোই আমার ভাল লেগেছে। তাই তোমাকে আমি আপাতভাবে সহজই একটা কাজ দেব এখন। তাই-ই তোমাকে এখানে আজ ডেকেছি। এটা

ঠিক কোনও তদন্তের বিষয় নয়। তবে এতে যে চ্যালেঞ্জ কম কিছু আছে, তেমনও কিন্তু নয়। এই কাজটা যদি তুমি ঠিকঠাক করে দিতে পারো, তা হলে উচ্চ-মাধ্যমিকের পর তোমাকে এই 'বোস ইনভেস্টিগেশন'-এর তরফ থেকে আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিদেশে ফরেন্সিক সায়েন্স পড়তে পাঠাব। আর তখন তোমার বাবার কাছ থেকে অনুমতি-টনুমতিগুলোও আমিই না হয় চেয়ে নেব কেমন?"

অনিকেত বসুর শেষের কথাগুলো শুনেই আনন্দে-উচ্ছ্বাসে জারুলের চোখদুটো যেন উপচে উঠতে চাইল। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে আবার সোজা হয়ে বসল জারুল। মনের মধ্যে হঠাৎই এই সময় মায়ের মুখটা ভেসে উঠল ওর। সেই ছোটবেলায় দেখা মা... পাড়ার প্যান্ডেল থেকে সিঁদুর খেলে হাসতে-হাসতে ফিরছিল। জারুল তখন কত্ত ছোট। অথচ মায়ের সেই হাসিমুখটা ওর এখনও কী জীবন্ত বলে মনে হয়! কেন যে হঠাৎ এই সময় মায়ের ওই রূপটাই ওর মনে পড়ে গেল, তা বুঝে উঠতে পারল না জারুল।

অনিকেত বসু গম্ভীর গলায় আবার বলে উঠলেন, "তা হলে ধরে নিচ্ছি তুমি রাজি। কী তাই তো?"

জারুল আর মুখে এ ব্যাপারে কী বলবে? ও তাই বোকার মতো একটা হাসল।

অনিকেত তখন গলাটা ঝেড়ে বললেন, "শোনো ইয়াং লেডি, এই সব ইনভেস্টিগেশনের কাজে ক্লায়েন্টের সমস্ত তথ্য কঠোরভাবে গোপন রাখাটাও কিন্তু এক জন পেশাদার গোয়েন্দার একটা মহৎ গুণ। আমি আশা করছি, এ ব্যাপারে তুমিও পূর্ণ পেশাদারিত্ব দেখাবে।"

জারুল শিরদাঁড়া সোজা করে বলল, "আমাকে ঠিক কী করতে হবে, সেটা বলুন, প্লিজ়।"

অনিকেত বসু চেয়ারে মাথাটা হেলান দিয়ে বসে বললেন, "কাজটা এমন কিছুই নয়... একটি মেয়ে, তোমার বয়সিই হবে বোধ হয়। তাকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমার কাছে আনতে হবে। আমার ওর কাছে একটু ক্ষমা চাইবার আছে..."

জারুল পাক্কা গোয়েন্দার মতো ভুরু কোঁচকাল এবার, "কোন মেয়ে? কিসের ক্ষমা? আমি ঠিক বুঝলাম না, স্যর।"

অনিকেতবাবু এ বার একটু যেন বিমর্ষ গলায় বলে উঠলেন, "মেয়েটির ডাকনাম, ঝিল। ভাল নাম সম্ভবত ঝিলম। বাকি ঠিকানা আর ডিটেলস তুমি রিসেপশনের রোমিতার কাছে পেয়ে যাবে।"

হঠাৎ অনিকেত বসু এগিয়ে এসে জারুলের হাতদুটো শক্ত করে চেপে ধরে আর্দ্র গলায় বলে উঠলেন, "ওই মেয়েটিকে এক বার আমার মুখোমুখি এনে দিতে পারবে তুমি? ওর কাছে রিয়েলি একটা বিষয়ে ক্ষমা চাওয়ার আছে আমার। অনেক দিন ধরে আমি বুকের মধ্যে একটা বিবেক-দংশনের পাথর বয়ে বেড়াচ্ছি। ওকে সব কিছু খুলে বলে আমি সেই দায়টা থেকে মুক্ত হতে চাই।"

সংলাপের শেষে এসে অনিকেত বসুর গলাটা রীতিমতো কেঁপে গেল। অনিকেত চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন। তার পর পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখদুটো মুছলেন।

ব্যাপারটা দেখে একটু অস্বস্তিতেই পড়ে গেল জারুল। এমন কেউকেটা গোছের মাঝবয়সি এক জন মানুষ যদি ওর সামনে হঠাৎ এমন করে কেঁদে ওঠেন, তা হলে ঠিক কী করা বা বলা উচিত, ভেবে পেল না জারুল।

একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে জারুল একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করল, "কী ব্যাপারে আপনি ওই মেয়েটির কাছে ক্ষমা চাইতে চাইছেন, সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন কি?"

অনিকেত এই প্রশ্নটা শুনে প্রথমটায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। তার পর নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বললেন, "ওই মেয়েটির মনে আমার সম্পর্কে বেশ কিছু ভুল ধারণা বাসা বেঁধে রয়েছে দীর্ঘ কাল ধরে। ও আমাকে, এমনকি আমার নামটাকে পর্যন্ত এত ঘৃণা করে যে, সোজা পথে আমি কখনওই ওর মুখোমুখি হতে পারছি না। তাই তো ঘুরপথে তোমার সাহায্য চাইছি। ও যদি এক বার আমার মুখোমুখি হয়, এক বার আমি যদি ওকে আমার তরফের কথাগুলো মন খুলে সব বলতে পারি, তা হলেই এ সমস্যার সমাধান হবে। যখন আমি ওর কাছে কনফেস করব, তখন তুমিও না-হয় এ ঘরে থাকবে এক জন নিরপেক্ষ সাক্ষী হয়ে। তখনই শুনে দেখো সবটা। এখন আর ওই ডিটেলসে আমি যেতে চাই না।"

অনিকেত কথা শেষ করে জারুলের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে তাকালেন।

জারুল অনিকেতের সামনের চেয়ারটা থেকে উঠতে-উঠতে নরম গলায় বলল, "আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব, স্যর।"

অনিকেত স্মিত হাসলেন, "গুড উইশ অ্যান্ড গুড লাক!"

জারুলও "থ্যাঙ্ক ইউ" বলে পিছন ফিরে চলে আসতে-আসতে মনে-মনে ভাবল, জীবনের প্রথম তদন্তের কাজটা যে এই রকম অদ্ভুত কিছু হবে, এটা ও স্বপ্নেও আশা করেনি।

সত্যি, বাস্তবের গোয়েন্দাগিরি কতটা আলাদা! এ বার সত্যি-সত্যিই তা হলে ও বড় হয়ে গেল!

॥ ৩ ॥

ঝিলমের কথা।

সারা দিন রাত একঘেয়ে বর্ষায় মতো মায়ের এই ঘিজঘিজ আর পিটপিট কিছুতেই যেন সহ্য হয় না ঝিলের। মা যেন দুনিয়ার যত ক্ষোভ, বাজারের ঊর্ধ্বমুখী দাম-দর, ওদের সংসারের অভাব, বাড়িওয়ালার দুর্ব্যবহার, কাজের লোকের নিত্য দিনের কামাই, এ সব কিছু ঝামেলার এক সঙ্গে শোধ তুলতে চায় শুধু ওকেই বকে আর ধমকে।

মায়ের মুখে-মুখে তর্ক-ঝগড়া করার মতো মেয়ে নয় ও। তাই ঝিল মুখ বুজে মায়ের সব টক-ঝাল-তেতো কথাগুলো সহ্য করে নেয়। কিন্তু যখন ও আর কিছুতেই পেরে ওঠে না, তখন ওরও চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। অথচ এ সবের জন্য মাকে খুব বেশি দোষ দেওয়াও যায় না। সেই কত দিন আগে থেকে সংসারের যাবতীয় চাপ সামাল দিয়ে ওকে একা-হাতে মানুষ করেছে মা। ঝিলের যখন মাত্র ন' বছর বয়স তখন একটা বিচ্ছিরি দুর্ঘটনায় হঠাৎ বাবার মৃত্যু হয়। আর সেই থেকে মা সম্পূর্ণ একা ওকে ঠিক করে মানুষ করে তোলার এই কঠিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

'বাবা' বলতে একটা ফরসা-লম্বা মানুষের হাসিখুশি মুখের আবছা অবয়বই কেবল মনে পড়ে ঝিলের। অনেক ছোটবেলায় ওকে কোলে করে ব্যারাকপুরের ফ্যাক্টরিতে বিশ্বকর্মা পুজো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। মনে আছে, বাবা সেদিন নিজে হাতে ওকে ভোগের খিচুড়ি খাইয়ে দিয়েছিল...

বাবাদের একটা কাপড়ের মিল ছিল ব্যারাকপুরে। এক বার সেই মিলে শ্রমিক অসন্তোষ ঠেকাতে গিয়ে বাবার গায়েই বোমা ছুড়েছিল দুষ্কৃতীরা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই সব শেষ। জনরোষের ব্যাপার বলে পুলিশও খুব তাড়াতাড়ি কেসটাকে ধামাচাপা দিয়ে দেয়। ঘটনাটায় কেউ আর ধরা পড়েনি। অর্থাৎ ঝিলের বাবা খুনই হয়েছিলেন। খবরের কাগজের ভাষায় 'নৃশংসভাবে হত্যা'।

কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে ঝিলদের সঙ্গে প্রায় সব আত্মীয়স্বজন সম্পর্ক শীতল করে দেন। এখন আর বিশেষ কারও সঙ্গে ওদের কোনও যোগাযোগ নেই। বর্তমানে দক্ষিণ শহরতলির একটা মধ্যবিত্ত পাড়ায় গলির একদম শেষতম বাড়িটার একতলায় ওরা মা আর মেয়ে, দু'জনে মিলে ভাড়া থাকে। তাও তো দেখতে-দেখতে ন'-দশ বছর হয়ে গেল।

মা বলে, "কেউ আমাদের মুখ দেখতে চায় না বলে, আমার কোনও খেদ নেই রে। তুই লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমার মুখ উজ্জ্বল করবি এক দিন। এইটুকু আশা নিয়েই তো আমি বেঁচে রয়েছি।"

মায়ের এই কথাগুলো পাঁজরের হাড়ে কেমন যেন দোলা দিয়ে যায় ঝিলের। তাই তো ও দাঁতে দাঁত চেপে লেখাপড়াটা চালিয়ে যেতে চায়। বাবার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ছিল ঠিকই, কিন্তু ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বিশেষ কিছু ছিল না মারা যাওয়ার সময়। ব্যবসাতেই সম্ভবত বেশির ভাগ টাকা লগ্নি

করে গিয়েছিল বাবা। বাবা কী ছাই নিজেই জানত, এ ভাবে হঠাৎ পৃথিবী ছেড়ে দুম করে এক দিন অসময়ে চলে যেতে হবে!

তাই বাবার মৃত্যুর পরে-পরই মা ওকে নিয়ে দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তখন ঝিলও অনেক ছোট। সবে থ্রি থেকে ফোরে উঠতে চলেছে। বাবা সোনারপুরের দিকে এক কাঠা জায়গা কিনে রেখে গিয়েছিল। সেই জমিটাকে বেচে, তার টাকা ব্যাঙ্কে রেখে, সেই সুদেই মোটামুটি তার পর কয়েক বছরে এই ভাড়াবাড়ি আর ঝিলের লেখাপড়ার খরচ টেনেটুনে চালিয়ে গিয়েছে মা। তার পর থেকেই মা এই ছোটখাটো খাবার হোম-ডেলিভারির ব্যবসাটা শুরু করেছিল।

মায়ের রান্নার হাতটা বরাবরই ভাল। এখন এখানকার ফ্ল্যাটগুলোয় অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। মেসে থাকে আই টি-তে চাকরি করা ছেলেরা। কিছু কলেজের ছাত্র। সবাই দু' বেলা মায়ের রান্না খাবার ডেলিভারি নেয়। মা সকাল-সকাল রান্না করে দেয়, যে-যেমনটা পছন্দ করে। তার পর ওদের চেনা রিকশাওয়ালা বিষাণদা, সে-ই খাবার দরজায়-দরজায় সময়মতো পৌঁছে দিয়ে আসে।

এই সূত্রেই পয়ারদের পাশের বাড়ির দাদু-দিদাকে পাতলা ঝোল-ভাত ডেলিভারি দিতে গিয়েই ঝিলের মায়ের সঙ্গে পয়ারের মায়ের ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে। ওদিকে আলাদা বোর্ড হলেও পয়ার আর ঝিল যেহেতু একই ক্লাসে পড়ে, তাই ফিজ়িক্স-কেমিস্ট্রি সব টিউশনগুলোই দু'জনে এক সঙ্গে ওরা পড়তে যেত। সেই নাইন-টেন থেকে। সেই থেকে আবার পয়ার আর ঝিলের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে এ কয়েক বছরে।

বেঁচে থাকতে বাবা এক নামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ঝিলকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। এত বছর ধরে সেই স্কুলের বিপুল খরচ জোগাতে মাকে যে কী হিমশিম খেতে হয়েছে ঝিল ভাল করেই জানে! কিন্তু আজ একটু বড় হওয়ার পর ঝিল এটা বুঝতে পারে যে, ইংরেজি মাধ্যমের দামি স্কুলে পড়াটাই জীবনে বড় কথা নয়। আসল কথাটা হল, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে পড়াশোনার পিছনে দারুণ ভাবে খেটে যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও দ্বিতীয় বিকল্প পথ নেই।

পয়ার একটি আদ্যন্ত ভাল ছেলে। অন্তত অধিরাজ স্যর বা ঋষিণ স্যরদের মতামত তো সেই রকম। এই জন্য ঝিল পয়ারের সঙ্গে মনে-মনে সব সময় একটা কম্পিটিশন অনুভব করে। কারণ ও-ও তো দাঁতে দাঁত চেপে ভাল করে লেখাপড়াটাই করতে চাইছে। আরএই একটা ব্যাপারে পয়ার আর ওর মধ্যে সবচেয়ে বড় সাদৃশ্য হল, ওরা দু'জনেই দুটো অভাবী পরিবারের মধ্যে থেকে বাবা-মায়েদের হাড়-ভাঙা স্ট্রাগল চোখের উপর দেখতে-দেখতে বড় হচ্ছে। তাই এত বাধা, এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পয়ার যদি নিজের লেখাপড়াটাকে ঠিক করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তা হলে ওই বা পারবে না কেন? মনের কোনায় এই আগুনটাকে সব সময় উস্কে রাখার চেষ্টা করে ঝিল।

মোটা ফিজ়িক্স বইটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতেই ঝিল শুনতে পেল, ঘুপচি রান্নাঘরটায় বঁটিতে পেঁয়াজ কুচোতে-কুচোতে মা এক-মনে গজগজ করেই চলেছে। কিন্তু এ নিয়ে ঝিল আর নতুন করে মাথা ঘামাল না। আস্তে-আস্তে বইটা মুড়ে রেখে ও রান্নাঘরের দরজায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল। নরম গলায় বলল, "ও মা, অধিরাজ স্যর কি তোমাকে ফোন করেছিলেন?"

কথাটা শুনেই রীতিমতো চিড়বিড়িয়ে উঠে মা বলল, "করেননি আবার! আমার নবাব-নন্দিনীর বন্ধুদের সঙ্গে ডানা ঝাপটে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার শখ হয়েছে... তা বলি, গত পরীক্ষায় ফিজ়িক্স আর অঙ্কে তুমি যে দুর্দান্ত রেজ়াল্টটা করেছ, সেটা অধিরাজ স্যর জানেন তো?"

এই কথাটা শুনেই ঝিল রান্নাঘরের সামনে থেকে ছিটকে সরে এল। এই মা'র এক দোষ! সবেতে ওকে খোঁচা দেওয়া। ও কি ইচ্ছে করে ফিজ়িক্স আর অঙ্ক পরীক্ষায় ডুবিয়েছে নাকি? দুটো বিষয়ই দিন-কে-দিন যা খিটকেল হয়ে ওর গলা টিপে ধরছে, তাতে ও কিছুতেই যেন থৈ পেয়ে উঠতে পারছে না।

মায়ের ঝাড় খেয়ে তাই চোখ দুটো ছলছল করে উঠল ঝিলের। ঝিলের প্রিয় বিষয় জীববিদ্যা। অধিরাজ স্যরের কাছে সেই ক্লাস এইটে ও যখন প্রথম টিউশন পড়তে ভর্তি হয়েছিল, তখন জীববিদ্যাতেও খুব কম নম্বর পেত।

কিন্তু অধিরাজ স্যরের পড়ানোয় এমনই একটা জাদু আছে যে, দিনে-দিনে জীববিদ্যা বিষয়টাতেই ঝিলের মূল ঝোঁকটা এসে পড়েছে।

স্যর যেন এই বিষয়টায় ওর ভিতটাকে একদম হাতে ধরে তৈরি করে দিয়েছেন।

ঝিলের তাই মনে-মনে খুব ইচ্ছে ও বড় হয়ে অধিরাজ স্যরের মতোই এক জন ভাল জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক হবে।

সব্জি কেটে হাত ধুয়ে আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে মা এ ঘরে এল।

ঝিল গোঁজ হয়ে বসেছিল। এখন মা'র দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভেজা-গলায় বলল, "তুমিই তা হলে স্যরকে ফোন করে বলে দাও, আমি কোথাও যাবটাব না।"

মা ওর কথাটা শুনতে-শুনতে জলের বোতল খুলে গলায় ঢাললেন। তার পর বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে হঠাৎ ঝিলের থুতনিটা ধরে আদর করে বললেন, "পুজোআচ্চার দিনে তুই মুখ ভার করে ঘরের মধ্যে বসে থাকবি, সেটাও কি ভাল দেখায় রে? তার চেয়ে তুই বরং মাসিদের দেওয়া নতুন চুড়িদারটা পরে স্যরের সঙ্গে ঘুরেই আয়। তুইও তো বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করার বিশেষ সুযোগ পাস না..."

ঝিল, মায়ের এই শেষ কথাগুলো শুনে প্রথমটায় কেমন যেন হতভম্বের মতো হয়ে গেল।

তার পর উঠে এসে মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে মা'র গালে গাল ঠেকিয়ে আদুরে গলায় বলল, "তুমি যাবে? তুমিও চলো না, মা, আমাদের সঙ্গে। তোমারও তো কোথাও কখনও ঘুরতে যাওয়া হয় না।"

মা হেসে বলল, "ধুর পাগলি! আমি এই হাঁটুর ব্যথা নিয়ে ভাল করে হাঁটতেই পারি না, আমি আবার কোথায় যাব? তুই যা, ঘুরে আয়," তার পরেই মুখটাকে সিরিয়াস করে বলল, "তবে হ্যাঁ, সব সময় স্যরের পাশে-পাশে থাকবে তুমি। হুটহাট এ-দিকে ও-দিকে চলে যাবে না। আর রাস্তার উল্টো-পাল্টা খাবার খাওয়ারও কোনও দরকার নেই। কেমন?"

মা বকতে-বকতে আবার রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। আর ঝিল পদার্থবিদ্যার বইটাকে সরিয়ে দিয়ে কানে হেডফোন গুঁজে দিল। এবার মা যা বকবক করছে সেটাকে এডিট করে দেওয়াই যায়! মা ভাবছে ও এখনও সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুটাই রয়ে গেছে বুঝি। ও রাস্তায় নাকি স্যরের হাত ধরে-ধরে হাঁটবে। হঠাৎ ঝিলের মাথায় একটা সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা ঝিলিক মেরে উঠল। ও তাড়াতাড়ি কান থেকে হেডফোনটাকে টেনে খুলে গলা তুলে বলল, "আচ্ছা মা, গড়িয়াহাটার দিকে মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্টটা কোথায় হবে তুমি জানো?"

মা, ওর প্রশ্নটা শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়ালেন, "কই, তেমন তো কিছু চিনি না। কেন রে? কী আছে ওখানে?"

ঝিল তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আলতো করে মিথ্যেটা বলে দিল মাকে, "তেমন কিছু নয়। ওই পয়ার বলছিল, ওই অ্যাপার্টমেন্টের আট তলায় নাকি জয়েন্ট ও অন্যান্য কমপিটিটিভ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য একটা ভাল কোচিং সেন্টার খুলেছে। যাই হোক, আমি তো আর জয়েন্টে-ফয়েন্ট দিচ্ছি না, তবু একটু খোঁজখবর নিচ্ছিলাম আর কী...!"

মহাসপ্তমী

দূরের প্যান্ডেলে ঢাক বাজছে। সঙ্গে মনখারাপ করা সানাইয়ের সঙ্গত। আজ রোদটাও উঠেছে পুরো ঝকঝকে। যদিও হাওয়ায় একটু-একটু শিরশিরে ভাব।

ঝিল একফোঁটাও দেরি করল না। চটপট স্নান-টান সেরে বেরিয়ে দেখল ঘড়িতে প্রায় সাড়ে-আটটা বাজতে চলেছে।

মা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "অ্যাই শোন, পয়ার এলে বসতে বলবি। আমি তোদের দু'জনকেই গরম-গরম লুচি আর আলু-চচ্চরি খাইয়ে তবে পাঠাব।"

পয়ারকে ডেকে এনে মায়ের লুচি খাওয়ানোর কথাটা শুনেই ঝিলের গা-পিত্তি পুরো জ্বলে উঠল। এই মা'র এক আদিখ্যেতা! পয়ারকে সব সময় ওর চেয়ে ভাল ছাত্র বলে। ওকে দেখিয়ে-দেখিয়ে তোয়াজ তো করবেই, আবার আজ বেরোনোর সময় মা নিশ্চই পয়ারকে ডেকে বলবে, ''দেখিস বাবা, মেয়েটাকে আমার একটু চোখে-চোখে রাখিস তুই। ও তো রাস্তাঘাট কিছু চেনে না।''

পয়ারের সামনে ঝিলকে এই ভাবে কচি খুকি বানিয়ে অপমান করলে মায়ের উপর বড্ড রাগ ধরে ঝিলের। তা ছাড়া পয়ারকে এই ভাল ছেলের তকমা দিয়ে-দিয়ে ফুলিয়ে ফানুস করে মা যে কী আনন্দ পায় ভগবানই জানেন! অথচ মায়ের এই অনর্থক পয়ারকে গাছে তোলার কোনও মানেই হয় না। কারণ শুধু ঝিল একা নয়, মায়ের চোখে ওই সরস্বতীর বরপুত্তুর পয়ারও কিন্তু এ বার ফিজিক্সের পরীক্ষায় যথেষ্ট কম নম্বরই পেয়েছে। কিন্তু পয়ারের ছন্দপতন তো মা দেখেও দেখতে পাবে না। অঙ্ক আর ফিজ়িক্সের যত কলঙ্ক সব শুধু ঝিলকে একাই যেন বয়ে বেড়াতে হবে চির কাল!

ড্রেসিং টেবিলের ভাঙা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ভিজে চুলটাকে ম্যানেজ করতে-করতে ঝিল যখন এ সব কথাগুলো মনে-মনে ভাবছে, ঠিক তখনই পয়ার ওদের দরজার বাইরে এসে হাঁক জুড়ল, "ঝিল, এই ঝিল! তুই রেডি তো?"

ঝিল একটা ব্যাপার ভেবে ভারী অবাক হচ্ছে, এ বার পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরোনোর জন্য, 'গুড়ু-গুড়ু' বয় পয়ারই সবচেয়ে বেশি যেন তৎপর। অথচ এইচ এসের আগে যখন আর মাত্র কয়েক মাস বাকি, তখন ব্রাহ্মী-শাকের শক্তিতে পুষ্ট পয়ারকুমারের এতটা উড়ু-উড়ু করাটা, ঠিক যেন ওর চরিত্রের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খেতে চাইছে না।

তা ছাড়া পয়ার আবার এ বার অধিরাজ স্যারের সঙ্গে বেরোনোর জন্য ওকেও খুব করে জোরাজুরি করে রাজি করিয়েছে। যেন ঝিল ঠাকুর দেখতে না-গেলে পয়ারেরও এবার গোটা প্যান্ডেল-হপিংটাই ফিকে পড়ে যাবে! আর ওই শয়তানটার ঝিলের প্রতি হঠাৎ এই বেশি-বেশি কেয়ার দেখানোটাকেই মা একেবারে হাতের চাঁদ করে লুফে নিয়েছে। মায়ের এখন তাই ইচ্ছে ঝিল যেন সব সময় পয়ারকে বড় দাদার মতো, পথেঘাটে মেনে চলে!

এ আবার কী কথা? পয়ার কেন ওর উপর এমন অযাচিত দাদাগিরি করবে? ও কি সত্যি-সত্যি ওর দাদা নাকি? ও-ও তো ঝিলেরই বয়সি একটা ছেলে, নাকি? কিন্তু এ সব সহজ যুক্তির কথা মাকে আর কে বোঝাবে? তা ছাড়া ওই জারুল বলে ওই সদ্য পরিচিত মেয়েটিও যেন ঝিলের পুজোয় বেড়াতে যাওয়াটা নিয়ে খুবই কনসার্নড।

সেদিন যখন অধিরাজ স্যারের ক্লাসে প্রথম ওই মেয়েটির সঙ্গে ওর আলাপ হল তখনই ঝিলের বেশ মিষ্টি লেগেছিল জারুলকে। জারুলই কিন্তু অধিরাজ স্যারকে পুজোর মধ্যে এক দিন বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম প্রস্তাবটা দিয়েছিল। তার পরই অবশ্য পয়ারও স্যারকে পটাতে নেমে পড়েছিল।

তার পর তো গত পরশু, মানে পঞ্চমীর রাত্তিরে, জারুলই ঋষিণ স্যারকেও প্রায় পেড়ে ফেলে বাধ্য করল এ অঞ্চলের আশপাশের বড় ঠাকুরগুলোকে ওদের দেখিয়ে আনতে। তখন পয়ারের পাশাপাশি জারুলও কিন্তু ঝিলকে আজকের পুজো দেখতে যাওয়ার প্ল্যানটায় বার বার করে আসার জন্য অনুরোধ করেছিল।

পয়ার আর জারুলের হঠাৎ ওকে নিয়েই এত মাতামাতি কেন সেটাই ভেবে পাচ্ছে না ঝিল। ও তো আর পয়ারের মতো লেখাপড়ায় পণ্ডিত নয় যে, ওর সঙ্গলাভ করে বন্ধুরা কেউ কৃতার্থ হয়ে যাবে! আর জারুল মেয়েটির সঙ্গে তো সবে, এই দু'দিন মাত্র ভাল করে কথা বলল ঝিল। তা হলে? তা ছাড়া এই গোটা পুজো-পরিক্রমার প্ল্যানটায় ঝিলের ঢুকে পড়াটা একটা নিছক অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। ও যদি অধিরাজ স্যারের কাছে সেদিন ওই অন্য ব্যাচের ক্লাসটায় ঠেকায় পড়ে পড়তে না যেত, তা হলে কি আর জারুল বা পয়ার কেউ ওকে এই ঘোরার প্ল্যানে এ ভাবে শামিল করত?

যাই হোক, আজ এই প্যান্ডেল-হপিংয়ের নামে মায়ের দৃষ্টি এড়িয়েই বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য রাস্তায় থাকাটার পিছনে ঝিলেরও একটা গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে! সেই টপ-সিক্রেট ব্যাপারটা ও কাউকেই এখন বলতে পারবে না! এমনকি ওই পাকা পয়ারটাকেও না। যদিও পয়ারের ঘাড় দিয়েই কাজটা উসুল করে নিতে হবে ওকে...

ঝিল জানে পয়ার ভাল ছেলে হলেও সাইকেলে করে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়। ফলে কলকাতার রাস্তাঘাট, অন্ধিসন্ধি ও মোটামুটি ভালই চেনে। তাই গড়িয়াহাটের কাছে ওই 'মণিকর্ণিকা' অ্যাপার্টমেন্টটাও ও নিশ্চয়ই ভালই চিনবে। তা ছাড়া ওই চত্বরে একটা বেশ বড় পুজোও হয়। অধিরাজ স্যারের সঙ্গে ঠাকুর দেখে ফেরার পথে যে করেই হোক পয়ারকে রাজি করিয়ে গড়িয়াহাটের ওই চত্বরটায় এক বার গিয়ে পৌঁছতেই হবে ঝিলকে। 'মণিকর্ণিকা'র সঠিক ঠিকানা জেনে আসতে পারলে তবেই তো ঝিল বুঝতে পারবে, ওর বাবার মৃত্যুর পিছনে আসলে কার কালো হাত ছিল!

উফ্‌ফ, পয়ারটা কী গপগপ করে খেতে পারে রে বাবা! আর মা-ও যত পারছে লুচি ওর পাতেই চেপে-চেপে চাপিয়ে যাচ্ছে। দেখে গা-পিত্তি জ্বলে উঠল ঝিলের। এর পরও পয়ার সেদিনের প্ল্যান-প্রোগ্রামের সময়ই অধিরাজ স্যারকে জপিয়ে রেখেছিল, আজ দুপুরে ঠাকুর দেখার পর লাঞ্চে ওদের বিরিয়ানি খাওয়াতে হবে। ঝিলের অবশ্য বিরিয়ানি-টিরিয়ানি অত ফেভারিট নয়। ওর চাইনিজ়-ই বেশি ভাল লাগে। যাই হোক, ও তো আর বাইরে কিছু খেতে যাচ্ছে না! মা খুব করে বারণ করে দিয়েছে ওকে রাস্তাঘাটের জাঙ্ক ফুড একদম না খেতে।

সকাল ন'টা নাগাদ নতুন ময়ূররঙা চুড়িদারটার ওড়নাটাকে ঠিক করতে-করতে পয়ারের সঙ্গে স্যারের বাড়ির দিকে পা বাড়াল ঝিল। হাত ঘুরিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মাকে টা-টা করতেই, মা বিড়বিড় করে বলল, "দুগ্গা-দুগ্গা।"

সঙ্গে-সঙ্গে পাড়ার পুজোয় আবার ঢাকে কাঠি পড়া শুরু হয়ে গেল। পয়ার এত ক্ষণ বেশ চুপচাপ ছিল। রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে ও কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে হঠাৎ বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "ঠিক দশটার মধ্যে স্যারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে ভাল হয়।"

ঝিল, পয়ারের কথাটা শুনে একটা ফুট না-কেটে পারল না। বলল, "কোন যুদ্ধে যাবি যে, এত তাড়া তোর?"

তার পর ঝিল হেসে বলল, "দ্যাখ, গিয়ে হয়তো দেখবি স্যর এখনও ঘুম থেকেই ওঠেননি!"

পয়ার এ সব কথার উত্তরে কোনও টুঁ শব্দও করল না। বদলে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে আড় চোখে এক বার দেখে নিয়েই যন্ত্রটাকে আবার পকেটে চালান করে দিল।

সপ্তমীর সকাল হলেও পুজোমণ্ডপগুলোর আশপাশ ছাড়া বাকি রাস্তাঘাট এখনও বেশ ফাঁকা রয়েছে। চার দিকে ছুটির সকালের একটা সদ্য ঘুমভাঙা আবেশ যেন। রাস্তাটা ফাঁকা বলেই ঝিল এক বার আগে-পিছে দেখে নিয়ে পয়ারের গায়ের কাছে ঘেঁষে এসে নিচু গলায় বলল, "এই শোন, তুই গড়িয়াহাটার ওদিকে মণিকর্ণিকা বলে কোনও অ্যাপার্টমেন্ট চিনিস?"

পয়ার এত ক্ষণে অবাক চোখ তুলে তাকাল ঝিলের দিকে, "হ্যাঁ, ওই তো... মোড় থেকে সামনে গিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে একটু এগোলেই বড় কমপ্লেক্সে বাড়িটা। কেন রে?"

ঝিল তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ওই তো মাসি ওই ফ্ল্যাটটার কাছে কোথাও একটা ভাল দাঁতের ডাক্তার দেখিয়েছিল। এখন মা-ও ওখান থেকেই দেখাতে চায়। তাই আজ ফেরার পথে ডেন্টাল-ক্লিনিকটা একটু চিনে আসতাম, এই আর কী!"

"ফেরার পথে?" পয়ারের গলাটা যেন ফুটো বেলুনের মতো চুপসে এল। তার পর ও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ওখানে যেতে-করতে কিন্তু সন্ধে হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ও দিকেও কয়েকটা বড়-বড় ঠাকুর হয়। সপ্তমীর সন্ধেতে ওখানে ভিড় ফেটে পড়বে। বেশি সন্ধে হয়ে গেলে কাকিমা আবার রাগমাগ করবেন না তো?"

ঝিল পয়ারের এই শেষ কথাটা শুনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "মাকে ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তুই আমার সঙ্গে ওই দিকে আজ যেতে পারবি কি না, সেটা বল? ওই জায়গাটা আমার একবার চিনে আসাটা, খুউব দরকার রে..."

পয়ার ঝিলের এই কথাটার উত্তর করার আগেই সামনের বাঁকটা ঘুরতেই ওদের সঙ্গে জারুলের দেখা হয়ে গেল। জারুল ঝিলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি দিল। ঝিলও হাত নাড়ল, "হাই! স্যরের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিস তো?"

জারুল ঘাড় নেড়ে ওদের পাশে এসে পা মেলাল। জারুল মেয়েটা বেশ ভাল। এই দু'দিনেই ওর সঙ্গে খুব ভাল করে মিশে গেছে। তাই ঝিল আজকের এই পুজোর হুজুগে নতুন বন্ধু জারুলের সঙ্গে মন খুলে কথা বলা শুরু করে দিল। কিন্তু শত কথার মাঝখানেও ঝিল খেয়াল করল পয়ার কিন্তু জারুলকে দেখার পরই আবার নিজের মুখটাকে পাথরের মতো শক্ত করে নিয়েছে। পয়ার ওদের থেকে দু'কদম এগিয়ে গিয়ে আবার পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে, কী সব খুটুর-খুটুর করছে। লেখাপড়ায় 'ভেরিগুড' ছেলেটাও যে সারাদিন মোবাইলে কী এত চ্যাট করে, মাথায় ঢোকে না ঝিলের।

নিউ আলিপুরের বিখ্যাত সর্বজনীন দেখার পর মোড়ের মাথায় এসে অধিরাজ স্যর হাত তুলে একটা ফাঁকা অটোকে দাঁড় করালেন। অটোর মধ্যে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে ঝিল স্যরের দিকে ফিরে ঠোঁট ফোলাল, "সকাল থেকে আজ বড্ড হাঁটালেন কিন্তু, স্যর! সেই রাসবিহারী, চেতলা হয়ে এখন এই নিউ আলিপুর পর্যন্ত। আপনি এত ম্যারাথন হাঁটাবেন জানলে কিন্তু কিছুতেই আজ আসতাম না! এর পর আমি আর এত হাঁটতেটাটতে পারব না, বলে দিলাম! আর বেশি হাঁটলে, আমার এই নতুন চটিটা ছিঁড়ে যাবে।"

অধিরাজ স্যর সব সময়ই মজা করার মুডে থাকেন। তাই ঝিলের কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, "চটি যদি সত্যিই ছিঁড়ে যায়, তখন তুই না-হয় ডানা ঝাপটে উড়ে-উড়ে যাস! তোর যা লিকলিকে চেহারা, তাতে ওড়ার সময় যে-কেউ তোকে সাইবেরিয়ার কোনও রঙিন হাঁস ভেবে নির্ঘাত ভুল করবে।"

স্যরের কথা শুনে ঝিলের খুব রাগ হল। আর বাকিরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু এত সব কিছুর মধ্যে ঝিল আবারও যেটা খেয়াল করল, সেটা হল পয়ারের ওই চুপচাপ মুখচোরা আবহ বলে বন্ধুটা স্যরের এই কথাটা শুনে হাসলেও, পয়ার কিন্তু মুখটাকে সেই পাঁচন গেলার মতো করেই রাখল। ঝিল কিছুতেই বুঝতে পারল না, যে-ছেলে দু'দিন আগেও আজকের এই ঠাকুর দেখতে যাওয়াটা নিয়ে এত নাচানাচি করছিল, সে হঠাৎ আজ সপ্তমীর জমজমাট সকালে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েও এমন রামগরুড়ের ছানা হয়ে রয়েছে কেন?

অধিরাজ স্যর ফটোগ্রাফি ভালবাসেন। তাই বেহালার কাছে একটা জমিদারবাড়িতে ঢুকে ঐতিহ্যবাহী কলাবৌ স্নানের কয়েকটা বিরল দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে পেরে স্যর এখন রীতিমতো উচ্ছ্বসিত।

স্যর ক্যামেরাটাকে গলায় ঝুলিয়ে হাত-মুখ নেড়ে ওদের তখন ফটো তোলার টেকনিক খুব করে বোঝাচ্ছেন। আর ওরা স্যরের কথা শুনতে-শুনতে বড় রাস্তাটার ফুটপাত ধরে ম্যান্টন না কোন একটা জায়গার দিকে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আবার হাঁটতে হচ্ছে ঝিলকে এবং এ বার এই হন্টনের ষড়যন্ত্রটা মি. পয়ারকুমারই পাকিয়েছেন! এত ক্ষণ পেঁচো হয়ে থেকে ব্যাটা এখন বলে কিনা, এই পথ ধরে একটু হাঁটলে ম্যান্টনের মোড়ে ওর কে এক আত্মীয় থাকে, তাকে গিয়ে নাকি ও ওর মুলোর মতো দাঁতগুলো বের করে দেখাবে!

পয়ারের উপর বেশ এক চোট রাগ হল ঝিলের। এমনিতেই বেহালার রাস্তাঘাট ঝিল কিছুই চেনে না। তার উপর এই অচেনা জায়গায় এত হাঁটাহাঁটি করে শেষ পর্যন্ত ওর বিকেলের প্ল্যানটা না চৌপাট হয়ে যায়! বিকেলে যে-করেই-হোক ওই মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্টটাকে চিনে আসতেই হবে ঝিলকে। তাই এক বার ওর মনে হল, জারুলকে কি ও এক বার জিজ্ঞেস করবে? এখান থেকে গড়িয়াহাটে যাবে কী করে?

তার পরই ঝিলের ষষ্ঠেন্দ্রিয় ওকে সতর্ক করল, 'খবরদার! কথাটা বেশি কারও সঙ্গে শেয়ার করাটা একদমই ঠিক হবে না। এটা অত্যন্ত গোপন ব্যাপার এবং ওকে ব্যাপারটা প্রাণপণে গোপনই রাখতে হবে!'

ঝিল আপন মনে এইসব কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে ফুটপাতের এক কোনা ধরে একা-একাই হাঁটছিল। ওর কয়েক কদম সামনে অধিরাজ স্যর। এখনও তাঁর ফটোগ্রাফির জ্ঞান, জারুল ও আবহকে অনর্গল বিতরণ করে চলেছেন। ওদিকে পয়ারটা আবারও পিছিয়ে পড়েছে। ও এখনও মোবাইলের অতলেই ডুবে। কানে হেডফোন গুঁজে থুতনিটাকে গলায় ঠেকিয়ে কার সঙ্গে এত ফুসফুস করছে ভগবানই জানেন!

হঠাৎ ফুটপাতের বাঁ পাশের সরু গলি থেকে একটা ক্রিমরঙা গাড়ি ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ঠিক ঝিলের পায়ের সামনে এসে। গাড়িটা একেবারে ওর ঘাড়ের উপর উঠে আসায় ভীষণ চমকে উঠল ঝিল। কিন্তু ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়িটার কালো কাচ নামিয়ে একটা ঝাঁকড়া চুলের ছেলে খুব উত্তেজিত ভাবে পয়ারের নাম ধরে হাঁক দিল। পয়ার মিনমিন করে কী একটা বলল, কিন্তু সামনে এগিয়ে এল না।

ঝিল ছেলেটার দিকে ফিরে তাকাল। ওর মুখটাকে কেমন যেন চেনা-চেনা বলে মনে হল। কিন্তু কোথায় যে দেখেছে হঠাৎ মনে করে উঠতে পারল না ঝিল। ঝিল যখন গাড়িওয়ালা ছেলেটিকে চেনার জন্য সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই ফ্র্যাকশন-অফ-সেকেন্ডের মধ্যেই ছেলেটি গাড়ি থেকে ঝড়ের বেগে নেমে এসে পয়ারকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে হঠাৎ ওর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারল। ঝিলের রাংতার মতো ফিনফিনে চেহারাটা ওই হ্যাঁচকা টানটায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই সটান গিয়ে গাড়ির সিটের উপর আছড়ে পড়ল। তার পরই ছেলেটি সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার গাড়িটাকে সচল করে ফেলল।

এ সব কী হচ্ছে, কেনই বা হচ্ছে, বিন্দুবিসর্গ কিচ্ছু বুঝতে না পেরে ভয়ে-আতঙ্কে ঝিল চিৎকার করে উঠল, "স্যর! পয়ার! জারুল! আবহ! এ সব কী হচ্ছে? আমাকে আপনারা বাঁচান! হেল্প, প্লিজ় হেল্প মি!"

ঝিল চিৎকারটা করে উঠতেই ছেলেটি হিংস্র ভাবে ওকে একটা ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করল। আর তাতেই নিজের মাথাটাকে সরিয়ে নিতে গিয়ে ঝিলের কপালটা দুম করে ঠুকে গেল পাশের বন্ধ জানলার কাচে। মাথাটা ঠুকে যেতেই ঝিল প্রথম কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল। তার পরই বিদ্যুৎ চমকের মতো ওর মনে পড়ে গেল আরে! এ তো উষ্ণীষ! মুখটা কত বদলে গেছে, মাত্র এই দু'বছরেই...

ফ্ল্যাশব্যাক ৩

সেই দিনটাই ভীষণ খারাপ ছিল। সারা দিনভর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েই গেছে। আকাশের রংটাও ছিল ঠিক যেন স্লেটপাথরের মতো কালো। এমনই একটা দিনে স্কুল থেকে ভিজে-ভিজে রেজ়াল্টটা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল ঝিল। রেজ়াল্টে লাল কালি দিয়ে দেগে দেওয়া ছিল ক্লাস ইলেভেনের ঝিলম ঘোষ, এই প্রথম অঙ্কে পাশমার্কসের থেকে অন্তত দশ নম্বর কম পেয়েছে।

সন্ধেবেলা এই রেজ়াল্ট দেখার পর অঙ্কের স্যরও আর বিশেষ কথাটতা বলেননি। মুখ কালো করে তাড়াতাড়ি ওদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। রেজ়াল্টের কাগজটা হাতে পাওয়ার পর থেকেই কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল ঝিল। বন্ধুরা অনেক বুঝিয়েও ওকে থামাতে পারেনি। জীবনে প্রথম ফেল করার অপমানটা যে কী দুঃসহ, ঝিল সেই দিন যেন হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে গিয়েছিল।

অঙ্কের স্যর চলে যাওয়ার পর ওই স্যাঁতসেঁতে বর্ষার সন্ধেয় ওদের ঘরটাতে যেন সুচ পড়ার নীরবতা নেমে এল। মা-ও কেমন থম মেরে,একেবারে চুপ করে রইল।

কেঁদে-কেঁদেও তত ক্ষণে ঝিল বড় হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই ও পায়ে-পায়ে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দিল। কাতর গলায় বলল, "ও মা, মা, তুমি কিছু বলছ না কেন?"

মা নিজের গলাটাকে একদম বরফের মতো শীতল রেখে চাকিতে রুটি বেলতে-বেলতে বলল, "বলার মতো তুমি কি আর আমার মুখ রেখেছ, মানা? আমার এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, তোমার বাবার অকালমৃত্যু, সবই তো দেখছি এখন বৃথাই গেল! এত চেষ্টা করেও তোমাকে মানুষ করতে পারলাম না..."

বলতে-বলতে মায়ের গলাটাও চাপা কান্নায় যেন বুজে এল।

মাকে ভেঙে পড়তে দেখে ঝিলও আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। নিজের ফরসা গাল দুটোকে চোখের জলে ভেজাতে-ভেজাতে বলে উঠল, "সত্যি বলছি মা, আমি সামনের বারে অঙ্কে ঠিক ভাল রেজ়াল্ট করব। তুমি দেখে নিয়ো। এ বারটা যে কী করে কী হয়ে গেল! পরীক্ষায় কিছুতেই প্রবলেমগুলোকে ঠিক যেন..."

মা ভোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "সেই বোধোদয় তোমার হলেই ভাল!" তার পর আঁচলে হাতটা মুছতে-মুছতে বলল, "দ্যাখ ঝিল, তুই তো সেই ছোটবেলা থেকেই আমাদের কষ্টটা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিস; তোর বাবা অকালে চলে যাওয়ার পর আমার যে তোকে নিয়ে কী আতান্তরে পড়তে হয়েছিল!"

মা আর কথাটা শেষ করতে পারল না। মুখে আঁচল চাপা দিল, উদ্গত কান্নাটাকে চেপে নিতে। মায়ের জীবনের এই দগদগে ক্ষতটাকে ভালই অনুভব করতে পারে ঝিল। ঝিল মায়ের কোমরটাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের পিঠে নিজের গাল ঠেকাল।

মা তখন ঝিলকে টেনে নিজের বুকের কাছে এনে বিমর্ষ গলায় বলে উঠল, "আমাদের হঠাৎ করে এই রকম হাঘরের মতো অবস্থা হয়ে গেল বলেই তো তোর বাবার খুনের একটা সঠিক তদন্ত পর্যন্ত হল না!"

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, "এখন তুইও যদি ঠিকমতো পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না-পারিস, তা হলে আমার জীবনে শেষ আশা-ভরসা বলতে আর কী বাকি থাকবে, বল তো?"

ঝিল মায়ের ওই শেষ কথাটা শুনে চোখ তুলে বলল, "তবে যে তুমি এত দিন বলে এসেছ, বাবা সেই শ্রমিক অসন্তোষের সময় ফ্যাক্টরির গেটে বোমার আঘাতে হঠাৎ একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল।"

মা গ্যাস-ওভেনের আঁচে রুটিগুলো সেঁকতে-সেঁকতেই কপালের ঘাম মুছল। তার পর বলল, "তুই এত দিন ছোট ছিলিস, তাই সব বুঝতিস না। এখন তো তুই বড় হয়েছিস। তুই-ই ভেবে বল না কারখানার গেটে ছুটে এসে পড়া কোনও বোমার আঘাতে যখন কেউ মারা যায়, তার মৃত্যুটা কি কখনও নিছক অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে?"

ঝিল মায়ের কথাগুলো শুনে ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে ও মায়ের হাত দুটোকে জাপটে ধরল, "তা হলে আসল ঘটনাটা কী? তুমি খুলে বলো আমায়।"

মা কিন্তু ঝিলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে প্রসঙ্গটাকে উড়িয়ে দিতে চাইল; বলল, "সে অনেক পুরনো কথা। আমার ও সব কাদা ঘাঁটতে আর ভাল লাগে না রে। তুই বরং তোর লেখাপড়া ঠিকমতো করে আমাকে উদ্ধার কর। তা হলেই আমার শান্তি।"

ঝিল কিন্তু মায়ের মুখে বাবার মৃত্যুসংক্রান্ত এই অদ্ভুত আর নতুন অ্যাঙ্গেলের কথাগুলো শুনে এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, ও কিছুতেই আর মাকে ওর সামনে থেকে পালিয়ে যেতে দিল না।

মায়ের হাতটা ঝাঁকিয়ে ধরে ও বলল, "প্লিজ়, তুমি সব কিছু আমাকে খুলে বলো, মা। আমারও তো বাবার মৃত্যু-রহস্যের আসল কথাটা জানা দরকার!"

মা তখন ক্লান্তভাবে কাঠের ছোট টুলটাকে টেনে নিয়ে রান্নাঘরের কোনাতেই ধপ করে বসে পড়ল।

তার পর বলে উঠল, "সেদিন তোর বাবার কটন-মিলের গেটে, শ্রমিকরা মালিকদের ঘেরাও আন্দোলন চালাচ্ছিল। শ্রমিকরা বার-বার স্লোগান দিয়ে অপবাদ দিচ্ছিল, তোর বাবাই নাকি ওদের বকেয়া পাওনা সব টাকা চুরি করে নিয়েছে..."

ঝিল মাকে মাঝ পথে থামাল, "ওরা হঠাৎ একা বাবার নামে অপবাদ দিচ্ছিল কেন? ওই কোম্পানিতে তো বাবার সঙ্গে অনিকেত বসু বলে বাবার এক জন বন্ধুরও পার্টনারশিপ ছিল বলে শুনেছি।"

মা মলিন হেসে উত্তর করল, "শ্রমিকদের মধ্যে আসলে ওই মিথ্যে কথাটা খুব পরিকল্পনা করেই রটিয়ে ওদেরকে তোর বাবার বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকদের আরও বলা হয়েছিল, তোর বাবা নাকি শ্রমিকদের বকেয়া টাকা সরিয়ে সেই পয়সায় গোপনে অন্য ব্যবসায় লগ্নি করেছে।"

ঝিল রীতিমতো ছিটকে উঠল, "কে? কে বাবার বিরুদ্ধে এমন মিথ্যে ষড়যন্ত্র করেছিল, মা?"

মা বরফের মতো ঠান্ডা গলাতে বলল, "যে মানুষটাকে তোর বাবা নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করত, সেই মি. অনিকেত বসু!"

ঝিল মায়ের কথাটা শুনে ধপ করে রান্নাঘরের মেঝেতেই বসে পড়ল। অবাক গলায় বলল, "কিন্তু এ সব করে, ওই অনিকেত বসুর কী লাভ হল?"

মা আবারও হাসল; দুঃখমাখা একটা হাসি। বলল, "অনিকেতবাবু ওই কটন-মিলের ফর্টি পার্সেন্ট পার্টনার ছিলেন। আর গোটা ব্যবসাটাই তোর বাবা তিলে-তিলে নিজে হাতে গড়ে তুলেছিল। তার পর অনেক বিশ্বাস করে অনিকেতকে নিজের ওই স্বপ্নের ব্যবসায় শামিল করে তোর বাবা। কিন্তু তোর বাবার এত সৎপথে ব্যবসা করা এবং পরিশ্রম করে অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবসায় এত সুনাম অর্জন করাটাকে, অনিকেত বসু ঠিক হজম করতে পারেনি। ওর মনের মধ্যে তোর বাবার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের প্রতিদানে কেবল ঈর্ষা, লোভ আর হিংসেই দিনে-দিনে দানা বেঁধে উঠেছিল। তাই অনিকেত বসুই আসলে বিভিন্ন করাপ্টেড শ্রমিক-নেতাকে হাত করে শ্রমিকদের মধ্যে এই কৃত্রিম বিদ্রোহের আগুনটাকে জ্বালিয়ে দেয়। পাশাপাশি কোম্পানির অ্যাকাউন্ট থেকে শ্রমিকদের বকেয়া থেকে মোটা অঙ্কের টাকা সরিয়ে নিজে অন্য কোনও ব্যবসায় ইনভেস্ট করে সেই টাকাখেলাপির বদনামটা কায়দা করে তোর বাবার উপরে চাপিয়ে দেয়। তোর বাবা এতটাই অনিকেতকে বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মানুষটা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, অনিকেত কখনও তোর বাবার বিরুদ্ধে এমন প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্রও করতে পারে।"

ঝিল মায়ের কথাটা শুনে চোখ-মুখ লাল করে অনেক ক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তার পর দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, "তার মানে ওই শয়তান অনিকেত বসুই বাবার পিছনে দুষ্কৃতী লাগিয়ে বোমাটাকে ছুড়িয়েছিল!"

মা আবার একটা তপ্ত শ্বাস ফেলল, "কী জানি! হয় তো অনিকেত বসু, তোর বাবাকে বোমা ছুড়ে মার্ডার করার মতো এতটাও বাড়াবাড়ি করার পরিকল্পনা প্রথমে করেনি। ও চেয়েছিল কারখানার গেটে বোমাটোমা ফাটিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে, কটন মিলের দরজায় তালা ঝুলিয়ে, তোর বাবাকে দেউলিয়া করে দিতে। তার পর ব্যবসার বাকি টাকাপয়সা নিয়ে ও সরে যাবে। আর তোর বাবা চরম বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ে আজীবন শ্রমিকদের ঠকানোর মিথ্যে দায়ে জেল খেটে মরবে। কিন্তু তোর বাবাই একেবারে মোক্ষম সময়ে কারখানার গেটের দিকে যেতে গিয়েই... চরম সর্বনাশটা ঘটে গেল!"

ঝিলের হঠাৎ মনে হল এখন বাইরে স্যাঁতসেঁতে ওই আকাশটা থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ছে না। শুধু যেন আগুনের গোলা ছিটকে-ছিটকে পড়ছে মাটিতে। আর সেই গরম লাভাস্রোতের আঁচে ওর চোখ দুটো ক্রমশ জ্বলতে-জ্বলতে লাল হয়ে উঠছে! সেই বিষম দহন-জ্বালার মধ্যে থেকেই মুখ তুলে ঝিল বলল, "তার মানে পরোক্ষ ভাবে হলেও ওই অনিকেত বসু লোকটাই আমার বাবার খুনের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, তাই তো?"

মা এ প্রশ্নের আর কোনও উত্তর করল না। চুপচাপ আবার উঠে গিয়ে গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল কালচে চাটুটায় রুটিগুলোকে সেঁকে ফেলতে।

ঝিল তখন আস্তে-আস্তে রান্নাঘরের সামনে থেকে সরে এল। ঘরে ঢুকে ও বিছানার উপর ছড়িয়ে থাকা বই-খাতাগুলোকে সরিয়ে, ঘোরে পাওয়া মাথাটাকে নামিয়ে খুব অন্যমনস্কভাবে বিছানার এক প্রান্তে
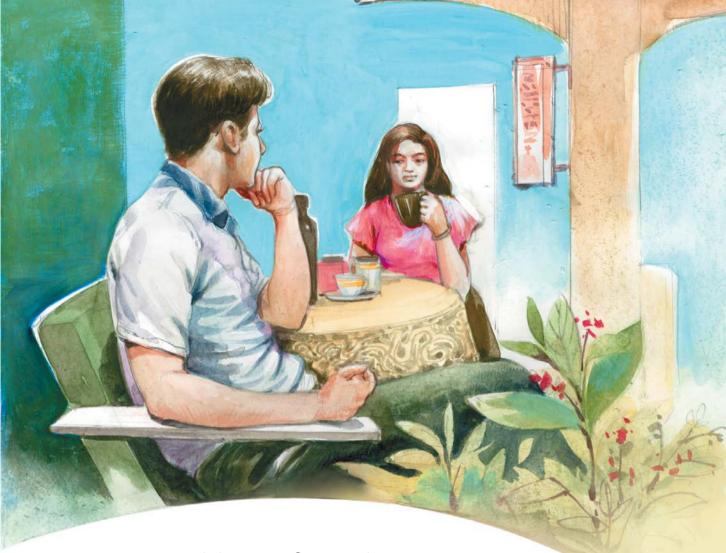
থপ করে বসে পড়ল। খাটের উপর সকালের বাসি খবরের কাগজটা তখন সিলিংফ্যানের হাওয়ায় মৃদু-মৃদু উড়ছিল। হঠাৎ ঝিলের চোখটা ওই উড়ন্ত খবরের-কাগজের ভিতরের পাতায় একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনের দিকে গিয়ে বিদ্ধ হল। ঝিল চোখ দুটোকে ভাল করে কচলে নিয়ে দেখল, বিজ্ঞাপনটায় লেখা রয়েছে,

'বোস ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-র তরফে শীঘ্রই নতুন ও দক্ষ তদন্তকারী এজেন্টদের নিয়োগ করা হবে।

কোম্পানির ডিরেক্টর, বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী শ্রীঅনিকেত বসু।

ঠিকানা- মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ৬/৬ নর্দান বালিগঞ্জ পার্ক, কলকাতা – ৭০০০১৯।'

॥ ৪ ॥

আবহর কথা

আবহর পুজোয় এবার কোথাও বেরোনো টেরোনোর মোটেও কোনও ইচ্ছে ছিল না। পুজোর প্ল্যান বলতে যেটা ওর মনের মধ্যে পোষা ছিল, সেটা অন্য কাউকে বললে নির্ঘাত সে ওকে অ্যান্টি-সোশ্যাল বলে পেটাত কিংবা সোজা ধরে নিয়ে গিয়ে পাগলা-গারদে পুরে দিয়ে আসত!

ব্যাপারটা হল আবহ চির কালই বেশ চুপচাপ, অন্তর্মুখী মানুষ। অনর্থক বেশি বকবক করা ওর পোষায় না। ও ভেবেছিল, পুজোর ক'টা দিন এ বছর বাড়ির বাইরে ও পা-ই রাখবে না! ওদের তিন তলার ছাদে যে ছোট্ট চিলেকোঠা ঘরটা রয়েছে, সেখানেই সারা দিন পূজাবার্ষিকী কোনও গল্পের বই সঙ্গে নিয়ে একা-একা কাটিয়ে দেবে। আরও একটা কাজ করবে সেটা হল, ওই জাপানি বা কোরিয়ান অ্যানিমেশনের স্টাইলে মঙ্গা-আর্টে ও দুগ্গাঠাকুরের কয়েকটা ছবি আঁকার চেষ্টা করবে। এই স্টাইলে ছবি আঁকতে এমনিতেই ওর খুব ভাল লাগে। ভারতীয় পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রদের ছবি এই মঙ্গা-অ্যানিমেশনের ধাঁচায় এঁকে ও একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে চাইছিল। কিন্তু...

কিন্তু আশপাশের বন্ধুরা এমন সব প্ল্যান-প্রোগ্রাম ফিট করে রাতদিন ফোন করছে এবং তার চেয়েও বড় কথা, কেন ও বেরোবে না, এই প্রশ্নটাকে এতটাই আগ্রাসী যুদ্ধ-বিমানের মতো করে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে যে আবহ অনেক চেষ্টা করেও আর পুজোর চার দিন, নিজেকে সম্পূর্ণ চিলেকোঠা-বন্দি করে রাখতে পারল না।

তা ছাড়া সপ্তমীর সকালটায় ওকে বন্ধুদের সঙ্গে বেরোতেই হবে। ওই দিন যে কখন কী ঘটে যাবে রাস্তাঘাটে, তার খবর এক মাত্র ওই তো আন্দাজ করতে পারছে! শত চেষ্টা করেও তাই বুকের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসটাকে রুখে দিতে পারল না আবহ। কারণ, আবহ যতই পুজোর মধ্যে স্বেচ্ছাবসর নিতে চাক না কেন, সেই গোলাপি চেরির মতো গালের মেয়েটি কিন্তু শত ইচ্ছে থাকলেও, এবার আর পুজোয় বেরোতে পারবে না। শুধু এবার কেন, কোনও দিনই আর কোনও পুজোয় বেরোতে পারবে না সে। সে যে ঘুমের দেশের পরির মতো শীতের কোনও সকালে হলুদ পাতার মতোই ঝরে যাবে বলে ঠিক করেছে! ওর কথাটা ভাবতেই আবহর চোখের কোনাটা আবার কেমন

যেন জ্বালা-জ্বালা করে উঠল।

আবহ নিজের মনের জানলায় উঁকি মেরে দেখতে পেল সেই কালচে ঢল নামানো চুলের মেয়েটি, এখন তার ফিকে নীল চোখের তারা দুটোকে স্বপ্নের সাম্পানের মতো দূরের ওই পেঁজা-তুলোয় ঢাকা আকাশের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে এক-মনে ওদের কমপ্লেক্সের পুজোর ঢাকের আওয়াজ শুনছে, কাস্‌ল-এর মতো বহুতলটার সুউচ্চ বারান্দাটা থেকে। ওর গাল দুটো বেয়ে একটা দুঃখের নীরব নদী যেন নিঃশব্দে নেমে আসছে গালের উপর; ওর শরীরে যে বাসা বেঁধেছে জটিল জিনগত রোগ। দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে এই ভীষণ অসময়েই ওকে যে ঝরা-পাতার মতো হারিয়ে যেতে হবে... হয়তো এই আসন্ন হেমন্তের আগেই! খানিক শরীরের কষ্টে আর খানিক মনের ব্যথায় তাই ওর অশ্রুনদী চোখ থেকে নেমে আপন মনে গড়িয়ে যাচ্ছে, মা দুগ্গার ওই জ্বলজ্বলে মুখটার দিকে।

আবহর তাই এ বারের পুজোয় একেবারেই ঘোরাঘুরির ইচ্ছে ছিল না। ওর ছেলেবেলার এক মাত্র সঙ্গীর এমন একটা অসুখের কথা শুনে ওর মনটাও যাকে বলে একদম বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই এমনিতেই কম কথা বলা আবহর টোনাল কোয়ালিটিতে এখন আরও একটু বেশিই পজ় পড়ে গেছে। কিন্তু চিলেকোঠার ঘরে নিজেকে দুপুরের পর-দুপুর বন্দি করে রাখলেও, আবহর কানের মধ্যে ওই করুণ আর্তিটার রিনরিনে শব্দ কিছুতেই যেন বন্ধ হয়নি; সেই ঘুমের দেশের মেয়েটা যেন বহু দূর থেকে বার বার ওকে ডেকে কষ্ট-মাখা গলায় বলে গেছে, "আমার হাতে আর বেশি সময় নেই রে, আবহ! ডাক্তার বলেছেন, আমার শরীর আর কিডনি প্রতিস্থাপনের ধকল সহ্য করার অবস্থায়ও নেই। বড় জোর আর সাত-কী-আট মাস সময় আছে আমার হাতে। এখন তুই বল, এর মধ্যে তুই এ ব্যাপারটার একটা সঠিক সমাধান করে ফেলতে পারবি কি না? কথা দে আমাকে? প্লিজ়, কথা দে!"

এই কথা দেওয়ার মতো আপাত সহজ, কিন্তু আদতে ভীষণ কঠিন ধাঁধাটায় জড়িয়ে পড়েই আবহর এ বারের পুজো-টুজো সব ঘেঁটে ঘ হতে বসেছে! এখন যে কাজটা ওর সব চেয়ে জঘন্য লাগে করতে, সেই টিকটিকিগিরিটাই ওকে নিজের মনের শত অনিচ্ছেতেও করতেই হবে; কেবল ওই বিকেল ফুরিয়ে আসা বিষণ্ণতার মতো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে। তাও আবার ওর আরও একটি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর উপরই! সত্যি, এত জটিলতা বুকের মধ্যে বইতে-বইতে এখন যেন বড্ড বেশি ক্লান্ত লাগছে আবহর। আবহর গল্পের বই পড়তে ভাল লাগে আর রাত জেগে-জেগে আপনমনে ছবি আঁকতে। জাপানি অ্যানিমেশনের ধাঁচায় ছবি আঁকাতে ও এখন বেশ ভালই দক্ষ হয়ে উঠেছে। এ সব কোনও আঁকার স্কুলে গিয়ে কখনও শেখেনি ও। নিজের চেষ্টায় আর মনের আনন্দেই খাতার পিছনের পাতাগুলোয় ফুটিয়ে তুলেছে, যখন যেমন ইচ্ছে হয়েছে।

গল্পের বইয়ের মধ্যে 'পথের পাঁচালী' আর 'চাঁদের পাহাড়'ই আবহর বার বার পড়তে ভাল লাগে। এই বই দুটো নিয়ে যে কত শীতের দুপুর এক-নিঃশ্বাসে ফুরিয়ে ফেলেছে ও। ছেলেবেলা থেকেই গোয়েন্দাকাহিনি-টাহিনি বিশেষ টানে না ওকে। বরং ওদের ছাদ থেকে দেখতে পাওয়া যাদবপুর লেভেল ক্রসিং আর তার চার পাশের আগাছার জঙ্গলের মধ্যেই যেন ও সেই অপু-দুর্গার কাশ বন ঠেলে-ঠেলে, রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার দৃশ্যটাকে, কল্পনা করতে পারে...

আবহর এই একাকিত্ব, মনখারাপ, নীরবতা আর নিজের মধ্যে আরও-আরও গুটিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা গত বছর পুজোর সময় থেকেই নিঃশব্দে ওর মধ্যে চারিয়ে গিয়েছে। গত বছরের দুর্গাষষ্ঠীর সেই সকালটার কথা যেন আজও ওর চোখের উপর স্পষ্ট ভেসে বেড়ায়। মনে হয়, এই তো এক্ষুনি ওর সামনে ঝরে পড়া চেরি ফুলের মতো রাস্তায় ঢলে পড়ল আর্দ্রতা! তখন অঙ্কের টিউশনটা গড়িয়াহাটার দিকে এক জন স্যরের কাছে একা পড়তে যেত ও। স্যর ওকে খুব বিচ্ছিরি একটা সময়ে পড়াতেন; রবিবার, সকাল আটটা থেকে দশটা। ফলে ওই একটা ছুটির দিনেও, আবহর ভোরের ঘুমটার দফারফা হয়ে যেত।

যাই হোক, গত বছর ষষ্ঠী পড়েছিল রবিবারে, আর সকাল-সকাল আবহ অঙ্কের স্যরের বাড়ি পৌঁছলেও, নীচের ঠাকুরমা জানালেন, স্যর বাড়ি নেই; সপরিবারে পুজোয় ডুয়ার্স বেড়াতে চলে গিয়েছেন। ফলে উল্টো-পথে তখন স্যরের বাড়ি থেকে গোলপার্কের কাছ পর্যন্ত হেঁটে এসে ও বাড়ি ফেরার বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। এমন সময়ই সেই অদ্ভুত এবং ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সেই দুর্ঘটনাটা ঘটল! আবহ বাসের সিঁড়িতে আপনমনে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা চেরি ফুলের মতো পলকা মেয়ে হঠাৎ বাস থেকে নামতে গিয়ে ওর গায়ের উপর অচৈতন্য হয়ে ওকে সমেতই রাস্তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

আবহ তাড়াতাড়ি মেয়েটির মাথাটা নিজের হাত দিয়ে গার্ড না-করে নিলে মাথাটা রাস্তায় ঠুকে গিয়ে আরও বেশি রক্তারক্তি কিছু হতে পারত। আবহ তাড়াতাড়ি নিজে উঠে মেয়েটিকে সোজা করতে গিয়ে, ওই ঘুমের দেশের রাজকন্যার মতো চোখ বন্ধ করে মাঝরাস্তায় অচৈতন্য হয়ে পড়া বিবর্ণ চেহারার মেয়েটিকে দেখে, মুহূর্তের জন্য চমকে উঠল। আরে! এ যে আর্দ্রতা! এত বছরে মুখটার এতটুকুও বদল হয়নি ওর...

মায়ের সঙ্গে সেই থ্রি-তে পড়ার সময় এক বারই বেনারসে বেড়াতে গিয়েছিল আবহ। তখনও শালিকমাসি বেনারসের কাছেই, সারনাথের বৌদ্ধ-পুরাতাত্ত্বিক মিউজ়িয়ামে চাকরি করতেন। শালিকমাসি ঠিক ওর নিজের মাসি নয়, মায়ের ছেলেবেলার এক স্কুলের বন্ধু; যাকে বলে, বেস্টফ্রেন্ড। শালিকমাসিই মাকে অনেক করে এক বার সারনাথে, মাসির কোয়ার্টার্সে বেড়াতে যেতে বলেছিল। সেবার বাবা পুজোর আগে-আগে অফিসের কাজে চিটাগাংয়ে চলে গেল বলেই, মা ছোট্ট আবহকে নিয়ে শালিকমাসির ওখানে যাওয়ার প্ল্যান করল। মাসি কর্মসূত্রে বেনারসে থাকলেও, মাসির হাজ়ব্যান্ড কলকাতার কাছেই কোথাও ব্যবসা করতেন বলে আবহ শুনেছিল। শালিকমাসির দুই ছেলেমেয়ে। ছেলে বড় এবং সে বাবার সঙ্গে কলকাতায় থাকত। তার সঙ্গে সেবার (এবং তার পরেও আর কখনও) পরিচয়ের সুযোগ হয়ে ওঠেনি আবহর। শালিকমাসি তার পুঁচকে মেয়ে আর্দ্রতাকে নিয়ে একাই থাকত সারনাথের সরকারি-কোয়ার্টার্সে। আবহর মনে আছে, তখন আর্দ্রতা আরও রোগা প্যাঁকাটির মতো ছিল। ও বয়সে আবহর চেয়ে কয়েক মাসের ছোটই ছিল; কিন্তু ওরা দু'জনেই তখন এক ক্লাসে পড়ত।

সেবার বেনারস বেড়াতে গিয়ে মায়েরা দুই সখীতে যেমন বহু দিন পরে পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, তেমনই আবহ আর আর্দ্রতাও দারুণ বন্ধু হয়ে উঠেছিল। শালিকমাসি বলত, "আমাদের কোয়ার্টারে আর্দ্রতার বয়সি বাচ্চা আর একটাও নেই, জানিস; তাই ইশকুলের বাইরে ওর কোনও খেলার সঙ্গী নেই। আমার আদুটা তাই বড্ড একা রে..."

আবহর সঙ্গে সেবার দারুণ জমে গিয়েছিল আর্দ্রতার। দু'জনে মিলে মাসিদের কোয়ার্টার্স-ক্যাম্পাসের বড় মাঠটায় কত যে ব্যাডমিন্টন খেলেছিল ওরা! তার পর এক সঙ্গে এ-দিক ও-দিক বেড়াতে যাওয়া, শপিং, খাওয়া-দাওয়া... সোনালি রাংতার মতো যেন সেই দিনগুলো বয়ে গিয়েছিল আবহর জীবনের উপর দিয়ে। আর্দ্রতার মতো এত ভাল মনের বন্ধু ও যেন এর আগে বা পরে, কখনও আর তেমন করে পায়নি।

প্রায় মাস খানেক শালিকমাসির ওখানে কাটিয়ে আসার পর ফেরার সময় আবহ আর আর্দ্রতা, দু'জনেই অঝোর ধারায় কেঁদেছিল খুব। দেখে তো ওদের মায়েদের চোখগুলোও ছলছল করে উঠেছিল সেবার। আবহ সেবার নিজে হাতে আর্দ্রতাকে বেশ কয়েকটা ছবি এঁকে উপহার দিয়ে এসেছিল। তখন থেকেই তো ও একটু-একটু করে অ্যানিমেশন আঁকার চেষ্টা করত। মনে আছে, ওর এঁকে দেওয়া ছবিগুলোকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবে বলেছিল আর্দ্রতা। আর্দ্রতা আবার পাথরের উপর রং ঘষে রক-ডিজ়াইন করত। তেমনই দুটো ওর নিজের হাতে রং করা নুড়ি, ফেরার সময় আবহর হাফ প্যান্টের পকেটে পুরে দিয়েছিল। বাড়িতে ফেরার পর সেই নুড়ি দুটো অনেক দিন নিজের খেলনার বাক্সে সযত্নে

রেখে দিয়েছিল আবহ। তার পর কখন যে দুম করে এত বড় হয়ে গেল, আর আর্দ্রতার স্মৃতিটাই ওর মন থেকে আস্তে-আস্তে মুছে মিলিয়ে গেল, সেটা ও আর কিছুতেই যেন খেয়াল করতে পারে না আবহ।

আবহর শুধু এইটুকুই এখন মনে পড়ে, সেবার বেনারস থেকে ফেরার পর ও বেশ কিছু দিন ব্যাগ গুছিয়ে, রেডি হয়ে, মায়ের উপর রাগ করে ছিল, আবার কেন ওকে আর্দ্রতার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না বলে। আর্দ্রতাও এমন কিছু ছেলেমানুষি করেছিল কি না, এখন তা আর মনে নেই আবহর।

আবহ কত ক্ষণ যে আর্দ্রতার মাথাটাকে নিজের কোলের উপর ধরে মাঝ রাস্তায় ভ্যাবলার মতো বসেছিল, ওর নিজেরই খেয়াল নেই। সম্বিৎ ফিরল, যখন বাস থেকে আরও কিছু যাত্রী তাড়াহুড়ো করে নেমে পাশের মিষ্টির দোকান থেকে জলের জগ নিয়ে এসে, আর্দ্রতার চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিলেন এবং তার পর সেই ঘুমের দেশের রাজকন্যে অবশেষে চোখ খুলে আবহকে দেখল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে মাঝ রাস্তার উপর এমন অড সিচুয়েশনেই আর্দ্রতাও রীতিমতো চিৎকার করে উঠেছিল, আবহর মুখের দিকে প্রথমবার তাকিয়ে, "কী রে, তুই? আবহ না? তুই এখানে কী করে?"

এ প্রশ্নটা অবশ্য আবহরই ওকে করার কথা ছিল। কারণ, আর্দ্রতা কবে বেনারস থেকে ওর শহরে এসেছে, সেটা আবহর জানা ছিল না। আবহর মা যে কেন আর তার পর থেকে কখনও শালিকমাসির সঙ্গে আর তেমনভাবে যোগাযোগ রাখেনি, সেটাও আবহর জানা নেই। আর্দ্রতার সঙ্গে মাত্র অল্প কয়েক দিনে গড়ে ওঠা যে গাঢ় বন্ধুত্বটা, ওর ছেলেবেলার একটা রঙিনতম অধ্যায় হয়ে গিয়েছিল, তার ব্যাপারেও ও-ও যে কী করে এতটা উদাসীন হয়ে গিয়েছিল এ ক'বছরে, সেটা ভেবেই তখন মনে-মনে বেশ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল আবহ। কাছের একটা ওষুধের দোকান থেকে কনুইয়ের ক্ষতটায় সামান্য ফার্স্ট-এড করে বাইরে বেরিয়ে, আর্দ্রতা আবহর দিকে ফিরে হাসল, "ইট্স ওকে। আমার মাঝে-মাঝেই আজকাল এমনটা হয়।"

তার পর মাথার পনিটেলটা ঝাঁকিয়ে আবহর দিকে ফিরে জোর করে হেসে ও বলল, "তার পর তোর খবর কী বল? তুই কত্ত বড় হয়ে গেছিস, ইস্স!"

আবহ বরাবরই কম কথা বলে। এখন এমনই অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে ও ওর ছেলেবেলার বেস্টফ্রেন্ড আর্দ্রতাকে আবিষ্কার করেছে যে, মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন উথলে উঠলেও, হঠাৎ এখন কী বলবে ভেবে পেল না আবহ। তাই ও চুপ করেই রইল। কিন্তু পুজোর সকালে ওর পাশে হাঁটতে-হাঁটতে, আর্দ্রতা নিজে থেকেই বলে উঠল, "তুই যখন আমাদের বেনারসের বাড়ি থেকে চলে এসেছিলিস না, সেই ছোটবেলায়, তখন আমি খুব কান্নাকাটি করেছিলাম কয়েক দিন। কেঁদে-কেঁদে, আর না খেয়ে-খেয়ে, জ্বরজারি পর্যন্ত বাঁধিয়ে ফেলেছিলাম! কী যে ছেলেমানুষ ছিলাম তখন!" কথাটা বলেই আবার বিষণ্ণ একটা হাসি দিল আর্দ্রতা।

আবহ এত ক্ষণে অনেকখানি কষ্ট করে যেন বলে উঠতে পারল, "তুই কলকাতায় কবে এলি?"

আর্দ্রতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এই তো ইলেভেনে ওঠার পর-পরই। মাস চারেক মতো হবে।"

আবহ আস্তে করে ঘাড় নাড়ল। তার পর বলল, "তুই এই সাত সকালে বাসে করে কোথায় গিয়েছিলি? আর এমন রাস্তার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়লি... তার মানে, তোর শরীর-টরীর...?"

আবহ আর্দ্রতার শুকিয়ে আসা ফুলের মতো মুখটার দিকে ভাল করে নজর বুলিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই সকাল থেকে খালি পেটে রয়েছিস! দাঁড়া এখানে, আমি এক্ষুনি আসছি।"

কথাটা বলেই, আবহ এক দৌড়ে ফুটপাত পেরিয়ে উল্টোদিকের দোকান থেকে দুটো আইসক্রিম-কোন কিনে ফেলল। তার পর আবার আর্দ্রতার পাশে ফিরে এসে হেসে বলল, "আমার কিন্তু এখনও মনে আছে তুই চকলেট দেওয়া কোন-আইসক্রিম খেতে খুব ভালবাসতিস।"

আর্দ্রতা হাসি-মুখে তখন আবহর হাত থেকে আইসক্রিমটা নিল। তার পর দু'জনে আবার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল।

আর্দ্রতাই এবার ঘুরিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করল, "তুই এত সকালবেলায় কোথায় গিয়েছিলি?"

আবহ পিঠের ব্যাগটা দেখিয়ে বলল, "কোথায় আবার! টিউশন পড়তে।"

আর্দ্রতা ভুরু তুলল, "পুজোর মধ্যেও টিউশন? তুই কি এইচ এসে ফার্স্ট হবি ঠিক করেছিস নাকি!"

আবহ ওর কথা শুনে হেসে উঠল। তার পর ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই তো বললি না, এত সকাল-সকাল তুই কোথায় গিয়েছিলি?"

আর্দ্রতা হঠাৎ রাস্তার মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পর চোখ দুটোর উপচে আসা জলকে কোনওমতে সামলে নিয়ে বলল, "বাড়িতে থাকতে আর ইচ্ছে করে না রে। দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই সকাল-সকাল যে দিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে পড়েছিলাম!"

আবহ ভীষণ অবাক হয়ে আর্দ্রতার মুখের দিকে তাকাল। এই মেয়েটি তো ওর ক্লাস ফোরে প্রথম আলাপ হওয়া, সেই ফুটফুটে আর প্রাঞ্জল বন্ধুটি নয়। এ যে এক বিষণ্ণতায় মাখা, অচিনপুরের বিষাদ-পরি। একে যেন আর্দ্রতা বলে ভাল করে চিনে উঠতেই পারল না আবহ। আবহ আস্তে করে তাই প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই এ দিকে কোথায় থাকিস বল? তা হলে আমিই এখন তোকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

আর্দ্রতা ওর দিকে ফিরে হাসল। সেই দুঃখ দিয়ে ধোয়া একটা নিঃশব্দ হাসি। তার পর সামনের বাঁকটা নিয়ে একটা চওড়া গলির মুখে এসে, সামনের বহুতলটার দিকে হাত তুলে বলল, "ওই গজদন্ত মিনারের কারাগারটাই আপাতত আমার ঠিকানা রে; যত দিন না পুরোপুরি শেষ হয়ে যাচ্ছি!"

আবহ আর্দ্রতার এই শেষ কথাটা শুনে রীতিমতো চমকে উঠে বলল, "কী যা-তা বলছিস!"

আর্দ্রতা আবারও হাসল, "ঠিকই বলছি রে। সেই বেনারসের দিনগুলোর পর তুইও তো আর আমার কোনও খবর নিলি না, আমিও তাই। অথচ দ্যাখ, আমাদের সেই ছোটবেলার ক্ষণিকের বন্ধুত্বের টান এমনই তীব্র ছিল যে, আজ যখন আমার পাশে আপনজন বলে আর কেউ কোথাও নেই, ঠিক তখনই তোর সঙ্গেই আমার দেখা হয়ে গেল!"

চোখ দিয়ে গালের উপর গড়িয়ে আসা জলটাকে আর মুছল না আর্দ্রতা। ওই অবস্থাতেই ও বলল, "তোকেই এখন আমার ভীষণ দরকার রে, আবহ। এই অচেনা শহরটায় আমার তো আর কোনও বন্ধু নেই। আর আমার হাতে সময়ও দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তাই আমি কিছু কথা তোকে বলতে চাই। তুই আমার সব কথা শুনবি তো?"

আবহ এ সব অসংলগ্ন কথার প্রত্যুত্তরে কী যে বলবে, ঠিক ভেবে উঠতে পারল না।

চেতনাটা কেমন যেন অচেনা ঘোরের কুয়াশার মধ্যে মিশে যেতে-যেতে আবহ খেয়াল করল, ওর হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে নিজের নম্বরটা তাতে সেভ করে দিয়ে আর্দ্রতা বলল, "তোকে ফোন করব আমি।"

আবহ ঘাড়টার কিছু নাড়ার আগেই তার পর সেই মণিকর্ণিকা নামক বিলাসবহুল গজদন্ত মিনারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল আবহর ফেলে আসা ছেলেবেলার সুখস্মৃতি অথবা হঠাৎ করে ঘনিয়ে আসা নতুন রহস্যের কুয়াশা-বন্ধু, আর্দ্রতা!

ফ্ল্যাশব্যাক ৪

শহরের মাথার উপর বিষণ্ণ একটা বিকেল। তার নীচে নির্জন এই কফিশপ। সেখানে মুখোমুখি দুই বন্ধু। এক জন চুপচাপ আর অন্য জন ক্লান্ত ও পাণ্ডুর।

ওরা দু'জনে বেশ অনেক ক্ষণ নীরবেই বসে রইল। ওদের মাঝখানে গোল টেবিলটায় গরম কফিমাগ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আপনমনে

বিমূর্ত নীল নকশার রূপ নিয়ে আকাশের দিকে মিলিয়ে যেতে লাগল।

তার পর এক সময় নীরবতা ভেঙে আর্দ্রতা হঠাৎ বলে উঠল, "আমি তখন ক্লাস এইটে উঠেছি সবে। সেই সময় হঠাৎ এক দিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে, মা মাঝরাস্তায়, ঠিক আমার মতোই, মাথা ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। সহযাত্রী ও রাস্তার অন্য লোকেরা, সে যাত্রায় মাকে তুলে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিল। ওখানেই প্রথম ধরা পড়ে মায়ের শরীরে বিলিরুবিন ভয়ঙ্কর রকম বেড়ে গিয়েছে এবং মায়ের কিডনি দুটোর অবস্থা খুবই খারাপ। অথচ এর আগে মায়ের শরীরে তেমন কোনও রোগের লক্ষণই ছিল না। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে বললেন, মায়ের এই রোগটা একটা দুরারোগ্য বংশগত রোগ, নাম, 'পলিসিস্টিক কিডনি সিনড্রোম'। এই রোগটা মানবদেহের ছ'নম্বর অটোজোমে অবস্থিত প্রকট জিনের প্রভাবে হয়। এই জিনটা কারও শরীরে অনন্তকাল ঘুমিয়ে থাকতে পারে আবার কারও শরীরে, যখন-তখন অ্যাকটিভ হয়ে তার কিডনি-দ্বয়ের মধ্যে অসংখ্য সিস্ট তৈরি করে, কিডনির কর্মক্ষমতা দ্রুত ধ্বংস করা শুরু করে দেয়। তখন সেই মানুষটা ডায়ালিসিস করিয়ে কোনওমতে কয়েক মাস মাত্র, ধুঁকতে-ধুঁকতে বেঁচে থাকতে পারে। এই রোগ থেকে মুক্তির এক মাত্র দাওয়াই হল, অন্যের দেহ থেকে ধার করে নিজের খারাপ কিডনি দুটো বদলে সেই জায়গায় সুস্থ কিডনি প্রতিস্থাপন করা। কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটাই বেশ জটিল এবং খরচসাপেক্ষ। যদিও তা করেও অধিকাংশ মানুষের দেহই নতুন কিডনি দুটোকে রিজেক্ট করে দেয়। তখন মৃত্যু আরও সুনিশ্চিত হয়ে যায়..."

আজকের এই দেখা করাটা, কফিশপের ডেস্টিনেশন, সবটাই আর্দ্রতা নিজে থেকেই ঠিক করেছে। আবহকে একটা টেক্সট-মেসেজ করতেই ও সময়মতো এসে হাজির হয়ে গেছে শুধু। এখন আর্দ্রতার কথাগুলো শুনে আবহ প্রত্যুত্তরে কী বলবে, ঠিক ভেবে পেল না। ও ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করতে গেল, "শালিকমাসি তা হলে..."

আবহর মুখের কথাটা ফুরোনোর আগেই আর্দ্রতা মলিন হেসে বলল, "বললাম না তোকে, এ রোগে বিশেষ কেউ বাঁচে না। মা তার পর মাত্র ছ'মাস মতো সময় পেয়েছিল। তার মধ্যেই মা আমাকে বেনারস থেকে দেরাদুনের একটা আবাসিক স্কুলে জোর করে ভর্তি করে দিয়ে গিয়েছিল। মা চায়নি, মায়ের মৃত্যুটা আমি সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে কষ্ট পাই।"

আবার একটা গুমোট নীরবতা নেমে এল হেমন্তের মনখারাপরঙা আসন্ন সন্ধেটার বুকে। আবহ নিজের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে-করতে এক সময় চোখ তুলল, "তোর বাবা আর দাদা তখন কোথায় ছিল? ওরা এক বারও আসেনি তোর মা'র কাছে?"

এইবার আর্দ্রতার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। ও মুখটা বেঁকিয়ে বলল, "মায়ের গোটা চিকিৎসাটার ব্যয়ভার মিউজ়িয়াম কর্তৃপক্ষই নিয়েছিল। এ জন্য আমার বাবার কাছে কখনও হাত পাততে হয়নি মাকে।"

আবহ অবাক হল, "এমন করে বলছিস কেন? তোর দাদাও তো নিশ্চয়ই মাকে হারিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিল?"

আর্দ্রতা ঘাড় নেড়ে বলল, "বাবা আর মায়ের মধ্যে একটা বরফশীতল দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল অনেক কাল আগেই। আমি ছোট ছিলাম, তাই অত ভাল করে বুঝতাম না। তবু ওই বয়সেই যেটুকু বুঝেছিলাম, বাবার ব্যবসা আর চালচলনে এমন কিছু বেআইনি ব্যাপারস্যাপার যুক্ত ছিল যে, মা সেটাকে কখনওই সমর্থন করতে পারেনি। আর ছেলেবেলা থেকেই যে হেতু আমি মায়ের, আর দাদা বাবার প্রতি বেশি ন্যাওটা ছিল, তাই দুই সন্তানের মধ্যে এক জনকে নিজেদের কাছে ভাগ করে রেখে, মা ও বাবা দেশের দুই দূরতম শহরে নিজেদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গিয়েছিল। আমার ধারণা, বাবার সঙ্গে এই শান্তিপূর্ণ দূরত্ব তৈরি করার গোটা পরিকল্পনাটাই মায়ের একারই ছিল। মা কখনও চাইত না, আমি বা দাদা কখনও মা ও বাবার মধ্যের এই অশান্তি বা মনোমালিন্যটার সাক্ষী হই।"

আবহ এ সব কথাবার্তার পর আবার কথা হারিয়ে ফেলে চুপ করেই রইল। তার পর জিজ্ঞেস করল, "তুই তা হলে হঠাৎ দেরাদুন ছেড়ে কলকাতায় চলে এলি কেন এইচ এস পড়তে?"

আর্দ্রতা আবারও সেই দুঃখভরা হাসিটা হেসে বলল, "নিয়তি বলে একটা কথা হয় জানিস তো? আমি তার টানেই আবার এই শহরে আমার প্রায় অপরিচিত এবং একেবারেই অপছন্দের বাবা ও দাদার কাছে এসে পড়েছি এখন!"

আবহ আর্দ্রতার কথা কিচ্ছু বুঝতে না পেরে, ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল।

আর্দ্রতা তখন ক্লান্ত গলায় বলল, "মাস আষ্টেক আগে যখন আমার ক্লাস টেনের ফাইনাল এগজ়াম সামনে, তখন আমিও একদিন মাঝরাতে পড়তে-পড়তে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লাম স্কুল-হোস্টেলের ঘরে। স্কুল-কর্তৃপক্ষ তখন আমাকেও তড়িঘড়ি দেরাদুনের একটা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। তার পর আমার শরীরেও ধরা পড়ল..."

আর্দ্রতা মাঝ পথে চুপ করে গেল। ওর গলায় অবরুদ্ধ কান্নার আঁচটাকে স্পষ্ট মালুম পেল আবহ। আবহর বুকটাও ছোটবেলার বন্ধুটার জন্য এক অজানা দুঃখে ভীষণ কনকন করে উঠল। কিন্তু আবহ কিছু বলে ওঠার আগেই আর্দ্রতা নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলল, "মা চায়নি, মায়ের মৃত্যুর খবরটা কেউ জানুক। খুব নীরবে একা-একাই চলে গিয়েছিল আমার মা। তাই তো তোরা কেউ কিছু খবর পাসনি এত দিন।"

আর্দ্রতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবহ বলল, "এখন তার মানে তুই চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে এসেছিস, তাই তো?"

আর্দ্রতা একটা অজানা দুঃখ ও বিরক্তিতে নিজের মুখটাকে বিকৃত করে বলে উঠল, "বাবা আর দাদাকে আমার জাস্ট অসহ্য লাগছে, এখানে আসার পর থেকেই! দু'জনের কেউই আমার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলে না; সেখানে ভালবাসা আর স্নেহ তো আরও দূরের বস্তু। আমি একা-একাই এখন এই অসুস্থ শরীরটাকে নিয়ে ওই সাতমহলা জেলখানাটায় মুখ বুজে বন্দি হয়ে থাকি। আর যখন আমার খুব মন কেমন করে, তখন মায়ের ছবিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কাঁদি।"

আর্দ্রতা চোখ থেকে নেমে আসা জলের ধারাটাকে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে ফেলল। তার পর আবার বলল, "দাদাটা তো পুরোপুরি বখাটে হয়ে গেছে; আর বাবাকে তো আমি বাড়িতে বেশির ভাগ সময় চোখেই দেখতে পাই না। আমি বেশ বুঝতে পারি, আমি মায়ের খুব কাছের ছিলাম বলেই বোধ হয়, বাবা আর দাদা দু'জনেই আমাকে নিয়ে বেজায় অসন্তুষ্ট। তা ছাড়া বাবা কিংবা দাদা, দু'জনেই টাকার দম্ভ আর অতিরিক্ত আভিজাত্য দেখিয়ে আশপাশের মানুষকে হেয় করে ভীষণ মজা পায়। এটা আবার আমার একদম সহ্য হয় না রে। তাই নামেই এরা আমার বাবা আর দাদা। এদের সঙ্গে আমার মনের মিল এক ফোঁটাও নেই। এই দুটো মানুষ আমার কাছে এখনও এতটাই অপরিচিত যে, এদের আমি বাইরের লোক ছাড়া আর বাড়তি কিছু ভাবতেই পারি না!"

সামান্য দম নিয়ে আর্দ্রতা আবার বলল, "আমার বয়সটা যে হেতু কম, আর যে হেতু আমার নিজের টাকাপয়সা কিছু নেই, তাই আমার নিকটতম অভিভাবক, বাবার কাছেই আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন দেরাদুনের স্কুল কর্তৃপক্ষ, ক্লাস টেনের ফাইনালের পরে-পরেই..."

আবহ কী ভাবে যে আর্দ্রতার এই চুরমার হয়ে যাওয়া ক্ষতময় জীবনে সান্ত্বনার প্রলেপ বোলাবে, ভেবে পেল না। তবু ও কোনওক্রমে বলল, "তুই এত ভেঙে পড়িস না। কাকু নিশ্চয়ই ভালমতো চিকিৎসা করে তোকে ঠিক সুস্থ করে তুলবেন।"

আর্দ্রতা আবহর কথা শুনে রাগে ছিটকে উঠল, "কাকু! তুই জানিস, আমার বাবা-মায়ের মৃত্যুর সময় কিডনি জোগাড় করার নাম করে কোথায় কোন কটন-মিলে বেআইনি লক-আউট করিয়ে, সেই ব্যবসার

টাকাটাকে বাঁকা-পথে সরিয়ে, কিডনি চোরাকারবারিদের র‍্যাকেটে লগ্নি করেছিল, স্রেফ নিজের অসৎ পথে বিত্ত বাড়ানোর জন্য!"

আবহ আর্দ্রতার কথা শুনে থমকে চুপ করে গেল। চেরি ফুলের মতো ফিনফিনে মেয়েটার মনের গভীরে এত ঝড়-ঝঞ্ঝার তোলপাড় যে এ ভাবে লুকিয়ে রয়েছে, এটা ও সত্যিই ভাবতে পারেনি।

হঠাৎ আর্দ্রতা এগিয়ে এসে আবহর হাত দুটো ওর ঠান্ডা হাতের আঙুলগুলো দিয়ে চেপে ধরল। তার পর কাতরকণ্ঠে বলল, "আবহ, আমার হাতে সময় খুব কম; আমি আর বেশি দিন বাঁচব না। মায়ের যে-রোগটা আটত্রিশ বছর বয়সে হয়েছিল, আমার সেটা এই ষোলো পড়ার আগেই শরীরের রাক্ষুসে জিনটাকে জাগিয়ে, রক্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু এই অচেনা শহরটায় তুই ছাড়া যে আমার আপন বন্ধু বলে আর কেউ নেই। তাই তোকে আমার একটা উপকার করে দিতেই হবে! তুই প্রমিস কর, আমার এই শেষ কথাটা তুই রাখবি?"

আবহ এ কথার উত্তরে হ্যাঁ-না কিছুই বলতে না পেরে, অপলক দৃষ্টিতে আর্দ্রতার পাণ্ডুর মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

আর্দ্রতা তখন হঠাৎ বলল, "তোর সেই কোন কাকা কী একটা মোবাইল-নেটওয়ার্ক-ট্র্যাকিং সফ্টওয়্যার ডেভলপ করেছিলেন, বলেছিলি না?"

আবহ অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমার ছোটকা তো আইআইটি-তে পড়ার সময়ই ওই এথিকাল-হ্যাকিং সফ্টওয়্যারটা তৈরি করেছিল। তাই তো ছোটকা এখন 'র'-এর সাইবার-সেলে চাকরি করে। দিল্লিতে থাকে।"

আর্দ্রতা আবার ঝুঁকে এল ওর দিকে, "ওই সফ্টওয়্যারটার একটা আন-আপগ্রেডেট ভার্সান তোর কাছেও আছে, তাই তো?"

আবহ থতমত খেয়ে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু... ওটা আমাদের ফ্যামিলি-সিক্রেট। ওটা পাবলিকলি আমি কখনও ব্যবহার করতে পারব না। তা হলে ছোটকা হেবি রেগে যাবে। ওর চাকরি নিয়ে টানাটানিও পড়ে যেতে পারে!"

আর্দ্রতা আবার ওর হাতের আঙুলগুলোকে নিজের বরফ-ঠান্ডা আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরল, "প্লিজ় আবহ, তোর মৃত্যুপথযাত্রী এই বন্ধুটার জন্য এক বার ওই সফ্টওয়্যারটাকে ব্যবহার কর তুই। কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না। শুধু তুই তোর ফোন থেকেই সার্ভিলেন্সটা করবি।"

আবহ ভীষণরকম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু হঠাৎ আমি ওই ট্র্যাকিং-সফ্টওয়্যার দিয়ে কাকে ট্র্যাক করব? আর কেনই বা করব?"

হেমন্তের সন্ধেয় আকাশের গায়ে সদ্য ফুটে ওঠা হলুদ চাঁদটার মতো ফিকে হেসে আর্দ্রতা বলল, "আমার বাবা আর দাদা মিলে আমার মায়ের মৃত্যুর সময় যে জঘন্য অপরাধের বীজটা বপন করেছিল, আমি নিজে মরে যাওয়ার আগে সেটাকে সংশোধন করে দিয়ে যেতে চাই রে! ব্যস, এইটুকুই..."

মহাসপ্তমী

দোতলার ল্যান্ডিংয়ের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাল আবহ; সকাল আটটা-পঁয়ত্রিশ। বাড়ি থেকে হেঁটে গিয়ে যাদবপুর থেকে ট্রেন ধরলে অধিরাজ স্যারের বাড়ি পৌঁছতে সাড়ে ন'টার বেশি লাগার কথা নয় ওর। সময়টা মনে-মনে ক্যালকুলেশন করতে-করতেই ও দোতলায় নিজের ঘরে এসে ঢুকল। মোবাইল অন করে বিশেষ সফ্টওয়্যার-অ্যাপটায় চোখ বোলাল আর-এক বার। এই বিশেষ সফ্টওয়্যার-অ্যাপটা দেশের আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা-সংস্থা ব্যবহার করে থাকে। এই সফ্টওয়্যার-অ্যাপটার গুণ হল, এ যে মোবাইলে থাকবে, সেই মোবাইল থেকে, অন্য যে কোনও সেভ্‌ড নম্বরের যে কোনও অন-লাইন চ্যাট এমনকি কথাবার্তা টেক্সট-মেসেজ পর্যন্ত তর্জমা করে, অত্যন্ত গোপনে, অ্যাপব্যবহারকারীর মোবাইলে পাঠিয়ে দিতে পারে এবং যার তথ্য ট্যাপ হল সে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারে না।

এই বিশেষ এথিকাল হ্যাকিং সফ্টওয়্যারটা ডিজ়াইন করার জন্যই আবহর ছোটকা বর্তমানে 'র'-এর সাইবার-ডিভিশনে, উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ারের পদে চাকরি পেয়েছেন। সফ্টওয়্যারটার একটা প্রাইমারি অ্যান্ড্রয়েড ভার্সান ছোটকা এ বাড়ির পুরনো ল্যাপটপটায় রেখে গিয়েছিল, এটা আবহ ভালই জানত। আর ছোটকার ল্যাপটপের সবচেয়ে কঠিন পাসওয়ার্ডটা, ও গোয়েন্দা গল্প বিন্দুমাত্র ভাল না বাসলেও, দিব্যি মুখস্থ বলে দিতে পারে চির কালই!

তাই সফ্টওয়্যারটার অ্যান্ড্রয়েড ভার্সানটাকে নিজের মোবাইলে ইনস্টল করে নিতে আবহর সময় লেগেছে মাত্র পাঁচ মিনিট। তার পর গোটাদুয়েক বিশেষ নম্বরের উপর ও এই বিশেষ সফ্টওয়্যার-ডিভাইসটা দিয়ে নজরদারি চালিয়েছে বিগত কয়েক দিনে। সেই নম্বর দুটোর একটা হল, ওর স্কুলের নিকটতম বন্ধু পয়ার এবং কোচিংয়ের বন্ধু জারুল!

ওরা দু'জনে অবশ্য এ ব্যাপারে কেউ কিছুই বুঝতে পারেনি। গোল-গলা টি-শার্টের তলা দিয়ে, হেডফোনের তারটাকে বের করে, এক-কানে গুঁজে রেখে, মোবাইলটাকে জিন্‌সের ডান-পকেটে পুরে রাখার লুকটাকে বেশ কয়েক দিন ধরে বন্ধুদের চোখের সামনে রাস্তায় ও কোচিংয়ের বাইরে আবহ এমন সন্তর্পণে তুলে ধরেছে যে, পঞ্চমীর সন্ধেবেলা ঋষিণ স্যারের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পয়ার বা জারুল, কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি, ওরা দু'জনেই এখন আবহর পকেটের মধ্যে, ওদের সমস্ত চলভাষিক সমস্ত কথোপকথন নিয়ে, চুপচাপ ট্র্যাক্‌ড হয়ে যাচ্ছে!

আজও মোবাইলটায় এক বার সতর্ক নজর বুলিয়ে নিয়ে, চল-যন্ত্রটাকে জিন্‌সের পকেটে চালান করে দিয়ে, ট্রেনের পাদানিতে টুপ করে উঠে পড়ল আবহ। আজ মোটেও অকুস্থলে পৌঁছতে দেরি করতে চায় না আবহ। পয়ার বা জারুলের মতোই আজকের এই আপাত ভাবে প্যান্ডেল-হপিং এবং তার নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা অন্য কোনও গভীর ষড়যন্ত্রের প্ল্যানটার থেকে, এক-চুলও নিজের চোখ সরাতে রাজি নয় ও। আবহ কথা কম বলে। তাই ওর কানটায় সব সময়ই অন্যের সব কথাবার্তা ভালই রেজিস্টার্ড হয়ে যায়। তাই ও জানে, পয়ার এত ক্ষণে ঝিলকে নিয়ে নির্ঘাত অধিরাজ স্যারের বাড়ির পথে হাঁটা লাগিয়ে দিয়েছে। ঝিল আর পয়ার কাছাকাছি থাকে। আর ওদের দু'জনের বাড়ি থেকে অধিরাজ স্যারের বাড়ির দূরত্বটা হাঁটা-পথের মধ্যেই পড়ে। আবহ ট্রেন থেকে নেমে, স্টেশনের পিছনের শর্টকাট রাস্তাটাই ধরল। ওর গাট-ফিলিংস বলছে, আজ পয়ার এক বারের জন্যও ঝিলকে নিজের কাছ-ছাড়া করতে চাইবে না। তাই ওকেও যত দ্রুত সম্ভব, ওদের আশপাশে গিয়ে পৌঁছতেই হবে। অবশ্য আবহর গোটা নজরদারির প্ল্যানটার মধ্যে জারুল মেয়েটি, একটা ছোট কাঁটার মতো গেঁথে রয়েছে। ওকেও একটু ম্যানেজ করা দরকার। কিন্তু কী ভাবে?

কথাগুলো ভাবতে-ভাবতেই স্যারের বাড়ির পথে হাঁটতে লাগল আবহ। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করল এক বার। ট্র্যাকিং-ডিভাইসটা খবর দিচ্ছে, একটু আগেই একটা অচেনা এবং আন-সেভ্‌ড নম্বর ওকে জানিয়েছে, বেলা বারোটায়, সে বেহালা-চৌরাস্তার কাছে ওর জন্য অপেক্ষা করবে।

পয়ারের এই নেপথ্য-সঙ্গীটি যে কে, সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে আবহ। এবং পয়ারের এই ফোন-সঙ্গী যে কী ভাবে পয়ারের মতো একটা ভাল ছেলেকে নরকের দিকে টেনে নামাতে চাইছে, সে ব্যাপারটাও, আবহ আর্দ্রতার কাছ থেকে অনেক আগেই জানতে পেরেছে। কিন্তু আবহর পয়ারের উপর ভরসা ছিল। ও ভেবেছিল, উষ্ণীষের মতো একটা খারাপ ছেলের পাতা ফাঁদকে, পয়ার নিশ্চয়ই বুঝে ফেলতে পারবে।

কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে, উষ্ণীষ পয়ারকে পাঁকে নামিয়েই নিজের নোংরা স্বার্থসিদ্ধিটা করতে চাইছে। তাই আজকে উষ্ণীষকে হাতে-নাতে ধরে একটা শিক্ষা দিতেই হবে ওকে! দাঁতে-দাঁত চেপে, সামনের দিকে এগিয়ে গেল আবহ।

কিছুটা এগিয়ে আবারও পকেট থেকে মোবাইলটাকে বের করে, চোখের সামনে তুলতে হল ওকে। আবার ট্র্যাকিং-ডিভাইসে খবর

এসেছে; এবার দেখা যাচ্ছে, জনৈক মি. বসু জারুলকে এই একটু আগেই ফোন করে আজকেই তাঁর গড়িয়াহাটের অফিসে ঝিলকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছেন। এই জায়গাটাতে এসেই ব্যাপারটা কেমন যেন সব গুলিয়ে-ঘেঁটে যাচ্ছে আবহের কাছে। রহস্যের নকশাটাকে ও যেন ঠিক ধরেও শেষ পর্যন্ত ধরে উঠতে পারছে না।

জারুল তো অধিরাজ স্যারের বাড়িতেই লাস্ট বায়োলজির ক্লাসে, প্রথম ঝিলের মুখোমুখি হল। তাই না ও আবহর দিকে ফিরে, সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "এই মেয়েটা আবার কে রে?"

তার পর অবশ্য পরশু মানে পঞ্চমীর সন্ধেয়, ঋষিণ স্যারের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে, জারুল যে একটু বেশি-বেশিই গায়ে পড়ে ঝিলের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছিল, সেটা আবহ ভালই খেয়াল করেছে। তাই গোয়েন্দা গল্পের প্রতি প্রবল ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও, স্রেফ একটা খটকার বশেই পঞ্চমীর রাতে বাড়ি ফিরে জারুলের ফোনালাপটাকেও এক বার ট্র্যাপ করে দেখেছিল আবহ। তখন জারুলের লিখিত কিছু চ্যাট থেকে এই মি. বসু এবং তাঁর দৌলতে ঝিলকে নিয়ে জারুলের প্রথম ইনভেস্টিগেশন-অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদির কিছু টুকরোটাকরা অথচ সন্দেহজনক বিষয় ওর চোখে আসে।

তা হলে কী জারুলও পয়ারের মতোই এই ষড়যন্ত্রের আর-এক জন ক্রীড়ানক? কিন্তু ওকে এই কুহক-জালে জড়াল কে? ওই জনৈক মি. বসু? এই 'মি. বসু' কী সেই বসু, যার কথা আর্দ্রতা বলেছিল ওকে? কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে কোঁচকানো ভুরুটাকে আবার সোজা করে নিয়ে অধিরাজ স্যারের বাড়ির দরজা ঠেলে আস্তে করে ভিতরে ঢুকে পড়ল আবহ।

বেহালায় একটা প্রাচীন জমিদারবাড়ির বনেদি পুজো দেখাতে জারুলই সকলকে চিনিয়ে নিয়ে গেল। এখানে কাছেই জারুলের মাসির বাড়ি, তাই এ এলাকাটা ওর চেনা। অধিরাজ স্যার অবশ্য জমিদারবাড়ির সাবেকি ঢঙে কলাবৌ স্নানের দৃশ্য দেখে, ভীষণ আপ্লুত হয়ে খচাখচ ফটো তোলা শুরু করে দিলেন। তার পর ওদের দিকে এগিয়ে এসে ভীষণ উত্তেজিত ভাবে বোঝাতে লাগলেন, এমন সব ঐতিহ্যবাহী পুজোর ফটো, সঠিক অ্যাঙ্গেল থেকে তোলাটায় ঠিক কতটা দক্ষতার দরকার হয়! স্যার যখন আপন মনে ফটো তোলার কথা বলে চলেছেন, তখন রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতেই আবহ খেয়াল করল, ঝিল এক-ফাঁকে পিছিয়ে পড়ে, পয়ারের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে, ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, "এখান থেকে ফিরে কিন্তু ওই গড়িয়াহাটের মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্টটাকে চিনে আসতেই হবে আমাকে। কথাটা মনে রাখিস।"

কথাটা বলেই ঝিল আবার চট করে পয়ারের পাশ থেকে সরে স্যারের পাশে চলে এল। আবহ এমন মুখ করল, ও-ও যেন এত ক্ষণ মন দিয়ে শুধু স্যারের কথাই শুনে চলেছে। কিন্তু ওর মাথার মধ্যে না চাইতেও ফেলুদার মতো মগজাস্ত্রটা আবারও সচল হয়ে উঠল! ঝিল হঠাৎ আবার পয়ারের সঙ্গে গড়িয়াহাটের দিকে যেতে চাইছে কেন? ও যে মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্টের নামটা এক্ষুনি নিল, সেটার কথাই তো ও জারুলকে ওই জনৈক মি. বসুর সঙ্গে বলতে শুনেছে, ট্র্যাকিং-ডিভাইসটার মারফত। এটা আবার কী জট পাকিয়ে উঠল রে বাবা!

নিজের অজান্তেই ভুরু দুটো আবার দ্বিতীয় বন্ধনীর মতো কুঁকড়ে গেল আবহর।

জমিদারবাড়ির পুজো দেখে বেরিয়ে অধিরাজ স্যার যখন অটোর জন্য এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছেন, তখনই পয়ার হঠাৎ ম্যান্টন পর্যন্ত হাঁটার প্রস্তাবটা দিয়ে বসল স্যারকে। স্যার তখন ফটো তোলার আনন্দে মশগুল, তাই পয়ারের অভিসন্ধি কিছুই টের পেলেন না। কিন্তু আবহর মনে হল, এত বড় একটা রিস্ক-গেম খেলার আগে, বন্ধু হিসেবে, এক বার অন্তত ওর পয়ারকে সাবধান করে দেওয়াটা উচিত কাজ হবে। একটু আগেই পয়ারের ফোনে উষ্ণীষের বার্তা এসে পৌঁছেছে; ও এই ম্যান্টন নামক জায়গাটার আশপাশেই কোথাও ওত পেতে রয়েছে। মোবাইলের ট্র্যাকিং-ডিভাইস মারফত, এ খবরটা যে আবহর কাছেও নিঃশব্দে চলে এসেছে পয়ারের ফোন থেকে, সেটা অবশ্য পয়ার টেরও পায়নি।

আবহ একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। স্কুলে যে গুটি কয়েক মাত্র বন্ধু আছে ওর, তার মধ্যে পয়ারের সঙ্গে ওর বন্ডিংটা সবচেয়ে ভাল। সিংহভাগ কোচিংয়েও ওরা দু'জনে সেই এইট-নাইনের বয়স থেকে এক সঙ্গে পড়ে। পয়ার তো আবহর চেয়েও লেখাপড়ায় বেশি ভাল। তবু সেই বন্ধুটাই আজ পরিস্থিতির চাপে পড়ে, এমন একটা বিপজ্জনক খাদের দিকে নেমে যাচ্ছে দেখে আবহর মনে-মনে ভারী কষ্ট হল।

তাই ও খানিকটা কায়দা করেই মৃদুস্বরে বলে উঠল, "হঠাৎ ম্যান্টন পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার দরকার কী তোর? চৌরাস্তা পর্যন্ত একটা অটো নিয়ে নিলেই তো ভাল হত।"

আবহর এই সামান্য খোঁচাটাতেই যেন চমকে উঠল পয়ার। তবে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে জোর করে একটা হাসি ফুটিয়ে, পয়ার বলল, "আরে... ও দিকে আমার এক জন আত্মীয় থাকেন; মা বলেছে, এক বার অন্তত ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসতে..."

আবহ এর পর আর কথা বাড়াল না এ প্রসঙ্গে। ও মনে-মনে ভাবল, এখন আর পয়ারকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। বরং এখন ওই উষ্ণীষ বদমাশটাকে হাতে-নাতে ধরতে পারলেই লাভ হবে বেশি। কিন্তু আবহর এখানে একটাই মাইনাস পয়েন্ট, ও পয়ারের মতো এত ভাল করে এই বেহালার রাস্তাঘাট চেনে না। তবু রাস্তার চার দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে চুপচাপ হাঁটতে থাকল আবহ।

হঠাৎ কিছু দূর এগোনোর পর সামনের বাঁ-হাতি গলিটা থেকে একটা ক্রিমরঙা গাড়ি বেড়িয়ে এসে ওদের সামনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পয়ার ঝিলের পাশ থেকে সরে গিয়ে, ফুটপাতের এক কোণে রোবটের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল।

অধিরাজ স্যার জারুলের সঙ্গে নিজের ফটো তোলার গল্প নিয়ে এতটাই মশগুল ছিলেন যে, গাড়িটা হঠাৎ করে মুখের সামনে এসে পড়াতে তিনিও প্রথমটায় কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

আবহ খেয়াল করল, ইতিমধ্যে গাড়ির কালো কাচ নামিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়েছে উষ্ণীষ। ও উত্তেজিত ভাবে পয়ারকে বলছে, ঝিলকে ধরে ওর গাড়ির মধ্যে তুলে দিতে। কিন্তু পয়ার তত ক্ষণে কেমন যেন ফ্যাকাসে মেরে পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গিয়েছে। এক-চুলও কোনওদিকে নড়ছে না।

হঠাৎ এই উত্তেজনার মুহূর্তেই আবহর মনে পড়ল, পয়ারের দাদুর বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন পয়ারদের বাড়িতে সন্ধেবেলা এসেছিল উষ্ণীষ। সেটা ছিল অগস্টের একটা সন্ধেবেলা। তখন অবশ্য ও উষ্ণীষের আজকের এই পরিচয়টা জানত না; ও কেবল জানত, উষ্ণীষ হল পয়ারের জ্যাঠতুতো দাদা, ছন্দকদার ব্যাচমেট। কিন্তু সেদিনও আবহ খেয়াল করেছিল, পয়ারকে হঠাৎ একা টানতে-টানতে গলির অন্ধকার কোনায় নিয়ে গিয়েছিল এই বড়লোকের বিগড়ে যাওয়া ছেলেটা। খুব নিচু গলায় হাত-মুখ নেড়ে উষ্ণীষ পয়ারকে কিছু একটা বলছিল... সেটা যে আজকের এই জঘন্য ষড়যন্ত্রটার সূত্রপাত ছিল, সে দিন তার আঁচ পর্যন্ত পায়নি আবহ। আর হঠাৎ করে আর্দ্রতা এই শহরে এসে না-পড়লে বোধ হয়, আজকের এই নাটকটাও এখানে উপস্থিত বাকি সকলের মতোই আবহর কাছেও একটা হঠাৎ দেখা দুর্ঘটনা হয়েই থেকে যেত। কিন্তু...

আবহর এই অন্যমনস্কতাটুকুর সুযোগে ফ্র্যাকশন-অফ-সেকেন্ডের মধ্যে উষ্ণীষ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পয়ারকে এক ধাক্কায় রাস্তার উপর ফেলে দিল। তার পর ঝিল কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওই রোগা ফড়িংয়ের মতো মেয়েটাকে গাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল শয়তানটা। তার পর সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে আবার ইঞ্জিন সচল করল উষ্ণীষ। গাড়ির মধ্যে থেকে আতঙ্কিত ঝিল আর্তনাদ করে উঠল, "স্যার! পয়ার! জারুল! আবহ... এ সব কী হচ্ছে? আমাকে বাঁচান আপনারা..."

তাড়াতাড়ি সম্বিৎ ফিরে পেয়েই গায়ের মাংসপেশিগুলোকে শক্ত করে ফেলল আবহ। তখনও অধিরাজ স্যার, জারুল, আর পথচলতি
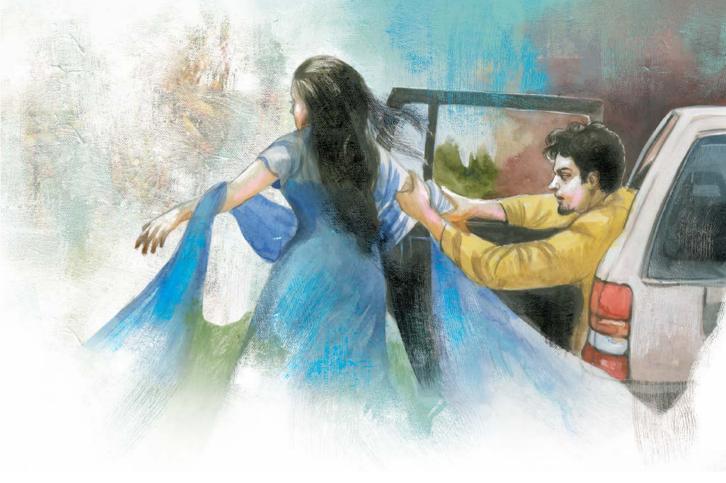
কয়েক জন মানুষ অবাক ও হতভম্ব অবস্থায়, কী থেকে কী হয়ে গেল, সেটা বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

কিন্তু আবহ আর দেরি করল না। রাস্তায় পড়ে যাওয়া পয়ারকে একটা ছোট্ট লাফে ডিঙিয়ে গিয়ে ও গলি থেকে বাঁক নিয়ে, বড় রাস্তায় ওঠার চেষ্টা করতে থাকা ক্রিমরঙা গাড়িটার দিকে দৌড় দিল। এমন সময় ঠিক আবহর মুখের সামনে ঘটনাটা দেখে, এক জন পথচলতি ভদ্রলোক স্কুটিটাকে দাঁড় করালেন। আবহ চটপট সেই ভদ্রলোকের স্কুটির পিছনে লাফিয়ে উঠে দাপটের সঙ্গে বলল, "কাকু, কুইক! ওই গাড়িটাকে ফলো করুন!"

ভদ্রলোক সামান্য দ্বিধা করেও আবহর গলার জোরেই সম্ভবত, কনভিন্সড হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি তিনিও তখন গাড়িটার পিছনে ধাওয়া করলেন। আবহ স্কুটির পিছন থেকে মুখ ঘুরিয়ে জারুলের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল, "হাঁ করে দেখছিস কী! তাড়াতাড়ি মোড়ের ওই ট্রাফিক-সার্জেনকে গিয়ে খবর দে। গাড়িটার নম্বর হল..."

জারুল আবহর নির্দেশটা পেয়েই চোখের চশমাটাকে নাকের উপর ঠেলে দিতে-দিতে ছোটা শুরু করে বলল, "বলতে হবে না! আমি দেখে নিয়েছি..."

এক ঘণ্টা পর

বেহালা থানা থেকে বাইরে বেরিয়ে অধিরাজ স্যর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "অনেক বেলা হয়ে গেল। তোদের তো পেটেও কিছু পড়েনি। তোরা সবাই বরং এখন আমার সঙ্গে গড়িয়ার বাড়িতে চল। একটু কিছু খেয়েদেয়ে, রেস্ট নিয়ে, তার পর যে যার মতো বাড়ি ফিরে যাস; কেমন?"

বাকিরা স্যরের কথার উত্তরে কেউ কোনও হ্যাঁ-না করল না। সকলেরই মুখ চুন আর দৃষ্টি অন্যমনস্ক। তখন আবহই মুখটা রীতিমতো সিরিয়াস করে বলল, "না! এখন আর ও সবের দরকার নেই, স্যর। আমার মতে, এখানে উপস্থিত আমরা সবাই কাল ঠিক সকাল দশটায়, আপনার গড়িয়ার ওই বাড়িতে হাজির হয়ে যাব। সবাই এক সঙ্গে বসে তখনই না হয়, আজ যে কাণ্ডটা ঘটল তার একটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে।"

আবারও সবাই চুপ। অধিরাজ স্যরই এ বার বাধ্য ছাত্রের মতো, আবহর কথাটায় মাথা দুলিয়ে বললেন, "বেশ, তাই-ই হোক তা হলে।"

আবহ তখন পয়ারের দিকে ঘুরে সেই রকমই চাবুক-গলায় বলে উঠল, "তুই আর এখানে বেজার মুখ করে বসে থেকে কী করবি? যা, সামনের ওই ওষুধের দোকানটা থেকে ঝিলের মাথার ক্ষতটায় একটু ফার্স্ট-এইড করিয়ে আন। আর সেই সঙ্গে ঠিক করে নিস, এই অঘটনটার জন্য ঝিলের মায়ের কাছে তুই কী-কী মিথ্যে জবাবদিহি করবি! কারণ, কাকিমা কিন্তু তোর ভরসাতেই ঝিলকে আমাদের সঙ্গে আজ ঘুরতে যাওয়ার পারমিশনটা দিয়েছিলেন।"

পয়ার আবহর কথাটা শুনে নিজেকে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে ফেলল।

এমন সময় একটা ধূসর এসইউভি গাড়ি এসে থানার সামনে থামল। গাড়ি থেকে এক জন সুট-বুট পরা ভদ্রলোক, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা এঁটে গটমটিয়ে ভীষণ থমথমে মুখে কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা থানার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

ভদ্রলোককে দেখেই আবহ, জারুলের দিকে ঘুরে তাকাল। জারুল এক-ঝলক চমকে উঠলেও ঝপ করে নিজের দৃষ্টিটাকে সরিয়ে নিল অন্যদিকে। আবহর বুঝতে বাকি রইল না যে, কিছু ক্ষণ আগের এই অপহরণকাণ্ডের কীর্তিমান শ্রীমান উষ্ণীষকুমারের পিতা এবং জারুলের ফোনালাপের সেই জনৈক 'মি. বসু', দু'জনেই আসলে একটিই লোক। সদ্য থানার মধ্যে ঢুকে যাওয়া ঘন মেরুন সুট পরা এই রাশভারী ভদ্রলোকটি; যিনি সামাজিকভাবে, মি. অনিকেত বসু বিশিষ্ট শিল্পপতি বলে পরিচিত এবং অতি অবশ্যই জারুলের ইনভেস্টিগেশন-

অ্যাসাইনমেন্টের বস! এখন ভদ্রলোক নিশ্চয়ই থানা থেকে নিজের কীর্তিমান ছেলেকে জামিনে ছাড়ানোর জন্যই তড়িঘড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে, এখানে ছুটে এসেছেন। ওরা চার জনে তার পরে আবার অধিরাজ স্যারের সঙ্গে রাস্তায় নেমে এল।

সপ্তমীর বিকেল ফুরিয়ে কলকাতার চার দিকে তখন আলোর রোশনাই একটু-একটু করে ফুটে উঠছে। এমন একটা উৎসবের আনন্দ-আবহে ওরা চার জন কিশোর-কিশোরী কিন্তু একেবারে নীরবে, নিজের-নিজের বৃত্তে, একটা ঘোর লাগা অদ্ভুত অনুভূতির মোহ-পরশ নিয়ে আবার মিশে গেল এই কল্লোলিনীর উৎসব-মুখর কলস্রোতে...

শেষ

"আজ মহাষ্টমী। পুরাণানুসারে আজকের দিনেই বসন্তকালের বদলে অকাল-শরতে, রামচন্দ্র, রাবণ-বধের সংকল্প নিয়ে মা দুর্গার আরাধনা শুরু করেছিলেন। তাই দুর্গাপুজোর এই সন্ধিক্ষণকে বলে অকালবোধন। আর আজ আমরাও এখানে এক অশুভ-শক্তির ভান্ডাফোঁড় করতে সকলে সমবেত হয়েছি; তাই আজকের এই মহাষ্টমীর অন্য রকম আবহাওয়াটাকেও এক রকমের অকালবোধনই বলা চলে।"

বেশ নাটুকে একটা বক্তব্য রেখে আবার সকলের মাঝখানে সোফার উপর বসে পড়ল আবহ। অধিরাজ স্যার তখন কফির ধোঁয়া ওঠা মাগগুলো সমেত ট্রে-টাকে সেন্টার-টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, "চা, জলযোগ সহকারেই এ বার বাকি কথাবার্তা হোক।"

সকলে নিঃশব্দে তখন যে যার কফিমাগ হাতে তুলে নিল। গড়িয়ার এই জায়গাটায় শহরের দক্ষিণতম প্রান্ত; সবে একটু-একটু করে সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাই এখনও ছোট-বড় বাড়ি ও বহুতলের ফাঁক গলে, এখানে চার দিকে বেশ খানিকটা সবুজের দেখা মেলে। কাছেই একটা পুকুর রয়েছে; তাতে সাদা আর গোলাপি শাপলা ফুল ফুটে রয়েছে। এটা অধিরাজ স্যারের দিদির বাড়ি। ওঁরা পুজোয় মধ্য প্রদেশ বেড়াতে গেছেন; তাই স্যর এখন ক'টা দিন এই বাড়িতে পাহারা দিতে রয়েছেন।

গতকালের কথা মতো ওরা সকলেই সকাল দশটার মধ্যে এখানে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু এক মাত্র আবহ ছাড়া আজ পয়ার, জারুল বা ঝিলম, কারও মুখেই এখনও পর্যন্ত কোনও কথা ফোটেনি। কিছু ক্ষণ পরিবেশটা নিস্তব্ধ থাকার পর আবহই কফিমাগটা হাতে করে, আবার উঠে দাঁড়াল। অধিরাজ স্যার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই-ই যখন এত ঘটা করে মিটিংটা ডাকলি আজ, তখন তোর কী বলার আছে, সেটা তুই চটপট বলে ফ্যাল এ বার।"

জারুলের গোটা ঘরের পরিবেশটা দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ যেন ঠিক ফেলুদার উপন্যাসগুলোর মতো শেষ পর্বে এসে, পর-পর যুক্তির জাল ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে কেস সল্‌ভ করার মতো পরিবেশ!

জারুল তাই নড়েচড়ে বসতে-না-বসতেই, আবহ নিজের গলাটাকে একটু ঝেড়ে নিয়ে বলল, "গতকাল আমাদের বন্ধু ঝিলমের সঙ্গে যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা আমার কাছে পুরোপুরি অনভিপ্রেত ছিল না। এর অনেকটাই আমি আগে থেকে পূর্বাভাস পেয়েছিলাম এবং সেই মতো সতর্কও ছিলাম। না হলে হয় তো ঝিলমের সঙ্গে আরও সাংঘাতিক কিছু হতে পারত!"

কথাটা বলেই আবহ ওর জ্বলন্ত চোখ দুটো তুলে, পয়ারের দিকে নিঃশব্দে এক বার তাকাল। কিন্তু পয়ার কোনও কথা বলল না। নিজের কালো হয়ে আসা মুখটাকে আবার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মেঝের কার্পেটের দিকেই স্থির ভাবে তাকিয়ে রইল।

আবহ বলল, "আমি এই গোটা ষড়যন্ত্রের ছকটা প্রথম যার কাছ থেকে জানতে পারি, সে সম্পর্কে আমার অনেক ছোটবেলার বন্ধু; তার নাম আর্দ্রতা বসু।"

আর্দ্রতা বসু নামটা শুনে সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টি বিনিময় করল। কিন্তু আবহ নিজের ছন্দে ঠান্ডা গলায় স্পষ্ট স্বরে বলে যেতে লাগল, "আর্দ্রতা, এই শহরে এসে পড়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে, এক রকম দুরারোগ্য জিনঘটিত কিডনির অসুখ নিয়ে। ও এখন বিছানায় পুরোপুরি শয্যাশায়ী। তাই শত ইচ্ছে থাকলেও, ও আজকের আমাদের এই মিটিংয়ে কিছুতেই আসতে পারল না। তবে ও এখন আমার এই মোবাইলের ও প্রান্তে অনলাইন রয়েছে।"

আবহ সামান্য পজ় দিয়ে তার পর ঝিলের দিকে ফিরে বলল, "আজ আর্দ্রতা না থাকলে কিন্তু উষ্ণীষের হাত থেকে তোকে বাঁচানোটা সম্ভব হত না রে।"

আবহর এই শেষ কথাটা শুনে ঝিল ওর মুখের দিকে একটু ক্ষণ অবাক চোখে তাকাল। তার পর হাত বাড়িয়ে আবহর মোবাইলটা চেয়ে নিয়ে বলল, "আমাকে তোর ফোনটা দিবি একটু? আমি আর্দ্রতাকে একটা থ্যাঙ্কস দিতে চাই।"

আবহ নিজের ফোনটাকে তখন লাউড-স্পিকার মোডে দিয়ে সেন্টার-টেবিলের উপর রাখল। ঝিল কিছু বলে ওঠার আগেই ফোনের ও প্রান্ত থেকে একটা রিনরিনে গলা বলে উঠল, "ঝিল! আমাকে তুমি হয়তো চেনো না। কিন্তু আমি তোমার কথা শুনেছি। আমার বাবা এবং দাদা দু'জনেই তোমার সঙ্গে এবং তোমার পরিবারের সঙ্গে যে অমানুষিক আচরণটা করেছে, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার বাবা আর দাদার পাপের জন্যই সম্ভবত আমার শরীরে এই বিরল রোগটা এমন করে অকালে কামড় বসিয়েছে!"

শেষ কথাগুলো বলতে-বলতে আর্দ্রতার গলাটা একটু কেঁপে গেল। আবহ তখন ফোনটাকে টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আবার সাইলেন্ট করে দিল। অধিরাজ স্যার এবার নড়েচড়ে বসে বললেন, "এই আবহ, একটু গুছিয়ে প্রথম থেকে সবটা শুরু কর না। না হলে যে কিছুই ঠিক ধরতে পারছি না।"

আবহ বলল, "বেশ, তাই হোক। আমি প্রথম থেকেই সবটা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি। আমার কোথাও কোনও তথ্যে ফাঁক পড়ে গেলে, তোরাও একটু সাহায্য করিস।"

এই কথা বলে আবহ বাকি তিন জন বন্ধুর মুখের দিকে নিজের উদ্দীপিত দৃষ্টিটাকে আরও এক বার বুলিয়ে নিল।

তার পর ও বলল, "এই ঘটনা বা ষড়যন্ত্রে লাঞ্ছিত হয়েছে এক জনই, তার নাম ঝিলম ঘোষ। এবং ঝিলম ঘোষকে লাঞ্ছিত করার পিছনে কাকতালীয় ভাবে রয়েছে একই পরিবারের পিতা এবং পুত্র, শ্রীঅনিকেত বসু ও তাঁর ছেলে উষ্ণীষ। ঘটনাচক্রে আবার এঁরা দু'জনে আর্দ্রতা বসুর বাবা এবং বড় ভাই হয়!"

আবহ একটু দম নিল। তার পর বলল, "ঝিলকে বেকায়দায় ফেলার জন্য অনিকেত বসু এবং তাঁর ছেলে উষ্ণীষের, দু'জনেরই দুটো সম্পূর্ণ আলাদা মোটিভ ছিল। সবার আগে আমাদের সেই মোটিভ দুটোকে ক্লিয়ার করে নেওয়া দরকার।"

জারুলের হঠাৎ কেন যেন মনে হচ্ছে, ওর চেয়ে বড় গণ্ডমূর্খ এ ঘরে এখন আর কেউ নেই! অনিকেত বসু আসলে ওর মতো একটা বাচ্চা মেয়ের গোয়েন্দা হওয়ার উৎসাহটাকে কাজে লাগিয়ে, নিজের কোনও একটা কুমতলব ঢুকিয়ে নেওয়ার তালে ছিল! আর জারুল এতটাই বোকা যে, ওই ঝকঝকে অফিসটায় ঢুকে, ও বাদ দিয়ে আর একটাও চাকরিপ্রার্থীকে ওখানে না-দেখেও, কিচ্ছুই আন্দাজ করতে পারেনি!

এই জন্যই ওর মতো একটা আন্ডার-এজেড মেয়েকে এতটা তোল্লাই দিয়ে, ফানুসের মতো স্বপ্নের আকাশে উড়িয়ে, নিজের কাজটাকে বুঝে নিতে চেয়েছিলেন, ওই শয়তান, মি. বসু! বসু নিশ্চয়ই ওকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠানোর আগেই লোক লাগিয়ে, ওর ব্যাকগ্রাউন্ডটাও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিয়েছিল। তার পর অতি ধূর্ত শেয়ালের মতো বেছে-বেছে ঠিক ওকেই, ঝিলের পিছনে এমন ভাবে লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল যে, ঝিলের বাড়ি ও পড়াশোনার ফিল্ডের কাছাকাছি থাকে, অথচ সরাসরি ঝিলের ব্যাপারে কিছুই জানে না।

কী সাংঘাতিক ঘড়েল লোক রে বাবা! হঠাৎ অনিকেত বসুর উপর রাগে জারুলের খুব ইচ্ছে হল ওই বাজে লোকটার চোখ থেকে সোনার

চশমাটাকে খুলে, এক-টানে মেঝেতে আছাড় মেরে, ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিতে! ঠিক যেমন গত কাল অচেনা বাইকটার পিছনে লাফিয়ে উঠে, উষ্ণীষের গাড়িটাকে তাড়া করেছিল আবহ। তার পর ঠিক যেন সিনেমার স্টান্টের কায়দাতেই, আবহ বাইকটার পিছন থেকে, একটা রোমহর্ষক লাফ দিয়ে সজোরে আছড়ে পড়েছিল, একদম চলন্ত গাড়িটার উইন্ডশিল্ডের কাচটার উপর।

ফলে বাধ্য হয়েই তখন গাড়িটাকে আবার ব্রেক কষে থামিয়ে দিয়েছিল উষ্ণীষ, আর তত ক্ষণে ওয়াকিটকিতে সামনের সিগন্যালের ট্রাফিক-গার্ডকে সতর্ক করতে-করতে, জারুলের সঙ্গে ছুটে অকুস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন, ম্যান্টন মোড়ের সেই কর্তব্যরত ট্রাফিক-সার্জেনটি। উফ্ফ, গতকাল ওইটুকু সময়ের মধ্যে ঝিলকে উদ্ধার করতে, মুখচোরা বলে এত দিনের পরিচিত আবহ যে-অবিশ্বাস্য চমকটা দেখাল, তার পর থেকে তো জারুল ওকেই মনে-মনে নিজের নতুন গোয়েন্দা-আইকন বলে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে!

অন্যমনস্কতাটা কাটিয়ে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল জারুল। তার পর আবহর মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু মি. বসুর ঝিলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানোর ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক কী ছিল?"

আবহ মুচকি হেসে বলল, "বলছি," তার পর ঝিলের দিকে ফিরে বলল, "আমি যতটুকু আর্দ্রতার কাছ থেকে জানতে পেরেছি, সেটাই আগে বলছি। আমি যদি কিছু ভুল বলি, ঝিল, তুই আমাকে শুধরে দিস।"

কথাটা বলেই, আবহ কফিমাগটা টেবিলে নামিয়ে রেখে আবার সকলের দিকে ফিরে তাকাল। তার পর ঘরের মধ্যে মৃদু পায়চারি শুরু করে বেশ গল্প করার ঢঙে ও বলতে শুরু করল, "বছর আষ্টেক আগে, ব্যারাকপুরে ঘোষ অ্যান্ড বোস কটন মিল নামের একটি কারখানার গেটে একটি অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রমিক অসন্তোষ ঠেকাতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে স্পট-ডেড হন, ওই কারখানাটির অন্যতম মালিক মি. অভিজ্ঞান ঘোষ; যিনি ছিলেন, আমাদের মধ্যে এখন উপস্থিত, আমাদেরই বন্ধু, ঝিলম ঘোষের বাবা!"

সকলে তখন সবিস্ময়ে ঝিলের দিকে ঘুরে তাকাল। ঝিল, ওর চোখ থেকে গড়িয়ে আসা জলের ধারাটাকে রুমালের প্রান্ত দিয়ে মুছে ফেলল।

আবহ আবার বলল, "এই দুর্ঘটনার পরে ঘোষ অ্যান্ড বোস কটন মিলের দরজায় চিরকালের মতো তালা পড়ে যায়। অভিজ্ঞান ঘোষের মৃত্যু বা হত্যারও কোনও সঠিক তদন্তও হয়নি তার পর। পুলিশ অজ্ঞাত কারণে কেসটা থেকে সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। এমনকি ব্যবসাটির বাকি টাকাপয়সারও আর কোনও হিসেব বা হদিশ পাওয়া যায়নি। সে সব টাকাপয়সার সিংহভাগ শেয়ার, যা অভিজ্ঞান ঘোষের পরিবারের ন্যায্য পাওনা ছিল, তাঁরা সেসবের কানাকড়িও পাননি। তাই তো ঝিল আর ঝিলের মা, এখনও ভাড়াবাড়িতে থেকে হোম-ডেলিভারির রান্নাবান্না করে কোনওমতে সংসার চালান।"

ঝিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে-আস্তে ঘাড় নেড়ে, আবহর সব কথায় সমর্থন করল। জারুল তখন ঝিলের প্রতি সমবেদনায়, ওর হাতটাকে শক্ত করে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

আবহ বলল, "এই দুর্ঘটনার আগে থেকেই রীতিমতো ষড়যন্ত্র করে রটানো হয়েছিল যে, ওই ঘোষ অ্যান্ড বোস কটন মিলের শ্রমিকদের যত বকেয়া টাকা-পয়সা, সব নাকি মি. অভিজ্ঞান ঘোষই বেনামে অন্যত্র সরিয়ে নতুন ব্যবসায় লগ্নি করছেন! এই অপবাদ থেকেই সেদিন মি. অভিজ্ঞান ঘোষের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার আয়রনি হল এটাই, ওই কারখানার মুনাফা থেকে দিনের-পর-দিন বেহিসেবি টাকা যিনি যথেচ্ছ সরাচ্ছিলেন এবং গোপনে সেই টাকায় কিডনি ও অন্য মানব-অঙ্গের চোরাকারবারিতে লগ্নি করে, অসৎ-পথে নিজের মুনাফা লোটার পথ প্রশস্ত করছিলেন, তিনি আর কেউ নন, অভিজ্ঞান ঘোষের বিশ্বস্ত বন্ধু, শ্রীঅনিকেত বসু! এই অনিকেত বসুই তলে-তলে করাপ্টেড শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন অভিজ্ঞানবাবুর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ ভাবে খেপিয়ে তুলতে! তার পর অভিজ্ঞানবাবুর অপমৃত্যুর পর, অনিকেত বসুর টাকা লোটার রাস্তাটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি তখন ওই গোটা কটন মিলের সব টাকা-পয়সা একাই আত্মসাৎ করে নিয়ে, আজ সাতমহলা মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্টের অধীশ্বর হয়েছেন!"

মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্টের নামটা শুনে ঝিল ও জারুল, দু'জনেই চমকে আবার আবহর মুখের দিকে চাইল। অধিরাজ স্যর সব শুনেটুনে বললেন, "কিন্তু তুই এত সব পুরনো কথা, জানলি কী করে?"

আবহ বলল, "আর্দ্রতার মা, আমার শালিকমাসি, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ডায়েরি লিখে গিয়েছিলেন। সেই সব ডায়েরি তিনি তাঁর এক মাত্র আদরের মেয়ে আর্দ্রতাকে দিয়ে যান। আর্দ্রতাই ওই ডায়েরি থেকে ওর বাবার টাকার লোভে পড়ে নরকে নামার সিঁড়িগুলোর সব প্রমাণ আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে।"

অধিরাজ স্যর তখন ঝিলের দিকে ঘুরে, নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর, তোরা কেন কিছু স্টেপ নিলি না? তোরা তো তোর বাবার ব্যাপারে সব সত্যিটাই জানতিস, তা হলে?"

ঝিল ছলছলে চোখে বলল, "আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম, স্যর। আর মায়ের হাতে তখন না ছিল কোনও ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, না পাশে ছিল কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজন। তাই আমরা আর কিছুই করে উঠতে পারিনি সেই সময়। সবটাই মা নিয়তির বিধান বলে এক রকম মেনে নিয়েছিল।"

জারুল হঠাৎ শিরদাঁড়া সোজা করে বসে বলল, "কিন্তু এত দিন পরে হঠাৎ অনিকেত বসু কেনই বা সেই কবরে ঢুকে যাওয়া কেসটাকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইলেন? উনি তো আমাকে ওঁর অফিসে ডেকেছিলেন ঝিলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, ওঁর কাছে নিয়ে আসার জন্যই। উনি নাকি ঝিলের কাছে কী সব ক্ষমাটমা চাইবেন বলছিলেন..."

জারুলের কথা শুনে এবার সকলে সবিস্ময়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল। ও তখন আমতা-আমতা করে বলল, "আমি... আসলে... ছোটবেলা থেকে বরাবরই ডিটেকটিভ হতে চাইতাম বলে, 'বোস ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি'র প্রবেশিকা পরীক্ষাটায়, বাড়িতে কাউকে কিছু না-জানিয়েই বসে গিয়েছিলাম। আমি তো ভেবেছিলাম, আমি কম বয়সের কারণে ইন্টারভিউয়ে ডাকই পাব না। তার পর আমাকে অবাক করে দিয়ে, একদিন ওই মি. অনিকেত বসুর সই করা ইন্টারভিউয়ের কল-লেটার আমার বাড়িতে চলে এল..."

আবহ জারুলকে মাঝ পথে থামিয়ে বলল, "কাম টু দ্য পয়েন্ট। অনিকেত বসু গোপনে ষড়যন্ত্র পাকালেও এবং প্রয়াত অভিজ্ঞান ঘোষ অনিকেতবাবুকে ছোট ভাইয়ের মতো বিশ্বাস করলেও, অনিকেতের ট্যারা আঙুলে ক্রমাগত ঘি তোলার কিছু ফন্দি-ফিকির তিনিও টের পেয়েছিলেন। অভিজ্ঞানবাবুরও কারখানায় এবং ব্যবসার অন্যত্র, কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী, অনুগত মানুষ ছিল, যাঁরা অভিজ্ঞানবাবুর হাতে ওই দুর্ঘটনার আগে-আগেই বেশ কিছু গোপন নথি ও সিসিটিভি ফুটেজ তুলে দিয়েছিল, যাতে পরিষ্কার অনিকেত বসুর, করাপ্টেড শ্রমিক-নেতাদের সঙ্গে বসে ষড়যন্ত্র পাকানোর এবং ব্যবসায় ভরাডুবি করানোর চক্রান্তের অকাট্য সব প্রমাণ রয়েছে!"

ঝিল এই কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, "সে সব নথি এখন কোথায়?"

আবহ ওকে শান্ত করে বলল, "বলছি। ওই নথিগুলো তুই নিজের হাতে পেলে তবেই তো মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে অনিকেত বসুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোর বাবার অপমৃত্যুর প্রতিকার চেয়ে, ওই লোকটার ভালমানুষির মুখোশটাকে খুলে দেওয়ার আসল জোরটা হাতে আসবে, নাকি! আশা করি, এই লক্ষ্য নিয়েই তুই গত কাল সন্ধেবেলা পয়ারের

সঙ্গে চুপিচুপি গড়িয়াহাটে গিয়ে মণিকর্ণিকা অ্যাপার্টমেন্টটা চিনে আসতে চেয়েছিলি?”

ঝিল পয়ারের দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে আস্তে করে ঘাড় নেড়ে, ‘হ্যাঁ’ বলল। পয়ার কিন্তু কাল থেকে সেই যে পাথরের মূর্তি হয়ে রয়েছে, এখনও তেমনই মাটির দিকে, ঘাড় নিচু করে বসে রইল। একটা কথাও বলল না।

আবহ তখন বলল, “অভিজ্ঞানবাবু, তাঁর বিরুদ্ধে অনিকেত বসুর পাকিয়ে তোলা সেইসব ষড়যন্ত্রের নথি ও ফুটেজ, তার পর খুব বুদ্ধি করে একটি বিদেশি ব্যাঙ্কের লকারে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। পরে যাতে তাঁর বর্তমানে বা অবর্তমানেও সেই নথিগুলো থেকে সত্যকে উন্মোচিত করা যায়। অভিজ্ঞানবাবু এমন ভাবেই বিদেশি ব্যাঙ্কটির সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করেছিলেন যে, তাঁর এক মাত্র সন্তান অর্থাৎ ঝিলম যখন সাবালক হবে, তখন সে যদি স্বেচ্ছায় ওই সব ডকুমেন্ট নিজের আইডেন্টিটি প্রুফ দাখিল করে, ব্যাঙ্কের থেকে আন-বন্ড করে, তবেই সেগুলো আবার প্রকাশ্যে আসতে পারবে। অর্থাৎ এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে, অভিজ্ঞানবাবু কিন্তু অলরেডি নিজের জীবন সংশয়ের খানিকটা আঁচ পেয়েই গিয়েছিলেন...”

জারুল উত্তেজিত ভাবে বলল, “অব সমঝা! তার মানে, অনিকেতবাবু জানতে পেরে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মরণকাঠি ঝিলের হাতেই বাঁধা রয়েছে! তাই আমাকে দিয়ে পটিয়ে-পাটিয়ে ঝিলকে নিজের কব্জায় নিয়ে উনি ওই প্রমাণগুলোকে লোপাট করতে চেয়েছিলেন, তাই তো?”

আবহ ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ঝিল গলায় যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ধরে রেখেই আবার বলল, “কিন্তু বাবা তো এ ব্যাপারে মাকেও কিছু কখনও বলে যায়নি। তা হলে?”

আবহ মুচকি হেসে বলল, “এ সব ক্ষেত্রে ওই বিদেশি ব্যাঙ্কই তোর আঠারো বছর পূর্ণ হলে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করত...”

একটু থেমে মুখে একটা রহস্যমাখা হাসি ছড়িয়ে আবহ আবার বলল, “তা ছাড়া এই গোটা ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়াটায়, এক জন তৃতীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে গ্যারেন্টার করে গিয়েছিলেন অভিজ্ঞানবাবু।”

ঝিল, জারুল, আর অধিরাজ স্যর চরম বিস্ময়ে প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন, “কে তিনি?”

আবহ অকম্পিত গলায় বলল, “আট বছর আগে, ব্যারাকপুরের ওই কটন-মিল লাগোয়া এলাকাতেই, যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটিতে অভিজ্ঞানবাবু ব্যবসার টাকাপয়সা জমা রাখতেন, সেই ব্যাঙ্কের তদানীন্তন ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সহৃদয়তা গড়ে উঠেছিল। এই সুহৃদ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ভদ্রলোকই অভিজ্ঞানবাবুকে, তাঁর গোপন নথি ও তথ্যগুলিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, এই বিশেষ বিদেশি ব্যাঙ্কটির হদিশ দিয়েছিলেন...”

একটু থেমে, আবহ আবার বলল, “তখন কী আর স্বর্গীয় অভিজ্ঞানবাবু জানতেন, আট বছর পর নিয়তিরই জটিল আবর্তে, সেই সহৃদয় ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার বন্ধুটির কন্যার হাতে হাত দিয়ে, এক সঙ্গে বসে থাকবে অভিজ্ঞানবাবুর এক মাত্র পুত্রী, ঝিলম!”

বাকিরা কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই জারুল রীতিমতো আকাশ থেকে পড়ে, চোখের মাইনাস এগারো পাওয়ারের মধ্যে দিয়ে সর্ষেফুল দেখতে-দেখতে অবাক গলায় বলে উঠল, “তুই কি তার মানে আমার বাবাইয়ের কথা বলছিস?”

আবহ মৃদু হেসে, ঘাড় নাড়ল, “ইয়েস! আমি তোর বাবা, মি. শারদ পালের কথাই বলছি রে।”

বেশ কিছু ক্ষণ ঘরটা হতভম্ব হয়ে থাকার পর অধিরাজ স্যর ভুরু কুঁচকে বললেন, “অভিজ্ঞানবাবুর বিদেশি ব্যাঙ্কে নথি লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা, অনিকেত বসু টের পেল কী করে?”

আবহ বলল, “আমাদের দেশে কোথাওই তো মিরজ়াফরের অভাব নেই, স্যর! তাই সঠিক না-জানা থাকলেও, আমার ধারণা, ওই ব্যাঙ্কের অথবা কটন মিল অফিসের অন্য কোনও কর্মী, অনিকেতবাবুর কাছে এ খবরটা লিক করে দিয়েছিল।”

ঝিল বলল, “উনি তা হলে এত দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলেন কেন? বাবার মতো, আমাকেও মেরে ফেললেই তো ওঁর সব পথের কাঁটা সাফ হয়ে যেত!”

আবহ উত্তর করল, “আমার ধারণা, উনি তোর আঠারো পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। তার আগে পর্যন্ত ওই বিদেশি ব্যাঙ্কের যা টার্মস-অ্যান্ড-কন্ডিশনস, তাতে ওঁর কিছুই করার ছিল না। আর তোকে খুন করলে আদৌও ওঁর কোনও লাভ ছিল না। সে ক্ষেত্রে ওই ব্যাঙ্ক, তাদের নিয়মানুসারে আদালতের পর্যবেক্ষণে প্রকাশ্যে ওই সব নথিপত্র পাবলিশ করে দিত, তখন অনিকেত বসুর পুরো কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসার কেস হয়ে যেত! অনিকেত বসু অত্যন্ত ধূর্ত চরিত্রের মানুষ বলেই, অত কাঁচা কাজটা কক্ষনও করেননি।”

অধিরাজ স্যর সব শুনেটুনে আবার বললেন, “কিন্তু অনিকেত বসুর এই মুহূর্তে শহরে যা প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে, তাতে এই সামান্য কারণের জন্য ঝিলমকে গুন্ডা দিয়ে অপহরণ করিয়ে, ভয় দেখালেই তো সহজে ওঁর কাজ হাসিল হয়ে যেত! এর জন্য এত নাক বেড় দিয়ে, জারুলকে রিক্রুট করার কী দরকার ছিল? আর একই সঙ্গে নিজের ছেলেকে পাঠিয়েই বা উনি, ঝিলকে অপহরণের কাঁচা-প্ল্যানটা করতে গেলেন কেন?”

আবহ স্যরের কথা শুনে দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, “উষ্ণীষের মোটিভটা সম্পূর্ণ আলাদা; সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। সে এ সব পুরনো ব্যাপারের কিছুই জানত না। অন্য দিকে ঝিলকে নিজের কাছে এনে ভয় দেখানোর জন্য, অনিকেত বসু গুন্ডা লাগাতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু তাতে তাঁর স্বার্থসিদ্ধি হত না। তিনি বুদ্ধিমান লোক; তাই তিনি এ ব্যাপারে একটা অ্যানালিসিস করেছিলেন। ঝিলের বয়স প্রায় আঠারো হতে চলল; অর্থাৎ এই বার ওই বিদেশি ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে, স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই ঝিলকে এই গোপন লকারটার কথা জানানো হবে। এবং ঝিল লকারের জিনিসগুলো সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সই করে নিল কি না, সেটাও ওই বিদেশি ব্যাঙ্ক নিজেদের আইনজীবী মারফত যাচাইও করে নেবে। এইভাবে লকার ও বন্ড হ্যান্ডেল করাতেই ওরা এক্সপার্ট। ফলে মোটা দাগের গুন্ডাগিরি দিয়ে যে, এ যাত্রায় কাজ হাসিল হবে না, এটা অনিকেত বসু ভালই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তো জারুলকে ট্র্যাপে ফেলার এই নতুন ধরনের নাটকটা উনি সাজিয়েছিলেন!”

আবহ অনেকটা বলে, এই বার চুপ করল। অধিরাজ স্যর একটা বড় করে শ্বাস ফেলে বললেন, “বুঝলাম।”

এত ক্ষণে পয়ারের পাথরের মূর্তি সামান্য নড়ে উঠে মৃদুস্বরে বলল, “তা হলে উষ্ণীষদা হঠাৎ ঝিলের পিছনে এ ভাবে মরিয়া হয়ে পড়তে গেল কেন?”

আবহ পয়ারের দিকে ফিরে বলল, “বলছি। তার আগে বল তুই হঠাৎ উষ্ণীষের মতো একটা বখাটে ছেলের পাল্লায় পড়তে গেলি কোন দুঃখে?”

পয়ার তখন যেন গভীর জলের নীচ থেকে উঠে এসে খুব করুণ গলায় ঝিলের দিকে ফিরে বলল, “অ্যাম সরি রে! আমি প্রথমটায় ভীষণ লোভে পড়ে গিয়েছিলাম... উষ্ণীষদা আমাকে ক্রমাগত লোভ দেখিয়েছিল, ওর কথামতো কাজ করে দিলে ও আমাকে নিখরচায় বিদেশি ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সুযোগ করে দেবে...”

ঝিল আহত গলায় বলল, “তাই জন্য তুই, আমাকে এই ভাবে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারলি, পয়ার? আমি না তোর বন্ধু হই!”

পয়ার আবার দুঃখ ও অপমানে ভারী হয়ে থাকা চোখ দুটোকে নামিয়ে নিয়ে বলল, “প্রথমটায় লোভে পড়ে গেলেও পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কাজটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না। তাই সরে আসারও প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তত দিনে বড্ড দেরি হয়ে গেছে রে...

উষ্ণীষদা তখন আমাকে উল্টো চাপ দেওয়া শুরু করেছে এই বলে যে, আমি যদি ওর কথা মতো না-চলি, তা হলে ও ওর বাবার প্রভাব খাটিয়ে, আমার বাবার কোলিয়ারির চাকরিটাকে খেয়ে নেবে! এমনকি আমার বাবাকে এবং আমাদের পরিবারকে নানা রকম মিথ্যে পুলিশি-কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ারও ভয় দেখিয়েছিল। আমি এ সবে খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই...”

পয়ার আর মুখের কথাটা শেষ করতে পারল না। ওর চোখ দিয়ে গরম জলের ফোঁটা টপটপ করে মেঝেতে এসে পড়ল।

আবহ এবার ঝিলের দিকে ঘুরে বলল, “এ বার তুই নিজে মুখে বল, উষ্ণীষ কেন তোকে হঠাৎ সেদিন মাঝরাস্তায় কিডন্যাপ করার এমন মরিয়া চেষ্টা করল? ওর সঙ্গে তোর কী এমন শত্রুতা আছে যে...”

জারুল ভাবল, বাপরে বাপ! এ তো চমকের পর চমক। এত খবর আবহ কী করে ম্যানেজ করল, ভগবান জানে! ও কি সত্যি-সত্যিই কোনও ছদ্মবেশী গোয়েন্দা নাকি? ওই জন্যই ও এত কম কথা বলে?

জারুলের চিন্তা-প্রবাহে চিড় ধরিয়ে ঝিল এবার বলল, “উষ্ণীষদা তো আমাদের থেকে অনেকটাই বড়। আমি যখন নাইনে পড়তাম, ও তখন ক্লাস ইলেভেনে পড়ত। কিন্তু ইলেভেনে পড়তে-পড়তেই উষ্ণীষকে আমাদের স্কুল থেকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হয়। তখন ও ওর বাবার প্রভাব খাটিয়ে বছরের মাঝ পথেই, কোনও বাংলা-মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হয় এবং সম্ভবত তখনই ওর সঙ্গে পয়ারের দাদা ছন্দকদার ঘনিষ্ঠতাটা গড়ে ওঠে।”

আবহ বাঁকা-হেসে বলল, “কিন্তু উষ্ণীষকে কেন হঠাৎ তোদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই কথাটা বল!”

অধিরাজ স্যারও আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলেন, “কেন-কেন?”

ঝিল বলল, “আমি তখন নাইন-বি-র মনিটর ছিলাম। তখন আমাদের নিয়ম ছিল, সিক্সথ পিরিয়ডের পর ক্লাসটিচারকে, সারা ক্লাসের হোমটাস্কের খাতাগুলোকে তুলে এক মাত্র মনিটরই পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমি যখন সেই খাতাগুলো নিয়ে, আমাদের ক্লাসটিচার বৃতি-মিসকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলাম, তখন পথে কেমিস্ট্রি-ল্যাবের সামনে পৌঁছে দেখি, নিচু হয়ে ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত এক জন ইলেভেনের ছাত্রর পিছন দিকে, খুব সন্তর্পণে টেস্টটিউবে করে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ভরে নিয়ে এসে, অন্যমনস্ক সেই ছাত্রটির গায়ে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে উষ্ণীষ! দৃশ্যটা দেখেই তো আমি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে খাতা-টাতা ফেলে, এক ছুটে উষ্ণীষের সামনে পৌঁছে গিয়ে এক ধাক্কায় ওর হাত থেকে ওই ধোঁয়া ওঠা গাঢ় অ্যাসিডের টেস্টটিউবটাকে ছুড়ে দূরে ফেলে দিই। ফলে ওই নিরীহ ছাত্রটি একটা জঘন্য ও সাংঘাতিক দুর্ঘটনার হাত থেকে এক রকম আমার জন্যই, সে যাত্রায় বেঁচে যায়। তার পর বাকি টিচাররা ছুটে আসেন এবং পরবর্তীকালে এমন অপরাধ-প্রবণতার জন্য, উষ্ণীষকে আমাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।”

অধিরাজ স্যার চোখ কপালে তুলে বললেন, “কী সাংঘাতিক! কিন্তু উষ্ণীষ হঠাৎ এমন একটা পাগলামি কেন করতে গিয়েছিল?”

আবহ মুচকি হেসে বলল, “বীর উষ্ণীষবাবু, তাঁর বোনের কাছে এই ব্যাপারে বড়াই করে বলেছিলেন, ওই আলাভোলা বন্ধুটির সঙ্গে একটু সামান্য রসিকতা মাত্র করতে যাচ্ছিল ও; আর সেই সময় ওর নামে নাকি মিথ্যে অপবাদ দিয়ে, ওকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করে, ওই নাইনের পাকা ওই একরত্তি মেয়েটি! তাই ওই মেয়েটিকে তুলে এনে, শাস্তি না-দেওয়া পর্যন্ত নাকি ওর মনে কোনও শান্তি নেই! তাই সিনেমার ভিলেনের মতো, পয়ারকে বোড়ে করে ঝিলকে অপহরণের জঘন্য এই পরিকল্পনাটা করেছিল উষ্ণীষকুমার।”

সবাই আবার চুপচাপ হয়ে গেল। ঘরের বাতাস যেন ষড়যন্ত্রের গল্প শুনতে-শুনতেই প্রবলভাবে ভারী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ পয়ার আবার আবহর দিকে ফিরে বলল, “তুই জানলি কী করে যে, আমার সঙ্গে উষ্ণীষদাই ফোনে কথা বলছিল? সবটাই তোর আন্দাজ, নাকি আর্দ্রতা তোকে বলেছে?”

জারুলও এবার পয়ারের কথার সূত্র ধরে বলল, “ঠিক কথা! আমিও যে অনিকেতবাবুর অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে এই জব-অ্যাসাইনমেন্টটা পাই, এটাও বা তুই জানলি কী করে? এ কথাটা তো আমি বাড়ির কাউকেও বলিনি এখনও! তা হলে?”

আবহ ওদের কথা শুনে, একপেশে হেসে বলল, “আমার ছোটকা, ‘র’-এর আই-টি-সেলে চাকরি করে শুনেছিস নিশ্চয়ই। ছোটকার তৈরি করা একটা এথিকাল-সাইবার-হ্যাকিং প্রযুক্তির সাহায্যেই আমি তোদের দু’জনের ফোন বিগত কিছুদিন ধরে ট্যাপ করে, সব কিছু দুইয়ে-দুইয়ে চার করে নিয়েছি রে। এই ব্যাপারে আর বেশি কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করিস না। জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে ছোটকার ওই ডিভাইসটার ডিটেলস আমি তোদের বলতে পারব না।”

টিংটং করে ফ্ল্যাটের ডোরবেলটা বেজে উঠল। অধিরাজ স্যার উঠে গিয়ে দরজা খুলে ডেলিভারি-বয়ের হাত থেকে খাবারের প্যাকেটগুলো নিয়ে এসে, আবার বসার ঘরে ঢুকে বললেন, “বাচ্চারা, গরম-গরম বিরিয়ানি এসে গেছে কিন্তু। মাথার ব্যায়াম ছেড়ে, এবার চলো সবাই, একটু পেটপুজোর তোড়জোড় করি!”

সকলেই ওরা তখন হাত-টাত ধুয়ে এসে প্লেট টেনে বসে পড়ল। এমন সময় খেতে-খেতে, জারুল, আবহর গায়ে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলল, “তোর পেটে-পেটে কী সাংঘাতিক বুদ্ধি রে! তুই তো যাকে বলে, পুরো ফেলুদা-টু-পয়েন্ট-ও! অ্যাই শোন না, তুই আমাকে তোর তোপসে করে নিবি, সামনের এমনই কোনও জটিল অ্যাডভেঞ্চারে? প্লিজ়!”

জারুলের কথাটা শুনে আবহ মুখটাকে আরও গম্ভীর করে নিয়ে বিরিয়ানির মটন কামড়াতে-কামড়াতে বলে উঠল, “আই হেট ডিটেকটিভ নভেলস! তবে আমি যখন শঙ্করের মতো চাঁদের পাহাড়ের অভিযানে যাব, তখন আমার একজন অ্যালভারেজের দরকার পড়বে। কিন্তু তুই কি আর এই মাইনাস-এগারো পাওয়ারের চশমাটা চোখে এঁটে,লেডি অ্যালভারেজ হতে পারবি? ভেবে দ্যাখ!”

আবহর এই শেষ কথাটা শুনে অধিরাজ স্যার, পয়ার ও ঝিল, সকলেই তখন খাওয়া ভুলে হো-হো করে হেসে উঠল।

ব্রুনেইয়ের সুলতান

সৌদি আরবের রাজা সলমন

বিশ্বের ধনী রাজাদের গল্প

কে বলেছে রাজারা নেই? তাঁরা আছেন এবং রাজকীয় জীবন যাপনও করে চলেছেন।

ঋষিতা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীতে এখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই দেশ চালান। তবে কিছু রাজা-রানি কিন্তু আজও নিজেদের প্রাসাদে দিব্যি আছেন বিলাসবহু জীবনে! কারা তাঁরা?

প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানে

এ বছর সারা বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাজা সৌদি আরবের রাজা সলমন বিন আবদুলআজ়িজ বিন অল সৌদ। এঁরা মোট ১.৪ ট্রিলিয়ন টাকার সম্পত্তির অধিকারী। এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে দামি বাড়িটি রাজপুত্র মহম্মদ সলমনই কিনেছেন। এমনকি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির সবচেয়ে দামি পেন্টিং 'সালভাতর মুন্দি' এঁদেরই কেনা। দ্বিতীয় ধনী রাজবংশ কুয়েত রাজ পরিবার। কুয়েতরাজ শেখ নওয়াফ আল আহমেদ আল সাবাহ ২০২০ সালে বসেছেন মসনদে। ১৭৫২ থেকেই এঁরা কুয়েতে রাজত্ব করছেন। ব্লু চিপ এবং বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার বেচেই প্রায় তিনশো ষাট বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি তৈরি করেছেন কুয়েতরাজ। তৃতীয় স্থানে আছেন কাতারের রাজ পরিবার। শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। তিনশো পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলারের মালিক এই রাজা। ইউরোপের সব বড় শহর ও আমেরিকার নিউ ইয়র্কে নিজের বাড়ি ও অফিস আছে। শোনা যায় এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ়, ফক্সওয়াগন কোম্পানির অন্যতম কর্ণধার তিনি।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে

চতুর্থ স্থানে রয়েছেন মধ্য প্রাচ্যের আবু ধাবির আমির শেখ মহম্মদ বিন জ়ায়েদ আল নহয়ান। তাঁর সম্পত্তি দেড়শো বিলিয়ন ডলার। পঞ্চম স্থানে আছেন কুইন এলিজ়াবেথ। তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির পরিমাণ সাতচল্লিশ বিলিয়ন ডলার আর পরিবারের সম্পত্তি মিলিয়ে মোট অর্থের পরিমাণ অষ্টআশি বিলিয়ন ডলার। এর পরেই ধনী রাজাদের মধ্যে জায়গা হয়েছে এক এশীয় রাজা, তাইল্যান্ডের মহা ভাজিরালংকর্ন। তিরিশ থেকে ষাট বিলিয়ন ডলার এই রাজার সম্পত্তি। শুধু রাজ পরিবারের ব্যবহারের জন্যই রাজা আটত্রিশটি এরোপ্লেন কিনেছেন। বাষট্টিটি বিলাসবহুল গাড়িও আছে তাঁর ব্যবহারের জন্য।

রইল বাকি তিন

সপ্তম স্থানে আছেন ব্রুনেইয়ের সুলতান হসনল বোলকিয়া। প্রায় আটাশ বিলিয়ন ডলার তাঁর সম্পত্তি। তাঁর ৭ হাজার গাড়ির মধ্যে আবার রয়েছে একটা সোনায় মোড়া রোলস রয়েস! তাঁর প্রাসাদ এত বড় যা কিনা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলেছিল।
অষ্টম স্থানে আছে দুবাইয়ের রাজ পরিবার। শেখ মহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম এখনকার রাজা। সম্পত্তির পরিমাণ আঠারো বিলিয়ন ডলার।
মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মহম্মদ বিশ্বের নবম ধনী রাজা। প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন ডলার এই রাজ পরিবারের সম্পত্তি।
দশম স্থানে আছে লিকটেনস্টাইনের রাজ পরিবার। রাজা দ্বিতীয় হানস অ্যাডাম প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন সম্পত্তির অধিকারী। তবে মুশকিল হচ্ছে তিনি আবার সকলের সঙ্গে খুব একটা মেশেন না।

যাই হোক, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দশটি রাজার খোঁজ পাওয়া গেল তো! কেমন রোমাঞ্চকর লাগল, তাই না?

গোপন পাহারাদার

জয়দীপ চক্রবর্তী

চা বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে একটা মিলিটারি ক্যাম্পকে বাঁয়ে রেখে গাড়িটা যেই ডান দিকে ঘুরল, চার পাশ একদম ফাঁকা হয়ে গেল। দোকান-টোকান তো দূরের কথা, রাস্তায় একটা মানুষও দেখতে পেলাম না আর। টিনটিন আমার পাঁজরের কাছে খোঁচা মেরে বলল, "জায়গাটা কেমন যেন ভুতুড়ে ঠেকছে, বল দাদাভাই?"

আমি গলাটাকে গম্ভীর করে বললাম, "ভিতু কোথাকার! আমার তো দিব্যি লাগছে। কী সুন্দর সবুজ চার দিক। কত রকমের পাখির ডাক। তোদের ছ'তলার ফ্ল্যাটে বসে কি এ সব পাবি কখনও? নির্জনতার একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। সেই সুন্দরকে বোঝার জন্যে আর একটু বড় হতে হবে তোকে।"

শেষের বাক্য দুটো কয়েক দিন আগেই আমাদের বাংলা ক্লাসে উদয় স্যর বলেছিলেন। সুযোগ পেয়েই কথাগুলো টিনটিনকে বলে দিলাম কায়দা করে।

টিনটিন একটু দমে গেল ঠিকই, তবে প্রতিবাদ করতেও ছাড়ল না, "তুই কি খুব বড়?"

"বড়ই তো," আমি খানিক গলা তুলে বলি, "আমার ক্লাস এইট। মানে তোর ডাবল। বাবা বলেছে, এইট থেকেই উঁচু ক্লাস, কেননা এখন থেকেই মাধ্যমিকের প্রস্তুতি শুরু..."

"কী ব্যাপার, কী নিয়ে তক্কো হচ্ছে তোদের?" নতুন ঠাকুরমা এক্কেবারে সামনে, ড্রাইভারকাকুর পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল।

টিনটিন অভিযোগ করার ঢঙে বলল, "দেখো না, দাদাভাই আমাকে ভিতু বলছে।"

"তা তুমি কি খুব বীরপুরুষ?" নতুন ঠাকুরমা কিছু বলার আগেই কাকাইয়া বলে উঠল আমাদের সামনের সিট থেকে। বাবা আমার পাশেই বসে ছিল। কাকাইয়া যেই কথাটা বলল, অমনি বাবাও বলে উঠল, "টিনটিন ছোট। তার ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে নিজেকে ভাইয়ের সামনে খুব বড় আর সাহসী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, সে-ও কিন্তু সন্ধের পরে ছাদে যাওয়ার দরকার পড়লে মাকে সঙ্গে নিয়ে ওঠে।"

"মোটেই নয়," তীব্র প্রতিবাদ করে উঠি আমি, "এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না বাবা, যখনই টিনটিনের সঙ্গে আমার কোনও বিষয়ে তর্ক হয়, তুমি সব সময় টিনটিনের পক্ষে কথা বলো।"

"আর আমার বাবা তোর পক্ষে," টিনটিন আড় চোখে কাকাইয়ার দিকে এক বার চেয়ে নিয়ে বলল।

আমার মা কী একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে আর বলা হল না। ড্রাইভার অমিতকাকু তত ক্ষণে আমাদের গাড়িটাকে রায়মাটাং নদীর মধ্যে নামিয়ে দিয়েছে। মস্ত চওড়া নদীটার মধ্য দিয়েই যেতে হবে আমাদের এই বার। এখন অবিশ্যি নদীতে জল নেই। তবু তার ছোট-বড় পাথরে ভরা খাত এতটাই চওড়া যে, দেখলেই বুক গুড়গুড় করে।

মা জিজ্ঞেস করল, "বর্ষাকালে এখান দিয়ে তোমরা যাতায়াত করো কী ভাবে অমিত?"

"করি না তো," অমিতকাকু মা'র দিকে না-তাকিয়েই বলল, "বর্ষার তিন-চার মাস রায়মাটাং মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এখানে কেউ আসে না। এখান থেকে যায়ও না কেউ।"

"খাওয়াদাওয়া?"

"এখানেই যা-কিছু পাওয়া যায়, আর যেটুকু সঞ্চিত থাকে। সে বড় কষ্টের জীবন। শহরের মানুষ বেঁচে থাকার জন্য এই ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের কথা ভাবতেও পারে না ম্যাডাম।"

অমিতকাকুর কথায় সকলেই চুপ করে গেল। এমনকি টিনটিন আর আমিও। নদী পেরিয়ে রাস্তাটা আবার খাড়া উঠে গেছে উপর দিকে। রাস্তার দু'দিকেই ঘন জঙ্গল। সেই রাস্তা ধরে আরও খানিক এগিয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে একটা মোরাম-বিছানো সরু পথ ধরলাম আমরা।

অমিতকাকু বলল, "এই পথ ধরে আর মাত্র মিনিট খানেক গেলে 'বনবিতান'-এ পৌঁছে যাব আমরা।"

॥ ২ ॥

'বনবিতান' বনবাংলো বক্সার জঙ্গলের প্রায় মধ্যিখানেই। চার দিকের কালচে সবুজ অরণ্যের মাঝখানে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে মোটা-মোটা শাল কাঠের গুঁড়ির উপরে বানানো দোতলার এই ঘর তিনটে। এক তলায় থাকার ঘর নেই। জঙ্গল থেকে প্রায়ই এখানে হাতির দল চলে আসে। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই বন্দোবস্ত। বনবিতান থেকে বেরিয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। মাঠের পরে ছোট্ট একটা শুকনো নালা। তার পরেই জঙ্গল। শাল, সেগুন, পলাশ, শিমুল আরও সব ছোট-বড় গাছ হালকা থেকে ঘন হয়ে গেছে ক্রমাগত।

গাড়িতে বসে বাবা আমাকে ভিতু বলেছে টিনটিনের সামনে। টিনটিনটাও বাবার কথা শুনে ফিক-ফিক করে হাসছিল, আমি দেখেছি। তখন থেকেই মনের মধ্যে বিচ্ছিরি একটা খচখচানি সেঁটে আছে। যে করেই হোক, টিনটিনের কাছে প্রমাণ করে দিতে হবে, অন্তত ওর চেয়ে আমার সাহস বেশি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মা, কাকিমা আর নতুন ঠাকুরমা ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। বাবা আর কাকাইয়াও দেখলাম জমিয়ে গল্প করছে আর-একটা ঘরে বসে। প্ল্যানটা তখনই আমার মাথায় এল।

মায়েদের দিকে সাবধানে এক বার তাকিয়ে নিয়ে আমি টিনটিনকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম।

টিনটিন চিরকালই গবেট। ও অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "কী হল, ডাকছিস কেন?"

আমি ঠোঁটের উপরে আঙুল চাপা দিয়ে ওকে চুপ করতে ইশারা করলাম। ভাগ্য ভাল, মা বা নতুন ঠাকুরমা জেগে ওঠেনি।

টিনটিন বাইরে বেরিয়ে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবি?"

"চলোই না," বলে ওর হাত ধরে বনবিতানের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সন্তর্পণে নেমে এলাম। সবুজ ঘাসের লন পেরিয়ে দু'জনে এসে দাঁড়ালাম জঙ্গলের একেবারে কিনারায়। সামনের সরু নালাটায় জল নেই। ওটা পেরিয়ে যাওয়া এমন কিছু শক্ত নয়।

টিনটিন এত ক্ষণে আমার ইচ্ছেটা বুঝতে পেরেছে। একটু ভয়-পাওয়া গলাতেই সে বলল, "জঙ্গলে ঢুকবি নাকি দাদাভাই?"

"হুঁ," উপর-নীচে মাথা নাড়লাম।

"মা যদি জানতে পারে, খুব বকবে কিন্তু। তোকেও বকুনি খেতে হবে জেম্মা আর জেঠুর কাছে।"

"অত ভয় থাকলে অ্যাডভেঞ্চারে বেরোনো যায় না," আমি মুরুব্বির মতো ভাব করে বললাম, "শঙ্কর যদি তোর মতো ভিতু হত, কিছুতেই চাঁদের পাহাড় খুঁজে বের করতে পারত না।"

টিনটিন কথা বাড়াল না। বুঝলাম, এই যে এক্ষুনি ওকে আবার ভিতু বললাম, তাতেই কাজ হয়েছে।

"এই জঙ্গলের মধ্যেও কি কোনও লুকোনো সম্পদ-টম্পদ আছে ভাবছিস?" টিনটিন বেশ সিরিয়াস মুখ করে জিজ্ঞেস করল।

"থাকতেও তো পারে," আমি শুকনো নালাটার মধ্যে নেমে যেতে-যেতে বললাম, "সেই অনুসন্ধানটাই তো করে আসতে চাইছি।"

আমার পিছন-পিছন টিনটিনও নেমে এল। বলল, "চল তা হলে এগোই।"

নালাটা পেরিয়ে ও-পারে উঠে দেখলাম, একটা খুব সরু পায়ে-

চলা পথ ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে। সেই পথ ধরে খানিকটা সবে এগিয়েছি, অমনি পিছন থেকে কে বলে উঠল, "তোমরা একা-একা জঙ্গলে ঢুকছ নাকি?"

প্রথমটা চমকে উঠেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিলাম আমি। পিছনে তাকিয়ে দেখি, একটা মোটা আর বেজায় উঁচু শাল গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়েছে সেই রোগা, ফরসা মেয়েটা।

মেয়েটাকে আমি চিনি। ওর নাম সঙ্গীতা। আমরা বনবিতানে আসার পর থেকেই দেখছি ওর মা লছমি আন্টির সঙ্গে সারা ক্ষণ হাতে-হাতে কাজ করে যাচ্ছিল এই মেয়েটা। হোম স্টে-টা ওদেরই। মহামারির জন্য অনেক দিন অতিথি আসেনি এ দিকে। এখনও আমরাই এক মাত্র অতিথি বনবিতানে। আন্টি খুব যত্নে রান্না-বান্না করে আমাদের নিজের হাতে খাইয়েছেন দুপুরবেলা।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এখানে কী করছ?"

"বন্ধুদের পাহারা দিচ্ছিলাম।"

"কোন বন্ধু, কোথায় তারা?"

"সে আছে। তোমরা বুঝবে না," সঙ্গীতা হাসল, "নিজের কাজেই জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, তোমরা দু'জন বোকার মতো চুপি-চুপি জঙ্গলে ঢোকার মতলব এঁটেছ।"

সঙ্গীতার কথা শুনে আমার খুব রাগ হয়ে গেল। ওকে ধমকে উঠেই বললাম, "তুমি আমাদের বোকা বললে কেন?"

"তোমরা তো বোকাই।"

"তুমি বুঝি খুব চালাক?" আমি একটু বিরক্ত হয়ে বলি, "তুমি জানো, আমি স্কুলের ক্লাসে ওঠার পরীক্ষায় প্রতি বছর ফার্স্ট হই?"

"স্কুলের পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেই কি সব জানা যায় নাকি?" মেয়েটা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

"যায় না?"

"উঁহু।"

"তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?"

"এইট।"

"আমারও তো এইট।"

"তাই?"

"হুঁ," বলে ওর দিকে চাইলাম আমি, "আচ্ছা তোমায় একটা ট্রান্সলেশন জিজ্ঞেস করি বলো দেখি," বলেই ক'দিন আগে ইংরেজির কুন্তল স্যর ক্লাসে যে কঠিন ট্রান্সলেশনটা করতে দিয়েছিলেন আমাদের, সেইটা জিজ্ঞেস করলাম সঙ্গীতাকে। ও বলতে পারল না। বিজ্ঞানের দুটো প্রশ্নেও ডাহা ভুল উত্তর দিল সে। আমি হেসে বললাম, "দেখলে, নিজে কিছুই জানো না, তবু আমাদের বোকা বলছ তুমি!"

"তাতে কী?" ফুঁসে উঠে বলল সঙ্গীতা, "দুটো ইংরেজি ট্রান্সলেশন বা চারটে কঠিন অঙ্ক কষতে জানলেই কি খুব বুদ্ধিমান হয়ে যায় কেউ?'"

"হয়ই তো।"

"মোটেই হয় না," দু'দিকে মাথা দুলিয়ে বলে সঙ্গীতা, "তোমরা বুদ্ধিমান হলে জঙ্গলের গন্ধ, শব্দ, গোপন নড়াচড়ার কিচ্ছু না-জেনে কিছুতেই হুট করে এমন জঙ্গলে ঢুকে পড়তে না। এই জঙ্গলে কত বিপদ আছে জানো?"

"আমরা কোনও বিপদকে ভয় পাই না।"

"তাই নাকি?' বিচ্ছিরি মুখ করে গা দুলিয়ে হেসে উঠল সঙ্গীতা, ''সত্যিই যদি বিপদে পড়ো, দেখবে স্কুলের ফার্স্ট হওয়া বিদ্যের কিছুই আর কাজে লাগবে না।"

"কী রকম বিপদ?" সঙ্গীতার সঙ্গে পা চালিয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে যেতে-যেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এই জঙ্গলে হাতি আছে। বাঘও আছে।"

"এই জঙ্গলে বাঘ আছে?" টিনটিন ভয়-পাওয়া গলায় বলে উঠল।

"লেপার্ড," সঙ্গীতা বলল, "আমাদের বাড়ির খোঁয়াড় থেকে ছাগল টেনে নিয়ে গেছে দু'বার।"

সঙ্গীতার কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি, জঙ্গলের মধ্যে থেকে বিচ্ছিরি 'ক্যাঁআআ, ক্যাঁআআআ' আওয়াজ করে কী-একটা যেন ডেকে উঠল। আমি ভয় পেয়ে বললাম, "লেপার্ড?"

"ধুস, ওটা তো ময়ূর," সঙ্গীতা বলল, "তবে বাঘ আশপাশে থাকলেও ময়ূর অমন করে ডেকে অবশ্য সতর্ক করে দেয় অনেক সময়।"

বাঘের কথা শুনে আমি দমে গেলাম। তবে ভয় পেয়েছি যে, সে কথাটা সঙ্গীতাকে বুঝতে না-দিয়ে বললাম, "তুমি এই জঙ্গলে মাঝেমধ্যেই ঢোকো?"

"সে তো ঢুকিই।"

"ভয় করে না?"

"উঁহু।"

"সে কী!"

"জঙ্গলকে ভালবেসে ফেললে আর জংলি প্রাণীদের ভয় থাকে না।"

সঙ্গীতা যা-ই বলুক, বাঘের কথাটা শোনার পর থেকেই আগের সেই সাহসটা আর পাচ্ছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম, মেয়েটাকে না-চটানোই ভাল। কথা বলতে- বলতে জঙ্গলের অনেকটাই ভিতরে চলে এসেছি। এই ঘন জঙ্গল থেকে নিরাপদে বেরোতে গেলে ওর সাহায্য দরকার।

টিনটিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "সঙ্গীতাদিদি, তুমি এই জঙ্গলে কখনও লুকিয়ে রাখা সম্পদ খোঁজার চেষ্টা করেছ?"

"অ্যাঁ," সঙ্গীতা হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে আমাদের মুখের দিকে।

টিনটিন আবার বলে, "হিরে, জহরত, সোনাদানা।"

সঙ্গীতা অবাক হয়ে বলে, "এই পুরো জঙ্গলটাই তো মস্ত সম্পদ গো! এর মধ্যে আবার আলাদা করে কী খুঁজব?"

"মানে?" আমি আর টিনটিন দু'জনেই এক সঙ্গে বলে উঠি।

সঙ্গীতা হাসল, "এই জঙ্গলই তো শুকনো কাঠ, পাতা, খাবার জলের ঝোরা, ওষুধের জড়িবুটি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের। মা বলে, জীবনের চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু হয় না।"

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

"কিন্তু মুশকিল কী জানো?"

"কী?"

"এক দল লোভী লোক এই জঙ্গলটাকে মেরে ফেলতে চাইছে।"

"কী ভাবে?"

"এই দেখো," বলেই সামনে হাত বাড়াল সঙ্গীতা। দেখলাম জঙ্গল

পাতলা হয়ে গেছে। কেটে নেওয়া গাছের অবশিষ্ট অংশটুকু অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে মাটির উপরে। কিছু গুঁড়ি মাটির উপরে শুইয়ে রাখা রয়েছে তখনও।

"কারা কেটে নিয়ে যাচ্ছে গাছগুলো?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। এই প্রথম মরে যাওয়া গাছগুলোর জন্য বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল আমার।

"কাঠের চোরা কারবারিরা," বিষণ্ণ মুখে বলল সঙ্গীতা, "এই গাছেরা সেই ছোট্টবেলা থেকেই আমার বন্ধু, জানো তো! তাই যখনই সুযোগ পাই, জঙ্গলে ঢুকে আমি ওদের পাহারা দিই।"

"তোমার ভয় করে না সঙ্গীতাদিদি?" টিনটিন জিজ্ঞেস করল।

"কিসের ভয়?"

"ওই বিচ্ছিরি লোকগুলো যদি তোমার কোনও ক্ষতি করে দেয়। ওদের মনে তো দয়া নেই।"

মিষ্টি করে হাসল সঙ্গীতা। তার পর কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। চুপ করে কী শুনতে লাগল যেন কান খাড়া করে।

জঙ্গলের আরও গভীর থেকে একটা শব্দ আমাদের কানেও এসে পৌঁছেছে তত ক্ষণে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্পষ্ট আওয়াজ উঠছে ঠক, ঠক, ঠক...

সঙ্গীতার চোখ-মুখ মুহূর্তে বদলে গেল। দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, "চলো।"

"কোথায়?" আমি ভয়-পাওয়া গলায় বললাম।

"ওই গাছেদের বাঁচাতে।"

আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম এ বার। কাঁপা গলায় সঙ্গীতাকে বললাম, "অযথা বিপদের মধ্যে জড়িয়ে কী লাভ সঙ্গীতা? চলো, আমরা বরং ফিরে যাই।"

সঙ্গীতার চোখে আগুন জ্বলে উঠল, "এই না একটু আগে বলছিলে কোনও বিপদকেই ভয় করো না তোমরা?"

আমি চুপ করে রইলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। দূরে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে লোকগুলোকে।

সঙ্গীতা চাপা গলায় বলল, "তুমি তো সবজান্তা ফার্স্ট বয়। একটু আগে খুব পরীক্ষা নিচ্ছিলে আমার। এখন তুমি বলো তো, বাতাসের গতি কোন দিক থেকে কোন দিকে?'"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে চুপ করে রইলাম। সে আবার বলল, "বাতাস শুঁকে বলতে পারবে, হাতির দল এখন কোন দিকে আছে?"

"অমন কি বলা যায় নাকি?" আমি মিনমিন করে বলার চেষ্টা করি।

"যায় বইকি," সঙ্গীতার মুখ-চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল, "তোমরা এ সব বিদ্যে জানো না বলেই অমন হাঁ হয়ে যাচ্ছ আমার কথায়..." বলতে-বলতেই মুখ উঁচু করে বাতাসে কিসের গন্ধ শুঁকতে শুরু করল মেয়েটা। মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে খানিকটা মাটি হাতে তুলে নিয়ে শুঁকতে লাগল কিছু ক্ষণ। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি এসো। এ বারের মতো লুটেরাগুলোকে বোধ হয় আটকাতে পারব। হাতির দল বেশি দূরে নেই।"

"কী ভাবে আটকাবে?" টিনটিন অবাক হয়ে বলল।

"দেখোই না," বলে ওই লোকগুলোর ডান দিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে আমাদের নিয়ে। দ্রুত হাতে কী একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে দু'হাতে ডলে নিয়ে মাখিয়ে দিল আমার আর টিনটিনের হাতে-মুখে। আমি নাক কুঁচকে বললাম, "এটা কী?"

"রক্ষাকবচ। এটা মেখে নিলে জঙ্গলের প্রাণীরা আর তোমাদের গায়ের গন্ধ পাবে না।"

"তুমি মাখলে না তো?"

"আমি আগেই মেখে নিয়েছি।"

সঙ্গীতা একটা ঘন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুটো হাতের তালু মুখের কাছে ধরে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করতে থাকল। সেই আওয়াজ গাছের ডালে-ডালে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ল বনে। লোকগুলো একটু থমকাল। সঙ্গীতা আবার সেই আওয়াজ করল। তার পর আর-এক বার। আমাদের কাছে সরে এসে সে হাঁপাতে লাগল উত্তেজনায়। কিছু ক্ষণ সব চুপচাপ। তার পর আবার গাছের গায়ে করাতের মৃদু শব্দ উঠল। কিন্তু সেই শব্দ ছাপিয়ে তত ক্ষণে আর একটা শব্দ জেগে উঠছে জঙ্গলের অপর প্রান্তে। কারা যেন বন-বাদাড় ভাঙতে-ভাঙতে দ্রুত এগিয়ে আসছে এই দিকে।

সঙ্গীতার মুখে আলতো হাসি ফুটে উঠল। আমার আর টিনটিনের হাতে টান দিল সে, "আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। দৌড়ও! ওরা আসছে। দুষ্টু লোকগুলো জব্দ হবে এই বার।"

"জঙ্গল দাপিয়ে ওরা কারা আসছে সঙ্গীতা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হাতির দল।"

॥ ৩ ॥

বনবিতানে ফিরলাম যখন, সন্ধে নামব-নামব করছে। মা-কাকিমা উঠে পড়েছে তখন। আমাদের দেখতে না-পেয়ে হুলস্থুলও শুরু হয়ে গেছে যথারীতি। দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই বাবা আর কাকাইয়া ছুটে এল। ধমকে উঠে বলল, "আমাদের না-জানিয়ে কোথায় গিয়েছিলি?"

"বেশি দূরে নয় আঙ্কল। কাছেই। আমি ছিলাম তো। বিপদ নেই এখানে," সঙ্গীতা এমন মিষ্টি করে হেসে কথাটা বলল, বাবা আমাদের বকুনি দিতে গিয়েও থেমে গেল। কাকাইয়া বলল, "তা তোরা গিয়েছিলি কোথায়?"

"ওই জঙ্গলে। শংকরের মতো অ্যাডভেঞ্চারে," টিনটিন বোকার মতো গোপন কথাটা বলে ফেলল সবার সামনে।

"হিরেটিরে পেলি কিছু?" কাকাইয়া হেসে জিজ্ঞেস করল।

"সব সম্পদই কি তুলে নিয়ে আসতে আছে সঙ্গে করে?" আমি আড় চোখে এক বার সঙ্গীতার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললাম, "কিছু সম্পদ যত্ন করে পাহারাও দিতে হয় সারা জীবন জুড়ে।"

বড়রা আমাদের কথায় কোনওদিনই তেমন গুরুত্ব দেয় না। এ বারেও দিল না বোধ হয়। দেখলাম, আমার এমন একটা সিরিয়াস কথাতেও সবাই মিলে হেসে উঠল হো-হো করে।

ছবি: *প্রসেনজিৎ নাথ*

অ্যানে ফ্র্যাঙ্ক

অ্যানে ফ্র্যাঙ্কের সেই ডায়েরি

সাতটি দশকের গণ্ডি পেরিয়েও আজও বিশ্ববাসীর কাছে সমান প্রিয় এই দিনলিপি।

উপাসনা সরকার পাত্র

সালটা ১৯৪২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিক্ষুব্ধ সময়। হিটলারের নেতৃত্বে ইহুদিদের উপর সে সময় নেমে আসে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা। জারি করা হয় একের পর-এক নিয়ম। বাইরে যখন নাৎসি সেনার প্রবল পরাক্রম, ঠিক সেই সময় তেরো বছর বয়সি এক ইহুদি কিশোরীর নিজের কথাই হয়ে উঠল যন্ত্রণামুখর ওই সময়ের প্রতিলিপি। তার পরের দু'বছর দু'মাস... পনেরো বছর দু'মাস বয়সে কিশোরী তাঁর ডায়েরির পাতায় শেষ কথা লিখেছিল। ইতিহাসের পাতায় ওই অসহনীয় যন্ত্রণার কথা আজও একটা বিক্ষুব্ধ সময়কে মনে করিয়ে দেয়। ১৩ বছর বয়সে লিখতে শুরু করা কিশোরীর দীর্ঘ দু'বছর দু'মাসের দিনলিপি একত্র করে প্রকাশ পেয়েছিল 'অ্যানে ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরি' নামে। জার্মানির অধিবাসী এবং ইহুদি ধর্মাবলম্বী অটো ফ্র্যাঙ্ক এবং এডিথের দ্বিতীয় সন্তান অ্যানে ফ্র্যাঙ্ক। অ্যানের জন্ম ১৯২৯ সালের ১২ জুন। ঠিক সেই সময়েই জার্মানির বুকে একটু-একটু করে নিজের জায়গা মজবুত করে তুলেছিল হিটলার, দিকে-দিকে তখন নাৎসি বাহিনীর সংঘর্ষের ত্রাস। সেনাবাহিনীর প্রবল পরাক্রম থেকে বাঁচতে সেই সময় অনেক ইহুদিই জার্মানি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, বাদ পড়েনি ফ্র্যাঙ্ক-পরিবারও। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ১৯৩৩ সালে তিনি যখন দেশ ছেড়ে আমস্টারডামে আশ্রয় নিলেন, তখন অ্যানে ফ্রাঙ্ক চার বছরের শিশু। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক পরিবারের নিভৃত শান্তির আশ্রয়েও ছেদ পড়ল, যখন হিটলারের নাৎসি বাহিনী নেদারল্যান্ডস দখল করে এবং একাধিক ইহুদি পরিবারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের পাঠানো হয় বন্দি-শিবিরে। এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-রাজ্যে জীবন কাটানোর পর শমন জারি হয় অটো ফ্র্যাঙ্কের নামেও। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে নাৎসিদের এই শমনকে এক প্রকার অবজ্ঞা করেই, নিজেদের অফিস-বাড়ির পিছন দিকে এক গোপন আস্তানায় আশ্রয় দেয় ফ্র্যাঙ্ক পরিবার। সঙ্গে অবশ্য ছিল আরও একটি পরিবার। এই দুই পরিবার নাৎসি বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। প্রায় দু'বছরেরও বেশি সময় আমরাও কিন্তু ভাইরাসের প্রবল পরাক্রমে ঘরবন্দি একটা সময় কাটিয়েছি। তবে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে অ্যানে ফ্র্যাঙ্কের পরিস্থিতিকে মিলিয়ে দেখতে গেলে ভুলই হবে! আমাদের এই গৃহবন্দি পরিস্থিতির ভিড়েও ছিল একে অন্যের প্রতি অগাধ ভালবাসা... বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি। স্কুলে

যেতে না-পারার মন খারাপ থাকলেও বন্ধুত্বে কিন্তু বিন্দু মাত্র ছেদ পড়েনি। তবে অ্যানে ফ্র্যাঙ্কের দিনযাপনের পথটুকু মোটেই সহজ ছিল না। হিটলারের নাৎসি বাহিনী অধিকৃত নেদারল্যান্ডসে কে শত্রু, আর কে মিত্র এইটুকু নির্বাচন করারও পথ ছিল কঠিন। গোপন ওই কুঠুরিতে আত্মগোপন করেছিল মোট আট জন। যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে নিজেদের এক প্রকার বাঁচাতে প্রত্যেকেই নীরব, নিস্পৃহ জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথনও হত ফিসফিস করে, বাথরুমে স্নান করার সময়ে জলের আওয়াজ যতটুকু সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রেখে করা, এমনকি জানলার কাছে শরীরের ছায়া পড়ার হাত থেকেও এক প্রকার নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখে চলত তারা। যুদ্ধের দুর্মূল্য বাজারে খাবারের ক্ষেত্রেও বিলাসিতার অবকাশ নেই বললেই চলে। ঘরবন্দি ওই বন্ধুহীন সময়ে নিজের তেরো বছরের জন্মদিনে একটা লাল ডায়েরি উপহার পায় অ্যানে ফ্র্যাঙ্ক। কিশোরীর চোখে তখন হাজারও স্বপ্ন, কিন্তু ওই স্বপ্নের ভিড়েই একটু-একটু করে ফুটে উঠতে থাকে সেই সময়ের প্রতিচ্ছবি। তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ, অভিমান, রাগ এমনকি, শরীরে-মনে প্রথম বার বড় হয়ে ওঠার কথাও কিশোরীর বয়ানে ফুটে ওঠে। নজরবন্দির কঠিন ওই সময়ে ডায়েরি 'কিটি'ই হয়ে যায় পরম প্রিয় বন্ধু। ডায়েরির পাতা একে-একে ভরে উঠলে, স্কুলের খাতার পাতা, আরও পরে কিছু সাদা কাগজই হয়ে উঠেছিল অ্যানের বন্ধু কিটির সঙ্গে গল্প করার মস্ত একটা ঠিকানা।
দু'বছরেরও বেশি সময় জুড়ে কিটির কাছে নিজের কথা বলতে-বলতে একটা সময়, ১৯৪৪ সালের ৪ অগস্ট, তাঁদের ওই নিভৃত গোপন আস্তানাতেও নেমে আসে নাৎসি বাহিনীর আক্রমণ। আট জন ইহুদিকে প্রায় জোর করেই নিয়ে যাওয়া হয় বন্দি-শিবিরে। জার্মানির আউশভিৎজ় বন্দি-শিবিরে ১৯৪৫ সালের ৬ জানুয়ারি অ্যানের মা মারা যান। অ্যানে আর তাঁর দিদি মারগটকে পাঠানো হয় দূরবর্তী বেরজেন-বেলসেন বন্দি-শিবিরে। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারির শেষ কিংবা মার্চের শুরুতে মারা যান মারগট। আর মার্চ মাসে বন্দি-শিবিরে মারা যায় অ্যানে। যুদ্ধ শেষে জীবিত অবস্থায় ফিরেছিলেন

সেই ডায়েরির পাতার ছবি
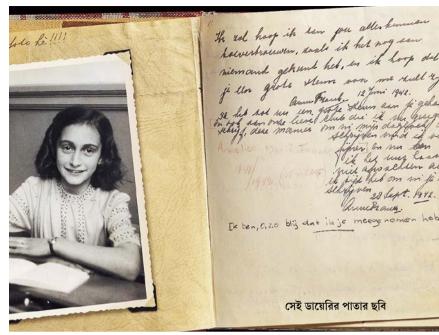
এক মাত্র অটো ফ্র্যাঙ্ক। নাৎসিরা অ্যানেদের বন্দি-শিবিরে নিয়ে গেলেও ফেলে গিয়েছিল তাঁর লেখা ডায়েরি আর অন্য খাতাগুলো। বাবা অটো ফ্র্যাঙ্ক মেয়ের এই 'কিটি' বন্ধুর কথা জানলেও, প্রথমে মেয়ের দিনলিপিগুলো পড়তে চাননি। পরে অবশ্য ডায়েরির পাতাগুলোতেই তিনি খুঁজে পেলেন একটা বিক্ষুব্ধ সময়ের দলিলকে। এক জন কিশোরীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিস্তারিত তাতে লেখা।
১৯৪৭ সালে ২৫ জুন ডাচ ভাষায় এই ডায়েরির কথাগুলোই প্রকাশ পায় 'হেত আখতারহাউস' নামে। এ বছর ৭৫ বছর পূর্ণ করল এই বইটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এক বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রতিচ্ছবি যেন অ্যানের ব্যক্তিগত উপলব্ধির এক সংজ্ঞা। ডাচ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হলেও পরে অবশ্য বইটি সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত হয় 'দ্য ডায়েরি অফ আ ইয়াং গার্ল' নামে। ১৯৫২ সালে ইংরেজি ভাষায় ব্রিটেন এবং আমেরিকায় প্রকাশিত এই বইয়ের নামটিই পাঠক মহলে বেশি শোনা যায়। বইটির ইংরেজি সংস্করণও এই বছরে ৭০ বছর পূর্ণ করেছে।

প্রায় সত্তরটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত এই ডায়েরির পাতাগুলো একটা বিচ্ছিন্ন সময়ের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করায়। কিশোরীর একান্ত ব্যক্তিগত স্বরটুকু ডায়েরির পাতায় আলাপের ছলে প্রকাশ পেয়েছে বলেই সেখানে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপের বীভৎসতা নেই। কিটি-র সঙ্গে কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে মজার ছলে কথা বলারও অভিব্যক্তি। ফুটে উঠেছে অ্যানের একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছে প্রকাশের ক্ষেত্রটিও। সাংবাদিক হওয়ার সুপ্ত অভীপ্সা মনের মধ্যে লালন করতে থাকা অ্যানে ১৯৪৪-এর ৫ এপ্রিল লেখে, 'অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম যে অশিক্ষিত থাকা থেকে বাঁচতে হলে আমাকে স্কুলের কাজগুলো করতে হবে— যাতে আমি জীবনে উপরে উঠতে পারি, যাতে আমি সাংবাদিক হতে পারি— কারণ এটাই আমি চাই। আমি জানি আমি লিখতে পারি। কিন্তু দেখতে হবে আমার সত্যি প্রতিভা আছে কিনা।'—যুদ্ধবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতেও আত্মবিশ্বাসের ভিত টলে যায়নি অ্যানের, জীবনের প্রকৃত অর্থ খোঁজার চেষ্টা সে করেছে নিরন্তর... ডায়েরির পাতাগুলোই তাঁর পরিচায়ক। সাতটি দশকের গণ্ডি পেরিয়েও আজও বিশ্বের মানুষের কাছে সমান প্রিয় এই ডায়েরি।

সম্পূর্ণ হাসির কমিক্‌স

কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্যালো! আর বাজার করতে হবে না! এক্ষুনি বাড়িতে চলে এসো!

কেন, কী হল? এই তো হয়ে গেছে! সব্জিটা নেব! কিন্তু...
সব্জির যা দাম, এ বার কিডনি বেচতে হবে গো!

তুমি শিগগির এসো! আগুন জ্বলছে! বুঝলে! আমার মাথায় আগুন জ্বলছে!

কিছুই বুঝতে পারছি না! আগুন লেগেছে?
সত্যিই তো বাজারে আগুন লেগে গেছে!

আমি ফোনটা রাখছি, তুমি এসো! যত সব!

পুলিশ তো দোতলায় উঠে গেল সার্চ করতে! দেখুন গিয়ে...

সক্কালবেলা যত উটকো ঝামেলা!
মজা দেখাচ্ছি দাঁড়া! নিজেকে স্মাগলার মনে হচ্ছে!

জামাকাপড় ছুড়ে ফেলছে!!
সব ভাল করে খুঁজে দেখো!

চোর-ছ্যাঁচড়ের বাড়ি সার্চ করার কাজে লাইফ রিস্ক নেই! ভাল ডিউটি!
তা হলে বাথরুমের কমোডগুলো দেখে এসো! যাও! কুইক!
!?
ঠিক তখনই...
!?
অসভ্যের মতো বাঁশি বাজাচ্ছেন কেন বলুন তো?
এই তো ক্যামেরার ব্যাগ! জিনিস সমেত!
হেঁ হেঁ সেই তো হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলেন! হি হি!

আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হবে তো! তাই বাঁশি বাজাচ্ছেন!
পিঁপ পিঁপ
ওফ! কী বাজে স্বপ্ন! হর্ন দিচ্ছে কোন হতচ্ছাড়া?
সবাই বোধ হয় ঘুমোচ্ছে! তুমি হর্ন দিতে থাকো!
পিঁপ পিঁপ
WB M20
কিছু লোকের বয়স বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে না! রামছাগলটা কে?
গাড়ির ভিতরে কে? ওহ সেই অপদার্থটা!

একটা গাড়ি কিনেই ফেললাম। কোম্পানির ফার্স্ট মডেল! না হলে ডিরেক্টর হিসেবে মানায় না!
অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সব গাড়ি চড়ে আসে!
আমি গাড়ি ছাড়া গেলে ভাল দেখায় না, কী বলেন? হেঁ হেঁ!
কী ব্যাপার? গাড়িটা পছন্দ হয়নি সেকেন্ড হ্যান্ড বলে? নাকি?
আসলে আমার উত্তেজিত হওয়া বারণ! আর এখানে...
!
...তোমার মতো উজবুকের সামনে বেশি ক্ষণ দাঁড়ালে আমি রাগে ফেটে পড়ব!
আমি ভিতরে চললাম!
আপনার কথা ভেবেই সকালবেলা গাড়িটা নিয়ে এসেছিলাম!
গাড়ি করে একটু মর্নিংওয়াকে যেতেন! ভালই লাগত! হেঁ হেঁ!
গাড়ি চড়ে মর্নিংওয়াক! ফাজলামির জায়গা পাওনি?
তোমাকে দেখে যতটা হোঁৎকা মনে হয় তুমি তার চেয়েও বেশি!
বাবা, শোনো!

ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, আমরা গাড়ি করে একটু গ্রামের দিকে গিয়ে হাঁটতে পারি!
সব ব্যাপারেই একটা বাড়াবাড়ি! প্ল্যানট্যান নেই, বললেই হল?
বেশি ক্ষণ লাগবে না, চলুন, পক্ষীরাজে উঠে পড়ুন!
রাপ্পার বন্ধুভাগ্যটা হতাশাজনক!

নতুন ফিল্ম এ বছরই নামাচ্ছি! প্রযোজক রাজি, বুঝলি!

কী একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ পাচ্ছি!
অন্য ডিরেক্টরদের কপাল পুড়ছে! তারই গন্ধ! আমি নামছি আবার!
গাড়ি তোমার এমনিই থেমে যাবে! অপদার্থ!
সর্বনাশ! গাড়ি থামাও শিগগির!

আরে কিছুই না! ক্লাচ জ্বলে গেছে, বুঝলি?
নতুন গাড়িরও এমন হতে পারে! মেশিন তো আফটার অল!
আমি কিচ্ছু শুনব না। ডাক্তার উত্তেজিত হতে বারণ করেছে!
প্রথমেই কাছেপিঠে একটা গ্যারাজ খুঁজে বের করতে হবে!
প্রথমেই দরকার তোমাকে আগাপাছতলা চাবকানো!
এতটা রাস্তা আমি কিন্তু হাঁটতে পারব না টনি!
কিচ্ছু চিন্তা করবেন না! দেখছি!
আরে! এই তো!
কাকা গাড়ি খারাপ, একটু ঠেলে দেবে? কত চাও দেব'খন!
বিরক্তিকর!
তোমরা শহরের লোকেরা ভাবো টাকা ছড়ালেই লোকে দৌড়ে আসবে! এমনিই দেব! পয়সা লাগবে না!
রাপ্পা বরং ওর সাইকেলটা নিয়ে চল! ওই লোকটা আর গাধাটা গাড়িটা ঠেলুক!
টনির গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে...
পুরনো হলে কী হবে, আসল ইঞ্জিন! হালকা গাড়ি! অসুবিধে হবে না!

WMB 20

ওই লোকটাকে চাই-ই চাই! না হলে কাজটা হবে না!

আরে ওই তো! দাঁড়াও!

আরে ও পালিয়ে যাচ্ছে! এই থামো, থামো! যাচ্ছ কোথায়?

যাচ্চলে!

আমি একটু আসছি!

আরে শুনুন!

আরে! দাঁড়াও বলছি! তোমাকে খুঁজতেই আমাদের এত দূর আসা!
লোকটা কি চোর নাকি? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!
কথাবার্তা বলে মীমাংসা হল...
চারটে হেলে সাপ ধরে দাও। তা হলেই হবে!
বাড়ি ফিরতে-ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যাবে! টনিটা একটা মূর্তিমান আপদ!
গাড়ি সারানো হয়ে গেলে একেবারে কোথাও লাঞ্চ করে ফিরব!
Indian
ঘণ্টা খানেক পরে...
কারণ ক'দিন আগেই টেবিল ল্যাম্প ছুড়ে এক জন সাংবাদিকের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন।
পরে...
তোমাদের জন্য তো কাগজটা তুলে দিতে হবে এ বার! তুমি তো কেলেঙ্কারি করেছ!
তুমি হেলমেট পরে কবি টলমল দত্তের সাক্ষাৎকার নিতে বসেছিলে? ছি ছি!
ভদ্রলোক ফেসবুকে লিখেছেন, আমরা ওঁকে অপমান করেছি!
একেই সাংবাদিকদের বদনামের শেষ নেই! যাচ্ছেতাই!

সাংবাদিক 'আহত', 'মরো-মরো'— এ সব হলে মানুষের সিমপ্যাথি পেতাম!
তার বদলে যদি আমার মাথা ফাটিয়ে দিতেন, সেটা কি ভাল হত?
!
লোকে সাংবাদিকদের ধন্য-ধন্য করত, এই আর কী!
You will
আজ রাপ্পার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছি, একটু ব্যস্ত আছি।
টনিটার কোনও সময় জ্ঞান নেই। ধুর, একাই বেরিয়ে যাই!
এই রে! ও তো বেরিয়ে গেল! আচ্ছা, ওই বাইকটাকে ফলো করো তো!
হে হে! দাদার গাড়িতে যা ঢোকানোর ঢুকিয়ে দিয়েছি!
দাদা, ওই বাইকটা যেন চোখের আড়াল না হয়! কুইক!
দেখলে তো আমার বন্ধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে!
ধুর মশাই! এই তো বললেন এখানে নামবেন!

ফোন করে থামতে বলছি! যত্ত সব ঝামেলা!
N P Enterprise
AUTO
আপনি আসছেন বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। হুঃ!
এই তুমি একদম বাজে বকবে না! গাড়ি চালাচ্ছ, গাড়ি চালাও তো!
হ্যাঁ বল! এই তো দাঁড়িয়েছি! কিন্তু কোথায় তুই?
রাপ্পার সঙ্গে টনি চলেছে শিল্পসংগ্রাহক ত্রিবেণী পাত্রর সাক্ষাৎকার নিতে...
আরে, তোর পিছনেই আছি ট্যাক্সিতে, দাঁড়া! জাস্ট এক মিনিট!
আরে, আমি তো পৌঁছেই গেছিলাম, তুই বেরিয়ে গেলি! চ'...
WB04E2785
কিন্তু ভাই, একটাই হেলমেট রয়েছে! বাকি রাস্তাটা ট্যাক্সিতেই আয়!
আর-একটা হেলমেট নেওয়া উচিত ছিল! কী যে করিস! ধ্যাত্তেরি!
চেঁচাস না! ওফ!

ঠিক আছে!
যাচ্ছি! চল!
বিরক্তিকর!

সামনে দাঁড়
করাও! দোকানটার
সামনে!
ROMA OPTICALS

হেলমেটটা
দারোয়ানের
কাছে জমা দিয়ে
যাব!

ভদ্রলোক খুবই
বিনয়ী। এমন
লোকের সাক্ষাৎকার
নিতেও ভাল লাগে।

দাদা এখন
বেরিয়ে যাবে।
এখন দেখা
হবে না!
আমাদের তো
ফোন করে
অ্যাপয়েন্টমেন্ট
করা ছিল!

এক বার কথা
তো বলতে
দেবেন, নাকি?

আরে মশাই, দাদা ড্রাইভ করে অনেক দূর যাবে! এখন বিরক্ত করবেন না! পরে আসবেন!
হুম! গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখছি। চল, টনি!

পরের সপ্তাহে ফোন করে আসবেন! দাদার একটা বাইট নিতে অপেক্ষা করতে হবে!
লোকটাকে চিনতে পারলি টনি?
চিনতে পারিনি! তাতে কী? লোকটাও আমাকে চিনতে পারেনি! ফিল্ম-টিম দ্যাখে না বোধ হয়!
এই লোকটাকে সে দিন দেখেছিলাম, যে দিন তোর গাড়ি খারাপ হয়ে গেল!
ত্রিবেণীর ভাইটা বোধ হয় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে! অভদ্র!
আনকালচার্ড! পরে যখন টিভিতে আমাকে দেখবে, তখন বুঝবে!!
ওই দ্যাখ! ত্রিবেণী পাত্র বেরোচ্ছে। পরে এক দিন আসা যাবে! চল!
ওদের বংশের কেউ নয়! হতেই পারে না!
CALL
এ কী! আবার তুমি! তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছ?
কে জানে! মনে হল আপনাদের এখান থেকে বের করে দেবে! তাই...

ও দিকে
ড্রামম

লোকটা মনে হয় বাঁচবে না! সবটাই কপাল! মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট!
টিফিন পরে খাবে! এখন চলো, বেরোতে হবে!
লোকটা আবার নামী, বিখ্যাত লোক! মনে হয় বাঁচবে না!
শোনো, আমার কয়েকটা পাঞ্জাবি কিনতে হবে! তোমার কি সময় হবে?

বেশ তো! আমারও কিছু কেনাকাটা ছিল! চলো এক দিন!
টনিও যাবে বলছিল। তিন জন চলে যাব এই সপ্তাহেই!
ওকে! তবে টনির ওই লজঝড়ে গাড়িটা আর আমি চড়তে চাই না!
এত ক্ষণে নিশ্চয়ই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে! নাকি হল না? বুঝতে পারছি না!
এখনও তো কোনও ফোনও এল না! ধুস! উফ! কী টেনশন!
নিজেই কি দাদাকে একটা কল করব! আর একটু ওয়েট করি!
ভদ্রলোকের ডায়েরি থেকে ভাইয়ের নাম্বার পাওয়া গেছে! ওটায় কল করো!

বাড়ির লোকগুলো কি হিমালয়ে গেছে নাকি? লাগছেই না লাইন!
ওরে ফোন, তুই বেজে ওঠ! বেজে ওঠ এক্ষুনি! কী রে, বাজবি তো?
ক্রিং ক্রিং
এই রে! ফোনটা বোধ হয় গেল একেবারে!
সেই সঙ্গে তোমার চাকরিটাও! বেরিয়ে যাও! গাধা! এক্ষুনি!
সেই যে এক বার রিং হল! ব্যস! তার পর আবার নট রিচেব্‌ল!
পরে...
তুমি যারই সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছ, সে-ই বিপদে পড়ছে...

একটাই তো ঘটল এমন! আর-একটা ঘটলে তবে বোঝা যাবে! আচ্ছা!
আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখি সাংবাদিকতা নিয়ে!
EMERGENCY
ওই তো ত্রিবেণী পাত্রর ভাই! অ্যান্টনি পাত্র!
হতচ্ছাড়া সাংবাদিকগুলো এসে গেছে!
দেখুন আমি মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত! প্লিজ়, পরে কথা বলব!
কী হবে কী করে বলব মশাই! আমরা ডাক্তার। ম্যাজিশিয়ান নই! বুঝতে হবে!
অ্যান্টনি পাত্র খুব চিন্তার মধ্যে রয়েছে...
বেঁচেও যেতে পারে! ধুস! হতাশ লাগছে!
আপনার প্রথম পছন্দ
পরের দিন বিকেলবেলা।

Pantaloons
ND Clock
ইচ্ছে করে, এই শপিং মলের সব শাড়ি তোমাকে কিনে দিই!
খুচরো আছে? না-থাকলে আমি দিচ্ছি!
একটা-দুটো দিয়েই শুরু করো না! ক্ষতি কী!
GENJA
Peter Pork
GUCCII
নায়িকা ডলফিন গঙ্গোপাধ্যায় এসেছেন শপিং করতে। তাঁকে ঘিরে লোকজন ফটো তুলছে!
আরে! আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না!
আরে টনি, সেই তোর ছবির নায়িকা! ডলফিন!
এত কায়দা করলে! দাদা তো মরল না! জিশুর মূর্তিটা...
আরে ক'টা দিন সময় তো দিতে হবে! হড়বড় করলে হবে না!
দুটো মূর্তি না-পেলে পুরো পেমেন্টটা পাব না! পুরো হোপলেস কেস!

Asia Camp
WMT BRAND
বড় ডিরেক্টরদের দেখে নায়িকারা এমন আদিখ্যেতাই করে!
কত দিন বাদে দেখা! তুমি হচ্ছ রিয়েল হিরো!
রাপ্পার সঙ্গে আমার একটা ফটো তোলো তো! ফেসবুকে আজকেই দেব!
আমি আজ তোমার কথাই ভাবছিলাম জানো! আমার বড় মামার ব্যাপারে!
আমার বড় মামা ত্রিবেণী পাত্র, ভেরি ফেমাস আর্ট কালেক্টর! একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কোমায় চলে গেছেন।
আই সাসপেক্ট দ্যাট দিজ় ইজ় আ কনস্পিরেসি!
ত্রিবেণী পাত্র কোমায়, মরছে না কিছুতেই...
দাদা মরার পর অন্তত এক মাস লাগবে সব কিছু হস্তগত করতে! দেরি হয়ে যাচ্ছে!

আমাকে চিনতে পারছেন? আমি টনি ঘোষাল! আমার ছবিতে কাজ করেছেন!
ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন, আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল।
তাই নাকি? আমার তো দেখে মনে হল আপনি চিনতেই পারেননি!
এক জন ব্যর্থ পরিচালককে চেনার কোনও প্রয়োজন বোধ করিনি!
রাপ্পা, আমি তোমায় রাত্তিরে কল করছি। কথা আছে।
হ্যাঁ রে, জামা, টি-শার্ট কী পছন্দ করবি বলছিলি... দেখবি না?
40%OFF
ধুস! কী হবে জামাকাপড় কিনে? সব ফালতু!
রাতে...
মামার বাড়িতে একটা সোনার জিশুর মূর্তি আছে। সেটা বিক্রির জন্যে কেউ ফোন করেছিল!
মনে হয় কেউ এক জন ওঁকে ডিস্টার্ব করছিল টু সেল দ্যাট বিউটিফুল আর্টওয়ার্ক!
আপনার মামা নিশ্চয়ই রাজি ছিলেন না? ...আর-একটা মূর্তি আছে? ...কোথায়?
মূর্তি... সোনা... হিরে... এ সব কী শুনছি!?
শ্রীরামপুরে? আচ্ছা... আসুন, আজ দেখা করছি! চলে আসুন!
আবার কিছু একটা বড় গোলমালে জড়াবে!
আমি চলে এসেছি! গোলপার্কের সেই ক্যাফেটার সামনে!

মামালি বুটিক
অ্যান্টনির সেই যে অভিনেত্রী ভাগ্নি না? গড়িয়াহাটে কি শপিং করবে?
সরি রাপ্পা, আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল!
আরে সেই ছেলেটা না? ব্যাপার কী?
হুম, মূর্তির ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছে! আশপাশে টেবিলও খালি নেই যে, বসে শুনব!
মামার বাড়ির সম্পত্তি সব কিছুই দুই মামার নামে। ত্রিবেণী আর অ্যান্টনি। মূর্তি বিক্রির চাপ আসছিল!
শ্রীরামপুরের ওই গির্জায় ঠিক একই রকম একটা মূর্তি আছে! মামাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ওই গির্জার কিছু একটা যোগাযোগ ছিল!
মূর্তিটা আগেও সরানোর চেষ্টা যারা করেছে, তারা বাঁচেনি! আর ওটা এ বাড়ির সম্পদ!
শোনো, তোমার অভিনেত্রী ভাগ্নি একটা গোয়েন্দা ভাড়া করেছে বোধ হয়!
ও কিস্যু করতে পারবে না! দাদা মরা পর্যন্ত শুধু ওয়েট করতে হবে!
তার পর মূর্তি দুটো বেচে দিলে কয়েকশো কোটি টাকা চলে আসবে!
ওই গির্জার ফাদারের কাছেও চাপ আসছিল বিক্রির জন্য! ফাদার বড় মামাকে জানিয়েছিলেন!
তার পরই এই দুর্ঘটনা! কিছুই বুঝতে পারছি না! কোনও প্রমাণও নেই!
বড় মামা মারা গেলে এই সম্পত্তির অধিকার ছোট মামা অ্যান্টনির?

বুঝতেই পারছ, মামি মারা গেছে। বড় মামার ছেলে থাকে বিদেশে। তার এ সব সম্পত্তি নিয়ে আগ্রহ নেই!
অ্যান্টনি মামা এসবের পিছনে আছে কি? কে জানে! এ দিকে ওই গির্জার...
WB04 25 22
হুম, ব্যাপারটা বেশ জটিল! আপনার ছোট মামার সঙ্গে কথা বলতে হবে!
...ফাদার কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন! ফোন করেছিলাম, কথাই বললেন না! ষড়যন্ত্র নাকি কাকতালীয় সব— কে জানে!
হতচ্ছাড়া! তোকে প্রথমেই একটু কড়কে দিতে হবে!
এক বার ওই গির্জায় গিয়ে ফাদারের সঙ্গে দেখা করলেও কিছু জানা যাবে!

বাড়িটা চিনে নিই প্রথমে, তার পর হচ্ছে ব্যবস্থা!
AUTO
ফাদার হয়তো ভয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। দেখা যাক!

AUTO

তোমাকে ভালবেসে এক জন চিঠি দিয়ে গেল! দেখো!
খুব সাবধান। বাড়াবাড়ি করিস না।
বাহ, তা হলে সব ঠিকই আছে!
মানে? তোমার এই সব ঠিক থাকার নমুনাটা একটু জানতে চাই!
তদন্ত ঠিক দিকেই এগোচ্ছে! আমাদের সন্দেহ সঠিক!
অর্থাৎ আরও একটি বড় গোলমালে জড়িয়ে কিছু দিনের ভোগান্তি! চমৎকার!
!
কয়েক ঘণ্টা বাদে...
ওই গির্জায় যেতে চাও! ঠিক আছে, আমি ঠিকানা পাঠিয়ে দিচ্ছি! ফাদারের সঙ্গে দেখা করলে বোঝা যাবে!
পরের দিন...
আরে এই তো পৌঁছচ্ছি! অটোয় আছি!
AUTO
আমার কি দাঁড়িয়ে থাকার সময় আছে! এত্ত টেনশন!
সামনের মোড়ে বাঁধবেন দাদা!

দশটা টাকা দাও তো! খুচরো নেই!
খুচরো দিন! ১০ টাকার জন্য ১০০ টাকার ভাঙানি? মামার বাড়ি?
ছোটলোক!
দশ টাকা দিতে মাথা গরম?
মূর্তি দুটো বিক্রি হলে তো... হি হি!
শোনো, আমাদের অভিজাত বংশ! দশ টাকা নিয়ে চিন্তা করা তোমাদের কাজ!
এমন অভিজাত বংশ যে দাদাকে মারতে সাপ লেলিয়ে দিয়েছ! হাসিও পায় তোমার কথা শুনে! হি হি!
রামছাগলের মতো ইয়ার্কি মারবে না! বড়-বড় রাজবংশে এ সব হয়েই থাকে! তোমার মতো উজবুক কী বুঝবে?
শোনো, ওই ছেলেটাকে হুমকি দিয়ে দিয়েছি, যাতে ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করে!
কে তোমাকে নিজে থেকে পাকামো করতে বলল?
AUTO

আমি খোঁজ নিয়েছি। রাপ্পা নামে ছেলেটা মহা পাকা! এ বার পিছনে পড়ে যাবে!
মোটা মাথার বুদ্ধি খাটিয়ে গুলিয়ে দিলে গবেট কোথাকার!
তোমার দাদাকে হাসপাতালে মারার একটা ব্যবস্থা করা যায় কি?
দাদার ছেলের মূর্তি নিয়ে কোনও সেন্টিমেন্ট নেই। তাই দাদা মরলেই মূর্তি বেচে দেব!
দাদা মরলে দাদার অত বড় কারখানা-সম্পত্তি সব যাবে ওর ছেলের দখলে! আমি পাব শুধু এই বাড়ির অর্ধেক! মূর্তিটা বেচতেই হবে! আমার টাকার দরকার!
ফাদার সম্প্রতি কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। কাগজে লিখে সব কিছু জানান!

ফাদার একদম কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা কী, একটু দেখুন!
সব ঈশ্বরভক্তির ব্যাপার! ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না!
না, মানে জলজ্যান্ত লোক একদম কথা বন্ধ করে দিল...
এ নিয়ে আর একটা কথা বললে একটি থাপ্পড়ে তোমার কথা বন্ধ করে দেব!
ফাদারের খাবারের অর্ডারটা নিতে যাব!
আগে দু'বেলা নিরামিষ খেতেন, এখন দু'বেলা চিকেন আর মটন! অদ্ভুত পরিবর্তন!
পাউরুটি বাটার চিকেন স্টু
দুটো মূর্তি দিতে পারলে তবেই তো ঠিকঠাক দামটা পাওয়া যাবে!
হাসপাতালে দাদার বারোটা আমি বাজিয়ে দিচ্ছি!
দাদা বেঁচে ফিরে এলে মূর্তি না-থাকলে তুলকালাম হবে! এ বাড়িতে থাকা তখন প্রবলেম হয়ে যাবে! উফ!
ডাক্তার সেজে ও সব করতে যাবে নাকি? একদম মানাবে না!
দেখতে তো রঘু ডাকাতের মতো! লোকে বুঝে যাবে!

একদম আজেবাজে কথা বলবে না! এর চেয়ে কত বড়-বড় কাজ সেরে দিলাম তুড়ি মেরে! হুঃ!
কাল আমি যাচ্ছি ডক্টর সেজে সকালবেলা। বেলা বারোটার মধ্যে প্রজেক্ট ডান! ব্যস!
ব্যস, ব্যস, এখানেই রাখো! আমার পাঁচ মিনিট লাগবে।
স্টার্ট বন্ধ কোরো না, দৌড়ে আসব, উঠব, গাড়ি ছেড়ে দেবে!
গুড মর্নিং স্যার!
মর্নিং!
স্যর, এই ওষুধগুলো একটু বুঝিয়ে দেবেন?
সময় নেই! সময় নেই!
তোদের গাফিলতিতেই রোগী মরেচে!
চামড়া ছাড়িয়ে নেব! খালি টাকা নিবি, চিকিৎসা করবি না!

LIFT→
নার্সিংহোম
না রক্তচোষা
রাক্ষসের দল?
মেঘ না-চাইতেই
জল। ওই তো
একটা ডাক্তার!
পেয়েছি!
!?
কী রে, গরিব
মানুষের পকেট
মেরে ডাক্তারি
হচ্ছে?
মেরে
একেবারে
থেঁতো করে
দে!
দুম
এ কী! ডাক্তার
গুলি চালাচ্ছে!
উদোম পিটুনি
দাও! ওয়ান অ্যান্ড
অনলি দাওয়াই!
এর পরেও
আমরা চুপ
করে থাকব!

সব প্ল্যান একটা-একটা করে ভেস্তে যাচ্ছে! দাদা না মরলে আমি...
অ্যান্টনি মামা ব্যস্ত? কথা ছিল...
বড় মামার ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তিত!
সে তো আমিও চিন্তিত! সেই কথাই বলছিলাম আমার বন্ধুকে!
আমার এক বন্ধু রাপ্পা যাবে ফাদার আঙ্কলের সঙ্গে দেখা করতে! যদি কিছু জানা যায়!
এ সব যত করবে, লোক জানাজানি হয়ে যাবে! তখন আমারও লাইফ রিস্ক! এ বার আমার পিছনেও লোক লেগে যাবে!
অলরেডি জানাজানি হয়েছে। রাপ্পাকে হুমকির চিঠি দিয়েছে কেউ!
পাকামি করতে গিয়ে কী করেছ দ্যাখো! তুমি একটি আস্ত গর্দভ!
ঠিক আছে, এখন গির্জার মূর্তিটা পার্টিকে দিয়ে দেব! আর তোমার ব্যবস্থা করে দেব! মাস খানেক দাও!
এখন আবার ডেঁপো ছোকরাটা গির্জায় যাচ্ছে! ওর ব্যবস্থা করতে হবে!

ফাদার ভদ্রলোক কথা বলা বন্ধ করেছেন— ব্যাপারটা অদ্ভুত!

যা বলার বলে দিয়েছি! এ বার ওর ব্যবস্থা করবে ফাদারের ভাই আর ওর চেলারা।

ফাদারের কাছেও হুমকি এসেছে? ভয়ে কথা বন্ধ করেছে? নাকি অন্য কারণে?

একটা টিকটিকি যাচ্ছে ফাদারের সঙ্গে দেখা করতে। মূর্তির ব্যাপার নিয়ে জিজ্ঞেস করবে হয়তো! ব্যাটাকে যা করার করে দিয়ো! ছেলেটা অত্যন্ত পাকা! এর আগে চোর-ডাকাত ধরে নাম কিনেছে কয়েক বার। ঠান্ডা করে দিয়ো।

ঘণ্টা খানেক পরে...
শ্রীরামপুর
SERAMPORE

শ্রীরামপুর
SERAMPORE
ওই তো রিকশা স্ট্যান্ড। চল, উঠে পড়ি!

গির্জায় যাচ্ছেন মানে ধম্মে-কম্মে মতি হয়েছে! ভাল! আজকাল তো ও সব ব্যাকডেটেড!

ST. PLAVES CHURCH
জায়গাটা কী সুন্দর! ঢুকলেই মনটা পবিত্র হয়ে যায়!
ST PLAVS CHURCH ESTD 1756

টনি আর রাপ্পা শ্রীরামপুরের গির্জায়...
আসুন! আমাদের ফাদার মাটির কাছাকাছি থাকতে চান সব সময়!
তাই মাটির তলার ঘরে থাকেন বেশির ভাগ সময়!
আচ্ছা বেশ। উনি তো শুনেছি কথাও বলেন না!
আমাদেরও কি হাত-পা নেড়ে কথা বলতে হবে নাকি?
আহা! কী বিনয়ী! এই না হলে ধর্মগুরু!
একটা জিনিস খেয়াল রেখো... চায়ে যেন অন্য গন্ধ না পাওয়া যায়।
তোমার জন্মের আগে থেকে চা বানাচ্ছি! তুমি গিয়ে অতিথিদের বসিয়ে রাখো, তার পর দেখছি!

আমরা একটা বিশেষ দরকারে আসছি! একটা জিশুর মূর্তির ব্যাপারে কথা বলব। তার আগে ব্যাপারটা খুলে বলি...
...তা এই গির্জার একটি ঘরে সোনার ওই মূর্তিটা আছে! আপনার কাছেও ফোন এসেছে...
অতিথিরা এসেছে! চায়ের ব্যবস্থা করতে বল! কুইক!
আপনার জীবন যদি বিপন্ন হয় বা এই হুমকি সম্পর্কে যা-ই জানেন, খুলে বলুন! প্লিজ়!
আসলে মূর্তিটার অ্যান্টিক ভ্যালু যা আন্দাজ করছি, কয়েকশো কোটি টাকা! তো...
কী যে লিখছে হিজিবিজি। কে জানে?
চিন্তা করার মতো কোনও কারণ ঘটেনি!
আপনা

চা-টা খেয়ে নিন। একেবারে দার্জিলিং থেকে আনা।

আপনারা অনুগ্রহ করে একটু চা সেবন করুন।

নিশ্চয়ই! ধন্যবাদ!

এ বার এই ব্যাপারটা সম্পর্কে যতটা জানেন, সেটা যদি বিস্তারিত জানান! আমরা সন্দেহ করছি একটা ব্যাপারে...

ত্রিবেণীবাবুর অ্যাক্সিডেন্টটাও একটা চক্রান্ত! যদিও নিশ্চিত কোনও প্রমাণ মেলেনি!

তোমরা আসলে দুটো ভেড়ে রামছাগল।
এ আবার কী ধরনের অসভ্যতা! আপনি এ কথা লিখছেন? ভাবা যায় না!
তোমাদের চা-এ ওষুধ মেশানো আছে। এক্ষুনি একশান হয়ে যাবে।
আহ, মাথাটা ঝিমঝিম করছে! আপনি... আপনি...
আপদের শান্তি!
এই মোটা হনুমানটাকে তুলতে আর-এক জন লাগবে! ডাকো!
পরে...

শোন হতভাগারা, আমি হলুম এখানকার ফাদারের যমজ ভাই! গলাটা আমার এতটাই আলাদা যে, বোবা সেজে রয়েছি! ওরে, দুটো মূর্তিই আমার চাই!
আরে মূর্তিটা পেয়ে গেলে অ্যান্টনিকেও বাঁচিয়ে রাখব না কি! ব্যাটা বড়লোকের স্পয়েলড চাইল্ড!
ত্রিবেণী না-মরলে অ্যান্টনি ওর বাড়ির মূর্তিটা দিতে পারছে না!
আর দুটো আপদ তদন্ত করতে এসেছিস! নদীর তলায় গিয়ে তদন্ত করবি!
টাকা উড়িয়ে বাজারে ওর এক গাদা দেনা! ওর মরাই ভাল! তোদের কাছে পাঠিয়ে দেব!
গ্যাস ভরিয়ে এনেছ তো! ওটা দিয়ে মারো, তার পর নদীতে সলিল সমাধি!
চলি বাছারা! জিশুর মূর্তির সামনে প্রার্থনায় বসতে হবে! হে হে! গুড বাই!

কাজটা কিন্তু ভাল করছেন না! আমরা নিখোঁজ হয়ে গেলে আপনি পার পাবেন?
জিন্‌সের প্যান্ট দুটো খুলে নিস তো! ব্র্যান্ডেড মাল!
নে রে ভাই, হরিনাম করতে থাক!
তোমরা বাংলা সংস্কৃতির বিরাট বড় ক্ষতি করছ। আমার সঙ্গে-সঙ্গে একটা যুগ শেষ হয়ে যাবে!
টনি, বাতেলা বন্ধ কর। অন্তত মরার সময় একটু শান্তি দে!
কয়েক মিনিট পরে...
ছেলে দুটো পটল তুলেছে! সন্ধে হলে বস্তা করে পাচার করে দেব!
তবে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে বস! এদের খোঁজে লোক আসবে!
বস্তায় দু’-চারটে থান ইট ভরে বিকেলের মধ্যে রেডি করছি!

ব্যাপারটা লোক জানাজানি হয়ে যাওয়ার আগে কেটে পড়তে হবে! বুঝলে?
আমি আপাতত একটা মূর্তি নিয়ে সেটা ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছি!
আমার দাদা তো এখনও কোমায়!
তুমি এখন বাড়ি ফিরে যাও! পরে যোগাযোগ করছি!
ছোঁড়া দুটোর ফোন হাওড়ায় ফেলে দিয়েছি, যাতে মনে হয় ওরা হাওড়া থেকে নিখোঁজ!
মরার আগে মোটা ছোকরাটা কী সব বকবক করছিল! ওফ!
দুম
দাম
দমাস
ওরা ডেডবডি দুটো আনতে গেছে, প্রায় আধ ঘণ্টা হয়ে গেল!
তোমাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখেছে? অপদার্থ!
দাঁড়াও! গিয়ে দেখছি কী ব্যাপারটা কী! ব্যাটারা এত ক্ষণ কী করছে?

নিশ্চয়ই ডেডবডি বস্তায় পুরে বসে-বসে আড্ডা দিচ্ছে!
এ কী! কেউ মেরে ডেডবডিগুলো নিয়ে গেছে!
ওগুলো ডেডবডি নয়! জ্যান্ত! রোগা ছেলেটা প্রচণ্ড পিটিয়েছে!
কী বাজে গ্যাস দিয়েছ! কাজ হয়নি! কী আরম্ভ করেছ কী?
চোপ রাও! দু'লাখ টাকা পেমেন্ট দিয়েছিলে! তার মধ্যে দেড় লাখ টাকা জাল নোট!
!
জাল নোট দিয়েছ, তাই জালি গ্যাস দিয়ে দিয়েছি! বেশ করেছি!
সর্বনাশ! হতচ্ছাড়াগুলো পুলিশ আনার আগেই পালাতে হবে!
আমরা এখন আলাদা হয়ে পালাব! তোমাদের প্রত্যেকের ব্যাগে টাকা দেওয়া আছে।

কিন্তু এমন তো কথা ছিল না! বাকি টাকা কবে দেবেন, কী ভাবে দেবেন বলুন!
পরিস্থিতি বুঝে করব তো! দুটো মূর্তি তো পেলাম না!
এখন তোমরা যা বলছি করো! দক্ষিণ ভারতের কোথাও আমরা দেখা করব!
প্রত্যেকের টাকার ব্যাগ দেখিয়ে দেওয়া হল...
এ দিক দিয়ে বেরোতে হবে! যা বলার, তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি!
সব বলেছেন কী? সব না-বললে আপনাকে ছাড়ব কী করে?
মানে, এই ব্যাগগুলোয় জাল নোটে ভর্তি!
হিসেবটা বুঝিয়ে দিন! জাল নোট গছিয়ে কেটে পড়বেন, তা হবে না!
শুধু নোট নয়, ওই বন্দুকের গুলিগুলোও নকল! হে হে হে!

ক্লিক
ক্লিক
ক্লিক
হে হে, এ বার আসল গুলি চলবে, দ্যাখ!
ফটফট
কালী পুজোর স্বপ্ন দেখছি! পটকা ফাটছে...
আজ্ঞে না! গির্জার দিক থেকে শব্দটা আসছে!
চার দিক ঘিরে ফেলা হয়েছে! সারেন্ডার কর! গুলি চলবে!
পালাতে হবে! পালাতেই হবে! গঙ্গার দিকে...
দুম
ইস, আপনার পালানো হল না! ভেরি সরি! হাত দুটো উপরে তুলুন!
ওফ!

ওই ছেলেটি বোধ হয় লোকটাকে ধরেছে! এ দিকে এসো! কুইক!
আমাকে শুধু চোখ রাঙালে হবে? অনেকেই আছে! সব বলব!
ত্রিবেণী পাত্রর ভাই অ্যান্টনি পাত্র বিরাট সেয়ানা! ওকে ধরুন!
ভোর-ভোর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাও! লোকটা পালাতে যেন না-পারে!
ভোরের দিকেই ঘুমটা ভাল হয়, কপাল খারাপ, সেটাই মাটি হয়ে গেল!
অ্যান্টনি পাত্র ধরা পড়ল...
কী ভেবেছেন কী? আমার একটা সোশ্যাল স্টেটাস আছে!! এটা ঠিক নয়!
গত কাল রাতেই সবাই ধরা পড়েছে! আসল ফাদারকে আটকে রেখে ফাদার সেজে লুকিয়েছিল!
রাপ্পা রায় আবার শিরোনামে এই জিশু মূর্তি পাচার কাণ্ডে! তার সাহসিকতা...
রাপ্পাদা, আমি রাহুল মজুমদার। তোমার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই। ভারতবার্তা থেকে আসছি!
আমার সাক্ষাৎকার নেবে কেন? আমি তো আর সেলিব্রিটি নই!

টনিদা, আপনাকেও চিনি কিন্তু! আপনার কথা কাগজে লিখলাম এই সে দিন।
কোনও একটা লেখা... ঠিক মনে পড়ছে না!
ও হ্যাঁ! কলকাতার ফ্লপ ডিরেক্টরদের নিয়ে লেখা!
রাপ্পাদা, শুধু ইন্টারভিউ নয়, একটা ডকু বানাব আপনাকে নিয়ে!
আপনার এই সব অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে! দারুণ হবে!
ওই জিশুমূর্তি চুরি করতে গেলেই তার সর্বনাশ হবে! আবার প্রমাণ হল! আগেও শুনেছি ছোটবেলায়! তাই হল!
টনিবাবু, রাপ্পাদার পাশাপাশি আপনিও কম বাহাদুর নন!
এ ভাবে বলবেন না! আমার লজ্জা করে! হেঁ হেঁ!
রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে...
বুঝলি, একটা কথা ভাবছি! মানে একটা কাজ...
ক'টা ভাল দেখতে জামা কিনেই ফেলি! চল তো!

স মা প্ত

প্রাচীন শিল্পীর তুলিতে সুজু খেলা

খেলার ইতিহাস, ইতিহাসের খেলা

বিশ্বের প্রাচীনতম ক্রীড়াগুলো বহু-বহু বছরের বিবর্তনে আজ আধুনিক রূপ নিয়েছে।

অংশুমিত্রা দত্ত

আজ যা ফুটবল, দশ বছর আগে তা কী খেলা ছিল? প্রশ্নটা শুনতে উদ্ভট মনে হলেও এ কথা অনস্বীকার্য, মানব সভ্যতার ইতিহাসে খেলাধুলো বরাবরই খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের শারীরিক কসরত এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিই ছিল যে-কোনও খেলার মূল দুই স্তম্ভ। তার সঙ্গে বিনোদন তো উপরি পাওনা। জিমন্যাস্টিক্স, তিরন্দাজি, বলগেম, সবই সভ্যতার উৎপত্তির সময় থেকে মানুষের যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

জিমন্যাস্টিক্স: ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রিসে পুরুষদের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য জিমন্যাস্টিক্স প্রথম শুরু হয়। জোহান ফ্রিডরিচ এবং ফ্রিডরিচ লাডভিগ জন নামের দুই জার্মান ডাক্তার অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে জিমন্যাস্টিক্সে প্রথম প্যারালাল বার, হরাইজ়ন্টাল বার, ব্যালেন্স বিম, ল্যাডার ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করেন, যা আধুনিক জিমন্যাস্টিক্সে দেখা যায়।

মেসোআমেরিকান বলগেম: তখন মেসোআমেরিকা বলতে আজকের সেন্ট্রাল মেক্সিকো থেকে বেলিজ়ে, গুয়াতেমালা, এল সালভাদর, হন্ডুরাস, কোস্টারিকা পর্যন্ত প্রসারিত অঞ্চলকে বোঝানো হত। এই মেসোআমেরিকাতেই প্রথম বলগেমের উৎপত্তি ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। অলমেক, অ্যাজ়টেক, মায়া সভ্যতায় এই খেলা খুব জনপ্রিয় ছিল।

সুজু: সুজুকে ফুটবলের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে ফিফা। ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চিনে সুজু খেলা শুরু হয়। একটি বলকে পা দিয়ে মেরে জালের মধ্যে পাঠানোর এই খেলাটির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় এক প্রাচীন সামরিক বইতে। রাজ পরিবারেও নাকি খেলা হত সুজু।

বক্সিং: বক্সিংয়ের উৎস খুঁজলে চলে যেতে হয় ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় (অধুনা ইরাক)। তখন সান্ধ্যকালীন খেলা হিসেবে মুষ্টিযুদ্ধ করা হত। অন্য মতে, মেসোপটেমিয়া নাকি এই খেলা সুমেরু সভ্যতা থেকে আমদানি করেছিল।

তিরন্দাজি: ২০০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিরন্দাজির আনুমানিক উৎপত্তি আফ্রিকায়। প্যালিওলিথিক যুগে নাকি প্রথম তির ও ধনুকের আবিষ্কার, তাই মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই খেলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তির-ধনুক শিকারে ব্যবহৃত হত। মিশর, পারস্য, ভারত ও জাপানি সভ্যতায় এই ক্রীড়া জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯০০ সালে অলিম্পিক্সের অন্তর্ভুক্ত হয় এই ক্রীড়া।

খেলা যে কেবলই খেলার ছলে হয় না, তার প্রমাণ এই ইতিহাস।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ঝিকিমিকি আলো

অদিতি ভট্টাচার্য

ছবি: রৌদ্র মিত্র
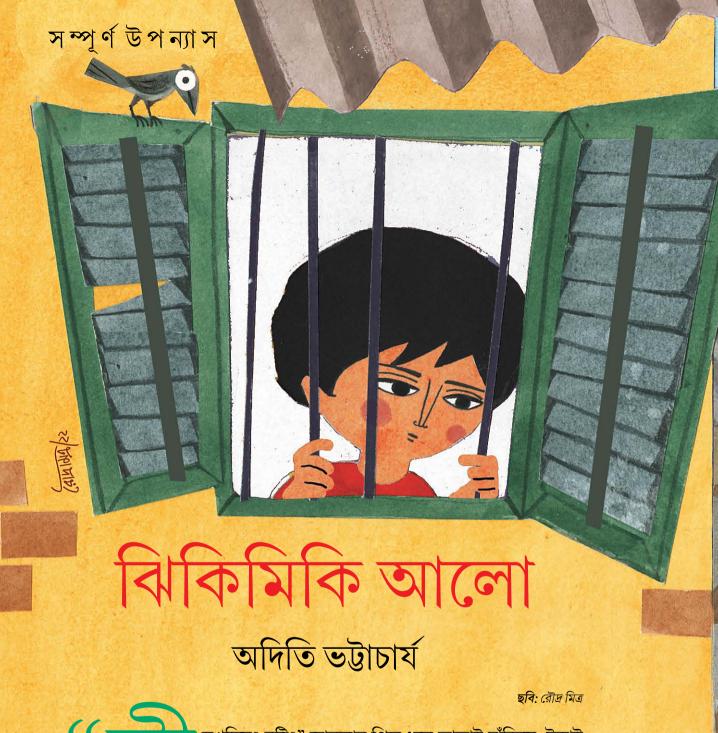
“কী দেখছিস? বৃষ্টি?” জানলার গ্রিল ধরে তাতাই দাঁড়িয়ে, টুকাই তার পাশে এসে দাঁড়াল।

তাতাই ঘাড় ঘুরিয়ে দাদাকে এক বার দেখল শুধু, কিছু বলল না, তার পর আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। জানলা থেকে একটু দূরে মাটিতে এক জায়গায় অল্প জল জমেছে।

একটা এই বড় ব্যাঙ কোত্থেকে যেন লাফিয়ে এসে সেই জলে পড়ল, থপ করে আওয়াজ হয়ে চার দিকে খানিক জল ছিটিয়ে গেল। টুকাই দেখল তাতাইয়ের মুখে অল্প হাসি। সে আবার দাদার দিকে তাকাল। টুকাইও হাসল। বলল, "কী মোটাসোটা ব্যাঙ রে বাবা! এটাই সারা রাত ডাকে বোধ হয়!"

তাতাইয়ের মুখটা তখনও হাসি-হাসি, সেই আগের মতো ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া মুখ নয়। দাদার কাছে ঘেঁষটে এল ও।

'ভাইটা যে কবে আবার আগে মতো হবে!' টুকাই নিজের মনেই ভাবল, 'ভাই ঠিক না হলে যে মা-ও সব সময় ওরকম দুঃখী-দুঃখী হয়ে থাকবে। বটুদাদু থাকলেও না হয় হত, কিন্তু বটুদাদুও যে এখানে নেই।'

বটুদাদুর কথা মনে পড়তেই টুকাইয়ের মুখটাও দুঃখী-দুঃখী হয়ে গেল, চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছল ও। ভাগ্যিস তাতাই আবার জানলা দিয়ে বাইয়ে তাকিয়েছে! না হলে দাদার চোখে জল দেখলে ও আবার সেই আগের মতো হয়ে যেত।

বটুদাদু গল্প বলতেন, মংলুর গল্প, সিলিমিলি আর বিট্টানের গল্প আর সেই সাধুবাবার গল্প। টুকাই হাঁ করে শুনত, সে এক আশ্চর্য দুনিয়া। শুনতে-শুনতে টুকাই যেন হারিয়েই যেত সেই দুনিয়ায়। শুধু টুকাই নয়, জয়, বাপ্পা, মন্দিরারাও শুনত। টুকাইয়ের জেঠতুতো দাদা রিকি অবশ্য বলত, "ও সব গল্প গরিব ছেলেমেয়েরা শোনে। তোদেরও তো বাবা নেই, তোরাও গরিব, বাবা মরে গেলে গরিব হয়ে যায়, তাই ওই বুড়োটার ওইসব আলতু-ফালতু বকবকানি শুনিস।"

আসল কথা হচ্ছে রিকি খুব বাজে কথা বলে। টুকাইয়ের বাবা যখন ছিলেন তখনও টুকাই বটুদাদুর কাছে গল্প শুনত। আর বাবা নেই আবার কী? বটুদাদু বলেছেন, "নেই বলে কিছু হয় না। সব আছে, স-অ-অ-ব,

সবাই আছে। যে রকম ভাবে আমরা দেখতাম সে রকম ভাবে হয়তো নেই, কিন্তু আছে। থাকতেই হবে। এই তো দুনিয়ার নিয়ম রে, তার এতটুকু এ-দিক ও-দিক হওয়ার জো নেই।"

টুকাই জিজ্ঞেস করেছিল, "তা হলে যে বাবাকে দেখতে পাচ্ছি না?"

বটুদাদু বলেছিলেন, "কী বললাম এক্ষুনি? যে রকম ভাবে আমরা দেখতাম সে রকম ভাবে হয়তো নেই, কিন্তু আছে। বললেই হল দেখতে পাচ্ছি না, চেষ্টা করে দ্যাখ দেখি কেমন দেখতে না পাস। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক সব কিছু এ দুটো চোখে দেখা যায় না। তবে যা শুধু চোখে দেখা যায়, তার বাইরেই কি কিছু নেই? আছে, অনেক কিছু আছে। বেশিটা তো ওখানেই। আমাদের চার পাশের দুনিয়ার মতোই সে আর-এক দুনিয়া।"

"যেখানে মংলু থাকে?"

"মংলু থাকে, আরও কত কে থাকে! সব এইখানে," বটুদাদু টুকাইয়ের বুকে আলতো হাত ছোঁয়ালেন, "বাবা তো চিরদিনের মতো এইখানে রয়ে গেছেন রে পাগলা। আর কখনও কোথাও তিনি যাবেন না, যেতে পারবেনই না।"

যে দিন সবাই বলছিল বাবা চলে গেছে, বাবা চলে গেছে, মা কী রকম যেন করছিলেন, তার পরের দিন বটুদাদু এসেছিলেন, টুকাইকে কাছে টেনে নিয়ে বসেছিলেন, বলেছিলেন, "চোখ বন্ধ কর দেখি, তা হলেই দেখতে পাবি বাবা আসছেন, তোর কাছে আসছেন। তুই মংলুকে দেখতে পাস না? তা হলে বাবাকে কেন পাবি না?"

আরও কত কিছু বলেছিলেন, সেসব শুনতে-শুনতে টুকাইয়ের মনে হয়েছিল বাবা যেন চলে যেতে যেতেও ফিরে এলেন, এসে কী রকম ভাবে যেন তার মধ্যেই মিশে গেলেন।

পাশের বাড়ি কেতকীজেঠিমা মাকে বলেছিলেন, "তাতাই তো কিছু বুঝতেই পারেনি, কিন্তু তোমার টুকাই অদ্ভুত শান্ত হয়ে আছে, সে রকম বাবা-বাবা করছে না তো! ও আবার একটু কল্পনাপ্রবণ তো, দেখছি তো জন্ম থেকে। কী জানি কী ভাবছে, কী বুঝছে!"

টুকাই বটুদাদুর কথাগুলো বলতে গিয়েও বলেনি। সব কথা সব সময় বড়দের বলা যায় না। তবে রিকিকে সে সব কথাই বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মা ডাকলেন, বেশ কড়া গলায়, "চলে এসো।"

টুকাই খেয়াল করে দেখেছে, মা ওকে আর তাতাইকে রিঙ্কি, রিকিদের সঙ্গে বিশেষ মিশতে দেন না। অবশ্য টুকাইয়েরও ওদের একেবারে পছন্দ না। তাতাইকে তো ওরা বড্ড রাগায়। তাতাই রেগে গেলে বা কাঁদলে হ্যা-হ্যা করে হাসে। এ রকম ছেলেমেয়েদের কখনও ভাল লাগে? একটা বড় বাড়ির দু'ভাগ, এক পাশে টুকাইরা থাকে আর আর-এক পাশে টুকাইয়ের জেঠুরা। কিন্তু কোনও যাতায়াত নেই। বাবা আর জেঠুকেই বা কত কথা বলতে দেখেছে টুকাই? বললেও তো কেমন যেন গম্ভীর-গম্ভীর মুখে বলত। অমন যে হাসিখুশি মানুষ বাবা, তিনিও কেমন গম্ভীর হয়ে যেতেন জেঠুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে। তার পর তো এক দিন কী হল কে জানে, সবার মুখে ওই একই কথা, বাবা চলে গেছেন, বাবা আর নেই! ভাগ্যিস বটুদাদু বুঝিয়ে বলেছিলেন ওকে, না হলে যে কী হত! মামা এসেছিলেন গ্রামের বাড়ি থেকে, মা আর মামার মধ্যে অনেক কথা হল। বড়দের শক্ত-শক্ত কথা, টুকাই সব কথা তো বোঝেনি, তবে এটুকু বুঝেছিল যে মামা ওদের নিয়ে যেতে চাইছেন।

"ভেবে দ্যাখ, দুটো বাচ্চা নিয়ে এখানে আর থাকবি নাকি। তার পর যা বললি... এই বাড়ি বন্ধ করে আমার সঙ্গে তরণীপুরে চল। টুকাই, তাতাই ওখানেই লেখাপড়া করবে। গ্রামে কি ছেলেপুলেরা মানুষ হচ্ছে না? না লেখাপড়া না-শিখে তারা গোমুখ্যুই থাকছে?" মামা বলেছিলেন।

মা রাজি হননি। বলেছিলেন, "না, এক্ষুনি যাব না। এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করে না। এখানেই তো আমার সব কিছু," মা'র গলা ধরে এসেছিল, চুপ করে গেছিলেন। তার পর আবার বললেন, "দেখি কিছু দিন। সব দিক সামলে পারি নাকি। তা ছাড়া বছরের মাঝখানে আর এই স্কুল ওই স্কুল করে ছেলে দুটোকে টানাহ্যাঁচড়া করতে ইচ্ছে করে না। একেই ওদের মাথার উপর থেকে ছাদ সরে গেল..."

মামা গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করে বলেছিলেন, "যা ভাল বুঝিস কর। আমি তো রইলামই। কোনও দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিস।"

ছোট হলেও টুকাই বেশ বুঝতে পেরেছিল যে, মা'র সিদ্ধান্তে মামা মোটেও খুশি হননি। তবে ও খুব খুশি হয়েছিল। এখান থেকে যাওয়ার কোনও ইচ্ছেই ওর ছিল না। এখানে ওর স্কুল আছে, বন্ধুরা আছে আর সবচেয়ে বড় কথা হল, বটুদাদু আছেন। অমন সুন্দর-সুন্দর গল্প বটুদাদু ছাড়া আর কে বলতে পারবে? সব কিছু ভুলিয়ে দেওয়া গল্প। মা'র দুঃখী-দুঃখী মুখটা আর জলভরা চোখ দুটোকে দেখলে বুকে যে চিনচিনে ব্যথাটা হয়, গলার কাছটায় যেন কী একটা দলা পাকিয়ে আসে— সেসবও ঠিক হয়ে যায় মংলু, বিট্টান আর সিলিমিলিদের গল্প শুনলে। সন্ধেবেলা যখন বাবা অফিস থেকে ফিরে আসেন না, ওদের আদর করেন না, তখন যে মনটা কী রকম খালি-খালি লাগে, সে সবও সামলে নেয় টুকাই, বটুদাদুর বলা কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে। ও তখন তাতাইকে গল্প শোনাতে বসে, তাতাইয়ের ভাল লাগুক বা না-লাগুক, তাতাই শুনুক আর না-শুনুক ও বলে যায়, বলেই যায়, যত ক্ষণ না মা এসে ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরেন। ওই সময় একটু কাঁদা যায়, কেউ দেখতে পায় না, টুকাই জানে। তবে ওই একটুখানিই, তার পরেই জোর করে হাসি-হাসি মুখে মা'র দিকে তাকায়। মা'র মুখেও তখন হাসি। টুকাই জানে মা-ও তখন ওই ওর মতোই একটুখানি কেঁদেছেন। বটুদাদু বলেছেন ও বড়, ও যা করবে, তাতাই দেখাদেখি তা-ই করবে। তা ছাড়া ছোট ভাইকে তো সামলানোর দায়িত্ব দাদারই। টুকাইকে তাই অনেক কিছু খেয়াল রেখে চলতে হয়। মা-ও তো বলেন, "টুকাই আমার খুব লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে।"

এ রকম করেই চলছিল। মা'র কড়া নিষেধ ছিল জেঠুদের বাড়ি যাওয়ায়। টুকাইরা যেতও না। রিকি, রিঙ্কিদের সঙ্গে আসা-যাওয়ার পথে দেখা হতই। টুকাই, তাতাইকে খেপানোর সুযোগ ওরা ছাড়ত না। মা বলেছিলেন, "ওরা যা খুশি বলুক, তোমরা উত্তর দেবে না।"

অবশ্য ওরা কাকে না আজেবাজে কথা বলে? কী একটা পরীক্ষা হল, সায়েন্স ট্যালেন্ট টেস্ট না কী, অনেক স্কুলের ছেলেমেয়ে দিয়েছিল তাতে মন্দিরা ফার্স্ট হয়েছিল, এত্ত-এত্ত প্রাইজ় পেয়েছিল। ওমা, তাতেও রিঙ্কির কী রাগ! বলে, "ছাই পরীক্ষা, বাসনমাজুনির মেয়ে ফার্স্ট হয়!"

এ রকম কথাবার্তা মা খুব অপছন্দ করেন, টুকাইকে বলেন, "দ্যাখ মন্দিরার লেখাপড়ায় কত মন! বটুদাদুর কাছে পড়ে কত ভাল রেজ়াল্ট করছে। আমি কমলাকে বলেছি তোমার ও মেয়ে কত বড় হয় দেখো।"

এ কথা টুকাই জানে। শুধু কি মন্দিরা? জয়, বাপ্পা আরও কত জনকে যে বটুদাদু পড়ান! বলেন, "পড় পড়, মন দিয়ে পড়। যা পড়ছিস, যা শিখছিস সব মনের মধ্যে গেঁথে নে। যতই ঝড়ঝাপটা আসুক, হাল ছাড়িস না, পরিশ্রম কর, দেখবি এক দিন ঠিক আগুন জ্বলবে।"

"আগুন?" টুকাই প্রথম দিন শুনে খুব অবাক হয়েছিল, "কোথায় আগুন জ্বলবে?

"তুই যে আগুন ভাবছিস এ কি সে আগুন নাকি রে পাগলা?" বটুদাদু বলেছিলেন, "এ আগুন অন্য রকম। এ দাউদাউ করে জ্বলে উঠে সব কিছুকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় না, বরং এ ঝিকমিক করে জ্বলে উঠে আলো দেয়, যে আলোয় আরও অনেকে পথ খুঁজে পায়। যখন জ্বলে ওঠে তখন বোঝা যায়, তখন সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে।"

বটুদাদুর সবই অন্য রকম। তিনি নিজেই যে অন্য রকম। তাই তাঁর কাজকর্মও অন্য রকম, তাঁর কথাবার্তাও অন্য রকম, তাঁর বলা গল্পও অন্য রকম। না হলে কখনও দিনের পর-দিন এত ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে যান? তার জন্যে নাকি টাকাপয়সাও নেন না। আবার কেউ পড়তে না এলেই খবর নিতে তার বাড়িতে দৌড়ন। কী হল? শরীর খারাপ? নাকি ছেলেটাকে কোনও চায়ের দোকানে ঢোকালে? মেয়েটাকে কার বাড়িতে বাচ্চা দেখাশোনার কাজে লাগালে? এ সব করলে আর রক্ষে নেই, বটুদাদু যা রেগে যান! টুকাই শুনেছে এ রকম অনেককে নাকি উনি

কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনে আবার লেখাপড়া করাচ্ছেন। রিনি, রিঙ্কিদের মতো কেউ-কেউ ওঁকে নিয়েও হাসিঠাট্টা করে, আবার অনেকে বলে, “সত্যিকারের মানুষ উনি, পরার্থে নিজের জীবন ব্যয় করছেন। এত বড় বাড়ির ছেলে, অগাধ সম্পত্তি, তাও দেখো বাচ্চাগুলোকে নিয়েই পড়ে আছেন। ও ছাড়া বোধ হয় আর নিজের কোনও শখআহ্লাদও নেই। এমন মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের।”

টুকাইয়ের বিশ্বাস উনি ম্যাজিক জানেন। না হলে অত ছেলেমেয়ে অমন বাধ্য হয়ে লেখাপড়া করে! জয় কি কম দুষ্টু? আবার স্রেফ গল্প বলে উনি দুঃখকষ্টও ভুলিয়ে দিতে পারেন।

“তোকেও আগুন জ্বালাতে হবে টুকাই,” উনি বলেছিলেন, “মায়ের জন্যে, তাতাইয়ের জন্যে। জ্বালাতেই হবে, বুঝলি?”

কী করে আগুন জ্বালাবে, কোথায়ই বা জ্বালাবে— এ সব টুকাই বোঝেনি, তবু ঘাড় কাত করেছিল। বটুদাদু যখন বলেছেন, তখন তা করতেই হবে।

সেদিনটার কথা এখনও মনে আছে টুকাইয়ের। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ, স্কুল ছুটি। এক বন্ধুর জন্মদিনের নেমন্তন্নে টুকাই তার বাড়িতে গেছিল। বন্ধুর মা বাড়িতে এসে নেমন্তন্ন করে গেছেন, বলেছিলেন দুপুরে টুকাই ওঁদের বাড়িতে খাবে, বিকেলে উনি নিজে পৌঁছে দিয়ে যাবেন। তাতাইকেও যেতে বলেছিলেন, কিন্তু কয়েক দিন আগে তাতাইয়ের শরীর খারাপ হয়েছিল বলে মা আর ওকে পাঠাননি। তা ছাড়া তাতাই বড়ই ছোট, এই সবে চার বছর হয়েছে, যদি ওখানে ভাল না লাগে? টুকাইকে “বাড়ি যাব, বাড়ি যাব,” করে বিরক্ত করে?

টুকাই নেমন্তন্ন খেয়ে বেলুন আর লজেন্সের প্যাকেট হাতে নিয়ে বেশ খুশি মনে বাড়ি ফিরেছিল, কিন্তু ফিরে যা দেখল তাতে ওর বড় ভয় করল, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, কোনও কথাই বলতে পারল না। দেখল তাতাই ঘরের এককোণে মেঝের উপর বসে, থরথর করে কাঁপছে, ফ্যাকাসে মুখ। মা পাশে বসে পাগলের মতো বলছেন, “কী হয়েছে সোনা? কোথায় কষ্ট হচ্ছে? আমাকে বলো? মাটিতে কেন বসে রয়েছ? চলো, বিছানায় বসবে চলো। লক্ষ্মী সোনা ছেলে, চলো।”

কিন্তু তাতাই উঠছেই না, ওই রকম কোণে সিঁটিয়ে বসে আছে। শেষে মা কোলে তুলে তাতাইকে বিছানায় শোয়ালেন। তাতাই মুখ দিয়ে একটা শব্দও করল না, শুধু ওর রোগা শরীরটা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছিল। মা'র ডাকাডাকিতে সরোজজেঠু আর কেতকীজেঠিমা এলেন, কিন্তু মা'র মতোই ওঁরাও কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। সরোজজেঠু ডাক্তার ডেকে আনলেন। তিনি তাতাইকে দেখেটেখে, মাকে জিজ্ঞেস করলেন “হঠাৎ করে এ রকম কেন হল? বাগানে খেলছিল বলছেন? তাতে তো এ রকম হওয়ার কথা নয়। পড়েটড়েও তো যায়নি। আমি ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছি, ও ঘুমোক। দেখুন ঘুম থেকে উঠে কিছু বলে কি না। ও না বললে তো কিছু বোঝা যাবে না। তার পরে না হয় অন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবা যাবে।”

তাতাই ইঞ্জেকশনে খুব ভয় পায়। টুকাই ভাবল এবার তাতাই কান্নাকাটি শুরু করবে, কিন্তু ও আশ্চর্য হয়ে দেখল তাতাই একটুও কাঁদল না। শুধু ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় জল গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ দিয়ে। তাতাই কি বোবা হয়ে গেছে? সিলিমিলির মতো? কিন্তু সিলিমিলি তো জন্ম থেকেই বোবা, তাতাই তো তা নয়। বটুদাদু বলেছেন সিলিমিলি কথা বলতে না পারলে কী হবে, ওর চোখের দিকে তাকালে অনেক কিছু বোঝা যায়, ওর চোখের ভাষা আছে আর সে ভাষা মংলু আর বিট্টান পড়তে পারে। সিলিমিলি কী বলছে তা বুঝতে ওদের কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু টুকাই কী করে বুঝবে তাতাইয়ের কথা?

দেখতে-দেখতে তাতাই ঘুমিয়ে পড়ল।

“মা ঘুম থেকে উঠে তাতাই আবার কথা বলবে তো?” টুকাই মাকে জিজ্ঞেস করল, এত ক্ষণে ও-ও এই একটা কথা বলল।

মা থমথমে মুখে চুপ করে বসে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। কেতকীজেঠিমা টুকাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, “বলবে, নিশ্চয়ই বলবে। হয়তো কিছু হয়েছে, তাই বলছে না, অত শরীর খারাপ গেল তো। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে। তুই আর এসব ভাবিস না তো!”

তাতাই আস্তে-আস্তে অনেকটা স্বাভাবিক হল। প্রথমে একটা-দুটো কথা বলত। তবে কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে সিঁটিয়ে যেত। দৌড়ে ঘরের কোণে চলে যেত, দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকত, মনে হত যেন দেওয়ালের সঙ্গেই মিশে যেতে চাইছে। না হলে বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ত।

“এখন আর ও কথা জিজ্ঞেস করবেন না, আর সব কিছু যখন ঠিকঠাক আছে। চোখে-চোখে রাখবেন,” ডাক্তারবাবু বললেন।

“আমরা আর এখানে থাকব না, বুঝলি?” মা এক দিন বললেন টুকাইকে, “মামার বাড়িতে চলে যাব। তোরা গ্রামের স্কুলেই লেখাপড়া করবি। মামা তো অনেক দিন থেকেই যেতে বলছে, আমিই যাইনি। কিন্তু এখন যেতেই হবে। তাতে মনে হয় তাতাইয়েরও ভাল হবে।”

“আর এখানে থাকব না? মামার বাড়িতে চলে যাব?” টুকাই শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করল।

মামার বাড়িটা বেশ বড়, বাগানওয়ালা। অত বড় বাড়িতে থাকার মধ্যে শুধু মামা আর পিসিদিদুন। গ্রামটাও খুব সুন্দর। কিন্তু টুকাইয়ের ভাল না লাগার কারণ মামাই। উনি বড় রাগী, বড় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। হাসি বলে যে দুনিয়ায় কোনও বস্তু আছেন, তা-ই উনি জানেন বলে মনে হয় না। এক বার গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে গিয়ে টুকাই ওর মামাতো দাদা টুটুনের একটা খেলনাগাড়ি নিয়ে খেলছিল আর খেলতে-খেলতেই সেটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়েছিল। সেটা জানতে পেরে মামা সজোরে একটা চড় কষিয়েছিলেন ওকে। ব্যাপারটা বাবার মোটেই ভাল লাগেনি, মামাকে দু'-চার কথা বলতে ছাড়েননি উনি।

“বৌদি আর টুটুন মিরিকে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর থেকেই তো দাদা কী রকম যেন হয়ে গেছে! মা-ও তো তার পরে আর বেশি দিন রইলেন না। দাদাও একেবারে পাল্টে গেল,” মা বলেছিলেন।

সেই থেকে টুকাইয়ের মামাকে বড় ভয়। উনি ওর দিকে তাকালেই ওর যেন গায়ের রক্ত জল হয়ে আসে। সেই মামার সঙ্গে থাকতে হবে! মামার বাড়িতে চলে যেতে হবে শুনেই টুকাই বটুদাদুর কাছে দৌড়েছিল, সব বলেছিল।

“মা যা করছেন অনেক ভেবেচিন্তেই করছেন, তোমাদের ভালর জন্যেই করছেন। তুমি তো অবাধ্য ছেলে নও, তা হলে কেন 'যাব না, যাব না' করছ?” সব শুনে বটুদাদু জিজ্ঞেস করলেন।

“মামাকে আমার একটুও ভাল লাগে না, বড্ড ভয় করে,” মুখ গোঁজ করে উত্তর দিল টুকাই।

“উনি কেন ও রকম হয়ে গেছেন তা তো তুমি জানোই। দুঃখে, শোকে। তোমার মানি আর টুটুনদাদা আর নেই বলে।”

“কিন্তু তুমি যে বলো নেই বলে কিচ্ছু হয় না। সব্বাই আছে, সব্বাই। বাবাও আছে, তা হলে?” তাড়াতাড়ি পাল্টা প্রশ্ন করেছিল টুকাই।

“সেটাই তো উনি বুঝতে পারেননি আর পারেননি বলেই তো ওই রকম হয়ে গেছেন।”

শুনে টুকাই হাঁ! ক্লাস ফাইভের ছেলে হয়ে ও যা বুঝতে পারল, মামা সেটা পারলেন না? যিনি কিনা একখানা হাই স্কুলের হেডমাস্টার মশাই? উঁচু ক্লাসের শক্ত-শক্ত অঙ্ক নিমেষে কষে ফেলতে পারেন? তিনি পারলেন না? বটুদাদুর কথা এই প্রথম ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না ও।

“তা কী করে হয়? উনি তো কত বড়! মা'র চেয়েও বড়, বাবার থেকেও বড়। তাও কেন বুঝতে পারলেন না?”

বটুদাদু হাসলেন, বললেন, “বড় হলেই কি সবাই সব কিছু বুঝতে পারে? বরং ছোটরা অনেক কিছু চট করে বুঝে যায়, বড়রা যা বুঝতেই চায় না। তবে বুঝবেন নিশ্চয়ই, না বুঝলে কি আর চলবে! তুমি কিন্তু আর 'যাব না যাব না' করবে না। ভয়ও পাবে না। সাধুবাবা বিট্টানকে কী বলেছিলেন মনে নেই?”

“আছে। সাধুবাবা বলেছিলেন ভয় পেতে নেই। ভয় পেলেই সব

গোলমাল হয়ে যায়, তখন বুদ্ধিও পালায়। তাই ভয় পেতে নেই।"

সেই টুকাইরা চলে এল গ্রামে মামার বাড়িতে।

"এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ওখানে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে থাকলে আমার চিন্তা রয়েই যেত। স্কুলে ভর্তি, লেখাপড়া— ও সব তোকে ভাবতে হবে না, আমি সব দেখব। তুইও এখানে নিজের সংসার মনে করেই থাক। আছে কে এখানে? আমি আর ছোট পিসি," বললেন মামা।

টুকাই দেখল কথা বলতে-বলতে মামার গম্ভীর মুখটা যেন আর অত গম্ভীর নেই, চোখের কোণ দুটোও কি চিকচিক করে উঠল? উনি টুকাই আর তাতাইকে এক ঝলক দেখে চলে গেলেন। আর পিসিদিদুন? তাঁর তো টুকাই আর তাতাইকে আদর করাই আর শেষ হচ্ছে না!

"এত দিনে বাড়িটায় আবার প্রাণ ফিরল। আমার দাদুভাইরা এসেছে যে! ও মিঠু, তুই এবার এ সংসার সামলা মা, আমাকে রেহাই দে। আমার দাদুভাইরা এসেছে, দেখবি এবার তোর দাদাও আর অষ্টপ্রহর ও রকম হাঁড়িমুখো আর খিটখিটে হয়ে থাকবে না। শোকে-শোকেই ছেলেটা একেবারে শেষ হয়ে গেল!" পিসিদিদুন আঁচলে চোখ মুছলেন।

তাতাই এর মধ্যেই পিসিদিদুনের খুব ন্যাওটা হয়ে উঠেছে। এখনও ওর সেই ভয়পাওয়া ভাবটা পুরো যায়নি বটে, তবে আগের চেয়ে অনেক ভাল। পিসিদিদুনও নানা গল্প বলে ওদের দু'জনকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, সে সব গল্প বটুদাদুর বলা গল্পের মতো না হলেও শুনতে খারাপও লাগে না। মা যেন মনে হয় কিছুটা নিশ্চিন্ত।

টুকাইরা নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তবে এখনও স্কুল শুরু হয়নি। তাতাই একটা বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু টুকাই মামার স্কুলে। এটাই ওর বড় ভয়ের কারণ, সে বটুদাদু যতই ভয় পেতে বারণ করুন না কেন। ওদিকে মা খালি বলে যাচ্ছেন, "এই স্কুলের কত নাম জানো? এখান থেকে অনেক ভাল-ভাল ছাত্র বেরিয়েছে। তোমাকেও মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে, বড় হতে হবে। আর কখনও এমন কিছু করবে না যাতে মামার কাছে তোমার নামে কেউ নালিশ করে, বুঝেছ?"

কই, টুকাইয়ের নামে তো আগের স্কুলেও কেউ কখনও নালিশ করেনি, তা হলে এখানে করবে কেন? আর এই কথাটা মা এত বার ওকে বলছেন কেন? আগে তো কখনও বলেননি! বটুদাদু নেই এখানে, এসব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? ফোনে মাঝে-মাঝে কথা হয় বটে, কিন্তু সে আর কত ক্ষণ? তা ছাড়া মা'র সামনে ফোনে সব কথা বলাও যায় না। বৃষ্টি দেখতে-দেখতে টুকাইয়ের আবার বটুদাদুর জন্যে মন কেমন করে উঠল। সত্যি, বটুদাদু না থাকলে ওর কোনও সমস্যারই সমাধান হয় না।

॥ ২ ॥

"বলি, বাড়িতে আছেন নাকি? কাল এসেছেন শুনলাম, তা গ্রামের পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় তো করতে হয়। তাই আমরাই চলে এলাম," সদর দরজার কাছ থেকে হাঁক পাড়লেন উমারঞ্জন চক্রবর্তী, সঙ্গে আরও কয়েক জন ভদ্রলোক, এঁরা সবাই এই গ্রামেরই বাসিন্দা।

"আসুন-আসুন, ভেতরে আসুন, এসে খুব ভাল করেছেন," সদর দরজা খোলাই ছিল, ভিতর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন মৃণাল মজুমদার, "বাড়িঘর ঠিক করতে-করতেই তো সময় চলে যাচ্ছে, সবে তো কাল এলাম। এখানে থাকব আর আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করব না তা কখনও হয়? আমি নিজেই যেতাম, দু'-একদিনের মধ্যেই।"

"থাকবেন? মানে পাকাপাকি ভাবে এখানেই থাকবেন?" উমারঞ্জনের সঙ্গী শঙ্কর বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন, বেশ অবাক হয়েই।

"হ্যাঁ আমার তো সে রকমই ইচ্ছে। কিন্তু আপনি যেন বেশ আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হল, কেন বলুন তো? কিছু হয়েছে কি?"

"না না, হবে আর কী? এ বাড়িতে তো আর কেউ থাকে না। ওপাশে তো শুধু বুড়ো ছিদাম থাকে। কাঠকুটো জ্বেলে কী রান্না করে আর পড়ে-পড়ে ঘুমোয়। দু'-তিন মাস অন্তর-অন্তর ও তরফ থেকে কেউ এসে ছিদামকে টাকাপয়সা দিয়ে যায়। আগে তবু পুজোটা হত, তা অন্নপূর্ণার ঘট নড়ার পর থেকে সে-ও তো বন্ধ। আর এ দিকের অংশে তো কোনও কালে কাউকে থাকতে দেখিনি, ভাগাভাগি হওয়ার পর থেকেই তো তালাবন্ধ। আপনাকেও ঠিক... মানে, মনে পড়ছে না। শেষ কবে এ দিকে এসেছিলেন বলুন তো?"

মৃণাল হেসে ফেললেন, এঁদের কৌতূহলে বিরক্ত হলেন না, বললেন, "শেষ কবে? তা সে আমাকেও অনেক হিসেবটিসেব করে বলতে হবে। আসলে বাড়ি ভাগাভাগির পর থেকে এই আমাদের অংশটা তালাবন্ধই থাকত। আমার দাদার বয়স হয়ে গেছে, তাঁর পক্ষে এসব দেখাশোনা করা সম্ভব নয়, দিদি মারা গেছেন, বোন, ভগ্নীপতিরা এদিক মাড়াবেই না। আমি দেখলাম রিটায়ার করেছি, এখন হাতে অখণ্ড অবসর, এই সুযোগে বাড়িটা ঠিকঠাক করে নিয়ে যদি থাকা যায়। বড়-বড় শহরে তো অনেক থাকা হল, এবার গ্রামে থাকলেই বা মন্দ কী? তা ছাড়া বাড়িটা এবার দেখাশোনা না করলেই নয়, কত কাল বন্ধ পড়ে আছে। মাঝে এক বার খানিক মেরামত করা হয়েছিল। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও কর্তা-গিন্নি মিলে চলে এলাম, বুঝলেন?"

"তা বেশ করেছেন। তা পাকাপাকি আসার আগে ওই লোকটিকে তো রেখে গেছিলেন, তখন তো আর আমাদের কারও সঙ্গে কোনও কথাবার্তা হয়নি। তা আপনি তার মানে শশধর মজুমদারের..."

"নাতি। তাঁর ছোট ছেলের ছোট ছেলে," উমারঞ্জনের কথার মাঝেই বলে উঠলেন মৃণাল, "এ বার বোঝা গেল তো? তাঁর দু'ছেলের মধ্যে এ বাড়ি ভাগ হয়েছে, ও পাশটাকে তো আপনারা বড় তরফের অংশ বলেন আর এ পাশটা ছোট তরফের, তাই তো? আমি হলাম এই ছোট তরফের।"

"আসলে আপনাকে তেমন দেখিনি তো, বড় তরফের যেমন সবাইকে চিনি-শুনি, তাই... যাক গে, বাদ দিন ও সব কথা। এই এসে পড়লেন, আলাপ-পরিচয়ও সব হয়ে গেল। এখানে থাকবেন শুনে খুব ভাল লাগল। কোনও কিছু দরকার হলে বলবেন, হতেই পারে, এত কাল বাদে এলেন, এ দিকের তো কিছুই জানেন না," উমারঞ্জন বললেন।

"সে তো নিশ্চয়ই। এখানে তো আপনারাই ভরসা," বললেন মৃণাল।

আরও দু'-চারটে কথাবার্তা বলে উমারঞ্জনরা চলে গেলেন, মৃণালও ভিতরে ঢুকে গেলেন। অনেক কাজ বাকি। এত দিনের অব্যবহৃত বাড়িকে আবার নিজেদের পছন্দমতো করে তোলা কি চাট্টিখানি কথা! তাও হারুকে কয়েক দিন আগে রেখে গেছিলেন বলে সে অনেকটাই গুছিয়ে ফেলেছে, অন্তত ঝুল, ধুলো ঝেড়ে বাড়িটাকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। তবে বাকি কাজ তো ওদের দাঁড়িয়ে থেকে করাতে হবে। ভালই হল এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে, দরকারে সাহায্য পাবেন।

"জমিটমিও সব পরিষ্কার হয়ে এল বলতে গেলে। ও দিককার কিছু জমিতে নাকি চাষ-টাষ হতে পারে। করাবেন নাকি কিছু? দু'জন জিজ্ঞেস করতে এসেছিল, এ গ্রামেরই লোক। আমি বলেছি আপনারা এলে কথা বলতে। পুকুর পরিষ্কার করতেও লোক লাগিয়েছি! বাবা, অত বড় পুকুর, পানায় একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে! পরিষ্কার করার পর মাছ ছাড়লে হয় না?" এক নিঃশ্বাসে হারু কথাগুলো বলে গেল।

"মাছ তো ছিলই। শুনেছি নাকি বড়-বড় মাছ উঠত আগে ওই পুকুর থেকে। ওই পুকুর নিয়ে কম গোলমাল! শুধু কী মাছ..." মৃণাল বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

হারু পুরনো লোক, উনি থামলেও সে থামতে দেবে কেন? তায় গোলমালের গন্ধ পেয়েছে, বলল, "গোলমালের কথা কী বলছিলেন?"

"ওই সম্পত্তি ভাগাভাগির সময়ে গোলমাল হয়েছিল। এ পুকুর দাদু বাবাকে দিয়েছিলেন, জ্যাঠামশাইকে ওই পশ্চিমের পুকুরটা। সেটা ওঁর মনঃপূত হয়নি, এই আর কী।"

"সে বললে তো, বড় তরফের অংশও বড়। আমি দেখেছি সব ঘুরে," বলল হারু।

"তুই দেখেছিস! কী করে?" মৃণাল অবাক।

"ওই ছিদামখুড়োর সঙ্গে গপ্পে-গপ্পে এক দিন বললাম, 'এদিককার

অংশটা তো অনেক বড় মনে হচ্ছে, তুমি একা সামলাও কী করে?’ তা শুনে সে বলল, ‘আমি বড় তরফের খাস কাজের লোক, জানিস না? আমি সামলাব না তো কে সামলাবে? ছোট তরফের অংশে আছেটা কী? সব কিছুই তো এ দিকে। ঠাকুরদালান পর্যন্ত। দেখেছিস কখনও এত বড় বাড়ি?’ এই বলে সে সব দেখাল। তা আপনাদের অংশ ছোট হল কেন?”

“আমরা পানিহাটির বাড়িটা পেয়েছিলাম বলে। দাদু তো সব ছেড়েছুড়ে গিরিডির আশ্রমে চলে গেছিলেন। চল দেখি, ও দিকের কাজ কত দূর এগোল?”

“তবে একখানা কথা এই বেলা বলে রাখি,” হারু বকবক করতে করতে এগোল, “এ বাড়িতে কিন্তু উপদ্রব আছে।”

“উপদ্রব আছে? কিসের উপদ্রব আবার?” মৃণাল যেতে-যেতেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

“কিসের, তা আমিও জানি না। তবে সন্ধে হলে একটা লোক নাকি এ দিক পানে ঘুরঘুর করে। আবার দুম করে হাওয়াও হয়ে যায়। ভূত না চোর বলতে পারব না। ছিদামখুড়ো বলে অপদেবতা। যবে থেকে মা অন্নপূর্ণার পুজো বন্ধ হয়েছে তবে থেকেই নাকি এ সব উপদ্রব। ছিদামখুড়ো অবশ্য সন্ধে হলেই বসে-বসে ঢোলে! কী দেখতে কী দেখেছে— আমি তো তা-ই ভেবেছিলাম, কিন্তু পরশু দিনের আগের দিন রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখি গামছা দিয়ে মুখবাঁধা একটা লোক ওই হাসনুহানার ঝোপের পাশ থেকে মুখ বাড়াচ্ছে। আমি চেঁচাতেই সুট করে সরে গেল। আমি অবশ্য আর বাইরে বেরোইনি দেখার জন্যে।”

“ভাল করেছিস। চোরটোর হবে আর কী। বুঝেছে লোক আসবে, তাই দেখছে যদি কিছু পাওয়া যায়। আগে তো আর এ বাড়িতে তেমন জিনিসপত্র কিছু ছিল না।”

চার দিকে শুধু কাজ আর কাজ। সে সবের দেখভাল করতে-করতেই মৃণাল ‘উপদ্রব’-এর কথাটা ভুলেই গেলেন।

ঘুম যখন ভাঙল, ঘড়িতে দেখলেন রাত প্রায় একটা। বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে, সন্ধে থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল বলেই বলেই বোধ হয়। নমিতা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, মৃণাল উঠলেন দক্ষিণ দিকের জানলাটা বন্ধ করতে। জানলার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মেঘ কেটে গেছে, চমৎকার জ্যোৎস্না, সে আলোয় সদ্য পরিষ্কার করা বাগানটাকে বড়ই সুন্দর লাগছে। মৃণাল জানলা বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তা-ই দেখতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলেন বড় গুলঞ্চ গাছটার পাশে ছায়া, মানুষের ছায়া। চমকে উঠে চেঁচানোর আগেই সে ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেল, নিমেষের মধ্যেই! মৃণালের কপালে ভাঁজ পড়ল। চোর কি রোজ একই বাড়িতে হানা দেবে চুরি করতে?

॥ ৩ ॥

“হাজার ঝুরির বট দেখেছিস?” হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে পিসিদিদুন জিজ্ঞেস করলেন, “ও বটের ঝুরি ছুঁয়ে মনের কথা বলে এলে তা পূর্ণ হয়। কত লোক কত কিছু বলে, কত দুঃখের কথা বটকে জানিয়ে আসে, দুঃখ দূর করতে বলে। হাজার ঝুরির বটকে আমরা ভগবানের মতো মান্যি করি, বুঝলি?”

“মংলুরাও তা-ই মানে। বনের সবচেয়ে বড় আর মোটা গাছটাকে ওরা ভগবান বলে মানে,” টুকাই সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, “ওই থেকেই নাকি সব গাছ জন্মেছে, বন হয়েছে। ও গাছের একটা পাতাও কেউ ছেঁড়ে না। মংলুদের কাঠের দরকার হলে মংলুর বাবা বিষ্ণু সেই দূরের ঘন বন থেকে কাঠ কেটে আনে, তবে দরকারের চেয়ে বেশি কখনওই কাটে না। সেখানে অনেক বেশি গাছ হয়ে গেছে, সাধুবাবা বলেছেন ওখান থেকে দু’-চারটে গাছ কাটলে ক্ষতি নেই।”

“মংলু কে দাদুভাই? কোথায় থাকে?” পিসিদিদুন জানতে চাইলেন।

টুকাই ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছে, এখন লজ্জা পেল। কী করে বলে যে মংলু থাকে মনের ভিতর? যারা ওর গল্প শুনেছে শুধু তারাই ওকে দেখতে পায়?

ভাগ্যিস মা এলেন সেই সময়। পিসিদিদুনের কথা শুনে বললেন, “ওর কথা বাদ দাও। আমাদের ওখানে এক বয়স্ক ভদ্রলোক আছেন, তাঁর কাছে রাজ্যের গল্প শুনেছে, শুনে-শুনে গল্পকেই সত্যি ভাবে আর গল্পের ছেলেমেয়েদের নিজের বন্ধু।”

“তা বেশ তো। গল্প শোনা তো খুব ভাল কথা। হ্যাঁ রে মিঠু, ওখানে গল্প বলার মানুষ এখনও আছেন?”

“তা আছেন। আসলে ওই মানুষটাই একদম অন্য রকম, সে তোমাকে এক দিন বলব’খন,” মা বললেন।

“দাদুভাই, বললে না তো, হাজার ঝুরির বট দেখেছ কিনা? সে দিন তো মামার সঙ্গে বেরিয়েছিলে, দেখেছ কি?”

“দূর থেকে দেখেছি,” টুকাই শুধু এইটুকুই বলল। কী করে বলে, ওর তো গাছটা দেখেই এক ছুটে ও দিকে যেতে ইচ্ছে করছিল। কী বড় গাছ! আর এই এত-এত ঝুরি নেমে এসেছে! কিন্তু মামাকে সে কথা বলার সাহস তো আর ওর ছিল না। তার উপর মামার শক্ত মুঠিতে ওর হাত ধরা ছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও মামা মুঠি আলগা করেননি, যেন আলগা করলেই টুকাই হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবে! মা যে কেন মামাকে বলে দেননি যে টুকাই ও রকম ছেলে নয়, তা জানে না। মামার শক্ত মুঠির ভিতরে টুকাইয়ের সরু কব্জিটা কুলকুল করে ঘেমে উঠছিল, তাও ও টুঁ শব্দটা করেনি। মামা ওকে নিয়ে গ্রামের পথে-পথে খানিক ঘুরলেন, কয়েক জনের বাড়ি চেনালেন, তার পর আবার এক জনের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরও অনেকে ছিলেন।

মামা টুকাইকে দেখিয়ে বললেন, “এইটি আমার বড় ভাগ্নে। এই এসেছে সবে। আমার স্কুলেই ভর্তি হয়েছে,” বলে টুকাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এঁদের প্রণাম করো।”

বাধ্য ছেলের মতো টুকাই মামার কথা শুনল। ওর কব্জিটা তখন টনটন করছে। যত ক্ষণ মামা ওখানে ছিলেন তত ক্ষণই উনি ওর হাত ধরেননি, কিন্তু সে আর কত ক্ষণ? দশ-পনেরো মিনিট। বেরিয়েই আবার শক্ত করে টুকাইয়ের হাত ধরলেন উনি। ওই টুকু সময়ের কথোপকথন থেকে টুকাই এটা বুঝল যে মামাকে এখানে সবাই খুব মানে, সম্মান করে। হাই স্কুলের হেডমাস্টার মশাই বলেই মনে হয়।

“ও মা, দূর থেকে দেখেছ কেন দাদুভাই? কাছে যাওনি?” পিসিদিদুন বললেন।

টুকাই মাথা নাড়ল।

“বিকেলে অন্তু তো বেরোবে, ওর সঙ্গে যেয়ো, আমি বলে দেব তোমাকে হাজার ঝুরির বট দেখিয়ে আনতে,” বললেন পিসিদিদুন।

মা পাশে বসেছিলেন, টুকাই মাথা নেড়ে না বলে মা’র কোলে মুখ গুঁজল, বলল, “আমি মামার সঙ্গে যাব না, ও মা, তুমি বারণ করো না!”

মা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, “কেন টুকাই? কী হয়েছে? মামার সঙ্গে যাবে না বলছ কেন? ও রকম বলতে নেই বাবা।”

“মামা এত জোরে চেপে আমার হাত ধরেছিল যে আমার এইখানটা ব্যথা করছিল,” টুকাই নিজের কব্জিটা দেখাল, “আমি কিছুতেই মামার সঙ্গে যাব না, কোথাও না।”

মা কিছু বললেন না, শুধু টুকাইকে নিজের বুকে চেপে ধরলেন, ওঁর চোখ চিকচিক করে উঠল।

পিসিদিদুন বিড়বিড় করে বললেন, “ছেলেটা যেন কেমন হয়ে গেছে! এখন এ কথা বলতে গেলেই কুরুক্ষেত্র হবে! সে নাকি আমাদের চেয়ে ছেলেপিলেদের ঢের ভাল বোঝে! ভাবলাম তোরা এসেছিস এবার বোধ হয় ও পাল্টাবে! কিন্তু কোথায় কী! তুমি ভেবো না দাদুভাই, আমি বলব। আহা, বেচারা ব্যথা পেয়েছে!”

“না,” মা বললেন। টুকাই আশ্চর্য হল, মা কেন না বললেন।

“তুমি যে আমার বাধ্য ছেলে, আমার লক্ষ্মী ছেলে, অত জোরে সর্ব ক্ষণ তোমার হাত ধরে রাখার কোনও দরকার নেই, তা তোমাকেই মামাকে বোঝাতে হবে টুকাই।”

“আমাকে?” টুকাই আরও আশ্চর্য হল, মা যে কী বলছেন ও কিছুই

বুঝতে পারল না।

"হ্যাঁ তোমাকে। তোমার কাজেকর্মে, তোমার আচার-ব্যবহারে। তবেই মামা বুঝবেন।"

"তুই ভাল কথা বললি মিঠু! অতটুকু বাচ্চা বোঝাবে অন্তুকে! বললাম তো আমিই বরং অন্তুকে..."

মা পিসিদিদুনকে কথা শেষ করতেই দিলেন না, বললেন, "ওদের এখন থেকে এখানে থাকতে হবে ছোটপিসি, এখানকার সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। এসব ছোটখাটো ব্যাপার ওকে মেটাতে দাও। তুমি-আমি কত পিছনে পড়ে থাকব?"

"থাক দাদুভাই, অন্তুর সঙ্গে যাওয়ার তোমার দরকার নেই। বিকেলে ঝগড়ু আসবে, আমি বরং ওকেই বলব, ও তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। খেলার মাঠেও যেয়ো। খেলাধুলো না করলে চলে নাকি?" পিসিদিদুন ব্যাপারটা সেখানেই মিটিয়ে দিলেন, বললেন, "তুমি তো গল্প শুনতে ভালবাস, দেখবে এখানে অনেক দাদুদের পাবে যাঁরা তোমাকে কত গল্প বলবেন।"

"তাই? বটুদাদুর মতো?" টুকাই এত ক্ষণে একটু খুশি।

"হ্যাঁ গো দাদুভাই। তুমি আর মন খারাপ কোরো না, এই রকম হাসিখুশি থাকো, ভাইকেও রাখো। ও বেচারা যে দেখি থেকে-থেকেই কী রকম ভয়ে কুঁকড়ে যায়!"

"কই গো ঠাগ্‌মা! কী কামকাজ আছে বলো, ঝগড়ুকে কেন বুলালে?" বিকেল হতে না-হতেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের একটা ঢ্যাঙা ছেলে এসে হাঁক পাড়ল। চুলগুলোয় কস্মিন কালেও চিরুনি পড়েছে বলে মনে হয় না, পরনে লাল-নীল চকরাবকরা একটা শার্ট আর একখানা রং জ্বলে যাওয়া কালো রঙের বারমুডা।

"ও ঝগড়ু, এ কী খোলতাই চেহারা করেছিস তুই! এই ক'দিন দেশের বাড়িতে গিয়ে শেষে এমন চেহারা করলি? চুলগুলোর ও কী ছিরি! আর এ কী জামা পরেছিস রে!" পিসিদিদুন গালে হাত দিয়ে বললেন।

ঝগড়ু এক গাল হেসে বলল, "কেন, এ তো আচ্ছা জামা আছে। আমার ফুফা দিল। দেশে যাওয়ার আগে যখন কলকাতা গেলাম তখন।"

"তোমার ফুফা দিল? তা বেশ! শোন, আমার ভাইঝি আর নাতিরা এসেছে, ওরা এখানেই থাকবে। আমার বড় নাতি তোদের হেডমাস্টার মশাইয়ের ইশকুলেই ভর্তি হয়েছে। ওদেরকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয় তো। হাজার ঝুরির বট দেখাবি আর খেলার মাঠে নিয়ে যাবি, বুঝলি?"

ঝগড়ুর বাবা সেই কবে এই গ্রামে এসেছিল আর যায়নি, এখানেই থেকে গেছে, ঝগড়ুর জন্মও এখানে, কিন্তু ও কথা বলে এরকম বাংলা-হিন্দি মেশানো এক জগাখিচুড়ি ভাষায়।

ঝগড়ুও খুব খুশি পিসিদিদুনের কথা শুনে, "আভি সে এখানেই থাকবে? বহুত আচ্ছা! তোমার ভি ভাল লাগবে ঠাগমা। তুমি বলো না এ বাড়ি বহুত শুনশান আছে। আর থাকবে না। খোকাবাবুরা এসে গেছে।"

"খোকাবাবু আবার কী?" টুকাই হেসে গড়িয়ে পড়ল, "না, না আমাকে খোকাবাবুটাবু বলবে না বলে দিচ্ছি।"

"বলব না? তা হলে কী বলব?" ঝগড়ুরও মুখে এক গাল হাসি।

"টুকাই বলবে, আমার ডাকনাম টুকাই আর ভাইয়ের ডাকনাম তাতাই।"

"বহুত বড়িয়া নাম আছে," ঝগড়ু বলল, "টুকাইবাবু আর তাতাইবাবু।"

"টুকাইবাবু! আবার বাবু!" টুকাইয়ের হাসি আর থামতেই চাইছে না। বটুদাদু কখনও-কখনও মজা করে ওকে টুকাইবাবু বলতেন।

"তুমি বহুত আচ্ছা লেড়কা আছ টুকাইবাবু। আমি তোমাকে আর তাতাইবাবুকে নিয়ে ঘুমাতে যাব।"

"যাও তো দাদুভাই, ভাইকে ডেকে নিয়ে এসো। ঘুরে এসো দু'জনে," পিসিদিদুন বললেন।

বেড়াতে যাবে শুনে তাতাই খুব খুশি হয়েই মা'র সঙ্গে আসছিল, কিন্তু ঝগড়ুকে দেখে যে ওর কী হল, এক নিমেষে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল।

"কী হল তাতাই? কী হল বাবা? ও রকম করছ কেন?" মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "এ তো একটা দাদা, ঝগড়ুদাদা, তোমাকে আর দাদাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। তুমি বেড়াতে যাবে না?"

তাতাই শক্ত করে মাকে ধরে রইল। ওর ছোট্ট শরীরটা ভয়ে কেঁপে -কেঁপে উঠছে।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে বেড়াতে যেতে হবে না, তুমি আমার সঙ্গে ঘরে চলো। টুকাই তুই যা, ঘুরে আয়," মা তাতাইকে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

"এ ক্যায়া হুয়া?" ঝগড়ু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ক্যায়া হুয়া সে কী ছাই আমিও জানি!" পিসিদিদুন বললেন, "কেন যে এ রকম করে ছেলেটা! দাদুভাই তুমি যাও, আর দেরি কোরো না।"

টুকাইয়ের ভাইকে ফেলে যেতেও ইচ্ছে করছিল না যেমন, তেমন আবার হাজার ঝুরির বট দেখা আর খেলার মাঠে যাওয়ার ইচ্ছেও কিছু কম নয়। তাই ও ঝগড়ুর সঙ্গেই গেল।

"এ তো আচ্ছা বাত নয় টুকাইবাবু। তাতাইবাবুর কী হল? আমাকে দেখে ডর লাগল? পর কিঁউ?" যেতে-যেতে ঝগড়ু বলল।

"না, না, তোমাকে দেখে ভয় পায়নি। ওর এ রকমই হয়। আমাদের বাড়িতে থাকতে-থাকতেই..." বলে টুকাই সব বলে ফেলল। তাতাইয়ের প্রথম ভয় পাওয়া থেকে ওদের এই গ্রামে চলে আসা পর্যন্ত সব কিছুই।

"তাতাইবাবুর সঙ্গে জ়রুর কুছ বুরা হুয়া। তবে তুমি চিন্তা কোরো না, আচ্ছা ভি হবে। বুরা কিছু হলে আচ্ছা ভি হয়, হতেই হয়, এই নিয়ম আছে," গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ঝগড়ু বলল, তার পর বলল, "ওহ দেখো হাজার ঝুরির বট! বহুত বড়িয়া গাছ। এইসে ওয়সে গাছ নেহি। সাচ মানো তো গাছ হি নেহি!"

"গাছ হি নেহি মানে! তা হলে কী?" টুকাইয়ের চোখ গোল-গোল।

"সিরফ গাছ হলে কি এত লোক আসত? কত কী মাঙত? অনেকে যা মেঙেছে তাই পেয়েছে।"

"তুমি বটের কাছে কিছু চেয়েছ ঝগড়ুদাদা?"

"মাঙলাম তো। দেশে যাওয়ার আগে এক দিন ভোর-ভোর এলাম, বললাম, 'আমাদের একটা জমির খুব জ়রুরৎ। একটা ঝোপড়িতে তো থাকি। এ ভাবে আর কিতনে দিন?' এখন দেখি কুছ হোতা হ্যায় ইয়া নেহি," ঝগড়ু উদাস মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল।

"হবে-হবে," টুকাই বলল, "তুমি ভেবো না ঝগড়ুদাদা। পিসিদিদুন বলেছে হাজার ঝুরি বটের কাছে কিছু বললে তা পূর্ণ হয়, দুঃখের কথা বললে দুঃখে কেটে যায়।"

"তুমি বহুত আচ্ছা লেড়কা আছো টুকাইবাবু। কিন্তু তাতাইবাবুর কী হল? যো হুয়া আচ্ছা নেহি হুয়া, এ আমি তোমাকে বললাম টুকাইবাবু।"

"কী হয়েছে কেউ কিচ্ছু জানে না। ডাক্তারবাবুও বুঝতে পারেনি, ভাইও বলেনি। জিজ্ঞেস করতে গেলেই তো আরও ভয় পেয়ে যায়।"

ঝগড়ু শুনল, কিছু বলল না। বেশ খানিক ক্ষণ ঘুরেটুরে ওরা বাড়ি ফিরে এল। খেলার মাঠে অনেকে খেলছিল। তার মধ্যে ওর বয়সি কতগুলো ছেলেও ছিল। ঝগড়ু তাদের ডেকে মহা ঘটা করে বলেছে, "এ হচ্ছে টুকাইবাবু, হেডমাস্টার মশায়ের ভাঞ্জা। আভি এখানেই থাকবে, তোমাদের সঙ্গে খেলতে আসবে। বহুত আচ্ছা লেড়কা।"

ছেলেদের মধ্যে ঝগড়ুর খুব কদর। কারণ ও ভাল ফুটবল খেলতে পারে। বড় ছেলেরা যেমন ওকে নিয়ে টানাটানি করছে, তেমন ছোটরাও।

ঝগড়ু অবশ্য বলেছে, "আভি সে আমি টুকাইবাবুর দলে থাকব।"

টুকাই তো তখনই ঠিক করে ফেলেছে ঝগড়ুর কাছ থেকে ভাল করে ফুটবল শিখবে। বাড়ি ফিরে টুকাই দেখল মামা খুব রাগারাগি করছেন, পিসিদিদুনকে বলছেন, "কী দরকার ছিল তোমার ওই ঝগড়ুর সঙ্গে টুকাইকে পাঠানোর? আমার মোটে পছন্দ হয় না ছেলেটাকে। না আছে কোনও চালচলনের ছিরি, না কথাবার্তার কোনও ছিরি! অথচ তুমি যে কী দেখেছ ওর মধ্যে তা তুমিই জানো! ও রকম ছেলেপিলের সঙ্গে

মিশলে টুকাইয়ের বখে যেতে আর বেশি সময় লাগবে না! একে তো তাতাইটা কী রকম যেন, ও তো আর কখনও স্বাভাবিক হবে বলে মনে হয় না, হয় কোনও-কোনও বাচ্চা এ রকম, তার উপর টুকাইও যদি বখে যায় তা হলে মিঠুর কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ এক বার?"

পিসিদিদুনও রেগে উঠলেন, বললেন, "তুই একেবারে সব ভবিষ্যৎ দেখে ফেললি! কে আর কোনও দিন স্বাভাবিক হবে না, কে বখে যাবে— সব তুই জানিস! এ দিকে নিজে..."

টুকাই দেখল মা কী একটা ইশারা করলেন, পিসিদিদুন যা বলতে যাচ্ছিলেন তা আর বললেন না, গজগজ করতে লাগলেন।

"বেশ, যা ভাল বোঝো তোমরা করো। তার ফলও তোমাদেরই ভুগতে হবে। নিজের ছেলের ক্ষতি নিজেরা করতে চাইলে আমি কে আটকানোর!" মামা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

তাতাই এখনও ভয় পাওয়া মুখ করে বিছানার উপর চুপটি করে বসে আছে, মাঝে-মাঝে একটা ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। মা'রও মুখ ভার, টুকাইকে খেতে দিয়ে উনি আবার রান্নাঘরে চলে গেলেন আর পিসিদিদুন সেই থেকে বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছেন আর থেকে-থেকে আঁচলে চোখ মুছছেন। গোটা বাড়িটাই যেন কী রকম থমথম করছে। টুকাইয়ের মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসবে।

টুকাই আস্তে-আস্তে উঠে ঘরের কোণে রাখা ওদের খেলনাপাতি ভরা বড় ব্যাগটার কাছে গেল, তার ভিতর থেকে সন্তর্পণে টিনের কৌটোটা বের করেই দ্রুত পায়ে বারান্দায় চলে গেল। যাওয়ার আগে অবশ্য এক বার ঘাড় ঘুরিয়ে চট করে ঘরের মধ্যে নজর বুলিয়েছে। তাতাই ছবি দেখছে আর পিসিদিদুন জপের মালা ঘোরাচ্ছেন। টুকাই যে বারান্দায় গেছে, তা খেয়ালও করেননি।

আলো-আঁধারি মাখা বারান্দা, তার মেঝেটা টুকটুকে লাল রঙের। তার উপর সামনের গাছের, ধারের রেলিঙের ছায়া পড়েছে। টুকাই সেই লাল-কালো নকশাদার মেঝের উপর দু'পা ছড়িয়ে বসল। কোলের উপর টিনের কৌটোটা রাখল। এটার ভিতর ভর্তি করে আছে কাচের গুলি, ওরা মার্বেল বলে। কত রকমের! কোনওটার ভিতর ছোট্ট-ছোট্ট দুটো সবুজ পাতা, আবার কোনওটার ভিতরে কমলা ফুল! এগুলো টুকাইয়ের খুব পছন্দের। অবশ্য শুধু টুকাইয়ের কেন, তাতাইয়েরও। এক সময় তো তাতাই-ই এটা দখল করে নিয়েছিল। এ নিয়ে দু'ভাইয়ের মধ্যে একটুও যে ঝগড়াঝাটি হয়নি, তা-ও নয়। তাতাই মাঝে-মধ্যেই এ-দিক ও-দিক মার্বেল ফেলে রাখত, টুকাই খুঁজেপেতে সেগুলো নিয়ে আবার কৌটোয় ভরত। সেদিনও দুটো মার্বেল পেয়েছিল পড়ার টেবিলে আর কৌটোটা খুঁজতে গিয়ে টুকাই দেখেছিল সেটা বাড়ির পিছন দিকের খোলা রোয়াকে পড়ে রয়েছে। টুকাই কৌটো খুলে তার ভিতর মার্বেলদুটো ঢোকায়। তার পর একটু নাড়াচাড়া করতেই অবাক! আরে, এ দুটো কোত্থেকে এল! লাল রঙের গোল-গোল দুটো জিনিস। সাধারণ মার্বেলের চেয়ে খানিক ছোট, কিন্তু দেখতে ভারী সুন্দর।

"অগ্নিশিলা!" আনন্দে টুকাই প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল, ও অগ্নিশিলা পেয়েছে!

তক্ষুনি ও ঠিক করে নিয়েছিল যে এ কৌটো আর হাতছাড়া করা যাবে না। তাতাই তো আর অগ্নিশিলাটিলা বোঝে না, বুঝলে কি আর কৌটোটা এখানে ফেলে রাখত! বটুদাদু তো এই শিলার কথাই বলেছিলেন। টুকাই কি ভুলে গেছে নাকি? মোটেই না, সব মনে আছে টুকাইয়ের। সাধুবাবা মংলুকে দু'খানা পাথর দিয়েছিলেন। লাল-লাল গোল পাথর। অগ্নিশিলা। পাথর দুটো ঘষলে আগুন জ্বলবে। নাহ, সাধারণ চকমকি পাথরের মতো অত সহজে জ্বলবে না, বটুদাদু বলেছেন। এ তো সাধারণ আগুন নয় যে এক বার, দু'বার ঘষলেই স্ফুলিঙ্গ দেখা যাবে, এ তো পথ খুঁজে পাওয়ার আলো। এ আলো জ্বলতে অনেক সময় লাগে। সারা দিন শুধু বসে-বসে ঘষলেই হবে না, নিজের কাজও ঠিকমতো করতে হবে। তবেই আলো জ্বলবে। মংলু বড় দুষ্টু ছেলে। লেখাপড়া করতে চায় না, সিলিমিলি আর বিট্টানকে কোনও কাজে সাহায্য করে না। খালি বনে-বনে ঘুরে বেড়ায়, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আর গ্রামে গিয়ে এর ওর বাড়িতে ঢুকে উৎপাত করে! সাধুবাবা তাই ওকে অগ্নিশিলা দিয়ে বলেছেন, "এ তোর জন্যে, বিট্টান আর সিলিমিলির এর দরকার নেই। দেখি তুই কেমন আগুন জ্বালাতে পারিস।"

মংলু বার কয়েক ঘষে কিছু হল না দেখে নদীতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। দিয়ে সে কথা আবার ঘটা করে সাধুবাবাকে বলেছিল। শুনে সাধুবাবা খুব হেসেছিলেন। বললেন, "ফেলে দিয়েছিস? বটে? তা ও তো তোর জিনিস, অমন ফেলে দিলেই হল নাকি? শোন, এ হল অগ্নিশিলা। যেমন-তেমন জিনিস নয়। পেলেও 'পেয়েছি, পেয়েছি' করে যেমন দশ জনকে বলে বেড়াতে নেই আবার এমন অযত্নও করতে নেই।"

মংলু সাধুবাবাকে মুখ ভেংচে পালিয়েছিল। তার পর এক দিন বিষ্ণু মাছ ধরবে বলে নদীতে জাল ফেলল। বিষ্ণু আর তার স্ত্রীর কাছেই তো সিলিমিলি, বিট্টান আর মংলু থাকে। সেই এতটুকু থেকে। সাধুবাবা এই তিন জন অনাথ ছেলেমেয়েকে যেন কোথা থেকে পেয়ে ওদের দিয়েছেন। প্রথমে এসেছিল সিলিমিলি, তার পর বিট্টান আর শেষে মংলু। জাল ফেললেই রোজ মাছ ওঠে না, উঠলেও কোনও-কোনও দিন অল্পস্বল্প ওঠে। যা ওঠে তা দিয়েই ওদের চালাতে হয়। ওরা বড় গরিব। তার উপর আবার গ্রামের বাইরে বনের ধারে কুঁড়েয় থাকে। গ্রামের রাজাবাবু ওদের গ্রামে থাকতে দেয়নি। খাজনা দিতে পারেনি কিনা। তবে সে দিন জালে এই বড় একটা মাছ উঠল। মংলুর মা খুব খুশি হয়ে মাছ কাটতে বসল, আহা, আজ ছেলেমেয়েগুলো ভাল করে ভাত খাবে। সেই মাছের পেটের ভিতর থেকে বেরোল অগ্নিশিলা। মংলু মাছ কাটা দেখছিল, অগ্নিশিলা দেখে তো থ। এ কী পাথর রে বাবা! ফেলে দিলেও আবার ফিরে আসে। সেই থেকে যত্ন করে নিজের কাছে রেখেছে। একেবারে যে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে গেছে তা মোটেও নয়, তবে দস্যিপনা যেন একটু কমেছে। বিট্টানের সঙ্গে-সঙ্গে থাকছে। বিট্টানের আবার একটা পায়ে জোর নেই তো, গাছের ডাল নিয়ে হাঁটে।

"অগ্নিশিলা কোথায় পাওয়া যায়?" গল্প শুনতে-শুনতে জিজ্ঞেস করেছিল টুকাই।

"কোথায় পাওয়া যায়? যারা পায় তারা হঠাৎই এক দিন পেয়ে যায়, না হলে কেউ দেয়, যেমন সাধুবাবা মংলুকে দিয়েছিলেন। তবে এ সবও অনেক কাল আগের কথা," বটুদাদু বলেছিলেন।

"তা হলে কী হবে?" টুকাই ভাবনায় পড়েছিল।

"কেন? তোর চাই?" বটুদাদু হেসেছিলেন, "এখনও পাওয়া যায় অগ্নিশিলা, একেবারে যে পাওয়া যায় না তা নয়। তবে তার জন্যে এ-দিক ও-দিক খুঁজে না বেড়ালেও চলে। সেসব তোকে আর-এক দিন বলব না হয়।"

মার্বেলের কৌটোয় অগ্নিশিলা পাওয়ার পর টুকাই সে কথা বটুদাদুকে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন পর পর ক'দিনই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। এক দিন যদি বা হল, টুকাই কিছু বলার আগেই দু'জন ভদ্রলোক এলেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। ব্যস, আর কিছু বলা হয়ে ওঠেনি। তবে টুকাই লক্ষ করেছে ওই ক'দিন তাতাই এক বারও মার্বেলের কৌটোটা চায়নি, টুকাই যে ওটা ওর চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে সেটা ও খেয়ালই করেনি। এ সব অগ্নিশিলার ম্যাজিক। অগ্নিশিলা ওর, সেটা যাতে অন্য কেউ দেখতে না পায় তার জন্যই তাতাই মার্বেলের কৌটোর কথা একেবারে ভুলে গেছে, টুকাইয়ের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল। আর অগ্নিশিলা কি যে সে জায়গায় রাখা যায়? ওটাই সবচেয়ে ভাল জায়গা। কৌটোর একেবারে তলায় থাকে, তার উপরে রাজ্যের মার্বেল। সে সব না সরালে দেখাই যায় না। টুকাই সময় সুযোগ বুঝে রোজ এক বার কী দু'বার ও দুটো সন্তর্পণে বের করত, ঘষাঘষি করত, আবার যথাস্থানে রেখে দিত। না, কোনও বারই ঝিকমিক করে আলো জ্বলে ওঠেনি। এত সহজে যে জ্বলবে না সে তো সাধুবাবা মংলুকে বলেইছিলেন। তবে জ্বলবে, এক দিন নিশ্চয়ই জ্বলবে, বটুদাদু যখন বলেছেন তখন জ্বলবেই। ওঁর কথা কি কখনও মিথ্যে হতে পারে?

তার পর তো এক দিন তাতাই কেমন হয়েই গেল আর তারও পরে ওরা মামার বাড়িতে চলে এল। বটুদাদুকে তখন আর অগ্নিশিলার কথা বলা হয়নি, মামার বাড়ি আসতে হবে শুনে টুকাইয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল আর বটুদাদু ওকে বুঝিয়েছিলেন ভয় না-পেতে, মা'র অবাধ্য না-হতে। অগ্নিশিলার কথা তখন আর মনেই ছিল না।

এখানে আসার পরও আর এ কৌটোয় তেমন হাত পড়েনি। অগ্নিশিলা কি যখন তখন সকলের সামনে বের করা যায়? সময় সুযোগ বুঝে করতে হয়। তাতাইয়ের কী হয়েছে কে জানে, ও বোধ হয় এই কৌটোর কথা ভুলেই গেছে।

আজ অনেক দিন পরে টুকাই আবার ও দুটো বের করল, হাতে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে অল্প ঘষলও, তার পর আবার মার্বেলের ভিতর লুকিয়ে রেখে কৌটো বন্ধ করে দিল। কবে যে আগুন জ্বলবে!

॥ ৪ ॥

গুলঞ্চ গাছের আশপাশের নরম মাটিতে পায়ের ছাপ। একেবারে পরিষ্কার। কাল রাতে ছায়াটাও তো এ দিকেই দেখেছিলেন। তার মানে সত্যিই লোক ঢুকেছিল বাড়িতে। হারু ভুল কিছু বলেনি। এই গ্রামেও চোরের উৎপাত! নিশ্চিন্তে থাকা যাবে না? মৃণাল চিন্তিত হলেন।

মৃণালদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় উমারঞ্জনরা রোজ বিকেলে বসে গল্প করেন। মৃণাল আজ সেখানেই গেলেন। গল্পও হবে, এখানে চোরটোরের উপদ্রব আছে কিনা তা জানাও যাবে।

"চোর!" উমারঞ্জন আকাশ থেকে পড়লেন, "দেখুন, বাগানের ফলপাকুড় গাঁয়ের দস্যি ছেলেমেয়েরা নিয়ে যায় অনেক সময়ে। ধরতে পারলে বকাবকি করি, কেউ-কেউ দু'-এক ঘা কষিয়েও দেয়, তার পর কিছু দিন সে বাড়িতে উপদ্রব বন্ধ থাকে, আবার শুরু হয়। পাড়াগাঁয়ে এ সব হয়, কিন্তু এদের কি চোর বলা চলে? আপনিই বলুন! নাকি আপনাদের বড়-বড় শহরে তা-ই বলে?"

"না না, কক্ষনও নয়, ছেলেপুলেরা ওরকম করে," মৃণাল হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, ইনি আবার কী ভেবে বসলেন কে জানে, "আমি কিন্তু এ সবের কথা বলিনি।"

"তা হলে কিসের কথা বলছেন? ভাল করে খুলে বলুন। না হলে বুঝব কী করে? দুম করে কেউ গাঁয়ের নামে বদনাম করলে আমাদের গায়ে লাগে মশাই, অস্বীকার করব না," উমারঞ্জনের মুখ এখনও গম্ভীর।

"সে তো লাগবেই। লাগাই স্বাভাবিক। তবে এ গ্রাম কিন্তু আমারও। অকারণ নিজের গ্রামের বদনাম করে আমারই বা কী লাভ বলুন? যা-ই হোক, ওসব কথা থাক, আসল কথা বলি। গত কাল রাতে আমাদের বাগানে কেউ ঢুকেছিল, আমি কিছু বোঝার আগেই পালাল। রাত তখন প্রায় একটা। অত রাতে তো আর ছোট ছেলেমেয়েরা ফলপাকুড় নিতে আসবে না। তা ছাড়া হারু, মানে আমি যে-লোকটিকে রেখে গেছিলাম সে-ও বলছিল একটা লোক নাকি মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ির বাগানে ঘোরাঘুরি করে। ও এক দিন রান্নাঘর থেকে দেখেছে। হারু পুরনো লোক, অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আমাদের পানিহাটির বাড়িতে বহু বছর আছে। ও মিথ্যে বলবে না। তা ছাড়া ওকে ওই শ্রীদামও নাকি কী সব বলেছে।"

"শ্রীদামের কথা বাদ দিন, ওর নিজেরই কথাবার্তা, চালচলন কিছুরই ঠিক-ঠিকানা নেই! শুনুন মশাই, এ গ্রামে চোরটোর কিছু নেই। এ গ্রামেই আমার জন্ম, বুড়ো হয়ে মরতে চললাম, এখন আপনি দু'দিন এসে যা খুশি বললেই বিশ্বাস করব? চুরি তো ওই একটিই হয়েছে। কমলদের বাড়িতে। আর কী চুরি হয়েছে, কমলরা কাদের সন্দেহ করে— সে কি আপনি জানেন না? আর মুখ খোলাবেন না মশাই!" উমারঞ্জন বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

"কমলদের সন্দেহও খুব অমূলক বলে তো মনে হয় না! চুরি হওয়ার আগের অন্নপূর্ণা পুজোয় কী হয়েছিল শোনেননি? প্রতি বছরের মতো সে বারও তো বড় তরফের ঠাকুরদালানেই পুজো হচ্ছিল। পুজো শুরু হল কী না হল, ঘট নড়ে উঠল। ভটচায্যি মশাই কোনও রকমে কাঁপতে-কাঁপতে পুজো সেরেছিলেন। তখনই উনি বলেছিলেন, 'মা রুষ্ট হয়েছেন, কোনও অন্যায় হয়েছে বা কেউ করতে যাচ্ছে!' আপনি এ সব কথা মানবেন কিনা জানি না, না-ও মানতে পারেন, আপনার মর্জি, তবে আমরা মানি। বড় তরফের কেউও তখন মানেনি, উল্টে ভটচায্যি মশাইয়ের নামে চাট্টি আজেবাজে কথা বলল। তক্ষুনি-তক্ষুনি তো আর কিছু হয়নি, তার বেশ কয়েক মাস পরে চুরি হল। তখন আবার বড় তরফের বিজন মজুমদার এ বাড়িতে। কিছু দিন সেই নিয়ে জল ঘোলা হল, কাজের কাজ অবশ্য কিছুই হয়নি। তবে পুজো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল। মুখে যত যা-ই বলুক না কেন, আর পুজো করার সাহস হল না। সাহস করলে তো পুজো হত এ বছর। তা এমন বাড়িতে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। মা'র কোপে পড়া কি খুব ভাল কথা?" আর-এক জন বললেন।

"যাক গে, মরুক গে, যার বাড়িতে ঘটছে সে বুঝুক, আমাদের কী?" উমারঞ্জন বললেন, সেই রকম বিরক্ত হয়েই, "কিন্তু বেমক্কা আপনি আমাদের গ্রামের বদনাম করবেন সে আমরা মেনে নেব না— এ পষ্ট বলে দিলাম। আমাদের কথা বিশ্বাস না হয়, যান না সারা গ্রাম ঘুরে-ঘুরে জিজ্ঞেস করে বেড়ান, দেখুন সবাই কী বলে।"

মৃণাল বুঝলেন এঁদেরকে কিছু বলা বৃথা। এঁরা মানবেনই না। অবশ্য শুধু এঁরা কেন? কমলদের বাড়িতেও তো গেছিলেন। ওঁদের বাড়ির পাশেই তো কমলদের বাড়ি, ভেবেছিলেন নিজে গিয়ে কথা বললে হয়তো সদ্ভাবটুকু বজায় থাকবে। তা-ও কি হল? হল না। মৃণালদের সঙ্গে মৌখিক সম্পর্কটুকু রাখতেও যে ওঁরা একেবারে আগ্রহী নন, সে কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁরা এখনও কী ধারণা পোষণ করে চলেছেন, তার আন্দাজ ঠিকই পেয়েছিলেন মৃণাল।

॥ ৫ ॥

হাজার ঝুরির বট টুকাইয়ের মামার বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। ওটুকু টুকাই একাই যাওয়া-আসা করতে পারে। মাকে সে কথা ও বলেওছে। বলেছে, বিকেলবেলায় মাঝে-মাঝে ও ওখানে যাবে। কী সুন্দর জায়গাটা! কেন যে এর আগে-আগে মামার বাড়ি এসে ওখানে যায়নি! নাকি ছোটবেলায় কখনও গিয়েছিল, এখন আর মনে নেই?

"সারা গ্রামের মধ্যে তোর ওই জায়গাটা পছন্দ হল?" মা হেসেছেন, "বিকেলবেলায় না-খেলে ওখানে যাবি?"

"মাঝে-মাঝে, যে দিন আমার ফুটবল খেলতে ইচ্ছে করবে না সে দিন," টুকাই বলেছে, "ঝগড়ুদাদা খেলবে, আমি বটের কাছে বসে থাকব। বটের ও ধার থেকে তো মাঠ দেখা যায় মা, তুমি জানো না?"

"জানি বাবা, জানি। কিন্তু তুই ওখানে একা-একা বসে কী করবি? ওখানে লোকজন তো সেই সকালে আসে, দুপুরের পর থেকে তো বটের তলা ফাঁকাই থাকে।"

টুকাই কিছু বলল না।

মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "তোর বটুদাদুর জন্যে মন খারাপ করে, তাই না? বিকেলবেলায় উনি তোদের গল্প শোনাতেন। কী ভেবেছিলাম আর কী হল!" মা'র দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

মা'র এ রকম মন খারাপ করা মুখ দেখতে টুকাইয়ের মোটেও ভাল লাগে না, তাই ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না না, মন খারাপ করে না মা, আর বটুদাদু বলেছেন আবার আমাদের দেখা হবে। তুমি কিন্তু মামাকে বলে দেবে মা, আমি বিকেলে ঝগড়ুদাদার সঙ্গে বেরোব।"

"আচ্ছা," মা বলেছেন আর সে ব্যবস্থাও করেছেন। মামার একেবারেই মনঃপূত হয়নি, কিন্তু বারণও করেননি।

টুকাই দু'-তিন দিন খেলেছে। কিন্তু দেখেছে ও খেললে অন্য খেলুড়েরা কী রকম যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। হেডস্যরের ভাগ্নে বলেই ওকে এ গ্রামের ছেলেমেয়ে সবাই যমের মতো ভয় পায়। এক জন তো পরিষ্কার বলেই দিল, "তোমার সঙ্গে আমি খেলব না বাবা। খেলতে গিয়ে একটু লাগল কী তুমি পড়ে গেলে, তখন কী হবে? হেডস্যর জানতে পারলে আমাদের শেষ করে দেবেন। তুমি খেললে আমি নেই।"

অমনি অন্য ছেলেরাও “ঠিক ঠিক” করে উঠল। ঝগড়ু বোঝাতে যাচ্ছিল, কিন্তু টুকাইয়ের আর খেলতেই ইচ্ছে করল না। এরা তো বন্ধু হতেই চায় না, এদের সঙ্গে খেলা যায়? জোর করে কিছু হয় নাকি?

“তুমি খেলো ঝগড়ুদাদা, আমি ও দিকে গিয়ে বসি,” টুকাই বলেছে।

আজও টুকাই বটের তলায় একা বসে। ঝগড়ুরা খেলছে। টুকাই ভাবছে কেউ কি ওর বন্ধু হবে না? স্কুলেও তো সবাই ওকে কেমন এড়িয়ে চলে। সকলেরই ওই এক ভয়। ও যদি কারও নামে মামার কাছে নালিশ করে দেয় তা হলে তো আর রক্ষে থাকবে না! এখানে না বন্ধুরা আছে, না বটুদাদু আছেন! দু’চোখ ফেটে জল এল ওর।

“এই খোকা, এখানে একা-একা বসে কী করছ তুমি? তোমাকে তো কখনও এ দিকে দেখিনি, কী নাম তোমার? কোথায় থাকো?”

টুকাই চমকে উঠে দেখল সাদা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক ওর পাশে দাঁড়িয়ে। বেশ দাদু-দাদু দেখতে। এ রকম ধুতি পাঞ্জাবি পরা মানুষ এখানে অনেক দেখছে টুকাই আর পিসিদিদুন তো বলেইছেন যে গল্প-বলা দাদুও এখানে অনেক আছেন।

টুকাই নাম বলল, কোথায় থাকে তা-ও বলল।

ভদ্রলোক তাঁর হাতের ছড়িটা মাটিতে রেখে নিজেও ধপ করে টুকাইয়ের পাশে বসে পড়লেন, বললেন, “দেখেই বুঝেছি তুমি এখানে নতুন। এ গ্রামের ছেলেমেয়েরা তো কেউ এরকম বটের তলায় চুপটি করে বসে থাকে না।”

টুকাই চুপ করে রইল।

“তুমি ওদের সঙ্গে খেলছ না কেন?” ভদ্রলোক খেলার মাঠের দিকে দেখিয়ে বললেন।

“আমার খেলতে ইচ্ছে করছে না।”

“খেলতে ইচ্ছে করছে না! না, এ তো মোটে ভাল কথা নয়! কেন, খেলতে ইচ্ছে করছে না কেন?”

টুকাই আবার নিরুত্তর, কী বলবে?

ভদ্রলোক কিন্তু চুপ করে রইলেন না। বললেন, “বুঝেছি। তোমার সঙ্গে ওরা খেলতে চাইছে না, এই তো? হেডমাস্টারমশাইয়ের ভয়ে। ওরা ওঁকে খুব ভয় পায় কিনা।”

“আমিও মামাকে ভয় পাই,” বলল টুকাই, “বটুদাদু আমাকে ভয় পেতে বারণ করেছেন কিন্তু তাও পাই। ওহ, তুমি তো আবার বটুদাদুকে চেনো না। বটুদাদু আমাদের বাড়ির ওখানে থাকেন, এখানে নয়।”

“না, এ সব ঠিক নয়। তুমিও ভয় পাচ্ছ, ওরাও ভয় পাচ্ছে, তোমাকে খেলায় নিচ্ছে না। এ রকম করলে তো চলবে না। কিছু করতে হবে। শোনো, তুমিও আর ও রকম মুখ গোমড়া করে ছলছলে চোখ নিয়ে বসে থেকো না। ছোট ছেলেমেয়েরা এ রকম করে বসে থাকলে আমার মোটে ভাল লাগে না। সত্যি কথা কী জানো, যেখানে যত গোলমাল হচ্ছে, দেখবে সব বড়দের নিয়ে! অথচ এই কথাটা তারা বোঝেই না, ভাবে একেবারে বিরাট বড় হয়ে গেছে, যা করছে সব ঠিক!”

“তোমাকে আমি কী বলে ডাকব?” টুকাই জিজ্ঞেস করল। এঁকে ওর বেশ ভাল লেগেছে।

ভদ্রলোক যেন কী ভাবছিলেন, এখন টুকাইয়ের কথা শুনে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, “কী বলে ডাকবে? দাদু বলবে?”

“শুধু দাদু?”

“তাও বটে, শুধু দাদু কী করে বলবে? এ গ্রামে কম দাদু নেই, গুলিয়ে যাবে। তা আমার হাতে তো এই লাঠিখানা থাকে সব সময়, তুমি বরং আমাকে লাঠিদাদু বলে ডেকো। না না, লাঠিদাদু নয়, লাঠিদাদা।”

“লাঠিদাদা!” টুকাই ফিক করে হেসে ফেলল।

“যা বলছিলাম। বড়দের নিয়েই যত গন্ডগোল। এই এ গ্রামের মজুমদারবাড়ির কথাই ধরো। মজুমদারবাড়ি চেনো তো? এক কালে তারাই এ গ্রামের জমিদার ছিল।”

টুকাই ঘাড় নাড়ল, “ঝগড়ুদাদার সঙ্গে এক দিন বেড়াতে-বেড়াতে দেখেছি। বড় বাড়ি, ঝগড়ুদাদা বলেছে দু’ভাগ হয়ে গেছে এখন। বড়

তরফ আর ছোট তরফ।"

"শুধু ভাগ হল? আরও কত কী হল! তখনও এ বাড়ি ভাগ হয়নি। ওখানে তখন থাকতেন শশধর মজুমদার। বাড়িতে তাঁর পরিবার-পরিজন ছাড়াও আরও অনেকে ছিল। যেমন কানাইচরণ। বড় দুঃখী ছেলে, কেউ ছিল না। শশধর তাঁকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। ছেলেটা বড় ভাল সাঁতার কাটত। ওই বড় পুকুর তোলপাড় করত। এক দিন কী হল, জানো? ওই পুকুরে ডুবসাঁতার কাটতে-কাটতে সে এক মূর্তি উদ্ধার করে আনল। বড় অদ্ভুত, ফণা তোলা সাপের মূর্তি। এ রকম কুণ্ডলী পাকিয়ে সাপটা বসে আছে। পেতলের মূর্তি, গায়ে কারুকার্য। শশধর দেখে বললেন, 'এ যখন তুই পেয়েছিস এ তোরই। তোকে তো খানিক জমিজমা আমি দেবই বলেছিলাম, যাতে সেখানে ঘরবাড়ি করে থাকতে পারিস, দুটো শাকপাতা অন্তত চাষ করতে পারিস। তা সে সব আমি এখনই লেখাপড়া করে দিয়ে দিচ্ছি। এ মূর্তি নিয়ে তুই সেখানেই থাক।' কানাই খুব খুশি হয়ে বলল, 'এ মূর্তির আমি পুজো করব। মা মনসার পুজো। দেখছ না ফণার নীচে মা মনসার ছবি খোদাই করা!'

"ও মা! তাতে শশধরের ছেলেমেয়েদের কী রাগ! তবে শশধর শোনেননি, তিনি কানাইকে যা দেবেন বলেছিলেন তা-ই দিয়েছেন।"

"উনি এখনও এখানেই থাকেন? ওই মূর্তি নিয়ে?"

"কে, কানাই?" লাঠিদাদা হো-হো করে হেসে উঠলেন, "সে কী এখনও বেঁচে আছে নাকি? এখন তো তার নাতিরা থাকে এখানে। ও মূর্তিকে সে প্রতিষ্ঠা করেছিল, পুজো করত। তবে সে মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। আর সে জন্যে কানাইয়ের নাতিরা মজুমদারদের সন্দেহ করে, বলে তাদেরই নাকি কীর্তি এটা, তারাই লোক লাগিয়ে চুরি করিয়েছে। চুরির ক'দিন আগে জমিতে বেড়া দেওয়া নিয়ে দু'দলে কী সব গোলমাল বেধেছিল! তাই তো বলি, বড়দের নিয়ে যত গোলমাল! ও বাবা, গপ্পো বলতে-বলতে তো দিনের আলো মরে এল! তুমি বাড়ি যাবে না?"

"যাব। ঝগড়ুদাদা আসুক, এলেই চলে যাব," টুকাই বলল। লাঠিদাদা তত ক্ষণে উঠে পড়েছেন।

"তুমি কাল আবার আসবে?" টুকাই জিজ্ঞেস করল।

"কাল? দেখি। তবে এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি রোজ এ রকম করে বসে থাকবে সে তো হয় না," লাঠিদাদা হনহন করে চলে গেলেন।

ঝগড়ুও চলে এল তার পর পরই। হাঁপাতে-হাঁপাতে ওর পাশে বসে পড়ে বলল, "কাল সে আমি ভি খেলব না, বুঝলে টুকাইবাবু?"

"কেন ঝগড়ুদাদা? তুমি খেলবে না কেন?"

"আমার খেলার নেশা আছে, ওরাও ডাকাডাকি করে তাই যাই, কিন্তু তুমি হর রোজ একা এখানে বসে থাকবে এ তো আচ্ছা বাত নেহি হ্যায়। ইস লিয়ে কাল সে আমি ভি তোমার সঙ্গে এখানে বসে থাকব। আজ তাতাইবাবু কেমন আছে? দু'দিন আমাকে দেখল আর দু'দিনই তাতাইবাবুর ডর লাগল। আমি ভি ডরেই তোমাদের বাড়ির ভেতর যাচ্ছি না, ঠাগমা ভি বারণ করল আর কামকাজও দিচ্ছে না।"

টুকাই জানে এ সব কথা। বিকেল হলে ঝগড়ু বাড়ির বাইরে থেকে ওকে ডাকে, ভুলেও ভিতরে ঢোকে না। পিসিদিদুন বলেছেন, "তোর আর এখন এসে দরকার নেই ঝগড়ু, ছেলেটা ভয় পাচ্ছে।"

মা অবশ্য বলেছেন, "না-না ছোটপিসি, তুমি ওকে বারণ কোরো না। বেচারা দুটো পয়সার আশায় আসে, তোমার ওকে দিয়ে যা কাজ করানোর করিয়ে নিয়ো। আমি তখন তাতাইকে নিয়ে অন্য ঘরে থাকব। ও দেখতে না-পেলেই তো হল।"

কিন্তু পিসিদিদুন আর ঝগড়ুকে ডাকেননি।

"তাতাই ওই রকমই আছে। মাঝে-মাঝে কেন যে অত ভয় পায় কে জানে! মামা বলেছে তাতাই আর কোনওদিন ঠিক হবে না," মন খারাপ করা স্বরে তাতাই বলল।

শুনে ঝগড়ু একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠল, "না না ওহ বাত সাচ নেহি। তুমি ওহ বাত শুনো না। হেডমাস্টার মশাই কেন এ বাত বললেন? তাতাইবাবু ঠিক হবে, জ়রুর ঠিক হবে।"

॥ ৬ ॥

তাতাইয়ের স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। একে তো নতুন স্কুলে যেতেই চাইছিল না, মা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, আদর করে ব্যাগ-ট্যাগ সব গুছিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুলে গিয়েও নাকি সব সময় চুপ করে বসে থাকে, কথাটথাও বেশি বলে না। একটু বকলেই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। তাতাইয়ের স্কুলের এক জন স্যর মামাকে বলেছেন, "এ তো অ্যাবনর্মাল বাচ্চা মনে হচ্ছে। একে বোধ হয় বাড়িতে রাখাই ভাল।"

মামা মুখখানাকে হাঁড়ির মতো করে বাড়িতে এলেন, তাতাইয়ের স্যরের কথা বলে বললেন, "কী বলেছিলাম আমি? বলিনি যে ও স্বাভাবিক নয় আর হবে বলেও মনে হয় না? ও রকম হয় অনেক বাচ্চা, সারা জীবন ও রকমই থাকে। ওকে আর স্কুলে পাঠানোর দরকার নেই, বাড়িতেই থাক। একটুআধটু লেখাপড়া যদি শেখে তো তা-ই যথেষ্ট।"

অ্যাবনর্মাল মানে টুকাই জানে। কথাটা শুনে পর্যন্ত ওর চোখ ফেটে জল আসছে। তাতাই অ্যাবনর্মাল? বললেই হল? কক্ষনও নয়।

"আমাকে এক গাদা হাবিজাবি কথা বলতে হল। বললাম, হঠাৎ বাবা মারা গেছে, ছোট ছেলে। শকটা সামলাতে পারেনি, তাই মনে হয় এ রকম হয়ে গেছে। স্কুলে না-পাঠালে আমাকে আর এ সব কৈফিয়ত দিতে হত না কাউকে," মামা গজগজ করেই চলেছেন।

"কিন্তু তাই জন্যে তো হয়নি দাদা," মা শান্ত স্বরেই বললেন, "কেন হয়েছে বললামই তো, ডাক্তারও তো কিছু বুঝতে পারলেন না।"

"থাম তো তুই," মামা এক ধমকে মা-কে থামিয়ে দিলেন, "এক দিন খেলতে-খেলতে একটা সম্পূর্ণ সুস্থ ছেলে এ রকম হয়ে যাবে? আষাঢ়ে গপ্পো নাকি? আগে থেকেই নিশ্চয়ই কিছু অস্বাভাবিকত্ব দেখা দিয়েছিল, তুই ধরতে পারিসনি। আর এমনি ডাক্তার কিছু করতে পারবে না, দেখালে অন্য ডাক্তার দেখাতে হবে। ওই মানসিক রোগের ডাক্তার। সে সব পরে ভাবা যাবে, আপাতত ও বাড়িতেই থাক, স্কুলটুল বন্ধ।"

"মা, মামা যা বলল সব সত্যি?" রাতে মা'র পাশে শুয়ে টুকাই জিজ্ঞেস করল, তাতাই তখন ঘুমে কাদা, "তাতাই আর কখনও স্কুলে যাবে না?"

"যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। তাতাই এক দিন পুরো ঠিক হয়ে যাবে," মা বললেন।

মা'র কথা শুনে টুকাই ভরসা পেল। বটুদাদু থাকলেও এই একই কথা বলতেন। বিট্টান তো হাঁটতেই পারত না। উঠে দাঁড়াতেই পারত না। গ্রামের বদ্যি এমনি দেখে না, পয়সা চায়। বিট্টানের বাবা-মা'র অত পয়সা নেই যে তাকে দেখায়। তাই ভরসা ওই সাধুবাবা। তিনি কী সব লতাপাতা, শিকড়বাকড় বেটে বিট্টানের পায়ে লাগিয়ে দিতেন, কী সব রসটস খাওয়াতেন। কিন্তু তাতেও কিছু হচ্ছিল না। বিট্টান উঠে দাঁড়াতেই চাইত না, মাটিতে ঘষটে-ঘষটে চলত। সাধুবাবা, বিট্টানের বাবা-মা কত চেষ্টা করতেন, কিন্তু বিট্টান দাঁড়াবেই না। এক দিন সাধুবাবা জোর করে বিট্টানকে নিয়ে চলে গেলেন। বিট্টানের মা খুব কাঁদল, বলল, "ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বাবা? ও যে চলতে ফিরতে পারে না।"

সাধুবাবা তার কথায় কর্ণপাতও করলেন না। টেনেহিঁচড়ে বিট্টানকে নিয়ে চললেন। অনেক দূরে বনের ভিতরে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর, তার ভিতরে বিট্টানকে বন্দি করে রেখে দিলেন। খাবারদাবার কিচ্ছু নেই। শুধু এক কোণে একটা কাটা গাছের গুঁড়ি। বেশ উঁচু। তার মাথায় একটা ছোট ঘটিতে জল রাখা। বসে থেকে-থেকে বিট্টান কাঁদতে লাগল। খিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে। বিট্টান ওই রকম মাটিতে ঘষটে-ঘষটে গুঁড়িটার কাছে গেল। কত চেষ্টা করল, কিন্তু বসে-বসে ঘটির নাগাল পেল না। হঠাৎ দরজা খুলে সাধুবাবা এলেন, বিট্টানকে গুঁড়ির কাছে বসে থাকতে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "সেই ওই ভাবে ঘষটে-ঘষটে এসেছিস? বসে-বসেই হাত বাড়াচ্ছিস? দাঁড়া তোর জল খাওয়া বের করছি!" বলে ঘটিটা নিয়ে কুঁড়েঘরের বাইরে ছুড়ে

ফেলে দিলেন।

"বলেছি না খেতে হলে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে আসতে হবে? আর কিছু ক্ষণ দেখব, যদি তুই উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা না-করিস তা হলে এই ঘরে আগুন দিয়ে দেব, তখন দেখব কী করে ঘষটে-ঘষটে বাইরে আসিস," বললেন সাধুবাবা।

বিট্টান বসে-বসে কাঁদতে লাগল। বাবা-মা সব সময় বলে সাধুবাবা কত ভাল, অথচ উনি যে এমন নিষ্ঠুর তা কি ও কোনওদিন ভাবতেও পেরেছিল! ও ঘরেই বসে রইল। কিছু ক্ষণ পরে সত্যি-সত্যিই হাতে একটা মশাল নিয়ে সাধুবাবা এলেন, বললেন, "নে এবার কী করবি ভাব, এই আমি আগুন দিলাম।"

"না-আ-আ-আ..." বিট্টান চেঁচিয়ে উঠল।

"তা হলে উঠে দাঁড়া, চেষ্টা কর, বেরিয়ে আয় কুঁড়ে থেকে, না হলে কিন্তু আমি সত্যি-সত্যিই আগুন দিয়ে দেব..."

ওই গাছের গুঁড়িটা ধরে বিট্টান আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল, এক পা, দু'পা চলতে না-চলতে মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু সাধুবাবা পড়তে দিলেন না, পরম মমতায় ওকে বুকে টেনে নিলেন। সেদিন সন্ধেবেলায় যখন বিট্টান বাড়ি ফিরল, সবাই অবাক হয়ে দেখল সে একটা গাছের ডাল নিয়ে হাঁটছে। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে, কিন্তু হাঁটছে। বিট্টানকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে ওর বাবা-মা কেঁদে ফেলল।

"এ রকম করে কেউ ভয় দেখায়? সত্যি যদি বিট্টান আগুনে পুড়ে যেত?" টুকাই বলেছিল শুনে।

বটুদাদু খুব হেসেছিলেন, "দুর বোকা, সাধুবাবা কি সত্যি-সত্যিই আগুন দিতেন নাকি? উনি তো ভয় দেখাচ্ছিলেন, যাতে বিট্টান ভয় পেয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। তবে কাজের কাজ তো হয়েছিল, তাই না?"

ও রকম কোনও সাধুবাবা এসে যদি তাতাইকে ভাল করে দিতেন? কোনও ম্যাজিক করে তাতাইয়ের মনের সব ভয় তাড়িয়ে দিতেন, কী ভালই না হত! তাতাই তা হলে আবার আগের মতো হয়ে যেত! এ সব ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা টুকাই নিজেও বোঝেনি।

বাড়ি, স্কুল, বাড়ি আর বিকেলে ঝগড়ুর সঙ্গে খানিক বেড়ানো—এই করে টুকাইয়ের দিন কাটছে। বড়ই একঘেয়ে। আগেকার কথা মনে পড়লে ওর মন বিদ্রোহ করে ওঠে। মাকে এক দিন বলেছিল, "এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না মা, আমাদের বাড়িতে ফিরে চলো না।"

মা কিছু বলেননি, কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে শুধু ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। ছোট হলেও টুকাই বুঝছিল মায়ের অক্ষমতা আর সেই কারণে মা'র কষ্ট। ও স্পষ্ট বুঝেছিল যে এখানেই ওদের থাকতে হবে, ফিরে যাওয়ার আর কোনও পথ নেই। আর-একটা কথাও বলেনি ও, সোজা পিসিদিদুনের ঘরে চলে এসেছিল। উনি তখন তাতাইকে গল্প বলছেন। তাতাইকে দেখে ওর আরও কষ্ট হল, বেচারা স্কুলে তো যেতেই পারে না, বাড়ি থেকেই বেরোয় না আজকাল। ঝগড়ুকে দেখার পর থেকে ওর ভয় পাওয়া ভাবটা যেন আরও বেড়েছে।

ঝগড়ু আজ খেলতে যায়নি, টুকাইয়ের সঙ্গেই বসে রয়েছে। ছেলেরা ডাকতে এসে ফিরে গেছে, ঝগড়ু বলেছে, "আমি আজ খেলব না। আমি টুকাইবাবুর সাথ মে থাকব।"

তবে ঝগড়ু থাকলেও আজ আর অত বকবক করছে না। একটু যেন অন্যমনস্ক। টুকাই দেখছিল মাঠে ছেলেরা তখনও খেলা শুরু করেনি, এক জায়গায় জটলা করে কী যেন শলাপরামর্শ করছে। একটু পরেই সবাই আবার দল বেঁধে এল, আবার ঝগড়ুকে ধরে টানাটানি শুরু করল।

"বলছি তো আমি খেলব না, ফির ভি তোমরা এমন করছ কেন?" ঝগড়ু বিরক্ত।

"চলো, চলো খেলবে চলো," ছেলেরা নাছোড়, "ওকেও খেলতে নেব আমরা, তা হলে যাবে তো?"

"টুকাইবাবু খেলবে?" ঝগড়ুর মুখের বিরক্তি কাটল।

"হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি তো, ও-ও খেলবে আমাদের সঙ্গে।"

"উঠো টুকাইবাবু, খেলে আসি," ঝগড়ু বলল। ওর মতো খেলাপাগল ছেলের পক্ষে কত ক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব?

ওরা নিজে থেকে ওকে খেলতে ডাকতে এসেছে, টুকাইও খুশি হয়ে মাঠে গেল। ছেলেরা নিজেরাই দুটো দল তৈরি করল। ঝগড়ু বলেছিল বটে যে ও টুকাইয়ের দলে থাকবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড়দের দলে চলে গেল। ওকে মাঠে দেখে তারাও কি আর ছাড়ে? বেশ খেলা হচ্ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে এমন ধাক্কা খেল টুকাই যে আর সামলাতে পারল না, মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। কপালটা ঠুকে গেল একটা আধলা ইটে। নিমেষের মধ্যে কপালের এক পাশ ফুলে উঠল। টুকাই আস্তে-আস্তে উঠে দেখল, ওর ধারেপাশে কেউ নেই, সবাই একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে। টুকাই আন্দাজ করতে পারল কে ওকে ধাক্কা মেরেছে, কিন্তু সে কথা বলে যে কোনও লাভ নেই, তা-ও বুঝল। অন্যরা সবাই একজোট। ওকে মারবে বলেই মেরেছে, খেলার জন্যে নয়, বল তো ওর পায়ে ছিলই না। কপালটায় বড্ড ব্যথা করছে, ও আস্তে-আস্তে মাঠ ছেড়ে চলে এল।

একটু পরেই ঝগড়ু দৌড়তে-দৌড়তে এল, "এ ক্যায়া হুয়া টুকাইবাবু? ক্যায়সে হুয়া?"

"খেলতে-খেলতে পড়ে গেছি। ইট ছিল দেখতে পাইনি, কপালটা ঠুকে গেছে," টুকাই বলল।

"এ ঝুট আছে। তুমি সচ বাতাও। তোমাকে তো ওই নন্দন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। ওরা হাসছে আর এই সব বলছে, আমি শুনে এলাম।"

টুকাই কিছু বলল না। ঠিকই বলেছে ঝগড়ু, নন্দনই ফেলেছে।

"উঠো টুকাইবাবু, চলো। বাড়ি গিয়ে সব সচ-সচ বাতাও। তার পর দেখো কী হয়," ঝগড়ু বলল।

"না, এ সব কথা একদম বলবে না, কাউকে না। বলব খেলতে গিয়ে পড়ে গেছি।"

"লেকিন কিঁউ?" ঝগড়ু অবাক।

"ও রকম নালিশ করতে নেই," টুকাই সংক্ষেপে বলল। এক দিন তাও খেলতে নিয়েছে, নালিশ করলে আর নেবে?

"নন্দন ইশকুলে হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে মার খেয়েছে, তাই ওর রাগ আছে, তাই তোমাকে ধাক্কা দিল। ও বলছিল আর হাসছিল, আমি শুনে এলাম। তুমি যদি কিছু না করো ওরা তোমাকে আরও পরেশান করবে, এ আমি বলে দিলাম টুকাইবাবু," ঝগড়ু বলল।

পিসিদিদুন কিন্তু ঝগড়ুকে ছাড়লেন না, খুব বকাবকি করলেন, "তোর ভরসায় আমি ছেলেটাকে ছাড়ি, তুই একটু খেয়াল রাখতে পারলি না? এ রকম করে কপাল ফুলিয়ে বাড়ি এল? কী আক্কেল তোর?"

"যে রকম লোকের ভরসায় পাঠাচ্ছ সে রকমই তো হবে। ও কি একটা ভরসা করার মতো মানুষ? আমার কথা তো শোনো না, এখন বোঝো," মামা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন।

"খেলতে গেলে এরকম একটুআধটু হয়। তুমিই কত হাত-পা কেটে বাড়ি ফিরেছ, এখন ভুলে গেছ দাদা?" মা পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করলেন।

মামা কিন্তু সে কথা শুনেও শুনলেন না, বরং টুকাইয়ের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, "খেলতে-খেলতে পড়ে গেছিস না মারামারি করেছিস? সত্যি কথা বল। ওই ঝগড়ুর সঙ্গে মিশলে সবই সম্ভব।"

টুকাইকে কিছু বলতে হল না, পিসিদিদুন বললেন, "কত বার এক কথা বলবে বল তো ছেলেটা? বলছে তো খেলতে-খেলতে পড়ে গেছে, কপালটা ইটে ঠুকে গেছে, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?"

মামা আর কিছু বললেন না।

ঝগড়ুর কথা কিন্তু সত্যি হল। টুকাইয়ের খেলুড়ে বন্ধুরা যেই বুঝে গেল টুকাই ওদের নামে নালিশ করেনি, ওদের উৎপাত শুরু হল। সবাই একই স্কুলে পড়ে, কেউ-কেউ একই ক্লাসেও। বেশি কিছু করার সাহস নেই, এটা-সেটা বলে খেপায়, সুযোগ পেলে ওর পেন নিয়ে নেয়,

বই-খাতা ছিঁড়ে দেয়। আর সব কিছু টুকাই সহ্য করে নেয়, শুধু যখন তাতাইকে পাগল বলে বিচ্ছিরি হ্যা-হ্যা করে হাসে, টুকাইয়ের খুব রাগ হয়, খুব! কী করে যেন সবাই তাতাইয়ের সমস্যার কথা জেনে গেছে। এ সবে নন্দনের উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। এক দিন আর সহ্য হল না, টুকাই গিয়ে নন্দনকে সপাটে এক চড় কষাল। ব্যস, আর যায় কোথায়? নন্দনের দলবল ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একা ছ'-সাত জনের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়, টুকাই অসহায়ের মতো মার খেতে লাগল। নেহাত তখন টিফিনের সময়, তাই উঁচু ক্লাসের ছেলেরা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ছাড়িয়ে নিল। কথা মামার কানেও পৌঁছল, নন্দনরা নয়, প্রথম মেরেছে টুকাই, এ অনেকেই দেখেছে। টিফিনের পরের দুটো পিরিয়ড ক্লাসরুমের বাইরে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল টুকাইকে। শরীরের ব্যথা, বেদনার অনুভূতি তখন চলে গেছে। মন জুড়ে শুধু অভিমান আর কষ্টের জ্বালা। মামা ওর একটা কথাও শুনলেন না, ওদের কথাই বিশ্বাস করলেন? ওঁর মনে হয় টুকাই বিনা কারণে মারামারি করতে পারে?

"তোমার গুণধর নাতির কাণ্ড শুনেছ? স্কুলে মারামারি করেছে," বাড়ি ঢুকতে-ঢুকতে মামা বললেন পিসিদিদুনকে, "আমার সে দিনই সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু তোমরা তো আমার কথা গ্রাহ্যই করলে না। আজ লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল, ছি ছি ছি!"

"অত ক্ষণ ছেলেটাকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলি, তাতেও হল না? কই, এক বারও তো জিজ্ঞেস করলি না কোথাও লেগেছে কি না? কী রকম মেরেছে সেটা দেখেছিস?" পিসিদিদুন বললেন।

"মারামারি ও আগে শুরু করেছে, অনেকে দেখেছে আর মারামারি করার মতো কিছুই হয়নি, সে-ও আমি জানি। না জেনেশুনে আমি কিছু করিনি।"

"সব সময় 'তোর ভাই পাগল, তোর ভাই পাগল' করে খেপিয়ে যায় ছেলেগুলো, ওর খারাপ লাগে না?"

"খেপিয়ে যায় বলে মারামারি করতে হবে? আর এ সবে ওকে অভ্যস্ত হতে বলো। এ রকম এখন অনেক শুনতে হবে। তাতাই যে স্বাভাবিক নয় তা তো আর মিথ্যে নয়," মামা গটগট করে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

পিসিদিদুন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

॥ ৭ ॥

নিশুতি রাত। চার পাশ নিস্তব্ধ। মাঝে-মাঝে শুধু দু'-একটা কুকুর আর রাতচরা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। মজুমদারবাড়ির বড় তরফের অংশের সামনে একটা ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করছে। দেখতে-দেখতে সে এসে দাঁড়াল একটা খোলা জানলার সামনে। এ জানলার গোটা তিনেক শিক নেই। তাতে যে ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কেউ অনায়াসে গলে যেতে পারে। অন্তত এই ছায়ামূর্তি তো পারেই। এই করে সে অনেক বার বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে। আর এক বার ঢুকতে পারলে তো হয়েই গেল, ও বাড়ির সব কিছু ওর নখদর্পণে। ছায়ামূর্তি জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি মারল। শ্রীদাম ঘুমোচ্ছে, তার নাক ডাকার আওয়াজ বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে। সারা রাত শ্রীদাম এ রকম মড়ার মতো ঘুমোয়, সেই সকালের আগে আর ওর ঘুম ভাঙে না। শ্রীদাম বুড়ো হয়েছে, বড়ই নিঃসঙ্গ। বউ মরেছে অনেক কাল, ছেলেরা খোঁজখবর রাখে না। সেই কবে থেকে শ্রীদাম এই বাড়ি আগলে এখানেই পড়ে আছে। এখন অবশ্য আর তেমন আগলানোর কিছু নেই। দামি-দামি যা জিনিস ছিল তা তো সব মজুমদারবাড়ির লোকেরা নিয়েই চলে গেছে। হ্যাঁ, সেগুন কাঠের ভারী-ভারী কয়েকখানা আসবাব এখনও আছে বটে, তবে সে সব আর কে চুরি করতে আসবে? ও সব বয়ে নিয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা নাকি? শ্রীদামের তাই তেমন কাজ নেই, নিজের রান্নাটুকু করে, খায়দায় আর ঘুমোয়। ছায়ামূর্তির মুখে হাসি ফুটল। আজই সুযোগ। ওই ঘরটা আজই দেখতে হবে। ওই ঘরটায় নাকি এক সময় অনেক বইপত্তর ছিল, সেসব আর কিছু এখন নেই, শুধু ক'টা বড়-বড় ট্রাঙ্ক রাখা আছে। সেগুলো আজ ঘেঁটে দেখতে হবে। সে আর সময় নষ্ট করল না, টুক করে জানলা দিয়ে গলে ঘরে ঢুকে পড়ল। বলা বাহুল্য শ্রীদাম কিছুই বুঝল না।

॥ ৮ ॥

"আজ তাতাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যা তো, তুই তো আর খেলিস না, বসেই থাকিস, ও-ও তোর সঙ্গে বসে থাকুক," বিকেলবেলায় মা টুকাইকে বললেন।

"এ তুই কী বলছিস মিঠু? ছেলেটাকে তো আরও উত্ত্যক্ত করবে সবাই! আমাদের সঙ্গে বেরোয় সে না-হয় হয়, কিন্তু দাদুভাই কি পারবে নাকি সামলাতে?" পিসিদিদুন বললেন।

"জানতে তো আর কারও কিছু বাকি নেই ছোটপিসি, স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল। এ রকম সারা ক্ষণ বাড়ির মধ্যে বসে থাকলে চলবে? বেরোক। আর টুকাইকেও সব সামলাতে, শিখতে হবে। ওদের মাথার ওপর থেকে যে ছাদ সরে গেছে তা এবার বুঝুক।"

"যে যা খুশি বলুক দাদুভাই, তুমি একটা কথাও বোলো না, কিচ্ছু কোরো না। খুব জ্বালাতন করলে বাড়ি চলে এসো, মনে থাকবে তো?" পিসিদিদুন বার বার করে বললেন।

টুকাই ভাইকে নিয়ে এসে হাজার ঝুরি বটের নীচে বসল।

"পিসিদিদুনের কাছে হাজার ঝুরি বটের গল্প শুনেছিস না? এটা সেই বট। কত-কত ঝুরি দেখেছিস? সত্যিই হাজার-হাজার!" টুকাই বলল।

তাতাই বাইরে বেরিয়ে আজ খুশি হয়েছে। বটের চার দিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। বটের গুঁড়ির গায়ে একটা কাঠবিড়ালি আর-একটা কাঠবিড়ালিকে তাড়া করেছে। দুটোই চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল! তাতাই খিলখিল করে হেসে উঠল।

"ওরা এ রকম করছে কেন রে দাদা?" তাতাই জিজ্ঞেস করল।

"কেন করছে? কে জানে?" টুকাই কোনও উত্তর দিতে পারল না।

"ও মা, এটাও জানো না! এ তো সামান্য ব্যাপার!"

গলার আওয়াজে চমকে উঠে দু'ভাই তাকিয়ে দেখল লাঠিদাদা হাসি-হাসি মুখে ওদের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কখন এসেছেন ওরা বুঝতেই পারেনি। তাতাই লাঠিদাদাকে চেনে না, ও টুকাইয়ের কাছে ঘেঁষটে এল।

"ভয় পাস না, ইনি লাঠিদাদা, সব সময় লাঠি নিয়ে ঘোরেন তো তাই ওই নামে আমি ডাকি। উনিই বলেছেন," টুকাই বলল, "লাঠিদাদাও বটুদাদুর মতো গল্প জানেন, শুনবি?"

তাতাই তখনও দাদার গা ঘেঁষটে দাঁড়িয়ে, গভীর মনোযোগে লাঠিদাদাকে দেখছে।

"শুনবে, শুনবে। আগে ভাল করে আলাপ-পরিচয় হোক, তার পর তো। তখন আর ও রকম করে দাঁড়িয়ে থাকবে না, বুঝলে? এখন বরং বসা যাক," লাঠিদাদা হাতের লাঠি রেখে বসে পড়লেন। ওঁর দেখাদেখি টুকাই আর তাতাইও।

"তুমি এত দিন আসোনি কেন লাঠিদাদা? এর মধ্যে কত কী হয়েছে জানো?" টুকাইয়ের কণ্ঠস্বরে অভিমানের ছোঁয়া।

"কেন আসিনি? হল না আসা, এই আর কী। আরে বাবা, বুড়ো হয়েছি তো, বুড়োমানুষদের এ রকম হয়, মানে এই আসব-আসব ভাবলেও আসা হয়ে ওঠে না। সে যাক গে যাক, এ সব কথা বাদ দাও। তুমি যেন কী বলছিলে? কত কী হয়েছে এর মধ্যে? তা কী হল শুনি?"

টুকাই এক-এক করে সব বলল। সেই খেলতে-খেলতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া থেকে স্কুলে শাস্তি পাওয়া— সব কিছু।

"ওহ, তার মানে এই শুরু হল!" লাঠিদাদা বললেন, "তুমি ভেবো না, নতুন স্কুলে এলে অমন একটুআধটু হয়েই থাকে। তুমি আর ওদের কথা গ্রাহ্যই কোরো না বুঝলে?"

কথাটা টুকাইয়ের তেমন মনঃপূত হল না, ও চুপ করে বসে রইল।

“তবে এই বিকেলবেলা চুপচাপ বসে থাকাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তুমিও একটু খেলাধুলো করতে পারলেই হত,” লাঠিদাদা বললেন।

“না, আমি আর ওদের সঙ্গে খেলব না।”

“আচ্ছা বেশ, সে না হয় এখন খেললে না। দেখো, এক দিন সব ঠিক হয়ে যাবে, তখন তুমিও খেলবে।”

“ঝগড়ুদাদাও তা-ই বলে। ”

“ঝগড়ুদাদা? বুঝেছি, ওই ঢ্যাঙা ছেলেটা! কী যে এক আজব ভাষায় কথা বলে!”

“ঝগড়ুদাদা খুব ভাল। এখন আর ওদের সঙ্গে খেলে না। ওরা কত ডাকাডাকি করে, কিন্তু ঝগড়ুদাদা যায় না। বলে ‘আমি টুকাইবাবুর সঙ্গে বৈঠে থাকব।’ রোজ তা-ই থাকে, এখানে বসে আমার সঙ্গে গল্প করে।”

“তা আজ তোমার ঝগড়ুদাদা এল না কেন?”

“কী করে আসবে? ঝগড়ুদাদাকে দেখে যে ভাই ভয় পায়। দু’দিন ভাইয়ের সামনে গেছিল, দু’দিনই ভাই ভয় পেয়েছে। আজও এসেছিল, কিন্তু আমি ভাইকে নিয়ে বেরোব বলে পিসিদিদুন আগেই ঝগড়ুদাদাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।”

“ভয় পায়? কেন? ভয় পায় কেন?” লাঠিদাদা খুব আশ্চর্য হয়েছেন।

তাতাই এক ফাঁকে উঠে গিয়েছিল। এখানে কেউ নেই, ও নিশ্চিন্তে বটের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঝরে পড়া বটের পাতা কুড়িয়ে নিজের মনে খেলছে। টুকাই দেখল এই সুযোগ, এখন আস্তে-আস্তে সব কথা লাঠিদাদাকে বললে ও শুনতে পাবে না।

“দাঁড়াও-দাঁড়াও, থামো-থামো, ও কী? ওর মুখ-চোখ ও রকম হয়ে যাচ্ছে কেন?” টুকাই তাতাইয়ের কথা বলছিল, হঠাৎ লাঠিদাদা বলে উঠলেন।

টুকাই চমকে উঠে দেখল তাতাই কখন এসে পড়েছে, ফ্যাকাসে, ভয়ার্ত মুখে তাকিয়ে রয়েছে। টুকাই এক লাফে উঠে পড়ল, তাতাইকে জড়িয়ে ধরে বলল, “কী হয়েছে ভাই? এই তো আমি, কোনও ভয় নেই, এই দ্যাখ এই তো আমি। মা’র কাছে যাবি?”

তাতাই উঁকি মেরে কী যেন দেখল এক বার। লাঠিদাদাও “কী হয়েছে? কী হয়েছে?” করে উঠে এসেছেন।

“কী হল বলো তো তোমার? কাকে দেখে ভয় পেলে? এই লাঠিখানা দেখছ? এই দিয়েই তার মজা বের করছি। এক বার শুধু বলো, তুমি ভয়টা পেলে কাকে দেখে?” লাঠিদাদা ওঁর হাতের লাঠিখানা দেখালেন।

তাতাই কোনও উত্তর দিল না, তবে ভয়টা কমেছে মনে হল।

“এই দেখো কথায়-কথায় আসল কথাটাই ভুলে গেলাম! নাহ, সত্যি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি দেখছি,” লাঠিদাদা আবার বললেন, “তখন তুমি জানতে চাইছিলে না কাঠবিড়ালিরা ও রকম করছে কেন? কেন করছে জানো? এক জন আর-এক জনের খাবার নিয়ে পালিয়েছে যে! ওরা দুই ভাই, এই তোমাদেরই মতো। বড়টা ছোটটার খাবার নিয়ে পালিয়েছে। দাদা তোমার খেলনাটেলনা মাঝে-মাঝে নিয়ে নেয় না? সে রকমই।”

তাতাই লাঠিদাদার দিকে তাকাল, মুখে একটু-একটু হাসি।

টুকাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাক বাবা, বেশি ভয় পায়নি।

“কক্ষনও আর এ রকম ভয় পাবে না। ভয় পেলে বটের কাছে এসে সব বলে দেবে, দেখবে ভয় চলে যাবে,” লাঠিদাদা বললেন।

“বটের কাছে তো লোকে চাইতে আসে, যার যা ইচ্ছে তাই চায়, দুঃখের কথা বলে যাতে দুঃখ চলে যায়, কিন্তু কেউ তো ভয়ের কথা বলে না!” বলল টুকাই।

“না-বলার কী আছে? দুঃখের কথা বলা যায় আর ভয়ের কথা বলা যায় না? বললেই বলা যায়। আরে বাবা, ভয়টাও তো যাওয়া দরকার, নাকি? তা ছাড়া এ কী যে সে বট! এ হল হাজার ঝুরির বট! এর বয়স একশো পার হয়ে গেছে, বুঝলে?”

“কখন বলবে? সকালে এসে?”

“অত সকাল-বিকেলের কী আছে? বলা নিয়ে কথা, যখন হোক বললেই হল। সন্ধে হয়ে আসছে, এ বার তোমরা বাড়ি যাও আর ভাইকে নিয়ে রোজ এ রকম বেরিয়ো,” লাঠিদাদা বললেন।

“বটের কাছে সব বলবি ভাই? কেন তুই এত ভয় পাস? মা কত বার জিজ্ঞেস করেছে তাও তুই বলিসনি, বটকে বলবি? বললেই ভয় চলে যাবে,” বাড়ি ফিরতে-ফিরতে টুকাই তাতাইকে জিজ্ঞেস করল।

তাতাই কিছু বলল না, শুধু টুকাইয়ের হাতটা আরও একটু জোরে চেপে ধরল। টুকাই বুঝল তাতাই আবার ভয় পাচ্ছে, এই প্রসঙ্গ উঠলেই যেমন পায়।

॥ ৯ ॥

“কুছ আচ্ছা হচ্ছে না, সিরফ বুরাই হচ্ছে,” ঝগড়ু বলল।

আজ তাতাই আসেনি, তাই ঝগড়ু টুকাইকে নিয়ে বটের নীচে এসে বসেছে। তাতাই এর মধ্যে আরও এক দিন বেরিয়েছিল টুকাইয়ের সঙ্গে। সেদিন যে শুধু কয়েকটা ছেলে তাতাইকে দেখে বিচ্ছিরি করে হেসেছিল তা নয়, আরও দু’জন তাতাইকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, “হেডমাস্টার মশাইয়ের ছোট ভাগ্নে। স্বাভাবিক নয় ছেলেটা। কী রকম যেন হয়ে থাকে!”

এরা মোটেই ছোট নয়, বড় লোক, তাও এ রকম বলল! টুকাই ওদের চেনে না, তাই কিছু বলতে পারল না। অবশ্য মা আর পিসিদিদুন দু’জনেই বারণ করে দিয়েছেন এ নিয়ে কারও সঙ্গে কোনও কথা বলতে।

“বল না ভাই, কী হয়েছে তোর,” টুকাই কত বার বলেছিল, “আচ্ছা আমাকে না বলিস, বটকে বল।”

কিন্তু তাতাই কিছুই বলেনি, বরং “মায়ের কাছে যাব, মায়ের কাছে যাব,” করে ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছিল। তার পর আর তাতাই বেরোয়নি। অবশ্য দু’-তিন দিন বিকেলবেলায় যা বৃষ্টি হল, টুকাই-ই বা কোথায় বেরোতে পারল?

“কিন্তু তুমি যে বলো বুরা হলে আচ্ছাও হবে?”

“বলি তো, আমি তো জানতাম এই নিয়ম আছে, লেকিন তা হচ্ছে না। এই তাতাইবাবুর কথাই দেখো। ওই রকমই আছে আবার ইশকুলে যাওয়া ভি বন্ধ হয়ে গেল। ওই নন্দনরা ভি তোমার সঙ্গে বদমাশি করছে। ওদের জন্যে তুমি শাস্তি পেলে। সিরফ বুরা!” ঝগড়ু মুখটাকে বাংলার পাঁচের মতো করে বলল।

“ঝগড়ুদাদা, তোমাদের জমি হল? তুমি যে জমি চেয়েছিলে বটের কাছে?” টুকাই জিজ্ঞেস করল।

“কাঁহা সে হবে? পয়সা কাঁহা? আমাকে আরও অনেক কামকাজ করতে হবে, অনেক-অনেক কামকাজ,” উদাস স্বরে ঝগড়ু বলল, “আমার ছোট ভাই-বহিনকে বড় করতে হবে। ওরা ইশকুলে পড়ে।”

“তুমি ইশকুলে পড়োনি ঝগড়ুদাদা?”

“আমি আর বেশি দিন কই পড়তে পারলাম! আমাকে তো কামকাজে লাগতে হল। আমি বড় বেটা, আমার কামকাজ না-করলে চলল না। লেকিন আমি আমার ভাই-বহিনকে পড়াব। ওরা ইস্কুলে যাবে, অনেক-অনেক পড়াই করবে। আমার মতো এ রকম কামকাজ করবে না, কভি নেহি।”

টুকাই চুপ করে রইল। সত্যি, স্কুলে না-পড়া যে কী কষ্টের! তাতাই স্কুলে যায় না, মামা বলেছেন ও আর কোনওদিন স্কুলে যাবে না, বাড়িতে লেখাপড়া করবে। শুনে থেকে টুকাইয়ের যা কষ্ট হয়েছে! মা’রও নিশ্চয়ই কষ্ট হয়, কিন্তু মা মুখে কিছু বলেন না।

“আচ্ছা টুকাইবাবু, এক বাত বাতাও। চোরি করা তো বহুত বুরা কাম আছে, তাই না?”

চুরি! শুনেই টুকাইয়ের হয়ে গেছে।

“চুরি করা খুব খারাপ, খুব, খু-উ-ব! ও ঝগড়ুদাদা, কে চুরি করল? কী চুরি করল?”

“ওহ সব বাত আমি বলতে পারব না। আমি কোসিস করছি তাকে বোঝাতে, লেকিন আমার বাত শোনে না। চোরি করে এনেছে। এক দিন না একদিন বহুত গড়বড় হবে।”

"তুমি জানো কী চুরি করেছে আর সেটা কোথায় আছে?"

"হাঁ ওহ আমি জানি।"

"তা হলে মংলু যা করেছিল তাই করো না।"

ঝগড়ু এত দিন টুকাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে-করতে মংলু, বিট্টান, সিলিমিলিদের কথা জেনে গেছে। ও ওদের গল্প শোনে আর মাথা নেড়ে-নেড়ে বলে, "বহুত আচ্ছা কাহানি আছে। টুকাইবাবু, তোমার বটুদাদু ভি বহুত আচ্ছা ইনসান আছে।"

"মংলু কী করেছিল টুকাইবাবু?"

"মংলু খুব ভাল গাছে চড়তে পারে। এ-গাছ ও-গাছের মগডালে চড়ে বসে থাকে। এক দিন কী দেখল জানো? দেখল দু'জন লোক আসছিল, তাদের সঙ্গে একটা টাকার পুঁটলি, কী সব কিনবে বলে অন্য গ্রাম থেকে মংলুদের গ্রামে আসছিল। বনের ধারের নির্জন পথ দিয়ে আসছিল। হঠাৎ রাজাবাবুর একটা সেপাই এল, ওই রাজাবাবু গো ঝগড়ুদাদা, যে মংলুদের গ্রামে থাকতে দেয়নি, আমি বলেছিলাম তোমাকে, তোমার মনে আছে তো?"

"হাঁ হাঁ আমার ইয়াদ আছে, ইয়াদ আছে," ঝগড়ু ব্যস্ত হয়ে বলল, "তুমি বলো ওই সেপাই কী করল এসে?"

"ওই সেপাই ভয় দেখিয়ে লোক দু'জনের কাছ থেকে টাকার পুঁটলিটা কেড়ে নিল। ও দিকে আরও কয়েক জন সেপাই আসছিল। তারা যদি দেখতে পেয়ে টাকার ভাগ চায় তাই এই সেপাইটা পুঁটলিটা একটু দূরে একটা গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে রেখে দিল। ভাবল পরে কোনও সময়ে এসে নিয়ে যাবে। তার পর অন্য সেপাইরা ওকে ডাকাডাকি করতেই ও দৌড়ে তাদের কাছে চলে গেল। রাজাবাবু ওদের কোথায় যেন যেতে বলেছে, তাই ওরা যাচ্ছে। ওদিকে লোক দুটো তো মনের দুঃখে আবার ফিরে যাচ্ছিল। মংলু তো গাছে চড়ে সব দেখেছে। সেপাই চলে যেতেই সে দৌড়ে সেই গাছের কাছে গেল, তার পর মাটি খুঁড়ে টাকার পুঁটলি বের করে নিল।"

"ফির?"

"তার পর আবার দৌড়তে-দৌড়তে সেই লোক দু'জনের কাছে গেল। গিয়ে তাদেরকে পুঁটলিটা দিল। লোক দু'জন যে কী খুশি হল! মংলুকে কত আদর করল! এমনকি, সব শুনে সাধুবাবা পর্যন্ত খুশি হলেন। বললেন, 'তুই বড় ভাল কাজ করেছিস।' তুমিও তাই করো ঝগড়ুদাদা। যাদের জিনিস তাদের ফেরত দিয়ে দাও।"

ঝগড়ু মাথা নাড়ল, "ইতনা আসান কাম এ নয় টুকাইবাবু। মংলু তোমার মতো ছোট ছেলে আছে, তাই ওকে কেউ চোর ভাবেনি। কিন্তু আমি কী করে ফেরত দিতে যাব? দিতে গেলে যদি ধরা পড়ে যাই? আমাকেই যদি চোর ভাবে?"

"না-না, তা হলে তুমি যেয়ো না ঝগড়ুদাদা। কিন্তু এখন কী করবে?"

"তুমি পরেশান হোয়ো না টুকাইবাবু, কুছ না কুছ উপায় নিকলাবে। আর এ সব বাত কাউকে বোলো না।"

টুকাই ঘাড় নাড়ল। পাগল নাকি! এ সব কথা কেউ বড়দের বলে? লাঠিদাদার কথাই ও কাউকে বলেনি!

বাড়িতে মামার কড়া নজরে থাকে টুকাই। স্কুলের সেই দিনের ঘটনাটার পর থেকেই। এখন লেখাপড়াও উনি দেখেন। মামার কাছে পড়তে বসতে টুকাইয়ের প্রথম-প্রথম খুব ভয় করত, কিন্তু মা বলেছেন মামার কাছে পড়লে ওরই ভাল, বিশেষ করে ওঁর মতো ভাল করে অঙ্ক শেখাতে নাকি মা-ও পারবেন না। বাধ্য হয়েই টুকাইকে কথা শুনতে হয়। তবে লেখাপড়ায় টুকাই কোনও কালেই অমনোযোগী নয়, তাই পড়ার সময় অন্তত বকুনি খায় না।

"টুকাইটার বুদ্ধি আছে, পড়েও মন দিয়ে। এখন থেকে ঠিক মতো দেখতে পারলে আর ওই ঝগড়ুটগড়ুর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করলে ছেলেটা ভালই হবে," মামা বলছিলেন, টুকাই শুনতে পেয়েছে।

"যাক, তবু দুটো ভাল কথা বললি!" পিসিদিদুন বলেছেন।

"আমি যা বলি ঠিকই বলি। ভালটাও বলি, মন্দটাও বলি। অন্যায় করলেও বাচ্চা ছেলে বলে মাথায় তুলে নাচানাচি করা আমি পছন্দ করি না," মামা বললেন, গম্ভীর স্বরে।

"এখন থেকে তো তোমাকে দেখতে হবে, তুমিই দেখো, ওদের তো আর কেউ নেই," মা বললেন।

"তাতাইটাও যদি এ রকম হত! ওর যে কী হবে! সারা জীবন কী করে কাটবে? কে দেখবে!" মামা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"আমার দাদুভাই ঠিক ভাল হয়ে যাবে। আর পাঁচটা বাচ্চার মতো স্কুলে যাবে, হাসবে, খেলবে। এ আমি বলে রাখলাম, তোরা পরে মিলিয়ে নিস," পিসিদিদুন বললেন।

টুকাই দরজা দিয়ে উঁকি মারছিল, দেখল মামা ম্লান হেসে চলে গেলেন। মুখটাও যেন কী রকম, আগের মতো আর অত গম্ভীর নেই। টুকাইয়ের মাঝে-মাঝে মনে হয় মামা যেন একটা মুখোশ পরে থাকেন। রাগী-রাগী, গম্ভীর মানুষের মুখোশ। কখনওসখনও খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও সেই মুখোশটা খুলে যায় আর তখন এক অন্য মামাকে দেখা যায়। কত সুন্দর করে পড়ান মামা! টুকাই খেয়াল করেছে এক বারে পড়া বুঝতে না-পারলেও তখন কিন্তু রেগে যান না। আবার টুকাই যখন শক্ত-শক্ত অঙ্কও ঠিক করে করতে পারে, তখন উনি 'ভেরি গুড'ও বলেন। টুকাইয়ের মনে হয় ওই সময় মামা অন্য রকম হয়ে যান। সেই মামাকে ভয় পেতে নয়, ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

টুকাই মন দিয়ে স্কুলের হোমওয়ার্ক করছিল, হঠাৎ দেখে তাতাই গুটগুট করে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

"আমার পড়া এখনও হয়নি তো, হয়ে গেলে খেলব। তুই এখন পিসিদিদুনের কাছে যা," টুকাই বলল।

মামা উঠে গেছেন একটু আগে, আবার এক্ষুনি আসবেন, এসে যদি দেখেন টুকাই পড়ার সময় ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করছে তা হলে রেগে যাবেন। তাতাই কিন্তু গেল না, বরং আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এ ঘরে একটা কাচের আলমারি আছে। সেটায় শুধু টুটুনের জিনিসপত্র। টুটুনের এত-এত খেলনা, টুটুনের হাতে আঁকা ছবি, টুটুনের বই, টুটুনের ফটো। মামা সাজিয়ে রেখেছেন সব। আলমারিতে তালা দেওয়া নেই, কিন্তু ওতে কারও হাত দেওয়া বারণ।

"ওই ট্রেনটা কী সুন্দর! আমাকে দে না দাদা, আমি নিয়ে খেলব," তাতাই একটা খেলনা দেখিয়ে বলল।

টুকাই প্রমাদ গুনল, তাতাই আলমারি খুলে ফেললেই তো হয়েছে! ও উঠে তাতাইয়ের কাছে গেল। বলল, "না, ওগুলো নিতে নেই। ওগুলো সব টুটুনদাদার জিনিস।"

"টুটুনদাদা তো নেই, পিসিদিদুন বলেছে। আমাকে ট্রেনটা দে না।"

"টুটুনদাদা আছে। শুধু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বাবার মতো। আমাকে বটুদাদু বলেছেন, নেই বলে কিচ্ছু হয় না, সবাই আছে। টুটুনদাদাও আছে।"

তাতাই এ সব কথা কতটা কী বুঝল বলা শক্ত, বায়না জুড়ল, "আমি ট্রেনটা নেব, আমাকে দে।"

"টুটুনদাদার জিনিস তুই কী করে নিবি? টুটুনদাদাকে না-জিজ্ঞেস করে নেওয়া যায় না। না-জিজ্ঞেস করে তো দুষ্টু ছেলেরা নেয়, তুই কি দুষ্টু ছেলে?"

তাতাই থমকাল, দুষ্টু ছেলে হতে আর কে চায়? বলল, "আমি মাকে বলব এ রকম ট্রেন এনে দিতে। মা এনে দেবে। আমি তখন ট্রেন নিয়ে খেলব। কাউকে দেব না। তোকেও দেব না, টুটুনদাদা এলে টুটুনদাদাকেও দেব না।"

"আমি তো ভেবেছিলাম পড়া হয়ে গেলে তোর সঙ্গে নতুন একটা খেলা খেলব। কিন্তু তুই তো এখন ট্রেন-ট্রেন করে বায়না করছিস, আমি তা হলে আর তোর সঙ্গে খেলব না," টুকাই বলল, ভাইকে ভোলাতে ও এখন শিখে গেছে।

"নতুন খেলা?"

"হ্যাঁ। আমি পড়া শেষ করে নিই, তার পরে খেলব। তুই এখন

পিসিদিদুনের কাছে যা, গল্প শোন, চল," টুকাই ঘুরে দাঁড়িয়েই স্থির হয়ে গেল, দরজার মুখে মামা দাঁড়িয়ে। কে জানে ওদের কথা কতটা কী শুনেছেন।

"তাতাই চলে এসেছে এ ঘরে, খেলনাগুলো দেখছিল। কিন্তু কিছুতে হাত দেয়নি..." টুকাই বলে উঠল, খেলনায় হাত দিলে কী হবে সে ও ভালই জানে।

"হোমওয়ার্ক শেষ হয়েছে?" মামা জিজ্ঞেস করলেন।

টুকাই মাথা নাড়ল।

"শেষ করে নে।"

টুকাই আশ্চর্য হয়ে দেখল মামা আর একটা কথাও না-বলে চলে গেলেন, এ ঘরেই আর এলেন না, গলার স্বরটাও কী রকম নরম!

মামা চলে যেতে তাতাইও এক ছুটে পালিয়েছে। টুকাই আবার পড়তে বসল।

॥ ১০ ॥

"ওই জিনিসটার কী হল ঝগড়ুদাদা? ওটা ফেরত দিতে পারলে? তুমি যে বললে কুছ না কুছ উপায় নিকলাবে?" টুকাই জিজ্ঞেস করল।

দু'জনে এসে বটের নীচে বসেছে। তাতাই কোনও দিন আসে, কোনও দিন আসে না। টুকাই অনেক চেষ্টা করেছিল, তাতাই যদি সব কথা বলে। কিন্তু তাতাই একটা কথাও বলেনি। বরং এক দিন খুব রেগে গিয়ে ওকে মারতে শুরু করছিল। তাই দেখে মাঠের ছেলেদের যা হাসি! সবাই খেলা ছেড়ে এ দিকে চলে এসেছিল। টুকাই অনেক কষ্টে ওকে শান্ত করে বাড়ি নিয়ে গেছিল সে দিন।

লাঠিদাদা শুনে বলেছিলেন, "এত সহজে কি আর হবে? চেষ্টা করলে হবে। তবে দেখো, চেষ্টা করতে গিয়ে আবার যেন ওকে রাগিয়ে দিয়ো না। তা হলে হিতে বিপরীত হবে, বুঝলে?"

তার পর থেকে তাতাই আর আসেনি, টুকাই ঝগড়ুর সঙ্গে আসে।

"ওই চোরি করা জিনিসটার কথা বলছ? সে এক আজিব ব্যাপার হয়েছে টুকাইবাবু। শুনলে বিশওয়াস করবে না," বলল ঝগড়ু।

"কী হয়েছে ঝগড়ুদাদা?" টুকাইয়ের শোনার আগ্রহ ষোলো আনা।

"সে দিন একটা বাক্স নিয়ে এসেছে, এই এ রকম একটা বাক্স," ঝগড়ু দু'হাত দিয়ে দেখাল, "কাঠের আছে। বহুত সুন্দর নকশা করা! বহুত আচ্ছা দেখতে! কত আচ্ছা, সে আমি তোমাকে বলতে পারব না টুকাইবাবু! ও রকম বাক্স আমি জিন্দেগি মে দেখিনি। ওই বাক্সর ভেতরে কী ছিল জানো? এই এতনা বড় একটা কাঁচি, সুঁই, সুতো, আর কাঁটা!"

"কাঁটা? সে আবার কী? কিসের কাঁটা?" টুকাই অবাক।

"আরে এমনি কাঁটা নয়। ওই তৈয়ারি করে না? সোয়েটার উয়েটার? উল দিয়ে সিলাই করে না? ওহি কাঁটা।"

"উল দিয়ে তো সোয়েটার বোনে ঝগড়ুদাদা, সিলাই করে না, তৈয়ারিও করে না! আমার মা-ও বোনে সোয়েটার আমার আর ভাইয়ের জন্যে। পিসিদিদুন তো এখনও বুনছেন। তুমি যে কী বলো না ঝগড়ুদাদা!"

"হাঁ হাঁ, ঠিক বাত। আমি ঠাগমার হাতে ও রকম কাঁটা দেখেছি। ঠাগমা সোয়েটার তৈয়ারি করে, আমি জানি।"

"আবার তৈয়ারি বলে! বলছি না সোয়েটার বোনে, বলো।"

"হাঁ হাঁ সোয়েটার বোনে, ঠাগমা সোয়েটার বোনে। ওই সব চিজ় আছে ওর ভেতরে। সুঁইয়ে জং ধরে গেছে, সুতা উতা ভি ঠিক নেই, পর ওই কাঁচি আভি ভি ঠিক আছে।"

"এ রকম চুরি করা অন্যায় কাজ। যাদের বাড়ি থেকে চুরি করছে তারা এ বার বাক্স না পেয়ে পুলিশের কাছে যাবে, তখন পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে, বুঝলে?"

"কে পুলিশের কাছে যাবে টুকাইবাবু? কেউ যাবে না। এ সব তো আলতু-ফালতু জিনিস, ফেলে দিয়েছে, ও তার ভেতর থেকে নিয়ে এসেছে।"

"আলতু-ফালতু জিনিস! ফেলে দিয়েছে! সুন্দর নকশা করা কাঠের বাক্স আলতু-ফালতু জিনিস! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ঝগড়ুদাদা!"

ঝগড়ু হেসে ফেলল, "না না, আমার মাথা খারাপ হয়নি টুকাইবাবু। ওহ সব ফেলে দেওয়া জিনিস। ও সব কেউ নেয় না। লেকিন কে ফেলেছে, কাঁহা ফেলেছে এ সব আমি তোমাকে বলব না।"

"বেশ বোলো না," টুকাইয়ের মুখ হাঁড়ি।

"অউর কী এনেছে শোনো না টুকাইবাবু।"

"আরও জিনিস এনেছে!" টুকাই আঁতকে উঠল, "কত কী চুরি করেছে গো!"

"এনেছে তো। ছেঁড়া-ফাটা কিতাব এনেছে। কিতাবের পাতা আলগা হয়ে গেছে। বহুত পুরানা কিতাব।"

"কিতাব? মানে বই?"

"হাঁ হাঁ বই। তবে এ তোমাদের কিতাবের মতো নয়, ইশকুলের কিতাব নয়, কাহানিরও নয়। এতে জামাকাপড়ের ছবি আছে।"

"জামাকাপড়ের ছবির বই!"

"হাঁ। ওসব দেখে দেখে নাকি দর্জি জামা তৈয়ারি করে। আমাকে তা-ই বলল। ও নিজে কুছ-কুছ দর্জির কাম জানে। শিখেছিল, ওই যে বাজারে মদন দর্জি আছে না, উসকে পাশ। লেকিন ওহ শিখাত কম, ফাইফরমাশ খাটাত জ্যাদা। ইস লিয়েই তো ও আর যেত না ওর কাছে। দর্জির কামকাজ ওর আচ্ছা লাগত, লেকিন শিখা হয়নি। এখন ও কী বলছে জানো টুকাইবাবু? ও বলছে ওই কিতাব দেখে-দেখে ও নিজে জামাকাপড় তৈয়ারি করতে পারবে। পহেলে নাকি ওর ভাতিজিদের জামা তৈরি করবে। ওই সব পেয়ে ও খুব খুশ আছে।"

"ভাতিজি কী?"

"ভাতিজি? ভাতিজি হল ওর বড়া ভায়ের বেটি। ওর বড়া ভায়ের দো বেটি আছে। ছোট-ছোট। ওদের জামা তৈয়ারি করবে।"

"জামা তৈরি করলে ভাল, কিন্তু চুরি করা খুব খারাপ কাজ," বিজ্ঞের মতো বলল টুকাই।

"আর করবে না। ও বলেছে আর করবে না। আমি ওকে বলেছি, 'এবার কামকাজ কর, আর এসব ধান্দা করবি না। সিরফ বলিনি, এখানে নিয়ে এসে বটের সামনে বলিয়েছি। এহ বট এয়সে অয়সে গাছ নেহি আছে, এ আমি তোমাকে বলেছি টুকাইবাবু। ও বটের সামনে বলেছে যে আর চোরি করবে না।"

"এবার ও ভাল হয়ে যাবে?"

"হাঁ, এবার ও আচ্ছা হয়ে যাবে," ঝগড়ু খুব খুশি।

"ও কে ঝগড়ুদাদা? তোমার বন্ধু? ওর নাম কী?" টুকাই আর না-জিজ্ঞেস করে পারল না, ঝগড়ু খালি 'ও' 'ও' করেই বলে, কখনও ভুলেও তার নাম উচ্চারণ করে না।

"ও আমি তোমাকে বাতাতে পারব না টুকাইবাবু। তুমি কিছু মনে নিয়ো না," ঝগড়ু কাঁচুমাচু হয়ে বলল।

ওর বলার ধরনে টুকাই হেসে ফেলল।

"তাতাইবাবু আর বেরোয় না?"

"নাহ, ক'দিন আর বেরোয়নি। এখানে আর আসতে চায় না। সে দিন ওকে ওরা খুব খেপিয়েছে। তাতাই খুব রেগে গেছিল।"

"ওরা খুব খারাপ আছে। ইশকুলে এখনও তোমাকে পরেশান করে?"

টুকাই মাথা নাড়ল। না, সেদিনের পর স্কুলে আর তেমন কিছু হয়নি। একেবারেই যে কিছু করে না তা নয়, তবে টুকাই আর গ্রাহ্য করে না। এখন ওরও দু'-তিন জন বন্ধু হয়েছে। স্কুলের স্যরেরাও যে ওকে পছন্দ করেন, সেটা ও বুঝেছে।

কতটুকু আর সময়? দেখতে-দেখতেই বিকেলের আলো ফুরিয়ে আসে। সন্ধের আগে বাড়ি না-ঢুকলে মা রাগ করেন। টুকাই তাই একটুও দেরি করে না, সন্ধে হব-হব করলেই উঠে পড়ে। ও একাই বাড়ি ফিরতে পারে, কিন্তু ঝগড়ু থাকলে ওকে এগিয়ে দিয়ে আসে।

তাতাইয়ের খুব সর্দি-কাশি হয়েছে। কাশি আর যেতেই চাইছে না। ভুগছে বলেই বোধ হয় খুব ঘ্যানঘ্যান শুরু করছে। মা তাই টুকাইকে বললেন, "যা তো, ওকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। বেশি দূরে যাস না, কাছাকাছিই থাক।"

"সাবধানে ভাইকে নিয়ে যেয়ো দাদুভাই। আর ফিরতে বেশি দেরি কোরো না। সকালে যে রকম বৃষ্টি হল তেমন হলেই তো হয়েছে। মেঘ করছে দেখলেই বাড়ি চলে এসো, কেমন?" পিসিদিদুন বললেন।

কোথায় আর যাবে, টুকাই সেই বটের তলাতেই এল। তাতাইয়ের মেজাজ বিশেষ সুবিধের নেই, পথেঘাটে কেউ কিছু বললে মুশকিল হবে। তবে রাস্তায় আসার সময় কিছু না-হলেও এখানে এসে হল। এখনও খেলা শুরু হয়নি, ছেলেরা মাঠে জটলা করছে, দূর থেকে টুকাই আর তাতাইকে আসতে দেখে ওরাও এসে হাজির হল। তার পর শুরু হল তাতাইকে রাগানো। তাতাই প্রথমে কিছু করেনি, জলভরা চোখে টুকাইয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। টুকাইও ভাবছিল ওকে নিয়ে চলে যাবে কিনা, কিন্তু চলে গেলে ওরাও খেপাতে-খেপাতে পিছন-পিছন যাবে, অন্তত কিছু দূর তো যাবেই। তা ছাড়া ওদের ভয়ে চলে যাওয়াটাও টুকাইয়ের খুব একটা মনঃপূত হচ্ছে না। তাই তাতাইয়ের মতো ও-ও চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ কী হল, তাতাই দাদার হাত ছেড়ে মাটি থেকে একটা ঢিল তুলে ওদের দিকে ছুড়ে মারতে গেল। টুকাই সঙ্গে-সঙ্গে ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল তাই রক্ষে, না হলে এর ফল যে কী হত সে টুকাই খুব ভালই জানে। সত্যি কথা বলতে, ওর নিজেরও কি ইচ্ছে করছে না ওদেরকে কয়েক ঘা দিতে? এ রকম মারামারি করার ইচ্ছে মোটেই ভাল নয়, সে ও জানে, কিন্তু এক-এক সময়ে সহ্য করা যায় না। তাতাই ওদের কী ক্ষতি করেছে যে সব সময় ওকে খেপিয়ে যাবে?

"মার না মার, কী রে মারবি না? ভয় পাচ্ছিস? তোর দাদাও তো আমাকে মেরেছিল, কিন্তু তার পর আমাদেরই হাতে যা পিটুনি খেল! তার ওপর আবার কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকল! কী রে, তুই মারবি না?" নন্দন খ্যাক-খ্যাক করে হেসে বলে উঠল।

টুকাই তাতাইকে জাপটে ধরে রেখেছে।

"ভাগো সব, ভাগো হিঁয়াসে! আজ তোমাদের মজা আমি দেখাব। আজ আমি হেডমাস্টার মশাইকে সব সচ বলব। তোমরা কী করো সব বলে দেব। তখন তোমরা দেখবে কী হয়।"

টুকাই মুখ তুলে দেখল ঝগড়ু কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে। এই রে, তাতাই আবার ভয় পাবে না তো! ঝগড়ু অবশ্য ওখানে দাঁড়াল না। বলতে গেলে ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে মাঠে নিয়ে গেল আর নিজে না-খেলে মাঠের এক ধারে বসে রইল।

"তুই যদি ওরকম ভিতু-ভিতু হয়ে থাকিস তা হলে ওরা তোকে খেপাবে ভাই, সব সময় খেপাবে। তুই আর স্কুলেও যেতে পারবি না। বল না তুই কেন এত ভয় পাস?" তাতাই একটু শান্ত হলে টুকাই জিজ্ঞেস করল।

তাতাই চুপ, কিচ্ছু বলল না।

"সে দিন লাঠিদাদা কী বললেন শুনলি না? এই বটের কাছে ভয়ের কথা বললে ভয় চলে যায়। তার পর তো লাঠিদাদা আছেনই, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সবাইকে ঠান্ডা করে দেবেন। বল না তুই কী দেখে অত ভয় পাস? ঝগড়ুদাদাকেও ভয় পাস, অথচ ঝগড়ুদাদা কত ভাল। আজ ঠিক সময়ে এসে না পড়লে কী হত বল তো? ওরা সহজে যেত এখান থেকে? আচ্ছা আমাকে না বলিস, বটের কাছে গিয়ে বল। আমি শুনব না।"

"মা'র কাছে যাব, আমি এক্ষুনি মা'র কাছে যাব," তাতাই উঠে পড়ল।

টুকাইও এক লাফে উঠল, তাতাইয়ের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাল, "নিয়ে যাব না আমি তোকে মা'র কাছে। তুই যদি না-বলিস, কেন তুই এত ভয় পাস তা হলে এখানেই তোকে একা ফেলে রেখে চলে যাব।"

দাদার এ রকম মূর্তি তাতাই কোনওদিন দেখেনি। ডুকরে কেঁদে উঠল ও।

“কাঁদ, যত খুশি কাঁদ, ছিঁচকাদুনে ছেলে কোথাকার! আমি তোকে কিছুতেই নিয়ে যাব না মা’র কাছে। থাক তুই এখানে পড়ে আর বসে-বসে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদ। আমি নন্দনদের ডেকে আনছি, ওরা এসে তোকে আরও খেপাক। খুব ভাল হবে, খুব মজা হবে।”

তাতাই কেঁদেই যাচ্ছে। টুকাই আবার বলল, “কী রে বলবি? কী হয়েছিল সেদিন? মা কত জিজ্ঞেস করেছে তোকে, তুই বলিসনি। তোর জন্যে আমাকে মার খেতে হয়েছে ওই নন্দনদের কাছে, মামা কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সবাই দেখে হেসেছে। এ সব কিছু হয়েছে তোর জন্যে, শুধু তোর জন্যে। তুই আমার ভাই নোস। তুই খুব বাজে,” বলতে-বলতে টুকাইও প্রায় কেঁদে ফেলল।

“ওরা যে ওই দাদাটাকে মেরে ফেলল, আমি দেখেছি, আমার খুব ভয় করে,” কাঁদতে-কাঁদতে তাতাই বলল।

টুকাই কিছু ক্ষণ কোনও কথা বলতে পারল না। এ সব কী বলছে তাতাই? কে মেরে ফেলল? কাকেই বা?

“কোন দাদা? কারা মারল?” বলতে গিয়ে টুকাইয়ের গলা কেঁপে গেল।

“জেঠু আর বান্টিদাদা। আর-একটা দাদাকে খালি জিজ্ঞেস করছিল, ‘বল কোথায় রেখেছিস, বল।’ তার পর একটা এ রকম দড়ি দিয়ে গলায় কী করল, দাদাটা পড়ে গেল। বান্টিদাদা বলল, ‘মরে গেছে!’ আমার খুব ভয় করছিল, আমি ঘরে চলে এলাম। এখনও ভয় করছে আমার। আমি মা’র কাছে যাব, আমাকে ফেলে চলে যাস না,” তাতাই কাঁদতে-কাঁদতে টুকাইকে জড়িয়ে ধরল।

জেঠু আর বান্টিদাদা! বান্টিদাদা তো জেঠুর কাছে কাজ করে, অনেক দিন।

“তুই এ সব কী করে দেখলি?”

“আমি খেলছিলাম। জেঠুদের পেছনের দরজাটা একটু ফাঁক ছিল। আমি খরগোশ দেখতে গেছিলাম...”

“তুই সেই খরগোশ দেখতে গেছিলি! মা কত বার বারণ করেছে জেঠুদের বাড়িতে যেতে, তাও তুই গেছিলি!”

টুকাইয়ের জেঠুর বাড়িতে একটা বড় খাঁচায় তিন-চারটে খরগোশ আছে। তাতাই খুব ভালবাসে ওদের দেখতে। পিছনের দরজাটার ও পাশেই খাঁচাটা রাখা থাকে। তাতাই মাঝে-মধ্যে দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে চলে আসে। মা অনেক বার বারণ করেছেন, কিন্তু তাতাই শোনে না। সে দিনও তার মানে উঁকি মারতে গিয়ে এই সব দেখে ফেলেছে। এখন আর তাতাইকে কী বলবে, টুকাইয়ের মনে হচ্ছে ওরই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে! তাতাই শেষ পর্যন্ত এ সব দেখে ফেলল!

“আমার খুব ভয় করছে,” তাতাই বলল।

“ভয় কী? আমরা তো আর এখন ওখানে থাকি না। তা ছাড়া এত দিনে জেঠু আর বান্টিদাদাকে নিশ্চয়ই পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে,” কাঁপা গলায় টুকাই চেষ্টা করল ভাইকে সান্ত্বনা দেওয়ার।

তাতাই মুখ তুলে দাদাকে দেখল।

“হ্যাঁ ধরে নিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে গেছে,” টুকাই নিজেও চেষ্টা করছে মনে সাহস আনার, ভয় পেতে নেই, ভয় পেলে বুদ্ধিও পালায়, “আর আমাদের কিসের ভয়? আমরা তো কিছু করিনি। তুই একদম আর ভয় পাবি না তো ভাই। আর এই কথাটা তুই আগে মাকে বলিসনি? কী বোকা তুই! মাকে বললেই তো আর ভয় থাকত না।”

“এখন মাকে বলব?”

“আমি বলব। তোকে আর বলতে হবে না। তুই বটের কাছে বললি তো, এ বার সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই কিন্তু আর ভয় পাবি না। এ বার স্কুলে যাবি তুই। তুই স্কুলে যাস না, এ রকম ভয়ে-ভয়ে থাকিস, মা’র কত দুঃখ হয় জানিস? আর এ রকম করিস না ভাই,” তাতাইকে আদর করতে-করতে বলল টুকাই।

বলল বটে যে ও মাকে বলবে, কিন্তু কী বলবে, কতটুকু বলবে কিছুই বুঝে পাচ্ছে না। তাতাই যা দেখেছে তা কল্পনা করেই ওর ভয় করছে।

এত ক্ষণ খেয়াল করেনি, এখন দেখল চার দিক থেকে কালো মেঘ এসে আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছে।

“বৃষ্টি আসছে তাতাই, তাড়াতাড়ি বাড়ি চল,” টুকাই বলল।

“আমি আগে-আগে যাচ্ছি টুকাইবাবু, ছাতা নিয়ে আসছি, এক্ষুনি বারিষ নামবে,” পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে ঝগড়ু বেরিয়ে গেল।

টুকাই আড় চোখে তাতাইয়ের দিকে তাকাল, নাহ এখন আর ভয় পায়নি, নাকি ঝগড়ুকে খেয়ালই করেনি?

ঝগড়ু ছাতা নিয়ে ফেরার আগেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। অবশ্য ঝগড়ুকে আর বাড়ি অবধি যেতে হয়নি, মামা তখন বেরিয়ে পড়েছেন ওদের নিয়ে আসতে। বাড়ি যখন ঢুকল তখন দু’জনেই ভিজে একশা!

আজ শুধু মামা নন, পিসিদিদুন আর মাও খুব বকলেন টুকাইকে। টুকাই একটা কথাও বলল না। কী করে বলবে কেন এত দেরি হল!

রাতে তাতাইয়ের জ্বর এল। মামা ছুটলেন ওষুধ আনতে। মা খুব রেগে আছেন। এ সব যে টুকাইয়ের জন্যেই সে ব্যাপারে উনি নিঃসন্দেহ। এমনকি, পিসিদিদুন পর্যন্ত বললেন, “তুমি তো এ রকম ছেলে নও দাদুভাই! তা হলে আজ কী হল? আমি অত করে বলে দিলাম মেঘ করছে দেখলেই ফিরে আসবে, তাও তুমি শুনলে না? আজ কি তুমি খেলতে-খেলতে ভাইয়ের কথা ভুলেই গেছিলে? ভাইয়ের চোখ-মুখ অমন ফোলা-ফোলা কেন ছিল? কী হয়েছিল দাদুভাই?”

টুকাই নিরুত্তর।

“কী আবার হবে? ওই তুমি যা বললে,” মামা বললেন, “খেলছিল, খেলতে-খেলতে আর কোনও খেয়ালই ছিল না। ওই ঝগড়ুটাও জুটেছিল তো। আর তাতাই বোধ হয় বসে-বসে কেঁদে যাচ্ছিল। কী টুকাই, তাই তো?”

টুকাই এখনও কোনও উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা’র আর সহ্য হল না। ঠাস করে এক চড় মেরে দিলেন টুকাইকে, “এত বার করে পিসিদিদুন জিজ্ঞেস করছেন, মামা জিজ্ঞেস করছেন, ছেলের মুখে কোনও শব্দ নেই! বড়রা কিছু জিজ্ঞেস করলে এ রকম উত্তর না-দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়? এই তোমার শিক্ষাদীক্ষা? এই শিখিয়েছি আমি তোমাকে? এ রকম অসভ্যতা করতে?”

“মারছ কেন? দাদাকে মারছ কেন?” তাতাই বিছানায় উঠে বসেছে।

মা অবাক হয়ে তাতাইয়ের দিকে তাকালেন। এতটা স্বাভাবিক স্বরে ও শেষ কবে কথা বলেছে?

“তোকেও বলিহারি মিঠু, একেবারে চড় কষিয়ে দিলি!” পিসিদিদুন বললেন।

“এখনও কিছুই করিনি ছোটপিসি, এবার দেখবে মার কাকে বলে,” মা আবার রেগে উঠলেন।

“কথার উত্তর দিবি, নাকি...”

“ভাই আজ সব বলেছে মা, সব,” মা’র কথা শেষ না-হতেই টুকাই বলল। ও ভেবেছিল মাকে আলাদা করে করে সব বলবে, মামা আর পিসিদিদুনের সামনে নয়, তাতাইয়ের সামনে তো নয়ই, কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই।

“কী বলেছে?”

“ও কেন ভয় পায় সে কথা বলেছে,” টুকাইয়ের মনে হল ওর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

মা এক মুহূর্ত থমকালেন, যে কথা উনি কত জানার চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি, আজ তা টুকাই জেনে গেল!

“বল কী বলেছে? চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নাকি আবার সাধ্যিসাধনা করতে হবে তোমাকে?” মা বললেন।

“বলছি মা, একটু দাঁড়াও,” টুকাই তাতাইয়ের কাছে গেল, বলল, “আমরা ওঘরে যাচ্ছি, তুই যা-যা বলেছিস সব বলব মাকে। তোকে আর ও সব শুনতে হবে না, তাই ওঘরে গিয়ে বলছি। তুই ও সব একদম ভুলে

যা। ভুলে যাবি তো?”

তাতাই ঘাড় নাড়ল, বলল, “ওদের পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, তাই না?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দুষ্টু লোকদের তো পুলিশে ধরবেই।”

“এ আবার কী হেঁয়ালি? কাকে পুলিশে ধরবে?” মামা বেশ বিরক্ত।

“দেখ টুকাই, ভাল কথায় বলবি কিনা বল, না হলে তোর কপালে আজ দুঃখ আছে,” মা'র রাগ এখনও পড়েনি।

“বলছি তো বলব, ও ঘরে এসো না!” টুকাই মিনতি করল।

“কী হচ্ছে কী মিঠু? যা না তোরা ও ঘরে, দেখ না কী বলে,” পিসিদিদুন ধমকে উঠলেন, “আমি আমার দাদুভাইয়ের কাছেই রইলাম। আমাদের দু'জনের অনেক কথা আছে। সে সব তোমাদের শোনার নয়, তাই না দাদুভাই?”

টুকাইয়ের মুখে সব কিছু শুনে মা আর মামা বাকশক্তিরহিত।

“এ কী বললি তুই! তাতাই এ সব দেখেছে! আর সেই জন্যেই এত ভয় পায়!” বেশ কিছু ক্ষণ পরে মা বললেন।

মামা তখনও চুপ।

“মা, আমি তো ভাইকে বলেছি পুলিশ ওদের ধরে নিয়ে গেছে, কিন্তু সত্যি-সত্যি ধরেছে কিনা তো জানি না। এখন কী হবে মা? আমারও তো খুব ভয় করছে,” টুকাই বলল।

“ওরা বোধ হয় বোঝেনি যে তাতাই সব দেখেছে, সেটাই যা রক্ষে। তাই আর ভয় নেই। তবে এ সব কথা আর কেউ যেন জানতে না পারে। কখনও কাউকে বলবি না, তাতাইকেও বলতে বারণ করবি, বুঝলি?” মামা এত ক্ষণে কথা বললেন, তার পর মা'র দিকে ফিরে বললেন, “প্রথমেই যদি চলে আসতিস, এখানে তা হলে আর এ সব কিছু হত না। কিন্তু আমার কথা তো কানেই তুললি না। ওদের চালচলন তোর একেবারে পছন্দ হত না, কিছু গোলমাল চলছে মনে হত, কিন্তু তাও ওখানে পড়ে রইলি! মাঝখান থেকে ছেলেটা ভুগছে!”

“ওদের ব্যবসায় কিছু গোলমাল আছে মনে হত, কিন্তু তাই বলে এই সব!” মা শিউরে উঠলেন।

“এখন আর ভেবে কোনও লাভ নেই। এখন এদের দু'জনকে সামলে রাখতে হবে। যা বললাম টুকাই, ভুলেও এসব কথা কাউকে বলবি না। ওই ঝগড়ুটার সঙ্গে তো আবার তোর যত ভাব, যত কথা, ওকেও কিন্তু বলে ফেলিস না। এসব কথা ছড়িয়ে গেলে বিপদ হতে বেশি ক্ষণ সময় লাগবে না,” মামা বললেন।

মা টুকাইকে বুকে টেনে নিলেন, বললেন, “আমি এত দিনে যা পারিনি আজ আমার টুকাই তাই করেছে আর আমি কিনা ওকেই মারলাম!”

চড় খেয়ে টুকাই কাঁদেনি, কিন্তু এখন দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

॥ ১১ ॥

সারা গ্রামে একেবারে হুলস্থুল পড়ে গেছে। আর এই হুলস্থুল ফেলেছে কমল। ওদের গৃহদেবতা, অর্থাৎ যে সাপের মূর্তিকে মা মনসার প্রতীক মেনে ওরা পুজো করত, সেই মূর্তি খুঁজে পাওয়া গেছে। আরও কিছু চুরি যাওয়া জিনিসের সঙ্গে নাকি ও মূর্তিও পাওয়া গেছে। থানা থেকে খবর এসেছে। কমল কলকাতায় যাবে মূর্তি আনতে।

“আর এই বার প্রমাণ হবে কে চোর। ওই বড় তরফই তো ওই সব খবরের কাগজের লোকজনকে পাঠিয়েছিল। বেড়া দেওয়া নিয়ে গোলমাল হল না? আমি কিছু বুঝি না নাকি? তারা এল, হাজারটা প্রশ্ন করল! বাপ রে বাপ, সে কী জেরা! খচ-খচ করে গুচ্ছের ফটো তুলল, তার পর গিয়ে বড় তরফের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করল। সে ফটো, সে লেখা খবরের কাগজে বেরোনোর পর-পরই তো চুরি হল। দাঁড়াও না, আগে ভালয়-ভালয় মাকে ঘরে নিয়ে আসি, আবার পিতিষ্ঠে করি, তার পর সব দেখব। বড়লোক বলে যা খুশি তাই? সইবে না, সইবে না, ধম্মে সইবে না,” কমল জনে-জনে বলেছে।

সবাই অপেক্ষা করছে কখন মূর্তি আবার গ্রামে ফিরে আসবে। এলেই সবাই দেখতে ছুটবে।

“আমি ভি যাব। তুমি যাবে না টুকাইবাবু?” ঝগড়ু জিজ্ঞেস করেছে ওকে।

“মামা যেতে দেবেন কি না জানি না,” টুকাই বলল।

“তাতাইবাবু এখন কেমন আছে?”

“ভাল আছে, আর জ্বর আসেনি।”

“আচ্ছি বাত। এখন ওই ডর চলে গেলে অউর ভি আচ্ছা,” বলল ঝগড়ু।

তাতাই তো সব বলল, কিন্তু ঝগড়ুকে দেখে কেন ভয় পায় তা তো বলল না, টুকাইয়ের হঠাৎ মনে হল। ও কথা কি আর তাতাইকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে? তাতাই যেন মনে হচ্ছে স্বাভাবিক হচ্ছে। মা-ও তাই বলেন। বাড়ি ফিরে বরং মাকেই বলবে জানতে।

“এ বহুত আচ্ছা হুয়া। শুভদের বহুত দুখ ছিল চোরি হওয়াতে, এখন আচ্ছা লাগবে,” ঝগড়ু এখনও সেই ভাবনাতেই মশগুল।

“শুভ আবার কে?” টুকাই জিজ্ঞেস করল, “চুরি তো হয়েছে কমলকাকুদের বাড়ি থেকে।

“শুভ তো উসকাই ভাই। আমার দোস্ত। ও ভি আচ্ছা হয়ে গেছে, এখন সিলাই-মিলাই করে, আর মজুমদারবাড়িতে যায় না, চোরি ভি করে না...” বলেই জিভ কাটল ঝগড়ু, বলতে-বলতে ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছে।

“কমলকাকুর ভাই শুভ? সে মজুমদারবাড়িতে গিয়ে চুরি করত?” টুকাই অবাক।

“হাঁ। ওরা ভাবে ওই মূর্তি মজুমদাররাই চোরি করিয়েছে, ইস লিয়ে... শুভ বোকা আছে, এক নম্বরের বোকা আছে। ভাবত মূর্তি চুরি করে ওরা ও বাড়িতেই রেখে দিয়েছে। কিতনে বার বলেছি ওকে এয়সা নেই হোতা, মুমকিন নেহি, লেকিন ও শুনত না। এক বার একটা ঘটি নিয়ে আসল, এক বার একটা ইস্টিলের গেলাস আর আখরি বার ওই বাক্সটা। মজুমদারবাড়িতে ওই সব দু'-চারটে সামানই আছে। এখানে ওখানে আলতু-ফালতু চিজ় জড়ো করা। ওই বাক্সটা তো সেখান থেকেই এনেছে। কে খেয়াল করে?”

“তাও এ অন্যায়। তোমার বন্ধুকে বলো ওসব ফেরত দিয়ে দিতে,” টুকাই বলল।

“আমি বলেছি। ঘটি আর গেলাস দিয়ে দিবে বলেছে, কিন্তু ও বাক্স দিবে না বলছে আর ও ছেঁড়া কিতাবও না।”

এ সব কথাও কি মাকে বলা উচিত? হাজার হোক চুরিই তো।

“মা, আমি কমলকাকুদের বাড়িতে যাব, মা-মনসার মূর্তি দেখতে?” বাড়ি ফিরে টুকাই মাকে জিজ্ঞেস করল।

“পিসিদিদুন যদি যান তা হলে যেয়ো,” মা বললেন।

“মা, এই দেখো ট্রেন, আমার ট্রেন,” তাতাই খুশিতে চেঁচাতে-চেঁচাতে ঘরে ঢুকল, পিছন-পিছন পিসিদিদুন।

“এ কী!” মা ট্রেনটা দেখেই আঁতকে উঠলেন। এটা সেই টুটুনের ট্রেনটা, যেটা আলমারির ভিতর থাকে।

“অমন করে দেখছিস কী? অন্তু নিজে বের করে ওকে খেলতে দিয়েছে,” পিসিদিদুন বললেন।

“দাদা!” মা'র তখনও বিশ্বাস হল না।

“হ্যাঁ রে বাবা, বিশ্বাস না-হলে যা জিজ্ঞেস কর গিয়ে, সে তার ঘরেই আছে।”

“বিশ্বাস হবে না কেন, তুমি বলছ যখন,” মা অপ্রস্তুত স্বরে বললেন।

টুকাই মামার ঘরে উঁকি দিল। মামা ওঁর পছন্দের ইজ়িচেয়ারে আধশোয়া, চোখ বন্ধ, চোখের কোণ ভেজা। আজ টুকাইয়ের একটুও ভয় করল না, বরং মামার কাছে যেতে, মামার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল। যদিও কী কথা বলবে ভেবে পেল না, থ্যাঙ্ক ইউ বলা যায় কি? টুকাই বুঝে উঠতে পারল না।

“টুকাই,” টুকাই চলে আসছিল, ডাক শুনে দাঁড়াল। মামা ডাকছেন।

ও পায়ে পায়ে মামার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মামা আশ্চর্য নরম স্বরে বললেন, "কিছু বলবি?"

"আমি কমলকাকুদের বাড়ি যাব মা-মনসার মূর্তি দেখতে? সবাই যাবে বলছে," আর কী বলবে ভেবে না-পেয়ে টুকাই এটাই জিজ্ঞেস করল।

"আগে মূর্তি আসুক, এই তো কমল সবে গেল। বেশ, যাস না হয়," মামা এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন।

তাতাই আবার ট্রেন নিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে এ ঘরে। ট্রেন পেয়ে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। তাতাইয়ের পিছন-পিছন পিসিদিদুনও এলেন। মামার দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে তাতাই বলল, "ট্রেনটা খুব ভাল। আমি গুড বয় হয়ে খেলা করব, ভাঙব না। টুটুনদাদা এলে দিয়ে দেব।"

"তুমি খেলা করো, তুমি খেললেই টুটুনদাদারও খেলা হবে," মামা বললেন।

তাতাই আবার ট্রেন চালাতে-চালাতে ঘর থেকে চলে গেল।

"কত কাল পরে ছেলেটা আবার স্বাভাবিক হল!" পিসিদিদুন বললেন, "এখন এ রকম থাকলেই হয়!"

"তা সত্যি। এখানে এসে পর্যন্ত ওকে এ রকম করে হাসতে, খেলতে দেখিনি। আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

পিসিদিদুন গালে হাত দিয়ে খুব অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, "ও মা! আমি কী বললাম আর তুই কী বুঝলি! আমি কি তাতাইয়ের কথা বলেছি নাকি! আমি তো এ বাড়ির সবচেয়ে বড় ছেলেটার কথা বলছি। অন্তু রে অন্তু, চিনিস না?"

মামা আড়চোখে এক বার টুকাইকে দেখে আবার গম্ভীর-গম্ভীর মুখ করে বললেন, "আহ ছোট পিসি, কী যে বলো তুমি তার ঠিক নেই!"

টুকাইও আর দাঁড়াল না, ফিক করে হেসে পালাল।

কত দিন, কত দিন পরে এত ভাল লাগছে! শেষ কবে এ রকম ভাল লেগেছিল?

টুকাই দেখল মা-ও তাতাইয়ের সঙ্গে ট্রেন নিয়ে খেলছেন। মা'র মুখটাও কী সুন্দর হাসি-হাসি!

"মামা যা বলেছেন, মনে আছে তো? ঝগড়ুকে কিছু বলিসনি তো?" টুকাইকে জিজ্ঞেস করলেন মা।

"না," টুকাই বলল, "মা জানো ঝগড়ুদাদা কী বলে, বলে 'কুছ বুরা হলে আচ্ছা ভি হয়, হতেই হয়, এই নিয়ম আছে।' সত্যি মা, তাই না? তাতাই ঠিক হয়ে যাচ্ছে, না মা?"

"আস্তে-আস্তে বোঝা যাবে। কেন যে ঝগড়ুকে দেখে ভয় পায় কে জানে!" মা বললেন।

"ঝগড়ুদাদা ওই শার্টটা কেন পরে? ওটা দেখলে আমার ভয় করে," তাতাই খেলতে-খেলতেই বলল, বোঝা গেল মা'র কথা ও শুনেছে।

"কোন শার্টটা বাবা? আর সেটা দেখলে তোমার ভয় করে কেন?" মা জিজ্ঞেস করলেন।

"ওই যে লাল-নীল রঙের শার্টটা। বান্টিদাদা ও রকম শার্ট পরেছিল," বলতে-বলতেই তাতাইয়ের ফুখ আবার ফ্যাকাসে হতে শুরু করল।

মা তাড়াতাড়ি ওকে কাছে টেনে নিলেন, "ভয় পায় না বাবা, ভয় পেতে নেই। তুমি ও সব ভুলে যাও।"

"তুমি দাদাকে বারণ করো, ও রকম করলে আমার ভয় করে," তাতাই আবার বলল।

"কী করেছিস টুকাই? কী বলছে ভাই?"

টুকাই কিছুই বুঝতে পারল না।

"এ রকম করছিল," তাতাই হাতের ভঙ্গিতে দেখাল।

"ওহ ওই সে দিন! ওই বটের তলায়? আমি একটা দড়ি নিয়ে দু'হাতে জড়াচ্ছিলাম, তাতেই তুই..."

মা ইশারায় টুকাইকে কথা শেষ করতে দিলেন না, বললেন, "তুই খুব দুষ্টু হয়ে গেছিস আজকাল। কেন ও রকম করছিলি? কোথা থেকে দড়ি পেলি? নিশ্চয়ই রাস্তা থেকে তুলেছিস? কত বার বারণ করেছি না, রাস্তার জিনিসে হাত দিবি না?"

তাতাই মা'র কোলে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল, সেই ভাবেই বলল, "দাদাকে বেশি বোকো না মা, একটু-একটু বকো। দাদা ভাল।"

মা হেসে ফেললেন, "তাই বুঝি? দাদা ভাল?"

॥ ১২ ॥

মূর্তি নিয়ে গ্রামে যত উত্তেজনা ছিল, মূর্তি ফিরে আসার পর সকলের মন ঠিক ততটাই খারাপ। কমল তো কপাল চাপড়ে হাহাকার করছে। সাপের চোখে দুটো মূল্যবান পাথর বসানো ছিল, সে দুটো নেই। কেউ উপড়ে নিয়েছে।

"আরও কিছু চোরাই জিনিসের সঙ্গে এটা পড়ে ছিল। বোধ হয় এই কারণেই বিক্রি হয়নি। যে লোকটা ধরা পড়েছে সে একটা অদ্ভুত কথা বলেছে। বলেছে নাকি অনেক চেষ্টা করেও আর কোনও পাথর চোখে বসানো যায়নি। এখনও আসল পাণ্ডারা ধরা পড়েনি, তবে আমরা চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে বড় কোনও চোরাচালান চক্র এর সঙ্গে জড়িত," পুলিশ বলেছে।

টুকাই গিয়ে মূর্তি দেখে এসেছে। দেখে ওরও মন খারাপ। কী রকম বিচ্ছিরি লাগছে মূর্তিটাকে! যত ক্ষণ না আবার পাথর বসানো হচ্ছে, তত ক্ষণ নাকি এ মূর্তিকে আর পুজো করা যাবে না।

"যদি বা ফিরে পেলাম, তা-ও এই হল!" কমল সবাইকে মূর্তি দেখাচ্ছে আর এই একই কথা বলছে, "আর ও পাথর কেনার ক্ষ্যামতা কি আমার আছে! কত দামি পাথর ছিল! পদ্মরাগ মণি, আমার ঠাকুরদা বলে গেছিলেন। সাধে বড় তরফের এত রাগ মূর্তি আমার ঠাকুরদাকে দিয়ে দেওয়ায়! হায় হায়, এ কী হল!"

ঝগড়ুও ছিল ওখানে। পিসিদিদুনকে দেখে বলল, "ঠাগমা কুছ কামকাজ দাও না আগের মতো। বড় পরেশানিতে আছি।"

পিসিদিদুন ঝগড়ুর আপাদমস্তক দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, "দিতে পারি, কিন্তু এক শর্তে। ওই লাল-নীল কিম্ভূতকিমাকার জামা, যেটা তোমার ফুফা তোমাকে দিয়েছে সেটা পরে যাওয়া চলবে না। আর চুল-টুল আঁচড়ে ভদ্র-সভ্য হয়ে যাবে। ও রকম করে যাও বলেই তোমাদের হেডমাস্টার মশাই চটে যান।"

ঝগড়ু হাঁ করে পিসিদিদুনের শর্ত শুনল, তার পর এক গাল হেসে বলল, "এই বাত? তুমি যা বলছ আমি তা-ই করব। তাতাইবাবু এখন ঠিক হয়ে গেছে, আমি জানি, তাতাইবাবুর আর ডর লাগে না।"

"তাতাইবাবু ঠিক হবে না কেন? ছোট ছেলেদের অমন কত কিছু হয়, আবার ঠিকও হয়ে যায়। এই তো আমার দাদুভাই আবার স্কুলে যাবে," পিসিদিদুন বললেন।

"হাঁ হাঁ জরুর যাবে, জরুর যাবে।"

"শোন, কাল সক্কাল-সক্কাল আসবি। বাগানটা পরিষ্কার করবি, বড় আগাছা হয়েছে। আর যা বললাম মনে রাখবি, না হলে কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই দেব না। আমার কথা শুনে চললে তোদের হেডমাস্টার মশাইকে বলে ইস্কুলের কাজকর্মও জুটিয়ে দিতে পারি।"

মামা আলমারির সব খেলনাই তাতাইকে দিয়ে দিয়েছেন। তাতাই সে সব নিয়ে মশগুল। নিজের পুরনো খেলনাগুলোর দিকে আর ফিরেও তাকাচ্ছে না। টুকাই এই ফাঁকে মার্বেলের কৌটো নিয়ে বসেছে। অগ্নিশিলা দুটো বের করে ঘষল। নাহ, আগুন আর জ্বলে না। চিড়িক করে এতটুকু ফুলকিও বেরোয় না, ঝিকিমিকি আলো তো দূরের কথা। ও তো নিজের লেখাপড়া ঠিক মতো করে, ভাইয়েরও খেয়াল রাখে, তা হলে? বটুদাদু কি ভুল বললেন?

অগ্নিশিলা দুটো হাতে নিয়েই বসেছিল। আগুন না-জ্বললেও জিনিস দুটো খুব সুন্দর। আচ্ছা, ওই মূর্তির চোখ দুটোও কি এমন সুন্দর ছিল? সে-ও তো লাল রঙের ছিল, পিসিদিদুন বলেছেন। এই দুটো ওই মূর্তির চোখে বসানো যাবে? ভাবা মাত্রই ছটফট করে উঠল টুকাই, না না এ কী ভাবছে ও? এ তো অগ্নিশিলা, এ কী যে সে জিনিস যে ও মূর্তির চোখে বসানোর জন্যে দিয়ে দেবে? আর দিয়ে দিলেই বা কী হবে? সে তো আবার ফিরেই আসবে ওর কাছে যেমন মংলুর কাছে এসেছিল। টুকাই তাড়াতাড়ি ও দুটো কৌটোয় ঢুকিয়ে কৌটোটা যথাস্থানে রেখে এল।

রাতে শুয়ে পড়ে মনে হল, মাকে এ সব কথাও না-বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? তাতাই যদি সে দিনই মাকে সব কথা বলে দিত তা হলে আর এ রকম হয়ে যেত না। মাকে বোধ হয় সব বলাই উচিত হবে। এ যদি সত্যিই অগ্নিশিলা হয় আর ওরই হয় তা হলে বললে তো কোনও ক্ষতি হবে না, দিয়ে দিলেও ফিরে আসবে। সাত-পাঁচ ভেবে টুকাই মাকে সব বলল। তাতাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

"এ ছেলেদের নিয়ে আমি কী করব! কেউ কিচ্ছু বলে না!" মা শুয়ে পড়েছিলেন, টুকাইয়ের কথা শুনে উঠে বসলেন।

অগ্নিশিলা দেখে মা'র কপালে ভাঁজ পড়ল, তিনি মামাকে দেখালেন।

"আমার মনে হচ্ছে এ বার পুলিশকে সব বলা উচিত। তাতাই যা দেখেছে তার সঙ্গে এর কোনও যোগ থাকলেও থাকতে পারে," মামা বললেন।

যা করার মামাই করলেন। পুলিশ তো ওই চোরাকারবারিদের খুঁজছিলই, এখন তাতাই যা দেখেছে সে সব জেনে আরও কিছু সূত্র পেল। ক'দিন পরে জানা গেল টুকাইয়ের জেঠু ওই চক্রের সঙ্গে জড়িত। যে খুন হয়েছে সে-ও ওদের দলেরই এক জন। ওই মূর্তি থেকে পদ্মরাগ মণি দুটো উপড়ে নিয়েছিল। ইদানীং ওর খুব যাতায়াত শুরু হয়েছিল টুকাইয়ের জেঠুর বাড়িতে। সবাই জানত সে-ও টুকাইয়ের জেঠুর ব্যবসার কর্মচারী। আরও কয়েকটা চোরাই জিনিসের সঙ্গে সাপের মূর্তিও ছিল ওর জিম্মায় আর টুকাইয়ের জেঠুর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও ওরই ছিল। তাই ওকেই টুকাইয়ের জেঠুর সন্দেহ হয়। তত ক্ষণে অবশ্য বিপদ বুঝে সে ও দুটো রেখে দিয়েছিল টুকাইদের মার্বেলের কৌটোয়, নিজের কাছে রাখা নিরাপদ হবে না, বুঝেই। তাতাই যেখানে সেখানে ও কৌটো ফেলে রাখত। সে দিন রিকি, রিঙ্কি, টুকাইয়ের জেঠিমা কেউই বাড়ি ছিল না। টুকাইয়ের জেঠু আর বান্টি দু'জনে মিলে লোকটাকে জেরা করছিল। মেরে ফেলার ভয় দেখাতে-দেখাতে সত্যিই মেরে ফেলেছিল। এত দিনে সে খুনের কিনারা হল, চোরাচালান চক্রের সবাই ধরাও পড়ল। তবে মজুমদারবাড়ির বড় তরফ বা ছোট তরফ কারও সঙ্গেই এই চক্রের কোনও যোগ নেই। মামা অবশ্য অনুরোধ করেছেন যাতে টুকাই-তাতাইয়ের নাম সামনে না আসে। ওদের যদি কোনও বিপদআপদ হয়, মামা এই ভয়ই সব সময় পান।

পদ্মরাগ মণিও যথাস্থানে ফিরে গেছে। আবার ঘটা করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সারা গ্রামের মানুষ তা দেখেছে। টুকাইও দেখতে গেছিল। যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরে গেছে, এ ভাল কথা, কিন্তু ও যে অগ্নিশিলা পায়নি— এ ভেবে টুকাইয়ের খুব মন খারাপ হয়েছে। তা হলে আর আগুন জ্বালাবে কী করে?

"এক বাত আছে টুকাইবাবু," ঝগড়ু এক দিন কাজ করতে এসে বলল।

"কী?"

"আমার দোস্ত তার ভুল বুঝেছে। বলছে সব ফেরত দিবে। ছিদামচাচার সঙ্গে ওর খুব ভাব আছে। বলছে এক দিন গিয়ে কায়দা করে সব রেখে আসবে।"

"কী রেখে আসবে? কার কথা হচ্ছে?" মামা কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টুকাই বা ঝগড়ু কেউই টের পায়নি।

ঝগড়ু মাথা চুলকোচ্ছে আর টুকাইয়ের মুখ নিচু। এখন কী হবে? মামা সব কথা জানলে যে আর রক্ষে নেই! এই সময়েই মামাকে এখানে আসতে হল!

"কী হল উত্তর দিচ্ছিস না যে? কী বলছিলি টুকাইকে?" মামা ধমকে উঠলেন।

ঝগড়ুর আর কোনও উপায় রইল না, সব খুলে বলল।

"টুকাইবাবু আগেই সব ফেরত দিতে বলেছিল। বলেছিল ইয়ে সহি নেহি। আমি ভি বুঝিয়েছিলাম, কিন্তু ও শুনছিল না। রাতে-রাতে ও বাড়ি যাওয়াটা নেশা মতো হয়ে গেছিল," ঝগড়ু বলল।

“যা, এখনই ওকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে আর জিনিসপত্র সব নিয়ে আসতে বলবি,” মামা বললেন।

হাই স্কুলের হেডমাস্টারমশাই এসেছেন, মৃণাল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

“একটা ভুল বোঝাবুঝির বোধ হয় শেষ হবে আর সেই সঙ্গে এক জন তার দোষও স্বীকার করবে। এই শুভ বল, সব বল,” মামা বললেন।

শুভ আমতা-আমতা করে সব বলল আর জিনিসগুলোও দিল।

“তুমি ওই মূর্তি খুঁজতে ও বাড়িতে যেতে? মূর্তি চুরি করলেও কি আর ওখানে কেউ রেখে দিত? তোমার কথা শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না,” বললেন মৃণাল।

“মূর্খ আর কাকে বলে! মাঝখান থেকে এই সব টুকটাক জিনিস সরানো অভ্যেস হয়ে গেল। এই দেখুন একখানা পেতলের তোবড়ানো ঘটি, একখানা স্টিলের গ্লাস আর এই বাক্সটা তুলে এনেছে। আপনার কাছেই নিয়ে এলাম। আপনি যদি মনে করেন তো ওঁদের খবর দিন আর যদি মনে করেন ক্ষমা করে ছেড়ে দেবেন তো তা-ই দিন। যা আপনার ইচ্ছে। আপনি এখন এখানেই থাকছেন, এই মজুমদারবাড়ির মানুষ আপনি, আপনি যা ঠিক মনে করবেন তা-ই হবে। থানা-পুলিশ করতে চাইলে তা-ও করতে পারেন,” মামা বললেন।

শুভ ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, বারবার বলছে, “বলছি তো আর করব না। আর আমি ও বাড়িতে ঢুকিওনি, বিশ্বাস করুন।”

“সে কথা অবশ্য ঠিক। হারু বলছিল উপদ্রব গেছে মনে হচ্ছে,” মৃণাল বললেন বাক্সটা নেড়েচেড়ে দেখতে-দেখতে, “এটা মনে হচ্ছে আমার ঠাকুরমার সেলাইয়ের বাক্স। সুন্দর-সুন্দর জামা তৈরি করতে পারতেন উনি। অনেক বই ছিল সে সবের। আমরা দেখেছি। কী বলছিলেন যেন মাস্টারমশাই? আমি যা ঠিক মনে করব তা-ই হবে? এ সব জিনিস তো কেউ নিয়ে যায়নি, এখানেই ফেলে রেখেছে, কোনও দিন নেবে কিনা তা-ও সন্দেহ। তবুও এই সব কিছু যদি শুভ ও বাড়িতে রেখে আসতে পারে তা হলে আমি আর কিছু করব না। কেউ জানবেও না।”

“ও আমি ঠিক রেখে আসব, ছিদামখুড়ো কিছু বুঝতেও পারবে না। না-না রাতে যাব না। দিনের বেলাতেই যাব,” শুভ হাঁপ ছেড়ে বলল।

“শুধু এই ছেঁড়া বইগুলো তুমিই রাখো। এতে যখন তোমার উপকার হচ্ছে। আমি নিশ্চিত আমার ঠাকুরমাও এতে খুশিই হবেন,” মৃণাল বললেন।

“টুকাইবাবু আগেই বলেছিল সব ফেরত দিতে, তুই শুনলি না,” ঝগড়ু বলল।

“বটে? তুমি বলেছিলে? তুমি তো খুব ভাল ছেলে তা হলে,” মৃণাল টুকাইকে আদর করে বললেন।

মামারা গল্প করছেন, টুকাই এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এ ঘরে বড়-বড় চারখানা ফটো টাঙানো। একটা ফটোর সামনে গিয়ে টুকাই থমকে দাঁড়াল। ফটোটা বহু পুরনো, অযত্নে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, মুখখানা তো একেবারেই অস্পষ্ট, তবে হাতের লাঠিটা বেশ বোঝা যায়। টুকাইয়ের চেনা-চেনা লাগল।

“এটা কার ফটো?” টুকাই জিজ্ঞেস করল।

“আমার ঠাকুরদা, শশধর মজুমদারের। যে-মূর্তি নিয়ে এত কাণ্ড সে-মূর্তি যখন কমলের ঠাকুরদা ওই পুকুর থেকে পেয়েছিলেন, আমার ঠাকুরদা তা ওঁকে দিয়ে দেন। আর কিছু জমিজমাও। সে নিয়ে কম গোলমাল হয়নি,” মৃণাল বললেন।

“উনি কোথায়?”

“উনি?” মৃণাল হেসে ফেললেন, “উনি আর নেই, মারা গেছেন।”

এই বড়দের এক দোষ। সব সময় খালি নেই আর নেই! নেই-ই যদি হত তা হলে ও কি আর লাঠিদাদাকে দেখতে পেত? বটুদাদু ঠিক বলেন, নেই বলে কিচ্ছু হয় না। লাঠিদাদাও কিছু ভুল বলেননি, যত গোলমাল বড়রাই করে, একটা সহজ, সাধারণ কথাও তারা বুঝতে পারে না!

॥ ১৩ ॥

বটুদাদু কবে থেকে আসব আসব করেন, কিন্তু আসার সময় এই এত দিনে পেলেন। এসে অবশ্য যত না কথা টুকাইয়ের সঙ্গে বলেছেন তার চেয়ে ঢের বেশি মামার সঙ্গে বলছেন। মামা ওঁকে সব বলেছেন, টুকাই জানে।

“আমি তো অগ্নিশিলা পেলাম না। কোথায় পাওয়া যায় তা-ও তুমি বললে না,” টুকাই বলল।

“অগ্নিশিলা এ-দিক ও-দিক খুঁজে বেড়াতে হয় না, আমি বলেছিলাম, ভুলে গেছ?” বটুদাদু বললেন।

টুকাই চুপ, এ রকম একটা কথা বটুদাদু যে বলেননি তা নয়, কিন্তু এ-দিক ও-দিক না খুঁজে কোথায় খুঁজলে পাওয়া যাবে সে তো বলেননি। বলেছিলেন, “সে আমি পরে বলব'খন।” আর এখন উনিই সব ভুলে গেছেন! কিন্তু সেটা বলা কি ঠিক হবে? অন্তত মামার সামনে? যদিও মামা এখন আর অত রাগী-রাগী নেই, তাও।

“নিজের ভেতরে দেখলেই তো অগ্নিশিলা খুঁজে পাওয়া যায়। ইচ্ছে, হাল না-ছাড়ার ইচ্ছে, ভেঙে পড়লেও আবার উঠে দাঁড়ানোর ইচ্ছে, এই হচ্ছে আসল অগ্নিশিলা, বুঝলে? এর সঙ্গে যখন তোমার পরিশ্রম, তোমার বুদ্ধি, তোমার মনোযোগ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে তখনই আগুন জ্বলবে, জ্বলবেই। জ্বলেছেও তো। এত কিছু হল, তাও জ্বলেছে।”

টুকাই ভাল করে বুঝতে পারল না। কোথায় জ্বলল আগুন? ও তো কিছুই দেখতে পায়নি! ধুর! এর চেয়ে গল্প শোনা অনেক ভাল। এ সব শক্ত-শক্ত কথা আর কাঁহাতক ভাল লেগে? ও তাই বটুদাদুকে বলল, “মংলুদের গল্প বলবে না? পুরোটা বলবে কিন্তু, একেবারে শেষ পর্যন্ত।”

“একেবারে শেষ পর্যন্ত! কিন্তু ও গল্পের শেষ যে আমি জানি না টুকাই, ও গল্পের শেষ তো তোরা লিখবি। আরও সত্যি কথা কী জানিস? মংলুদের গল্প বোধ হয় শেষই হয় না, এক জন মংলুর গল্প শেষ হয় তো আর-এক জনের শুরু হয়। যুগ-যুগ ধরে এরকমই চলছে। কী মাস্টারমশাই, আমি ঠিক বললাম তো?” বটুদাদু মামার দিকে তাকালেন।

মামা হাসলেন, “ঠিক।”
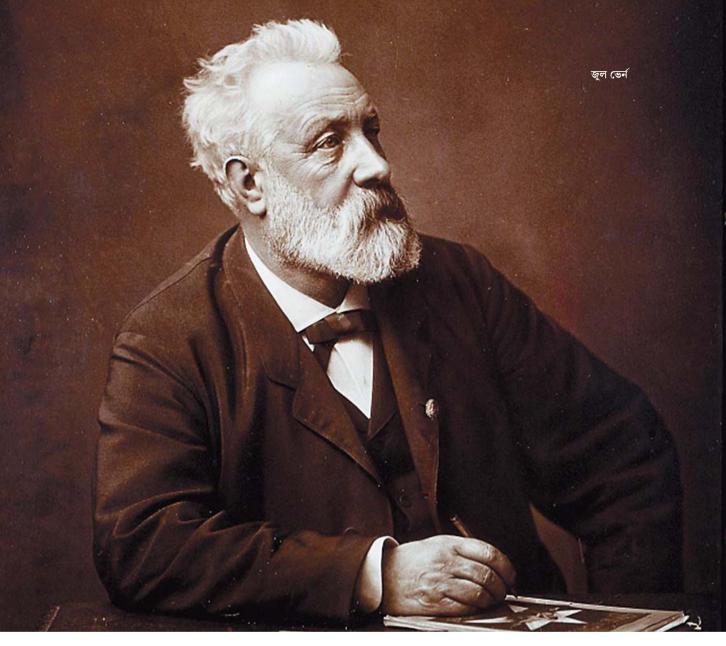
দেড়শো বছর আগের চোখে

লেখক জুল গাব্রিয়েল ভের্ন কল্পনার সময়যান চেপে হয়েছিলেন আমাদেরই প্রতিবেশী।

সাগ্নিক রক্ষিত

বহু বছর ধরে তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে সিন্দুকটা। বাড়ির বড়রা ওটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। শুধু ছোট্ট ছেলে জাঁ ভেবে আকুল হয়, তার বিখ্যাত পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া ওই সিন্দুকের মধ্যে না জানি কত হিরে-জহরত, সোনাদানা বা কী দুষ্প্রাপ্য বস্তু লুকোনো আছে। অবশেষে জাঁ যখন বড় হয়ে সিন্দুকের মালিক হয়ে বসল, কালবিলম্ব না-করে সে লোকজন ডেকে তালা খোলার ব্যবস্থা করল। শেষমেশ খোলা হল সেই রহস্যময় সিন্দুক। ভিতরে উঁকি দিয়ে জাঁ তো অবাক। এ তো শুধু কয়েকটা চিঠিপত্তর, একটা নোটবুক আর ধুলোয় ধূসর একটা কাগজের দিস্তে। সে দিন হতাশ হলেও, কয়েক বছর পর অবশ্য জাঁ বুঝতে পারে, ওই কাগজের দিস্তেটা নিজেই এক অমূল্য গুপ্তধন। জাঁ-র পূর্বপুরুষ যে-সে লোক ছিলেন না, তাঁর নাম ছিল জুল গাব্রিয়েল ভের্ন। ওই দিস্তেটা

ছিল তাঁর হারিয়ে যাওয়া অপ্রকাশিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি— 'প্যারিস ইন দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি'।
সায়েন্স ফিকশনের পথপ্রদর্শক জুল ভের্নের নামের সঙ্গেই মিশে আছে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ। উত্তেজনায় ঠাসা তাঁর গল্পের নায়কেরা স্থলে জলে অন্তরীক্ষে বিচিত্র সব আশ্চর্যযানে চষে বেড়াত বিশ্বচরাচর। কেউ-কেউ পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে পাড়ি দিত মহাকাশে। ভের্ন তাঁর বইয়ে এমন সব অদ্ভুত দুনিয়া সৃষ্টি করতেন, যা সেই সময়ে আকাশকুসুম কল্পনা মনে হলেও আজকের দিনে ঘোরতর বাস্তব। সত্যিকারের আবিষ্কারের বহু আগেই উপন্যাসে তিনি 'আবিষ্কার' করেছিলেন সাবমেরিন, হেলিকপ্টার, রেডিয়ো, টেলিভিশন, টেলিফোন। লিখেছিলেন ভিডিয়ো কনফারেন্সিং বা অন্তর্জাল বাণিজ্যের কথাও। বড়-বড় পণ্ডিতেরা অনেক মাথা চুলকেও ভেবে উঠতে পারেননি, চিলেকোঠার একটা ছোট ঘরে বসে একটা লোক, যিনি নিজে বিজ্ঞানীও নন, তিনি কী করে আজকের বাস্তবকে এমন নির্ভুল কল্পনা করলেন? মানুষ প্রথম চাঁদে পা দেওয়ার একশো বছর আগেই 'ফ্রম দি আর্থ টু দ্য মুন' উপন্যাসে ভের্ন পৌঁছে গিয়েছিলেন চাঁদের বুকে। ১৮৬৩ সালে ভের্ন লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস—'ফাইভ উইকস ইন আ বেলুন'। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রায় সব প্রকাশক সেটাকে উদ্ভট, অবাস্তব বলে নাকচ করে দেন। এই সময়ই ভের্নের সঙ্গে আলাপ হয় পিয়ের-জুল হেৎজেল নামে এক নামী প্রকাশকের। বই ছাপতে রাজি হলেন হেৎজেল। ব্যস, রাতারাতি ভের্ন-কে নিয়ে হইহই পড়ে গেল প্যারিসে। উৎসাহিত ভের্ন লিখে ফেললেন আর-একটি উপন্যাস। মানসচক্ষে আঁকলেন একশো বছর পর প্যারিসের ছবি—প্যারিস ইন দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি। কিন্তু হেৎজেলও এ বার বেঁকে বসলেন। তিনি স্পষ্ট বললেন, এ উপন্যাস ছাপলে লোকে বলবে এ চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক, পাগলের প্রলাপ। নিরাশ ভের্ন সেই বাতিল পাণ্ডুলিপিকে বন্ধ করে রাখলেন সিন্দুকে। ভুলেই গেলেন তার কথা। প্রায় ১২৬ বছর পর এই সিন্দুকই খুলেছিলেন জাঁ। হেৎজেল আজকের দিনে এসে দাঁড়ালে নির্ঘাত কপাল চাপড়াতেন। আসলে তাঁর দোষ নেই। যে সময় ঘরে-ঘরে জ্বলত তেলের লম্ফ, রাস্তায় ঘড়ঘড়িয়ে চলত ঘোড়ার গাড়ি, সেই দেড়শো বছর আগে এ উপন্যাসকে উন্মাদের কল্পনা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ মনে হয়, ভের্ন যেন কল্পনার টাইম মেশিনে চড়ে একশো বছর পরের প্যারিসের পথে হাওয়া খেয়ে গিয়েছিলেন। নইলে এমন নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী কি সম্ভব? এ বইয়ে মিশেল দুফ্রেনয় নামে ষোলো বছরের এক কিশোরের চোখে ষাটের দশকের প্যারিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে। শহর জুড়ে ছেয়ে আছে আকাশছোঁয়া বহুতল, যাতে ওঠা-নামা করতে আছে লিফ্ট। রাস্তার কোণে-কোণে ঝলমল করছে বৈদ্যুতিক আলো, মাটির নীচে তির বেগে ছুটছে মেট্রো, মাথার উপরে দৌড়চ্ছে মোনোরেল। সাঁইসাঁই করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে গ্যাসচালিত গাড়ি, ড্রাইভারের হাতে স্টিয়ারিং, পায়ে অ্যাক্সিলারেটর। মানুষ হিসেবনিকেশ করছে ক্যালকুলেটরে, তথ্য আদানপ্রদান করছে কম্পিউটারের মতো এক যন্ত্রের মাধ্যমে, কেনাকাটা করছে বিরাট শপিং মলে। গোটা দুনিয়াকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে একটা নেটওয়ার্ক, যেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। আর প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে আছে একটা গগনচুম্বী আলোকস্তম্ভ, যেন অবিকল আইফেল টাওয়ার! সেই ১৮৬৩ সালে একটা লোক লম্ফের আলোয় বসে লিখেছিলেন এই আশ্চর্য উপাখ্যান।
তবে ভের্নের প্যারিসের এত আলোর উল্টো পিঠেই লুকিয়ে আছে অন্ধকার। এখানে কেউ কবিতা পড়ে না, ছবি আঁকে না, সিনেমা দেখে না, গানও তেমন শোনে না। ওসব খামোকা সময়ের অপচয়। অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয়। বেশি হাসাহাসি করলেও সকলে কটমটিয়ে তাকায়। সকলে গোমড়া মুখে বসে কেবল বিজ্ঞান চর্চা করে। দয়ামায়া, করুণা, ভালবাসার দাম নেই। মানুষ মর্যাদা দেয় শুধু বিজ্ঞানকে। এখানে আধুনিকতা আছে, আবেগ নেই। বিনোদন আছে, শিল্প নেই। গবেষণা আছে, স্বপ্ন নেই। এক সর্বব্যাপী যান্ত্রিকতায় আক্রান্ত পৃথিবী, মানুষ যেন কলের পুতুল।
দেড়শো বছর ধরে সিন্দুকে বন্দি হয়ে থাকা বইটায়, যান্ত্রিক দুনিয়ায় হাঁসফাঁস করতে থাকা মিশেলের মাধ্যমে আসলে ভের্ন বলতে চেয়েছিলেন— 'তোমার ভিতরে যে স্বাধীন, ছটফটে, অযান্ত্রিক মনটা আছে, তাকে কখনও বন্দি করে রেখো না। কে বলতে পারে, তোমার আজকের অদ্ভুতুড়ে কল্পনা হয়তো হয়ে উঠবে দেড়শো বছর পরের জলজ্যান্ত বাস্তব!'

মাসাইমারার বিশল্যকরণী

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
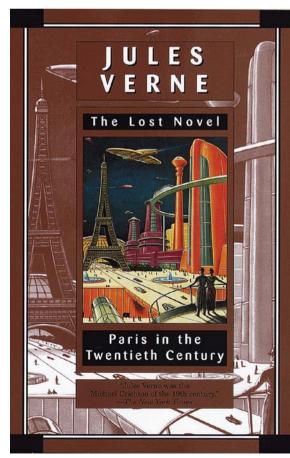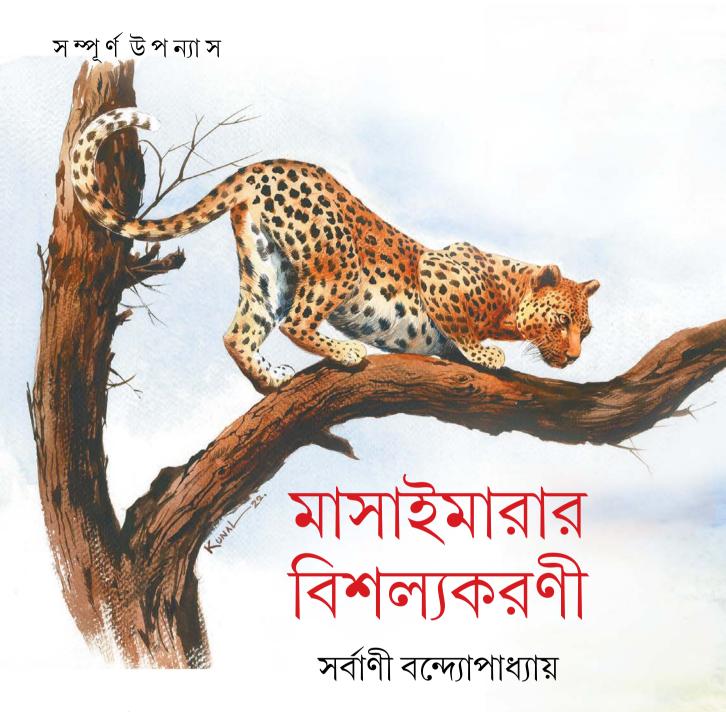
নাইরোবি এয়ারপোর্টে নামার পর এক ডলারে একটা জলের বোতল কিনে এনে সবুজের হাতে দিয়ে নিরুপম বললেন, “সবুজ, তোমার হিতেনকাকু বার বার বলে দিয়েছেন, মাসাইমারার বন-জঙ্গল দেখতে যাচ্ছ, ভাল ভাবে সব কিছু দেখে এসো। বেশি এ-দিক ও-দিক কোরো না। দেশটা আফ্রিকা আর শহরটা নাইরোবি। সে কথা ভুলে যেয়ো না যেন।”

সবুজ তাকায় বাবার দিকে, “হিতেনকাকু কেনিয়ায় চাকরি করতে এসেছিলেন, তাই না?”

“হ্যাঁ। এই নাইরোবিতেই ওঁর পোস্টিং ছিল। দীর্ঘ দশ বছর উনি এখানেই ছিলেন।”

“অথচ মাসাইমারা অরণ্য দেখেননি!”

“না। উনি বরাবর একটু কেজো মানুষ কিনা,” কথাটা বলে বাবা মুচকি হাসেন।

“এদের কেজো বলা চলে কী? কোনটা যে আসলে কাজ আর কোনটা অকাজ, তা বুঝতেই আমাদের গোটা জীবন কেটে যায়।”

কথাটা কে বলল? সবুজ, বোতল থেকে গলায় জল ঢালতে-ঢালতে চমকে তাকায়। ও মা, এই ভদ্রলোকটিকে তো ও একটু আগেই প্লেনে লাগেজ রাখতে সাহায্য করেছিল। ভারী অদ্ভুত তো! কখন উনি ওর আর বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ও খেয়াল করেনি। নিজে থেকেই ওদের কথার মধ্যে কথা বলছেন।

“সরি, আপনার ছেলের সঙ্গে প্লেনে মোলাকাত হয়েছিল। আপনার সঙ্গে আলাপ নেই। তবু আপনাদের আলাপচারিতায় নাক গলিয়ে ফেললাম।”

নিরুপম একটু হেসে বলেন, “সে ঠিক আছে। আপনার নামটা?”

“অলীক। আপনাদের মতোই মাসাইমারা অরণ্য দেখতে এসেছি। পেশায় কলেজের মাস্টারমশাই তো। তাই একটু বেশিই কথা বলি।”

“বেশি আবার কোথায়? বিদেশ-বিভুঁইয়ে বাংলা শুনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে তো হতেই পারে। কিন্তু আমায় একটু মাপ করবেন, আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলুন। আমি একটু কাজ সেরে আসছি,” বাবা চলে যান।

সবুজ জানে ওর বাবা, মাকে জলের বোতল দিতে যাচ্ছেন। দূরের একটা সোফায় বসে আছেন ললিতা। ওরা তিন জনেই এসেছে

ছবি: *কুনাল বর্মণ*
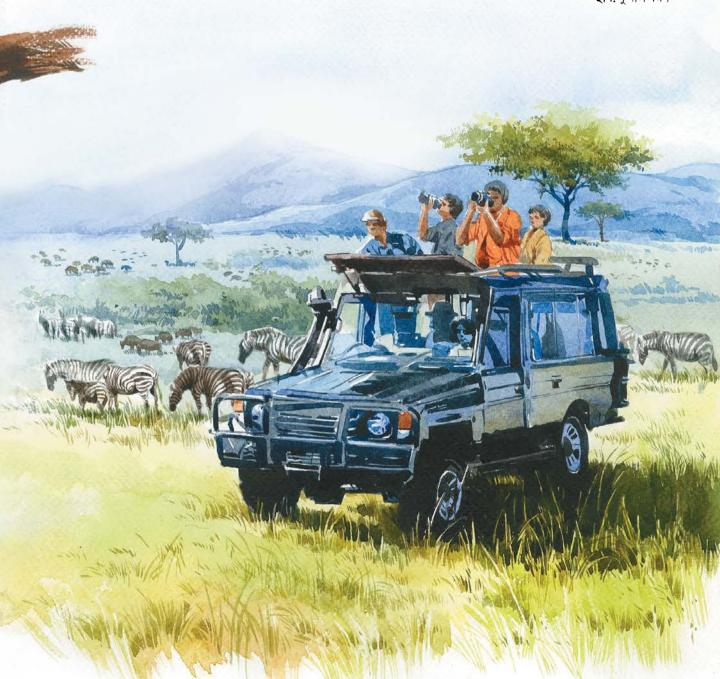
মাসাইমারায় বেড়াতে। আসলে এয়ারপোর্টে নামার পর ওর আর মা'র দু'জনেরই খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। এয়ারপোর্টের কোথাও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। তাই লাগেজ সংগ্রহ করার পর মাকে ওই সোফায় মালপত্রের পাহারায় বসিয়ে বাবা যান জল কিনতে। ও লাউঞ্জে ঘুরছিল। জিপ গাড়ির ব্যবস্থা দেশে থাকতেই অনলাইনে হয়েছে। ড্রাইভার ভদ্রলোক ফোন করেছেন। আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

"তোমার নাম সবুজ?"

"হ্যাঁ। কী করে জানলেন?"

কাঁধের ব্যাগের দিকে তাকান উনি। সবুজের খেয়াল হয়, ওর নাম-ঠিকানার একটা লেবেল ওর ব্যাগেই লাগানো আছে। এবার ও ভাল করে দেখে অলীকবাবুকে। লম্বায় মাঝারি। গায়ের রং তামাটে। মুখ খুব সাধারণ হলেও চোখের মধ্যে উজ্জ্বলতা আছে। সাধারণ ফুল হাতা সাদা শার্ট আর ফিটিংস না-থাকা একটা প্যান্ট পরেছেন উনি। সাদামাটা একটা চশমা চোখের উজ্জ্বলতা ঢাকতে পারেনি। মুখের দাড়ি-গোঁফ আর চুলের বাহার চোখে পড়ার মতো। ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল আর গালে যত্নে লালিত দাড়ি। হাতে আবার একটা বাদামি বড় টুপি, যা একাধারে রোদ-বৃষ্টি আটকায়।

"আচ্ছা আপনার পদবিটা বললেন না তো?"

"আমি বলি না। অফিসিয়াল ফর্ম ভরার সময় শুধু কাজে লাগে। জাত-ধর্মের ভেদাভেদ মানি না তো। পদবি শুনলেই লোকে জাত-ধর্ম বুঝে যায়। তাই ওটা উহ্য রাখি।"

"আচ্ছা," বলে ও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ভারী অদ্ভুত লোক তো! যা মনে হচ্ছে ইনি একটু বেশিই কথা বলেন। আর গায়েপড়া যে, সে তো দেখাই গেল। কথা না-বাড়িয়ে ও মন দিয়ে এয়ারপোর্টের অন্দরমহলের সাজানো-গোছানো কর্মব্যস্ত চেহারাটা দেখতে থাকে। আলোয় ঝলমল করছে!

ওর পাশ থেকে অলীকবাবু বলেন, "এয়ারপোর্টের চেহারা দেখে দেশের অবস্থা কল্পনা করে লাভ নেই। এখানকার বেশির ভাগ মানুষ খুব গরিব। খেতে পায় না। আমাদের দেশের মতোই।"

বাবাকে অন্য দিক থেকে আসতে দেখে ও স্বস্তি পায়। অলীকবাবুর কথা তো শুরু হলে থামে না মনে হচ্ছে। বাবা এসেই বলেন, "গাড়ি দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। তুই মায়ের কাছে চলে যা। গাড়ি এলে আমরা বেরোব।"

একটু বাদে বাবা ফোনে ডাক দিলে বাইরে এসে ও অবাক হয়ে যায়। এ রকম জিপ ও আগে দেখেনি। মোটামুটি দশ জন তো বসতেই পারবে। ওদের জিপের সামনেই বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বাবা ড্রাইভার নিউটনের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেন। এই টুরে ওদের গাইডও বটে। হাসি মুখে এগিয়ে এসে ওর সঙ্গে হাত মেলায় নিউটন, "হাই সবুজ। মি. নিউটন।"

কথাবার্তা সব ইংরেজিতেই বলতে হবে। নিউটন ওদের পুরো মাসাইমারা অরণ্য ঘুরিয়ে দেখাবে। আর-একটি পরিবারও দাঁড়িয়ে আছে। তারাও ওদের সঙ্গে ভ্রমণে অংশ নেবে। বছর চল্লিশের এক সুদর্শন যুবক, তার চার-পাঁচ বছরের একটি দুরন্ত পুত্র আর লম্বা ছিপছিপে সুন্দরী স্ত্রী। ভদ্রলোক নাকি ডাক্তার। মা'র মুখ দেখে মনে হয় সঙ্গীদের দেখে নেহাতই হতাশ হয়েছেন। কেননা ওরা দক্ষিণী, কেরলের অধিবাসী। বাংলায় গল্প করা যাবে না। তবে এ ব্যাপারে ওর বিশেষ অভিজ্ঞতাও আছে। ও বহু বার দেখেছে, যে-কোনও ভাষার মানুষের সঙ্গে মা অম্লান বদনে বাংলায় কথা বলে যেতে পারেন।

ওরা তিন জন, বাচ্চাকে ধরলে ওঁরাও তিন জন। সবাই গাড়িতে ওঠার পরও নিউটন বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। কার জন্য অপেক্ষা করছে ও? এয়ারপোর্টের সামনে একটা পার্কিংয়ে ওদের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধের অন্ধকার ঝুপুস করে নেমেও বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। বড়-বড় বাড়ি, বিশাল-বিশাল আলোকিত মল, ঝকঝকে বাস, রাস্তাভর্তি বিভিন্ন মডেলের চার-চাকার ধীর গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, না, নাইরোবি বড় শহর বটে!

নিউটন কাকে যেন ফোন করছে আর 'ইয়েস ইয়েস' করছে। খানিক পরে আবার একটা হাত উপরে তুলে ইশারা করতে শুরু করল। সবুজ দূর থেকে একটা টুপির এগিয়ে আসা টের পায়। চমকে ওঠাটা সামলে নেয়, যখন দেখে রাস্তা দিয়ে মালপত্রের ট্রলি টানতে-টানতে অলীকবাবু ওদের জিপের দিকেই এগিয়ে আসছেন। তার মানে সাত নম্বর ভ্রমণকারী উনিই। বড় করে একটা শ্বাস ফেলে ও। বেশ বুঝতে পারে, এ যাত্রায় ওর বোর হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।

॥ ২ ॥

জিপ রওনা দিয়েছে বেশ খানিক ক্ষণ। মাসাইমারার ঘন অরণ্যের মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতে ওর আবার মনে হচ্ছিল সেই কথাটা। গাছপালার রং সবুজ না-হলে মানাত কি? বিজ্ঞানের দিক থেকে যে কারণই থাক এই সবুজ রঙেই গাছপালা সার্থক। তার লাবণ্য খুলেছে এই রঙেই। তাই বুঝি প্রকৃতি জলে, আকাশে নীল গুলেছে। মাটিতে লাল, গেরুয়া, বাদামি, মেটে, কালো যখন যা ইচ্ছে রং বরাদ্দ করলেও গাছপালার জন্য সবুজ রংটাই বেছে রেখেছে।

ওর নিজের সবুজ নামটা খুবই পছন্দের। নাম রেখেছিলেন দাদু। ওঁর বাগান করার শখ ছিল। অদ্ভুত ভাবে গাছপালার প্রতি সবুজেরও ভীষণ টান আছে। মাসাইমারার জঙ্গলে আসার ইচ্ছেও বহু দিনের। মাধ্যমিকের ভাল রেজ়াল্টের পর বাবার কাছে সেই ইচ্ছেটা পেশ করেছিল ও। কলকাতা থেকে দিল্লি এয়ারপোর্ট হয়ে আদ্দিস আবাবায় কিছু ক্ষণ হল্ট করে, পরের ফ্লাইটে সন্ধেবেলা ওরা এসে নেমেছিল নাইরোবিতে। এয়ারপোর্টেই নিউটন আর তার হুডতোলা গাড়ির সঙ্গে ওদের পরিচয়। নাইরোবি শহর সম্বন্ধে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছিল ওদের। বিদেশিদের জন্য একেবারেই নিরাপদ নয়। তাই বারবার মনে হলেও গাড়ি থেকে নেমে এক পাক ঘুরে আসার ইচ্ছেটা, সবুজকে বাতিল রাখতে হয়েছিল।

আফ্রিকার কেনিয়ায় অবস্থিত এই মাসাইমারার অরণ্য। অনেক দিনই আসার ইচ্ছে, তাই বাবার সম্মতি পেয়ে ইন্টারনেটে এই 'ব্লু-ফক্স' কোম্পানির সঙ্গে ও-ই যোগাযোগ করে। জুলাই মাসটা বেছে নেওয়ার কারণ, এই সময় লাখ-লাখ জন্তু-জানোয়ার খাদ্যের সন্ধানে স্থান পরিবর্তন করে। সেই ঘটনাটাই 'মাইগ্রেশান' নামে বিখ্যাত। এখানকার আবহাওয়ায় একটা অদ্ভুত বৈচিত্র আছে। জুনে বর্ষা আসে আর প্রবল বৃষ্টিপাতে বড়-বড় ঘাস জন্মায়। কেনিয়া থেকে সেরেঙ্গেটি বা সেরেঙ্গেটি থেকে কেনিয়ায় বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে তৃণভোজী প্রাণীরা। ঘাস খাওয়ার জন্য তারা দলে-দলে রওনা দেয়। ওয়াইল্ড বিস্ট, জ়েব্রার পালের পিছন-পিছন দল বেঁধে যায় অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী। ওই ওয়াইল্ড বিস্ট আর জ়েব্রারা ওদের খাদ্য। এই দল বেঁধে লাখ-লাখ প্রাণীর স্থান পরিবর্তন দেখতেই সবাই মাসাইমারা আসে। তাই জুলাই মাসের মাঝামাঝি, দুপুরেই ওরা দিল্লির ফ্লাইট ধরতে দমদমের দিকে রওনা দিয়েছিল। জানা ছিল, ওরা ছাড়াও আরও চার জন ওদের সঙ্গে আফ্রিকাতেই যোগ দেবে। এখন গন্তব্য মাসাইমারা রিসর্ট।

গত রাতটা নাইরোবিতেই কেটেছে। হোটেলের ঘর ছিল ভাল রকম বিলাসবহুল। ডিনারের ব্যবস্থাও চমৎকার। বিছানা এত নরম, বসলেই ডুবে যেতে হয়। মা'র সঙ্গে শুয়েও সবুজ অনেক ক্ষণ জেগে ছিল। ঘুম আসছিল না। ওর মন বার বার বলছিল মাসাইমারা ভ্রমণ খুব সহজ হবে না। আর ওর মন তো খুব একটা ভুল কথা বলে না। ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাতের হোটেলের চমৎকার ডিনারে অলীকবাবু আসেননি। ওঁর শরীর নাকি ভাল নেই। অথচ রাতে ও নিজে উপরের ব্যালকনি থেকে অলীকবাবুকে বাগানে পায়চারি করতে দেখেছে। স্বাভাবিক বোধ না করলে কেউ হাঁটতে যায়? তবে কাউকে কিছু বলেনি।

সকালে গরম জলে স্নান সেরে চটপট রেডি হয়ে নিতে হল। ওরা একেবারে খেয়েদেয়ে জিপে উঠল। গাড়ি বেশ অনেক ক্ষণই দাঁড়িয়েছিল।

সবুজ ছটফট করছিল। বাইরের চলমান শহর ওকে টানছিল। শুধু মায়ের ভয়েই গাড়ির জানলায় চোখ রেখে বসেছিল ও। আসলে ওরা আগেই জেনে এসেছে আফ্রিকার কোনও জায়গাই একা বিদেশির জন্য নিরাপদ নয়।

গাড়িতে অলীকবাবু বসেছেন ওরই পাশে। যা মনে হচ্ছে উনি পুরো ভ্রমণটাতেই সবুজের সঙ্গ ছাড়বেন না। তবে বেশি বকলেও ভুল কিছু বকবেন না নিশ্চয়ই। লেখাপড়া আছে। অনেক কিছুই জানা যাবে। কলেজে পড়ান, বিষয় বায়োসায়েন্স। কিন্তু এ সময় তো কলেজ বন্ধ নয়। উনি বেড়াতে বেরোলেন কী বলে? ওদের গাড়িতে ওঁর যাওয়ার কথা প্রথম থেকেই। অথচ উনি বলছেন যে, নিউটনের ফোন নম্বর সেভ না-করে সব কিছু গোলমাল করে ফেলেছিলেন। সবুজের মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে, অলীকবাবু সব ঠিকঠাক বলছেন তো?

মাসাইমারা যাওয়ার রাস্তা খুব মোলায়েম নয়। প্রথমে সেটা বোঝা যায়নি। মাসাইমারার সঙ্গে দূরত্ব যত কমছে, তত ব্যাপারটা ধরা পড়ছে। গাড়ি ঝাঁকুনি দিচ্ছে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে ওর। সব ব্যাপারটাই যেন স্বপ্নের মতো। আফ্রিকার বিখ্যাত জঙ্গলের দিকে ছুটছে গাড়ি। যে-মাসাইমারা জঙ্গলে ও কোনও দিন আসার কল্পনাও করেনি। দীর্ঘ রাস্তা। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘুম আসছে না। রাস্তার পাশের ধু ধু মাঠে কখনও দলে-দলে জ়েব্রা, কখনও জিরাফ, কখনও লম্বা শিংওয়ালা হরিণের দল হেঁটে বা দৌড়ে যাচ্ছে। বেশিটাই বড়-বড় ঘাসের জঙ্গল। মানে ঘাসে ভরা বিশাল-বিশাল মাঠ। আর যত দূর দেখা যায়, সেই মাঠের শেষ প্রান্ত আকাশে ঠেকেছে। কোথাও বা মাঠের পিছনে টিলার মতো সারি দেওয়া পাহাড়, আকাশের গায়ে লেপ্টে আছে। সাধারণ ভাবে পথের এক ধারে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর অন্য ধারে জঙ্গল। সেই জঙ্গলে আছে বড়-বড় গাছ, যার ডালে অনায়াসে একটা বড়সড় লেপার্ড চার পা আর ল্যাজ ঝুলিয়ে ঘুমোতে পারে।

জঙ্গলের পথেই চোখে পড়ল এক সারি জ়েব্রা মাঠের মধ্যে দৌড়চ্ছে। গাইড কাম ড্রাইভার নিউটন ভাল ইংরেজি বলে। উচ্চারণও পরিষ্কার। গাড়ি চালাতে-চালাতেই সারা ক্ষণ মজার-মজার কথা বলে চলল ও। জিপ থামিয়ে ও-দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "দু'ধরনের জ়েব্রা আছে। এক দলের গায়ে সাদার উপর কালো ডোরা,আর এক দলের কালোর উপর সাদা ডোরা। ভাল করে লক্ষ করুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন।"

কথাটা শোনার পর মা দেখার চেষ্টা করতেই বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। মা ভুলটা বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিলেন। সবুজ তখনও দু'চোখ ভরে দেখছিল। এক সারি জ়েব্রা মানে প্রায় চল্লিশটার মতো হবে। স্বাস্থ্যবান। গায়ের চামড়াও চকচক করছে। ঢিমে তালে খোলা মাঠে দৌড়চ্ছে ওরা। যেন কোনও মাঠে ড্রেস পরা খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ চলছে। এমন দৃশ্য তো আর চিড়িয়াখানায় দেখা যাবে না। জিপের মাথাটা নিউটনকে বলতেই তুলে দিয়েছে। সহজেই উঠে যায় ওটা। আর ওরা সিটের উপর দাঁড়িয়ে ওই ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে আরও ভাল ভাবে জীবজন্তু দেখার সুযোগ পাচ্ছে।

সব পথই এক সময় শেষ হয়। মাসাইমারার রিসর্টের কাছাকাছি এসে গিয়েছে ওরা। এক পাশে টানা ঘাসের মাঠ আর অন্য পাশে বড় গাছের জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। গাড়িকে মাঝে-মাঝেই দাঁড়াতে হচ্ছে। পথে হাতির পালের রাস্তা পেরোনোর জন্য এক বার গাড়ি থামল। সবুজ অবাক হয়ে দেখল, হাতিরা কেউ ওদের তাকিয়েও দেখল না। মাথা উঁচু করে গাছের ডাল ভেঙে খেতে-খেতে এগিয়ে গেল।

মা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এ বার জেগে উঠেছেন। নিউটনকে মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী সব ভয়ঙ্কর চেহারার হাতি, দেখলেই ভয় করে! কিন্তু ওরা তো তাকিয়েও দেখল না। ব্যাপারটা কী?"

ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। নিউটন হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করাতেই ওরা দেখল দুটো চিতা বাঘ মাঠের মধ্যে দূরের একটা দলছুট হরিণের দিকে তাকিয়ে শরীর টানটান করে ফেলেছে। দাঁড়িয়ে আছে। তবে ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে হরিণটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওরা কেউ খেয়াল করেনি, দক্ষিণী ভদ্রমহিলার ছোট ছেলেটি ওদের গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে শরীর ঝুলিয়ে ওই চিতা দুটোকে দেখে হই হই হই করে মাথা-হাত সব নাড়াচ্ছিল। হঠাৎ একটা চিতা এ-দিকে তাকিয়ে গর্‌র গর্‌র করে আওয়াজ করতেই, অলীকবাবু পিছনের সিট থেকে ছুটে এসে ওকে ভিতরে টেনে নিয়ে কাচ আটকে দিলেন।

নিউটন সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ও ওই মহিলার দিকে এক বার তাকিয়ে বলল, "ছেলেকে সামলে রাখবেন। চিতা ছুটে এলে আর কিছুই করা যেত না। বড় বাঁচা বেঁচেছি সবাই। এমনিতে ওরা গাড়িকে যন্ত্র মনে করে। গাড়ি দেখতে-দেখতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর গাড়ির মধ্যে যারা আছে, তাদেরও ওরা যন্ত্রের অংশ মনে করে। কিন্তু গাড়ির বাইরে শরীরের নাড়াচাড়া দেখলেই মুশকিল," শেষ কথাটা বলে মুচকি হাসল নিউটন।

ছেলেটির মা তো আতঙ্কে বাচ্চাকে কোলে জড়িয়ে কাঁপছে। নিউটনের নির্বিকার বাক্য শুনে মা'র মুখও দেখার মতো! বাবা হেসে বললেন, "ও সব ভেবে মন খারাপ না-করে যা দেখতে এসেছ তাই দেখো। গাছপালা, হাতি, সিংহ। আজেবাজে কথা ভেবে ভয় পেয়ে কী লাভ?"

মা বললেন, "ভয় পেতে আমার বয়েই গেছে। আমার বীরপুরুষ ছেলে সঙ্গে আছে তো!"

শুনে অলীকবাবু ওর দিকে তাকিয়ে খুক খুক করে হেসে উঠলেন, "কারাটে না জুডো? কোনটায় মাস্টার? মা তোমাকে বীরপুরুষ বললেন কেন?"

ও গম্ভীর ভাবেই বলল, "কারাটে জানি। তবে ব্যায়াম, খেলাধুলো বরাবর করি তো, গায়ে জোর আছে।"

"মনে জোর আছে তো? ওটা বেশি শক্তি দেয়," কথাটা বলা মাত্রই ওর মনে হল অলীকবাবুকে দেখে যা মনে হচ্ছে সেটাই সব নয়। ওঁকে একটু বুঝতে হবে। ওরা কেউ খেয়াল করেনি, উনিই বাচ্চাটাকে আর ওদের রক্ষা করেছেন। এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সকলে দেখাতে পারত কি?

॥ ৩ ॥

রিসর্টে পৌঁছে একটা বাজে খবর পেতে হল ওদের। ওরা গাড়ি থেকে নেমে রিসেপশনের সোফায় বসেছিল। বাবা টিভি দেখে এসেই ওই বিদঘুটে সংবাদ দিলেন। টিভি নিউজ় বলছে, বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী অনাথবন্ধু সেনগুপ্ত বেঙ্গালুরুতে নিজের বাড়ি থেকেই নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর একান্ত পরিচারক গণেশকে তিনি বাড়ি যাওয়ার জন্য সপ্তাহ খানেকের ছুটি দিয়েছিলেন। বাড়ির ঠিকে কাজের লোক গত দু'-তিন দিন বাড়ি তালাবন্ধ দেখে ফিরে যাচ্ছে। ফোন বন্ধ। সন্দেহ হওয়ায় সে সোজা থানায় জানিয়েছে। কেননা ওকে না-জানিয়ে সচরাচর অনাথবন্ধু বাড়ি বন্ধ করে কোথাও যান না।

রিসর্টের রিসেপশনের টিভির বিশাল স্ক্রিনে নিউজ়ের সঙ্গে ওঁর ফটো দেখাচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই এখন উনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তো। ঠিক পাশের বাড়ির লোকের মতো চেহারা। কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হয়। খবরে এ-ও বলা হল, কিছু দিন আগেই ওঁর প্রিয় পোষ্য হঠাৎ মারা যাওয়ায় তিনি খুব আঘাত পান। বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দেন। এই পরিস্থিতিতে ওঁর পক্ষে কোথাও একা-একা যাওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। সন্দেহ করা হচ্ছে, ঘটনাটির মধ্যে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র আছে।

অনাথবন্ধুর খবরটা নিয়ে সরকারি পদস্থ ব্যক্তিরা যে বিশেষ ভাবেই চিন্তিত, সে সবও টিভি কভার করেছে। ছবিতে দেখাল, পথেঘাটে নানা গ্রুপের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। আসলে অনাথবন্ধুর মতো সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানী এখন হাতে-গোনা কয়েক জনই আছেন। ওঁর খ্যাতির বিশেষ একটা কারণ আছে। কে না জানে, যে-বছর সাংঘাতিক ডেঙ্গি ভাইরাস পৃথিবীর মানুষদের আক্রমণ করেছিল তার

প্রথম সঠিক প্রতিষেধক উনিই আবিষ্কার করে মানুষকে সুরক্ষা দেন। গত বছর আরও ভয়ঙ্কর ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে। ওই ভাইরাসের ফলে পৃথিবীতে লক্ষ-লক্ষ মানুষ আচমকা নিউমোনিয়ার মতো সর্দি-জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রবল শ্বাসকষ্টে মারা যায়। দীর্ঘ দিন ঘরবন্দি থাকার পর বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করা একটা প্রাথমিক প্রতিষেধক আর মাস্কের সাহায্য নিয়ে মানুষ কাজকর্ম করছে। অনাথবন্ধু সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছিলেন, এই রোগকে তিনি নির্মূল করে মানুষের হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবেন। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হবে। ঠিক এই ঘোষণার পরে তাঁর নিরুদ্দেশ-সংবাদ মানুষ নিতে পারছে না। তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে বলেই পুলিশ বিভাগের বড় কর্তা মন্তব্য করেছেন।

"ওঁকে অপহরণ করে লাভ কী?"

মায়ের মন্তব্য শুনে বাবা উত্তেজিত হয়ে বলেন, "লাভ একটাই, ভারতের বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের কৃতিত্ব ছিনিয়ে নেওয়া। ওই মারাত্মক ব্যাধি নির্মূল করার কথা পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত আর কেউ তো বলেনি। জোর জবরদস্তি করে আবিষ্কারের পদ্ধতি জেনে নিয়ে ওঁকে গায়েব করে দেওয়া যেতেই পারে। এ তো খুব চেনা ছক, বুঝতে পারলে না? তবে আমাদের লোকসান একটাই, তাড়াতাড়ি আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা হল না। সবই ভাগ্য!"

সবাই যখন চুপচাপ, অলীকবাবু মন্তব্য করলেন, "এই আমাদের বড় দোষ। সব ভাল-মন্দ ভাগ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বসে থাকি। কেন রে বাবা, বার বার এক জন মানুষকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে? নিজেরা কিছু করে দেখা!"

সবুজ আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ও ভাবছিল অনাথবন্ধুর কথা। মানুষটার কী হল কে জানে? ওই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এই সময়েই নিখোঁজ হয়ে গেলেন! উনি বেঁচে আছেন তো?

॥ ৪ ॥

মাসাইমারায় ওদের ঠিক দু'দিন থাকার কথা। তাই জিপে যেতে-যেতেই নিউটন বলেছিল, "ওখানে পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিয়ে ঠিক চারটের সময় আমরা বেরিয়ে পড়ব। আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন।"

বনের ভিতর এত বড় রিসর্ট থাকতে পারে, সবুজ ভাবতেই পারেনি। ওরা পৌঁছতেই প্লেটে করে সাদা রোলের মতো জিনিস আর পাতলা কাচের গ্লাসে হলুদ রঙের ঠান্ডা পানীয় এনে হাজির করল ওয়েটার। সবুজ, সাদা রোলটায় কামড় না-দিয়ে, অন্যরা কী করে দেখার জন্য ভাগ্যিস অপেক্ষা করছিল! ওটা আসলে একটা ভেজা, সুগন্ধি ন্যাপকিন। সকলের দেখাদেখি ও আর মা মুখ-গলা মুছে, ন্যাপকিনটা ট্রে-তে ফেলে দিল। এই ট্রেনিংটা বাবার। উনিই বলেছিলেন, "কোথাও গিয়ে যখন কোনও কিছু বুঝতে পারবে না, তখন অন্যদের লক্ষ করবে।"

মুখ মুছে নিয়ে চার পাশে তাকিয়ে ও অলীকবাবুকে খুঁজছিল। দেখল, উনি রিসেপশনের মাসাই ছেলেটির সঙ্গে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দিব্যি গল্প জুড়েছেন। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল এর আগেও উনি এখানে এসেছেন। কটেজে গিয়ে স্নান সেরে ডাইনিং হলে দুপুরের খাবার খেতে এসে সবুজ ভারী অবাক হল। সেই অলীকবাবু ভদ্রলোক বসে আছেন একা একটা টেবিলে। ওদের দেখে হাসলেন উনি। ও গিয়ে ওঁর পাশের চেয়ারে আর বাবা-মা বাকি চেয়ারে বসতেই উনি ওর কাছে অদ্ভুত একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন।

"এমন একটা প্রাণীর নাম বলো, যার চারটে হাত। পা নেই, তাই হাঁটতে পারে না। উঁচু গাছের মগডাল থেকে উল্টো হয়ে ঝুলে থাকে। শুধু কচি পাতা আর ফুলের পাপড়ি খায়। সেটাই হজম করতে লাগে তিন সপ্তাহ। পৃথিবীর সবচেয়ে ধীর গতির প্রাণী। কী নাম, বলতে পারবে?"

সবুজ একটু ভেবেই বলল, "স্লথ।"

অলীকবাবু এক বার উজ্জ্বল চোখে দেখলেন ওকে। তার পর বললেন, "একদম ঠিক। খাওয়ার পর আমরা সবাই সাফারিতে যাব তো! সন্ধেবেলা তুমি এসো। তোমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে রইল। আমার কটেজটা একদম নর্থে। দুটো পাশাপাশি কটেজ। প্রথমটাই আমার। এসো কিন্তু!"

ওর এক বার মনে হল, কী ব্যাপার, বাবা-মাকে যেতে বলছেন না কেন? ওকে একাই ডাকছেন! তার পর ভাবল মানুষটা কথা বলতে ভালবাসেন তো, নানা রকম গল্প করবেন। তাই হয়তো ওকে একাই ডেকেছেন।

ওঁর সঙ্গে খেতে-খেতেও বেশ গল্প জমে গেল। উনি বললেন, "কলেজে পড়াই। তা ছাড়া আমি একটা বিশেষ গবেষণার কাজও করছি।"

বাবা বললেন, "গবেষণা? কী নিয়ে?"

উনি একটু অন্যমনস্ক ভাবেই খাবারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখেছেন, এরাও সেদ্ধ আলু খায়। আমাদের মতো গরিব দেশ কি না!"

সবুজ দেখল বাবা সবটা বুঝে বা না-বুঝে আর কৌতূহল দেখালেন না। মা সবুজের দিকে তাকাতেই সবুজ একটা ইশারা করল, যার মানে, 'চেপে যাও।'

খেয়ে ফেরার পথে ওরা রিসর্টের প্রদর্শনীর ঘরগুলো খুঁটিয়ে দেখল। যদিও সবই বিক্রির জন্য সাজানো, তবু ওদের রুচির তারিফ করতে হয়। মাসাইদের আসল পোশাক, গয়না, বাসন, অস্ত্রশস্ত্র সব কিছুর খুদে সংস্করণ ওর মধ্যেই সাজানো ছিল। সবুজের মনে পড়ল, এই রিসর্টে ঢোকার পর এক জন মাসাইকে ও দেখেছে। মাসাই আসলে মাসাইমারার অধিবাসীদের বলে। মাসাইদের পুরুষেরা সাধারণত খুব লম্বা হয়। তাদের কান চিত্র-বিচিত্র করে কাটা থাকে। কানে অনেক গয়না পরে ওরা, গলায় অনেক হার ঝোলে। বেশির ভাগ মাসাইয়ের মাথা কামানো। এক জন শিক্ষিত মাসাই কাউন্টারে কাজ করছিল। সে অবশ্য অত গয়নাগাটি পরেনি। কানের ফুটোয় একটাই মাকড়ি পরেছে। তবে ট্র্যাডিশনাল লাল চেক কাপড় সারা শরীরে জড়ানো। আধুনিক মাসাইরা সবাই সব সময় ও-সব পরে না।

দুপুরে খাওয়ার পর ওরা ফিরে এসেছিল নিজেদের কটেজে। তখন প্রায় আড়াইটে বাজে। ওরা তিন জনেই ক্লান্ত। জামাকাপড় পাল্টে শুয়ে পড়েছিল। ঠিক পৌনে চারটেয় ঘুম ভাঙল বাবার ডাকে। উঠে দেখল মা আর বাবা পোশাক পরে একদম তৈরি। ও লজ্জাই পেল, "আমাকে ডেকে দাওনি কেন?"

মা একটু হেসে ঘরের ভিতর থেকে কয়েকটা কুকি আর এক কাপ কফি এনে দিলেন ওকে। জামাকাপড় পরতে-পরতে সবটাই গলা দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছিল ও। আসলে এখানে কটেজগুলোয় একটা টেবিলে বাস্কেটে করে কুকিজ়, কফি, চা, দুধ, চিনির পাউচ রাখা থাকে। গরম জল করার জন্য প্লাগওয়ালা ফ্লাস্ক আছে। ঘুম থেকে উঠে বা যে-কোনও সময় চা-কফি বানিয়ে নেওয়া যায়। কফি খেয়ে ওরা রওনা দিল রিসর্টের রিসেপশনের দিকে। ওখানেই নিউটন অপেক্ষা করবে তো।

॥ ৫ ॥

বিকেলে এই ঘোরাঘুরির পর্ব না-থাকলে হয়তো আর-একটু ঘুমোত ও। কিন্তু এ রকম একটা জায়গায় এসে কিছু না-দেখে ঘরে বসে থাকাটা নেহাতই মূর্খামি। রিসেপশনে আরও দু'টি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। এরা আফ্রিকাতেই অন্য শহরে কাজ করে। এখানে এসেছে মাসাইমারা অরণ্য দেখবে বলে। ওদের সঙ্গেই ঘুরবে।

ঠিক চারটেয় ওরা পৌঁছেছিল রিসেপশনে। দলের বাকিরাও তৈরি হয়ে ওখানেই অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে নিউটনের ঠিক পিছনের সিটে মায়ের সঙ্গে বসেছিল ও। বাবা আর অলীকবাবু ছিলেন ওদের পাশের বাঁ-দিকের সিটে। অলীকবাবুর সঙ্গে বাবার বেশ জমে গিয়েছে। বিজয় চোপড়া আর আদিত্য সিংহ নামের ওই দুটো ছেলে জিপের উপরের ছাদ তুলে মাথা গলিয়ে বাইরেটা দেখছিল। ওরা বেশ বড়সড় ক্যামেরা এনেছে। কমবয়সি ডাক্তার আর তার বউও ছাদের ফাঁকে মাথা গলিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছেলেটাও বায়না করে বাবার কোলে উঠে মাথা বের করে দেখছে চার পাশ। ও সিট থেকে উঠে একদম পিছনে গিয়ে ওদের মতোই সিটে দাঁড়িয়ে মাথা বের করে দিল। মা এখানেও বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। তবে এই বইটা আলাদা। নিউটন দিয়েছে। এখানকার জঙ্গলের বিভিন্ন জীব-জন্তুর ফটো আর তাদের বিশদ বিবরণ দেওয়া, বেশ মোটা বই। খুব ইচ্ছে থাকলেও সবুজ এখন বইটা দেখবে না। চার পাশের জীবন্ত গাছপালা, জীব-জন্তু ওকে বেশি টানছে।

এ অভিজ্ঞতার স্বাদই আলাদা। দুরন্ত গতির গাড়িতে মুন্ডু বের করে এর আগে কখনও দাঁড়ায়নি তো। বাইরের হু হু হাওয়ায় চুল উড়ছে। রোদ থাকলেও তেমন তাপ নেই। কিন্তু দু'পাশের দৃশ্যে খুবই হতাশ হচ্ছিল ও। খোলা মাঠ দু'দিকেই। রাস্তার বাঁ-দিকে বড়-বড় গাছ থাকলেও ডান দিকে বিশাল ঘাস-জমি চলেছে তো চলেছেই। জিপটা হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। নিউটন নিজের বড় দূরবিন তুলে দিল ওদের হাতে। কাড়াকাড়ি করে নিয়ে দেখল ওরা, ডান দিকেই ঘাস-জমিওয়ালা মাঠের একদম শেষে, অনেক দূরে টিলার নীচে এক সিংহ বসে আছে। তার পাশ ফিরে বসার ভঙ্গিটি ভারী সম্ভ্রম জাগায়। দেখেই মনে হয়, ইনি সত্যি-সত্যিই বনের রাজা। মানে পশুরাজ। ঠিক এই সময়েই অলীকবাবু এসে দাঁড়ালেন ওর পাশে।

দাঁড়িয়েই কথা শুরু করলেন, "জানো সবুজ, ওই যে সিংহটিকে দেখছ একদম একলা বসে আছে, এ রকমই থাকে ওরা। এটাই ওদের স্বভাব। ওরা একা-একা থাকাই পছন্দ করে। একটা দলে এক জন সিংহ আর গোটা তিনেক সিংহী বাচ্চাদের নিয়ে থাকে। সিংহী শিকার করার পর শিকারের শরীরের মূল অংশটা সিংহ খায়। বাকিদের ভাগে থাকে অবশিষ্ট অংশ। 'লায়ন শেয়ার' কথাটা শুনেছ তো, সেটা এই জন্যই বলে।"

সবুজ ভাবছিল, ব্যাপারটা কী? অলীকবাবু সবাইকে ছেড়ে দিয়ে ওকে ধরেছেন কেন? মানুষটা ঠিকঠাক তো? বিদেশে ভুলভাল মানুষের পাল্লায় পড়লে খুব মুশকিল হবে।

হঠাৎ নিউটনের কাছে ওয়াকিটকিতে একটা ফোন এল, আর ও গতি পরিবর্তন করে বাঁদিকে বনের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল।

এখানের নিয়ম আলাদা। একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। প্রতিটি জিপের ড্রাইভারের কাছেই ওয়াকিটকি রাখা থাকে। বনের মধ্যে কোনও ঘটনা ঘটলেই এক জন আর-এক জনকে খবর দেয়। বিশেষ করে এখানে পর্যটকেরা সকলেই খোলা জঙ্গলে জীব-জন্তু দেখতে এসেছে। তবে দেখতে পাওয়ার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই এক জন গাইড কাম ড্রাইভার কোনও স্পটে বিশেষ কিছু দেখলেই বাকি সবাইকে তার খবর দিয়ে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে সে ওই লোকেশনে উপস্থিত হয়।

নিউটন জিপ নিয়ে সরু রাস্তা ধরে বনের একদম ভিতরে ঢুকে যাচ্ছিল। ওদের গাড়ির সিটে বসার নির্দেশ দিয়ে তীব্র গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল ও। জিপের মাথার ঢাকা সুইচ টিপে বন্ধ করে দিয়েছিল। পথে চোখে পড়ল, একটা জন্তু ওদের জিপের সামনে দিয়ে রাস্তা ক্রস করে টুক করে বনের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

নিউটন বলল, "ওটা একটা নেকড়ে।"

শেষে জিপ গিয়ে দাঁড়াল একটা সরু রাস্তায়। সেখানে টুরিস্ট সমেত আরও অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। সেই গাড়ির লাইনে ওদের গাড়িটাও ঢুকে পড়ল। এত মানুষ, কিন্তু কেউ কোনও শব্দ করছে না। নিউটন পৌঁছেই বলেছিল, "কোনও আওয়াজ করবেন না। আর গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করবেন না।"

সে ইচ্ছেও কারও ছিল না। কেননা দ্রষ্টব্য একটাই। বেশ কিছু দূরে একটা বড় গাছের মগডালে আরাম করে ঘুমোচ্ছিল একটা লেপার্ড। তার লম্বা লেজ ঝুলছিল ডাল থেকে। নিস্পন্দ তার শরীর দেখে মনে হচ্ছিল, সে বুঝি মরেই গেছে।

নিউটন ফিসফিসিয়ে বলল, "এরা লেপার্ড। গাছে চড়তে পারে। চিতারা গাছে উঠতে পারে না। আপনারা ভাবতেও পারবেন না লেপার্ডরা কত দূর শক্তিশালী। নিজের চেয়ে বেশি ওজনের শিকার ওরা টেনে গাছের মগডালে তুলে নিয়ে যায়, তার পর খায়।"

ফটো-শিকারির দল ফটো তোলার পালা সাঙ্গ হতেই যে যার মতো গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছিল। ওদের গাড়িও ঘুরিয়ে নিয়ে নিউটন হোটেলেই ফিরে চলল। ফেরার পথে একটা চিতাকে দেখল ওয়াইল্ড বিস্টকে তাড়া করতে। বিভিন্ন ধরনের হরিণের মধ্যে গ্যাজেল, ওয়াইল্ড বিস্ট, ইম্পালার কিছু-কিছু নজরে এল ওর। তবে এত কিছুর মধ্যেও ওর মাথায় একটাই চিন্তা কাজ করছিল, অলীকবাবু ওকে কেন আলাদা করে ডেকেছেন? কী বলবেন উনি?

কথাটা আগে শুনলেও নিউটনের কাছে ও জানতে চেয়েছিল, "তোমরা যে এই বনে-বনে ঘুরে বেড়াও, তোমাদের কাছে কি সত্যিই কোনও অস্ত্র থাকে না?"

ও হেসে বলেছে, "না। কোনও অস্ত্র নিয়ে আমরা ঘুরতে পারি না। তা হলে আমাদের এই জিপ নিয়ে ঘোরাই বন্ধ হয়ে যাবে। অনুমতি পাব না।"

"সে কী! যদি বুনো জন্তু আক্রমণ করে?"

"করবে না। জন্তুরা তো মানুষ নয় যে বিনা কারণে কাউকে তাড়া করবে। তা ছাড়া আমাদের কাছে ওয়াকিটকি আছে। বিপদে পড়লে সঙ্গে-সঙ্গে সব জায়গায় খবর হয়ে যাবে।"

এ বারে ওর পাশেই বসেছিলেন ললিতা। নিউটনের এই কথাটা আগে ঠিক বিশ্বাস করেননি। শুনে ভয় পেয়ে গেলেন, "সে কী! আমরা তো তা হলে সম্পূর্ণ অরক্ষিত!"

মা'র ভাবভঙ্গি দেখেই সবটা বুঝে নিয়ে হা-হা করে হাসল নিউটন। আর হেসেই বলল, "কথাটা একটু পাল্টে নিলেই ঠিক হবে। আসলে আমাদের জীবন সব সময়েই অরক্ষিত। তবে একটা নিশ্চয়তা আমি আপনাকে দিতে পারি। এই জিপের মধ্যে যদি চুপ করে বসে থাকেন, মাথা বা শরীরের কোনও অংশ বের না করেন, সিংহ, লেপার্ড, চিতা বা বাঘ কখনওই আপনাকে আক্রমণ করবে না। বাচ্চা সমেত কোনও হাতি বা গন্ডারের ক্ষেত্রে অবশ্য এ গ্যারান্টি আপনাকে দিতে পারব না।"

"মানে?" ললিতা বেশ দ্বিধাগ্রস্ত।

"বাচ্চা সমেত মা বড় ভয়ানক। বাচ্চাগুলোর জন্য ওরা আগে থেকেই শঙ্কিত থাকে তো। কেউ কাছাকাছি এলেই আক্রমণ করে।"

সবুজ দেখল বাবা মায়ের কথা শুনে মজা পেয়েছেন। মিটিমিটি হেসে বললেন, "তুমি একদম জানলার ধারে বোসো না কিন্তু। যদি আক্রমণ করে, তোমাকেই আগে ধরবে।"

মা হাসলেন, "কী যে বলো, তোমার ওজন আমার চেয়ে বেশি। ও তোমাকেই বেছে নেবে। আমার আবার ভয় কীসের?"

॥ ৬ ॥

কথা হচ্ছিল অলীকবাবুর কটেজে বসে। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। পথের জোরালো আলোয় কটেজের সামনে কোনও অন্ধকার নেই। একটু আগেই এই কটেজে এসেছে ও। ওখান থেকে ফেরার পর বাবা-মা বেশ ক্লান্ত। দু'জনেই বিশ্রাম নিচ্ছেন। ও চলে এসেছে ওঁর কটেজে। একটা কথা ওর প্রথম থেকেই মনে হচ্ছে, এই অলীকবাবু মানুষটি কেন ওকে এত কাছে টানছেন? ওর পাশে বসছেন, নানা কথা আলোচনা করছেন, এর পিছনের রহস্যটা কী? তবে সেটা বুঝতে গেলে তো ওকে ওঁর ডাকে সাড়া দিতে হবে! আর সেটার জন্যই ওর এই কটেজে আসা।

অলীকবাবুর টেবিলে ছড়ানো বেশ কয়েকটা ফটো। উনি একটা-একটা করে দেখালেন ওকে। ফটোগুলো একটু অন্য রকম। ওর কাছে একটা স্লথের ফটোও আছে।

"দেখছ, স্লথ! ব্রাজিলের বনে এদের বাস। আঙুলে কী বড়-বড় নখ! কিন্তু ওরা কাউকেই আক্রমণ করে না। নরম শরীর, গতি নেই বললেই চলে। গাছের মগডালে শরীর মিশিয়ে রেখে ঝোলে, যাতে চিল ওদের আক্রমণ না-করতে পারে। জাগুয়ার আর চিল ওদের খায়।"

সবুজ ফটোগুলো দেখছিল মন দিয়ে। নানা জীব-জন্তুর ফটো। একটা ফটোয় বাচ্চা একটা কুমিরকে দু'হাতে ধরা হয়েছে। তবে হাত দুটোই আছে, ফটোর মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে না।

অলীকবাবু কফির ট্রে এনে টেবিলে রাখলেন। সঙ্গে কাজু আর কুকিজ়।

"নাও, কফি খাও। এখানে তোমাকে ভাল কিছু খাওয়াতে পারছি না। জানো, আমাজ়ন নদীতে আমরা রাতে বোটে করে গিয়েছিলাম কুমির মারতে। সম্ভব হয়নি।"

"কুমির মেরে কী করতেন?"

"আমাজ়ন নদীর আশপাশে যারা থাকে, তারা কুমির খায়। আমি নিরামিষ খাই, কিন্তু আমার সঙ্গীরা কুমির খাবে ভেবেছিল। পারেনি। আমার কোলের কুমিরের বাচ্চাটাকেই তো ধরা হয়েছিল খাওয়া হবে বলে। যদিও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হই আমরা। পরে এক দিন সে গল্প বলব।"

আমাজ়ন, মাসাইমারার মতো ভয়ঙ্কর জঙ্গলে উনি এর আগেও এসেছেন? যে-সব গল্প উনি করছেন, সেগুলো কি সত্যি ওঁর নিজের অভিজ্ঞতা? কোনও ফটোতেই ওঁর মুখ দেখা যায়নি কিন্তু। ও এ বার সোজাসুজি তাকায় ওঁর দিকে।

"আমায় বলবেন, কেন আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?"

অলীকবাবুর মুখ-চোখের ভাষা একদম পাল্টে যায়। উনি ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। ওঁর চোখের দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে অনেকটা দুশ্চিন্তা, "জানতাম, তুমি ঠিক বুঝবে তোমাকে আমি একটা দরকারেই ডেকেছি। বোসো, বলছি। প্রথম কথা হল, আমি একটা মিশনে এখানে এসেছি। তার সঙ্গে আমাদের দেশের বা আরও ব্যাপক ভাবে বলতে গেলে, পৃথিবীর স্বার্থজড়িত। তুমি তো লক্ষ করেছিলে নাইরোবি এয়ারপোর্টে আমি সবার শেষে গাড়ির কাছে আসি। এয়ারপোর্ট থেকে বিভিন্ন দিকে বেরোনো যায়। এক জন লোক এসে আমায় রিপোর্ট করেছিল, আমাদের গাড়ি নর্থ গেটে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে ভুল দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"কেন? এতে কার কী লাভ?"

"বলছি। আজও কটেজে ঢোকার মুখে আমি পড়ে গেছি। কে বা কারা আমার ঘরের সামনে জল ঢেলে রেখেছিল জানি না। আলো নেভানো থাকায় দেখতে পাইনি। আমার হাত-পা ভেঙে যেতে পারত। কিছুই না, কাজে ব্যাঘাত ঘটত। তাই তোমাকে কিছু বলে রাখতে চাই।"

সবুজ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অলীকবাবুর দিকে। উনি দরজা খুলে এক বার কটেজের বাইরেটা দেখে আসেন। আবার দরজা ভেজিয়ে বলেন, "আমি একটা বিশেষ কাজে এই দেশে এসেছি। এক জন বিশিষ্ট মানুষের খোঁজে এখানে আসা আমার। তাঁর অধীনে বা বলতে পারো, তাঁর সঙ্গেই আমি একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলাম। স্বভাবতই তাঁর কিছু হলে আমার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যায়। সেই লোকটির নাম আমি তোমাকে বলতে পারছি না। তিনি কিন্তু এই মাসাইমারাতেই আছেন, আর তাঁকে আমি খুঁজে বের করবই।"

"কে তিনি? অনাথবন্ধু নন তো!" বলে হাসে ও, "আর আপনি আমায় এত ব্যক্তিগত কথাই বা বলছেন কেন?" সবুজ বলে ওঠে।

অলীকবাবু করুণ ভাবে হাসেন, "বলছি কারণ আমার এখন যা দুরবস্থা, কারও সাহায্য না-পেলে আমি কিছুতেই কাজটা উদ্ধার করতে পারব না। মনে হল তোমার কাছে আমি সাহায্য পেতে পারি। নাইরোবিতে পা দেওয়ার পর থেকেই আমাকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তবে আমি শেষ অবধি লড়ে যাব। তুমি আমার পাশে থাকবে?"

"আমি আপনাকে সাহায্য করব? আমাকে এই ক'ঘণ্টার আলাপেই চিনে গেলেন?"

"অনেক বছর ছাত্র পড়াচ্ছি। আমি মানুষ চিনতে পারি। প্লেনে সবাই গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। তুমি পারলে না। বিমানসেবিকা আসছে না দেখে নিজেই সিট থেকে উঠে এসে আমার লাগেজ ব্যবস্থা করে রেখে দিলে।"

সবুজের বেশ লজ্জা করছিল। ইনি ওকে প্রথম দেখাতেই কতটা বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু ওর মনে তো ওঁর প্রতি কোনও বিশ্বাস নেই। তবে এই অলীকবাবুকে প্রমাণ ছাড়া আর অবিশ্বাস করবে না ও।

উনি সবুজের একদম কাছে এসে ফিসফিস করেন, "তোমার সঙ্গে দরকারি কথা আছে। মন দিয়ে শোনো। আমি শুধু-শুধু এখানে তোমায় ডাকিনি। কয়েক দিনের মধ্যেই একটা জিনিস তোমাকে রাখতে দেব। সেটা আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। তার পর আগামী ছ'মাসে আমার কোনও খবর না-পেলে, অথবা আমার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে, তুমি সেটা রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের বায়োসায়েন্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর রণজিৎ ত্রিপাঠী অথবা বিশাল ভরদ্বাজের হাতে তুলে দেবে। ওরা ওটা সঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দেবেন। নাম দুটো কোথাও লেখা চলবে না। মনে রাখতে হবে। বুঝেছ?"

ও একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকে অলীকবাবুর দিকে। যে-মানুষটার সঙ্গে ওর বিমানবন্দরে আলাপ হয়েছিল, বা যে অলীকবাবু ওদের সঙ্গে বিকেলে টুর করলেন, তার সঙ্গে এই মানুষটার একেবারেই মিল নেই। ইনি কে? ওকেই বা এত দায়িত্ব দিচ্ছেন কেন?

"তুমি খুব অবাক হয়েছ, তাই না? আমি নাইরোবিতে নামার পরেও জানতাম না তোমার কাছে আমায় এই ধরনের সাহায্য নিতে হবে। ইন ফ্যাক্ট আমি যা-যা ভেবে এখানে এসেছিলাম, সব ওলটপালট হয়ে গেছে। কে বা কারা আমাকে ফলো করছে। শোনো, তোমার ইমেল আইডি আর ঠিকানা ক্যাপিটাল লেটারে লিখে দিয়ে যাও তো।"

উনি সবুজকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দেন। সবুজ সবটা লেখার পর উনি হেসে বলেন, "আমাকেও এটা মুখস্থ করতে হবে। আর-একটা কথা, আমার ঘর থেকে বেরোনোর পর তুমি বাগানে একটু ঘোরাঘুরি করে নিজের ঘরে ফিরে যেয়ো। এই ম্যাগাজ়িনটা দিলাম। এটা আমাকে তুমি আজই ডাইনিং হল-এ সবার সামনে ফেরত দেবে। যাতে তোমার, আমার কাছে আসার একটা অ্যালিবাই তৈরি হয়। আর এর পর থেকে সবার সামনে আমি তোমাকে বিশেষ চিনব না। ঠিক আছে?"

ও সম্মতির ঘাড় নাড়ে।

"যা বললাম, সবটাই তোমার নিরাপত্তার কারণে। সাবধানে থেকো। আর মনে রেখো আমি যেটা দেব, সেটা খুব ছোট একটা জিনিস। কিন্তু মানবজাতির মঙ্গলের জন্য ওটা খুব বড় একটা কাজে লাগতে পারে। কোনও ভাবেই ওই জিনিসটা হাতছাড়া করা চলবে না। আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে ওটা সুরক্ষিত থাকবে বলে আশা করতে পারি।"

সবুজ এত ক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এ বার সে ম্যাগাজ়িনটা হাতে তুলে নেয়। তার পর ওর দিকে তাকিয়ে বলে, "আসি তা হলে। আপনি আমার সদিচ্ছার ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিন্ত থাকুন। বাকিটা কিন্তু আমার হাতে নেই।"

অলীকবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হল খাওয়ার ঘরে। ওঁকে দেখে বাবা-মা ওকে নিয়ে এগিয়ে গেলেও উনি বিশেষ পাত্তা দিলেন না। ওরা অন্য টেবিলে খেতে বসল। নানা রকম আইটেম। সবই পছন্দসই। তবু বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সবুজ। ওর মনে পড়ছিল কিছু ক্ষণ আগে বলা অলীকবাবুর কথাগুলো। আশ্চর্য! এক বার দেখেই কী করে এক জন মানুষ আর-এক জনকে এতটা বিশ্বাস করে!

ওদের সবাইকে খাওয়ার ঘরে দেখে নিউটন এগিয়ে এসে জানাল, পরের দিন ঠিক সকাল ছ'টায় ওদের গাড়ি এসে দাঁড়াবে। ওরা যেন চা বা কফি খেয়ে সময় মতো তৈরি হয়ে নেয়।

পরের দিন সকালে তৈরি হয়ে ডাইনিং হলে কফি খেতে যেতেই দেখা হল অলীকবাবুর সঙ্গে। উনি অত সকালেই স্নান সেরে একদম তৈরি।

"আমাদের সঙ্গে যাবেন তো?" মা'র প্রশ্নের উত্তরে উনি দু'দিকে ঘাড় নাড়িয়ে অসম্মতি জানালেন। ওরা জিপে বসেই দেখল, একটা আকাশি গাড়িতে অলীকবাবু বেরিয়ে গেলেন।

॥ ৭ ॥

এ বারের বেড়ানোটা ললিতা খুব উপভোগ করছেন। জিপের

জানলা দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। সামনে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। তিনি ছাড়া বাদবাকি সবাই এমনকি, সবুজের বাবাও জিপের মাথার ফাঁকের মধ্যে মুন্ডু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্তত গোটা তিরিশের মতো বিভিন্ন আকৃতির গাড়ি সার দিয়েছে রাস্তার উপরে। অথচ এক ফোঁটা শব্দ করছে না কেউ। গাড়ি থেকে দশ হাত দূরের ঘাস-জমিতে বসে আছে বিশাল আকৃতির তিনটি সিংহী। তাদের ছ'টি বাচ্চা ঘাস-জমিতে খেলছে। একটা বড় ওয়াইল্ড বিস্টের মৃত শরীর পড়ে আছে ঘাসের উপর। যেন একটা বনভোজন হচ্ছে। শুধু বাচ্চাদের বাবা, মানে কোনও সিংহ সঙ্গে নেই। মাঝে-মাঝে বাচ্চারা মৃত পশুটির মাংস খেতে যাচ্ছে। বাদবাকি সময় তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করছে। তাদের মায়েদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই মাঝে-মাঝে মায়েরা জোরালো শব্দে হাই তুলছে, ঢেকুর তুলছে।

চার পাশের গাড়ির ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইট ঝলসে উঠছে। নিউটন বলছে, "মোবাইলে ফটো তুললে সাবধানে তুলবেন। মনে রাখবেন হাত থেকে পড়ে গেলে আমি কাউকেই গাড়ির বাইরে গিয়ে মোবাইল কুড়োতে দেব না।"

ললিতা ভাবছিলেন সিংহীদের থেকে কত কম দূরত্বে রয়েছেন তাঁরা। সিংহীরা আক্রমণ করলে বাঁচার কোনও উপায় নেই। তবে তাঁরা ছাড়াও এই পিকনিকের আরও কিছু দর্শক আছে। ঘাস-জমির উপর একটু দূরত্বে সার দিয়ে বসে আছে হায়নারা। তাদের পিছনেই আছে শিয়ালরা। মনে হয় সিংহীরা চলে গেলেই তারা মৃত জীবটির শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাদবাকি সবটুকু অবশিষ্ট তাদের ভোগে যাবে।

সবুজকে দেখলেন ললিতা। ক্যামেরা নিয়ে ফটো তুলতে ব্যস্ত। তার মনে পড়ল অলীকবাবুর কথা। তিনি নিশ্চিত ওঁর সঙ্গে সবুজের বিশেষ কিছু কথা হয়েছে, যা ছেলে তাঁকে জানায়নি। কেননা প্রফেসরের কটেজ থেকে ফিরে আসার পর তিনি ওর মুখে চিন্তার ছায়া দেখেছেন। নিরুপমবাবুকে বলি-বলি করেও কথাটা বলেননি তিনি। ছেলেটাকে আরও লক্ষ করতে হবে। ভিতরে-ভিতরে ললিতা একটু সিঁটিয়ে আছেন। ছেলে যা চাপা স্বভাবের, কোনও কথাই না-বলতে চাইলে বেরোবে না।

সকালে বন থেকে ফিরে ব্রেকফাস্ট খেয়েই আবার বেরিয়ে যাওয়া। জিপে বসেই উসখুস করছিল সবুজ। অলীকবাবু কী অনুসন্ধান করতে মাসাইমারায় এসেছেন কে জানে! ও তো কিছু না-বুঝেই ওঁকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু উনি এখনও পর্যন্ত কিছুই বলেননি। আজ উনি কোথায় গেলেন?

জিপে যেতে-যেতে দিল্লি থেকে আসা দু'জনের সঙ্গেই সবুজের আলাপ হয়ে গেল। ওরাই কথা শুরু করল ওর সঙ্গে। দু'জনেই দিল্লি আইআইটি-র ছাত্র। এক ব্যাচের। এখন চাকরি করছে। এক জনের নাম বিক্রম চৌধুরী, অন্য জন আদিত্য কপূর। ছেলেদু'টি বেশ লম্বা-চওড়া, স্মার্ট, বুদ্ধিমানও। দেশ ঘোরার নেশা আছে। কথাপ্রসঙ্গে আদিত্য বলছিল, "আমাদের দেশের কী নেই বলো! পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল, মরুভূমি, স্থাপত্য... সব আছে, সব। শুধু এদের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে আমরা তুলে ধরতে পারি না, এই যা।"

বিক্রমও বলল, "এর আগে আমরা ইউরোপ ঘুরেছি। ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্সবার্গের গির্জা দেখতে-দেখতে আমার বার বার তাজমহলের কথা মনে হচ্ছিল। সারা পৃথিবীতে তাজমহল একটাই, তাই না?"

সবুজরা চলেছে মাসাইদের গ্রাম দেখতে। ওদের গ্রামে ঢুকতে গেলে মাথাপিছু কুড়ি ডলার দিতে হয়। গ্রামে ঢোকার মুখেই নিজেদের পোশাকে সুসজ্জিত কয়েক জন মাসাইয়ের সঙ্গে আলাপ হল। ওরা ইংরেজিতে বেশ ভালই কথা বলতে পারে। নিজেদের গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাল। কাঁটাতারের ঝোপঝাড় লাগানো বেড়া দিয়ে গোটা গ্রাম ঘেরা। রাতে ওই বেড়াতেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, যাতে জীবজন্তুরা ঢুকতে না-পারে। প্রায় একশো জনের মতো লোক এক-একটা গ্রামে বাস করে। গ্রামের একটা বাড়িতে ঢুকে দেখারও অনুমতি পাওয়া গেল। সারা বাড়িতে একটাই গোল মতো বাতাস ঢোকা-বেরোনোর রাস্তা।

মেয়েদের দূর থেকে জল আনতে হয়। নিউটনের কাছে সবুজ জানতে চাইল, "পথে বন্য জন্তুর আক্রমণে মৃত্যুও হতে পারে তো?"

নিউটন বলল, "মৃত্যু আরও কত ভাবে হয়। এই তো কিছু দিন আগে কী একটা জ্বরে গ্রাম কে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। বাঁচল তো। এমনিতে মাসাইদের সিংহরা খুব ভয় পায়। ওদের লাল পোশাকের আশপাশে কখনও সিংহরা আসে না।

ওখানে মাসাইদের সঙ্গে খোলা উঠোনে নাচল ওরা। মাসাইদের ছোট বাচ্চা আর গবাদি পশুর মল-মূত্রে গ্রামের ওই উঠোনটা ভর্তি হয়ে আছে। সিন্থেটিক জামাকাপড় পরা মাসাই শিশুদের ওই মাটিতে খেলা করতে দেখে খুব মন খারাপ হল সবুজের।

নিউটন কী ভাবে যেন বুঝেছে ওর মনের কথা। সবুজের পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "তোমার মনে হচ্ছে তো, এরা কী ভাবে বাঁচে? এ ভাবেই দিব্যি বাঁচে। আসলে যারা ছোট থেকে যে ভাবে বাঁচতে শেখে, সে ভাবেই বরাবর বেঁচে যায়। পরে হয়তো এদের বাঁচাটা পাল্টে যাবে। এখনই এদের জন্য গ্রামে স্কুল হচ্ছে নানা এনজিও থেকে। বেশ কিছু মাসাই শিক্ষিতও হয়েছে। ইংরেজি লিখতে-বলতে পারে। দু'-এক জনকে তো তুমি রিসর্টেই দেখেছ।"

সবুজ ঘাড় নাড়ে। হয়তো নিউটনের কথাই সত্যি। লেখাপড়া শিখলে এদের জীবনও পাল্টে যাবে। ফেরার পথে নিউটন আর একটা কথা ফিসফিস করে বলল ওকে, "কাউকে বোলো না, তোমাকে একটা খবর দিই। তোমাদের ওই প্রফেসর বড্ড এ-দিক ও-দিক ঘোরাঘুরি করছে! কী ব্যাপার বলো তো?"

সবুজ হাঁ হয়ে গিয়ে বলে, "কে? প্রফেসর অলীকবাবু?"

"হ্যাঁ, উনিই হবেন। তবে আগে যখন দেখেছি, ওঁর মাথায় টুপি ছিল না। অত মন দিয়ে খেয়াল করিনি তখন। উনি এখানে এসে একটা মোপেড চেপে একা ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এমনকি, মনে হচ্ছে দিনের আলো থাকাকালীন বেশ কিছু দিন ওঁকেই আমি জঙ্গলে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। বারবার এখানে উনি আসতেই বা যাবেন কেন?"

সবুজ যা বোঝার বুঝে নেয়। এ ব্যাপারে আর নিউটনের সঙ্গে কথা না-বাড়ানোই ভাল। রাতে শুয়ে-শুয়ে অলীকবাবুর কথাই ভাবছিল ও। ললিতা আস্তে-আস্তে এসে বসলেন ওর পাশে। মাথার চুলে বিলি কাটতে-কাটতে বললেন, "ওই মাসাইটা হাতে তৈরি বাজনাটা কী সুন্দর বাজাচ্ছিল, তাই না? কী যেন নাম বাজনাটার?"

সবুজ অন্যমনস্ক ভাবেই বলে, "ওয়ানডেন্ডো।"

ললিতা একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, "কী এত ভাবছিস বল তো? আবার কোনও ঝামেলায় জড়ালি নাকি?"

সবুজ এবারও একই ভাবে সায় দিল গলার আওয়াজে, "হুঁ।"

॥ ৮ ॥

সকালেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে ওদের নাইবাসা যাওয়ার কথা। গাড়িতে উঠে খুব অবাক হয়ে গেল সবুজ। ওদের গাড়িতেই একদম পিছনে একা-একা বসে আছেন অলীকবাবু। ওঁর পায়ে একটা ব্যান্ডেজ। ওকে দেখে এক মুখ হেসে অভ্যর্থনা করলেন, "এসো, এখানে বসো।"

পাশে বসে ও জিজ্ঞেস করল, "পায়ে কী হল? ব্যান্ডেজ বেঁধেছেন। আপনি কি নাইবাসা যাবেন নাকি?"

উনি হাসলেন। তার পর অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "ওই জুতোতে পেরেক উঠেছিল। ফুটে গিয়ে একটু রক্ত বেরোল। বিষিয়ে যাতে না-যায় সেই জন্য এই ক্রেপ ব্যান্ডেজটা জড়িয়েছি। ও ছাড়ো, আমার একটু কাজ আছে। তাই তোমাদের সঙ্গ ধরলাম।"

সবুজ বোঝে, সবার সামনে কথাটা উনি বাড়াতে চাইছেন না। বলে, "টিটেনাস ইঞ্জেকশন নিয়েছেন তো?"

অলীকবাবু ঘাড় নাড়েন। সবুজ ডায়েরি খুলে গত দিনের অভিজ্ঞতা লিখে রাখছিল। ঠিক আগের দিনটা বড় ভাল কেটেছে ওদের। মাসাইদের গ্রাম থেকে ঘুরে আসার পর লাঞ্চ খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়েছিল ওরা। উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গল-সাফারি। বনের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে ও গোধূলির আলোয় দেখেছিল বড়-বড় গাছ আর ঘাস-বনে হাতি, জিরাফ, আর হরিণ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মন দিয়ে যে-যার খাবার খেতে ব্যস্ত।

নাইবাসা যাওয়ার পথে ওরা বসেছিল একদম পিছনের সিটে। নিউটন এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে, হঠাৎ অলীকবাবু নিজের বুকপকেট থেকে একটা পেন ড্রাইভ বের করে ওর হাতে ঢুকিয়ে দিলেন। ও সঙ্গে-সঙ্গে সেটা প্যান্টের ভিতরের পকেটে রেখে দিল। উনি খুব নিচু গলায় ওকে বললেন, "গাড়িতে গান বাজছে, আওয়াজ হচ্ছে, অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এখানেই কথাগুলো বলা ভাল। তুমি জানো নিশ্চয়ই, মনুষ্যবসতি এখন ভীষণ ভাবে ভাইরাস-অধ্যুষিত। ভ্যাকসিন মানুষকে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত করতে পারেনি। আমি আর আমার এক বন্ধু সে-বিষয়েই গবেষণা করছি। আমাদের গবেষণা সফল হবে কি না জানি না। তবে সফল হলে পৃথিবী ভাইরাসমুক্ত হতে পারবে। প্রাথমিক ভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা তো আগেই হয়েছে। আমাদের কাজ অনেকটাই এগোলেও এখনও বেশ কিছু পরীক্ষা বাকি। আর ঠিক এই সময়েই কেউ কাজটা ভন্ডুল করে দিতে চাইছে। আমাদের পরীক্ষা মূলত বিভিন্ন পশু নিয়ে। মানুষ আক্রান্ত হলেও, কী কারণে পশুসমাজ পাশাপাশি থেকেও সে-ভাবে বিপদে পড়েনি, সেটাই আমরা দেখছি। কিন্তু কিছু ব্যবসায়ীর মদত পাওয়া গুন্ডারা প্রতি মুহূর্তে আমাদের পিছু নিচ্ছে। ব্যবসায়ীরা আগে থেকেই এই গবেষণার স্বত্ব কিনে নিতে চায়।"

সবুজ হাঁ করে তাকিয়েছিল ওঁর মুখের দিকে। মানুষ এখনও সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত নয়। আবার নতুন করে ওই রোগের সংক্রমণের আশঙ্কা বিজ্ঞানীরা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। এঁরা যদি এ কাজে সফল হতে পারেন, তা হলে মানুষের বড় উপকার হয়।

কিন্তু একটা প্রশ্ন ওর মাথা থেকে যাচ্ছে না। ও জানতে চাইল সেটা, "আচ্ছা পশুদের ক্ষেত্রে কী ভাবে এর প্রয়োগ হবে? সে তো অসম্ভব ব্যাপার।"

"খুব ভাল প্রশ্ন করেছ। কথাটা ভাবার। তবে পশুদের ক্ষেত্রে একটা শৃঙ্খল কাজ করে। জীবজগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক আছে জানো তো? সে ক্ষেত্রে ওই শৃঙ্খল ব্যবহার করেই সমস্যার সমাধান করব আমরা।"

"তার মানে অনাথবন্ধুর মতোই আপনারা পৃথিবীকে ভাইরাস-মুক্ত করতে চান।"

"তা বলতে পারো। সে ভাবেই ভাবা হচ্ছে। তবে ওঁর কাজের পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের মিল না-ও থাকতে পারে।"

উনি গাড়ির জানলা দিয়ে এক বার বাইরে তাকালেন। তার পর ওকে ইঙ্গিত করলেন বাইরের দিকে তাকাতে। এক দল হাতি জঙ্গলের গাছের ডাল ভেঙে পাতা খাচ্ছে। অলীকবাবু তাদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে ওকে বললেন, "এরা কিন্তু পোষ মানে না। আফ্রিকার হাতিরা বন্য হয়। হাতি আর জলহস্তীরা আমিষাশী হলে, জীবজন্তু খেলে, কবে অরণ্যের সব প্রাণী শেষ হয়ে যেত।"

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলায় সবুজ একটু অবাক হয়। তাকিয়ে দেখে দিল্লির ছেলে দুটো, ডাক্তার-দম্পতি এমনকি, ওর মা-বাবা সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। আর মন দিয়ে ওঁর কথাই শুনছেন।

অলীকবাবু চুপচাপ বই পড়ছেন। ওঁর কথা বন্ধ হতে চোখ বুজে চুপচাপ বসেছিল সবুজ। এক টানা যেতে-যেতে একটু ঘুম পাচ্ছিল ওর। হঠাৎ টের পায় উনি ওর ঘাড়ের দিকে হেলে গিয়ে জানলা দিয়ে কিছু দেখার ভঙ্গি করে ফিসফিস করে কিছু কথা বলছেন। কান খাড়া করে ও। উনি বলছিলেন, "আমি বাঁচি না-বাঁচি, আমার কাজ যেন খোয়া না-যায়, সে দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। আমার পেন ড্রাইভটা তুমি সামলে রেখো। যাদের নাম বলেছি, তাদের না-পেলে উপযুক্ত জায়গায় জমা দিয়ো, কেমন?"

সবুজ ঘাড় নাড়তেই আবার নিজের সিটে বসে বইয়ে ডুবে গেলেন উনি। ও জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে-দেখতে ভাবছিল, এই সব মানুষ আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর! তবে পৃথিবীর মনুষ্যবসতি

এমনই থাকবে কি না, সেই নিয়েও তো সংশয় দেখা দিয়েছে।

সবুজ ভাবছিল, এ বিষয়ে ও যদি কোনও ভাবে একটু সাহায্যও করতে পারে, সেটা অনেক বড় কাজ হবে। আর একটা কথাও মনে হচ্ছিল ওর। অলীকবাবু বলছেন ওঁর এক বন্ধু সঙ্গে আছে। সে কে? ওঁর পায়ে জুতোর পেরেক ফোটার ব্যাপারটা একেবারেই সাধারণ ঘটনা নয়। পেরেকটা জুতোতে কেউ যে আটকে রেখে গেছিল, এটা বোঝাই যাচ্ছে। আর বড়সড় বিপদের আশঙ্কাতেই উনি ওকে এ রকম একটা দায়িত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু সেই লোকেদের হাত থেকে ও কি পারবে অলীকবাবুকে আর ওঁর বন্ধুকে বাঁচাতে?

ভাবতে-ভাবতে কখন যেন ওর চোখ লেগে গিয়েছিল। তাকাতেই দেখল, মা ওকে ডাকছেন, "কী রে, ওঠ! নামতে হবে তো। নাইবাসা এসে গেছে।"

ও পাশের সিটের দিকে তাকিয়ে দেখে অলীকবাবু নেই। তা হলে সবটাই কি ওর কল্পনা? ভাবতে-ভাবতেই প্যান্টের পকেটের ওই জায়গাটায় হাত দিতেই টের পায়, কিছু একটা ওখানে রাখা আছে। আশ্বস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেয় ও।

॥ ৯ ॥

নাইবাসার প্রধান আকর্ষণ জলহস্তী। রিসর্টের ভিতরেই খাল কাটা আছে। সেখানে জলহস্তীরা নামে। এ ছাড়া রিসর্টের মধ্যে ঘাস-জমিতে তারা রাতে ঘাস খেতে আসে। জলহস্তীরা নিরামিষাশী। তবে ভয়ঙ্কর। যদি ওদের সামনে কোনও মানুষ পড়ে, আর ওরা তাকে বাধা মনে করে, তা হলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

নাইবাসা পৌঁছনোর পর থেকেই প্রফেসরের সঙ্গে সবুজের দেখা হয়নি। বিকেলে ওঁকে ছাড়া সবাই পাশের লেকে নৌকা চাপতে গিয়ে আবিষ্কার করল, লেকটা একেবারেই জলহস্তীর ঘরবাড়ি। দিল্লি থেকে আসা আদিত্য আর বিক্রমের সঙ্গে সবুজের বেশ ভাব হয়ে গেছে। ওরা এর আগে নৌকা চালিয়েছে। মাঝে-মাঝে মাঝির হাত থেকে দাঁড় নেওয়ার জন্য ওরা বেশ পীড়াপীড়ি করছিল। মাঝি রাজি হল না।

মাঝির রাজি না-হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। বিরাট বড় লেকের জলে সারা ক্ষণ বুদ্বুদ উঠছে। যেখানে-যেখানে বুদ্বুদ, তার পাশ দিয়ে নৌকা চলে যাচ্ছে। কেননা ওখানেই জলের নীচে জলহস্তী আছে। মাঝে-মাঝে ভুস করে জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলছে ওরা। জলহস্তী দেখে, ওদের কথা শুনে, সবুজের মা ললিতা খুব ভয় পাচ্ছিলেন। ওঁকে মাঝি আশ্বস্ত করে বলল, "এ পর্যন্ত জলহস্তীরা কখনও নৌকা ডুবিয়ে দেয়নি।"

জুলাই-অগস্ট মাসে মাসাইমারার জন্তুরা হাজারে-হাজারে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে, মানে সেরেঙ্গেটি থেকে মাসাইমারার দিকে আসে। ওরা এদিকে আসে ঘাস খেতে। সেই যাওয়া-আসাটাকেই 'গ্রেট মাইগ্রেশান' বলে। মূলত, জেব্রা আর ওয়াইল্ড বিস্টেরা যায়। মারা নদী পেরিয়ে যাওয়ার সময় মারা নদীর কুমিরেরা ওদের ধরতে পারলেই খায়। কিন্তু ওই নদীতে জলহস্তীও থাকে। কুমিরেরা যখন কোনও ওয়াইল্ড বিস্ট বা জেব্রাকে খাওয়ার জন্য তাড়া করে, তখন কোনও জলহস্তীর চোখে পড়লে কুমিরকে আটকে ওই জন্তুটাকে পেরোতে সাহায্য করে। জলহস্তীর হাঁ এত বড়, সিংহ, কুমিরেরাও ওকে ভয় খায়। ওর চোয়ালের পুরোটা খুলে গেলে যে কোনও বড় জন্তুর মাথা তাতে ঢুকে যেতে পারে।

লেক থেকে ফিরে ডাইনিং হলে চা খেতে যাওয়ার সময়ই রিসর্টের তরফ থেকে ওদের জানিয়ে দেওয়া হল, রাতে একা-একা ডাইনিং হল থেকে নিজের কটেজে যাওয়া-আসা চলবে না। গার্ড লাগবে। সন্ধে নামলেই জলহস্তীরা লেক থেকে রিসর্টে ঘাস খেতে উঠে আসে তো। তখন তাদের সামনে পড়লে আর বাঁচার আশা নেই।

নাইবাসায় পৌঁছনোর পর থেকেই অলীকবাবুর সঙ্গে সবুজের আর দেখা হয়নি। ওঁর জন্য সারা ক্ষণ চিন্তাটা মাথার মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছিল ও। অদ্ভুত পরিস্থিতিতেই সেই দেখাটা হয়ে গেল। রাতে ডিনার করার সময় সবুজের বাবার হঠাৎ মনে পড়ল, তিনি খাওয়ার আগের ওষুধটা আনতে ভুলেছেন। কথাটা শুনেই সবুজ শোরগোল না-তুলে, কাউকে কিছু না-বলে, এক দৌড়ে কটেজে গিয়েছিল ওষুধ আনতে। সাহসে ভর করে একা-একাই ফিরছিল। পিছন থেকে কে যেন জোর গলায় ওকে দাঁড়াতে বলল। ও দাঁড়াতেই অন্ধকারের আড়াল থেকে অলীকবাবু সামনে এগিয়ে এসে টর্চের আলোটা সোজা বাগানের দিকে ফেললেন। দাঁড়িয়ে থাকা জলহস্তীর চোখে আলোটা পড়তেই সে ধীরে-সুস্থে অন্য দিকে হাঁটা দিল। সবুজ আঁতকে উঠে তাকাতেই উনি বললেন, "সঙ্গে রিসর্টের গার্ড নিয়ে আসা উচিত ছিল। তুমি দেখোনি, কিন্তু ঠিক তোমার পিছনেই জলহস্তীটা আসছিল।"

ও ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে বসল, "সকাল থেকে আপনি কোথায় ছিলেন?"

উনি বললেন, "সাবধানে থেকো," তার পর যেমন এসেছিলেন তেমনি অন্ধকারে মিশে গেলেন।

॥ ১০ ॥

"ওই দেখো 'নাইলাক ব্রেস্টেড রোলার', ওটা আফ্রিকার একটা বিখ্যাত পাখি," নাকুরু লেকের ধারে দাঁড়িয়ে সবুজের কাঁধে হাত রেখে কথাটা বললেন অলীকবাবু। আফ্রিকার এই লেক খুবই বিখ্যাত। লেকের জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও।

এ দিনের গন্তব্য সুইট ওয়াটার। সুইট ওয়াটারে যাওয়ার পথেই ওরা এসেছে বিখ্যাত লেক নাকুরুতে। নিউটন পাহাড়ের উপর নিয়ে গেল। সেখানে বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত শহরের দিক নির্দেশ করা হয়েছে তির চিহ্ন দিয়ে। ওই জায়গা থেকে কলকাতা শহরের দূরত্ব কত, তা-ও বোর্ডে লেখা আছে। নাকুরু লেকের পাশের চরায় নানা রকমের পাখি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। অলীকবাবু সেই দিকে তাকিয়ে সবুজকে বলছিলেন, "ভাইরাসের আক্রমণে যখন সারা পৃথিবী সন্ত্রস্ত, তখন একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে, সেটা জানো কি? অন্য দেশ থেকে কত-কত পাখি আমাদের দেশে এসেছে। আমার মুম্বইয়ের ফ্ল্যাটের জানলা খুললে একটা লেক দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে অন্য বছরগুলোয় যত সংখ্যক পাখি আসে, তার চেয়ে এ বারে অনেক-অনেক বেশি পাখি এসেছে। কেন বলো তো? তার একটাই কারণ, পরিবেশে দূষণের মাত্রা অনেক কমেছে।"

নাকুরু লেকে পাখি দেখার সময় হঠাৎই অলীকবাবু ওর পাশে এসে ওকে পাখি চেনাতে শুরু করেছিলেন। পাখি দেখাতে-দেখাতে উনি গলা নামিয়ে বলছিলেন, "আমি খুব বিপদের মধ্যে আছি। তবে এর মধ্যেই আমাকে বিশেষ এক জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তোমার দায়িত্ব তুমি পালন কোরো।"

কথা বলতে-বলতেই উনি অন্য দিকে চলে গিয়েছিলেন। কিছু ক্ষণ পরে ওঁকে আর খুঁজে পায়নি ও। সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফটো তুলছিল। নিউটন সবাইকে তাড়া দিয়ে গাড়িতে উঠতে বলছিল। ওকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, "প্রফেসর তো একটু আগেই অন্য গাড়িতে চলে গেলেন। তোমাকে কী বলছিলেন উনি?"

"উনি আমাকে পাখি চেনাচ্ছিলেন।"

নিউটন সাদা দু'পাটি দাঁত বের করে হাসল, "চিনলে পাখি? এখানকার পাখি বা যে কোনও প্রাণী সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে আমাকে বোলো। আমার কাছে ফটো দেওয়া বই আছে। সেটা দেখলে তুমি সব জানতে পারবে।"

সবুজ তখনকার মতো ওকে আর ঘাঁটায়নি। মুখের ভাবে চিন্তার ছাপও পড়তে দেয়নি। মাথার মধ্যে একটা কথাই ঘুরছিল ওর। অলীকবাবু বিপদে আছেন। ওঁকে কী করে বিদেশ-বিভুঁইয়ে সাহায্য করা যায়।

লাখ-লাখ প্রাণীর স্থান পরিবর্তন দেখতে, ইচ্ছে করেই সবুজরা মাসাইমারায় এসেছে জুলাই মাসে। অলীকবাবু বলছিলেন, "কী বলব সবুজ, মানুষের জন্য পৃথিবীতে কিছু-কিছু প্রাণী একেবারে লোপ পেতে

বসেছে। তুমি জানো, সাদা গন্ডার পাওয়া যায় এক মাত্র এই লেক নাকুরুর ধারে। ওদের সংখ্যা এখন মোটে পঁচিশে ঠেকেছে। আর কিছু দিন পরে পৃথিবীতে ওদের খুঁজেই পাওয়া যাবে না।"

নাকুরু লেক দেখে, অলীকবাবু ছাড়া ওরা সবাই সুইট ওয়াটারে এসেছে। ওদের থাকার রিসর্টটা ভারী সুন্দর! এ রকম জায়গায় আগে কখনও থাকেনি ও। গাছের ডালে তৈরি শক্তপোক্ত মাচার উপরে তাঁবুর মতো ঘরের ব্যবস্থা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই ঘরে ঢুকতে হয়। তাঁবু বলতে সচরাচর যে ছবি ভেসে ওঠে, তার সঙ্গে ওই ঘরের কোনও মিল নেই। পরিপাটি ব্যবস্থা। এমনকি বাথরুম দেখেও বোঝা যায় না যে ওরা লগ হাউসে আছে।

সুইট ওয়াটারে থাকাকালীন, কী ভাবে খোলা আকাশের নীচে অরণ্যের মধ্যে মুক্ত ভাবে শিম্পাঞ্জিদের রাখা হয়েছে, নিউটন সে সব দেখাতে জিপে করে নিয়ে গেল ওদের। রাতে ডিনারের পর ডাইনিং হলের ভিতরে সোফায় বসেছিল সবাই। বাইরে থেকে এক জন মাসাই কর্মচারী হলে ঢুকে কিছু বলতেই সবাই হুড়মুড় করে ছুটল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল পরিখার ওপারে একটা চিতার দলছুট হরিণকে তাড়া করার বাস্তব দৃশ্য। মা বললেন, "সিনেমায় এমন আকছার দেখায়। অনেক ভাগ্য করলে খালি চোখে এমন দেখা যায়!"

রাতে শোয়ার আগে জামা-প্যান্ট খোলার সময় ভিতরের পকেট থেকে পেন ড্রাইভটা বের করে নিতে গিয়ে প্যান্টের পাশের পকেটে রাখা একটা কাগজ ওর হাতে ঠেকল। তাতে বড়-বড় করে ইংরেজিতে লেখা— 'বোকারাই অন্যদের গোলমালে নিজেকে জড়ায়। সাহস দেখায়। বেশি সাহস ক্ষতিকারক।'

বড়-বড় টাইপে ইংরেজি ভাষায় কথাগুলো লিখে ওর প্যান্টের পকেটে অজান্তে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এটা আবার কে করল? তবে কি অলীকবাবুর কাছের মানুষ ভেবে কেউ ওর উপরও নজর রেখেছে?

রাতেই নিউটনের ফোন এল। পরের দিন ও মাসাইমারার বিখ্যাত 'মাইগ্রেশান পর্ব' দেখাতে নিয়ে যাবে। সকাল ন'টায় যাত্রা শুরু। সবার জন্য ও রিসর্টের কিচেনে প্যাকেট লাঞ্চ আর জলের বোতলের ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছে। ওগুলো গাড়িতে তুলে নেওয়া হবে। অন্তত পাঁচ-ছ' ঘণ্টা ওখানেই থাকতে হবে।

সবুজ শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল কাগজটা কখন ওর পকেটে এল? কিছুতেই ভেবে কূল-কিনারা করতে পারছিল না। তার পর খেয়াল হল নাইবাসা ছেড়ে সুইট ওয়াটারে আসার পর থেকে ও জামা পাল্টায়নি। গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ার পর অথবা রাতে ঠেলাঠেলি করে ঝুঁকে চিতার শিকার দেখার সময় কেউ ওর জামার পকেটে এই চিরকুট রাখতে পারে। প্রথমটাতেই সুযোগ বেশি। নির্ঘাত ওর সঙ্গে প্রফেসরের যোগাযোগের ব্যাপারে কেউ কিছু অনুমান করেছে। এ বারে তো সাবধান হতেই হবে।

রাতে অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল সবুজের। তাঁবুর দরজা তো চেন টানা থাকে। হাওয়ায় পর্দার মতো দরজাটা পতপত আওয়াজ করছে। চেন টানা নেই। তা হলে কি ওদের ঘরে কেউ ঢুকেছিল? দরজা ভাল করে না-দিয়েই চলে গেছে। বাকি রাতটা তেমন ঘুম হল না। ভোরের দিকে সবুজ দেখল একটা বড় কুমির ওদের তাঁবুর ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ঘুরে যাওয়ার সময় সবুজকে খুব জোরে একটা লেজের ঝাপট মারল।

ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। মা ডাকছেন ওকে, "উঠে পড়। আটটা বাজে। নিউটন বলেছে ন'টায় রওনা দেবে।"

॥ ১১ ॥

গাড়ির মধ্যেই বসে আছে ওরা। মারা নদীর জল এ সময়ে কম। চার থেকে পাঁচ ফুট জলের গভীরতা, কোনও-কোনও জায়গায়। কোথাও আবার আরও কম। হেঁটে-হেঁটেই পেরিয়ে যাওয়া যায়। সবুজ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। নদীর ধারেই ওয়াইল্ড বিস্ট আর জ়েব্রার ভিড়। অনেক দর্শনার্থী-গাড়িও এসে দাঁড়িয়েছে। এক-দু'হাজার ওয়াইল্ড বিস্ট আর জ়েব্রা জড়ো হয়েছে ওখানে। ওদের পথে নামার কারণ একটাই। আবহাওয়া বদলের কারণে যেখানে বৃষ্টি হচ্ছে, সেখানেই বড়-বড় ঘাস জন্মাচ্ছে। ওদের এই দল বেঁধে যাত্রা, যেটাকে মাইগ্রেশান বলে, তার মূলে রয়েছে খিদে নামক এক সহজাত প্রবৃত্তি। ওরা ছুটছে ওই ঘাস খেতে। বছরের পর-বছর ওরা এ রকম ভাবেই স্থান পরিবর্তন করে। ও-দিকে জ়েব্রা, ওয়াইল্ড বিস্টের বিরাট দলটা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দলপতির কাছে কোনও সিগন্যালের অপেক্ষায় ছিল হয়তো। সেটা পেয়ে এক জন জলে নামতেই সবাই হড়বড়িয়ে মারা নদীর জলে নামা শুরু করল। কোনও রকমে জল পেরিয়েই ও-পারে উঠে ছুটতে শুরু করেছে।

নদীর ও-পারটা নদী থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু। এবড়ো-খেবড়ো সেই পথেই হুড়মুড়িয়ে উঠে না-গেলে ওদের কুমিরের খাদ্য হওয়াই ভবিতব্য। নদীতে সবাই মিলে ঝাঁপ দিতেই জলে বিকট শব্দ উঠেছে। কুমিরেরা সেই শব্দ শুনে ওদের ধরার জন্য ছুটে যাচ্ছে। জলের মধ্যে ঝটাপটি চলছে। আট-দশ জনকে মুখে ধরে নিয়ে জলে ডুব দিচ্ছে কুমিরেরা। শুধু এক জায়গায় নয়। মারা নদীর তীরের বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হওয়া প্রাণীরা এ ভাবেই মৃত্যু আর নদীকে একই সঙ্গে পেরিয়ে যাচ্ছে।

সবুজদের সামনেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল। দুটো বাচ্চা ওয়াইল্ড বিস্ট পার হতে না-পেরে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করল। অন্য পারে ওদের মাকে দেখতে পাচ্ছে সবুজরা। সে-ও ছটফট করছে। এ পাশে আবার সিংহরা বাচ্চা দুটোকে ধরবে বলে এগিয়ে যাচ্ছে। জলে কুমির, ডাঙায় সিংহ। ঠিক তখনই নায়কোচিত স্টাইলে একটা জলহস্তী ওই বাচ্চাদের আড়াল করে দাঁড়াল। বিশাল ওজনের জলহস্তীকে সিংহ, কুমির দু'পক্ষই ভয় পায়। ওদের হাত থেকে বাচ্চাদের প্রাণ বাঁচাল ওই জলহস্তী। দর্শকেরাও সকলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

বনের নিয়ম এক রকম। সেখানে খাদ্য-খাদকের বিরোধের সম্পর্ক প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে। মানুষের নিয়ম আরও জটিল। যে রক্ষা করবে বলে এগিয়ে এল, তারই জীবন-সংশয়। না হলে অলীকবাবুর মতো মানুষকে এমন ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়? যত ক্ষণ না উনি দেশে ফিরছেন, তত ক্ষণ উনি বিপন্মুক্ত নন। আর ওই মানুষটির খোঁজ না-পাওয়া অবধি উনি ফিরতেও পারবেন না।

মারা নদীর তীরের মাইগ্রেশান পর্ব দেখতে-দেখতেও সবুজের চিন্তার বিরাম হয়নি। ও বেশ ভাল মতোই বুঝতে পারছে, অলীকবাবু খুব শিগগিরই বিপদে পড়বেন আর ও সেই বিপদে কোনও ভাবেই ওঁর পাশে থাকতে পারবে না। কেননা কয়েক দিনের মধ্যেই ওদের চলে যেতে হবে। নিউটন হঠাৎ ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

"কেমন দেখছ এই মাইগ্রেশান? আগামী কাল আবার আসব। ইচ্ছে করলে তুমি আমার সঙ্গে আসতে পারো।"

"কালকের দিনটা বিশ্রাম নেব। তা ছাড়া একই জিনিস বার বার দেখে কী হবে?"

কথা বলতে-বলতেই ও গাড়ির দিকে এগোতে থাকে। নিউটন বার বারই ওকে প্রফেসরের কথা জিজ্ঞেস করছে। গাড়ি স্টার্ট নেয় না। ওই ডাক্তার, তার স্ত্রী, ওদের বাচ্চা আর দিল্লির ছেলে দুটো একদম ফিরতে ইচ্ছুক নয়। সবুজের বাবা-মাও দিব্যি সিটের উপর দাঁড়িয়ে গাড়ির খোলা মাথার মধ্যে দিয়ে মুন্ডু বাড়িয়ে ওই অভিনব মাইগ্রেশান উপভোগ করছেন।

কিন্তু ও উৎসুক হয়ে আছে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করার জন্য। কথা না-বললে ও কিছুতেই বুঝতে পারবে না অলীকবাবুর কাজ কত দূর এগোল। তা ছাড়া ওর মনে এক অদ্ভুত আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। সেই অতীন্দ্রিয় ভাবনা, মানে সিক্সথ সেন্স বলছে, ওঁর যে-কোনও মুহূর্তে ক্ষতি হতে পারে। উনি বিপদের মধ্যেই বাস করছেন।

॥ ১২ ॥

নিউটন একটা কথা বলেছে ফেরার পথে, যেটা সবুজকে খুব ভাবিয়েছে। নিউটন বলছিল, "মাসাইরা ভাবে পৃথিবীতে যত গরু আছে, সব গরুর তারাই মালিক। ঈশ্বরই তাদের জন্ম থেকে এই

সম্পদের অধিকারী করেছেন। ফলে কারও কাছে গরু থাকলে সে গরু যেভাবে হোক দখলে আনলে কোনও অন্যায় করা হয় না।"

কথাটা শুনতে-শুনতে ওর মনে হচ্ছিল, তা হলে কি এই অধিকারবোধের জন্যই পৃথিবীতে এত গোলমাল? যেমন অলীকবাবু ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করলে সব মানুষের উপকার হবে। কিন্তু কিছু মানুষ ভাবছে ওই আবিষ্কারের মর্যাদা এবং বিক্রয়বাবদ টাকা তাদেরই প্রাপ্য। অতএব, মানুষটাকে শেষ করে ফেলো, আবিষ্কারটা ছিনিয়ে নাও।

রাতে খাওয়ার ঘরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অলীকবাবুর সঙ্গে। উনি যে এই সুইট ওয়াটারেই আছেন, সেটাই ও জানতে পারেনি। তবে সবার সামনে ওদের যে উনি এড়িয়ে চলছেন, সেটা ও স্পষ্ট বুঝতে পারল। ওকে দেখে একটু হাসলেন। তবে সে হাসিতে কোনও আমন্ত্রণ নেই। ওঁর কাজকর্মের খবর জানার জন্য ছটফট করলেও, খাওয়ার সময় বাবা-মা'র সঙ্গে অন্য টেবিলে বসল ও।

খেতে-খেতে পুরো টুরটার কথাই ভাবছিল। বেড়ানো খুবই ভাল হয়েছে। অলীকবাবুর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না-থাকলে আরও ভাল হত। এ-দিক ও-দিকে তাকাতে-তাকাতেই মুখে খাবার ঢোকাচ্ছিল সবুজ। হঠাৎ ও লক্ষ করল চার-পাঁচ জনের একটা দল এসে ঢুকল রেস্তরাঁর মধ্যে। ওদের চোখের দৃষ্টি বলছে কাউকে ওরা খুঁজছে।

কিছু একটা হতে চলেছে, মনে হতেই ওর মাথায় ক্লিক করল কথাটা। তবে কি এরাই তারা, যাদের কথা ইশারা-ইঙ্গিতে বহু বার বলছেন অলীকবাবু? সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের হাতে চাপ দিয়ে কিছু না-বলার ইঙ্গিত দিল ও। ছেলে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেও ললিতা কোনও কথা বললেন না। এগোতে-এগোতে নজরে এল কোনও টেবিলেই অলীকবাবু নেই। দ্রুত চিন্তা করে টয়লেটের দিকে গেল সবুজ।

হাতে চাপ দিয়ে সবুজের খাবার টেবিল থেকে উঠে যাওয়ার সময় মন দিয়ে দাঁতে আটকে যাওয়া মাংসের কুচি বের করছিলেন ললিতা। ছেলের ঝট করে উঠে যাওয়াটা আটকাতে না-পারলেও চমকে মুখ তুললেন তিনি। নিরুপমকে আলতো ভাবে ঠেলে প্রায় স্বগতোক্তির সুরে জানালেন, "সবুজ এই মাত্র খাওয়া ছেড়ে উঠে গেল কিন্তু!"

নিরুপম বললেন, "ঠিক আছে। টয়লেটে গেল হয়তো!"

সবুজ সোজা গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। যা ভেবেছে, তা-ই। অলীকবাবু নিশ্চিন্তে হাত ধুচ্ছেন বেসিনে। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিতেই ঘুরে দাঁড়ালেন উনি। একা সবুজকে এগিয়ে আসতে দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। তার পরে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তুমি? ওরা কি এসে গেল তা হলে?"

ও বলল, "কী ভাবে পালাবেন জানি না। কিন্তু যেতেই হবে। "

টয়লেট থেকে বেরোনোর আর কোনও পথ নেই। সবুজ একটু চিন্তা করে নিজের পোশাক দ্রুত ছাড়তে লাগল। অলীক ওর ইঙ্গিত বুঝতে দেরি করেননি। তিনিও নিজের পোশাক খুলতে শুরু করলেন। সবুজের টুপি, রংচঙে জামায় তাঁকে একেবারেই চেনা যাচ্ছিল না। সবুজের বাহারি ফ্রেমের চশমা চোখে আটকে একেবারেই ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। সাদা ফুল হাতা শার্ট পরা সবুজকে খাওয়ার টেবিলে ফিরে আসার পর ললিতা অবাক হয়ে দেখছিলেন। কিন্তু নিরুপমের তাড়ায় তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন তিন জনে। ফেরার পথে কেউ কোনও কথা বলেননি। ঘরে এসেও ভাবছিল ও, অলীকবাবু পালাতে পারলেন তো? পরে ওই লোকগুলোকে আর চোখে পড়েনি।

সকালে ঘুম ভাঙার পর হই হই কাণ্ড! এই রিসর্টের এত বছরের ইতিহাসে বোর্ডারের নিরুদ্দেশ হওয়ার কোনও রেকর্ড ছিল না। সব জায়গায় সার্চ হবে। প্রফেসর অলীকবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। উনি গত কাল রাতে ডিনার খেয়েছেন। কিন্তু তার পর থেকেই ওঁকে কেউ দেখেনি। তাঁবুর চেন টানা ছিল। নিভাঁজ বিছানা বলছে, সেখানে কেউ শোয়নি। সকালে ঘর পরিষ্কারের লোক প্রথম বিষয়টা বুঝতে পেরে রিপোর্ট করে। একটা পোশাকের প্যাকেট ডাস্টবিনে পাওয়া গেছে। তদন্তের সময় ডাইনিং হলের এক ওয়েটার জানিয়েছে, ওটাই পরে গত রাতে উনি ডাইনিং হলে খেতে গিয়েছিলেন।

সবুজ ঘুম থেকে ওঠার পর সবটা ওর বাবার কাছেই শুনল। নিরুপম বললেন, "ভাগ্যিস পোশাকগুলো কাল রাতে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। আমাদের কটেজ থেকে ওগুলো পাওয়া গেলে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হত।"

সবুজ হাসে, "ওটুকু বুদ্ধি তো থাকতেই হবে।"

ললিতা শুয়ে পড়ার পর বাবা আর ছেলে দু'জনে মিলেই ওই ফেলার কাজটা করেছিল। নিজেদের পোশাকের মধ্যে ওই প্যাকেট দিব্যি লুকিয়ে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বাইরের বড় ডাস্টবিনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ললিতা ভ্রু কুঁচকে সবুজের নতুন পোশাকটা দেখেছিলেন ডাইনিং হলে। হয়তো সবটা নিজে-নিজেই বুঝেছেন বলেই তক্ষুনি আর কিছু জানতে চাননি। সার্চের প্রসঙ্গে বাবা সংক্ষেপে সবটাই জানিয়ে দেন।

সার্চ করার কথা বললেও কোনও কটেজেই অনুসন্ধান হয়নি। বাবা বললেন, "নর্মাল কার্টসি না-মানলে ওদের ব্যবসা মার খাবে তো।"

পুলিশের গাড়ি এসেছিল। ওরা প্রত্যেক কটেজের বাসিন্দাদের সম্পূর্ণ ঘটনাই মেল করে জানিয়ে অনুরোধ করেছে, এই নিরুদ্দেশের ব্যাপারে কিছু জানা থাকলে বা ভবিষ্যতে কোনও কিছু জানলে তক্ষুনি জানিয়ে দিতে।

ললিতা খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বার বার বলছিলেন, "সবুজ যেটুকু জানে জানাতে পারত। ওদের উপকার হত হয়তো।"

নিরুপম হাসছিলেন, "তুমি ওকে চিনলে না। এ বার একটু বিশ্বাস করো। বলার হলে কি বলত না?"

সে দিনের প্রোগ্রাম মাঠে মারা গেল। কথা ছিল গাড়ি নিয়ে আরও এক বার মারা নদীর ধারে যাবে ওরা। কিন্তু রিসর্টের সমস্যায় সে ইচ্ছে আর পূরণ হল না। তা ছাড়া নিউটন জানাল, তার শরীর সে রকম ভাল নেই। তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে সে।

পরের দিন ওরা আট জনেই চলল নিউটনের জিপে চেপে, আবার মাইগ্রেশান দেখতে। অলীকবাবু চলে যাওয়ার পর এই প্রথম বার ওরা তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করছে। তাই আবহাওয়া একটু থমথমে। নিউটনেরও তেমন মুড নেই। নিজে থেকেই বলল, "আপনারা গন্ডার দেখতে যাবেন? তা হলে মাইগ্রেশানের পর্ব মিটলে আবার যাওয়া যাবে।"

মাইগ্রেশান দেখার পর্ব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেরার পথে নিউটন গভীর বনে নিয়ে গেল ওদের। বিকেলের নরম আলোয় ওরা দেখল পুরুষ ও মহিলা গন্ডারের ফাঁকে একটা শিশু গন্ডার দিব্যি খেলা করছে। নিরাপত্তার কারণে একদমই কাছে যাওয়া চলবে না। সেখান থেকেই গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে গন্ডার পরিবারের খেলা দেখছিল ওরা। এখানকার গন্ডারদের দুটো শিং। পরস্পরকে ঠেলছে, ফেলে দিচ্ছে। সেটাই ওদের খেলা। মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গীয় কোনও দৃশ্য, পিছনের নীল আকাশ আর সবুজ গাছপালার টাঙানো পর্দার সামনে ভেসে উঠেছে।

এত কিছুর মধ্যেও অলীকবাবুর চিন্তা ওর মাথা থেকে যায়নি। ওঁকে ও টয়লেট থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তার পর এই বন-জঙ্গলের মধ্যে উনি কোথায় গেলেন? রাতে বাবা-মা'র সঙ্গে ডাইনিং হলে বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়েই খেল ও। আনমনা থাকায় একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, তা ছাড়া মাথায় চিন্তাটাও আছে। তাই খেয়েদেয়ে রিসর্টের পিছনের বারান্দার আধো অন্ধকারে একা-একাই পায়চারি করছিল। মনে একটাই ভাবনা, অলীকবাবু স্বস্থানে পৌঁছেছেন তো? হঠাৎ ভুঁইফোঁড়ের মতো তিন-চার জন উপস্থিত হয়ে ঘিরে ধরতেই সবুজ সচেতন হল। কিন্তু তখন আর কিছুই করার নেই।

॥ ১৩ ॥

ঘুম ভাঙল একটা অন্ধকার ঘরে। সাধারণ কোনও বাড়ির ঘর বলেই মনে হল সবুজের। এটাই আশ্চর্যের যে, ওর হাত-পা বাঁধা নেই। আসলে ওরা জানে, এখান থেকে কোনও ভাবে পালালেও বনের মধ্যে সিংহ বা চিতার পেটে যেতে হবে। তাই ও সে ঝুঁকি নেবে না। উঠে দরজা পর্যন্ত

চলে গেল ও। দরজাটা বাইরে থেকে দেওয়া। টেনে বিশেষ লাভ হল না। একটু বাদে চোখ সয়ে যেতে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। একেবারেই সাদাসিধে একটা ঘর। আসবাব বলতে মেঝেয় গদির উপরে মাদুর পাতা আর এক কোণে একটা টেবিল-চেয়ার। জলের বোতলও রাখা আছে। ঢকঢক করে বেশ কিছুটা খেয়ে নিল সবুজ। মাথার ঠিক পিছনে একটা ব্যথা, আর কোমর টনটন করছে। কাল রাতের কথা কিছুই মনে পড়ছে না। খালি ওরা যে ওকে ঘিরে ধরেছিল, সেটুকুই মনে আছে। মনে নেই, কিছুই মনে নেই। ঘুম পাচ্ছে খুব। ঘুমের ওষুধ বোধ হয় জলেই মেশানো ছিল। ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে মুখে-চোখে জল দিতে-দিতে একটু হালকা লাগল। কিন্তু বেশি ক্ষণ চোখ খুলে রাখা যাচ্ছে না। গদির বিছানায় গিয়ে শরীর এলিয়ে দিল সবুজ।

ঘুম ভাঙল যখন, তখন বাইরের আলো কমছে ক্রমশ। এ ঘরে একটি মাত্র জানলা। একটা হলুদ দেওয়াল ছাড়া সেখান থেকে আর কিছুই দেখা যায় না। ওকে কারা কেন তুলে নিয়ে এসেছে, তার কিছুই জানে না ও। মনে-মনে ভাবল, ওরা যদি ভেবে থাকে ওকে চাপ দিয়ে কথা বের করবে, তা হলে ভুল ভেবেছে। হঠাৎ ওর নজরে এল টেবিলের উপর একটা ডিশ চাপা দেওয়া প্লেট আছে। জোর খিদে পেয়ে গেছে। ওরাই কিছু খাবার রেখেছে হয়তো। বিষ মেশানো থাকলেও খাবে ও। সারা সকাল-দুপুর পেটে কিছুই পড়েনি।

ডিমের ডালনা আর একটু শুকনো হয়ে যাওয়া খান তিনেক রুটি। কেমন খেতে ভাবার আগেই সবটা শেষ করে ফেলল সবুজ। বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে আসতেই নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে এল দু'জন মানুষ।

ঘরে নির্ঘাত সিসিটিভি লাগানো আছে। ওরা নইলে খাওয়া শেষ হতেই ঢুকল কী করে? স্থির হয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে সবুজ। আফ্রিকার লোক। পেল্লায় চেহারা। চুপচাপ এসে সবুজকে দু'পাশ থেকে ঘিরে দাঁড়ায় তারা। প্রথম প্রশ্নটাই অলীকবাবুকে নিয়ে, "ওই প্রফেসরকে তুমি কত দিন চেনো?"

রাগের চোটে সবুজ প্রথমে ভাবছিল উত্তর দেবে না। তার পরে মনে হল সেটা এক ধরনের বোকামি হবে। ওরা ওকে সন্দেহ করবে আর ঝামেলা পাকাবে। মারধোর তো করতেই পারে। আর বিশালাকার মানুষ দু'জনের মারও ভয়ঙ্কর হবে।

কথাবার্তা সবই চলছিল ইংরেজিতে। তবে সবাই কথা বলছিল না। ওদের মধ্যে এক জন কালো গেঞ্জি আর সাদা হাফ প্যান্ট পরেছিল। প্রশ্ন সে করছিল। তার ডান দিকের ভ্রূ কাটা। ওদের মধ্যে ও-ই একটু সুশ্রী দেখতে।

খুব সহজ ভাবেই সবুজ বলল, "ওঁর সঙ্গে এখানে আসার সময় প্লেনে আলাপ হয়। তার আগে জীবনে কখনও ওঁকে দেখিনি।"

"তবে তুমি ওঁর কটেজে গিয়েছিলে কেন?"

মনের ভয় সরিয়ে ও বলল, "অনেক দিনের আলাপ না-থাকলে কেউ কারও ঘরে যায় না বুঝি? ওঁকে আমি প্লেনেই লকারে জিনিস রাখতে সাহায্য করি। তার পরে আমাদের জিপেই উনি মাসাইমারায় আসছিলেন। তখনও গল্প হয়। তাই উনি যেতে বললে, ওঁর ঘরে গিয়েছিলাম।"

"উনি কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছেন, বলতে পারো?"

"মানে? আমি কী করে জানব? তা ছাড়া গা-ঢাকা দিয়েছেন বলছ কেন? উনি কী ভাবে নিখোঁজ হয়েছেন, কে বলতে পারে?"

কালো গেঞ্জি উঠে দাঁড়ায়, "এই চল। এ ভাবে হবে না। ছোকরা বহুত চালু। ওকে না-খেতে দিয়ে ফেলে রাখ। তবে যদি কিছু বলে।"

একটা দিন কেটেছে। গত কাল সন্ধের পর থেকে সবুজ এখনও এক ভাবেই আছে। পেটে কিছু পড়েনি ওর। জলের বোতল ঘরেই রাখা ছিল। এক ঢোক, দু'ঢোক করে খেয়ে জলটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই বোতলের জলটুকুই যা ভরসা। এটুকুও শেষ হয়ে গেলে কী হবে কে জানে! তবে ছোট থেকেই বাবা একটা কথা বার বার বলেছেন ওকে, "যা হওয়ার, তা-ই হয়। যা ঘটার, তাই ঘটে। মাথা ঠান্ডা রাখলে অনেক বিপদ সামলানো যায়। এড়ানো যায়।"

এই মুহূর্তে কোনও কথাই মাথায় আসছে না। শরীরও দুর্বল। ধীরে-ধীরে গিয়ে জানলায় দাঁড়ায় ও। সামনে সেই এক হলুদ দেওয়াল। একে তো না-খেয়ে শরীর ঝিমঝিম করছে, তার উপর ওই একঘেয়ে হলুদ দেওয়াল দেখতে-দেখতে ও পাগল হয়ে যাবে। আস্তে-আস্তে মেঝের উপরেই বসে পড়ে। ঠিক মনে নেই, কত ক্ষণ ঘুমিয়েছিল। ঘড়ির ঢং ঢং আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। এই বাড়ির কাছাকাছি গির্জা আছে মনে হয়। ঘুম ভেঙে টের পায়,মেঝেয় গদির ওপরে পাতা মাদুরে ও শুয়ে আছে। ঘর অন্ধকার।

গলা শুকিয়ে কাঠ। হাতে কী যেন কামড়াচ্ছে। চার পাশের অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে রাস্তার এক ফালি আলোর ঘরে ঢোকা টের পায়। সেই আলোয় আবছা নজরে আসে, মেঝেয় সারি দিয়ে চলেছে পিঁপড়েরা। তাদেরই দু'-একটা হয়তো কামড়েছে ওকে। মেঝেয় পাতা গদি, মাদুরের নীচে সারি দিয়ে ঢুকছে। কোথায় যাচ্ছে ওরা ?

একটু আগেই মায়ের কথা মনে হচ্ছিল ওর। ওর জন্য ভাবতে গিয়ে হয়তো কিছুই খাচ্ছেন না মা। তা ছাড়া ওদের যাওয়ার টিকিট কাটা ছিল, কিন্তু যাওয়া হল না। এ সব নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই হাত দিয়ে মেঝে হাতড়ায় ও। মেঝেতে মোটা গদির উপরেই মাদুর-বিছানো। গদি উঁচু করে তার নীচ দিয়ে পিঁপড়ের পিছু পিছু হাত বাড়ায়। হাতে কী একটা ঠেকে। গোল কড়ার মতো। ওকে শাস্তি দিতে আলোর কানেকশন অফ করে দিয়েছিল ওরা। শাপে বর হল সেটাই। অন্ধকারেই হিড়হিড় করে গদি সরায় ও।

কিছুটা পরে কোনও মতে গাড়ির ঝাঁকুনিগুলো সহ্য করার চেষ্টা করছিল সবুজ। কেননা চলমান গাড়ির পিছনের ডিকিতে শুয়ে আছে ও। গাড়ির ডিকিতেই ওকে ঢুকিয়েছে নিউটন। বিনা বাক্যব্যয়ে ওর কথা শুনেছে সবুজ। শরীর কুঁকড়ে শুয়ে আছে। ডালায় চাবি দেওয়া হয়নি। মাঝে-মাঝে সামান্য ঠেলছে ভিতর থেকে আর হাওয়া ঢুকছে। এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। একদম বাঘের গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাঘেরা এত ক্ষণে সব রাস্তায় লোক বসিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

নিউটন বলেছিল, "ডিকির ভিতরে ঢুকে পড়ো। আপাতত ওটাই নিরাপদ জায়গা।"

যে-ঘরে ওরা ওকে আটকেছিল সেই ঘরটার মেঝের নীচে যে বেরোনোর একটা রাস্তা আছে, সেটাই বোঝা যায়নি। সম্ভবত ওই বাড়িটা ওদের স্থায়ী আস্তানা। তাই পালানোর একটা পথও রেখেছে। পরে সবুজের মনে পড়েছে, ওকে ওরা অন্য ঘরে ঢোকাচ্ছিল। সে ঘরটায় হয়তো কোনও কারণে একেবারেই জায়গা ছিল না। তাই ওকে এই ঘরে ঢুকিয়েছে। বোধ হয় ভুলে গেছিল যে, ওর বন্দি থাকার ঘরেই পাতাল-পথ আছে।

গদি সরাতেই আংটাটায় হাত পড়ে। অন্ধকারে কিছুই না-দেখে, শুধু ওটা ধরে নাড়াচাড়া করতেই মেঝের খানিকটা সরে যায়। আর ও বুঝতে পারে ভাগ্যের জোরে একটা পালানোর পথ পেয়েছে, আর সেটাকেই ব্যবহার করতে হবে। ওই ফাঁকের নীচেই একটা দড়ির মই ঝুলছিল। সেটা বেয়ে নীচে নামতেই একটা টানা ঘর। ঘরের শেষের দরজাটা ভিতর থেকেই দেওয়া। ঘরটার মধ্যে অন্ধকারে নেমে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি ও। তার পরে চোখ সইয়ে নিতেই স্কাইলাইটে বাইরের আবছা আলো এসে পড়ায় দরজাটা নজরে আসে। ওটা খুলতেই পথ। বনের ভিতর দিয়েই রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে খানিক এগোতেই লোকালয়। লোকালয়ে পৌঁছে একটা ছোটখাটো দোকানদারের কাছ থেকে ফোন নিয়ে, ঠিকানা জেনে, সাবধানে নিউটনকে সবটা জানিয়ে, ফোন করে ও। তার পর এই ডিকি-যাত্রা। দোকানে সময়টা কিছুতেই কাটতে চাইছিল না। ভয়ে-আতঙ্কে সিঁটিয়ে ছিল সবুজ। অবশেষে নিউটন এসে ওকে উদ্ধার করেছে।

ওখান থেকে আসার সময় একটা কাণ্ড করেছিল সবুজ। ওই নীচের ঘরের এক কোণে জড়ো করা ছিল কিছু কাপড়। সে রকম একটা কাপড় জড়িয়ে নিয়েছিল শরীরে। তখন না-বুঝলেও পরে ও দেখেছে, সারা শরীর আর মুখ চাপা দেওয়ার জন্য ওই কাপড় নেওয়াটা খুবই

কাজের হয়েছে। লালের উপর ডোরা দেওয়া মাসাইদের ব্যবহৃত কাপড়। না-দেখেই সেই কাপড় একটা শরীরে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল শেষ মুহূর্তে। নিউটন বলেছিল, সিংহরা ওই মাসাইদের কাপড়কে খুব ভয় পায়। ওই কাপড় শরীরে জড়ানো থাকলে ওরা কাছে আসে না। কিন্তু অন্য জন্তুদের হাতে, ওই পথে, যে কোনও মুহূর্তে সবুজের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সংক্ষিপ্ত বনের পথে বোধ হয় ভাগ্যের জোরেই কোনও বিপত্তি হয়নি। তবে রাস্তায় পৌঁছে যাওয়ার পর ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেছিল আর কোনও বিপত্তি হবে না। ও ঠিক পৌঁছবে নিরাপদ আশ্রয়ে।

সে দিন নিউটনের ফোন ক্রমাগত বাজছিল। ও গাড়ি চালাতে-চালাতেই ফোন ধরে হতভম্ব! আগের দিন থেকেই সবুজের খোঁজ শুরু করেছে সবাই। আর হঠাৎ সবুজ কথা বলতে চাইছে। এ যে মেঘ না চাইতেই জল!

॥ ১৪ ॥

প্রচণ্ড ঝাঁকাচ্ছিল গাড়িটা। পথ না-থাকলেও যদি যেতে হয় যেমন লাগে, ঠিক তেমনই লাগছে। ঠিকানায় পৌঁছে ডিকির ডালাটা খুলে দিল নিউটন। এ রকম গভীর বন সবুজের পক্ষে কোনও দিন কল্পনা করাও সম্ভব হত না। চার দিকে বড়- বড় গাছ তার ঝুরি নামিয়েছে। নিউটনের গাড়ি থেকে নামার পর কিছুটা হেঁটেই ওরা পৌঁছল সেই গ্রামে। চৌকো একটা ঘাস-জমিতে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে নিউটন। সেখান থেকেই ওর নজরে এল গ্রামটা। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ ফুট লম্বা বাঁশের ফ্রেমে গাছপালা লাগিয়ে সারা গ্রামটাকে ঘেরা হয়েছে। বাঁশগুলো দেখলেই বোঝা যায় বন থেকে কাটা। গাছের ডালপালাও তাই। নিউটন জানাল, গ্রামের ভিতরে বাস করছে প্রায় হাজার খানেক গরু আর দশ-পনেরোটি পরিবার।

"এই হল আসল মাসাই গ্রাম," নিউটন ওকে বলেছিল।

"আর আমাদের যে গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলে, সেটা তা হলে গ্রাম নয়?"

"সেটা হল সাজানো গ্রাম। ওটা দেখেই পর্যটকেরা ডলার দেয়। মাথাপিছু কুড়ি ডলার। উন্নয়নের জন্য কম নয়।"

মাসাই গ্রামটি অনেকখানি জায়গা নিয়ে। বাড়িগুলো ছাড়া-ছাড়া। গরুদের উঠোনেই রাখা হয়। উঠোনের মাটি কাদায় পিছল হয়ে আছে। গ্রামের মোড়লের পিছু-পিছু কয়েক জন মাসাই বেরিয়ে এসেছিল, মোড়লও এসেছিল। মোড়লই ওই গ্রামের বৈদ্য। মানে কারও কোনও রকম শরীর খারাপ হলে এই বৈদ্যরাই নানা গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি করে দেয়।

নিউটন ওদের সঙ্গে ওদের ভাষায় বেশ কিছু ক্ষণ কথা বলেছিল। আলোচনার সারসংক্ষেপ জানিয়েছিল ওকে। এখানে দু'-তিন দিন ওকে থাকতে হবে। তার পর নিউটন এসে ওকে নিয়ে যাবে।

ও অবাক হয়ে বলেছিল, "সে কী! আমি কী করে এখানে একা থাকব? আমি এদের ভাষা বুঝি না। তার উপর এদের জীবনযাত্রাও অন্য ধরনের।"

"না-না, একা থাকবে কেন? তোমাকে এক জন সঙ্গী দেওয়া হবে," নিউটন ওর সাদা দাঁত বের করে হাসে।

"সঙ্গী মানে আমি। আমার সঙ্গে থাকতে পারবে তো?" কথা বলতে-বলতে এগিয়ে আসা মানুষটিকে দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়েছিল সবুজ। আর দেখেছিল মাসাইদের পোশাকে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং অলীকবাবু। ওর চোখে আনন্দে জল বেরিয়ে আসছিল তখন। নিউটন হাসছিল। অতি কষ্টে ঠোঁট চেপে নিজের চোখের জল আটকায় ও।

নিউটন তত ক্ষণে হাত নেড়ে গাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছে। ওকে চলে যেতে হবে। নতুন আসা যাত্রীদের দায়িত্ব আছে। তা ছাড়া ওকে না-দেখতে পেলে যে-কেউ সন্দেহ করতে পারে।

"আপনি এখানে কী করে এলেন? সে দিন রাতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর কিছুই তো জানতে পারিনি।"

“আরে আমি তো বাথরুম থেকে বেরিয়ে কিচেনে ঢুকেছিলাম। কিচেনের বাইরে বেরোনোর দরজা খুলে কোনও রকমে ছুট দিয়েছি। কোথায় যাব, কী ভাবে যাব, কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। রিসর্টের গাছপালার আড়ালে নিজেকে ঢাকা দিয়ে চলেছি, হঠাৎ দেখি নিউটন গাড়ি ঘোরাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে ওকে বলতেই ও আমাকে তুলে নিল গাড়িতে। তার পর আমার কথামতো এই গ্রামে পৌঁছে দিল। এই গ্রামটা আমার পরিচিত। আমি এখানে আগেও এসেছি।”

“এই গ্রামটা আপনার পরিচিত?”

“হ্যাঁ। কেন, কী ভাবে, সে সব পরে এক দিন বলা যাবে।”

অলীকবাবুর ইশারা মতো ওঁর পিছু-পিছু হাঁটছিল ও। একটু আগেই নিউটনের কাছে বাবা-মা’র খবর নিয়েছে। মন সে জন্য খুব খারাপ হয়ে আছে। মা কিছুই প্রায় খাচ্ছেন না। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বাবা হাজার বোঝালেও কাজ হয়নি। ডাক্তাররা ছাড়া আইটি সেক্টরের দুটো ছেলেও ওই রিসর্টে থেকে গিয়েছে। ছেলে দুটোর মেলামেশার জড়তা কেটেছে। সবুজের বাবা-মা প্রায় ওদের ভরসাতেই রয়েছেন।

সবুজ নিউটনকে বলেছিল, “বাবা-মাকে ইঙ্গিত দিয়ো যে, আমি ভাল আছি।”

নিউটন হাসছিল, “ইঙ্গিত দিলে, ওরা যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান? তা ছাড়া ওদের ভাবভঙ্গি লক্ষ করেই অনেকে অনেক কিছু বুঝে যাবে। কাজেই আপাতত আমি মুখ বুজেই থাকব।”

বিপদ আছেই। তাই নিউটনের কথার উত্তর দিতে পারেনি ও। মনে হচ্ছে সবই সম্ভব। তাই ওর কথা মেনে নেওয়াই ভাল।

অলীকবাবু যে ভাবে উধাও হয়েছিলেন, ওর মনে হয়নি এত তাড়াতাড়ি ওঁর সাক্ষাৎ পাবে। ওঁর জন্য মাসাইরা নিজেদের বাড়ির মতো একটা গাছ-পাতার তৈরি মাটি লেপা ঘর দিয়েছে। ওদের ঘরগুলো থেকে একটু দূরে বানানো এই ঘরে আগে কেউ থাকেনি মনে হয়। বেশ অন্য রকম ঘরটা। দরজা খুব নিচু। ঘরের মাথায় পাতা ছাওয়া। সবুজ মাথা নামিয়ে ওঁর পিছু-পিছু ঢুকল সেই ঘরে। জানলা নেই। একটা গর্ত করা আছে ঘরের মাঝখানের চৌকো জায়গাটার দেওয়ালে। ঠিক তার নীচেই প্রফেসরের রান্নার সামান্য সরঞ্জাম আর স্টোভ রাখা হয়েছে।

অলীকবাবু জানান, “এ সব ব্যবস্থা নিউটন করেছে। এরা তো কাঁচা মাংস, দুধ আর রক্ত এক সঙ্গে মণ্ড পাকিয়ে খায়। আগে জল খেত না। এখন কী করে জানা নেই। কেননা এখন অনেকেই স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করছে। সভ্য জগতের অনেক অভ্যেসও রপ্ত করছে। আগেকার অনেক কিছুই হয়তো আস্তে-আস্তে পাল্টে যাবে।”

উনি সবুজকে বললেন, “তোমার খুব সমস্যা হবে। এখানে আমাদের মতো সভ্য মানুষদের থাকার খুবই অসুবিধে। নিউটন এসে আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ায় খাবার বানিয়ে খেতে অসুবিধে হচ্ছে না। তবে স্নান করা যাচ্ছে না। কেননা, জলের অভাবে এরা কেউ স্নান করে না। ওরা আমাকে বালতিতে এক বালতি জল দিয়ে যায়। তাতেই সব কাজ সারতে হয়। প্রাকৃতিক কাজকর্মের জন্য বনই ভরসা।”

সবুজ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওঁর দিকে। অলীক ওর ঘাবড়ে যাওয়া মুখ দেখে একটু হাসেন। হাসি থামিয়ে বলেন, “এখানে জলে কুমির, ডাঙায় সিংহ। তবু মেয়েরা কলসি নিয়ে জল আনতে যায়। অবাক হোয়ো না। আমাদের দেশে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মাইলের পর-মাইল হেঁটে মেয়েরা কুয়ো থেকে নিজের পরিবারের জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করে। তার পর আবার অনেক রাস্তা পেরিয়ে বাড়ি ফেরে।”

“জানি, রাজস্থানে।”

“আরও অনেক জায়গাতেই। তুমি জওয়ানদের কথা ভাবো। সীমান্তের বরফে ঢাকা জায়গায় তারা যুদ্ধ করে, সীমানা পাহারা দেয়। তারা কি রোজ স্নান করতে পারে? এক মগ জলই সেখানে অনেক। তোমাকে আর উদাহরণ দেব না। তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। বেঁচে থাকার জন্য, নিজেদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ অনেক কিছুই করে, যা তার নিত্য দিনের অভ্যেসে থাকে না। আমরা এখানে লুকিয়ে আছি কেন, সেটা ভাবলেই তুমি সব উত্তর পেয়ে যাবে।”

সবুজ উঠে দাঁড়ায়। মনে-মনে ও ভেবে নিয়েছে, অলীকবাবুর কথামতোই চলবে। ঘরের মাথা বেশ নিচু। দেওয়ালের গায়ে দু’পাশে দুটো মাচা করা। ওখানেই শুতে হবে। নিজের মাচা থেকে একটা চাদর হাতে তুলে ওকে দিতে-দিতে অলীকবাবু বলেছিলেন, “এগুলো সব আমি নিউটনকে দিয়ে আনিয়েছি। তুমি দেখো, ওই ঝুড়িতে আপেল, কলা আর পাউরুটি রাখা আছে। তোমার তো খিদে পেয়েছে। একেবারে খিদে মিটিয়ে শুয়ে পড়ো।”

সবুজ বলে, “আপনার কাজ মিটেছে?”

অলীক ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান, তার পর বলেন, “এখন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নাও। কাল সকালে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবে।”

৷৷ ১৫ ৷৷

নিরুপমবাবু আর ললিতাকে রীতিমতো রিসর্টের আতিথেয়তায় রাখা হয়েছে। ম্যানেজার বলেছেন, “যত দিন খুশি এখানে থাকুন। আপনার ছেলে এখান থেকেই নিখোঁজ হয়েছে। ওর খবর না-পাওয়া পর্যন্ত আপনাদের সব দায়িত্ব আমরাই নেব।”

সবুজই বা গেল কোথায়? অলীকবাবুকেও তার আগের দিন রাত থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। পর পর মানুষগুলো কি উবে যাচ্ছে?

ললিতার মন খুব খারাপ হয়ে আছে। সে দিন রাতে ডাইনিং হলে সবুজ ভারী অদ্ভুত আচরণ করেছিল। খাওয়ার পরে একটা অন্য পোশাক পরে চলে এসেছিল। তবু তিনি কিছু জানতে চাননি। তিনি বুঝেছিলেন এর পিছনে গূঢ় কোনও কারণ আছে। পরে অলীকবাবুর উধাও হওয়ার পর অনেকটাই অনুমান করতে পেরেছিলেন। সবুজের বাবাও জানিয়ে দেন সবটা। কিন্তু তার পর থেকে তো ছেলেকে নিয়েই দুশ্চিন্তায় আছেন। এখন তার মনে হচ্ছে সে দিনই যদি ছেলেকে কিছু বলতেন, ব্যাপারটা এত বাড়তে পারত না। এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। তাঁরা এখনও যে স্থির আছেন, তার পিছনে নিউটনের অবদান অনেকখানি।

নিউটন তাঁকে এক ফাঁকে এসে বলে গিয়েছে, “সবুজ ঠিক আছে। আমি জানি সব। তবে আমার কাছে এর পর কিছু জানতে চাইলে সুবিধে হবে না। আমি পরিষ্কার বলব, আমি কিছু জানি না। আর একটা কথাও বলে রাখি, আপনাদের হাবেভাবে বা মুখের কথাতেও কেউ যদি টের পায় সবুজের খবর আপনারা রাখেন, তা হলে ওকে বা আপনাদের বাঁচাতে পারব না। এই দুঃখী-দুঃখী হাবভাবই বজায় রাখুন।’’

আর-একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। বেড়াতে এলে সব সময়েই তিনি প্রসাধনীর ব্যাগে সিঁদুর রাখেন। একটা প্লাস্টিকে কৌটোটা মুড়ে পাতলা ওই ব্যাগে রেখে দেন। সে দিন ব্যাগ খুলে তিনি অবাক। প্লাস্টিকের ওই মোড়কটায় দ্বিতীয় ভাঁজ দিয়ে কী যেন একটা মুড়ে রাখা আছে। খুলে হাতে নিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন নিরুপমবাবুকে, “এটা তো পেন ড্রাইভ? এখানে কে রাখল? তুমি?”

উনি একটু গম্ভীর ভাবেই পুরোটা আবার মোড়কবন্দি করে বললেন, “হ্যাঁ, এটা পেন ড্রাইভ। সম্ভবত তোমার ছেলের কাজের জিনিস। নিরাপদ জায়গা ভেবেই ওখানে রেখেছে। তুমি একটু খেয়াল রেখো, ওটা যাতে হারিয়ে না যায়।”

সে দিন রাতেই তাঁবুর ভিতর চোর ঢোকে। তবে তার কিছু চুরি করার মতলব ছিল বলে মনে হল না। সে হাতড়েছিল জামা-কাপড়ের ব্যাগ আর সুটকেস। তার পর সবুজের ব্যাগটা টেনে বাইরে নিয়ে যায়। সামনের বাগানে চেন খোলা, সেই ব্যাগে জামাকাপড় যেমন ছিল, তেমনি আছে। শুধু সবক’টার ভাঁজ খুলে একেবারে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। কিন্তু ডায়েরি, কাগজপত্র কিছুতে হাত দেয়নি। তাঁবুর পাশে একটা গাছের টবের আড়ালে পড়ে ছিল ব্যাগটা। তাঁরা কুড়িয়ে এনেছেন। সবুজের ডায়েরিটা সুটকেসেই ছিল। পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে ললিতার নজরে এল ডায়েরির পাতায় এলোমেলো দুটো বক্তব্য লেখা হয়েছে।

‘অলীকবাবু কী খুঁজছেন? মাসাইমারা এলেন কেন?’

ললিতার বেশ আশঙ্কা হল। ছেলেটা কি কোনও কিছুতে জড়িয়ে পড়ল?

বাগানে একটা ফোয়ারার পাশের ধাপে একা বসে-বসে সে কথাই ভাবছিলেন ললিতা আর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। হঠাৎ দিল্লির আদিত্য এসে হাজির। ক’দিন ধরেই এরা তাঁদের দেখাশোনা করছে।

আদিত্য অন্য কোনও কথা না-বলে সোজাসুজি জানতে চায়, “আপনারা কবে যাচ্ছেন?”

আচমকা ওর প্রশ্নে বেশ অবাক হন তিনি। তাঁরা কবে যাবেন জেনে ও কী করবে? তবে ওকে সেটা বুঝতে দেন না। শান্ত ভাবেই বলেন, “আমাদের ছেলের কোনও খবর নেই। এ সময়ে তাই যাওয়ার ব্যাপারে কিছু ভেবে উঠতেই পারছি না। তোমরা কিছু ঠিক করলে?”

আদিত্য হাসে, “আমরাও ভাবছি। দেখি কবে যাওয়া যায়।”

ও চলে যাওয়ার পর ললিতা নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান। সবুজের বাবাকে বিষয়টা জানাতে হবে। উনি বার বার ললিতাকে বলেছেন, এ সময়ে কেউ কিছু জানতে চাইলে, সবুজ বা তাঁদের সম্বন্ধেও ন্যূনতম কৌতূহল দেখালেও উত্তর এড়িয়ে যেতে। উনি তা-ই করছেন। তবে আদিত্যর কৌতূহল তাঁকে ভারী অবাক করেছে। তিনি এ-ও লক্ষ করেছেন, বিক্রম কিছু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে ঢুকে তিনি অবাক হলেন, সবুজ যে ভাঁজ-করা আফ্রিকার মানচিত্র নিয়ে এসেছিল, সেটা বিছানার উপর বিছিয়ে নিরুপমবাবু কী যেন দেখছেন। তাঁকে দেখেই বললেন, “ললিতা, এসো, দেখে যাও, এই হচ্ছে কেনিয়া। আমরা এখন যে জায়গাটায় আছি, সেই ‘সুইটওয়াটার’, দেখো। এই যে এখানে।”

ললিতা ঝুঁকে মানচিত্র দেখতে-দেখতে এক বার ভাবেন আদিত্যের কথা তিনি ওঁকে জানাবেন। তার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের বদল করেন। না, এখন কিছু বলবেন না। শুধু নজর রাখবেন। দেখা যাক না, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

॥ ১৬ ॥

সবুজ একটু চিন্তায় আছে। অলীকবাবু বলছিলেন, “নিউটনের কাছে শুনলাম তোমার বাবা-মা এই বিপদে পড়ায় ওদের ট্র্যাভেল এজেন্সির অনুরোধে এয়ারলাইন্স কিছু ছাড় দিয়ে টিকিট করে দেবে বলেছে। তা তুমি ফিরে যাও।”

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগে অলীকবাবুর মুখে কথাটা শুনে ওর খুব মন খারাপ হয়েছিল। তা হলে কি উনি ওকে আর সঙ্গে নিতে চাইছেন না?

ওর মুখের আলো নিভে যাচ্ছে দেখেই হয়তো অলীকবাবু আমাজ়নের গল্প শুরু করেন।

“আমাজ়নের গল্পটা শুনেই নাও। কবে কোথায় ছিটকে যাব। আমাজ়ন নদী বিশাল। না-দেখলে ভাবতেও পারবে না,” অলীকবাবু একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান।

সবুজ হাঁ করে ওর কথা শুনছিল। বলে, “আমি দেখেছি তো।”

“কোথায় দেখেছ?” ঘরের অন্য মাচায় বসেছেন অলীকবাবু। সেখান থেকেই প্রশ্ন ছোড়েন।

“সিনেমায়। আমাজ়ন নদীর উপর বাংলায় একটা সিনেমা হয়েছিল।”

অলীক হাসেন, “সিনেমা দেখে কিছুই ধারণা করা যায় না। ওই নদী অনেক চওড়া, অনেক লম্বা। সে বর্ণনা দেওয়াই বৃথা। না-দেখলে এ ভাবে কতটা আর বোঝাতে পারব,” বলেই ঝপ করে উনি সবুজের পাশেই বসে পড়েন।

“ওই নদীর কুমিরের কথা কী বলবেন বলছিলেন?” সবুজ মনে করিয়ে দেয়।

“হ্যাঁ, ওই নদীর বৈশিষ্ট্য হল ওতে প্রচুর পিরানহা মাছ আছে। জলে নামলেই যে-কোনও জীবজন্তুকে তা খেয়ে শেষ করে দেবে। আর ওই নদীর আশপাশের বাসিন্দারা কুমির খায়। এক দিন রাতে ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম কুমির শিকারে। আমাজ়ন নদীর কুমিরেরা বিশাল বড়-বড় হয়। এক-একটা কুড়ি-পঁচিশ ফুটের মতো। চড়া থেকে কুমিরের ছোট এক বাচ্চাকে ধরা হল। সেটা নদীর বুকে ভাসমান চড়ায় ঘুরছিল। ওগুলো দেখতে চড়ার মতো হলেও আসলে জমাট বাঁধা কচুরিপানা, শ্যাওলা ও আরও অনেক কিছু। ভাসমান চড়া। কেউ দাঁড়ালেই ভুস করে ডুবে যাবে। কুমিররা শুয়ে থাকতে পারে। কুমিরের বাচ্চাটা এমন কিছু বড় নয়। একটা বড় মাপের রুই মাছের মতো সাইজ়। ওরা ভেবেছিল ‘বারবিকিউ’ করে, মানে আগুনে ঝলসে খাবে। অন্ধকার রাত। আমরা কুমিরের বাচ্চাকে নিয়ে নৌকায় রওনা দিলাম। তার পরের ঘটনা জীবনেও ভুলব না। আমাদের মাথায় হেলমেটের মতো আলো লাগানো ছিল। তাতেই যা দেখেছি, সারা জীবন মনে থাকবে।”

“মানে? কী হয়েছিল তার পরে?”

“বিশাল নদীর বুকে আমাদের নৌকো চলেছে। হঠাৎ ওই আলোয় দেখি এক বিশাল কুমির চলেছে আমাদের নৌকার পাশেপাশে। এক-এক বার ডান দিকে এক-এক বার বাঁ দিকে ভেসে উঠছে। প্রথমে ব্যাপারটা বোঝা যায়নি। যারা নৌকা চালাচ্ছিল, তারা ভয় পাচ্ছিল খুব। বলছিল, এত বড় কুমির তারাও এর আগে দেখেনি। এ যদি আক্রমণ করে, বাঁচার রাস্তা নেই। লেজের এক ঝাপটাতেই নৌকা ডুবে যাবে। এটা মা-কুমির, আর তার ছানাকেই ধরেছি আমরা।”

“আপনারা কী করলেন?”

“পথ খোলা ছিল একটাই। মাঝিরা বলল ওই কুমিরের বাচ্চাকে জলে ছেড়ে দিতে। তাই দেওয়া হল। মা-কুমিরকে আর দেখা গেল না। আমরাও বাঁচলাম।

গল্প শেষ করে চুপ করে বসে কী যেন ভাবলেন উনি, তার পর বললেন, “আমি নিউটনকে খবর পাঠাব, এখানে আমার সঙ্গে থাকবে কিনা সে সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি নিয়ো।”

সবুজের খুব কৌতূহল হচ্ছিল। কিসের জন্য অলীকবাবু থেকে যাবেন? কিন্তু নিজে থেকে উনি না-জানালে জানতে চাওয়াও ঠিক নয়।

সুযোগ এসে গেল অন্য ভাবে। সকালে সবুজ দেখল মাসাইদের গ্রামের ছোট বাচ্চাদের তাদের মায়েরা মিশনারিদের স্কুলে পড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। পিঠে বইয়ের ব্যাগ বেঁধে বাচ্চারা চলেছে। ওর খুব ভয় করছিল, সিংহ বা অন্য কোনও জীবজন্তু ওদের আক্রমণ করবে না তো? কিন্তু ওদের জীবন তো ও ভাবেই চলে। তবে মাসাইদের সিংহরা এতটাই ভয় পায় যে ধারেকাছেও ঘেঁষে না। অনেক সময় সিংহের শিকার করা মৃত হরিণের ঠ্যাং মাসাইরা নিজেরা খাবে বলেও উঠিয়ে নিয়ে আসে।

ওই বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া দেখতে-দেখতে সবুজ অলীকবাবুকে বলল, “তা হলে এখানে অনেক দিন ধরেই লেখাপড়ার চল হয়েছে? দিব্যি সব কাজকর্ম চালিয়ে নিতে পারছে। ইংরেজি, অঙ্কে ভালই জ্ঞান। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, ওই মাসাই লাল ডোরাকাটা কাপড় ওদের মতো করেই গায়ে জড়িয়েছে। কানও মাসাইদের মতো কাটা, আর তাতে চিত্র- বিচিত্র মাকড়ি ঝুলছে।”

ওর কথা শুনে অলীকবাবু বললেন, “হতে পারে ওদের জাত্যভিমান বেশি। তাই পোশাক-আশাকে নিজেদের ধারাই বহন করছে। এখানে মিশনারিরা অনেক দিনই স্কুল চালু করেছে। আমার সঙ্গে দিল্লির কলেজে এক জন মাসাই পড়েছিল। স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে সে ভারতে আসে। পরে সে আমেরিকায় স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে গিয়ে গোল্ড মেডেলিস্ট হয়। আমার মতোই সে-ও মানুষের শরীরে ভাইরাসের প্রভাব নিয়েই কাজকর্ম করেছে,” সবুজের দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে ফেলে বলেন, “হ্যাঁ, আমি এখানে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছি। ওই ঘটনায় আসাটা একটু হুড়োহুড়ি করেই করতে হল। তাকে খবর পাঠানো হয়েছে, আজ হোক কাল হোক, সে আসবেই।”

“কিন্তু তার গবেষণা আর আপনার গবেষণা... মানে আমি বলতে চাইছি...”

“বুঝেছি, তুমি কী বলতে চাইছ। আসলে ও এখন আর এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। অনেক দিন আগেই চাকরি-বাকরি ছেড়ে এই মাসাইমারায় ফিরে এসেছিল। এদের সঙ্গে আগের মতোই

জীবন কাটাচ্ছিল। গত বছর ওই ভয়ঙ্কর অতিমারি শুরু হতে আমি ওকে অনুরোধ করি, আমার সঙ্গে এ-ব্যাপারে গবেষণা শুরু করতে। ও আমার অনুরোধে আমাজ়নে থেকে কাজ করছে গত এক বছর ধরে। আমরা পরস্পরের কাজের ফলাফল নিয়ে অনলাইনে আলোচনা করেই এত দূর এগিয়েছি। ও আমার বিশেষ বন্ধু।"

"এক জন মাসাই জীবনে অত উন্নতি করার পর আবার এই মাসাইদের অনুন্নত জীবনে ফিরে এসেছেন? ভারী অবাক লাগছে ভাবতে।"

"আসলে সব ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। ওর তথাকথিত সভ্যতা পছন্দ হয়নি। ভাবনার এই বৈচিত্র আছে বলেই তো পৃথিবী এত সুন্দর!"

"কিন্তু উনি আমাজ়নে কাজ করছেন কেন?"

"ওখানে অনেক প্রাচীন প্রাণীর অস্তিত্ব এখনও টিকে আছে। তাই আমাদের কাজে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ব্যবহার করে তাদের ওপর এই ভাইরাসের আর রোগ প্রতিরোধে আমাদের ভ্যাকসিনের প্রভাবের নমুনা সংগ্রহ করতে পেরেছি। আমাজ়ন নদীর তীরে সারা বছর ধরে বৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে জল প্রায় দশ ফুট বেড়ে যায়।"

সে দিন রাতেই সবুজ এক ভয়ঙ্কর ঘটনার মুখোমুখি হল। রাতে প্রবল আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। অলীকবাবুর সঙ্গে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল, মাসাইরা হাতে মশাল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। অলীকবাবু বললেন, "গ্রামের চার পাশের বাঁশের ঘেরা টপকে সিংহ এসেছিল। পুরুষ সিংহ। ওই পঁচিশ-তিরিশ ফুটের বেড়া টপকে গ্রামে ঢুকে একটা গরু নিয়ে যাওয়ার সময় বেড়া ভেঙে চলে গেছে।"

॥ ১৭ ॥

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর একটু ঘাবড়ে গেল সবুজ। ঘরে কেউ নেই। দরজা খোলা পেয়ে ছোট-ছোট কিছু বাচ্চা এসে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে দরজা দিয়ে। ওকে দেখছে ওরা। সবুজের মনে হচ্ছিল উঠে ওদের গাল টিপে দেয়। হাতে দু'-একটা বিস্কুট তুলে দেয়। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। অলীকবাবুর কড়া নিষেধ আছে।

ও বলেছিল, "কিন্তু..."

কথা শেষ করার আগেই অলীক বলেছিলেন, "কোনও কিন্তু নয়। আমি এর আগেও এখানে বাস করে গেছি। আর এ রকম অস্পৃশ্য হয়েই থেকেছি। তুমি বুদ্ধিমান। আশা করি আমার কথা বুঝবে। এর কারণটা বুঝেছ?"

"বুঝেছি। ওদের ইনফেকশন হতে পারে। আমার ইনফেকশন হতে পারে।"

অলীক ওর কথা শুনে হেসেছিলেন শুধু।

বাচ্চাগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এরা আগের গ্রামের বাচ্চাদের মতো অতটা অপরিষ্কার নয়। দেখতে একই রকম। মাথার চুলগুলো শোয়া-শোয়া। প্রায় দেখা যায় না। মাথায় সেগুলো কুঁকড়ে লেপ্টে আছে। ও এগোতেই ওরা দৌড়ে পালাল। বাইরে উঠোনে ও দেখল, এক জন বিরাট লম্বা-চওড়া মাসাই অলীকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। পিছন ফিরে থাকায় মাসাইয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না ও। ইনিই কি তিনি? সবুজ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সবুজের খুব অভিমান হচ্ছিল। যে-মানুষটার জন্য ও এত কিছু করল, কবে বাড়ি ফিরবে তার ঠিক নেই, সেই অলীকবাবু ওকে এক বার ডেকে নিজের বন্ধুর সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করিয়ে দিলেন না! ও চুপচাপ বসে একটা আপেল চিবোচ্ছিল। বেশ কিছু ক্ষণ বাদে অলীকবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, "আজ দুপুরের পরে আমার ওই মাসাই বন্ধুর সঙ্গে আমি এক জনের সঙ্গে দেখা করতে যাব। পথে বিপদ আছে। ইচ্ছে হলে তুমি সঙ্গে যেতে পারো।"

বিকেলের আলো থাকতে-থাকতেই ওরা রওনা দিল। একদম সামনে অলীকবাবুর দীর্ঘদেহী মাসাই বন্ধুটি। ওঁর নাম সাংলা। ওর পাশে এক জন মাসাই। ওঁর পিছনে ওরা দু'জন, সব শেষে আর এক জন মাসাই। ওরা নিরস্ত্র হলেও মাসাই দু'জনেই হাতে বর্শা নিয়ে চলেছেন।

ঘন বনের মধ্যে পথ। মাঝে-মাঝে বন এত ঘন হয়েছে যে সামনের রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। পথ পাতায় ঢাকা। ওদের পায়ে ঢাকা গামবুট আছে। এ সব ব্যবস্থা অলীকবাবু সম্ভবত নিউটনকে দিয়ে করেছেন। কিন্তু মাসাইরা চলেছে খালি পায়ে। পাতার নীচে সাপখোপ বা বিষাক্ত পোকা থাকতে পারে। কামড়ে দিলে কী যে হবে!

কথাটা ও অলীকবাবুকে বলেই ফেলল, "ওরা তো খালি পায়ে। যদি পোকা বা সাপে কামড়ায়! কী হবে?"

"তোমার কি ধারণা, ওরা সেটা জানে না? শুধু সাপ, পোকা? এই বনে সিংহ আছে। চিতা আছে। লেপার্ড আছে। হাতি, গন্ডার, কী নেই? ওদের নিয়ে ভেবো না। ওরা এ সবে অভ্যস্ত।"

কথাটা শোনার পরও সবুজ সে রকম ভয় পেল না। কেননা মাসাইদের সঙ্গে পথ চলতে-চলতে ওরও অদ্ভুত এক সাহস বুকের মধ্যে জমা হয়েছে। ও টের পাচ্ছিল পায়ের নীচের মাটি কখনও ঢালু হয়ে নেমে যাচ্ছে। কখনও উঠছে। আসলে এ সব এলাকায় জমি সমান নয়। অসমতল। চার পাশ ঘিরে আছে পাহাড়। বনের মাঝে কিছু-কিছু জায়গায় আগুন রঙের, বেগুনি রঙের ফুল ফুটেছে। মাঝে-মাঝে পথের ধারে ঝর্না নজরে আসছে। অঞ্চলটায় ছোট-ছোট পাহাড় আছে পথের ধারে। আর সেই পাহাড়ের গা বেয়েই সরু ঝর্না নেমে আসছে। যেতে-যেতে ছোট-ছোট হরিণ চোখে পড়ছে। ঝর্নার ধারে একটা হরিণ আপন মনে জল খাচ্ছিল। ওদের দেখে দৌড়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। সবুজের বেশ লাগছিল বনের পথে এ ভাবে এগোতে। কিন্তু অলীকবাবুর বন্ধু সবাইকে থামতে বললেন।

ওরা খেয়াল করল মাসাই প্রহরী দু'জন বাতাসে গন্ধ শুঁকছে। তার পর ওদের ধরে তুলে দিল গাছের উপর। আর নিজেরাও চটপট উঠে পড়ল গাছে। ঠিক তার পরেই একটা গন্ডার পরিবারকে দেখতে পেল ওরা। হেলতে-দুলতে তারা বনের ডালপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। গন্ডাররা দূরে পৌঁছে যাওয়ার পরেও সবুজরা গাছেই লেপ্টে থাকল আরও কিছু ক্ষণ। এক দল হাতি চলে গেল গাছের তলা দিয়ে। তার পরেই একটা চিতা। হাতিদের যাওয়ার সময় সবুজের বেশ ভয় করছিল। যে ভাবে মাথার উপর শুঁড় তুলে হুংকার ছাড়ছিল ওরা, কিছু বুঝেছে বোধ হয়। ওদের ঘ্রাণশক্তি তো খুব বেশি। গাছের উপর থেকে ওকে নামিয়ে আনা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিল না। বলতে গেলে প্রায় ওর নাকের ডগা দিয়েই শুঁড় ঘুরিয়েছে হাতিটা।

প্রায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ও-ভাবে কাটানোর পর ওরা মুক্তি পেল। আবার হেঁটে-হেঁটে এগিয়ে চলা। বয়স হলেও অলীকবাবুর শরীর বেশ এনার্জিতে ভরপুর। সবুজের পায়ে ব্যথা করলেও উনি টুঁ শব্দ না-করে এগিয়ে চলেছিলেন। বন ক্রমশ হালকা হচ্ছিল। তার পর বড় একটা মাঠ আড়াআড়ি পেরিয়ে ওরা দূর পাহাড়ের সারির পায়ের কাছে পৌঁছে গেল। এখানে সারি-সারি ছোট-ছোট টিলা। নিঃশব্দে বেশ কিছুটা চলার পর একটা পাহাড়ি টিলার গুহার কাছে এসে সবাই থামল।

গুহার ভিতর কী যে আছে! সবুজ উঁকিঝুঁকি মেরে দেখল এক বার। বাইরে থেকে দেখায় চাপ-চাপ অন্ধকার গুহার মধ্যে জমে আছে। সাংলার চোখ বন্ধ। উনি হাত তুলে, উদাত্ত গলায়, ওদের ভাষায় এক টানা একটা গানের মতো সুর উঠিয়ে-নামিয়ে, কাউকে আহ্বান জানালেন।

ওই গান চলাকালীন গুহার মধ্যে থেকে পিলপিল করে গোটা পঞ্চাশ বামন মানুষ বেরিয়ে এল। ফুট দুয়েকের বেশি কেউ লম্বা নয়। হাত-পা খুদে-খুদে। মাথার কালো কোঁকড়া ছোট-ছোট রোঁয়ার মতো চুল মাথাতেই আটকে আছে। মুখ, মাথা, শরীরের তুলনায় বেশ বড়। লাল ডোরা কাপড় কোমরে জড়ানো। হাতে তির-ধনুক। সবুজের মনে হল, ও বইয়ের পাতায় দেখা অরণ্যদেবের খুলিগুহার পিগমিদের দর্শন পেল বুঝি। অবিকল সে রকম হাবভাব।
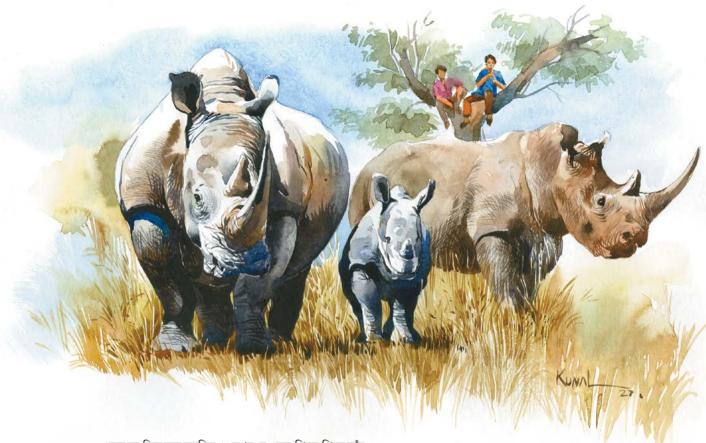
ওদের মন দিয়ে লক্ষ করছিল ও। কখন যে ওদের পিছন-পিছন তাঁর আবির্ভাব হল, ও খেয়াল করেনি। বিচিত্র সাজগোজ করা শীর্ণ এক জন মানুষ। তাঁর দু'পাশে দু'টি সিংহ নিরীহ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষটার দৃষ্টি তাদের মুখের উপর স্থির মনে হল। মুখের দাড়ি কেমন জড়িয়ে গেছে। কপালে উদ্ভট আঁকিবুকি। মাসাইদের লাল কাপড় কোমরে জড়ানো। কানের বিভিন্ন ফুটোয় নানা রঙের মাকড়ি, গলায় অনেক মালা ঝুলছে। বিশাল লম্বা মানুষটার বয়স বোঝা যায় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি লক্ষ করলেন সবাইকে। শোনা গেল ইনি মাসাইদের সবচেয়ে বড় পুরোহিত। তার পর তাঁর কাছে হাঁটু মুড়ে সাংলা হাত পাতলে তিনি বিড়বিড় করে মন্ত্র বলে ওর হাতে কিছু দিলেন। সেটা নিয়ে এ বার ওঁর পিছু-পিছু সবাই ফিরে চলল।

ফেরার সময় খুব দ্রুত এল ওরা। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর অলীকবাবু বসলেন ওর সঙ্গে। প্রথমেই যে কথাটা বললেন সেটা শুনে ও চমকে গেল। ওর কাছে বিষয়টা বেশ অকল্পনীয়।

"শোনো সবুজ, তোমার বাবা-মা এখন নজরদারিতে আছেন। ওই আইআইটি-র ছেলেগুলো ওদের নজরে-নজরে রেখেছে।"

"কেন? কারণটা আমায় বলবেন।"

"খুব সোজা। ওরা তোমার বাবা-মা, তাই। তোমাকে যারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তারা বুঝেছিল, তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আমার গবেষণার খবর কিছু তুমি জানতে পারো, বা তোমাকে এ কাজে আমি ব্যবহার করতে পারি। আর কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি তোমার বাবা-মাকে টানলেই তোমাকে পাওয়া যাবে।"

"কিন্তু আদিত্য বা বিক্রম ওঁরা... আমি তো ভাবতেও পারছি না।"

"হ্যাঁ, ওঁরা বিপক্ষের লোক। প্রথম থেকেই আমাকে নজরে রেখেছিল। পরে তুমিও অন্তর্ভুক্ত হলে। এখন আবার তোমার বাবা-মাকে ধরেছে। ওদের চক্র সারা পৃথিবীতে ছড়ানো।"

সবুজ ভয়ে-ভয়ে বলে, "তা হলে ওরা ফিরবেন কী করে?"

"সে ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন শুয়ে পড়ো। রাত অনেক হয়েছে।"

ক্লান্ত শরীরে আর কথা বাড়ালেন না উনি। ঘরে রাখা কিছু ফল খেয়ে দু'জনেই শুয়ে পড়ল।

অবশেষে বিমানবন্দরে পৌঁছে সবুজ দেখল, প্লেন এসে দাঁড়িয়েছে। ওর বাবা-মা সিঁড়ি বেয়ে টুকটুক করে দিব্যি প্লেনে উঠছেন। আর ও মালপত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউ ওকে প্লেনে উঠতে বলছে না। তার পর ওরই নাকের ডগা দিয়ে প্লেন আকাশে উড়ে গেল। ওকে নিয়ে গেল না। ওকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হয়তো কারওই নেই। সে কথা ভেবেই জোর কান্না পেল ওর।

কান্না পেতে-পেতে ঘুমটা ভেঙে গেল সবুজের, বুঝতে পারল, মাসাইদের ঘরে ও একা শুয়ে আছে। ঘর খোলা। অলীকবাবুকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে উনি উঠেছেন। বাইরে আছেন। কী এক ক্লান্তি আর মন খারাপ ওকে ঘিরে আছে যেন। বিছানা ছেড়ে উঠতে একদম ইচ্ছে করছে না। দূর থেকে সেই হাতে বানানো বাজনার সুর ভেসে আসছে। বাজনার নামটি চমৎকার! ওয়ানডেনডো।

॥ ১৮ ॥

সকালে নিজেদের রুমে চা-কফি খেয়ে চুপ করে বসেছিলেন ললিতা। নিরুপমবাবু হাঁটতে বেরিয়েছেন। হঠাৎ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কেউ উঠে আসছে মনে হল তাঁর। তাঁবুর দরজার চেন খুলে দেখেন নিউটন দাঁড়িয়ে। তাঁবুতে ঢুকে আসে ও। তার পর খুব কাছে এসে ইংরেজিতে ফিসফিস করে, "আজ রাতে তৈরি থাকবেন। আমি একটু রাতে এসে ভারী মাল সব গাড়িতে নিয়ে যাব। তা হলে কারও চোখে পড়বে না। আপনারা রাতেই এক জন-এক জন করে হেঁটে গাড়িতে উঠবেন। ওখানেই বসে বা ডাবল সিটে শুয়ে ঘুমোবেন। ভোরেই বেরিয়ে যাব আমরা। দুপুরের ফ্লাইট। এখানে এখন কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। স্যরকে বলে দেবেন, প্লেনে ওঠার আগে অবধি কেউ ফোন করলে উনি যেন বলেন যে, আপনারা লজে বসে বোর হচ্ছিলেন, তাই আবার এখানকার প্রাণীদের মাইগ্রেশান দেখতে গিয়েছেন।"

ললিতা ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, "সে কী! আমার ছেলের খবর নেই। ওকে এখানে রেখে আমরা কখনওই যাব না।"

নিউটন হাসে, "ও ভাবে ভেবে লাভ নেই। তা হলে আপনারা সবাই আটকে থাকবেন। যে যখন সুযোগ পাবে, সে তখন চলে যাবে। আপনার ছেলে কালও যেতে পারে, পরেও যেতে পারে। তবে এ বারে আমি গাড়ি নিয়ে যাব না। অন্য লোক ঠিক করেছি। আপনারা আমাদের দেশের অতিথি। আমাদের এই বেড়ানোর এজেন্সির একটা সুনামের ব্যাপার আছে। তাই যতটা সম্ভব চেষ্টা করছি বিপদ সামলে নিজেদের দেশে আপনাদের পৌঁছে দেওয়ার।"

নিউটন আর দাঁড়ায় না। ও চলে যাওয়ার পর ললিতা কিছুতেই মন বসাতে পারছিলেন না। সুটকেসটা এক বার টেনে বের করেন। আবার ঢুকিয়ে রেখে দেন। সবুজের বাবার সঙ্গে কথা না-বলে তিনি কিছুই গোছাবেন না। নিরুপম চুপচাপ হাঁটছিলেন ডাইনিং হলের সামনের লম্বা লনে। ছেলেটা কোথায় আছে, কেমন আছে, সেই ভাবনাটা মাথার মধ্যে দিন-রাত চলছে। এই দুশ্চিন্তাটা সবুজের মায়ের সামনে একদম প্রকাশ করছেন না তিনি। করলেই উনি একেবারে ভেঙে পড়বেন। তাই ওঁর কাছে এমন ভাব করছেন যেন চিন্তা করার কিছু কারণ নেই। সবুজ ভাল আছে। শুধু কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। যা ভেবে এসেছিলেন, কিছুই মিলল না। আদিত্য এসে কখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছে তিনি খেয়াল করেননি। ওর প্রশ্ন শুনে মুখ তুলে তাকালেন।

"ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন নাকি?"

"মানে? ছেলের কোন হদিশ নেই। আমরা ফিরে যাব?"

"হদিশ আপনারা সত্যিই জানেন না? নাকি বলছেন না কাউকে?"

নিরুপমবাবু এ রকম কথা আদিত্যর মুখে আশা করেননি। থমকে দাঁড়ান তিনি। তার পর সোজাসুজি তাকান ছেলেটার দিকে। কী ব্যাপার? গম্ভীর হয়ে বলেন, "যদিও তোমাকে উত্তর দিতে কোনও ভাবেই বাধ্য নই, তবু বলছি, আমি মিথ্যে বলি না।"

ওখান থেকে ফেরার সময় তিনি অনুভব করলেন আদিত্য ওই লনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। তাঁর খুব খারাপ লাগছিল। সেটা আরও বাড়ল, যখন তাঁবুতে ফেরার পর তিনি অবাক হয়ে দেখলেন এই অবেলায় কপালের উপর হাত চাপা দিয়ে ললিতা বিছানায় শুয়ে আছেন। সাধারণত অবসরে ললিতা বই পড়েন। তাই বেড়াতে গেলেও দু'-তিনটে বই তিনি সঙ্গে রাখেন। সবুজের জন্য মন খারাপের একটা ব্যাপার আছে ঠিকই। কিন্তু কিছু না-ঘটলে এমন আচরণ করার তো কথা নয়।

নিরুপমবাবুর পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে বসলেন ললিতা, "আচ্ছা, আমরা কি ছেলেটাকে এখানে রেখেই চলে যাব?"

"হঠাৎ এ কথার মানে কী? এ রকম বলছ কেন?"

নিউটনের সব কথা খুলে বলতে নিরুপমবাবু বললেন, "চলে যাওয়াই ভাল। মনে হচ্ছে আমাদের ওপরও নজরদারি শুরু হয়েছে।"

আদিত্যর ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে বুঝলেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ললিতাও একমত হলেন যে, এখানে থেকে তাঁরা ছেলের কোনও উপকারই করতে পারবেন না। মাঝখান থেকে তাঁদের বিপদ ঘটতে পারে। তখন ছেলেটা দুশ্চিন্তায় ভুগবে। তার চেয়ে তাঁরা দেশে ফিরে সঠিক জায়গায় নিখোঁজ সবুজের খোঁজ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। অন্য রকম ভাবে এখানকার সরকারের উপর চাপ দিতে পারেন।

বিমানবন্দরের রাস্তাটা একেবারেই নিরাপদ নয়। লম্বা রাস্তা, প্রচুর সময় লাগে। আশপাশে কোনও লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই। ড্রাইভার একটা বাচ্চা ছেলে। ও ভয় পাচ্ছিল, খবর পেলে যে-কোনও সময় দুর্বৃত্তরা সবুজের বাবা-মাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সবুজের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাই কথা না-বলে খুব জোরে জিপ চালাচ্ছিল ও। বিমানবন্দরে পৌঁছে ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করলেন ওরা দু'জন। তার পর প্লেন ছাড়ার ঘোষণা হতে লাইনে দাঁড়ালেন। প্লেনের পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া আর কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। ঠিক তখনই দূর থেকে আদিত্য আর বিক্রমকে ছুটে আসতে দেখলেন নিরুপমবাবু। ওরা ভিতরে ঢুকল কী করে? তবে কি ওরাও তাঁদের সঙ্গেই ফিরছে? একটুও দেরি না-করে স্ত্রীর হাত ধরে প্লেনের সিঁড়ির ঘেরাটোপে ঢুকে গেলেন তিনি। ভয়ে আর পিছন ফিরে তাকালেন না।

ললিতা মাথা নিচু করে প্লেনের মধ্যে হাঁটছিলেন। বিদেশ-বিভুঁইয়ে ছেলেটাকে ফেলে চলে আসার ব্যাপারটা মন থেকে নিতে পারছিলেন না কিছুতেই। জানলা দিয়ে প্লেনের সিঁড়ির চলে যাওয়া দেখলেন নিরুপমবাবু। জোর গতিতে ছুটতে-ছুটতে একটা ঝাঁকুনি মেরে আকাশে উঠে পড়ল প্লেনটা। ললিতা মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করছিলেন। জানলা দিয়ে মেঘ দেখতে-দেখতে নিরুপমবাবু ভাবছিলেন, ছেলেটাকে এখানে রেখে যাওয়াটা কি ঠিক হল?

॥ ১৯ ॥

স্বপ্নটা একেবারেই সত্যি হল। মা-বাবার চলে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রথমেই সেই কথাটা মনে হল সবুজের। তবে একই প্লেনে না-হলেও তাদেরও এ বার ফেরার ব্যবস্থা হচ্ছে। সবটাই করছেন অলীকবাবুর সেই মাসাই বন্ধু, সাংলা। পরিকল্পনা মতো একটু রাত থাকতেই তাদের বেরোতে হবে। নাইরোবি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে তবে উনি ফিরবেন।

এ-দিকের কাজ সব শেষ। ভ্যাকসিনের প্রস্তুতি এবং সব পরীক্ষাই হবে দেশে ফিরে। তবে বেশির ভাগ কাজটাই হয়ে গেছে। বনে-জঙ্গলে যে সব মানুষ থাকে, তাদের শরীরের সহনশীলতা শহুরে মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই তাদের উপর পরীক্ষা করে কোনও লাভ নেই। ফিরে গিয়ে দেশে যারা প্রথম ডোজ় নিতে ইচ্ছুক, তাদের উপরেই দেখা হবে। সকালে কথা হচ্ছিল অলীকবাবুর সঙ্গে। দেশে বিদেশের আবিষ্কৃত ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁরা যে ভ্যাকসিন চালু করতে চলেছেন তার একটাই ডোজ় হবে, যে কোনও রকম ভাইরাস ইনফেকশনের আশঙ্কাও নির্মূল করবে।

দরজা খোলা। মাসাই ছেলেমেয়েরা একটু আগেই এসেছিল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে সব। ভিড় করেছিল ঘরের সামনে। সবুজের খুব খারাপ লেগেছে। অলীকবাবুর কড়া বারণ। তাই ওদের হাতে কিছুই তুলে দিতে পারেনি। অলীকবাবুর কাছেই খবর পেল আদিত্য আর বিক্রম নিরুপমবাবুদের এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ধাওয়া করেও সুবিধে করতে পারেনি। ওঁরা ঠিকঠাক পৌঁছে গেছে।

সবুজ জেনেছে অলীকবাবুর বন্ধু ওয়্যারলেস ব্যবহার করেন। তাই নির্দিষ্ট লোক মারফত সব খবরই তাঁরা সংগ্রহ করে নেন। অলীকবাবু বললেন, "বাবা-মা'র খবর পেয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হলে। তোমাকে ওঁদের কাছে পৌঁছে দিলে আমি নিশ্চিন্ত হব। আর-একটা কথা, দিল্লিতে পৌঁছনোর পর তোমার কথামতো লোক পাঠিয়ে ওই দরকারি পেন ড্রাইভটা তোমার মা'র কাছ থেকে নেওয়া গেছে। কাজেই ওই ব্যাপারেও আমি খুব নিশ্চিন্ত হয়েছি।"

সবুজ তখুনি বলেছিল, "খুব ভাল খবর। তা হলে আপনার কাজের ব্যাপারে আমার দায়িত্ব শেষ। তবে আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। আমি বাবা-মা'র সঙ্গে যখন ফিরে যাইনি, একেবারে আপনাকে নিয়েই যাব কিন্তু।"

অলীকবাবু হাসলেন, "সে কথা দিতে পারছি না। তবে চেষ্টা করব যে, এটুকু বলতে পারি। তুমি তোমার সব কিছু গুছিয়ে রেখো। সময় হলেই বেরিয়ে যাব।"

অলীকবাবুর শখ স্কেচ করা। তাই ওঁর কাছে বেশ কিছু ড্রয়িং শিট আর ইচ্ছে হলে রং করার জন্য প্যাস্টেল কালার মজুত থাকে। সবুজও ছবি আঁকবে বলে ওঁর কাছ থেকে দু'-একটা কাগজ নিয়ে রেখেছিল। দুপুরবেলায় অলীকবাবু সম্ভবত বন্ধুর কাছে গিয়েছিলেন। ও সারা দুপুর-বিকেল ধরে বসে-বসে কাগজ ছিঁড়ে, কার্ডের মতো ভাঁজ করে অনেক

ছবি আঁকল। প্যাস্টেল দিয়ে রং করল ছবিগুলো। ওই বাচ্চাগুলোকে কার্ড দিলে অলীকবাবু কিছু বলবেন না নিশ্চয়ই। নিজের দেশের রাস্তা, ছেলেমেয়ে ভর্তি পার্ক, নদীর ধার, মেলা, বাজার, আরও অনেক কিছু আঁকার সঙ্গে-সঙ্গে দরজায় ভিড় করা ওই ছেলে-মেয়েদেরও আঁকল ও।

সন্ধেবেলা অলীকবাবু ঘরে ফিরে এসে ওর ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত, "এই ছবি পেলে ওরা খুব খুশি হত। ওদের দিতে চাও, তাই তো? কিন্তু ওদের তো তুমি পাবে না। আজ রাতেই আমাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। কাল ভোরের ফ্লাইটেই আমরা দেশে ফিরব। ঠিক আছে দাও আমাকে। দেখছি, কী ভাবে ওদের দেওয়া যায়।"

একটু বেশি রাতেই রওনা হল ওরা। বনের মধ্যে মাসাইদের নিয়ে গার্ড দিয়ে ওদের কিছুটা হাঁটিয়ে এনে গাড়িতে তুললেন সাংলা। তার পর নিজেও চড়ে বসলেন ড্রাইভারের সিটে। সবুজ বুঝল এয়ারপোর্টে তাদের পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরবেন।

ঘন বনের মাঝখান দিয়ে রাস্তা গিয়েছে। চার পাশে কোনও আলোর চিহ্ন নেই। তার মধ্যে হেডলাইটের জোরালো আলো ফেলে তীব্র গতিতে ওদের গাড়ি ছুটছে। সবুজের মন ভারী হয়ে আছে। ও বুঝতে পারছিল এই ঘন জঙ্গল, নানা ধরনের ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণী, মাসাই ছেলেমেয়েরা, নিউটনের মতো বন্ধুরা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ক'দিনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ, নানা ধরনের বিচিত্র অভিঘাত, গভীর ভাবে জড়িয়ে ধরেছে তার মনকে। তাই নানান বিপদের মুখোমুখি হলেও মাসাইমারা ছেড়ে যেতে তার এত খারাপ লাগছে।

রাত জাগা অভ্যেস নেই, তাই গাড়ির দুলুনিতে ঘুম পাচ্ছিল ওর। জিপে ও, অলীকবাবু আর একটি মাসাই ছেলে পাশাপাশি বসেছে। সামনে ড্রাইভারের সিটে বসেছেন সাংলা। সাংলা এক বার পিছনে তাকিয়ে কী যেন বললেন অলীকবাবুকে। সঙ্গে-সঙ্গে উনি সবুজকে বললেন, "ইচ্ছে করলে তুমি ঘুমোতে পারো। আমরা তো জেগে আছি।"

চোখ খুলে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হল। তবে দু'বার গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙলে ও দেখেছিল দুটো অদ্ভুত দৃশ্য। এক বার এক জন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামানোর জন্য দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে "হেল্প, হেল্প" করে চেঁচাচ্ছিল। অন্য বার পথে কাঠের গুঁড়ি ফেলে পথ বন্ধ করা হয়েছিল। দু'বারই গাড়ি থামেনি। শেষ মুহূর্তে লোকটা ছিটকে সরে গিয়েছিল পথের ধারে। ঘুমের ঘোরে হলেও সবুজ ভুল কিছু দেখেনি। তখনও ড্রাইভারের সিটে ছিলেন স্বয়ং সাংলা।

এয়ারপোর্টে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। গাড়িতেই পোশাক বদলে, নকল চুল-দাড়ির উপর পাগড়ি লাগিয়ে, হাতে লোহার বালা পরে, 'শিখ' সাজল দু'জনে। লাউঞ্জে বসে থাকতে-থাকতেই বেলা এগারোটা নাগাদ প্লেনের ঘোষণা শোনা গেল। দিল্লি পৌঁছনোর পর লাগেজ নিয়ে বাথরুমের সামনে এসে অলীকবাবু বললেন, "যাও, চেঞ্জ করে এসো। না হলে কলকাতায় তোমার বাবা-মা তোমাকে চিনতে পারবেন না। আমি খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। ওঁরা এয়ারপোর্টের বাইরে তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকবেন। আমি ক'টা দিন দিল্লিতেই থাকব।"

"আপনি আগে যান। আমার ফ্লাইটের তো দেরি আছে। আপনি তো এখনই বেরিয়ে যাবেন।"

"আমার সময় লাগবে, তুমি আগে সেরে এসো," বলে অলীকবাবু জিনিসপত্র সব দেওয়ালের দিকে জড়ো করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

॥ ২০ ॥

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সবুজ অবাক। ওর সুটকেস এক পাশে দাঁড় করানো। কিন্তু বাদবাকি লাগেজ নিয়ে অলীকবাবু কোথায় গেলেন? সামনে ছোটখাটো একটা ভিড় হয়েছে। কালো পোশাক পরা ব্ল্যাকক্যাট ধরনের দু'জন সেই ভিড় সরাতে-সরাতে কাউকে গেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তক্ষুনি ভিড়ের মধ্যে থেকে এক জন মানুষ ছুটে এলেন তার দিকে। মুখটা চেনা-চেনা। ওর জামার বুকপকেটে একটা কার্ড গুঁজে দিয়ে বললেন, "কলকাতায় পৌঁছে ফোন করে নিশ্চিন্ত কোরো। চিন্তায় থাকব। পরে দেখা হবে।"

ভিড় ধাওয়া করতেই ছিটকে সরে গেলেন তিনি। আর প্রহরীরা গার্ড দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। সবুজ হাঁ হয়ে গেল। ইনি কে? হঠাৎ ওর এত শুভানুধ্যায়ী সাজছেন কেন? কলকাতার প্লেন আরও ঘণ্টা তিনেক বাদে। লাউঞ্জের সোফায় বসে ভাবছিল ও, আশ্চর্য! অলীকবাবু এ ভাবে তাকে ফেলে গেলেন কোথায়? এমনটা ও ভাবেনি তো! হঠাৎ কী খেয়াল হতে পকেট থেকে কার্ডটা বের করল সবুজ। আর অবাক হয়ে দেখল তাতে লেখা, 'প্রফেসর অনাথবন্ধু সেনগুপ্ত।'

অলীকবাবুই অনাথবন্ধু! তাই গলাটা অত চেনা লেগেছিল।

প্লেনে অলীকবাবুর কাছে ও বলেছিল, "একটা বিষয়ে কৌতূহল রয়েই গেল। ওই প্রাচীন মাসাই বৈদ্যের কাছে অত কষ্ট করে যাওয়া হল কেন? উনি আপনাদের কী দিলেন?"

উনি কাগজ ওল্টাতে-ওল্টাতে বলেছিলেন, "বিশল্যকরণী। এর বেশি বলব না। কাকে বলে জানা না-থাকলে ইন্টারনেটে সার্চ করো।"

ও বলেছিল, "বলবেন না সেটা মেনে নিলাম, ধাঁধায় রাখছেন কেন?"

উনি মুখ টিপে হেসে ফিসফিস করে বলেছিলেন, "আসল ধাঁধাটাই বাকি আছে, বুঝলে! সেটা সামলাতে পারবে তো?"

॥ ২১ ॥

মাস তিনেক পরের কথা। খবরের কাগজ খুলেই বাবা চেঁচালেন, "তোমরা আজকের হেডলাইনটা দেখে যাও!"

'ভ্যাকসিনের সফল প্রয়োগ। অনাথবন্ধু এখন মানুষের বন্ধু।'

মা হেসে বললেন, "কেউ কি বিশ্বাস করবে যে, অত বড় মানুষের সঙ্গে আমাদের ও রকম সম্পর্ক হয়েছিল!"

বাবা হেসে বললেন, "করবে। এই দেখো উনি সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছেন, ড. সাংলা তাঁর ভ্যাকসিন সংক্রান্ত যাবতীয় আবিষ্কারের অন্যতম ভাগীদার। আর-এক জন সহযোগী যোদ্ধার নাম সবুজ সরকার, যে সব সময় তাঁর বিপদে-আপদে সঙ্গে ছিল।"

ঘরের মধ্যে সবুজ তখন আগের দিনে কুরিয়ারে আসা প্যাকেটটা খুলে আবার দেখছিল। অনাথবন্ধুর করা পাঁচটি স্কেচ। মাসাইমারার বিগ ফাইভ। সিংহ, হাতি, জলহস্তী, বুনো মোষ, আর লেপার্ড। প্রত্যেকটার পিছনে লেখা, 'স্নেহের সবুজকে ভালবেসে, অনাথবন্ধু'।

অ্যালিসা হিলি

ক্রিকেটের আগুনে ব্যাটার অ্যালিসা

২০১৭ সালের পর থেকেই দাউদাউ ফর্মে আছেন এই অজ়ি ব্যাটার-উইকেটরক্ষক।

চন্দন রুদ্র

ইদানীং ক্রিকেট মাঠে ঝড় তুলেছে তাঁর বিধ্বংসী চওড়া ব্যাট। মাঠে নেমে চোখের পলকে বিপক্ষের বোলিং আক্রমণকে তছনছ করে দিতে পারেন। অস্ট্রেলিয়ার এই উইকেট রক্ষক-ব্যাটার অ্যালিসা হিলিই এখন মেয়েদের ক্রিকেট-বিশ্বের সবচেয়ে আগুনে ব্যাটার। ব্যাটে চোখ ধাঁধানো সাফল্যের পর বিশ্ব জয়ের আনন্দে মাঠে উচ্ছ্বাসে মেতেছেন স্ত্রী। সেই মুহূর্তে গোটা স্টেডিয়াম যখন তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, তখন গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ক্রিকেটের আর-এক বিশ্বজয়ী তারকা, গর্বিত এক স্বামী। নিউজ়িল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের মাঠে এ বার মেয়েদের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ ফাইনালের শেষে এমনই দৃশ্য দেখেছে দুনিয়া। স্ত্রী অ্যালিসা হিলি অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটার। আর স্বামী মিচেল স্টার্ক, অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ ক্রিকেট দলের তারকা পেসার। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে এই নিয়ে সপ্তম বার মেয়েদের ক্রিকেটে বিশ্বসেরা খেতাব জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে মূলত ওপেনার অ্যালিসার ১৩৮ বলে দুরন্ত ১৭০ রানের ইনিংসই অজ়ি মেয়েদের জয়ের পথ সহজ করে দেয়। এই বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার অ্যালিসা গড়েছেন একাধিক নতুন বিশ্বরেকর্ড। তাঁরই মতো ২০১৫ সালে ওয়ানডে ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন স্টার্ক। এ বছর দু'জনেই অস্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা ক্রিকেটার (পুরুষ ও মহিলা) নির্বাচিত হয়েছেন। খেলার দুনিয়ায় এমন সফল ক্রিকেট-দম্পতি আর নেই। এমনকি, গিনেস বুকেও উঠে গিয়েছে অ্যালিসার নাম।

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের গোল্ড কোস্টের মেয়ে অ্যালিসা। পুরো নাম অ্যালিসা জিন হিলি। ক্রিকেট-পরিবারে জন্ম হলেও গোড়ার দিকে ক্রিকেটের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না অ্যালিসার। ২০০৭ সালে নিউ সাউথ ওয়েলস দলের হয়ে তাঁর ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ। শুরুর দিকে ব্যাটার হিসেবে মাঠে নামলেও পরে অ্যালিসা হাতে তুলে নেন গ্লাভস।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা ফেলতে অবশ্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দেশের উইমেন্স ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগে ব্যাটের সঙ্গে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়েও দ্রুত নজর কাড়েন তিনি। ২০১০ সালে নিউজ়িল্যান্ডের বিপক্ষে এক দিনের সিরিজ়ে অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের দলে মিডল অর্ডার ব্যাটারের সঙ্গে অ্যালিসা উইকেটরক্ষকেরও দায়িত্ব পান। সে বছর মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের সদস্য ছিলেন অ্যালিসা।

সেই থেকে এক দশকের বেশি সময় ধরে মেয়েদের অজ়ি ক্রিকেট দলে খেলছেন। তবে ২০১৭ সালের আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন অস্ট্রেলিয়া দলের সাধারণ মানের এক ব্যাটার। দুরন্ত গতিতে খেলা শুরুর আগে ক্রিকেট থেকে এক বার অবসর নেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। অ্যালিসার কথায়, ‘‘আমার বয়স তখন ২৬-২৭ বছর হবে। ক্রিকেট নিয়ে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।’’ ২০১৭ সালে অ্যাশেজ় সিরিজ়ে তাঁকে ওপেনার হিসেবে তুলে আনার পর থেকেই ব্যাট

হাতে ক্রমশ এক নতুন অ্যালিসার জন্ম হয়। এক বার এক সাক্ষাৎকারে তিনি ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মাকে ‘সবচেয়ে বিধ্বংসী সাদা বলের ব্যাটার’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ‘‘ব্যাটে সাফল্য পাওয়ার জন্য আমি রোহিতের ব্যাটিং-শৈলী অনুসরণ করতে চাই।’’ এরই মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সব মিলিয়ে অ্যালিসা জিতেছেন ছ’টি বিশ্বকাপ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ে ২০১৮ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেরা খেলোয়াড় হন। একই বছরে পান আইসিসি-র বর্ষসেরার পুরস্কার। মেলবোর্নে ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ৩৯ বলে ৭৫ রানের ম্যাচ-জেতানো ইনিংস খেলার ফাঁকে ছেলে কিংবা মেয়েদের ক্রিকেটের যে-কোনও বিশ্বকাপের ফাইনালে দ্রুততম (৩০ বলে) অর্ধ শত রানের ইনিংস খেলে নজির গড়েন অ্যালিসা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তাঁর বছর তিনেক আগের অপরাজিত ১৪৮ রান মেয়েদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আজও ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংস।

আগুনে ব্যাটার অ্যালিসাই প্রথম কোনও মহিলা ক্রিকেটার, যিনি এক বিশ্বকাপে ৫০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে রেকর্ড গড়েছেন। এ বারের বিশ্বকাপে তিনি নয় ম্যাচে করেন ৫০৯ রান। বিশ্বকাপ ফাইনালে তাঁর ১৭০ রানের ইনিংস ক্রিকেটের যে কোনও বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নজির। প্রথম কোনও ব্যাটার হিসেবে বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালে শতরান করার কৃতিত্বও দেখিয়েছেন অ্যালিসা। বছর দুয়েক আগে নিউজ়িল্যান্ড সফরে ভেঙেছেন টি-টোয়েন্টিতে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ৯১টি শিকারের বিশ্বরেকর্ড। তাঁকে নিয়ে যখন লিখছি তখন ৭৮৫ রেটিং পয়েন্ট পেয়ে আইসিসি-র মহিলা ক্রিকেটার-তালিকায় শীর্ষে আছেন তিনিই। ক্রিকেটে তিনি একাধিক বিশ্বরেকর্ডের মালিক। আবার ৮২.০৫ মিটার উচ্চতা থেকে ছোড়া ক্রিকেট-বল তালুবন্দি করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও নাম তুলে ফেলেছেন এই অজ়ি ওপেনার। মেলবোর্ন স্টেডিয়ামে ২০২০ সালে ড্রোন থেকে নিক্ষেপ করা বল ধরে আগের ৬২ মিটারের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। মেয়েদের ক্রিকেটে অ্যালিসা এখন সত্যিই সুপারস্টার।